# নির্বাচিত সংকলন

শাহ আবদুল হান্নান

# নির্বাচিত সংকলন

শাহ্ আবদুল হান্নান

বুকমাস্টার

www.pathagar.com

# নির্বাচিত সংকলন

## শাহ্ আবদুল হান্নান

প্রকাশক
আহমদ হোসেন মানিক
বুকমাস্টার
৭০ নয়াপল্টন, ঢাকা ১০০০
bookmasterdhaka@gmail.com

প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর ২০১৩

গ্রন্থস্বত্ব
দি পাইওনিয়ার, দি উইটনেস

প্রচ্ছদ
জিয়া শামস

মুদ্রণ
দি প্রিন্টমাস্টার
theprintmaster2000@gmail.com

মূল্য
ছয়শত টাকা

Nirbachito Sankolon : Shah Abdul Hannan. Published by Bookmaster 70 Nayapaltan, Dhaka 1000. First Publication: September 2013. Price : Tk.600.00 US$ 30.00

www.pathagar.com

# ভূমিকা

বিগত প্রায় চার দশক ধরে আমি বাংলাদেশ, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, ইসলাম, অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি সহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর আমার বক্তব্য, বিশ্লেষণ ও মতামত প্রকাশ করে বেশকিছু বই লিখেছি। আমার এ বইগুলোর মধ্যে আটটি বই থেকে সময়ের বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ এবং সাক্ষাৎকার নিয়ে 'নির্বাচিত সংকলন' গ্রন্থটি সাজানো হয়েছে। এতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে রয়েছে মানবাধিকার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, পররাষ্ট্রনীতি, বিশ্ব বাস্তবতা, ইসলামী অর্থনীতির বিভিন্ন দিক, দারিদ্র্য বিমোচন, ক্ষুদ্রঋণ, ওয়াকফ, গণতন্ত্র ও ইসলামের সম্পর্ক সহ ইসলামের বিভিন্ন দিক, সেকুলারিজম, শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, নারী সমাজ, মিডিয়া এবং জাতীয় সমস্যা ইত্যাদি। এ গ্রন্থটি বাংলাদেশ সহ আন্তর্জাতিক বিশ্বের প্রত্যেকটি বিষয়কে ইসলামের দৃষ্টিতে দেখার সুযোগ তৈরি করবে। যারা সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ইত্যাদি নিয়ে চিন্তা করেন, কাজ করেন – বইটি তাদের কাজে লাগবে। বইটি ইংরেজিতে অনূদিত হলে বাংলাদেশের বাইরেও যারা মানবতার কল্যাণে কাজ করছেন তারা উপকৃত হবেন বলে আশা করি।

এ বইটি সংকলন ও সম্পাদনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে দি পাইওনিয়ারের স্নেহভাজন আহমদ হোসেন মানিক, মোঃ হাবিবুর রহমান ও কবি ওমর বিশ্বাস। বুদ্ধিবৃত্তিক সংগঠন দি পাইওনিয়ার, দি উইটনেস এবং প্রকাশনা সংস্থা বুকমাস্টার সহ যারা এ বইটি প্রকাশে ভূমিকা রেখেছেন সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আমার লেখালেখিতে সততাই আমাকে পথনির্দেশ করেছে। আমি তথ্য দ্বারা প্রভাবিত হয়েছি, বিদ্বেষ দ্বারা নয়। সবার চিন্তা একরকম হয় না। একই ঘটনার বিভিন্ন ব্যাখ্যা হতে পারে। আমারও ভুল থাকতে পারে তা আমি নির্দ্বিধায় স্বীকার করছি। এ গ্রন্থের তথ্য ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে পাঠকের যে কোনো ধরনের পরামর্শ ও সংশোধনী আমাকে কৃতার্থ করবে।

দুনিয়ার ব্যক্তিগত কোনো লাভের জন্য আমি লেখালেখি করিনি। সর্বশক্তিমান আল্লাহপাকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যিনি আমাকে লেখার সুযোগ দিয়েছেন। দোয়া করছি তিনি যেন এ বইটি গ্রহণ করেন এবং আমাদের জাতির জন্য এটিকে কল্যাণকর করে দেন।

**শাহ আবদুল হান্নান**
sahannan@sonarbangladesh.com

সেপ্টেম্বর ২০১৩

www.pathagar.com

# সূচিপত্র

## বিষয়চিন্তা


মুসলিম বিশ্বের বর্তমান সময়ের প্রধান ইস্যুসমূহ // ১৩
গণতন্ত্র ঃ প্রেক্ষিত ইসলাম ও মুসলিম বিশ্ব // ২১
মুসলিম উম্মাহর সমস্যা থেকে উত্তরণ ঃ কিছু ভাবনা // ২৭
মহৎ আদর্শের জন্য কাজ করতে হলে // ৩১
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ঃ একটি পর্যালোচনা // ৩৫
সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক // ৪০
ইসলামি সংস্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্য তৌহিদ // ৪৭
সংস্কৃতি আইনের চেয়ে শক্তিশালী // ৫০
অশ্লীল সংস্কৃতির প্রতীক ভ্যালেন্টাইন ডে // ৫২
ইসলামের দৃষ্টিতে মানবাধিকার // ৫৫
টিভি কম দেখুন ঃ সময়কে কাজে লাগান // ৬০
টিভি চ্যানেল কর্তৃপক্ষের নিকট কিছু প্রস্তাব // ৬৪
ঐক্য ও নেতৃত্বে জামাল উদ্দীন আফগানী // ৬৯
ইকবাল ও তার রাজনৈতিক অবদান // ৭৩


## সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি ভাবনা


ইসলামী ব্যাংকের বিরুদ্ধে প্রচারণা ঃ নেপথ্যে কী কারণ // ৭৭
ইসরাইলকে কেন স্বীকৃতি দেয়া সঙ্গত নয় // ৮০
ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মুসলিম জাগরণ // ৮৪
পারিবারিক নির্যাতন একটি বিশ্ব সমস্যা // ৯০
বিশ্বের সবচেয়ে বড় সমস্যা স্রষ্টাকে ভুলে যাওয়া // ৯৩


www.pathagar.com

ধর্মীয় মিলিট্যান্সির উপর বিআইআইএসএস-এর সেমিনারে
আমার অংশগ্রহণ ও অভিজ্ঞতা // ৯৬

সামাজিক সমস্যা সমাধানে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের
ইমাম প্রশিক্ষণ প্রকল্প // ১০৬

মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর শ্রেষ্ঠ কৃতি
তাঁর 'তাফসীরুল কোরআন' // ১১১

সমাজ ও সংস্কৃতিতে নারীর অবস্থান // ১১৫

কর্মজীবী মেয়েদের বাসস্থান সমস্যা // ১১৮

আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য // ১২২

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ প্রসঙ্গ ভাবনা // ১২৮

ঈদ সংস্কৃতির স্বরূপ ও মূল্যায়ন // ১৩২

একজন লেখক প্রকৃতপক্ষে বইয়েরই প্রোডাক্ট // ১৩৬

উৎসব পালন ঃ বিভিন্ন দিক // ১৩৯

মাদরাসা শিক্ষার সংস্কার প্রসঙ্গে // ১৪২

যে সংঘাতের সীমান্ত নেই // ১৪৬

শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতির অগ্রগতি // ১৫০

সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও ধর্ম // ১৫৪

শিক্ষা, সভ্যতা, ধর্ম ও সেকুলারিজম // ১৫৯

শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ঃ সব ধর্মীয় শিক্ষার
অবমূল্যায়ন প্রধান বৈশিষ্ট্য // ১৬৬

সাংবাদিকদের পাঠাভ্যাস জরুরি // ১৬৯

সংবাদপত্রের সততা ও নিরপেক্ষতা // ১৭৫

নারী ঃ ইসলাম ও বাস্তবতা

ইসলামে নারীর মর্যাদা, অধিকার ও ক্ষমতায়ন // ১৮১

ইসলামে আর্থিক সুবিধা পুত্রের চেয়ে কন্যার বেশি // ১৮৭

তালাকপ্রাপ্তা নারীর খোরপোষ // ১৮৯

ইসলামে শালীনতা, পোশাকের দর্শন ও বিধানাবলী // ১৯২

পতিতাবৃত্তি ঃ কারণ ও প্রতিকার // ১৯৬

শহরাঞ্চলের ছিন্নমূল দুঃস্থ মহিলাদের পুনর্বাসন // ১৯৯

www.pathagar.com

একজন শ্রেষ্ঠ নারী বেগম রোকেয়া // ২০২
পতিতাবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রতীক শবমেহের // ২০৫
গৃহকর্মীর মূল্যায়ন ও মর্যাদা // ২০৭
শিশু গ্রহণ আইন // ২০৮
শিশু গ্রহণ ও পালন আইন প্রণয়ন // ২১০
বাংলাদেশে যৌতুক ঃ প্রয়োজন একটি সামাজিক আন্দোলন // ২১৩
সিভিল কোড প্রসঙ্গে // ২১৬
নাতির সম্পত্তির অধিকার // ২১৯
তালাক পরবর্তীতে নারীর নিরাপত্তা ঃ একটি সামাজিক সমস্যা // ২২২
পতিতাবৃত্তি নিষিদ্ধ করে তাদের পুনর্বাসন করতে হবে // ২২৪

অষ্টম কলাম

রাষ্ট্রধর্মের ইতিহাস ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ // ২২৯
নারীনীতি নিয়ে বিভ্রান্তি ঃ কিছু সংশোধন জরুরি // ২৩১
পথশিশুদের রক্ষা করা এবং
দারিদ্র্য দূরীকরণের সামগ্রিক পদক্ষেপ // ২৩৩
বিভিন্ন ফসলের বাম্পার ফলনের ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় // ২৩৫
নয়া দিগন্তের একটি কলাম ও বাউল প্রসঙ্গ // ২৩৭
বিচার বিভাগের জবাবদিহিতা ও মাতৃত্ব ছুটি বাড়ানো // ২৩৯
শেয়ার বাজার ও আইনের শাসন // ২৪১
শেয়ারবাজার সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা // ২৪৩
একটি সামাজিক ও একটি আইনি সমস্যা // ২৪৫
'জিহাদি' শব্দের অপব্যবহার // ২৪৮
ইসলামী ব্যাংকিংয়ে মৌলিক কোনো ত্রুটি নেই // ২৫১
কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা // ২৫৪
বিচার পদ্ধতির সংস্কার প্রয়োজন // ২৫৬
নজরুল জন্মবার্ষিকী ও সাহিত্যিকদের মূল্যায়ন // ২৫৮
অল্প বয়সে প্রেমে জড়িয়ে পড়া // ২৬০
সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ কাদের বিরুদ্ধে? // ২৬৩

www.pathagar.com

আজকের প্রজন্ম নতুন ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন // ২৬৫
ধর্মীয় দল নিষিদ্ধ করার অসঙ্গত চিন্তা // ২৬৮

## বিশ্বপরিস্থিতি, অর্থনীতি ও ইসলাম বিষয়ক বিশ্লেষণ

ইসলাম বহুদলীয় গণতন্ত্রের বিরোধী নয় // ২৭৩
তৌহিদই আমাদের সংস্কৃতির মূল ভিত্তি // ২৮৮
কবি গোলাম মোস্তফা প্রকৃতপক্ষেই বাংলাদেশের
গুটিকয়েক শ্রেষ্ঠ সন্তানদের একজন ছিলেন // ২৯৬
পুলিশ প্রশাসনকে ইউরোপ-আমেরিকার পুলিশ প্রশাসনের
আদলে সম্পূর্ণ ঢেলে সাজানো ও পুনর্গঠন প্রয়োজন // ২৯৯
এ দেশে ইসলাম কায়েম না হওয়ার পেছনে মূল সমস্যা হচ্ছে
সকল পর্যায়ে লিডারশিপ তৈরি না হওয়া // ৩০১
ক্ষুদ্রঋণ দ্বারা দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব নয় // ৩১৮
জিহাদ ও সন্ত্রাস এক নয় গণতন্ত্রই সঠিক পথ // ৩৩৩
দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সুপারভাইজড যাকাত ব্যবস্থা
প্রবর্তন করা উচিত // ৩৩৬
দারিদ্র্য দূর করার প্রধান উপায় হলো উন্নয়ন // ৩৪১
ভারতের সাথে অমীমাংসিত ইস্যুর ব্যাপারে
আলোচনার মাধ্যমে প্যাকেজ ডিল করা উচিত // ৩৪৪
জনগণকে মহাজনদের হাত থেকে রক্ষা করতে
ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি অব্যাহত রাখতে হবে // ৩৫১

## দেশ সমাজ রাজনীতি

শুক্রবারের পরিবর্তে রবিবার ছুটি অসঙ্গত // ৩৫৭
ইসলামী দাওয়াতের কর্মপদ্ধতি // ৩৬১
শক্তিশালী মুসলিম উম্মাহ গঠন // ৩৬৫
দি মেসেজ অব দি কুরআন এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাফসির // ৩৬৯
হাদিসের পরস্পর বিরোধিতা দূর করার উপায় // ৩৭৫
যাকাত আদায়ের বিধান // ৩৭৮
উসুলে ফিকাহয় কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যার মূলনীতি // ৩৮১
ফতোয়া ঃ ঐতিহাসিক ও আইনগত প্রেক্ষাপট // ৩৮৯

www.pathagar.com

ইসলাম ও জননিরাপত্তা // ৩৯৪
বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে নবী জীবনের শিক্ষা // ৩৯৭
হজ, ঈদুল আজহা ও কুরবানি // ৪০১
জুমার খুতবার মান উন্নয়ন // ৪০৬
আমাদের রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষার পাঠক্রমে সংশোধন দরকার // ৪০৭
সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শালীনতার সমস্যা // ৪১১
কওমি মাদরাসা শিক্ষার অগ্রগতির জন্য কিছু প্রস্তাব // ৪১৪

## ইসলামী অর্থনীতি ঃ দর্শন ও কর্মকৌশল

ইসলামী অর্থনীতি ঃ দর্শন ও কর্মকৌশল // ৪১৯
ইসলামী অর্থনীতি ঃ প্রয়োগ ও বাস্তবতা // ৪২৭
ইসলামী অর্থনীতি ও তার বাস্তবায়ন // ৪৩৬
ইসলামী অর্থনীতি ঃ কিছু দিক // ৪৩৮
বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং ঃ ঐতিহাসিক ভূমিকা // ৪৫১
ইসলামী ব্যাংকিং ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা // ৪৫৫
বিশ্ব আর্থিক সঙ্কট ঃ অংশীদারিত্ব ব্যাংকিংই একমাত্র সমাধান // ৪৬৪
দারিদ্র্য বিমোচন ঃ ইসলামের কৌশল // ৪৬৯
ওয়াকফ ঃ প্রয়োজন নতুন আন্দোলন // ৪৭৬

## ইসলামী অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকা

ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য // ৪৮৩
ইসলামী অর্থনীতির প্রথম মডেল // ৪৮৭
ইসলামী অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকা // ৪৯৪
ওশরের বিধান // ৫১০
ইসলামের দৃষ্টিতে জাতীয়করণ ঃ তত্ত্ব ও প্রয়োগ // ৫১৭

## পরিশিষ্ট

বিষয়ভিত্তিক সূচি // ৫২৪

www.pathagar.com

## শাহ্‌ আবদুল হান্নান-এর প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ

সোভিয়েত ইউনিয়নে ইসলাম
ইসলামী অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকা
নারীর সমস্যা ও ইসলাম
Social Laws of Islam
Usul-al-Fiqh
ইসলামী অর্থনীতি : দর্শন ও কর্মকৌশল
নারী ও বাস্তবতা
দেশ সমাজ রাজনীতি
Law Economics and History
বিশ্ব পরিস্থিতি, অর্থনীতি ও ইসলাম বিষয়ক বিশ্লেষণ
আমার কাল আমার চিন্তা
উসূলুল ফিকহ্‌
অষ্টম কলাম
নারী : ইসলাম ও বাস্তবতা
সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি ভাবনা
বিষয়চিন্তা
নির্বাচিত সংকলন

www.pathagar.com

www.pathagar.com

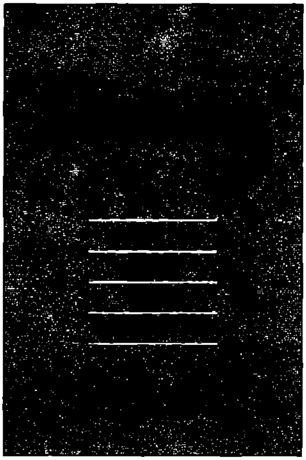

বিষয়চিন্তা

প্রকাশকাল : প্রথম প্রকাশ - ডিসেম্বর ২০০৪, বুকমাস্টার
দ্বিতীয় সংস্করণ - জুলাই ২০১৩, দি পাইওনিয়ার

www.pathagar.com

www.pathagar.com

# মুসলিম বিশ্বের বর্তমান সময়ের প্রধান ইস্যুসমূহ

বিগত দিনগুলোতে আমার কাছে মুসলিম উম্মাহর জন্য কতগুলো বিষয়কে প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। এর মধ্যে একটি ইস্যুতে আমার মনকে কিছুটা পরিবর্তন করেছি যা আমি আগে এতো বড় ইস্যু হিসেবে দেখিনি। সেটি হলো নব্য সাম্রাজ্যবাদ (New Imperialism)। এ সাম্রাজ্যবাদীরা কারা তা আমরা সবাই জানি। আজ তারা চাচ্ছে রাজনীতি সহ সকল ক্ষেত্রে বিশ্বকে শাসন করতে। তারা চায় তাদের আদেশ নিষেধকেই (dictation) মেনে চলতে হবে, তাদের মতো চলতে হবে। আইএমএফ (IMF), বিশ্বব্যাংক (World Bank) কিংবা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (World Trade Organisation) মাধ্যমেও এ রকম ডিকটেশন আসতে পারে।

পাশ্চাত্য শাসনের অধীন থেকে মুক্ত হওয়ার অনেক উপায়ের মধ্যে একটি হলো অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন হওয়া। বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভরশীল না হওয়া। আজকের দিনে আমেরিকান এ শাসন থেকে বাঁচার একটি উপায় হলো কোনো দেশকে বিদেশী সাহায্য থেকে মুক্ত হওয়া। যারা অর্থনীতি সম্পর্কে কমবেশি ধারণা রাখে তারাও জানে আমাদের মতো দেশগুলোতে অর্থনীতির জন্য সবচেয়ে বড় নিশ্চয়তার দিক হলো বিদেশী সাহায্য (Foreign Aid)। যদি কোনো দেশ বিদেশী সাহায্য থেকে মুক্ত হতে পারে তাহলে তারা পাশ্চাত্যের প্রভাব থেকেও মুক্তি পেতে পারে।

নয়া সাম্রাজ্যবাদের প্রসঙ্গে আফগানিস্তানের পরিস্থিতিতে বলা যায় আন্তর্জাতিক আইনে আমেরিকার কোনো অধিকার ছিল না আফগানিস্তান আক্রমণ করার। আন্তর্জাতিক আইনে একটি রাষ্ট্রের আরেকটি রাষ্ট্র আক্রমণ করার কোনো অধিকার নেই। আমেরিকা একটি আক্রমণাত্মক শক্তি। তারা এমন একটি দেশ যারা কোনো প্রকার আন্তর্জাতিক আইন মানে না। বর্তমান আন্তর্জাতিক আইন বলে, যদি কারো কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে তা জাতিসংঘে তোলা উচিত। আর জাতিসংঘ কোনোভাবেই একটি দেশের উপর আক্রমণ করার কথা বলতে পারে না। খুব বেশি হলে জাতিসংঘ অবরোধ কায়েম করার কথা বলতে পারে, এর বেশি কিছু নয়। নিরাপত্তা পরিষদের দায়িত্ব নিরাপত্তা রক্ষা করা, নিরাপত্তা বিঘ্ন করা কিংবা আক্রমণ করা নয়।



www.pathagar.com

এদিকে আমেরিকা শুধু আক্রমণ করছে তা-ই নয়; তারা বলছে বিন লাদেনকে তাদের কাছে হস্তান্তর করতে হবে। কিন্তু তারা তা বলতে পারে না। আমি কে যে আমার হাতে কোনো এক ব্যক্তিকে হস্তান্তর করতে হবে? তার বিরুদ্ধে আমি তো দেশীয় কিংবা আন্তর্জাতিক কোনো কোর্টে মামলা দায়ের করিনি। আর সেখানে কোনো রায়ও হয়নি যে রায়ের ভিত্তিতে হস্তান্তর করা হবে। কিন্তু আমেরিকা আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করে তা করেছে। শুধু তাই নয়, তারা বন্দীদেরকে হত্যা করে। তারা মাজারি শরিফে বোমাবর্ষণ করে বন্দীদেরকে হত্যা করেছে। প্রিজন রায়ট হয়েছে কিনা তার কোনো প্রমাণ নেই। আর যদি হয়েও থাকে তাহলেও বোমাবর্ষণ করে কোনো প্রিজন রিভল্ট দমন করা হয় না। সাধারণত কয়েকদিন খাবার, পানি দেয়া হয় না। তারপর এর সমাপ্তি হয়। মি. রামসফিল্ড বলেছেন:

Capture or killed and we have done the second thing.

এ হত্যাকাণ্ডের দায়িত্ব আমেরিকান বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জনাব বুশ থেকে আরম্ভ করে রামসফিল্ড এবং এর সাথে জড়িত সকল কমান্ডারদের উপর পড়বে। এ হত্যাকাণ্ডের জন্য প্রেসিডেন্ট বুশ, ব্লেয়ার সহ তাদের যেসব কমান্ডার, সৈন্য বাহিনী নর্দান এলায়েন্সে যারা জড়িত – এদের সবার বিচার হওয়া উচিত, দণ্ড হওয়া উচিত।

তালেবানের নানারকম সমস্যা আছে। আফগান ও মুসলিম এলিটরা তাদের থেকে দূরে সরে গেছে। তারা টেলিভিশন ধ্বংস করে দিয়েছে, মেয়েদেরকে পড়তে দেয়নি, বুদ্ধমূর্তি মুসলিমদের প্রতিবাদের মধ্যে ধ্বংস করে দিয়েছে। পাঁচ বছরেও তারা কোনো ইলেকশন করতে পারেনি। এমনকি কান্দাহারেও কোনো ইলেকশন করতে পারেনি। তারা তাদের কোনো বৈধতা (Legitimacy) সৃষ্টি করতে পারেনি। এসব সমস্যা সেখানে ছিল। কিন্তু এর মানে এ নয় যে বাইরের কোনো একটি শক্তি জোর করে আফগানিস্তানের সরকার পরিবর্তন করে দেবে।

নব্য সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে কোনো দেশের সরকারগুলো কিছু করবে না। তাদের অনেকেই বড় বড় শক্তিগুলোর পক্ষে এজেন্টের মতো কাজ করছে। এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে একমাত্র জনগণ এবং এজন্য জনগণের নেতাদেরকে সংগঠিত করতে হবে। এ কথা সত্য যে, নব্য সাম্রাজ্যবাদী সব জালেমদের সব সময় পতন হয়। নৈতিক মানবিকতা তা-ই বলে।

নব্য সাম্রাজ্যবাদের পর মুসলিম বিশ্বের জন্য অন্যতম প্রধান ইস্যু হলো শিক্ষা। এ বিষয়টিকে আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। Islamization of Knowledge-এর লেখক ড. ইসমাইল রাজি আল ফারুকির দৃষ্টিতে শিক্ষা উম্মাহর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। আমি একটু আগে



www.pathagar.com

যে চ্যালেঞ্জের (আমেরিকান ডিক্টেটরশিপ, আমেরিকান চ্যালেঞ্জ, পশ্চিমা চ্যালেঞ্জ) কথা বললাম তা মোকাবিলা করার জন্য আমাদেরকে একটি ভালো শিক্ষাব্যবস্থা দাঁড় করাতে হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। আমেরিকা ও পশ্চিমাদের চ্যালেঞ্জ, সেটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কিংবা সাংস্কৃতিক যেটিই হোক – এর বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য আমাদের একটি ভালো শিক্ষাব্যবস্থা দরকার। সভ্যতার দ্বন্দ্বে ইসলাম জয়ী হবে – নামে হোক বা বেনামে হোক, যদি আমাদের একটি ভালো শিক্ষাব্যবস্থা এবং ভালো শিক্ষিত জনশক্তি (পুরুষ ও নারী) থাকে। কিংবা যদি আমরা তা গড়তে পারি, তবেই তা সম্ভবপর হবে বলে আমি মনে করি।

এখানে আমি শিক্ষার কয়েকটি জটিল বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই। একটি হলো এর সংজ্ঞাগত বিষয়। ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্রে কতগুলো সংজ্ঞাগত বিষয় রয়েছে। ইসলামি শিক্ষা কি? এটি কি শুধুই কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকাহর জ্ঞান? নাকি এটি সকল প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিজ্ঞানের ইসলামি মূল্যবোধ, জ্ঞানের ইসলামিকরণ আন্দোলনের সমন্বয়? মালয়েশিয়া, পাকিস্তানে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি বিষয় বেরিয়ে এসেছে – সেটি হলো, সকল শিক্ষাই ইসলামি মূল্যবোধকে ধারণ করবে, ইসলামি শিক্ষার আওতার মধ্যে হবে, মূল্যবোধভিত্তিক হবে অথবা এর আওতা বহির্ভূত হবে না। তারা এটি মেনে নিয়েছে যে শুধু কুরআন পড়া, হাদিস পড়া, শুধু ফিকাহ পড়া, আরবি পড়া ইসলামিক শিক্ষা নয়। যদি আমাদের ছেলেরা কম্পিউটার সায়েন্স, ফিজিক্স এবং অন্যান্য সায়েন্স পড়ে এবং তাতে যদি গ্রহণীয় ইসলামি বিষয়ও শিক্ষায় সংযোজিত করা হয় অথবা অন্য কোনোভাবে রাখা হয় তা-ও ইসলামি শিক্ষার আওতার মধ্যে হবে। কাজেই বলা যায়, যে কোনো ভাবেই হোক বর্তমানে সংজজ্ঞাগত সমস্যাটি নেই। কিন্তু হতে পারে যারা দুনিয়া সম্পর্কে জানে না – তারা হয়তো বিতর্ক করতে পারে। কিন্তু আমি মনে করি এলিটদের মধ্যে এ সমস্যাটি নেই এবং আল্লাহতায়ালা চাইলে সেভাবেই বিষয় এগিয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ।

এখন আমি আমাদের স্কুল সিস্টেম সম্পর্কে বলতে চাই। বর্তমানে স্কুলের উপর অনেক কাজ হয়েছে – বিশেষভাবে পাকিস্তান, ইরান, সুদানে। সৌদি আরবে স্কুল সিস্টেমে ইসলাম ও আধুনিক শিক্ষার দারুণ সমন্বয় ঘটেছে। সুতরাং বলা যায় আজ আমাদের যথেষ্ট স্কুল শিক্ষার কারিকুলাম আছে যা আমরা বাংলাদেশে নিয়ে আসতে পারি। এরপর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষায় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আজ আমরা যেখানে এসেছি তার ফলে এখানে ইসলামি শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় গড়ে ওঠা সম্ভব। বাংলাদেশ সহ মুসলিম বিশ্বকে মালয়েশিয়া বা ইসলামাবাদ ইসলামিক ইউনিভার্সিটির ভিত্তিতে শিক্ষা প্রোগ্রাম সাজাতে হবে। এ মডেলকে প্রয়োজন মনে করলে একটু রিফাইন্ড করে, প্লাস-



www.pathagar.com

মাইনাস করে আমরা সেটি নিতে পারি। এটি মুসলিম বিশ্বে উচ্চ শিক্ষার ইসলামিকরণে মডেল হতে পারে। এখানে একটি কথা বলতে হবে, অমুসলিমদের জন্য পর্যাপ্ত বিকল্প খোলা রাখতে হবে। এটি আমাদের মনে রাখতে হবে এবং যদি কেউ না-ও করে থাকে তবে আমাদের তা করতে হবে। ইসলামের 'লা ইকরাহা ফিদদিন' এবং 'জাস্টিস'-এর যে স্পিরিট তা সামনে রাখতে হবে। 'লা ইকরাহা ফিদদিন' ও 'জাস্টিস'-এর মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। একে সামনে রেখে অমুসলিমদের জন্য প্রচুর অপশন (যেখানে যেরকম প্রয়োজন) দেয়া উচিত। এখানে কোনো আন্দোলন সৃষ্টি করা, কারো দাবির সুযোগ সৃষ্টি করা, অথবা পত্রিকায় উঠার পর ব্যবস্থা নেয়া যেন না হয়। এটি ইসলামের জাস্টিসের দাবি এবং এটিই আমাদের জন্য ভালো।

এখানে মাদরাসা স্ট্রিম সম্পর্কে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। মাদরাসা স্ট্রিম সম্পর্কে আমি খুব ব্যাপকভাবে চিন্তা করেছি। প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কি মাদরাসাকে শুধু আলেম তৈরি করার জন্যই চাচ্ছি? তার উদ্দেশ্য কি? নাকি শিক্ষার একটি মূলধারা করতে চাচ্ছি? প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি শুধু আলেম তৈরি করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে তো এতো মাদরাসার দরকারই নেই। এতো কওমি কিংবা এতো আলিয়া মাদরাসার তাহলে প্রয়োজন কি? যদি আমরা চাই মাদরাসা ধারা অন্যতম একটি মূলধারা হবে তাহলে রেডিক্যাল পরিবর্তন করতে হবে। এই পরিবর্তনটি কি? আমাদের দেশে কামেল মাদরাসায় চারটি কোর্স আছে- আদব, তাফসির, ফিকাহ ও হাদিস। আমি সংক্ষেপে বলবো আরো কয়েকটি কামেল কোর্স তাতে যোগ করতে হবে। কামেল ইকোনোমিকস, কামেল পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং অন্যান্য কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয়ে কামেল খুলতে হবে। চারটির জায়গায় ছয়টি, আটটি বা দশটি করতে হবে। তাতে বর্তমান কোর্সটি আলেম, ফাজেল পর্যন্ত মোটামুটি এক থাকতে পারে। তারা বর্তমানে কি করে? এক পর্যায় পর্যন্ত এ রকম পড়ে তারপর আলাদা হয়ে যায়।

তেমনিভাবে ফাজেল পর্যন্ত ঠিক রেখে আমাদেরকেও আরো চারটি, ছয়টি কোর্স যোগ করতে হবে। সে সাথে প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে হবে। কওমি মাদরাসার ক্ষেত্রেও একই কথা। যদি মসজিদ আর মাদরাসার জন্যই শুধু আলেম তৈরি করা মাদরাসার উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তো এতো হাজার হাজার কওমি মাদরাসার দরকার নেই। কিন্তু তাদের যদি উদ্দেশ্য থাকে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি তৈরি করা তাহলে তাদেরকেও নতুন নতুন বিভাগ খুলতে হবে। এখন কেবল দাওরায়ে হাদিস আছে। তাদের শেষের চার বছর পরিবর্তন করতে হবে। এখানে দাওরায়ে একতেমাদের (অর্থনীতি) মতো আরো তিন-চারটি দাওরা বাড়াতে হবে যাতে তারা জাতি, সমাজ, অর্থনীতি ও প্রশাসনের জন্য আরো বেশি উপযোগী হতে পারে। তাহলেই তারা সমাজ,



www.pathagar.com

অর্থনীতি, প্রশাসনের জন্য যোগ্য লোক তৈরি করতে পারবে। এ ধরনের সংস্কার করলেই কওমি মাদরাসা এবং আলিয়া মাদরাসা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার দু'টি মূল শাখা হিসেবে টিকে থাকবে এবং অবদান রাখতে পারবে।

এরপর আমি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সহশিক্ষা নিয়ে আলোচনা করবো। সহশিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমানে দু'টি পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে। মালয়েশিয়ায় ড্রেসকোড সহ (হিজাব সহ) একত্রে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে এবং ইসলামাবাদে ক্যাম্পাস আলাদা করে দেয়া হয়েছে। ইসলামি শিক্ষাবিদগণ দু'টিকেই বৈধ গণ্য করেছেন। আমি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সহশিক্ষা খুব সুবিধাজনক মনে করি না। আমাদের বর্তমান সমাজ পাকিস্তান ও মালয়েশিয়ার তুলনায় অধিক সেকুলার। এখানে আলাদা ক্যাম্পাস করা ভালো ও সঙ্গত। তবে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ইসলামি শিক্ষাবিদগণ যথাযথ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন সে কথা আলাদা। কিন্তু অবশ্যই ছেলেমেয়েদের জন্য আলাদা আলাদা ক্যাম্পাসই লক্ষ্য হওয়া উচিত। হাই স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে সহশিক্ষা একেবারেই থাকা উচিত নয়। এর ফলাফল খুব খারাপ হয়।

এখন অন্য ইস্যু যেমন আধুনিকীকরণের দিকে নজর দিই। Islamic Awakening Between Rejection and Extremism নামে ড. কারযাভীর একটি বই আছে। এতে তিনি চরমপন্থার (extremism) কুফল, বিপদের সম্ভাবনা এবং এর কারণসমূহ তুলে ধরেছেন। এ বইয়ের বাংলা অনুবাদ বেরিয়েছে 'ইসলামী পুনর্জাগরণ সমস্যা ও সম্ভাবনা' নামে। কারযাভীর মতো মুসলিম বিশ্বের প্রধান চিন্তাবিদরা মনে করেন মুসলিম বিশ্বে বিভিন্ন রকম চরমপন্থা বা উগ্রতা রয়েছে। এদের স্বভাব সম্পর্কে তিনি বলেছেন, এরা একে অন্যকে সব সময় অভিযুক্ত (accuse) করে। নিজের মতের বাইরে শুনতে চায় না। ইসলামের স্বভাব মধ্যপন্থা, চরমপন্থা নয়। চরমপন্থার ক্ষতি আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি। এটি দূর করা খুবই প্রয়োজন।

যেখানে আমাদের ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করা জরুরি সেখানে সময় কোথায় যে আমরা গুরুত্বহীন (marginal) বিষয় নিয়ে সময় নষ্ট করবো। যেখানে মুসলিম বিশ্বে দারিদ্র্যতার সমস্যা, শিক্ষার সমস্যা সেখানে আমাদের কার দাড়ি কতো বড় সেটি কোনো বিষয় হতে পারে না। কিছু লোক আমাদের প্রধান বিষয়সমূহের পরিবর্তে মাইনর বিষয়গুলোকেই বেশি করে তুলে ধরতে থাকে। কিন্তু এটি আমাদের বুঝতে হবে যে একটি বিল্ডিংয়ের কাঠামো দাঁড় করাবার পর সেটির বিন্যাস বিভিন্ন রকম হতে পারে। তবে আগে বিল্ডিংয়ের কাঠামো দাঁড় করাতে হবে। তেমনিভাবে যেখানে ইসলাম এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি সেখানে ইসলামের মূল কাজ করার পরই অন্য বিষয়ে মনোযোগ দিতে হবে, যদি তা জরুরি মনে করা হয়। আর ততটুকু করা যেতে পারে যতটুকু ইসলাম জরুরি মনে করেছে। কিন্তু এখানে বাস্তবে ইসলামের মূল স্পিরিটটিই নেই।



www.pathagar.com

সেটি উপড়ে ফেলা হয়েছে। তাহলে এ অবস্থায় কি সেসব মার্জিনাল বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকার সময়? এ প্রসঙ্গে অন্য কিছু বলার চেয়ে বিষয়টি উপলব্ধির জন্য আমাদের ড. কারযাভীর সেই Islamic Awakening Between Rejection and Extremism বইটি পড়া উচিত।

ইসলামের একটি অন্যতম প্রধান বিষয় হলো বিভিন্ন রকম চরমপন্থি (various type of extremism) যা ইসলামকে বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করছে। যারা চরমপন্থি তাদের অবস্থান কারোর হয় এ পাশে নয় ঐ পাশে, যে কোনো এক প্রান্তে। ফলে তারা কখনো সমন্বয় করতে জানে না। সমন্বয় করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু সমন্বয় করা তখনই সম্ভব যখন মানুষ মডারেট হয়, মধ্যপন্থা অবলম্বন করে। যখন তারা একে অন্যের সাথে কথা বলে, আলাপ করে, একজন আরেকজনের কথা শোনে – তারা ঐক্যবদ্ধ হয়েই কাজ করে। কিন্তু কট্টরপন্থা হলো উম্মতের মধ্যে এমন অবস্থান সৃষ্টি করা যাতে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে না পারে।

এরপর ইসলামের যে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি তা হলো জেন্ডার ইস্যু। এটি ইসলামে নারী-পুরুষের স্থান এবং পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়। মেয়েদেরকে পিছনে রেখে ইসলাম কিংবা উম্মত অগ্রসর হবে, তা দিবাস্বপ্ন দেখা। ড. সাঈদ রামাদান, যাকে লিটল হাসান আল বান্না বলা হতো – তিনি উম্মতের তিনটি সমস্যার কথা বলেছিলেন। একটি হলো শরিয়াহ এবং ফিকাহর মধ্যে পার্থক্য করতে না পারা। কুরআন-সুন্নাহর বাধ্যতামূলক প্রকৃতির (binding nature) সাথে ফিকাহর বাধ্যতামূলক নয় এমন প্রকৃতির পার্থক্য করতে না পারা এবং দু'টিকে এক করে ফেলা। দ্বিতীয় সমস্যা হলো মুসলিম নারীর দুর্দশা। এ কথাগুলো তিনি বলেছিলেন ১৯৬৫ সালের দিকে। আজ থেকে অনেক আগেই তিনি এটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এটি বর্তমানে যেমন ড. ইউসুফ আল কারযাভীর উপলব্ধি, তেমনি মুহাম্মদ আল গাজ্জালির মতো গ্রেট আলেমরাও একই কথা বলে গেছেন। আল গাজ্জালি মিসরের লোক, যিনি দুই বছর আগে মারা গেছেন। তৃতীয় সমস্যা হলো শাসকদের আনুগত্য সম্পর্কে ভুল ধারণা (wrong motions of obedience to rulers)। নারীদেরকে তার যথাযোগ্য স্থান দিতে হবে। তাদেরকে সমাজ এবং ইসলামের কাজে পুরোপুরি সম্পৃক্ত করতে হবে। তাদেরকে মানবিক মর্যাদায় সমান মানুষ মনে করতে হবে। তাদের সকল অধিকার দিতে হবে। (দ্রষ্টব্য: ১. ইসলামের সামাজিক বিধান, ড. জামাল আল বাদাবী, ২. রাসুলের যুগে নারী স্বাধীনতা, আল্লামা আবদুল হালিম আবু শুক্কাহ এবং ৩. দি স্ট্যাটাস অব মুসলিম উইমেন, ড. ইউসুফ আল কারযাভী।)

এরপর যে সমস্যা আমি মনে করি তা হলো গণতন্ত্রের অভাব। স্বৈরতন্ত্র, রাজতন্ত্র মুসলিম বিশ্বে আছে। এটি পাশ্চাত্যের কাছে মুসলমানদের খারাপ ইমেজই তুলে ধরে। তাদের কাছে মনে হয় মুসলমানদের স্বভাবই হলো এমন।



www.pathagar.com

দোষ হলো আমাদের আর তারা দেখছে ইসলামই এমন। এর খারাপ প্রভাবটাই মুসলমানদের উপর পড়ে। কিন্তু এর সমাধান কি? এ সম্পর্কে আমি এক লেখায় লিখেছিলাম, ইসলামি আইনের আওতায় গণতন্ত্র শব্দটি বহু পূর্বেই স্বীকৃত হয়ে গেছে। ১৯৪৮ সালে যখন পাকিস্তানের সংবিধান হয় সেখানে democracy, freedom, equality, social justice as enanciated by Islam shall fully observed বলে একটি ধারাই আলেমদের পরামর্শে যোগ করা হয়। আমি লক্ষ্য করেছি মাওলানা মওদূদী ডেমোক্রেসি শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। সেখানে তিনি Theo-Democracy শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। তিনি ডেমোক্রেসি শব্দটি পরিহার করেননি। আল্লামা ইকবালও গণতন্ত্রের চেয়ে ভালো বিকল্প নেই বলেছেন। ড. ইউসুফ আল কারযাভী Islamic Movement, Political Freedom and Democracy লেখায় বলেছেন যে এটিই ইসলামের নিকটতম পন্থা। যারা সন্দেহ করে জনগণের সার্বভৌমত্ব, জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস, এ ধারণার কি হবে? এ সন্দেহের উত্তরে তিনি বলেছেন –

> আপনারা যদি এতোই ভয় পান তাহলে সংবিধানের একটি ধারায় লিখে দিন, কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী কোনো আইন পাস করা যাবে না, তাহলেই সমস্যার সমাধান হবে।

কাজেই গণতন্ত্র সম্পর্কে যারা বেশি ভয় পান তারা যদি গণতন্ত্র না বলতে চান তাহলে 'ইসলামি গণতন্ত্র' শব্দ ব্যবহার করতে পারেন। অনেকে খেলাফত শব্দ ব্যবহার করতে চান। কিন্তু প্রত্যেকটি ইসলামি রাষ্ট্রকে আলাদা আলাদা খেলাফত বলবেন কি না? তারপর সুস্পষ্ট করতে হবে খেলাফতের বিস্তৃত রূপ কি? পার্লামেন্ট থাকবে কি না? নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন হবে কি না? মৌলিক অধিকার কি কি হবে? এসব ধারণা সুস্পষ্ট না করে খেলাফত কায়েমের দাবি করায় জটিলতা সৃষ্টি করবে। যতদিন তা না করা হবে ততদিন পর্যন্ত ইসলামি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞগণ ইসলামি রাষ্ট্র এবং গণতন্ত্র পরিভাষা ব্যবহারের পক্ষে।

আমাদের সমস্যার আরেকটি দিক হলো কুরআন এবং সুন্নাহর ভুল ব্যাখ্যা। এমন এক সময় ছিল যখন কুরআন এবং হাদিসের পর্যাপ্ত অনুবাদ ছিল না। এখন অনেক অনুবাদ হওয়ায় সমস্যা হয়েছে যে প্রত্যেকে হাদিস পড়ে তার একটি ব্যাখ্যা দেয়া শুরু করে, কিন্ত তারা জানে না হাদিস কতো ধরনের। তারা জানে না যে হাদিসের মধ্যে যদি সংঘাত দেখা দেয় তাহলে তা কীভাবে দূর করতে হবে। আবার কুরআনের সঙ্গে হাদিসের যদি বিরোধ দেখা দেয় তাহলে তা কীভাবে দূর করতে হবে? এর ব্যাখ্যা পদ্ধতি না জেনেই তা করতে থাকে। কীভাবে 'তারুদ' (বিরোধ) দূর করতে হবে? হুকুমের মূল্য কি? সব হুকুমই কি ফরজ না মুস্তাহাব মাত্র? আমল হলেই কি ফরজ হয়ে যায়? এখন যারা শব্দের বিভিন্ন শ্রেণি (যেমন আম, খাস, হাকিকি, মাজাফি ইত্যাদি) জানবে না, ব্যাখ্যা-


www.pathagar.com

বিশ্লেষণের পদ্ধতি জানবে না, উসুল আল ফিকাহ্ পড়বে না – তারা যদি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে তাহলে তা ভুল হবে। এজন্য উসুলের জ্ঞান খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

উম্মতের মধ্যে সমস্যা বেড়েছে। ধর্মীয় খুঁটিনাটি বিষয়ে মতবিরোধ বেড়েছে। এজন্য প্রয়োজন অনেক সংখ্যক বড় আলেমের। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, আমরা যারা ইসলামের মূল বিষয় জানি না তারা এক ধরনের মূর্খ। এ মূর্খতা থেকে যে ব্যাখ্যা দেয়া হয় সেটি ইসলামের জন্য বিপজ্জনক। এ অবস্থা থেকে বাঁচার উপায় হলো উসুল আল ফিকাহ্‌র জ্ঞান এবং নির্ভরযোগ্য ইসলামি সাহিত্য ছড়ানো। আর সাথে আধুনিক সমস্যা ও সভ্যতা জানে এমন গ্রেট আলেম তৈরি করা যারা লোকদের ঐক্যবদ্ধ রাখতে পারবে। উদাহরণ দিলে পরিষ্কার হবে যে, ড. কারযাভীর মতো কিছু গ্রেট আলেম থাকার কারণে মধ্যপ্রাচ্যের সকলে একটি মতে এসে পৌঁছেছে। বাংলাদেশ সহ অন্যান্য মুসলিম দেশে আধুনিক সমস্যা ও সভ্যতা সম্পর্কে অবহিত অত্যন্ত উচ্চমানের আলেমের উদ্ভব হতে হবে। সেটি মুসলিম বিশ্বের জন্য কল্যাণকর হবে।

আশা করি, মুসলিম বিশ্বের এসব প্রধান সমস্যা সমাধানে আমরা সবাই উদ্যোগী হবো।



www.pathagar.com

# গণতন্ত্র ঃ প্রেক্ষিত ইসলাম ও মুসলিম বিশ্ব

বর্তমান বিশ্বে গণতন্ত্র একটি পরিচিত শব্দ। বিশ্বের অধিকাংশ দেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের লক্ষ্য সংশ্লিষ্ট দেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। গণতন্ত্র আধুনিক বিশ্বে একটি স্বীকৃত ও সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা। অন্যদিকে দেখা যায় গণতন্ত্র সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিভিন্ন মতামত। বিভিন্ন ইসলামি দলের এজেন্ডায় রয়েছে গণতন্ত্রের কথা, অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা। আবার এমন সব দল বা ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা যায়, যারা গণতন্ত্রকে ইসলামসম্মত মনে করেন না, কেননা গণতন্ত্রে জনগণের সার্বভৌমত্বের কথা বলা হয়েছে।

এ বিষয়ে আমাদের সূক্ষ্ম ও গভীর বিশ্লেষণ প্রয়োজন। শব্দগত মারপ্যাচের উর্ধ্বে গিয়ে বিষয়টি ভালোভাবে বোঝা দরকার। আমরা দেখছি আধুনিক বিশ্বে ইসলামি দলসমূহ ও ব্যক্তিবর্গ, ইসলামি পণ্ডিতগণ এমন রাজনৈতিক ব্যবস্থার কথা চিন্তা করেন যেখানে সরকার পার্লামেন্টের মাধ্যমে দেশ পরিচালনা করবে। সকলের মত প্রকাশের অধিকার তথা ভোটাধিকার থাকবে, আইনের শাসন থাকবে, বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা থাকবে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থাকবে, মৌলিক মানবাধিকার রক্ষিত হবে ইত্যাদি। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, যখন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কথা বলা হয় তখন তার পূর্বশর্ত হিসেবে এসবের কথাই বলা হয়। অর্থাৎ গভীর বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ইসলামি দলগুলোর সরকার ও রাষ্ট্র সংক্রান্ত ধারণা এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার গঠন কাঠামো একই ধরনের।

তত্ত্বগতভাবে বলা যায় যে, কেবল সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে যখন ইসলামে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মুখ্য সেখানে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে জনগণের সার্বভৌমত্বের কথা বলা হয়েছে। যদিও এখানে উল্লেখ না করে পারা যায় না যে, সার্বভৌমত্বের ধারণা পাশ্চাত্যে এক রকম নয়। কোনো কোনো রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এ রকম কথা বলেছেন যে, সার্বভৌমত্বের ধারণার কোনো প্রয়োজন নেই। গণতন্ত্র সংক্রান্ত বিভিন্ন গ্রন্থে সার্বভৌমত্বের ধারণাকে তেমন গুরুত্বের সাথে আলোচনাও করা হয় না। তবে ইসলামি দলগুলোর মধ্যে সার্বভৌমত্ব শব্দটির আপত্তি সম্পর্কে এ সময়ের বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী প্রণীত ‘Priorities of the Islamic Movement in the Coming Phase’



www.pathagar.com

গ্রন্থের 'The Movement and Political Freedom and Democracy' শীর্ষক আলোচনার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা প্রয়োজন মনে করছি:

> The fear of some people here is that democracy makes the people a source of power and even legislation (although legislation is Allah's alone) should not be heeded here, because we are supposed to be speaking of a people that is Muslim in its majority and has accepted Allah as its Lord, Mohammad as its Prophet and Islam as its Religion. Such a people would not be expected to pass a legislation that is contestable in Islam and its incontestable principles and conclusive rules. Any way these fears can be overcome by one article (in the constitution) that any legislation contradicting the incontestable provisions of Islam be null and void.
>
> কিছু সংখ্যক মানুষের ভয় গণতন্ত্র মানুষকে ক্ষমতার উৎসে পরিণত করে এবং আইন প্রণয়ন করার অধিকার দেয় (যদিও আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর), তার প্রতি কর্ণপাত করা উচিত হবে না। কারণ আমরা এমন এক মানবগোষ্ঠী সম্পর্কে কথা বলছি যারা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং আল্লাহকে তাদের প্রভু হিসেবে, মুহাম্মদকে তাদের নবী এবং ইসলামকে তাদের ধর্ম হিসেবে মেনে নিয়েছে। আশা করা যায়, এ ধরনের মানুষ এমন আইন প্রণয়ন করবে না, যা ইসলামের অকাট্য নীতি ও সিদ্ধান্তমূলক আইনের পরিপন্থী হবে। যাহোক ইসলামের অলঙ্ঘনীয় বিধানের পরিপন্থি যে কোনো আইন বাতিল বলে গণ্য হবে এমন একটি অনুচ্ছেদ সংবিধানে সংযোজন করে এ আশংকা দূর করা যেতে পারে।

এছাড়া রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে মানুষ তথা উম্মতের দায়িত্ব সম্পর্কে মহাকবি ড. আল্লামা মুহাম্মাদ ইকবালের মতামত হচ্ছে এরকম:

> ইসলাম গোড়াতেই স্বীকার করে নিয়েছে যে, বাস্তবে রাজনৈতিক ক্ষমতার ধারক ও বাহক হল উম্মত এবং যেসব কার্যক্রম নির্বাচকমণ্ডলী তাদের নেতা নির্বাচনের নিমিত্ত গ্রহণ করে তার অর্থ শুধু এই যে, তারা তাদের সম্মিলিত ও স্বাধীন নির্বাচন পদ্ধতি দ্বারা উক্ত রাজনৈতিক ক্ষমতাকে এমন একজন নির্দিষ্ট ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের মাঝে ন্যস্ত করে দেয়, যারা তাকে উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্তির জন্য উপযুক্ত বিবেচনা করে। ইসলামি আইন প্রণয়নের ভিত্তি মিল্লাতের সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতি ও যৌথ মতের উপর প্রতিষ্ঠিত।[১]



www.pathagar.com

আমরা দেখছি যে, অনেক ইসলামি পণ্ডিত গণতন্ত্র শব্দকে শর্তসাপেক্ষে ইসলামের মধ্যে আত্মস্থ করে নিয়েছেন। ড. আবু সাঈদ নূরুদ্দীন-এর 'মহাকবি ইকবাল' গ্রন্থে আমরা দেখতে পাই যে আল্লামা ইকবাল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপর সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট ছিলেন না। কিন্তু তাঁর লেখায় উল্লেখ করেছেন যে গণতন্ত্রের কোনো বিকল্প নেই। তিনি তাঁর 'Reconstruction of Religious Thought in Islam'-এর ৬ষ্ঠ ভাষণে নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে আরও বলেন:

> ইসলামি রাষ্ট্র স্বাধীনতা, সাম্য এবং স্থিতিশীলতার চিরন্তন বিধানসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতির নীতিমালা শুধু ইসলামের মৌলিক ভাবধারার সাথেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, বরং যেসব শক্তি মুসলিম বিশ্বে কার্যরত রয়েছে তাকেও সুসংহত করা অপরিহার্য।[২]

ইকবালের মতে, গণতন্ত্রের ভিত্তি যদি রূহানী ও নৈতিক হয় তাহলেই তা হবে সর্বোৎকৃষ্ট রাজনৈতিক পদ্ধতি। ইসলামি রাষ্ট্রকে এ কারণেই তিনি 'রূহানী গণতন্ত্র' বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইংরেজি সাময়িকী 'The New Era'-এর ২৮ জুলাই ১৯১৭ সংখ্যায় তিনি বলেন:

> ইসলামে গণতন্ত্র অধিকাংশ ইউরোপীয় সমাজসমূহের মতো অর্থনৈতিক সুযোগের সম্প্রসারণ থেকে উৎপন্ন হয় না; বরং এটি একটি রূহানী নীতি, যা ঐ কথার ভিত্তিতে এসেছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই কতকগুলো সুপ্ত শক্তির এমন একটি আধার, যার সম্ভাবনাসমূহকে এক বিশেষ গুণ ও চরিত্রের দ্বারা উন্নত করা যেতে পারে।[৩]

অর্থাৎ ইসলাম এমন এক গণতন্ত্র দিয়েছে যা আল্লাহর আইনের অধীন। অন্যদিকে আমরা দেখি মাওলানা মওদূদী পঞ্চাশ বছর পূর্বে তাঁর 'ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ' গ্রন্থে ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্য 'Theo-democracy' শব্দ দু'টি ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ তিনি 'Democracy' বা গণতন্ত্র শব্দটি পরিত্যাগ করেননি বরং আল্লাহর সার্বভৌমত্বের অধীনে এটিকে গ্রহণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায়ে প্রদত্ত একটি বক্তব্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

করাচির 'আখবারে জাহান' পত্রিকায় ১৯৬৯ সালের ২ এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন:

> ইসলাম ও গণতন্ত্র পরস্পরের বিরোধী নয়। গণতন্ত্র সেই শাসন ব্যবস্থার নাম, যেখানে জনমতের ভিত্তিতে সরকার গঠিত, পরিচালিত ও পরিবর্তিত হয়। ইসলামি শাসনব্যবস্থাও তদ্রূপ। তবে পাশ্চাত্য গণতন্ত্র থেকে আমাদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ভিন্ন। কেননা পাশ্চাত্য গণতন্ত্র লাগামহীন হয়ে থাকে। জনগণের রায় হালালকে হারাম করে দিতে পারে, যেমন ব্রিটেনে হয়েছে এবং হচ্ছে। পক্ষান্তরে ইসলামি



www.pathagar.com

গণতন্ত্র কুরআন ও হাদিস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। গোটা জাতি চাইলেও ইসলামের সীমানার বাইরে গিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। সমাজতন্ত্র এর ঠিক বিপরীত। সমাজতন্ত্র একটি জীবনদর্শনের নাম। তার রয়েছে নিজস্ব আকিদা, বিশ্বাস, দর্শন ও নৈতিকতা। ইসলামের সাথে তার কোনোই মিল নেই।[৪]

লন্ডনের মাজাল্লাতুন গুরাবা পত্রিকার ২ এপ্রিল ১৯৬৯ সংখ্যায় প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন:

> যুগের মানুষদের কথা বুঝানোর জন্য আধুনিক পরিভাষা ব্যবহার করা অপরিহার্য। তবে এগুলো ব্যবহারে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। কোনো কোনো পরিভাষা বর্জন করা ভালো এবং ওয়াজিব, যেমন সমাজতন্ত্র। আর কোনো কোনোটার ব্যবহার এ শর্তে জায়েজ যে তার ইসলামি তাৎপর্য ও পাশ্চাত্য তাৎপর্যের পার্থক্য পুরোপুরি বুঝিয়ে দিতে হবে। যেমন গণতন্ত্র, সাংবিধানিক ব্যবস্থা ও সংসদীয় পদ্ধতি।[৫]

আমরা এটিও লক্ষ্য করেছি, পাকিস্তানে যখন বিশ্বের প্রথম ইসলামি সংবিধান রচিত হচ্ছিল তখন তার মধ্যে গণতন্ত্র শব্দটি নেওয়া হয়েছিল আলেমদের সমর্থনে। প্রকৃতপক্ষে একটি আদর্শ প্রস্তাবনা রূপে পাকিস্তানে শাসনতন্ত্রের ভূমিকা আলেমরাই প্রণয়ন করেছিলেন। এ ভূমিকায় গণতন্ত্রের বিষয়টি বলা হয়েছে এভাবে:

> Wherein the principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice as enunciated by Islam, shall be fully observed.[৬]
>
> গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সমতা, সহনশীলতা এবং সামাজিক ন্যায়পরায়ণতার নীতি ইসলামে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে পুরোপুরি সেভাবে মান্য করতে হবে।

অর্থাৎ ইসলাম গণতন্ত্রকে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে তা সেভাবে অনুসৃত হবে। এর অর্থ হচ্ছে আলেমগণ, ইসলামি রাজনীতিকগণ শর্তসাপেক্ষে গণতন্ত্র শব্দটি, গণতন্ত্র পরিভাষাটি এবং তা দ্বারা যা বোঝায় তা গ্রহণ করেছেন। আমরা আরো দেখতে পাই যে, আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী তাঁর 'Priorities of the Islamic Movement in the Coming Phase' গ্রন্থের একটি আলোচনার শিরোনাম করেছেন 'The Movement and Political Freedom and Democracy'. তিনি এতে দেখিয়েছেন যে ইসলাম কোনো স্বৈরাচার এবং রাজতন্ত্র সমর্থন করে না। তিনি আরও দেখিয়েছেন যে, Political Freedom-এর মধ্যেই ইসলাম বিকশিত হয়। তিনি দেখিয়েছেন যে, যদিও ইসলাম গণতন্ত্র থেকেও ব্যাপক একটি বিষয়, একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা, তথাপি তিনি



www.pathagar.com

গণতন্ত্রকে ইসলামের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে করেন এবং ইসলামে মানুষের জন্য যেসকল মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে তা গণতন্ত্রের মাধ্যমেই পূরণ করা সম্ভব। তিনি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার পক্ষে লিখেছেন। তবে যারা ভয় পান যে গণতন্ত্রের নামে ইসলামবিরোধী আইন প্রণীত হতে পারে, তাদেরকে আশ্বস্ত করার জন্য সংবিধানে 'কুরআন ও সুন্নাহবিরোধী কোনো আইন পাশ করা যাবে না' এমন একটি ধারা সংযোজনের তিনি পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন:

> However, the tools and guaranties created by democracy are as close as can ever be to the realization of the political principles brought to this earth by Islam to put a leash on the ambitions and whims of rulers. These principles are shura (consultation), good advice, enjoining what is proper and forbidding what is evil, disobeying illegal orders, ressisting unbelief and changing wrong by force whenever possible. It is only in democracy and political freedom that the power of Parliament is evident and that people's deputies can withdraw confidence from any govt. that breached the Constitution and it is only such an environment the strength of free press, free Parliament, Opposition and the masses is most felt.[৭]
>
> যাহোক, গণতন্ত্র যেসকল নীতি ও নিশ্চয়তা দান করেছে তা শাসকদের উচ্চাশা ও খেয়ালীপনার উপর একটি নিয়ন্ত্রণ আরোপের জন্য ইসলাম পৃথিবীতে যেসব রাজনৈতিক নীতির অবতারণা করেছে তার নিকটতম। এসকল নীতিসমূহ হচ্ছে, শূরা, নসিহত, যা সংগত তার আদেশ দেওয়া, যা খারাপ তা বর্জন করা, অবৈধ আদেশসমূহ অমান্য করা, অবিশ্বাস প্রতিরোধ করা এবং যখনই সম্ভব শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে অন্যায়ের প্রতিবিধান করা। স্বাধীন রাজনৈতিক পরিবেশ এবং গণতন্ত্রেই কেবল সংসদীয় পদ্ধতির বৈধতা ও ক্ষমতা স্বীকৃত এবং জনগণের প্রতিনিধিগণ যে কোনো সরকারের উপর সংবিধান লংঘনের অপরাধে অনাস্থা জ্ঞাপন করতে পারে এবং এটি (গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা) এমন একটি পরিবেশ যেখানে স্বাধীন সংবাদপত্র, নিরপেক্ষ সংসদ, বিরোধী দলের অবস্থান এবং জনসাধারণের মতামত সর্বাপেক্ষা অধিক প্রতিফলিত।

উপরের আলোচনা থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, ইসলামি চিন্তাবিদ ও মুসলিম জনগণ ভোটাধিকার, আইনের শাসন এবং জনগণের নির্বাচিত সরকারই চায়।



www.pathagar.com

এসব বোঝাবার জন্যই আজকাল 'গণতন্ত্র' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। সার্বিক প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে 'গণতন্ত্র' শব্দ গ্রহণ করার মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই। পাশ্চাত্যে ইসলাম সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি রয়েছে যে ইসলাম আগ্রাসী এবং একনায়কত্ববাদী (Violent, Authoritarian), এর ফলে এসব দূর হবে। মুসলিম বিশ্বেও এর ফলে রাজা-বাদশাহ ও স্বৈরশাসকগণ অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে না। আমরা দেখছি যে, বিভিন্ন শাসনতন্ত্রে ব্যবহার ছাড়াও ইসলামি চিন্তাবিদগণ ইতোমধ্যেই 'গণতন্ত্র' পরিভাষাটি গ্রহণ করেছেন। এটি সংগত। আমরা আশা করি এ আলোচনা 'গণতন্ত্র'-এর পরিভাষা সম্পর্কে বিতর্ক দূর করতে সহায়তা করবে।

### তথ্যসূত্র

১. ইসলামের রাজনৈতিক চিন্তাধারা, লাহোর ১৯১০-১৯১১, 'মহাকবি ইকবাল', ড. আবু সাঈদ নূরুদ্দীন, পৃষ্ঠা: ২৩৪।

২. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ২৩৫।

৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ২৩৯।

৪. মাওলানা মওদূদীর সাক্ষাৎকার, আধুনিক প্রকাশনী, ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা: ২৬৩।

৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ২৫৫।

৬. ১৯৫৬ সালের পাকিস্তান শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনা।

৭. ড. ইউসুফ আল কারযাভী প্রণীত 'Priorities of the Islamic Movement in the Coming Phase' গ্রন্থের 'The Movement and Political Freedom and Democracy' শীর্ষক আলোচনা।



www.pathagar.com

# মুসলিম উম্মাহর সমস্যা থেকে উত্তরণ ঃ কিছু ভাবনা

মুসলিম উম্মাহ বর্তমানে তার ইতিহাসের এক জটিলতম সময় অতিক্রম করছে। অতীতেও মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে অনেক জটিলতা এসেছে। ঐতিহাসিকভাবে দেখা যায়, ইসলামের শুরুতেই তা রোমান ও পারসিয়ান শাসকদের পক্ষ হতে চাপের মধ্যে ছিল। গ্রিক চিন্তার পেনিট্রেশনের কারণে আরেকটি সময় গেছে তখন মুসলিম বিশ্বাসের মারাত্মক ধরনের পরিবর্তন হতে পারতো। যাই হোক, তা থেকে আমরা উদ্ধার পেয়ে গেছি। পরবর্তীকালে আব্বাসীয় খিলাফতের শেষদিকের দুর্বলতা এবং মঙ্গল আক্রমণ – এসব মিলিয়ে একটি বিরাট সমস্যা মুসলিম বিশ্বে গেছে। ক্রুসেড হামলা যেটি হয়েছে, সেটিও একটি বিরাট অধ্যায়। সে সময় ইসলাম টিকে গেছে তা-ও একটি বিরাট বিষয়। ক্রুসেডে গোটা ইউরোপ একত্র হয়ে মুসলিম বিশ্বের উপর হামলা করে বসে। এরপর কলোনিয়ালিজমের মাধ্যমেও পাশ্চাত্য ইসলামকে শেষ করে দেবার চেষ্টা করেছিল। মুখে মুখে তারা উপনিবেশকে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বা অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ যা-ই বলুক না কেন, মূলকথা কিন্তু তাদের এটিই ছিল যে, সম্ভব হলে মুসলমানদের খ্রিস্টান করে ফেলা এবং সে চেষ্টা তারা কম করেনি। এজন্য তারা খ্রিস্টান স্কুল করেছে, মিশনারি কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। কোনো কোনো দেশে স্কুল ব্যবস্থা মিশনারিদের হাতে তুলে দিয়েছে এবং শিক্ষা গ্রহণের শর্ত হিসেবে খ্রিস্টান হওয়াকে বাধ্যতামূলক করেছে। যেমন নাইজেরিয়া, সিয়েরালিওন সহ পশ্চিম আফ্রিকার অনেক জায়গায় তারা এ কাণ্ড করেছে। এটি প্রকৃতপক্ষে ভয়াবহ ধরনের হস্তক্ষেপ, মানুষকে বাধ্য করা।

এসব কথা বলার উদ্দেশ্য এটিই যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হওয়া মুসলিম বিশ্বের জন্য নতুন কোনো বিষয় নয়। মুসলিম বিশ্বের ইতিহাস অনেক চ্যালেঞ্জের। আজকেও মুসলিম বিশ্ব অনেক বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। যেভাবেই হোক না কেন আজকে Clash of Civilization-এর কথা এসে গেছে। একথা বিগত ১০-১৫ বছর ধরে বলা হচ্ছে। এর উপর বই লেখা হচ্ছে। আবার শুধু বই লিখেও শেষ করা হয়নি, কীভাবে ইসলামের মোকাবিলা করা হবে তা-ও বলা হয়েছে। ইউরোপ, রাশিয়া, আমেরিকাকে একত্র হয়ে মুসলিম বিশ্বকে প্রতিহত করার কথা বলা হয়েছে এবং মুসলিম বিশ্বকে বিভক্ত করতে হবে, দুর্বল করতে হবে সে কথা বলা হয়েছে। হানটিংটন এ কথিত বিপদ থেকে



www.pathagar.com

বাঁচার জন্য কী করতে হবে তার একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ তার বইতে দিয়েছেন। এ পরিস্থিতিতে আমেরিকাতে আবার নতুন করে উদ্ভব হয়েছে বুশ সাহেবের, উদ্ভব হয়েছে খ্রিস্টান কোয়ালিশনের। আমি কোনো ধরনের ধর্মীয় কোয়ালিশনের বিরোধী নই, কিন্তু তার উদ্দেশ্য সৎ হতে হবে। অথচ এখানে উদ্দেশ্য দেখা যায় জোর করে বিশ্বকে ডমিনেট করা। টেররিজমের শ্লোগান দেয়া হচ্ছে। সত্যিই টেররিজম এবং সন্ত্রাস আছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে টেররিজম ইসলামকে আক্রমণ করার একটি আড়াল মাত্র। আজ টেররিজমের পোশাকে ইসলামের উপর আক্রমণ হচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে মুসলিম বিশ্ব বিরাট সংকটের মধ্যে আছে এবং এ সংকট খুব গভীর। তবে ভালোর দিক হচ্ছে আমেরিকা বা বুশের কিংবা পশ্চিমাদের যে ষড়যন্ত্রই বলি না কেন সে ষড়যন্ত্র মুসলিম বিশ্ব উপলব্ধি করতে পেরেছে। জনগণের লেভেলে উপলব্ধির কোনো অভাব নেই। সকল সরকারি পর্যায়েও মুখে যা-ই বলুক অন্তরে উপলব্ধি হয়ে গেছে। সকল সরকারই এটি হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছে। এটি একটি ভালো দিক এবং আমি বিশ্বাস করি এ ক্রাইসিস থেকে মুসলিম বিশ্ব শক্তিশালী হয়ে ভালোভাবে বেরিয়ে আসবে।

আমাদের সংকটে অনেক ডাইমেনশন আছে। সংকটের একটি ডাইমেনশন হচ্ছে কালচারাল। ওয়েস্ট চাচ্ছে আমাদের কালচারকে ইসলাম থেকে সরিয়ে নিতে। আর চাচ্ছে পাশ্চাত্যের কালচারকে ভিত্তি করতে। কিন্তু যৌনতার বাড়াবাড়ি এবং বিনোদনের নামে অন্ধ উত্তাল উল্লাস যার প্রধান দিক – সেগুলো ইসলাম পছন্দ করে না। এখানে ইসলাম চায় যা কিছু হবে সব ডিসেন্ট হতে হবে, অবৈধ অশ্লীল যৌনতা হবে না। এখানেই তাদের সাথে পার্থক্য। সুতরাং ওয়েস্ট ও ইসলামের কালচারের সীমা খুবই স্পষ্ট একটি সীমা।

তারা অর্থনীতিতে শাসন করতে চাচ্ছে। গ্লোবালাইজেশন শ্লোগান মাত্র। আসল কথা হচ্ছে শক্তিশালী পাশ্চাত্য দেশের পণ্য বিক্রি করা। ফ্রি ট্রেডের কথা বলে তারা এটি করছে। আইএমএফ, ওয়ার্ল্ডব্যাংকের গভীরে গেলে দেখা যাবে তারা পাশ্চাত্যের, বিশেষ করে আমেরিকার স্বার্থ রক্ষা করে কাজ করছে। আবার বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে ইসলামকে সন্ত্রাসী বলে গ্রাস করার চেষ্টা করছে। কিছুদিন আগে আমেরিকার একজন প্রফেসর ড. রিফাত হাসান বাংলাদেশে আসলে তার সাথে আমার কথা হয়। তিনি জানালেন, ১১ সেপ্টেম্বর ঘটনার কোনো কিছু প্রমাণ না হওয়া সত্ত্বেও সেখানে মুসলমানরা আক্রমণের শিকার। এখনো কেউ বলতে পারে না আসলে কে এ ঘটনাটি ঘটিয়েছে। আমেরিকান সরকার একটি ফরমাল জুডিশিয়াল তদন্ত পর্যন্ত এখনো করেনি। বিচার বিভাগীয় কোনো কমিশন করেনি। তিনি সব কথা বলেননি তবে আমি বলবো, যেসব নাম উচ্চারণ করে বলা হচ্ছে এটি মুসলিমরা করেছে সে নামগুলোও নিশ্চিত করে বলা যাবে না। যে প্লেনে ১৯ জন মুসলমান ছিল, তাতে অন্যান্যরাও ছিল – সবাই তো মারা গেছে। তারা এটি করেছে, ওরা করেনি তার প্রমাণ কি? ওরা যে কোনো



www.pathagar.com

ইন্টেলিজেন্সের এজেন্ট নয় তারই বা প্রমাণ কি? এরই বা প্রমাণ কি যে এরা লাদেনের লোক? কোনো কিছু তদন্ত না হয়ে, কোর্টে প্রমাণ না করে এটি বলা হচ্ছে। সুতরাং এটি আমেরিকার একপেশে প্রোপাগান্ডা মাত্র। আমি বলি না যে এরা করেনি। কিন্তু আমি বলতে পারছি না যে এরা করেছে।

## উত্তরণের উপায়

আমাদেরকে এজন্য হতাশায় ভুগলে চলবে না। আমাদের একটি সুস্থ পরিকল্পনা হাতে নিতে হবে। এর প্রধান দিক হবে আমাদের মজবুত অর্থনীতি গড়ে তোলা। যদি আমরা এটি করতে পারি তাহলে বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদ থেকে বেঁচে যাবো এবং শক্তিশালী হবো। এরপর যদি সায়েন্স এন্ড টেকনোলোজিকে এবং শিক্ষাকে উন্নত করতে পারি তাহলে ডিফেন্সেও আমরা শক্তিশালী হয়ে যাবো। আর এজন্য আমাদের অনৈক্যের ইস্যুসমূহ আমরা এড়িয়ে যেতে পারি। প্রতিটি বিষয়ে জোর দেয়ার দরকার নেই। ছোটখাটো বিষয়গুলোতে আমাদের অনৈক্য থাকতে পারে। সেটিকে বড় করে না দেখলেই হলো। ঐক্যের বিষয়গুলোতে আমরা একত্রে কাজ করতে পারি। ছোট বিষয়সমূহ ধরলে কোনো ঐক্য হবে না।

মুসলিম বিশ্বের ওআইসিকে কোনোভাবেই অবহেলা করা ঠিক হয়নি। তারা জাতিসংঘের উপর নির্ভর করেছে কিন্তু এর উপর যথাযথ গুরুত্ব দেয়নি। এটি ভুল করেছে। ওআইসিকে খুবই শক্তিশালী করা দরকার। ওআইসির বর্তমান ১০ম সম্মেলন এমন এক সময় হয়েছে যখন মুসলমানরা যথার্থ রাস্তার অনুসন্ধান করছে। ১৯৬৯ সালে যখন ওআইসি প্রতিষ্ঠা হয় তার আগে আল আকসা মসজিদ পুড়িয়ে দেয়া হয়। ইসরাইলের সে নৃশংসতাই মুসলিম বিশ্বে বিস্ফোরিত হয়। তখন একটি বিরাট সংকটের সময় ওআইসি প্রতিষ্ঠিত হয়। তেমনিভাবে দশম সামিট যে সময় হয়েছে সে সময় মুসলিম বিশ্ব বড় ধরনের সংকটের সম্মুখীন। এখানে ৫৭টি দেশের প্রতিনিধিগণ ছিল। তারা খুব মূল্যবান কথা বলেছে। মুসলিম ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা তারা বুঝেছে। ওআইসির নতুন চেয়ারম্যান মাহাথির মোহাম্মদ যে স্টেটমেন্ট দিয়েছেন তাতে তিনি বর্তমান বিশ্বের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেছেন। ইসরাইলি ইহুদিদের ভূমিকা, তারা মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে বিশ্বকে যে নিয়ন্ত্রণ করছে সে কথাও এসেছে। মুসলমানদের পতনের কারণ হিসেবে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে পিছিয়ে পড়াকে উল্লেখ করেছেন। আমরা ইজতিহাদ করিনি, গবেষণা করিনি। এগুলো আমাদের ঠিক হয়নি বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। তিনি মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হতে বলেছেন। তারা সম্মেলনে যে ফাইনাল ডিক্লারেশন দিয়েছেন তাতে ১০ দফা ঘোষণা দিয়েছেন যে আমাদের কি কি করতে হবে।

একটি সত্য ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, ওআইসি শক্তিশালী হলো না কেন? এটি শক্তিশালী না হওয়ার কারণ মুসলিম রাষ্ট্রগুলো এর গুরুত্ব দেয়নি। তারা জাতিসংঘের পিছনে সব সময় ছুটে সব সমস্যার সমাধান পেতে চেষ্টা



www.pathagar.com

করেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাও তারা পায়নি। অর্থাৎ জাতিসংঘ মুসলমানদের কোনো সমস্যার সমাধান করে দিতে পারেনি। কাশ্মির, চেচনিয়া, বসনিয়া, ফিলিস্তিন কোনোখানেই সমস্যা সমাধান করতে পারেনি। উল্টো আমরা দেখি জাতিসংঘ ইউনাইটেড স্টেটসের উপর নির্ভর করে। আমেরিকা যেটি চায় না তা হয় না, যেটি চায় সেটি দু'দিন পরে হলেও হয়। এ অবস্থায় জাতিসংঘের উপর নির্ভর করা আমাদের কতটুকু ঠিক? আমি জাতিসংঘ ভেঙে যাওয়ার পক্ষে নই। এটি থাকতে হবে। আমাদের উচিত হবে ওআইসিকে শক্তিশালী করা। আমি জানি কোনো কোনো রাষ্ট্র চেয়েছে ওআইসি থাকুক কিন্তু শক্তিশালী না হোক। মাহাথির মোহাম্মদ গত এক বছর ধরে ওআইসিকে শক্তিশালী করার কথা বলে যাচ্ছেন। এর জন্য প্রত্যেকটি সদস্য রাষ্ট্রের শক্ত সমর্থন দেয়া প্রয়োজন। ওআইসি শক্তিশালী করার প্রশ্নে তার স্থায়ী সচিবালয় বাদেও একটি ভেটোহীন সিকিউরিটি কাউন্সিল হওয়া দরকার। সেখানে কোনো সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে গেলে দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন লাগবে। এটি আইডিয়া আকারে আমি উল্লেখ করলাম। আমি অন্য এক জায়গায় ন্যামের (NAM) ব্যাপারে এরকম মডেলের কথা বলেছিলাম। ওআইসি তার ৫৭টি সদস্য দেশের নিরাপত্তা, বিশেষ করে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার বিষয়টি দেখতে পারে। জাতিসংঘের উপর মানবজাতির নির্ভর করা ঠিক হবে না। আর জাতিসংঘের বর্তমান কাঠামোও পরিবর্তন হওয়া দরকার। একেও শক্তিশালী করা দরকার। যুক্তরাষ্ট্র থেকে একে মুক্ত করা দরকার।



www.pathagar.com

# মহৎ আদর্শের জন্য কাজ করতে হলে

যারা কিশোর তাদের নিশ্চয়ই ইসলাম সম্পর্কে ভালো করে জানার, ইসলামের কর্মী হবার, ইসলামের সেবা করার এবং এর মধ্য দিয়ে জীবনকে অর্থবহ করে তোলার আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। আর সত্যিই মানুষের জীবন তখনই মহৎ হয়, তাৎপর্যপূর্ণ হয় – যখন সে কোনো মহৎ আদর্শের জন্য কাজ করে। নিজের জন্য কাজ করা ভালো, মন্দ নয়। দেশের জন্য কাজ করা তা-ও খুব ভালো। কিন্তু সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে কোনো মহৎ আদর্শের জন্য কাজ করা।

ইসলামই মুসলমানদের আদর্শ। আমরা সত্যিই যদি ইসলামের জন্য মূল্যবান হতে চাই তাহলে আমাদের অবশ্যই ঈমান ঠিক থাকতে হবে। ঈমান কি তা ভালো করে বুঝতে হবে। ঈমান সম্পর্কে, বিশ্বাস সম্পর্কে ব্যাপক পড়াশুনা থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে ড. জামাল আল বাদাবির 'ইসলামি আকিদা ও মৌলিক বিশ্বাস' বইটি পড়তে পারলে ভালো হয়। এ বইতে ইসলামি আকিদা সম্পর্কে খুব সংক্ষেপে সুন্দর আলোচনা করা হয়েছে। তৌহিদ, রিসালাত, আখেরাত সহ আকিদার অন্যান্য বিষয় এ বইতে পাওয়া যাবে। এ বইতে তা সহজ ভাষায় বলা হয়েছে। ইসলামের আকিদা বা মৌলিক বিশ্বাস সম্পর্কে তোমাদের সবারই পরিষ্কার ধারণা থাকা উচিত।

তোমাদের সবারই ঈমানের সাথে সাথে অবশ্যই আমল ভালো হতে হবে, আখলাক বা স্বভাব ভালো হতে হবে। এটি ঠিক, এ সব কিছুর পিছনে রয়েছে জ্ঞান। জ্ঞানই বলে দেবে কোনটি ভালো আখলাক, কোনটি ভালো আমল। কাজেই তোমাদেরকে ইসলামের মৌলিক জ্ঞান অর্জন করার চেষ্টা করতে হবে। সে জন্য আকিদা বা বিশ্বাসের বাইরে অল্প বয়সেই কুরআন পড়া শুরু করা ভালো। এতে আমি তেমন কোনো অসুবিধা দেখি না। বর্তমানে কুরআনের বাংলা অনুবাদ পাওয়া যায়। তোমরা যারা সেভেন, এইট বা নাইনের ছাত্র তারা বাংলায় যে সমস্ত প্রবন্ধ পড়, কুরআনের অনুবাদের ভাষার বেশিরভাগ অংশই তারচেয়ে বেশি কঠিন কিছু নয়। গোটা কুরআনের একশ' থেকে দেড়শ' কিংবা বেশি হলে দু'শ' আয়াত আছে যাকে আমরা একটু কঠিন হিসেবে ধরতে পারি। বাকি আয়াতগুলো একেবারেই কঠিন নয়, সহজ। কাজেই অল্প বয়স থেকেই আমরা যদি কুরআনের অনুবাদ পড়া শুরু করি তাহলে তার ফল ভালো হবে।



www.pathagar.com

আমি অনেকের মতো তোমাদেরকেও বলছি, যারা আরবিতে দুর্বল তাদেরকেও বলছি, যারা তেলাওয়াত ভালো করে করতে পারে না, তেলাওয়াত ভালো করে শেখার সঙ্গে সঙ্গে যদি শুধু অনুবাদ অংশই পড়ে এবং মাসে এক পারা করে পড়ে, ত্রিশ মাসে যদি ত্রিশ পারা শেষ করে, তাহলে তাদের মনে কুরআনের একটি গভীর প্রভাব আসবে। অন্যদিকে সারা জীবনে তোমরা পনের থেকে বিশবার অর্থসহ কুরআন শেষ করতে পারবে। ত্রিশ মাস অর্থাৎ আড়াই বছরে একবার করে পড়ার অর্থ হলো পঁচিশ বছরে দশবার আর পঞ্চাশ বছরে বিশবার পড়া। অর্থাৎ তোমাদের জীবনে কুরআন অর্থসহ বিশবার পড়া হয়ে যাবে। যারা তেলাওয়াত করতে পারো তারা তেলাওয়াত সহই পড়তে চেষ্টা করবে। কুরআন তোমাদের মনে প্রবেশ করলে তোমাদের দিলে কোনটি ভালো এবং কোনটি মন্দ, কোনটি গ্রহণযোগ্য এবং কোনটি গ্রহণযোগ্য নয় তার একটি ফোরকান অর্থাৎ পার্থক্যকারী থাকবে।

তোমাদের আরেকটি কাজ করতে হবে। সেটি হলো সুন্নাহর যে মূল উৎস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে তাঁর জীবনীটি খুব ভালো করে পড়তে হবে। এ প্রসঙ্গে আমার নিজের কথাই বলি। আমার নিজের জীবনে আমি যখন ক্লাস সিক্স কি সেভেনে পড়ি, সেই অল্প বয়সেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি বড় জীবনী পড়েছিলাম। সে জীবনীটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। নাম 'পাক পানজাতন'। সেটি ছিল প্রায় ৭০০ পৃষ্ঠার বই। তার ৪০০ পৃষ্ঠাই ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী, বাকি ৩০০ পৃষ্ঠা ছিল হজরত আলী (রা.), হজরত ফাতেমা (রা.) এবং হজরত হাসান (রা.) ও হজরত হোসেন (রা.)-এর জীবনী। আমি এ বইটি অল্প বয়সেই প্রায় ১০ বার পড়েছিলাম। পড়েছিলাম বলেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী আমার মনে এতো গভীরভাবে প্রবেশ করে যে, আমার আখলাক আগের চেয়ে অনেক ভালো হয়ে যায়। এর ফলে আমি নিজেই যেন একটি দুর্গ হয়ে গেলাম। এ দুর্গে কোনো দুষ্টামি, শয়তানি সহজে প্রবেশ করতে পারে না – এ দুর্গ বাঁধা দিয়ে দেয়। সকল খারাপ বা মন্দ দুর্গের প্রবেশ মুখেই বাঁধা পায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী আমাকে এভাবে বেঁধে ফেললো। আর এর মানে এ নয় যে, আমি বলি না আমি দোষ করি না, আমি গুণাহ করি না, আমার ত্রুটি হয় না। কিন্তু আমি বলি তা খুব কম করি। আল্লাহর মেহেরবানীতে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী জানার প্রভাবের কারণেই আমার এটি হয়েছে।

তাই আমি বলবো, তোমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী ভালো করে পড়তে হবে। তোমরা আস্তে আস্তে বড় হবে। আমি বলবো ইসলাম বোঝার জন্য কিছুট আরবি শেখা ভালো। বেশি শিখতে পারলে বেশি ভালো। কমছে কম আরবি যাতে বুঝতে পারো তার জন্য মূল গ্রামার শিখে নেয়া



www.pathagar.com

এবং আরবিতে কিছু প্রবন্ধ বা গল্প পড়ে নেয়া দরকার। এজন্য মাত্র এক বছর বা দু'বছর আরবি পড়তে হবে। আমি নিজে আরবি পড়েছি, শিখেছি। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কোর্সগুলো করেছি। তার ফলে আমার অন্তত এতটুকু হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তি আমাকে ইসলামের ব্যাপারে, কুরআনের ব্যাপারে ধোঁকা দিতে পারবে না। অন্তত এতটুকু লাভ হয়েছে যে এর মাধ্যমে সম্পূর্ণ জ্ঞান যদি নাও হয়, আমি ভালো করে যদি আরবি বুঝতে নাও পারি, তাহলেও আমাকে অন্তত কোনো ব্যক্তি আরবি কথা বলে ধোঁকা দেবে তা আর সম্ভব নয়। কেননা আমি আরবি গঠনরীতি জানি। এজন্য তোমাদেরকে আমি এটুকুই বলবো জীবনের প্রথম দিকেই সম্ভব হলে আরবি শিখে নেয়ার চেষ্টা করবে।

এরপর আমি বলবো গত একশ' বছরে ইসলামের যেসব গ্রেট স্কলার জন্ম নিয়েছেন তাদের প্রধান বইগুলো পড়তে হবে। তোমরা হয়তো বলবে একশ' বছরের কথা বলছেন কেন? তার আগের যুগের কথা এজন্যই বলছি না যে, একই কথা আধুনিক লেখকেরা নতুন করে উপস্থাপন করেছেন। আমাদের যুগের উদাহরণ দিয়ে উপস্থাপন করেছেন। আমাদের সমাজের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। একই তৌহিদের বই এক হাজার বছর আগের উপস্থাপন এক রকম হবে আর আজকের লেখাটি অন্যরকম হবে। তাই আজকের লেখাই আমাদের পড়তে হবে। তেমনিভাবে পাঁচশ বছর আগের লেখা ইসলামি অর্থনীতির বই এক রকম আর আজকে লিখলে তা অন্যরকম হবে। আজকের লেখায় স্টক মার্কেটের কথা থাকবে, ব্যাংকের কথা থাকবে। কিন্তু পাঁচশ বছর আগে ঈমাম ইবনে তাইমিয়া যে বই লিখেছেন 'আল হিসবা ফিল ইসলাম', তাতে ব্যাংকিং কিংবা স্টক মার্কেট থাকছে না।

সুতরাং আমাদের আজকের লেখকদের বই প্রধানত পড়তে হবে। সে সাথে কতগুলো সাবজেক্টের কিছু কিছু জ্ঞান আমাদের অর্জন করতে হবে। বড় বড় লেখকদের অন্তত একশ' বই পড়তে হবে। এজন্য পাঁচ থেকে দশ বছরের সময় নিলেই হবে। কয়েকটি বিষয়ে ভালো জ্ঞান থাকতে হবে – যেমন ইতিহাস। ইতিহাস একজন শিক্ষকের মতো। আমাদেরকে মুসলিম ইতিহাস জানা দরকার। সাবকন্টিনেন্টের ইতিহাস জানা দরকার। বাংলাদেশের অতীত ইতিহাস জানা দরকার। সেই ১২০০ সাল থেকে প্রায় ৮০০ বছর ধরে মুসলমানরা এখানে আছে। এসব আমাদের জানতে হবে। ইসলাম ও মুসলমানদের ইতিহাস ভালো করে জানতে হবে। সে সাথে সম্ভব হলে ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান, রাশিয়ার ইতিহাস জানতে পারলে ভালো। সবারই কিছু অর্থনীতি জানা দরকার। প্রাথমিক জ্ঞান হলেও সোশালোজি কিছু জানা দরকার। আমি নিজে যেহেতু এগুলো পড়েছি সে জন্যই তোমাদের বলছি।

এগুলো মোটামুটি একটি ধারণা। তবে অনেক বড় লিস্ট বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এটি তেমন বড় লিস্ট নয়। কুরআন প্রতি ত্রিশ মাসে একবার - এটি



www.pathagar.com

খুব বড় বই নয়। ছোট একটি বই, প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠার। এর যদি আবার আরবি বাদ দিই তাহলে অনুবাদ ২০০ পৃষ্ঠায় হয়ে যায়। আর এ ২০০ পৃষ্ঠা ত্রিশ মাসের জন্য খুব বড় কিছু নয়। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনীও খুব বড় নয়, ৩-৪শ' পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়। এটি তোমরা জীবনে কয়েকবার পড়বে। এরপর বলেছি আরবি ভাষার কথা। তাও দুই-তিন বছরে শিখলে চলবে। সে সাথে আধুনিক যুগের প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক লেখকদের প্রায় ১০০ বই ১০ বছরে পড়া। আমি কি এটি খুব বড় সিলেবাস দিয়েছি? আমার তো মনে হয় আমি তেমন কোনো বড় সিলেবাস দেইনি। আমি আশা করি, তোমরা ছোটরা এ কাজটি করতে পারলে নিজেরাই উপকৃত হবে। লেখাটি সকল কিশোর, ছাত্র-ছাত্রী এমনকি আগ্রহীদের জন্যও প্রযোজ্য হতে পারে।



www.pathagar.com

# বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ঃ একটি পর্যালোচনা

আমাদের ভাষা আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর পূর্তি হলো। ভাষা ও সাহিত্যে আমাদের অর্জনকে মূল্যায়ন প্রয়োজন। আমার যতটুকু পড়াশুনা তার আলোকে আমি দেখতে পাই, বাংলা ভাষা একটি অত্যন্ত শক্তিশালী ভাষায় পরিণত হয়েছে। এটি এমনি হয়নি। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, ফররুখ এবং এরপরে অন্যান্য কবি-সাহিত্যিক যারা এলেন তাদের চেষ্টা ও সাধনার ফলেই বাংলা ভাষা একটি শক্তিশালী রূপ গ্রহণ করে। এ ভাষার একটি বড় সুবিধা হলো বিদেশী শব্দভাণ্ডার থেকে সে অবলীলায় শব্দ গ্রহণ করে। একদিকে সংস্কৃত অন্য দিকে আরবি এবং ফারসি থেকে ব্যাপকভাবে শব্দ গ্রহণ এবং পরবর্তীকালে যেহেতু ইংরেজরা দু'শ বছর এদেশ শাসন করে, সেখান থেকে বাংলা ভাষায় ইংরেজি শব্দও ব্যাপকভাবে প্রবেশ করে। ফলে দেখা যায় বিশ্বের যে কয়টি ভাষার শব্দভাণ্ডার বেশ সমৃদ্ধ তার মধ্যে বাংলা একটি। যদিও এ বিষয়টি অবশ্যই গবেষণার দাবি রাখে। যদি একটি ভাষার শব্দভাণ্ডার খুব ব্যাপক হয় তাহলে সে ভাষা যে কোনো বিষয় প্রকাশ (Express) করতে পারে। যে কোনো বিষয় সে ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়।

আর শব্দভাণ্ডারের ব্যাপকতার কারণে বাংলা ভাষার মাধ্যমে বর্তমানে যে কোনো বিষয়, যে কোনো কিছু প্রকাশ করা সম্ভব। তুলনামূলকভাবে শব্দভাণ্ডার অতি অল্প হলে সে ভাষার মাধ্যমে কখনো ব্যাপক চিন্তাধারা তুলে ধরা সম্ভব হয় না। বাংলা ভাষার মাধ্যমে বর্তমানে যে কোনো দর্শন, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি বা সমাজ বিজ্ঞান, বিজ্ঞান কিংবা সকল কিছু প্রকাশ করা সম্ভব। তবে বিজ্ঞানকে প্রকাশ করতে গেলে আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক যে শব্দমালা সেগুলোকে গ্রহণ করতে হবে। ইতোমধ্যে যেগুলো গ্রহণ করা হয়েছে তার ফলে যেহেতু কোনো সমস্যা হয়নি তাই প্রয়োজনে আরো শব্দ গ্রহণ করলেও কোনো সমস্যা হবে না বলেই মনে হয়।

কাজেই বলা যায় খুবই শক্তিশালী একটি ভাষা আমরা পেয়েছি, যেটি গত এক-দেড়শ' বছরে অভাবিত উন্নতি করেছে। বিশেষ করে গত পঞ্চাশ বছরে এ ভাষা আরো সমৃদ্ধ হয়েছে। ইংরেজি শব্দের প্রবেশ এ সময় ব্যাপকতর হয়েছে। বিজ্ঞানের প্রয়োজনে এবং অন্যান্য কারণে বিশ্বের অগ্রযাত্রার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অগ্রসর হয়েছে এ ভাষা।



www.pathagar.com

এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করতে হয়, সেটি হলো, আমরা একই সঙ্গে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা এবং শিক্ষার মাধ্যম করেছি। যদিও বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করা ঠিক হয়েছে কি না এ নিয়ে কেউ কেউ মতভেদ করেন, তবে আমি মনে করি ঠিকই হয়েছে। ইংরেজি শিখবো, বিশ্বের ভাষা ঠিক আছে। ইংরেজির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ করতে হবে, তাও ঠিক আছে। এর মানে এই নয় যে, এতো বড় একটি শক্তিশালী ভাষা হওয়া সত্ত্বেও আমাদের অফিসিয়াল ভাষা ইংরেজি হবে, এ কথা মনে করা একেবারেই অসঙ্গত।

যে কথা বলছিলাম, বাংলা ভাষা যে শিক্ষার মাধ্যম হয়ে গেল আপ টু ইউনিভার্সিটি লেভেল – তার ফলে আরো অসংখ্য ইংরেজি শব্দ বিজ্ঞানের প্রয়োজনে আমরা গ্রহণ করে ফেললাম। এ ডেভেলপমেন্ট হলো গত বিশ-ত্রিশ বছরে।

ভাষার মাধ্যমে আমরা সবই প্রকাশ করতে সক্ষম। কিন্তু এরকম একটি অস্ত্র আমাদের হাতে থাকা সত্ত্বেও সে তুলনায় আমাদের সাহিত্যের অর্জন ব্যাপক – এটি বলতে আমার দ্বিধা আছে। আজ আমাদের নিজেদেরকে প্রশ্ন করতে হবে, চিন্তার ক্ষেত্রে আমরা কতটুকু লিখেছি, পলিটিক্যাল সায়েন্স কিংবা অর্থনীতির ওপর কতটুকু লিখেছি, দর্শন বা অন্যান্য বিজ্ঞান এবং সমাজ বিজ্ঞানের ওপর কতটুকু লিখেছি? বাস্তবে দেখা যাবে খুব কমই লিখেছি। কিছু টেক্সট বইয়ের অনুবাদ ছাড়া সত্যিকার অর্থে মূল কাজ আমরা যাকে বলি, তা বাংলা সাহিত্যে করিনি।

তেমনিভাবে উপন্যাস, গল্পের কথা বললেও বলবো আমাদের অর্জন খুব বেশি নয়। নিশ্চয় বাংলায় অনেক পপুলার উপন্যাস লেখা হয়েছে। যেমন ছোট ছোট উপন্যাস যাকে নভেল বলা যায় - যখন একজন লেখক লেখেন তখন হাজার হাজার কপি বিক্রি হয়ে যায়। কিন্তু সাহিত্যের বিচার এটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়। ভাষার সমৃদ্ধির তুলনায় সাহিত্যের দরবারে আমাদের অর্জন এখনো সে পরিমাণ নয়। এরপর যদি কবিতা প্রসঙ্গে বলি তাহলে একথা ঠিক যে, আমাদের কবির সংখ্যা অনেক। অসংখ্য কবি আছেন, তার মধ্যে কেউ কেউ উল্লেখযোগ্য কবি হিসেবেও খ্যাতি অর্জন করেছেন। কিন্তু তবু বলা যায় বাংলা ভাষা একটি শক্তিশালী ভাষায় পরিণত হলেও আমরা সামগ্রিকভাবে একটি শক্তিশালী সাহিত্য তৈরি করতে পেরেছি এমন কথা বলতে পারি না। তবে আমাদের সুযোগ রয়েছে। এ ভাষাকে ব্যবহার করে আমরা একটি শক্তিশালী সাহিত্য তৈরি করতে পারি। উপন্যাসের ক্ষেত্রে, গল্পের ক্ষেত্রে, কবিতার ক্ষেত্রে তো পারিই। সর্বোপরি একটি জাতিকে প্রতিনিধিত্ব (Represent) করার জন্য মূল যে চিন্তা (Thought) তার ক্ষেত্রেও সম্ভব। এজন্য যেটি প্রয়োজন সেটি হচ্ছে বিশ্ব সাহিত্যকে জানা (বিশ্বের যে দর্শন – সেটি রাজনৈতিক হোক বা অর্থনৈতিক হোক কিংবা সমাজ বা সভ্যতা সংক্রান্ত থিওরিই হোক), সে সম্পর্কে গভীর পড়াশুনা করা। তাহলেই আমাদের সাহিত্য শক্তিশালী হবে।



www.pathagar.com

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতিতে অনুবাদ সাহিত্য একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। অনুবাদ ক্ষেত্রে যে কাজ হয়েছে, বিশেষ করে বেশকিছু বিশ্বখ্যাত তাফসির এরই মধ্যে অনূদিত হয়েছে। মাওলানা মওদূদীর তাফসির 'তাফহিমুল কুরআন' অনুবাদ হয়েছে। সাইয়্যেদ কুতুবের তাফসির 'ফি জ্বিলালিল কুরআন' অনুবাদ হয়েছে। 'তাফসিরে ইবনে কাসির' ও মুফতি শফির তাফসির 'মারেফুল কুরআন' সহ অন্যান্য আরো কিছু উল্লেখযোগ্য তাফসির অনুবাদ হয়েছে। অনুবাদ বাদে এ সময় বাংলায় মূল তাফসিরও লেখা হয়েছে। এক্ষেত্রে মাওলানা আকরম খাঁর তাফসির সহ আরো বেশ কিছু তাফসিরের কথা বলা যায়। প্রসঙ্গত এক্ষেত্রে গিরীশচন্দ্র সেনের নামও এসে যায়।

তাফসিরের পর সিহাহ্ সিত্তা সহ উল্লেখযোগ্য হাদিস গ্রন্থের অনুবাদের কথা উল্লেখ করা যায়। এছাড়া বেশ কিছু ইসলামি বইয়ের অনুবাদও হয়েছে। তবে হাদিস গ্রন্থগুলোর অনুবাদ হলেও হাদিস গ্রন্থের টীকাসমূহের (Commentary) পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ হয়নি। এখন পর্যন্ত বুখারি, মুসলিমের টীকাসমূহের ব্যাখ্যাগ্রন্থ পুরোপুরি অনুবাদ হয়নি। একথা অবশ্য বলা ভালো যে, আজকে সেসব অনুবাদ করতে গেলে নতুন করে টীকা যোগ করার (Annotation) প্রয়োজন হবে। কেননা তৎকালীন ব্যাকগ্রাউন্ড আলাদা ছিল, পরিস্থিতি আলাদা ছিল, যেটি তাদের টিকা বা মতামতে প্রবেশ করেছে। সেদিক থেকে আজকে তার অনুবাদ করতে গেলে তার এনোটেশন লাগবে। তার নতুন করে নোট দিতে হবে। ইসলামি চিন্তাবিদদের মধ্যে ইমাম গাজ্জালির কিছু অনুবাদ হলেও ইবনে খলদুন, আল কিন্দি, আল ফারাবি, ইবনুল আরাবি প্রমুখদের বইয়ের তেমন অনুবাদ হয়নি। আধুনিক লেখকদের মধ্যে ড. ইউসুফ আল কারযাভীর কিছু বইয়ের অনুবাদ হয়েছে। অনুবাদ হয়েছে মাওলানা মওদূদী, ড. মরিস বুকাইলি, আল্লামা আসাদ, সাইয়্যেদ কুতুব, মোহাম্মদ কুতুবের বইয়ের। অনুবাদ সাহিত্যের ক্ষেত্রে ড. তাহা হোসাইন, ড. নাজিব কিলানি, নসীম হিজাযীর বইয়েরও অনুবাদ হয়েছে।

অন্যদিকে ইসলামের উপর বাংলা ভাষায় কয়েক হাজার বই লেখা হয়েছে। এর মধ্যে মাওলানা আকরম খাঁ, গোলাম মোস্তফা, মাওলানা আবদুর রহীম সাহেবের মতো চিন্তাবিদদের লেখাগুলো মানসম্পন্ন হলেও অন্যান্য অধিকাংশ লেখাই নিম্নমানের। এগুলোকে নোটবুক বলে গণ্য করতে হবে। সংখ্যার দিক থেকে বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। প্রথম ইন্দোনেশিয়া, দ্বিতীয় পাকিস্তান। এক সময় বাংলাদেশ দ্বিতীয় ছিল। আজ সে দেশের ইসলামি সাহিত্য লেখার এবং অনুবাদের এ অবস্থা। ড. কারযাভী, ড. আবদুল হামিদ আবু সুলেমান, ড. তাহা জাবির আল আলওয়ানি, মোহাম্মদ আল গাজ্জালি, ড. খুরশিদ আহমদ, ড. ওমর চাপরার লেখার সাথে তুলনামূলক বিচার করলে আমাদের অবস্থান বোঝা যাবে। তখনই আমরা বাংলা ভাষার মাধ্যমে আমাদের সাহিত্যকে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণীয় ও প্রসারিত করতে ভূমিকা রাখতে পারবো।



www.pathagar.com

একটি ভাষাকে আন্তর্জাতিভাবে পরিচিতি করার দু'টি পদ্ধতি থাকে। একটি হলো ভাষা যদি নিজেই আরেকটি দেশের ভাষায় পরিণত হয়, একেবারে স্থানীয় ভাষা হয়ে যায়। আরেকটি হলো, কোনো ভাষাকে যদি রাষ্ট্র ভাষা করা হয়। যেমন আরবির ক্ষেত্রে কুরাইশদের ভাষা মধ্যপ্রাচ্যের পুরো অঞ্চলের ভাষা হয়ে গেছে, সেটি একটি পথ। অথবা আমরা যেমন দেখি ইংরেজি বিশ্বের প্রায় একশ'টি দেশের রাষ্ট্র ভাষা হয়েছে। আমরা এখনো দেখি ভারত ও পাকিস্তানের অফিসের ভাষা ইংরেজি। আমরা বাংলা ভাষাকে আমাদের অফিসিয়াল ভাষা করতে পেরেছি। কিন্তু এক্ষেত্রে বাংলা ভাষা অন্য একটি এলাকা দখল করে ফেলবে সে সম্ভাবনা নেই। কাজেই, বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত করার পদ্ধতি একটিই, সেটি হলো অনুবাদ। আমাদের যা কিছু ভালো কাজ হয়েছে সেগুলো অনুবাদ হওয়া দরকার। বিশেষ করে গল্প, কবিতা ও উপন্যাস তথা সৃজনশীল সাহিত্য। গল্প, উপন্যাস, কবিতা মানুষের হৃদয়কে নাড়া দেয়, আবেগকে উদ্বেলিত করে। সুতরাং আমাদের ভালো গল্পগুলোর অনুবাদ হওয়া দরকার। গল্পের সাথে সাথে শক্তিশালী উপন্যাসগুলো অনুবাদ হওয়া দরকার, শক্তিশালী কবিতাগুলো অনুবাদ হওয়া দরকার। সে সাথে যদি জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা কোনো মৌলিক কাজ করে থাকি, যদিও আমি তা তেমন দেখছি না – সেগুলো অনুবাদ হওয়া দরকার। এজন্য রাষ্ট্রের এবং সরকারের একটি দায়িত্ব আছে। সাহিত্যিকদেরও একটি দায়িত্ব আছে। এজন্য সংগঠন থাকা দরকার। বাংলা একাডেমি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ও ভূমিকা পালন করতে পারে। এক্ষেত্রে মার্কেটিং (Marketing), অনুবাদ (Translation), প্রচার (Campaign) ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। আর অনুবাদ শুধু ইংরেজিতে নয় অন্য ভাষাতেও হতে হবে। ইংরেজিতে করলে সুবিধা হলো অন্য ভাষায় রূপান্তর করা সহজ হয়। আমাদের দেশে ইংরেজি জানা লোক অনেক আছে। কিন্তু জার্মান, ফরাসি জানা লোক অতো নেই। অন্যান্য ভাষা জানা লোক ধরতে গেলে নেই-ই। সুতরাং অনুবাদ ইংরেজিতে করলে এবং মার্কেটিং হয়ে গেলে সেখান থেকে অটোমেটিক অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ হয়ে যাবে।

আরেকটি পদ্ধতি হতে পারে কয়েকটি বিশেষ ভাষায়, যেগুলোতে বিশ্বের বিরাট এক অংশ কথা বলে যেমন কিছু চাইনিজ জানা লোক আমাদের আছে অথবা রাশিয়ায় পড়াশুনা করা রুশ জানা লোক আমাদের আছে – তাদের মাধ্যমে যদি আমরা অনুবাদ করি তাহলে সেটি একটি পদ্ধতি হতে পারে। সেটি করা উচিত বলেও আমি মনে করি। তেমনি ফ্রেঞ্চ জানা কিছু লোক আমাদের থাকতে পারে। তাদের মাধ্যমেও সে ভাষায় আমরা সরাসরি অনুবাদ করতে পারি। বর্তমানে আমাদের দেশে বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশের ভাষাও শিক্ষা দেয়া হয়। তবে ইংরেজি করলে ইংরেজি থেকে অন্যান্য ভাষায় পুনরায় অনুবাদের সম্ভাবনা থাকে।



www.pathagar.com

সবচেয়ে ভালো হবে যদি সরকার বাংলা একাডেমি ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনে একটি করে অনুবাদ ব্যুরো খোলে। আলাদা নতুন কোনো সংগঠন করতে গেলে নানান ধরণের সমস্যা চলে আসে। তাদের একটি উইং (Wing) খোলা বর্তমান কাঠামোর (Existing Structure) মধ্যে সহজ হবে।

মনে রাখা দরকার, আরোপিত কিছুই মঙ্গলজনক হয় না। কিন্তু আমাদের ভাষার ক্ষেত্রে এ ধরণের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। এটি আরোপ করা হয়েছে দু'ভাবে। মুসলিম লেখকদের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে নানা ভুল বোঝাবুঝির কারণে এবং ব্যক্তিগত জীবনে কিছু তিক্ততার কারণে। আর নিজেদের পড়াশুনার কারণে ইসলাম সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখেন না – এ ধরনের লেখকরা ইসলাম বিরোধী, তৌহিদ বিরোধী শব্দ ঢুকিয়ে দিয়েছে। এটুকু হলো আরোপিত ব্যাপার। আবার পশ্চিমবঙ্গের বাংলা ভাষার সাথে আমাদের বাংলা ভাষার পার্থক্যের কারণেও এমন কিছু শব্দ এসেছে, এ অঞ্চলের জন্য যা আরোপিত। কেউ যদি এ দু' এলাকার ভাষা গভীরভাবে পর্যালোচনা করেন তিনি এ পার্থক্য ধরতে পারবেন। ভাষা আন্দোলনের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এ সব বিষয়গুলোতে আমাদের বিশেষভাবে নজর দেয়া দরকার।



www.pathagar.com

# সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক

## সংস্কৃতি কি

সংস্কৃতি কি এবং কি নয় এ সম্পর্কে বিতর্ক রয়েছে গত একশ' বছর ধরে। এ বিতর্ক বৃদ্ধি পায় মার্কসিজমের উত্থানের পরে। মার্কসিজমের উত্থানের পর একটি নতুন দর্শন আসে Art for life sake নামে। তখন এ নিয়ে একটি বিতর্ক দেখা দেয় যে, Art for art sake না Art for life sake। এ বিতর্ক আগে ছিল না। কমিউনিস্টরা এ বিতর্ক তুলে ধরে। এটি করতে গিয়ে তারা বাড়াবাড়িও করে। আর্ট এখানে সংস্কৃতি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। সংস্কৃতির ভিতর যে একটি সৌন্দর্য থাকতে হবে তা তারা হাইলাইট করতে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। তারা সম্পূর্ণভাবে এটিকে উপেক্ষা করে।

অন্যদিকে যারা 'আর্ট ফর আর্ট সেক'-এর পক্ষে তারাও এ ইস্যুকে রাজনীতিকরণ করে। তারা বলেন, আর্ট আর্টের জন্য। অর্থাৎ এর মধ্যে সৌন্দর্য থাকতে হবে। সৌন্দর্যের চেতনা থাকতে হবে। জীবনের বিভিন্ন দিককে, সাহিত্যকলায় যা কিছুই সুন্দর করে এবং সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তা-ই সংস্কৃতি।

সংস্কৃতির প্রশ্নে যদি আমরা সুবিচার করতে চাই তাহলে সেখানে আর্ট বা সংস্কৃতিতে দু'টি দিকই থাকতে হবে। জীবনের জন্য তা প্রয়োজনীয় হতে হবে। জীবনের জন্যই হবে, জীবনকে বাদ দিয়ে নয়। তার মাধ্যমে জীবনকেই ধারণ করতে হবে। এটিই সত্য কথা। অন্যদিকে এটিও সত্য যে, যা কিছু সুন্দর নয় তা আর্ট বা সংস্কৃতি হবে না, তা জীবনের জন্য হলেও। কাজেই দু'টি উপাদানই প্রয়োজন – দু'টিই সত্য। এ বিতর্কের পরিসমাপ্তির প্রয়োজন রয়েছে। তবে আমার মনে হয় বর্তমানে তার পরিসমাপ্তি কিছুটা হয়েও গেছে। মার্কসিজমের পতনের পর এ বিতর্ক আর খুব একটি আছে বলে মনে হয় না।

যে কোনো আদর্শভিত্তিক দলও একথা তুলতে পারে যে আর্ট ফর লাইফ সেক। এটি তারাও নিয়ে নিতে পারে। এটি কেউ কেউ কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিয়েও নিয়েছে। কিন্তু এটি প্রয়োজনীয় নয়। এ তর্ক ইসলামপন্থিদেরও দরকার নেই। ইসলামপন্থিদের সংস্কৃতির মধ্যে এ দু'টি জিনিসের সমন্বয় ঘটাতে হবে।

এ তাত্ত্বিক কথার বাইরে বলা যায় – সংস্কৃতির বহু দিক রয়েছে, বহু ডাইমেনশন রয়েছে। সাহিত্য, শিল্প, সিনেমা, নাটক – সবই সংস্কৃতির অংশ।



www.pathagar.com

সংস্কৃতির ডাইমেনশনের কথা বলতে গিয়ে তার বিভিন্ন ডাইমেনশনের কথা আসে। সংগীত, সাহিত্য থেকে আরম্ভ করে নাটক, সিনেমা সব কিছুই সংস্কৃতির মধ্যে রয়েছে। আরেকটি দিক থেকে বলতে গেলে বলা যায়, মানুষের জীবনাচারই সংস্কৃতি। মানুষের গোটা জীবনপদ্ধতিই সংস্কৃতি। সে হিসেবে সংস্কৃতির আরো ব্যাপক অর্থ দাঁড়ায়।

সংস্কৃতির সংজ্ঞার ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে কিছুটা মতপার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু মৌলিকভাবে আমরা স্বীকার করি, সংস্কৃতি একটি ব্যাপক বিষয়। সংস্কৃতি গোটা জীবনব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সংস্কৃতি প্রতিটি জাতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তার যেমন অনেক দিক বা ডাইমেনশন রয়েছে তেমনি সর্বোপরি এটি জীবনকে সার্ভ করতে হবে। সৌন্দর্যকেও সার্ভ করতে হবে। আবারও বলি এটিকে সুন্দরও হতে হবে এবং জীবনের জন্যও হতে হবে।

## সংস্কৃতি ও মানুষ

সংস্কৃতি ও মানুষকে আলাদা করা যায় না। তবে এভাবে বলা যায়, সংস্কৃতির জন্য মানুষ নয়। মানুষের জন্য সংস্কৃতি। সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে কোনো ব্যক্তি বা সমাজ কল্পনা করা যায় না। প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে সংস্কৃতি রয়েছে। ব্যক্তির একটি স্বতন্ত্র সংস্কৃতিও রয়েছে। তার চালচলন আর স্বভাবের মধ্যে সেসব পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠে। প্রত্যেক পরিবারের একটি সংস্কৃতি রয়েছে। তার মধ্যেও একটি স্বাতন্ত্র্য থাকতে পারে। তার ধরনে, বলনে, কথনে, বক্তব্যে, চলনে সেটি থাকতে পারে। সমাজের থাকতে পারে, একটি জাতির থাকতে পারে। সুতরাং সংস্কৃতির বাইরে মানুষ নয়। আবার মানুষের বাইরেও সংস্কৃতি নয়।

## সংস্কৃতির ভিত্তি

সংস্কৃতিকে কয়েকটি ভিত্তির উপর দাঁড়াতে হবে। সুস্থ বিশ্বাসের উপর সংস্কৃতিকে দাঁড়াতে হবে। যদি দুর্নীতিগ্রস্ত চিন্তার (Corrupt thought) উপর সংস্কৃতি দাঁড়ায় সে সংস্কৃতিও দুর্নীতিগ্রস্ত হবে। কারণ বিশ্বাস আচরণকে প্রভাবিত করে। সংস্কৃতি হচ্ছে আচরণ – তার পেছনে রয়েছে বিশ্বাস। এ বিশ্বাস দুর্নীতিগ্রস্ত হলে আচরণও তাই হবে। বিশ্বাস সুস্থ হলে সেটিও সুস্থ হবে।

এখানে মুসলিম জাতির কথা বললে তার ভিত্তি অবশ্যই তৌহিদ হতে হবে। তৌহিদ বলতে আমরা বুঝি একজন স্রষ্টা রয়েছেন। সব সৃষ্টির একটি উদ্দেশ্য রয়েছে। আমরা মানুষ, আমরা আল্লাহর প্রতিনিধি। আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে তার মিশনকে এ বিশ্ব, আকাশ সর্বত্র কার্যকর করা। এজন্য মুসলিম সংস্কৃতিকে সব সময়ই শিরকমুক্ত হতে হবে। মুসলিম সংস্কৃতি এমন হতে হবে যেন খলিফার মর্যাদা রক্ষা পায়। তার যে প্রতিনিধি মানুষ, তার সঙ্গে খাপ খায়। অর্থাৎ তা ভদ্র হতে হবে, সৌন্দর্যমণ্ডিত হতে হবে, মার্জিত হতে হবে। অমার্জিত হলে চলবে না। এটি অশ্লীলতামুক্ত হতে হবে।



www.pathagar.com

কাজেই সংস্কৃতির প্রথম ভিত্তি হচ্ছে বিশ্বাস। ইসলামের ক্ষেত্রে এটি হচ্ছে তৌহিদ। তাহলে তেমনি যদি আমরা ইসলামের বাইরে গিয়ে দেখি তাহলে অমুসলিমদের মধ্যেও সুস্থ বিশ্বাস থাকতে হবে। সেটি তৌহিদ নাও হতে পারে। সেটি আমার দৃষ্টিতে সঠিক নাও হতে পারে। কিন্তু আমার দৃষ্টিতে যা-ই হোক না কেন যদি স্রষ্টার উপর বিশ্বাস থাকে, মানবতাবাদী হয় তাহলে তার উপরেও যে সংস্কৃতি গড়ে উঠবে সেটিও ভালো হবে। মানবতার একটি অংশ মুসলিম; বাকি অংশ অমুসলিম। তাদের সংস্কৃতিও ভালো হবে যদি তা সুস্থ বিশ্বাসের উপর হয়। তাদের ক্ষেত্রে সেটি স্রষ্টার উপর হতে হবে। যদি নাস্তিকতার উপর হয় তাহলে ক্ষতি হবে। যদি স্রষ্টার অস্তিত্বের উপর ভিত্তিশীল হয় তাহলে তা নাস্তিকতার চেয়ে অনেক ভালো হবে – এতে কোনো সন্দেহ নেই। সেটি যদি মানবতাবাদী হয় তাহলে অবশ্যই ভালো হবে। কিন্তু সেটি যদি জাতিপূজা বা গোত্রপূজা হয় তাহলে সেটি হবে অসুস্থ সংস্কৃতি। সুতরাং ইসলামের ক্ষেত্রে তৌহিদ বলবো। কিন্তু মানবতারও যে অন্য অংশ রয়েছে, তারা তৌহিদ মানছে না। তাদের ক্ষেত্রে সুস্থ সংস্কৃতি গড়ে তোলার ভিত্তির জন্য অবশ্যই একটি সুস্থ বিশ্বাস লাগবে। সেটি হতে পারে মানবতাবাদ এবং স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস। কিন্তু নাস্তিকতার উপর হতে পারে না। যদি হয় তাহলে তা মারাত্মক হবে। যদি রেসিজম বা গোত্রবাদ হয়, বংশপূজা হয়, জাতিপূজা হয় তাহলেও সেটি মারাত্মক হবে।

তাহলে আমরা বলতে পারি, সংস্কৃতির জন্য সুস্থ বিশ্বাস লাগবে। দ্বিতীয়ত তা অশ্লীলতামুক্ত হতে হবে। যদিও এটি প্রথমটির সাথে সম্পর্কযুক্ত। যদি সংস্কৃতি সুস্থ বিশ্বাসের উপর হয় তাহলে তা অশ্লীলতামুক্ত হবেই। কারণ কোনো সুস্থ বিশ্বাসই বলে না অশ্লীলতা ভালো। এ সংস্কৃতি অবশ্যই মানবজাতির জন্য হতে হবে। সংস্কৃতিকে মানবজাতির উদ্দেশ্য পূরণ করতে হবে। মানবতাবাদী হতে হবে। কল্যাণধর্মী হতে হবে।

সংস্কৃতির আরেকটি ভিত্তি হচ্ছে সৌন্দর্যচেতনা। এখানে সুন্দর চেতনা থাকতে হবে। কোনো কিছুই অসুন্দর করা যাবে না। কাজেই সার্বিকভাবে বলা যায় সংস্কৃতির ভিত্তির জন্য একটি সুস্থ বিশ্বাস লাগবে, মানবতাবাদী ও মানুষের প্রয়োজনে হতে হবে, অশ্লীলতামুক্ত হতে হবে, কল্যাণধর্মী হতে হবে এবং সৌন্দর্য-চেতনামণ্ডিত ও সৌন্দর্য-বুদ্ধিমণ্ডিত হতে হবে।

এজন্য আমাদের বিভিন্ন পার্থক্যকে মেনে নেয়া দরকার। বিশ্ব এক রকম নয়। বিশ্ব এক জাতি মিলে হয়নি। আল্লাহতায়ালা নিজেই বলেছেন, আমি যদি চাইতাম সবাই ইসলামের অনুসারী হয়ে যেতো, সবাই সিরাতুল মুস্তাকিমের পথে থাকতো। কিন্তু আমি তো এরকম পরিকল্পনা করিনি। আমি মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছি। অর্থাৎ সবাই এক পথে আসবে না আল্লাহর দেয়া এ স্বাধীনতার কারণে।



www.pathagar.com

এটিকে সামনে রেখে বলা যায় এ বাস্তবতা আজকে আছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে। মানুষ বিভিন্ন মতের হবে, বিভিন্ন ধরনের হবে। সেটিকে সামনে রেখে আমি বলেছি সুস্থ বিশ্বাস ইসলামের ক্ষেত্রে তৌহিদ এবং অন্যদের ক্ষেত্রে মানবিকতা হতে হবে। স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস থাকতে হবে যদি তা তৌহিদ না-ও হয়। তাহলে সেটি সুস্থ সংস্কৃতি হবে। সেটি নাস্তিকতার চেয়ে অনেক অনেক ভালো। নাস্তিকতার উপরে, রেসিজমের উপরে কোনো ভালো সংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারে না।

## সংস্কৃতিতে নিয়ন্ত্রণ

সংস্কৃতি কি মানুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত? নিয়ন্ত্রিত হলে কতোটুকু? এটি আসলে ইয়েস ও নো-এর (Yes and No) প্রশ্ন। এটি ঠিক যে সংস্কৃতিকে মানুষ নির্মাণ করে। একা এক ব্যক্তিই সংস্কৃতি নির্মাণ করে না। অনেকে মিলে, অনেক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে একটি সংস্কৃতি শত বছরে, হাজার বছরে গড়ে ওঠে। তাই যদি হয় তাহলে এটি কে গড়লো? মানুষ গড়লো। কিন্তু কোনো এক ব্যক্তি বা এক প্রজন্মের বা এক বংশের এর উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। এ অর্থে বলা যায় এটি মানুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। কিন্তু আবার এটিও তো সত্য যে সংস্কৃতি মানুষই তৈরি করেছে – সকল মানুষ মিলে তৈরি করেছে। সুতরাং আমরা বলতে পারি সংস্কৃতি প্রকৃতপক্ষে মানুষই তৈরি করে এবং এ অর্থে মানুষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু এ অর্থে আবার নিয়ন্ত্রিত নয় যে কোনো একটি জাতি, কোনো একটি জেনারেশন (Generation) এ সংস্কৃতি নির্মাণ করেনি। অথচ আমরা তো জেনারেশন ধরে চিন্তা করি, আমরা তো ঐতিহাসিকভাবে একত্রে অবস্থান (exist) করছি না – সুতরাং এ অর্থে আবার বলা যায় সংস্কৃতি মানুষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। এটি একটি ঐতিহাসিক বিকাশ (Historical Identity)। এজন্যই আমি বিভিন্ন জায়গায় বলে থাকি যে সংস্কৃতিকে নিয়ে খেলা চলবে না। সংস্কৃতি মানুষের গভীর চেতনা থেকে উৎসারিত। এটি খুব স্পর্শকাতর। সংস্কৃতি নিয়ে সাবধানে এগুতে হবে। যেহেতু আমি একজন ইসলামপন্থি, একথা সেজন্য ইসলামপন্থিদের বেশি করে বলি। আমার অনেক কিছুই পছন্দ হবে না, কিন্তু সেটিকে সরাতে হবে আস্তে আস্তে। ধৈর্য ধরে সরাতে হবে। যেটি রাখলে চলে সেটি রাখতে হবে। কারণ ইসলামের শুরুতেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সরাসরি ইসলামবিরোধী নয় এমন স্থানীয় রীতিনীতি, আচার-আচরণকে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আরব কাস্টমসকে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। ইবনে তাইমিয়ার একটি বিখ্যাত ফতোয়া আছে ঃ যে কোনো দেশের স্থানীয় কাস্টমস (রীতিপ্রথা) তা যদি সরাসরি ইসলামবিরোধী না হয়, একেবারে সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ না হয়, তাহলে সেটি থাকবে।

আমরা এ ব্যাপারে অনেক সময় কিছুটা হঠকারিতা করে বসি। কিছুটা বাড়াবাড়ি করে বসি। এগুলো থেকে আমাদের মুক্ত হতে হবে। ইসলামে যে মহত্ত্ব, সামগ্রিকতা, ব্যাপকতা এবং বহু মত ও পথের সুযোগ আছে সে সুযোগের



www.pathagar.com

বিষয়টি মনে রাখতে হবে। যদি এ মত ও পথের সুযোগ না থাকতো তাহলে এতগুলো মাজহাব হলো কীভাবে? সুন্নিদের চারটি মাজহাব হলো কীভাবে? শিয়াদের মধ্যে কয়েকটি মাজহাব হলো কী কারণে? এটি হয়েছে এ কারণে যে ইসলামে এ অপশনটি আছে।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমাদের বিভিন্ন মতামতকে মানতে হবে। এখানে বিভিন্ন মত-পথের স্বীকৃতি আমাদের দিতে হবে। বিশ্বব্যাপী ইসলামের যে সংস্কৃতি তার তো একেক দেশের একেক সংস্করণ। ইন্দোনেশিয়ার ইসলামি সংস্কৃতি রূপে-রসে-রঙে একই সাথে ইসলামিক হবে, ইন্দোনেশিয়ানও হবে এবং তার মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব থাকবে না। সংস্কৃতির ভিতর যদি সুস্পষ্ট ইসলামবিরোধী কোনো মৌল উপাদান না থাকে তাহলে তা ইসলামি সংস্কৃতি হতে বাধা নেই। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তেমনিভাবে তা প্রযোজ্য মরক্কো, নাইজেরিয়া, পাকিস্তানের ক্ষেত্রেও। প্রত্যেকের নিজস্ব রঙ হবে। আমার মনে হয় এটি অনেকটি এরকম হবে যে, একই বাগানে ইসলাম তার মধ্যে একশ'টি ফুল গাছ। এ বিষয়গুলো ইসলামি সংস্কৃতিকর্মীদের ভেবে দেখা দরকার। এ বিষয়টি বিচার করে দেখা দরকার।

## সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার

সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সংস্কৃতিই তার অন্যতম পরিচয়। নতুন পরিচয় গড়ে তোলা কঠিন। মানুষ পরিচয় ছাড়া চলতে পারে না। তাই হঠাৎ করে নতুন আইডেনটিটি সে গড়ে তুলবে কীভাবে? তার পুরাতন পরিচয় রাখতে হবে, শুধু ততটুকু বাদ দিতে হবে যতটুকু মানবতার জন্য ভালো নয়। যেটুকু সৌন্দর্যের বাইরে, অশ্লীলতায় ভরা এবং ইসলামের ক্ষেত্রে শিরক রয়েছে অথবা ইসলামের মূল শিক্ষার পরিপন্থি, সেটুকু বাদ দিয়ে বাকিটুকু রাখাই তার দায়বদ্ধতা।

## বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য

বিশ্বায়ন বর্তমান বিশ্বে একটি মেজর ঘটনা। সেটি মূলত ঘটেছে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে। একথা ঠিক যে, আজ ভ্রমণ সহজ হয়ে গেছে। কিন্তু ভ্রমণ সহজ হলেও কতো লোকই বা ভ্রমণ করে? বড়জোর শতকরা পাঁচ ভাগ। আমেরিকার কথা বলি, বছরে কতোজন তারা দেশের বাইরে ভ্রমণে যায়? খুবই কম। এ যদি হয় অবস্থা তাহলে বিশ্বায়ন যেটি হচ্ছে তা ভ্রমণের কারণে নয়। এটি হচ্ছে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ডেভেলপমেন্টের কারণে। সারা বিশ্বেই আমরা ভ্রমণ করছি, কিন্তু শারীরিকভাবে ভ্রমণ করছি না। আমরা মন, চোখ, কান দ্বারা ভ্রমণ করছি। আমরা তার গন্ধ পাচ্ছি। এ নতুন ভ্রমণের কারণে বিশ্বে একটি নীরব যোগাযোগ ও লেনদেন চলছে। এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী কল্যাণ ছড়িয়ে পড়তে পারে। অকল্যাণও ছড়িয়ে পড়তে পারে। এতে উভয় দিকের সম্ভাবনাই রয়েছে।



www.pathagar.com

এ অবস্থায় আগামী দিনগুলোতে সংস্কৃতি কতটুকু ভিন্ন থাকবে বলা মুশকিল। আমার মনে হয় সংস্কৃতির অনেক কিছু এক হয়ে যাবে। যেমন পোশাক-পরিচ্ছদ বিশ্বব্যাপী ক্রমেই কাছাকাছি চলে আসতে পারে – এটি অসম্ভব নয়। স্বীকার করতে হবে, ইতোমধ্যেই পুরুষ পোশাকের ক্ষেত্রে শার্ট-প্যান্ট প্রায় এক হয়ে গেছে। যদিও নারী পোশাকের ক্ষেত্রে ঠিক অন্যরকম হয়েছে। মুসলিম বিশ্বে তো নারীর পোশাক নানাভাবে অন্যরকমই রয়ে গেছে। ফলে আমি মনে করি অনেক ক্ষেত্রে কাছাকাছি আসলেও যেসব ক্ষেত্রে এক হবে না সেসব ক্ষেত্রে পার্থক্য থেকে যাবে। যেমন খাওয়া-দাওয়া, এর উপকরণাদী একেক জায়গায় একেক রকম থেকে যাবে। আবার প্রত্যেক এলাকার নিজস্ব গানের সুর আলাদা থেকে যাবে। প্রত্যেক এলাকার নিজস্ব প্রকৃতি, নদী, সমুদ্র, বন, ফসল, মাঠ আছে। তার একরকম আলাদা সুর আছে। সুতরাং গানে, সংগীতে এ পার্থক্য থেকে যাবে। প্রত্যেক এলাকার জনগোষ্ঠীর নিজস্বতার জন্য এবং অন্য জনগোষ্ঠী ও এলাকার ভিন্নতার জন্য সাহিত্যেও একটি পার্থক্য থেকে যাবে।

সংস্কৃতির একটি নিয়ামক হলো ধর্ম বা বিশ্বাস। এটি এক অর্থে সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। সে নিয়ামকের আলাদা বৈশিষ্ট্যের জন্য সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য থেকেই যাবে। হতে পারে, শত সংস্কৃতি না থাকতে পারে, কিন্তু অন্তত পাঁচ-দশটি সংস্কৃতি বিশ্বে থেকে যাবে। তবে ভবিষ্যতে কী হতে যাচ্ছে তা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। কিন্তু অনেক দিকেই ঐক্য বাড়বে। সাংস্কৃতিক ঐক্য বাড়বে, অনেক বেশি পারস্পরিক যোগাযোগ বাড়বে। আবার অনেক ক্ষেত্রেই পার্থক্য থেকে যাবে।

এখানে আগ্রাসন (Aggression) ও ইন্টারঅ্যাকশনকে (Interaction) যদি এক না করে পার্থক্য করতে পারি তাহলে ভালো হবে। ইন্টারঅ্যাকশনকে আমরা পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বা লেনদেন বলি, আর আগ্রাসন হচ্ছে পরিকল্পিতভাবে চাপিয়ে দেয়া। আমাদেরকে অবশ্যই পরিকল্পিত চাপিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করতে হবে। 'লা ইকরাহা ফিদদিন'-এর ভিতরও এ তাৎপর্য রয়ে গেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদিদের সাথে প্রথম চুক্তিতেই তাদের সম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা দিয়ে দিলেন, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা দিলেন। এটি প্রমাণ করে সংস্কৃতিকে জোর করে বদলে দেয়া ইসলামও নয়, মানবতাও নয়। আগ্রাসনের ব্যাপারেও আমাদের এ দিকটি খেয়াল রাখতে হবে।

পাশ্চাত্যের কালচার দুর্ভাগ্যজনকভাবে হলেও বস্তুবাদের উপর ভিত্তিশীল। বস্তুবাদ হলো ভোগবাদ এবং স্বার্থপরতা। তার কারণেই কালচার খুব নোংরা হয়ে গেছে। কালচার নারীকেন্দ্রিক হয়ে গেছে, নারীর অপব্যবহারকেন্দ্রিক হয়ে গেছে। এটিকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেবার যে প্রবণতা তা রুখতে হবে। এটিকে রুখতে পশ্চিমাদের মধ্যে যারা ভালো তাদেরকেও



www.pathagar.com

উৎসাহিত করতে হবে। পশ্চিমা বস্তুবাদ নাস্তিকতা না হলেও নাস্তিকতার কাছাকাছি। এটির বিরুদ্ধে সারা বিশ্বের সবাইকে রুখে দাঁড়াতে হবে। এ বস্তুবাদ মানবতার জন্য কল্যাণকর নয়।

## বিনোদনের সংস্কৃতি

সংস্কৃতির বাইরে কোনো মানুষ হতে পারে না, সমাজ হতে পারে না। তাই মানুষের পক্ষে সংস্কৃতিবিমুখ হওয়াও সম্ভব নয়। তবে সুশিক্ষার অভাবে, দারিদ্র্যের কারণে কিছু লোক যদি অপরাধী হয়ে যায় তাহলে তার সংস্কৃতি হয়ে যাচ্ছে কুসংস্কৃতি বা অপসংস্কৃতি। আবার প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত একটি সংস্কৃতি আছে। কেউ দেশের গান পছন্দ করে, কেউ হামদ-নাত পছন্দ করে। এটি হলো একটি দিক। আর গান-বাজনা হলো কালচারের বাইরের একটি দিক। যদিও এগুলোই বেশি, তারপরও এসব কালচারের মূল দিক নয়। কালচারের মূল দিক হচ্ছে জীবনাচার, পুরো জীবন। প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি উচ্চারণ, বক্তব্য, চলাচল, ভ্রমণ, কথন সব কিছু হচ্ছে তার কালচার। আমরা খুব গভীরভাবে না দেখার কারণে গান, নাচকেই বড় ভেবে এসব বিষয়কে ছোট ভাবি। কিন্তু এগুলো না থাকলেও একটি জাতির পক্ষে সংস্কৃতিবান হওয়া সম্ভব। এগুলো বাদ দিয়েও জাতি সংস্কৃতিবান হতে পারে। অনেক জাতিই আছে যাদের গান খুব পপুলার নয়, যাদের নাচ নেই – তাতে কিছু আসে যায় না।

আমরা বিনোদনের নামে যা খুশি তা-ই করতে পারি না। জীবনের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বিনোদন। বিনোদন প্রয়োজন। আধুনিক বিশ্বে বিনোদনকে গুরুত্ব দিতে হবে। মানুষের দৈনিক জীবনের একটি বড় অংশ রাস্তায় চলে যায়। তার সাথে অফিসের সময়। প্রতিটি ক্ষেত্রেই মানুষ ব্যস্ত। এ অবস্থায় তার জন্য অবশ্যই একটি সুস্থ বিনোদনের ব্যবস্থা থাকতে হবে। বিনোদনকে সুস্থ হতে হবে – অসুস্থ হওয়া যাবে না, অশ্লীল হওয়া যাবে না। কু-স্বভাব সৃষ্টি করে, অপরাধ ছড়ায় এমন কিছু করা যাবে না। খারাপ যা খুব কম ঘটে তাকে নাটকে এনে জাতিকে জানাতেই হবে তা আসলে জরুরি নয়। সাহিত্যের নামে যেটি করা হয় – একটি পরিবারের দুর্ঘটনাকে গোটা জাতিকে জানানো হয়। কিন্তু তা যদি সুন্দর কিছু হতো তা-ও কথা ছিল।

আসলে বিনোদনের মধ্যে একটি সীমা থাকতেই হবে। সে সীমা থাকতে হবে আইন এবং কাস্টমসের মাধ্যমে। এ ব্যাপারে স্বাধীনতার নামে আমরা কদাচারকে অনুমোদন করতে পারি না। আমরা এমন স্বাধীনতা চাই না যে স্বাধীনতা মানুষকে অমানুষ বানায়।



www.pathagar.com

# ইসলামি সংস্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্য তৌহিদ

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা আমাকে কতটুকু মানায় আমি নিজেও বুঝতে পারছি না। বক্তৃতা সংস্কৃতির অংশ কি না এ সম্পর্কে আমি ভালো করে জানি না। কিন্তু আমি ধরেই নিচ্ছি বক্তৃতা সংস্কৃতির অংশ। ধরে নিয়েই আমি আপনাদের সামনে কিছু কথা বলতে চাচ্ছি।

যে কোনো সাংস্কৃতিক আন্দোলন বা যে কোনো আন্দোলনের পিছনে একটি দর্শন থাকার প্রয়োজন আছে। কোনো বড় আন্দোলন, বড় বিপ্লব বা বড় পট পরিবর্তন হয় না যদি তাতে কোনো তত্ত্ব না থাকে। আমি সে তত্ত্বের দিকে গিয়েই দু'-একটি কথা সহজ করে বলার চেষ্টা করছি।

আমি দেখছি বিশ্বব্যাপী একটি নৈতিক সংকট চলছে – একটি নৈতিক অবক্ষয় চলছে। এ নৈতিক অবক্ষয়ের প্রমাণ হচ্ছে বিশ্বব্যাপী বর্বরতা। সেটি আফগানিস্তানে হোক, ইরাকে হোক, কাশ্মিরে হোক কিংবা অন্য কোনো দেশে হোক হিংস্রতা, ধ্বংস, হত্যা, অত্যাচার, এমনকি সন্ত্রাস কোনোটিই মানবজাতির জন্য কল্যাণকর নয়। আমি খুব স্পষ্টভাবে বলতে চাই সন্ত্রাস মানবতার শত্রু। আমি এ তর্কে যাবো না যে কে সন্ত্রাস করছে। কিন্তু আমি জানি এর ফলে সবচেয়ে বড় ক্ষতি হচ্ছে ইসলাম এবং মানবতাবাদের। আমি মনে করি সকল ভালো লোকের, এমনকি সংস্কৃতিসেবীর এবং সকল সংস্কৃতিকর্মীর এ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। ক্রুয়েলিটির বিরুদ্ধে, বার্বারিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে এবং সে সাথে বিশ্বব্যাপী যে নৈতিক অবক্ষয় তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে।

একটু আগে একটি বাচ্চা ছেলে গান গাইলো যে, 'রক্তের হোলি খেলা আমি চাই না' – এটি তো একই কথা, কিন্তু সে কতটুকু বুঝে বলেছে আমি জানি না। আমাদের এটি বুঝতে হবে। আমাদের ইসলামের উপলব্ধি খুবই সুপারফিশিয়াল। একে ট্রিটমেন্ট করতে হবে, গভীর করতে হবে। না হলে আমরা একটি মানবিক সমাজ, একটি সুন্দর সমাজ, সাংস্কৃতিকভাবে একটি উন্নত সমাজ গড়ে তুলতে পারবো না।

এরপরে আমি বলতে চাই বিশ্বব্যাপী এ নৈতিক অবক্ষয়, ক্রুয়েলিটি, বার্বারিজম, টেররিজমের পিছনে রয়েছে মূলত দু'টি কারণ। অনেক কারণ



www.pathagar.com

থাকতে পারে তবে আমি বলবো দু'টি কারণ বড়। একটি হচ্ছে সুশিক্ষা বা সত্যিকার শিক্ষার অভাব। দ্বিতীয়টি হচ্ছে অসুস্থ সংস্কৃতি। আমি মনে করি বিশ্বব্যাপী এই যে অবস্থা, এ অরাজকতা, বর্বরতা, অমানবিকতা, এই যে অত্যাচার, জুলুম এর পিছনে রয়েছে মূলত দু'টি জিনিস – প্রকৃত ভালো শিক্ষার অভাব এবং অসুস্থ সংস্কৃতি। আমি সংস্কৃতির দিকে যাবো। কিন্তু শিক্ষা সম্পর্কে একটি কথা না বললে আমার কথা পূর্ণ হবে না। সুশিক্ষা কাকে বলে? প্রকৃত শিক্ষা কি? ইসলামের দৃষ্টিতে বা মানবতার দৃষ্টিতে ভালো শিক্ষা বা সুশিক্ষা কি? কোন শিক্ষা মানুষকে উন্নত করবে? আমি মনে করি আমাদের এমন এক শিক্ষা লাগবে যাতে সম্পূর্ণ প্রফেশনালিজমও থাকতে হবে। অর্থাৎ তাকে একদিকে প্রফেশনালিজম হিসেবে গ্রহণ করতে হবে, অন্যদিকে একটি মোরাল শিক্ষা তার লাগবে। মুসলমানদের ক্ষেত্রে আমি মনে করি এ নৈতিক শিক্ষা ইসলাম দিতে পারে। আমি যে সুশিক্ষার কথা বললাম তার আন্দোলন ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে এবং চলছে। যার একটি উদাহরণ হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়া। বাংলাদেশেও এরকম ইসলামিক ইউনিভার্সিটি হচ্ছে। এগুলো হচ্ছে নমুনা মাত্র। শিক্ষার এ আন্দোলনকে অনেকদূর এগিয়ে নিতে হবে।

সংস্কৃতির দিকে আমি যখন তাকাই, বর্তমানে বিশ্বব্যাপী যে সংস্কৃতি তার প্রজেকশনের যদি একটি ইনস্ট্রুমেন্ট হয়ে থাকে টিভি – তখন করুণ একটি চিত্র আমার সামনে ভেসে ওঠে। আমার মনে হয় খুব খারাপ অবস্থা। আমি যখন সিনেমা দেখি, আমি খুব কমই দেখি, কিন্তু যতটুকু দেখি তাতে মনে হয়েছে সিনেমা হলো অশ্লীলতা ও যৌনতার নগ্ন উপস্থাপনার মাধ্যমে বাণিজ্য করার একটি মাধ্যম। এটি তো হতে দেয়া যায় না। একই অবস্থা নাটকেও দেখা যায়। এমনকি উপন্যাসের ক্ষেত্রেও দেখছি সে একই অবস্থা। এ অনুষ্ঠানে আসার সময় আলাপ করছিলাম একজন কবির সঙ্গে। সে কবি আমাকে এ কথাই বললো যে রবীন্দ্রনাথের যে উপন্যাস সেরকম উপন্যাস আজকে লেখা হচ্ছে না। নজরুল ইসলামের যে উপন্যাস সেরকম আজকে হচ্ছে না। সে মানবতাবাদ তাতে নেই, মানুষের কথা তাতে নেই, সে সুন্দর সমাজের কথা তাতে নেই। শরৎচন্দ্রের মতো উপন্যাস লেখা হচ্ছে না। আমি আগের কথাই বললাম। কারণ আজকে খুব ভালো উদাহরণ দেয়ার মতো উপন্যাস আমি নিজেও দেখতে পাচ্ছি না। এটি আমাদের ব্যর্থতা – সংস্কৃতির টোটাল ব্যর্থতা, সাহিত্যের টোটাল ব্যর্থতা। সাংস্কৃতিক কর্মীদের কাছে আমার প্রশ্ন আজকে সে মানবতাবাদী নাটক, উপন্যাস কোথায়? সেদিকে আমাদের যেতে হবে।

মূল কথা হলো, অপসংস্কৃতি থেকে বাঁচতে হলে আমাদেরকে সুস্থ সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। যদি তা করতে হয় তাহলে আমাদেরকে একটি সাউন্ড, ডিপেন্ট সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। সংস্কৃতির যে চ্যালেঞ্জগুলো আমাদের সামনে আসছে তার কয়েকটি রূপ আছে। একটি হচ্ছে তার পলিটিক্যাল রূপ। তার



www.pathagar.com

একটি ইকোনমিক চ্যালেঞ্জ আছে, একটি মিলিটারি চ্যালেঞ্জ আছে, একটি কালচারাল চ্যালেঞ্জও আছে। পাশ্চাত্য মূলত চাচ্ছে তাদের কালচার আমাদের উপর চাপিয়ে দিতে। আমি একজন ইসলামিস্ট ও একজন মানবতাবাদীর মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখি না। একজন ইসলামিস্টের সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে মানবতাকে এ অশ্লীলতা থেকে উদ্ধার করা।

ইসলামি সংস্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্য কি? তার বৈশিষ্ট্যের একটি হচ্ছে তৌহিদ। তাকে তৌহিদপন্থি হতে হবে। ইসলামি সংস্কৃতি মানে তাকে তৌহিদকে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে। আরেক দিকে তাকে অশ্লীলতামুক্ত হতে হবে। একটি নেগেটিভ পয়েন্ট, একটি পজেটিভ।

আমার মতে, আমাদের একটি সুস্থ সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য এ যে আন্দোলন সে আন্দোলনকে সাহায্য করতে হবে। সুস্থ সংস্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্য কি? আমার মতে সুস্থ সংস্কৃতির মূল উপাদান তিনটি। একটি হচ্ছে সুস্থ বিশ্বাস। মুসলমানদের ক্ষেত্রে, ইসলামের ক্ষেত্রে এটি হচ্ছে তৌহিদ। দুই, অশ্লীলতামুক্ত হতে হবে। তিন, মানবতার বাণী তাতে থাকতে হবে, মানুষের কল্যাণের বাণী তাতে থাকতে হবে। মানুষকে সমৃদ্ধ করবে, মানুষের ক্ষুধা-দুঃখ দূর করবে, এমন একটি ম্যাসেজ যে সংস্কৃতিতে থাকবে আমি সেটিকেই সুস্থ সংস্কৃতি মনে করবো।

আমি এ সুস্থ সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিকাশ এবং অগ্রগতি কামনা করি।

(জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলন ২০০৪-এর দ্বিতীয় পর্ব
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী ভাষণ)



www.pathagar.com

# সংস্কৃতি আইনের চেয়ে শক্তিশালী

আমি এ সাংস্কৃতিক সম্মেলনের সাংস্কৃতিক পর্বের উদ্বোধন করার আগে সংক্ষেপে দু'-একটি কথা আপনাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই।

প্রথমত, সংস্কৃতি কি? এ সম্পর্কে বিতর্ক রয়েছে। সংস্কৃতি শুধু নাচ, গান বা কবিতাই নয়। সংস্কৃতি হলো মানুষের গোটা জীবনাচার। মোটামুটিভাবে আমরা সংস্কৃতি সম্পর্কে বলতে পারি, এ জীবনাচার হলো মানুষ যা করে, তার পরিবার যা করে, অর্থাৎ রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিকতা প্রভৃতিতে যে আচার বা জীবনপদ্ধতি মেনে চলা হয় তা-ই সংস্কৃতি।

দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের মুসলিম জনগণ অবশ্যই ইসলামি সংস্কৃতি মেনে চলবে। তারা মুসলমান। তারা এদেশে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছে। এখানে কারোর উপর ইসলাম চাপিয়ে দেয়া হয়নি। ইসলাম প্রচারের জন্য জোরজবরদস্তি করা হয়নি। যেহেতু এদেশের জনগণ স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছে তাই ইসলাম ও ঈমানের দাবি এটি যে, তাদের উপর অনৈসলামিক কিছু চাপিয়ে দেয়া যাবে না। ইসলামি সংস্কৃতি এখানে প্রতিফলিত হতে হবে। ইসলামবিরোধী কোনো কিছু গ্রহণ করার দাবি করাও অন্যায়। কেউ এরকম দাবিও করতে পারে না। তা হবে অযৌক্তিক।

তৃতীয়ত, বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠী থাকতে পারে। আমাদের মধ্যে মুসলিম ও অমুসলিম জনগোষ্ঠী একত্রে বসবাস করে। অমুসলিম জনগণ তাদের সংস্কৃতি অনুসরণ করবে, আর মুসলিম জনগণ তাদের মুসলিম সংস্কৃতি অনুসরণ করবে। মুসলমানরা সেটুকু শুধু তাদের আচার হিসেবে, জীবন পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করবে যেটুকু ইসলামের সাথে সংগতিপূর্ণ।

চতুর্থত, বাংলাদেশের মুসলিম সংস্কৃতিতে আমরা মুসলিম জনগণ যারা মুসলিম নন তাদের সংস্কৃতিকে গ্রহণ করতে পারি না।

আরেকটি কথা আপনাদের বলতে চাই, সংস্কৃতি আইনের চেয়ে গভীর। আইনের মাধ্যমে মানুষের ভেতর সহজে প্রবেশ করা যায় না। কিন্তু সংস্কৃতির মাধ্যমে মানুষের ভেতর অনেক গভীরভাবে প্রবেশ করা যায়। আইনকে সহজে পরিবর্তন করা যায়। কিন্তু সংস্কৃতিকে সহজে পরিবর্তন করা যায় না। আমরা



www.pathagar.com

চাই ইসলামি মূল্যবোধ সংস্কৃতির অংশে পরিণত হবে। ইসলামের মূল্যবোধ এবং ধারণাকে আমাদের সংস্কৃতির অংশ করে রাখতে হবে। তাহলে আমাদের সংস্কৃতিকে ইসলামের ব্যানারে এখানে কখনো অপব্যাখ্যা করা সহজ হবে না। বরং অপসংস্কৃতিকে প্রতিরোধ করা সহজ হবে।

আপনারা যারা সংস্কৃতির শক্তিশালী ভিত গড়তে চান তাদের কাছে অনুরোধ – সংস্কৃতি থেকে অশ্লীলতা, নারীর অপব্যবহার ও নারীর অমর্যাদাকর বিষয়গুলোকে দূর করতে হবে। সংস্কৃতিকে মানবতার সেবায় নিয়োগ করতে হবে।

আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে মানবকল্যাণী সংস্কৃতির প্রতি। দেখতে হবে তা মানুষের চরিত্রকে উন্নত করে না ধ্বংস করে। কাজেই আমরা বলবো গান হোক, কবিতা হোক, সাহিত্য হোক – সবকিছুকেই আমাদের পজেটিভ করতে হবে, নেগেটিভ কোনো কিছু নয়।

(জাতীয় সংস্কৃতি পরিষদের জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলন ২০০২-এর
দ্বিতীয় পর্ব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী বক্তব্য)



www.pathagar.com

# অশ্লীল সংস্কৃতির প্রতীক ভ্যালেন্টাইন ডে

ভ্যালেন্টাইন ডে বা ভালোবাসা দিবস নামে বাংলাদেশে বিগত কয়েক বছর ধরে একটি নতুন দিবস পালনের সংস্কৃতি শুরু হয়েছে। এটি এখন বিশেষ বিশেষ মহলে পালন করা হচ্ছে। ব্যবসায়িক স্বার্থ ও মুনাফা অর্জনের প্রত্যাশায় একটি ব্যবসায়িক মহল এবং হোটেল ব্যবসায়ীরা এর সাথে যুক্ত হয়ে উৎসাহিত করছে। কিন্তু ভ্যালেন্টাইন ডে'র ইতিহাস ও ভিত্তি কি? এ সম্পর্কে আমি ইম্প্যাক্ট ইন্টারন্যাশনাল পত্রিকায় প্রকাশিত প্রখ্যাত স্কলার ড. খালিদ বেগ-এর একটি লেখার অংশ এখানে তুলে ধরলাম:

> আজকাল অনেক মুসলিমই প্রকৃত বিষয়টি না জেনেই নানা রকম বিজাতীয় সংস্কৃতির চর্চা করে থাকে। তারা কেবল তাদের সাংস্কৃতিক নেতাদের মতোই এসব ক্ষেত্রে অন্ধ অনুসারী। তারা এটি খুবই কম উপলব্ধি করে যে তারা যা নির্দোষ বিনোদন হিসেবে করে তার শিকড় আসলে পৌত্তলিকতায়, যা তারা লালন করে আসলে তা অবিশ্বাসেরই প্রতীক। তারা যে ধারণা লালন করে তা কুসংস্কার থেকেই জন্ম। এমনকি ইসলাম যা পোষণ করে এসব তার প্রত্যাখ্যান। ভালোবাসা দিবস আমেরিকা এবং বৃটেন বাদে গোটা ইউরোপে মৃত হলেও হঠাৎ করেই তা মুসলিম দেশগুলোতে আবার প্রবেশ করছে। কিন্তু কার ভালোবাসা? কেন এ দিবস পালিত হবে?
>
> অন্যান্য কিছু ক্ষেত্রে তারা যেমন করে, এ বিষয়েও কথিত আছে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে উর্বরতা ও পশুর দেবতা বলে খ্যাত লুপারকাসের (Lupercus) সম্মানে পৌত্তলিক রীতিনীতির একটি অংশ হিসেবে রোমানরা ভ্যালেন্টাইন ডে উদযাপন শুরু করে। এর মূল আকর্ষণ হলো পরবর্তী বছরের লটারির আগ পর্যন্ত বর্তমান বছরে লটারির মাধ্যমে যুবকদের মাঝে যুবতীদের বণ্টন করে দেয়া। এ দিন উদযাপনে অন্যান্য ঘৃণ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে একটি ছিল, এক টুকরো ছাগলের চামড়ায় আবৃত যুবতীদের দু'জন যুবক কর্তৃক উৎসর্গকৃত ছাগল ও কুকুরের রক্তে ভেজা চাবুক দিয়ে প্রহার করা। মনে করা হতো 'পবিত্র যুবক'দের প্রতিটি 'পবিত্র' আঘাত দ্বারা ঐ সব যুবতী ভালোভাবে সন্তান ধারণে সক্ষম হবে।



www.pathagar.com

খ্রিস্টান সম্প্রদায় যথারীতি লুপারকালিয়ার (Lupercalia) এ ঘৃণ্য রীতিকে বন্ধ করার বৃথা চেষ্টা করলো। প্রথমে তারা মেয়েদের নামে লটারির বদলে ধর্ম যাজকদের নামে লটারির ব্যবস্থা চালু করলো। এর উদ্দেশ্য হলো, যে যুবকের নাম লটারিতে উঠবে সে যেন পরবর্তী একটি বছর যাজকের মতো পবিত্র হতে পারে। কিন্তু খ্রিস্টানরা খুব কম স্থানেই এ কাজে সফল হলো।

একটি জনপ্রিয় খারাপ কাজকে কিছু পরিবর্তন করে তাকে ভালো কাজে লাগাবার প্রবণতা বহু পুরাতন। তাই খ্রিস্টানরা শুধুমাত্র লুপারকালিয়া থেকে এ উৎসবের নাম সেইন্ট ভ্যালেন্টাইন করতে পারলো। পোপ গ্যালাসিয়াস (Gellasius) ৪৯৬ খ্রিস্টাব্দে সেইন্ট ভ্যালেন্টাইনের সম্মানে এটি করলো। তথাপি খ্রিস্টান কিংবদন্তীতে পঞ্চাশেরও বেশি বিভিন্ন রকম ভ্যালেন্টাইন আছে। এদের মধ্যে মাত্র দু'জন সবচেয়ে বেশি পরিচিত, যদিও তাদের জীবন ও চরিত্র এখনো রহস্যাবৃত। একটি কিংবদন্তী হলো, যেটি প্রকৃত ভ্যালেন্টাইন দিবসের সাথে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ, সেইন্ট ভ্যালেন্টাইন হলেন 'প্রেমিকদের যাজক' – যে নিজেকে কারাগারের প্রধানের মেয়ের প্রেমে জড়িয়ে ফেলে।

কিন্তু কিছু মারাত্মক অসুবিধার জন্য ফ্রান্স সরকার উল্লেখিত লটারি ১৭৭৬ সালে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। কাল পরিক্রমায় এটি ইটালি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি এবং জার্মান থেকেও উঠে যায়। এর আগে সপ্তদশ শতাব্দীতে পিউরিটানরা যখন শক্তিশালী ছিল সে সময় ইংল্যান্ডে এটি নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু রাজা দ্বিতীয় চার্লস এটি ১৬৬০ সালে পুনরুজ্জীবিত করে। ইংল্যান্ড থেকেই এটি নতুন বিশ্বে আগমন করে যেখানে এটিকেই টাকা বানানোর ভালো মাধ্যম হিসেবে নিতে ইয়াংকিরা (আমেরিকানরা) উদ্যোগী হয়। ১৮৪০ সালের দিকে ইস্টার এ. হল্যান্ড 'হোয়াট এলস ভ্যালেন্টাইন' (What Else Valentine) নামে প্রথম বাণিজ্যিকভাবে আমেরিকান ভ্যালেন্টাইন ডে কার্ড বানায় এবং প্রথম বছরই ৫০০০ ডলারের কার্ড বিক্রি হয় (তখন ৫০০০ ডলার অনেক)। সেই থেকে ভ্যালেন্টাইন ডে ফুলে ফেঁপে ওঠে।

এটি হ্যালোইনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সাধারণ মানুষেরা ভূত এবং অপদেবতার মতো পোষাকে সজ্জিত হয়ে পৌত্তলিকদের একটি প্রাচীন শয়তান পূজার পুনঃপ্রচলন করে। পৌত্তলিকরা এর নাম দেয় সামহাইন (Samhain) যা সোয়েন (Sowen) হিসেবে উচ্চারিত হয়। যেমনটি ভ্যালেন্টাইন ডে'র ক্ষেত্রে ঘটেছিল। খ্রিস্টানরা এর নাম পরিবর্তন করে ঠিকই, কিন্তু পৌত্তলিক শিকড় পরিবর্তন করতে



www.pathagar.com

পারেনি। দৃশ্যত নির্দোষ অনুষ্ঠানেরও পৌত্তলিক শিকড় থাকতে পারে। পূর্বকালে মানুষ ভূত-প্রেতকে ভয় পেতো, বিশেষভাবে তাদের জন্মদিনে। একটি প্রচলিত বিশ্বাস ছিল, মন্দ প্রেরণা একজন ব্যক্তির জন্য অধিক বিপজ্জনক যখন কেউ প্রাত্যহিক জীবনে একটি পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা অর্জন করে। যেমন জন্মদিনে বা একটি বছরের শুরুতে। কাজেই সে ব্যক্তির পরিবার ও চারপাশের বন্ধুবান্ধব হাসি-আনন্দের মাধ্যমে জন্মদিনে তাকে মন্দ থেকে রক্ষা করতো যাতে কোনো ক্ষতি না হয়।

কী করে একজন সচেতন মানুষ ভাবতে পারে ইসলাম অনৈসলামিক ধারণা এবং বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত অযৌক্তিক আচার-অনুষ্ঠানের ব্যাপারে উদাসীন থাকবে? ...

এটি একটি বিশাল ট্রাজেডি যে মিডিয়ার মাধ্যমে নিত্য বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক অপপ্রচারে মুসলমানরা ভালোবাসা দিবস (Valentine Day) হেলোইন (Halloween) এবং এমনকি সান্তাক্লজকেও (Santaclaus) আলিঙ্গন করে নেয়।

(ইম্প্যাক্ট ইন্টারন্যাশনাল, লন্ডন, মার্চ ২০০১)।

এটিই ভ্যালেন্টাইন দিবসের ইতিহাস। এরকম একটি পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারভিত্তিক অনুষ্ঠান বাংলাদেশের মতো একটি দেশে, যেখানে জনগণের শতকরা ৯০ জন মুসলমান সেখানে কীভাবে পালিত হতে পারে? ইসলাম আমাদের প্রকৃত ও অকৃত্রিম ভালোবাসাই শিক্ষা দেয় যা এ ধরনের অনুষ্ঠানের উপর নির্ভর করে না। আমাদের দেশে এটি বর্তমানে তরুণ-তরুণীদের অবাধ মেলামেশা এবং ব্যাভিচারের একটি মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। এটি মুসলমানদের এবং বাংলাদেশীদের সংস্কৃতির অংশ নয়। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির এমন কোনো অংশই, যা অশ্লীল এবং অশালীন, আমাদের দেশে অনুমোদন করা উচিত নয়।

এ ব্যাপারে এ অপসংস্কৃতি বন্ধ করতে শিক্ষক, সাংবাদিক, চিন্তাবিদ, আলেম এবং সামাজিক কর্মীদের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য এগিয়ে আসতে হবে।



www.pathagar.com

# ইসলামের দৃষ্টিতে মানবাধিকার

মানবাধিকার মানব জাতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ের মধ্যে অন্যতম। মানবাধিকার মানুষের স্বভাবগত। অর্থাৎ মানুষের যে স্বভাব তার মধ্যেই মানবাধিকারের দাবিটি রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'কুল্লু মাউলুদিন আলাল ফিতরা'। এর অর্থ হলো, প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৃষ্টি করা হয়েছে একটি স্বভাবের উপর। সে স্বভাবের মধ্যে রয়েছে স্বাধীনতা। হযরত ওমর (রা.)-এর একটি অত্যন্ত বিখ্যাত বক্তব্য আছে যে, 'আল্লাহ্ তো তোমাদের সবাইকে স্বাধীন করে সৃষ্টি করেছিলেন, কে তোমাদেরকে গোলাম করলো?' এটি একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য।

আমরা মানবাধিকারের ইতিহাস পর্যালোচনায় গেলে দেখবো মদিনার সনদ বা মদিনার রাষ্ট্র গঠনের সময় ইহুদিদের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে চুক্তি করেছিলেন, যাকে বলা হচ্ছে 'মিসক আল মদিনা' বা 'মদিনার চুক্তি' – তার বিভিন্ন দিক রয়েছে। এটি হচ্ছে পৃথিবীর প্রথম লিখিত সংবিধান। তার আগে কোনো লিখিত সংবিধান কোনো রাষ্ট্রের ছিল কি না তা ইতিহাস থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় না। এ সংবিধানে বিভিন্ন দিকের কথা বলা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে রাষ্ট্র কেমন হবে, এর শাসক কে হবে। কিন্তু একই সঙ্গে এ সনদে বিভিন্ন গোষ্ঠীর কি অধিকার হবে তা-ও বলে দেয়া হয়েছিল। কাজেই এটি শুধুমাত্র একটি সাংবিধানিক ডকুমেন্টই নয়, এটি একটি মানবাধিকার ডকুমেন্টও। বিশ্বের ইতিহাসে মানবাধিকারের ডকুমেন্টের মধ্যে মদিনার সনদ একটি গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট। যদিও আমি আগেই বলেছি মানুষের স্বভাবের মধ্যে এটি আছে। কিন্তু ডকুমেন্ট হিসেবে যদি আমরা দেখতে চাই তাহলে মদিনার সনদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বোঝা যায়।

মানবাধিকার নিয়ে এরপর অনেক কাজ হয়েছে। সেখানে ফ্রিডম, লিবার্টি, ডেমোক্রেসির কথা বলা হয়েছে। এটি ইউরোপ সহ বিশ্বের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তাতেও মানুষের অধিকারের কথা আলোচিত হয়েছে। এভাবে একটি ঐতিহাসিক ডেভেলপমেন্ট আমরা মানবাধিকারের ইতিহাসে দেখতে পাই। কিন্তু তারপরেও কোনো একটি ডকুমেন্টে সব মানবাধিকার আনার কাজটি আগে হয়নি। এ কাজটি হয় ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদে, United Nations Declaration of Human Rights-এর মাধ্যমে।



www.pathagar.com

মানব ইতিহাসে বিভিন্ন ঘোষণায়, দলিলে বা বিভিন্ন লেখকের লেখায় এর আগে যেগুলোকে মানবাধিকার বলে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তা একত্র করে জাতিসংঘের সকল রাষ্ট্র একমত হয়ে এ ডকুমেন্ট প্রণয়ন করে। এদিক থেকে এটি গুরুত্বপূর্ণ যে, এতে মানবজাতির সকল রাষ্ট্রের স্বাধীন ইচ্ছার একটি প্রতিফলন ঘটেছিল – এটিকে অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু যেহেতু এ প্রশ্নটি ছিল এবং আছে যে, ইসলাম মানবাধিকার দিয়েছে কি না, দিলে কতটুকু দিয়েছে? মানবাধিকার সংক্রান্ত ইসলামের যেহেতু একটি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে এবং যেহেতু ইসলাম মূলত একটি নৈতিক শক্তি, সেজন্য তার একটি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। সে কারণে যখন ওআইসি হয় তখন এর নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করলেন যে তাদের একটি মানবাধিকার দলিল খাড়া করা দরকার। সে কাজটি শুরু হয় আশির দশকের প্রথম দিকে। দশ বছর ধরে কাজ হয়। তার জন্য সকল ইসলামি চিন্তাবিদ, আইনজ্ঞ, ফিকাহবিদদের একসঙ্গে যুক্ত করে ওআইসির ফিকাহ একাডেমি এ ডকুমেন্ট তৈরি করে। নানা পদ্ধতি, ঘাত, চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ১৯৯০ সালে কায়রোতে এ ডকুমেন্টটি পাস করা হয়। এটি একটি ঐতিহাসিক এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এখানে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

Article 1:

a. All human beings form one family whose members are united by submission to God and descent from Adam. All men are equal in terms of basic human dignity and basic obligations and responsibilities, without any discrimination on the grounds of race, color, language, sex, religious belief, political affiliation, social status or other considerations. True faith is the guarantee for enhancing such dignity along the path to human perfection.

b. All human beings are God's subjects, and the most loved by Him are those who are most useful to the rest of His subjects, and no one has superiority over another except on the basis of piety and good deeds.

অনুবাদ: ধারা-১

ক. আদম থেকে উদ্ভূত এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ সমগ্র মানবজাতি এক পরিবারের সদস্য। জাতি, গোত্র, বর্ণ, ভাষা, নারী-পুরুষ, ধর্ম বিশ্বাস, রাজনৈতিক মতবাদ, সামাজিক অবস্থান বা অন্য যে কোনো বিবেচনা নির্বিশেষে মূল মানবিক মর্যাদা এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যের দিক থেকে সকল মানুষ সমান। খাঁটি ঈমান ব্যক্তির মধ্যে মানবিক পূর্ণতা এনে দিয়ে এ মর্যাদা বৃদ্ধিকে গ্যারান্টি দেয়।



www.pathagar.com

খ. প্রতিটি মানুষ আল্লাহর অধীন। সেসব ব্যক্তিকে তিনি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন, যারা তার সমগ্র সৃষ্টিজগতের কল্যাণে নিয়োজিত এবং শুধুমাত্র খোদাভীতি (তাকওয়া) ও সৎকর্মের ভিত্তিতেই একজন মানুষ অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতে পারে।

এ ধারাতে মানবজাতি বা সকল মানুষের যে মৌলিক সমতা তা ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থাৎ লিঙ্গ, জাতি, রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতে ভেদাভেদ না করে মতবাদ নির্বিশেষে সকলেই যে আল্লাহতায়ালার অধীন বান্দা এবং তারা মানুষ হিসেবে সমান – এ কথাটিই তাতে বলা হয়েছে।

এ সনদের Article 2-তে মানুষের জীবনকে রক্ষার কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে:

ক. জীবন হলো খোদাপ্রদত্ত একটি উপহার এবং প্রত্যেক ব্যক্তিরই জীবন ধারণের সুনিশ্চিত অধিকার রয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তি, সমাজ এবং রাষ্ট্রের কর্তব্য – এ অধিকারকে যেকোনো প্রকার অবমাননা থেকে রক্ষা করা। শরিয়াহ নির্দেশিত কোনো কারণ ছাড়া কাউকে হত্যা করা হারাম বা নিষিদ্ধ।

খ. এমন কোনো কাজ করা বা উপায় অবলম্বন করা নিষিদ্ধ যা মানব জাতির ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

গ. স্রষ্টা কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে (Term of time willed by Allah) কারো জীবন রক্ষা করা শরিয়াহ নির্দেশিত একটি কর্তব্য।

ঘ. শারীরিক ক্ষতি বা নির্যাতন থেকে নিরাপত্তা পাবার অধিকার সবার জন্যই সুরক্ষিত। একে নিশ্চয়তা দান করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব এবং শরিয়াহ নির্দেশিত কোনো কারণ ছাড়া এ অধিকার লঙ্ঘন করা নিষিদ্ধ।

Article 3-এ বলা হয়েছে মানুষের বিরোধ মীমাংসার জন্য কোনো রকম সশস্ত্র সংঘাতে লিপ্ত হওয়া যাবে না। এ গোটা ডকুমেন্টই ইসলামি নীতির আলোকে প্রণীত হয়েছে। এ ধারায়ও বলা হয়েছে যুদ্ধ যদি শুরু হয়েই যায় তাহলে যারা যুদ্ধরত নয় তাদের হত্যা করা যাবে না। বৃদ্ধ, মহিলা, শিশুদের হত্যা করা যাবে না। আহত এবং অসুস্থদেরকে চিকিৎসা সেবা দিতে হবে। যুদ্ধবন্দীদেরকে খাওয়ানো, আশ্রয় দেয়া সহ সবকিছু করতে হবে। মৃতদেহকে অবমাননা করা যাবে না। যুদ্ধবন্দী বিনিময় করতে হবে। বন্দী অবস্থায় তাদেরকে দেখতে দিতে হবে। ফসল নষ্ট করা যাবে না, গাছ কাটা যাবে না, সাধারণ জনগণের ঘরবাড়ি ধ্বংস করা যাবে না।

মেয়েদের অধিকার সম্পর্কে Article 5-এ আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, পরিবার হলো সমাজের ফাউন্ডেশন। পরিবারকে বিয়ের মাধ্যমে গঠন করা হবে। এ ধারার মাধ্যমে লেসবিয়ানিজম, সমকামিতা,


www.pathagar.com

ছেলে-ছেলে, মেয়ে-মেয়ে বিয়ে অস্বীকার করা হয়েছে। এ ধারায় আরো বলা হয়েছে সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে বিবাহের পথে যত প্রতিবন্ধকতা আছে তা দূর করা এবং তাকে সহজ করে দেয়া। এগুলোতে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে। পরিবারকে তার সুরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে হবে। ধারাটি হলো:

Article 5

a. The family is the foundation of society and marriage is the basis of its formation. Men and women have the right to marriage and no restrictions stemming from race, color or nationality shall prevent them from enjoying this right.

b. Society and the state shall remove all obstacles to marriage and shall facilitate marital procedure. They shall ensure family protection and welfare.

নারীর অধিকার সম্পর্কে Article 6-এও সুন্দর করে বলা হয়েছে। ধারাটিতে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে:

অনুবাদ: ধারা ৬

ক. মর্যাদা এবং তা ভোগ করার অধিকারের পাশাপাশি কর্তব্য পালনের দিক থেকেও নারী-পুরষ সমান। নারীর রয়েছে স্বতন্ত্র সামাজিক সত্তা বা পরিচয় ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং তার নিজের নাম ও বংশ পরিচয় বজায় রাখার অধিকার।

খ. পরিবারের ভরণপোষণ ও সার্বিক কল্যাণের দায়-দায়িত্ব স্বামীর উপর বর্তাবে।

অন্য ধারা Article 7-এ পিতা-মাতা, শিশুদের অধিকারের কথা বলা হয়েছে। প্রতিটি মানুষের শিক্ষার অধিকারের কথা Article 9-এ বলা হয়েছে।

অনুবাদ: ধারা ৯

ক. জ্ঞানার্জন বাধ্যতামূলক এবং শিক্ষার সুব্যবস্থা করা সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্তব্য। রাষ্ট্র শিক্ষা অর্জনের সকল পদ্ধতিকে সহজলভ্য করবে এবং সমাজের স্বার্থে শিক্ষাকে বহুমুখী করার প্রতিশ্রুতি দিবে যেন তা মানবজাতির কল্যাণে মানুষকে ইসলাম ধর্ম ও সমগ্র বিশ্বের প্রকৃত অবস্থার সঙ্গে পরিচিত করে তোলে।

খ. বিভিন্ন শিক্ষা ও পথ নির্দেশনামূলক প্রতিষ্ঠান যেমন পরিবার, স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রচার মাধ্যম ইত্যাদি থেকে ধর্মীয় এবং দুনিয়াবী শিক্ষালাভের অধিকার প্রতিটি মানুষের রয়েছে। তার এ শিক্ষালাভের অধিকার এমন যে, তা ভারসাম্য ও সমগ্রতা পায় তার ব্যক্তিত্ব



www.pathagar.com

বিকাশে। স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস (ঈমান) দৃঢ়করণে, তার অধিকার ও কর্তব্য বা বাধ্যবাধকতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং এর সুরক্ষার ব্যাপারে এ শিক্ষা তার ভিতরে এনে দেয় উৎকর্ষ।

এ সনদের Article 11-এ বলা হয়েছে প্রতিটি মানুষ স্বাধীন সত্তা হিসেবে জন্মগ্রহণ করে। কাউকে দাস করা যাবে না, গোলাম করা যাবে না, সব ধরনের উপনিবেশবাদ নিষিদ্ধ। তেমনিভাবে অন্যান্য ধারায় মানুষের চলাফেরার স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে। সবারই কাজ করার অধিকার থাকার কথা বলা হয়েছে। সুদ নিষিদ্ধের কথা বলা হয়েছে। আইনসম্মতভাবে যে সম্পত্তির মালিকানা থাকবে তা ভোগের অধিকারের কথা Article 15-এ বলা হয়েছে। Article 17-এ পরিচ্ছন্ন পরিবেশে বসবাসের অধিকারের কথা বলা হয়েছে। Article 18-এ নিরাপত্তার সাথে বাস করার অধিকারের কথা আছে। Article 20-এ অন্যায়ভাবে কাউকে গ্রেফতার করা যাবে না বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কাউকে জিম্মি বা পণবন্দী না করার ব্যাপারে Article 21-এ উল্লেখ করা হয়েছে। তেমনিভাবে এখানে বলা হয়েছে সকলের তার মত প্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে যদি তা শরিয়তের নীতিমালার বিরোধী না হয়।

Article 22-এ বলা হয়েছে দায়িত্ব বা ক্ষমতা আমানত মাত্র। Article 24-এ বলা হয়েছে, এ সনদের আলোকে যা কিছু দেয়া হয়েছে এগুলো ইসলামি শরিয়তের আওতায় হবে (All the rights and freedoms stipulated in this Declaration are subject to the Islamic Shariah.)। যদি কোনো কিছুর ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় তাহলে সেটি ইসলামি শরিয়াহ্ থেকে নিতে হবে। এ কথা সর্বশেষ Article 25-এ বলা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, The Islamic Shariah is the only source of reference for the explanation or clarification of any of the articles of this Declaration.

মুসলিম বিশ্বের জন্য এ ডকুমেন্টটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় এ দলিলটি যতটা প্রচার হওয়ার দরকার ছিল আমাদের সরকারসমূহের ব্যর্থতার জন্য, এনজিওগুলোর ব্যর্থতার জন্য বা লেখকদের ব্যর্থতার জন্য এটি সেভাবে ছড়ায়নি। আশা করি ভবিষ্যতের জন্য এটি ব্যাপকভাবে ছড়াবে। ইসলামের আলোকে সর্বসম্মত মানবাধিকার ঘোষণার এ অত্যন্ত মূল্যবান দলিলের মাধ্যমে আমাদের জাতি-সমাজ গড়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে।



www.pathagar.com

# টিভি কম দেখুন ঃ সময়কে কাজে লাগান

টেলিভিশন আধুনিক সভ্যতার একটি বড় অবদান। আজকে এর ফলে বিশ্বব্যাপী জ্ঞানের বিকাশ হয়েছে, যোগাযোগ বৃদ্ধি হয়েছে। মানুষের পরস্পরের জানাজানির সুযোগ-সুবিধা বেড়েছে। এ সবই বিজ্ঞানের অবদান।

বিজ্ঞানের এ যুগে আমাদের অবশ্যই টেলিভিশনের পজেটিভ দিকটি দেখতে হবে। টেলিভিশন আবিষ্কারের পর থেকে ৬০/৭০ বছর পার হয়ে গেছে। ভালো-মন্দ, সুবিধা-অসুবিধার দিকসহ এর সামগ্রিক প্রভাব আজ আমাদের কাছে স্পষ্ট। বর্তমানে আমরা এমন এক পর্যায়ে এসে পৌছেছি যে, টেলিভিশনের খারাপ দিকগুলো রিভিউ করে দেখার প্রয়োজন। আমি ইংল্যান্ড এবং আমেরিকায় দেখেছি অনেক বাড়িতে টিভি রাখা হয় না। এ মানসিকতাসম্পন্ন লোক সেখানে আছে। তবে অন্যান্য দেশের কথা আমি ঠিক বলতে পারবো না।

বছর তিনেক আগে আমার এক ছাত্র আমাকে একটি বই দেয়। বইটির নাম ছিল Four Arguments for the Elimination of Television, লেখক Jerry Mender। বইটি আমেরিকা থেকে প্রকাশিত হয়। সেখানে টেলিভিশনের ক্ষতিকর ছয়টি দিক তুলে ধরে বলা হয়েছে, এ ছয়টি কারণের জন্য টিভি বন্ধ করে দেয়া উচিত। এছাড়াও ব্যক্তি পর্যায় থেকে শুরু করে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন মাধ্যমে টেলিভিশনের ক্ষতিকর দিকগুলো আমাদের সামনে বিভিন্ন সময় তুলে ধরা হয়। এসব কী প্রমাণ করে? এসব প্রমাণ করে যে টিভির ব্যবহার বা টিভির কল্যাণকামিতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে। তবে সে প্রশ্ন কতোটুকু সঠিক আর কতোটুকু সঠিক নয়, আমি সে সামগ্রিক আলোচনায় যাচ্ছি না। কিন্তু সে প্রশ্ন উঠেছে আর তা উঠেছে পাশ্চাত্য দেশগুলোতেই। এরকম বই আমাদের দেশেও লেখা হয়নি।

আমাদের দেশে সরকারি, বেসরকারি টিভি চ্যানেলের পাশাপাশি স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলো উন্মুক্ত। এসব চ্যানেলগুলোর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতম প্রধান দিকটি হলো খবর। এরপরই দেখা যায় নাচ, গান আর সিনেমা। এ নাচ, গান, সিনেমাই টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর ৫০ থেকে ৬০ ভাগ সময় জুড়ে রয়েছে। সেখানে খেলাধুলার প্রোগ্রাম রয়েছে। তবে খেলাধুলার জন্য



www.pathagar.com

কয়েকটি চ্যানেলই আছে। ২৪ ঘণ্টাই খেলাধুলা সংক্রান্ত অনুষ্ঠান সেখানে দেখানো হচ্ছে। আবার কার্টুন চ্যানেলও আছে। কিন্তু সমাজে এর প্রভাব কিভাবে পড়ছে? বাস্তবে এটিকে কিভাবে দেখা হচ্ছে আর বাস্তবে মানুষের সময় কিভাবে ব্যয় হচ্ছে? সার্বিকভাবে আমরা দেখতে পাই শিশু-কিশোর থেকে যুবক শ্রেণি পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অনেকেরই ৬/৭ ঘণ্টাই টেলিভিশনের পিছনে ব্যয় হয়ে যাচ্ছে। ছেলেরা স্পোর্টস এডিকশনের বা নেশার ফলে ৫/৬ ঘণ্টাই খেলা দেখার জন্য ব্যয় করছে। এটি অনেকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এতে তাদের অন্যান্য কাজের ব্যাঘাত হচ্ছে, লেখাপড়ার ক্ষতি হচ্ছে। তেমনি বাচ্চারা কার্টুন নিয়ে প্রায়ই ব্যস্ত থাকে। রাতে বা সকালে লেখাপড়ার মূল সময়টাতেও অনেকেই কার্টুন দেখে কাটায়। আবার কার্টুনের সব যে ভালো তা-ও আমি বলবো না। সেখানেও মারামারি আছে, অস্ত্র চালানোর ব্যাপার আছে। সেসব দেখে বাচ্চাদের একটু বয়স হলে তাদের মনে প্রশ্ন জাগে আমার বন্দুক কোথায়? একজন যদি তার দিনের ৪ বা ৫ ঘণ্টা টেলিভিশনের পিছনে ব্যয় করে তাহলে অবস্থা কেমন দাঁড়ায়?

তুলনামূলকভাবে ভালো প্রোগ্রাম হলেও সেখানে ৪/৫ ঘণ্টা ব্যয়ের প্রশ্ন চলে আসে। আমাকে বিভিন্ন ব্যক্তি টিভির সিরিয়াল প্রোগ্রামের কথা বলেছে। সেগুলো কতোটুকু ভালো, কতোটুকু কল্যাণকর আর জ্ঞানের, আমি সে বিষয়ের দিকে যাবো না। এ সিরিয়াল, মেগা সিরিয়াল প্রোগ্রামের একটি প্রভাব হলো এর ফলে মহিলারা এ প্রোগ্রাম দেখতে যেয়ে প্রতিবেশীর সাথে দেখা-সাক্ষাতের সময় বের করতে পারে না। আগে মহিলারা যেভাবে এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়িতে যেতেন, পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা করতেন, পাশের বাড়ি যেতেন – সেটি কমে এসেছে এবং তারা সম্পূর্ণরূপে ঘরমুখী হয়ে যাচ্ছেন। তাদের মাথায় থাকছে কোন সময় কোন প্রোগ্রাম শুরু হবে আর কোনটা দেখতে হবে। এর ফলে দেখা গেছে আমাদের সামাজিকতা পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে। এতে আমাদের পারস্পরিক সহানুভূতি, কল্যাণকামিতা, খোঁজখবর নেয়া ক্রমেই কমে যাচ্ছে।

এ স্পোর্টস, কার্টুন, নাচগান, সিনেমা কিংবা সিরিয়াল, মেগাসিরিয়াল প্রোগ্রামের মাধ্যমে মানুষের যে খুব একটি মানসিক উন্নয়ন হয় কিংবা অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয় তা বলা যায় না। এর সার্বিক প্রভাব নৈতিকও নয়, কল্যাণকরও নয়। কিছু কিছু ভালো প্রোগ্রাম আছে। এ বিষয়ে তর্ক হতে পারে। কিন্তু সার্বিক প্রভাব কল্যাণকর তা বলা মুশকিল।

টেলিভিশন প্রসঙ্গে আমি এখানে যে বিষয়টি জাতির সামনে তুলে ধরতে চাই তা হচ্ছে সময় অপচয় প্রসঙ্গ। টেলিভিশন প্রোগ্রামের মধ্যে কতোটা আদর্শ, নৈতিকতা আছে আর কতোটা নেই এসব আলোচনা বর্তমান নিবন্ধের মূল বিষয় নয়। এখানে মূল বিষয় হচ্ছে যে, এতে কতোটা সময় যাচ্ছে। আমরা ইতোমধ্যেই লক্ষ্য করেছি ছেলেমেয়ে, বাচ্চা, গৃহিণী আর ছাত্রদের কী পরিমাণ



www.pathagar.com

সময় টেলিভিশনের বিভিন্ন প্রোগ্রামের পিছনে যায়। আমরা এ-ও লক্ষ্য করলাম যে, এই সময় দিনে ১ ঘণ্টা নয়, বরং গড়ে ৪ থেকে ৫ ঘণ্টা যাচ্ছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ৭/৮ ঘণ্টাও যাচ্ছে। এ পরিস্থিতি জাতির জন্য ভয়াবহ ক্ষতিকর। একটি স্টাডিতে দেখা গেছে যে, একজন মানুষের ৫০/৬০ বছরের জীবনের ১২ বছর সময়ই ব্যয় হয়েছে শুধু টিভির পিছনে। একটি জীবনের যদি এ ১২ বছরই টিভির পিছনে যায় তাহলে তার অবস্থা আমরা কল্পনা করতে পারি! Dr. Hisham al-Talib তার Training Guide for Islamic Workers বইতে এ হিসাবের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এর সমাধান কি? আমার মনে হয় এর জন্য একটি আন্দোলন দরকার। এ আন্দোলন সরকারি, বেসরকারি, ব্যক্তিগত, সামাজিক – সকল পর্যায় থেকেই করতে হবে। সে আন্দোলনের শ্লোগান হবে – আমরা টিভি কম দেখবো। এখানে আমরা টিভি দেখবো না বা টিভি ব্যান্ড করে দিতে হবে তা বলছি না। এখানে আমরা শুধু বলছি, টিভি দেখার সময় আমাদের কমাতে হবে। যে যার পছন্দ অনুযায়ী টিভি প্রোগ্রাম বেছে নিতে পারে কিন্তু এজন্য সারাদিনই তাকে টিভি দেখতে হবে এর কোনো যৌক্তিকতা নেই। যে খবর দেখতে চায় দেখবে। কেউ তার নিজের সবচেয়ে বেশি পছন্দের অনুষ্ঠান বেছে নিয়ে যদি শুধু সেটিই সীমিত সময় দেখে তাহলেও তার অনেক সময় বেঁচে যায়। দিনে ১/২ বার খবর সহ সপ্তাহে কিছু ভালো অনুষ্ঠান কিংবা শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান, কার্টুন ছবি ইত্যাদি দেখলো। তবে আমাদেরকে টিভি দেখার সময় অবশ্য অবশ্যই কমিয়ে আনতে হবে যদি আমরা জাতিকে গঠন করতে চাই। জাতির সবচেয়ে বড় সম্পদ হচ্ছে সময়। সময় হচ্ছে জীবন। জীবনই হচ্ছে সময়। সময়ই যদি আমরা অপচয় করে দিই তাহলে কি করে আমাদের উন্নতি সম্ভব হবে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক কোনো উন্নয়নই সময়ের সদ্ব্যবহার ছাড়া সম্ভব নয়। তাই আমাদের নতুন শ্লোগান হওয়া উচিত – আমরা টেলিভিশন কম দেখবো এবং আমরা সময়কে কাজে লাগাবো। এর ফলে যে বিশাল সময় বেঁচে যাবে তা আমরা ভালো কাজে ব্যবহার করতে পারি। যেমন আমরা আমাদের ছাত্রজীবনের সময়গুলোতে বিভিন্ন লিটারেচার পড়তাম। নজরুল, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র সহ বিভিন্ন রকম সাহিত্য পড়তাম। আজকের দিনে সেগুলো পড়ার সংখ্যা খুবই কমে গেছে। এটি যে কতো বড় ক্ষতি তা আমরা একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবো।

সাহিত্য না পড়ার জন্যও সময়কে অনেক ক্ষেত্রে দায়ী করা হয়। সাহিত্য হচ্ছে মানুষের জীবনের দর্পণ – এটি একটি দিক। অন্যদিক হচ্ছে সাহিত্য মানুষকে মহৎ করে। যারা ওয়ার্ল্ড ক্ল্যাসিক পড়বে, টলস্টয়, ম্যাক্সিম গোর্কি, পার্ল বাক আর রবীন্দ্রনাথের হোক বা আল্লামা ইকবালের হোক, নজরুলের হোক – তারাই জীবনে মহৎ হবে। এদের দ্বারা মানবতা কল্যাণ পাবে। অথচ আজকে সেরকম লোক তৈরি হওয়ার রাস্তা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এর কারণ হলো বেশির ভাগ লোক আজকে সাহিত্য পড়ছে না। যখন একজন ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছে



www.pathagar.com

সেখানে সে প্রফেশনাল শিক্ষাই পাচ্ছে। সেখানেও সাহিত্যের গুরুত্ব কম। বাংলা পড়লে আমরা নাক সিটকাচ্ছি। কোনো কোনো ইউনিভার্সিটি বলছে এগুলো পড়ার দরকার কি? আমাদের সে শিক্ষা দরকার যা আমাদের ইন্ডাস্ট্রির জন্য কাজে লাগবে, যা আমাদের কমিউনিকেশনের কাজে লাগবে, যা আমাদের কনস্ট্রাকশনের কাজে লাগবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর দ্বারা মানুষ রোবট তৈরি হবে – মানুষ তৈরি হবে না। আমরা এ জিনিসটি ভুলে যাচ্ছি।

এ পরিস্থিতিতে আমার মনে হচ্ছে, আমাদের একটি আত্মনিয়ন্ত্রণ দরকার। আমাদের সময় বাঁচাতে হবে। আমরা সময় বাঁচাবো, সময়কে মানবতার কাজে লাগাবো, মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করবো। জাতির কল্যাণে, জাতি গঠনে ব্যবহার করবো। এ সময়কে আমরা ফ্যামিলির ডেভেলপমেন্টের কাজে ব্যবহার করবো, নিজের আত্মগঠনে ব্যবহার করবো, আত্মীয়-স্বজন-প্রতিবেশীর জন্য ব্যবহার করবো।

নিজেরা নিজেদের সময়কে বাঁচাবো। আমরা কতক্ষণ টিভি দেখবো তা সরকার নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। কিন্তু সরকার চাইলে খারাপ চ্যানেলগুলো যতদিন পর্যন্ত সম্ভব ততদিন তারা সেসব নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এ উদ্যোগ অবশ্যই সরকারকে নেয়া উচিত। বছরখানেক আগে সরকার কিছু চ্যানেল বন্ধ করে ভালোই করেছিল যদিও তা পুরোপুরি কার্যকর করতে পারেনি। সরকারকে অবশ্যই এসব খারাপ চ্যানেলগুলোর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে হবে।

সবশেষে গোটা জাতির কাছে বলতে চাই, সকলেই এ বিষয়টি ভেবে দেখবেন এবং প্রত্যেকেই তার নিজের ফ্যামিলিতে টিভি ব্যবহারের ওপর নিয়ন্ত্রণ আনার চেষ্টা করবেন। এ ব্যাপারে ফ্যামিলিতে মায়েদের বিশেষ ভূমিকা রাখতে হবে। তারা নিজেরাই যদি বেশি করে টিভি দেখেন তাহলে বাচ্চাদের আটকানো সম্ভব হবে না। আমি মনে করি, এ বিষয়টি সকলেই বিশেষভাবে বিবেচনা করে দেখবেন। পত্রিকাগুলো এ ব্যাপারে ভূমিকা রাখতে পারে। এটি একটি জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হতে পারে। এতে আমাদেরই কল্যাণ হবে। আমার মতে, 'আমরা টিভি কম দেখবো ঃ সময়কে কাজে লাগাবো' - এ শ্লোগান জাতিকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে।

২ ডিসেম্বর ২০০৩



www.pathagar.com

# টিভি চ্যানেল কর্তৃপক্ষের নিকট কিছু প্রস্তাব

আমাদের দেশে আগে মাত্র একটি টিভি চ্যানেলই ছিল। সেটি বাংলাদেশ টেলিভিশন বা বিটিভি। বিটিভিতে আশির দশকের দিকে দু'বেলা অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু হয়েও পরবর্তীতে বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘদিন পর এখন আবার দু'বেলা অনুষ্ঠান হচ্ছে। নব্বইয়ের মাঝামাঝি সময় থেকে দু'টি প্রাইভেট টিভি চ্যানেলকে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে অনুষ্ঠান করার অনুমতি দেয়া হয়। একটি হচ্ছে এটিএন এবং অন্যটি চ্যানেল আই। আরো পরে বেসরকারি টিভি চ্যানেল হিসেবে ইটিভিকে টেরেসট্রিয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠান সম্প্রচারের অনুমতি দেয়া হয়। এটিএন এবং চ্যানেল আইয়ের টেরেসট্রিয়াল সুবিধা ছিল না। কিন্তু ইটিভির এ সুবিধা থাকায় তাদের সারাদেশে ব্যাপক গ্রাহক হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে মামলা হয় ও আদালতের রায়ের প্রেক্ষিতে তাদের টেরেসট্রিয়াল সম্প্রচার বন্ধ হয়ে যায়।

যাহোক, আমি সত্যিকার অর্থে খুব বেশি টিভি দেখি না। কিন্তু সমাজ সম্পর্কে অবহিত থাকার জন্য এবং সমাজে কী হচ্ছে তা বোঝার জন্য, জানার জন্য, যতটুকু দেখার দরকার বা না দেখলে সমাজে কী হচ্ছে বা টিভি চ্যানেলসমূহে কী হচ্ছে তা বোঝা যাবে না – ততটুকুই দেখি। এরই ভিত্তিতে টিভি চ্যানেলগুলোর মালিক এবং পরিচালকদের কতগুলো বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সে সাথে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এগুলো বাংলাদেশ টেলিভিশনকেও আমি বিবেচনা করতে অনুরোধ করছি।

প্রথমত, আমি লক্ষ্য করলাম, ১৪ ফেব্রুয়ারির আগের কয়েকদিন পাশ্চাত্যে যেটি ভ্যালেন্টাইন ডে হিসেবে পালিত বিটিভি তা বেশ গুরুত্বের সাথে তুলে ধরে। এখানে আমার প্রশ্ন, ভ্যালেন্টাইন ডে বা ভালোবাসা দিবস সম্পর্কে কয়েক বছর আগেও আমাদের দেশের মানুষ জানতো না এবং যার ইতিহাস খুব ভালো কিছু নয় – সেটিকে আমাদের দেশে পপুলার করার দরকার আছে কি না বা আমরা পপুলার করবো কি না? কিংবা প্রাইভেট চ্যানেলগুলোর এ ব্যাপারে কোনো বাধ্যবাধকতা আছে কি না? ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখবো, এটি খ্রিস্টের জন্মের প্রায় পাঁচশ' বছর আগে প্যাগান বা প্রকৃতি পূজকদের অনুষ্ঠান ছিল। সেখানকার মূল বিষয়টি ছিল, একটি লটারি হতো এবং আগামী বছর লটারি না হওয়া পর্যন্ত যুবতীদেরকে যুবকদের মাঝে লটারি করে বণ্টন করা



www.pathagar.com

হতো। আরো দেখা যায়, তারা নানারকম পশুর চামড়া দিয়ে তৈরি স্বল্পবসনা মেয়েদের প্রহার করতো এবং মনে করা হতো এ প্রহারের ফলে তাদের ভালো সন্তান হবে। এর মানে হলো অশ্লীলতা তো ছিলই এবং সে সাথে ছিল কুসংস্কার।

খ্রিস্টধর্মের আবির্ভাবের পরে এ দিবসটিকে সংস্কার করার চেষ্টা করা হলো। কিন্তু ইতিহাস থেকে দেখা যায় সংস্কারের প্রচেষ্টা খুব একটি ফলপ্রসূ হলো না। শুধু আগের নাম পাল্টিয়ে ভ্যালেন্টাইন ডে করা হলো এবং তারা চেষ্টা করলো এটিকে একটি যাজক বা সেইন্টের নামে করা, যার লক্ষ্য হবে লটারিতে যার নাম উঠবে সে ওই যাজকের মতো ভালো হবে, ভালো জীবনযাপন করবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নামের পরিবর্তন ছাড়া আর কোনো পরিবর্তনই সাধিত হলো না এবং সেটি পূর্বের মতোই রয়ে গেলো।

প্রকৃতপক্ষে ভ্যালেন্টাইন ডের ইতিহাস এরকমই। এখানে ভ্যালেন্টাইন সম্পর্কে বুঝতে সুবিধার জন্য লন্ডনের মাসিক ইমপ্যাক্ট ইন্টারন্যাশনালের কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি:

> কথিত আছে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে উর্বরতা ও পশুর দেবতা বলে খ্যাত লুপারকাসের (Lupercus) সম্মানে পৌত্তলিক রীতিনীতির একটি অংশ হিসেবে রোমানরা ভ্যালেন্টাইন ডে উদযাপন শুরু করে। এর মূল আকর্ষণ হলো পরবর্তী বছরের লটারির আগে পর্যন্ত বর্তমান বছরের লটারির মাধ্যমে যুবকদের মাঝে যুবতীদের বণ্টন করে দেয়া। এ দিন উদযাপনের অন্যান্য ঘৃণ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে একটি ছিল, এক টুকরো ছাগলের চামড়ায় আবৃত যুবতীদের দু'জন যুবক কর্তৃক উৎসর্গকৃত ছাগল ও কুকুরের রক্তে ভেজা চাবুক দিয়ে প্রহার করা। মনে করা হতো 'পবিত্র যুবক'দের প্রতিটি 'পবিত্র' আঘাত দ্বারা ঐসব যুবতী ভালোভাবে সন্তান ধারণে সক্ষম হবে।
>
> খ্রিস্টান সম্প্রদায় যথারীতি লুপারকালিয়ার (Lupercalia) এ ঘৃণ্য রীতিকে বন্ধ করার চেষ্টা করলো। ... কিন্তু খ্রিস্টানরা খুব কম স্থানেই এ কাজে সফল হলো। একটি জনপ্রিয় খারাপ কাজকে কিছু পরিবর্তন করে তাকে ভালো কাজে লাগাবার প্রবণতা বহু পুরাতন। তাই খ্রিস্টানরা শুধুমাত্র লুপারকালিয়া থেকে এ উৎসবের নাম সেইন্ট ভ্যালেন্টাইন করতে পারলো। পোপ গ্যালাসিয়াস (Gallasius) ৪৯৬ খ্রিস্টাব্দে সেইন্ট ভ্যালেন্টাইনের সম্মানে এটি করলো। তথাপি খ্রিস্টান কিংবদন্তীতে পঞ্চাশেরও বেশি বিভিন্ন রকম ভ্যালেন্টাইন আছে। ... একটি কিংবদন্তী, যেটি প্রকৃত ভ্যালেন্টাইন দিবসের সাথে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ তা হলো, সেইন্ট ভ্যালেন্টাইন হলেন 'প্রেমিকদের যাজক' যে নিজেকে কারাগারের প্রধানের মেয়ের প্রেমে জড়িয়ে ফেলে। (Impact International, London, March 2011)।



www.pathagar.com

এ যার ইতিহাস, যার মধ্যে রয়েছে কুসংস্কার এবং অশ্লীলতা, সে রকম একটি জিনিসকে কেন আমাদের সমাজে আমদানী করতে হবে। আমাদের দেশে দিবসের তো অভাব নেই। আমাদের ঈদের মতো উৎসব রয়েছে। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের নিজেদের ধর্মীয় উৎসব রয়েছে। আমাদের বড় বড় মনীষীদের জন্ম-মৃত্যু দিবস রয়েছে। আরো অনেক দিবস থাকতেও সেখানে এ রকম একটি কুসংস্কার ও অশ্লীলতাকে আমাদের এখানে আনার কী যৌক্তিকতা থাকতে পারে? এ দিবসের গভীরে আরেকটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, এটি মূলত ব্যবসায়ীদের মার্কেটিং কৌশলে পরিণত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে ফুল, কার্ড, পোশাক-পরিচ্ছদ আর নানারকম উপহারসামগ্রী বেচাকেনা হবে। এর সাথে মানুষের তেমন কি স্বার্থ রয়েছে এবং কোন যুক্তিতে এমন একটি দিবসকে, যার পরিচয় উপরে দেয়া হলো, আমরা পপুলার করবো।

আমি চ্যানেল মালিকদের নিকট অনুরোধ করি, ভবিষ্যতে আপনারা ভ্যালেন্টাইনকে পপুলার করবেন না। এবার ২০০৪ সালের হিসেবেও সারা দেশের ১৪ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে হয়তো কেবল ঢাকা শহরেই কয়েক হাজার লোক এ দিবস পালন করেছে। গ্রামের এবং দেশের অধিকাংশ মানুষ এটি জানেই না। তাই এটিকে কেন ব্যাপক করবেন? এতে তো আপনাদেরও বিজ্ঞাপন তেমন বাড়বে না। আর যদি এক-দু'টি বেড়েই থাকে তাহলে সেটি কি এতোই মূল্যবান যার জন্য আমাদের জাতীয় কালচারে একটি পরিবর্তন আনতে হবে? এটি বিবেচনা করে দেখতে হবে। আগামী বছরের জন্য এখন থেকে এটি পরিকল্পনায় আনতে হবে। এটিকে আপনাদের পরিকল্পনা থেকে বাদ দিতে পারেন। আমার জানা আছে দু'-একজন ব্যক্তি এবং সাপ্তাহিক গত তিন-চার বছর ধরে একে পপুলার করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু এ ফাঁদে পড়ার তো কোনো প্রয়োজন নেই। তাদের এ চেষ্টা বা অপচেষ্টায় আপনারা কেন শরিক হবেন?

দ্বিতীয়ত, আমি বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বিজ্ঞাপন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। বিজ্ঞাপন ছাড়া সরকারি টিভিও বাণিজ্যিকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। তাই সবারই বিজ্ঞাপন দরকার। লাভজনকভাবে চালাতে গেলেও দরকার। কিন্তু গত এক বছর ধরে আমি বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে প্রচারিত বিজ্ঞাপনে দেখেছি, টিভি চ্যানেলগুলো ক্রমাগতভাবে আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাতে সংগতিহীন হয়ে পড়ছে। একান্তই পুরুষদের ব্যবহৃত পণ্যের বিজ্ঞাপনে নারীদের অযৌক্তিকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। বিজ্ঞাপনে পুরুষের চেয়ে নারীদের উপস্থিতি অনেক বেশি। আমি ব্যক্তিগতভাবে ধূমপান নিষিদ্ধ করার পক্ষপাতী। একজন মানুষের বেঁচে থাকার জন্য এর ন্যূনতম প্রয়োজন নেই। কিন্তু টিভি চ্যানেলগুলোতে সিগারেটের যে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয় তা অনেক সময় কুরুচিপূর্ণ। আর সিগারেটের বিজ্ঞাপনেও নারী মডেলের অপ্রয়োজনীয় উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। সিগারেটের বিজ্ঞাপনে স্বামী বা বন্ধুর সিগারেট খাওয়ায় সহযোগিতা বা উৎসাহ নারীকে কেন



www.pathagar.com

করতে হবে? কাজেই সকল বিজ্ঞাপনে নারীর ব্যবহার কতোটুকু যুক্তিযুক্ত এবং উদ্দেশ্যমূলক সে প্রশ্ন উঠতেই পারে।

বিজ্ঞাপনে আমরা আমাদের কালচার থেকে সরে যাচ্ছি। বেশিরভাগ বিজ্ঞাপন চিত্রেই দেখা যায় নারীদের শরীরে ওড়না নেই। নারীর শরীর প্রকটভাবে তুলে ধরার লক্ষ্যে হিন্দি সিনেমার মতো হঠাৎ বৃষ্টিতে মডেলদের ভেজানো হয়। দেখা যায় বিজ্ঞাপন চিত্রে নারী মডেল প্রায়ই ওড়না উড়িয়ে দিচ্ছেন। এসব এক ধরনের অশ্লীলতা এবং আমাদের সামাজিক রীতির বিরোধী। অপ্রয়োজনীয়ভাবে নারী মডেলের ওড়না উড়িয়ে না দিলে কিংবা তাকে বৃষ্টিতে না ভেজালে কি সে পণ্যটি কেউ কিনবে না? অনেক মডেল আবার ওড়না একপাশে ঝুলিয়ে রাখে। আবার অনেক মেয়ে ওড়না গলায় পেঁচিয়ে রাখে। দুঃখজনক হলো শুধু বিজ্ঞাপনেই নয়, অনুষ্ঠান উপস্থাপনায়ও অনেক মেয়ে এ নেতিবাচক স্টাইলটি গ্রহণ করেছে। এটি প্রকৃতপক্ষে আমাদের ঐতিহ্যবিরোধী। তাহলে আমাদের জাতির ঐতিহ্যবিরোধী এসব অশ্লীল এবং বিকৃত কালচার ছড়িয়ে দেয়ার প্রয়োজন কি? আমরা তো মনে করি এদেশের শতকরা নিরানব্বই জন লোকই জাতির ভালো ঐতিহ্য থেকে সরে যেতে চায় না।

বিজ্ঞাপনে এও দেখা যায়, কোনো একটি নির্দিষ্ট ত্বকের ক্রিমের গুণে মাত্র অল্প দিনেই কালো মেয়ে ফর্সা হয়ে যায় এবং ফর্সার গুণে চাকরি হয়। এটি কতটুকু বাস্তবসম্মত? কালো মেয়েদের কি চাকরি হয় না? আবার একটি কনডেন্সড মিল্কের বিজ্ঞাপনে মেয়েদের কৌশলে বিকৃত উপস্থাপনও লক্ষ্য করা যায়। বিজ্ঞাপনে মেয়েদের শার্ট-প্যান্ট পড়াই শুধু নয় সেটি আরো অতিক্রম করে শার্ট-প্যান্টের সাথে ওড়নাবিহীন অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। আসলে প্রচার অশ্লীল কিংবা সৌজন্যতা ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধহীন হলেই পণ্য বেশি বিক্রি হয় না। প্রকৃতপক্ষে পণ্যের প্রচারের জন্য অশ্লীলতার প্রয়োজন নেই। কিন্তু বিজ্ঞাপন নির্মাতারা আমাদের রুচিবোধকে তোয়াক্কা করছে না। শুধু নির্দিষ্ট একটি সাবান ব্যবহারে স্টার বনে যাওয়ার মতো অবাস্তবতাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

আমি টিভি চ্যানেলগুলোকে বলতে চাই আপনারা প্রতিযোগিতায় আছেন ঠিকই, কিন্তু আপনাদের কতগুলো কমন স্বার্থ আছে। এ কমন স্বার্থের জন্য আপনারা একটি নীতিমালা ঠিক করেন যে আপনারা এসব সীমা বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে অতিক্রম করবেন না। তাহলে কেউই তার ফলে অপ্রয়োজনীয় সুবিধা নিতে পারবেন না। এজন্য আমি মনে করি টিভি চ্যানেলসমূহের একটি সমিতি হওয়া দরকার। সেখান থেকেই আপনারা আপনাদের স্বার্থের জন্য কাজ করতে পারবেন। তখন, যারা বিজ্ঞাপন দাতা তাদেরও অহেতুক চাপের সম্মুখীন আপনারা হবেন না। কেননা আপনাদের তো একটি নীতিমালা থাকবে। আপনাদের নীতিমালার কতগুলো বিষয় থাকবে। যেমন সিগারেট বা কোনো মাদকের বিজ্ঞাপন প্রচার করবেন না। তেমনিভাবে অশ্লীলতার ব্যাপারে কোনো



www.pathagar.com

প্রকার ছাড় দেবেন না। পোশাকের ক্ষেত্রে আমাদের যে ঐতিহ্য সে ঐতিহ্য খুবই ভালো – সে ঐতিহ্যকে কখনোই বাদ দিবেন না। ওড়নাকে বাদ দেয়া বিজ্ঞাপন অনুমোদন করবেন না।

আমাদের দেশে শালীনতার যে ধারণা তাতেও দেখা যায় বিজ্ঞাপনে যারা ওড়না ছেড়ে দিচ্ছে তারা কিন্তু ঘরে ওড়না পড়ছে। সুতরাং এমন করার কি দরকার আছে যা তারা নিজেরাই মেনে চলতে পারছে না। পারিবারিক গণ্ডির বাইরে শুধুমাত্র বিজ্ঞাপনের প্রয়োজনে ওড়না ছেড়ে দেয়া বা এ ধরনের পোশাকের ক্ষেত্রে ছাড় দেয়ার কি প্রয়োজন?

উপস্থাপনার ব্যাপারে একটি কথা বলতে চাই। এটি বিশেষ করে উপস্থাপিকাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আমাদের উপস্থাপিকারা অনেক যোগ্য এতে সন্দেহ নেই। তারা সুন্দর উপস্থাপনা করেন এতেও কোনো বক্তব্য নেই। কিন্তু আমি বারবার লক্ষ্য করেছি উপস্থাপিকারা ওড়না ছেড়ে অনেক অনুষ্ঠান উপস্থাপন করছেন। এটি টিভি প্রোগ্রামে গ্রহণ করার দরকার কি? এগুলো শুধু যে ঐতিহ্যবিরোধী তা নয়, এটি ভবিষ্যতে আমাদের ঐতিহ্যেরও ক্ষতি করতে পারে এবং এটি আমাদের পোশাকের মধ্যে অশ্লীলতা আনতে পারে। এতে সাধারণ ছেলেমেয়েরাও প্রভাবিত হবে। এসব দিকে আপনাদের দায়িত্ব রয়েছে। জাতীয় কালচারের কোনো প্রকার ক্ষতি, এমনকি ধর্মের, ধর্মীয় ঐতিহ্যের কোনো ক্ষতি না হয় – এ ব্যাপারে কি আপনাদের কোনো দায়িত্ব নেই?

প্রত্যেকটি চ্যানেলেই তো আজ ইসলামি ঐতিহ্যকে গুরুত্বের সাথে প্রচার করা হচ্ছে। এটি তো প্রচারিত হচ্ছে আপনাদের বিশ্বাস আর ভালোবাসার কারণে। এ বিশ্বাস আর ভালোবাসার দাবি, আপনাদের চ্যানেলে ইসলামবিরোধী অনুষ্ঠান বা বিষয় রাখবেন না। এটি করা সম্ভব। তাই এটি আপনাদের বিবেচনা করতে অনুরোধ করি। আশা করি টিভি চ্যানেল কর্তৃপক্ষ আমার প্রস্তাবগুলো বিবেচনা করে দেখবেন।

১৩ মে ২০০৪



www.pathagar.com

# ঐক্য ও নেতৃত্বে জামাল উদ্দীন আফগানী

সাইয়িদ জামাল উদ্দীন আফগানী গত দু'শ বছরে সারা মুসলিম বিশ্বে, ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর যে কয়জন মহান মুসলিম মনীষী জন্ম নিয়েছিলেন তাদের মধ্যে একজন। আরো স্পষ্ট করে বলা যায় প্রথম চার-পাঁচ জনের মধ্যে একজন।

তার রাজনৈতিক জীবন, তার কর্ম সম্পর্কে না জানলে কেউ বুঝতেই পারবে না যে তিনি কত বড় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ১৮৩৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইন্তেকাল করেন ১৮৯৭ সালে মাত্র ৫৮ বছর বয়সে। এর মধ্যে তিনি এমন অসাধারণ সব কাজ করেন যা ভাবাই যায় না।

জামাল উদ্দীন আফগানীর কাজ বুঝতে হলে সে সময়কে বোঝা দরকার। তিনি এমন এক সময়ে জন্মগ্রহণ করেন যখন সাম্রাজ্যবাদ তার সর্বোচ্চ ক্ষমতা নিয়ে অধিষ্ঠিত। ভারত ইতোমধ্যেই পদানত হয়ে গেছে – ১৭৫৭ সাল থেকে শুরু করে ১৮৫৭ সালের দিকে। যখন তিনি মাত্র সতের-আঠারো বছরের যুবক তখন ভারত উপমহাদেশে সিপাহী বিদ্রোহ অর্থাৎ স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু হয়। সে সময় সমগ্র ভারতকেই বৃটেন দখল করে নেয়। একই সময়ে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, পর্তুগাল ও ডাচরা মিলে সারা বিশ্ব দখল করে চলছে। জামাল উদ্দীন আফগানী সাম্রাজ্যবাদের উত্থানের ঠিক সে সময়ই জন্মগ্রহণ করেন এবং বেড়ে ওঠেন।

তার বেড়ে ওঠার এ মুহূর্তে তিনি লক্ষ্য করলেন প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে বিশ্বের প্রায় সকল দেশই ইংরেজদের এবং অন্যান্য ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের পদানত হয়ে গেছে। জামাল উদ্দীন আফগানী তার যৌবনেই সারা বিশ্ব ঘুরে বেড়ান। আফগানিস্তানে তার জন্ম হলেও হিন্দুস্তানে তিনি আসেন। আমরা জানি, ঊনবিংশ শতাব্দীর সে সময় গোটা মুসলিম বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশই ভারত উপমহাদেশে বাস করতো। এর মধ্যে ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম দিকে বেশি এবং মধ্যভাগে বিক্ষিপ্তভাবে মুসলিমরা বাস করতো। আফগানী কলকাতাতেও আসেন। তিনি ফ্রান্সে যান। তিনি তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের প্রধান প্রধান দেশে (যেগুলোকে সে সময়ের মুসলিম পাওয়ার বলতে পারি) যান। যেমন - মিসরে তিনি অনেকদিন ছিলেন। মিসরকে তখনকার উত্তর আফ্রিকা বা আরব বিশ্বের নেতা বলা যায়। মিসর ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ দেশ। সেখানে তিনি কাজ করেন। এরপর তুর্কী খেলাফতের কেন্দ্র ইস্তাম্বুলে তিনি বাস



www.pathagar.com

করেন এবং সেখানকার রাজনীতিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন। তিনি মিসর থাকাকালীন সময় সেখানে এ কাজটিই করেছিলেন। মিসরের মতো তুরস্কও তখন খুব গুরুত্বপূর্ণ দেশ হিসেবে স্বীকৃত ছিল। বর্তমানেও তুরস্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ দেশ। তিনি তুরস্কের খেলাফতকে পরিবর্তন ও রক্ষা করার চেষ্টা করেন। ইরান এখনকার মতো তখনও খুবই গুরুত্বপূর্ণ দেশ ছিল। তিনি ইরানে যান এবং সেখানেও কাজ করেন, সেখানকার রাজনীতিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন এবং জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেন। সে সাথে সাথে হিন্দুস্তানের রাজনীতিকে তিনি প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন।

এগুলো বলার উদ্দেশ্য হলো তিনি ইন্দোনেশিয়া বা ইস্টে (পূর্বে) কাজ করেননি। কিন্তু তৎকালীন কেন্দ্রীয় চারটি স্থান উপমহাদেশ, ইরান, তুরস্ক এবং মিসরে কাজ করেন। আফগানিস্তানও সে সাথে উল্লেখযোগ্য। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় তিনি সঠিকভাবেই দেশগুলো নির্বাচন করেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন মুসলিম বিশ্বের ভবিষ্যত নির্ভর করছে এসব দেশ বা স্থানের এলিট বা জনগণকে প্রভাবিত করার ওপর। আমরা এটিও লক্ষ্য করি, তিনি তার জীবনে মিসরে মুফতি আবদুহুর মতো একজন মহৎ শিষ্য পান। মুফতি আবদুহুই তার চিন্তাধারাকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেবার চিন্তা করেন, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের কেন্দ্রে, যেটি আরবিভাষী ছিল। এটি সত্য যে সাবকন্টিনেন্টে তৎকালীন মুসলিম এলিটদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষিত কম ছিল। যারা ছিল তারা আরবি শিক্ষিত ছিল। তাদের মধ্যে আরবির মাধ্যমেই আফগানীর চিন্তাধারা পৌঁছানো সম্ভব হতো। ইংরেজির মাধ্যমে পৌঁছানোর কোনো উপায় তখন ছিল না। আর ইংরেজি ভাষা তাদের মধ্যে বিস্তার লাভ করে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। এখানে প্রথম মুসলিম ইংরেজি কলেজই স্থাপিত হয় অনেক পরে, আলিগড়ে। এছাড়া ইংরেজি শিক্ষা ছিল তখন গুটিকয়েক লোকের মধ্যে। সুতরাং তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের যারা এলিট ছিলেন তাদের ভাষা বলা যায় আরবিই ছিল। আরবির সাথে সাথে ভারত এবং ইরানে ফারসিও ছিল। কাজেই তিনি প্রথমে মিসরকেন্দ্রীক সাংবাদিকতা শুরু করেন মুফতি আবদুহুর সহায়তায়। সারা বিশ্বে তিনি তার বাণীকে ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেন।

এরপর তিনি ফ্রান্সে গিয়ে 'আল উরওয়াতুল-উছকা' বা শক্ত রজ্জু নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। প্যারিসকে কেন্দ্র করে আরবি ভাষায় এটি করার মধ্যে এও প্রমাণ করে যে তিনি নিজেও আরবি ভাষা ভালো জানতেন। তিনি তার পত্রিকা 'আল-উরওয়াতুল উছকায়' যে সমস্ত প্রবন্ধ লেখেন সেগুলো সংকলন করে উরদুতে মুহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস কাসেমী 'আফগানী রচনাবলী' লেখেন।

জামাল উদ্দীন আফগানী তখন তার লেখায় মুসলিম বিশ্বের কেন্দ্রীয় সমস্যাগুলো কী তা দেখাতে চাইলেন। তিনি তার যুগকে সামনে রেখেই কথা বলেছেন। যেমন আমরা আমাদের যুগকে সামনে রেখে কথা বলে থাকি। তিনি



www.pathagar.com

দু'টি বিষয়কে প্রধান বলে দেখেন। একটি হলো অনৈক্য। তিনি বলেছেন, 'বিদেশী শক্তি আমাদের অনৈক্যের সুযোগে ঢুকে পড়েছে।' আর দ্বিতীয় যে বিষয়ের ওপর তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন সেটি হলো নেতৃত্ব। তিনি বললেন, 'মুসলিমদের মধ্যে নেতৃত্বের অভাব ঘটেছে এবং শক্ত নেতৃত্ব নেই।' যদিও বলা যায় গণতন্ত্র, মানবাধিকার, নারীর অধিকার এসব বিষয় তিনি আনেননি। কেন আনেননি? এর উত্তর হলো, সে যুগে এগুলো বড় প্রশ্ন ছিল না। তখনকার সময় বড় প্রশ্ন ছিল মুসলিম জাতির রক্ষা। যে শাসকই আছে তাকে নিয়েই এগুতে হবে, সেখানে প্রথম কাজ এটি নয় যে বাদশাহী বাদ দিয়ে গণতন্ত্র করা, মানবাধিকার করা। প্রকৃতপক্ষে তখনকার ইস্যুই ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেটি মানসিকভাবে দেড়শ' বছর আগে না গেলে আমরা বুঝবো না। তিনি তার সময়কে সামনে রেখেই নেতৃত্বের প্রশ্ন তুলেছিলেন। তিনি একথা বললেন না যে নেতা স্বৈরাচারী, গণতান্ত্রিক নয় কিংবা তিনি নির্বাচিত নন। কিন্তু তিনি এটি বললেন যে, 'যে যেখানে নেতা আছেন আপনারা বিভেদ, ঝগড়াঝাটি বন্ধ করে একত্রিত হন। আপনাদের নেতৃত্বের যোগ্যতা রাখতে হবে।' আলস্য, বিলাস এবং জুলুম পরিহার করার জন্য তিনি তাদেরকে বললেন। তিনি এ দু'টি জিনিস–অনৈক্য ও নেতৃত্বকে সার্বিকভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন।

তিনি তার 'একতা' প্রবন্ধে বলেছেন, 'একথা বলার উদ্দেশ্য এ নয় যে, সমস্ত মুসলিম দেশের ওপর কোনো একক ব্যক্তির আধিপত্য মেনে নেয়া হোক। এমন প্রস্তাব দুঃসাধ্য বলে মনে করার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে আমি অবশ্যই চাই যে, এদের সবার ওপর কুরআনী আহকামের আধিপত্য থাকুক এবং সবাই ইসলামকে নিজেদের ঐক্য ও সংহতির মাধ্যমে পরিণত করুক।' (মুহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস কাসেমী, সাইয়িদ জামাল উদ্দীন আফগানীর রচনাবলী, পৃষ্ঠা: ৪৩)।

এ কথার ব্যাখ্যায় বলা যায়, এখানে তিনি বলছেন না যে, সারা মুসলিম বিশ্বকে এক নেতা মেনে নিতে হবে এখনই। এ প্রস্তাব কতো ভালো বা মন্দ সে প্রশ্ন তিনি তুলছেন না। তিনি তা দুঃসাধ্য বলে মনে করেছেন। সেটি বাস্তবও নয়। তিনি বলেছেন ঐক্যের ভিত্তি এমনই হবে যে সবার উপরই কুরআনী আহকামের আধিপত্য থাকুক। অর্থাৎ কুরআনকে ঐক্যের ভিত্তি করা হোক। ইসলামকে ঐক্য ও সংহতির মাধ্যমে পরিণত করা হোক। আমরা এখানে পরিষ্কার দেখি যে মুসলিম ঐক্যের ভিত্তি এ ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে তা তিনি মনে করেননি। তিনি কুরআন ও ইসলামকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি আরেক জায়গায় বলছেন: 'ঐক্য ও নেতৃত্ব এ দু'টি বস্তু সামাজিক ও জাতীয় জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ দু'টিকে অর্জন করার পথে কখনো প্রাকৃতিক প্রয়োজন ও স্বভাবগত চাহিদা সাহায্য করে, কখনো ধর্ম এগুলো থেকে উপকৃত হওয়ার পথ বলে দেয়, আবার ক্রমাগত অনুশীলন চর্চার মাধ্যমে এগুলো লাভ করা যায়। ঐক্য ও নেতৃত্ব এক সাথেই বাড়ে এবং উৎকর্ষে উপনীত হয়।' (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৪৫)।



www.pathagar.com

তিনি আবার বলেছেন, 'ঐক্য ও নেতৃত্ব ইসলামি সুউচ্চ প্রাসাদের দু'টি প্রধান স্তম্ভ। এগুলোকে অটুট রাখার জন্য চেষ্টা করা ইসলামের সাথে সম্পর্কিত প্রতিটি ব্যক্তির উপর ফরজ।' (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৪৬)। তিনি এভাবেই ঐক্য ও নেতৃত্বকে কল্পনা করতেন। একথা একবিংশ শতাব্দীর আজকের দিনেও সত্য যে আমরা পাশ্চাত্য থেকে যে সমস্ত কারণে পিছিয়ে আছি তার মধ্যে রয়েছে ঐক্যের এবং যোগ্য নেতৃত্বের অভাব। বিভিন্ন দেশে মুসলমানরা যেভাবে মার খাচ্ছে সেখানেও আমরা শক্তিশালী কোনো অবস্থান এখনও তৈরি করতে পারিনি।

জামাল উদ্দীন আফগানী বলেন, 'হিলফুল ফুযুল অন্ধকার যুগের একটি চুক্তি হলেও ঐক্যের খাতিরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সেটিও গ্রহণীয় ছিল এবং পৌত্তলিকদের সাথে তিনি তাতে শরিক হন।' (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৫২)। অর্থাৎ ঐক্যকে গুরুত্ব দেয়ার জন্যই তিনি এ কথাটি উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি আরেক জায়গায় ইসলামি রাষ্ট্রের উপর জোর দিচ্ছেন: 'বেশির ভাগ দ্বীনি হুকুম জারী করা একটি সুসংগঠিত ইসলামি রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল।' (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৫৩)। এর দ্বারা এও বোঝা যায় যে তিনি ইসলামি রাষ্ট্র চাইতেন।

তিনি এ ঐক্যের ব্যাপারে হজের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'প্রত্যেক মুসলমানের উপর সামর্থ্য সাপেক্ষে হজ আদায় করা ফরজ। হজ উপলক্ষে এ ভূখণ্ডে প্রত্যেক স্তরের, প্রত্যেক অঞ্চলের এবং প্রত্যেক মানবগোষ্ঠীর মুসলিম পরস্পর মিলিত হয়। প্রয়োজন শুধু একটি। আর তা হলো – কোনো প্রভাবশালী মহান ব্যক্তি সত্যের এমন একটি আওয়াজ বুলন্দ করবে যার দ্বারা বিশ্বের সর্বদিকে ও সর্বপ্রান্তে চাঞ্চল্য ও কর্মব্যস্ততার একটি বিদ্যুৎ প্রবাহ বয়ে যাবে এবং নীরবতাপ্রবণ মানবগোষ্ঠীর অন্তরে জাগরণ এবং জাগরণ থেকে কর্ম সম্পাদনের আকুতি সৃষ্টি হবে।' (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৫৭)। আমরা আজ হজকে ব্যবহার করার যে কথা বলছি সে কথাই তিনি আজ থেকে প্রায় দেড়শ' বছর আগে বলে গেছেন। তিনি তখনই ঐক্যের পক্ষে কথা বলেছেন।

জামাল উদ্দীন আফগানী একজন অত্যন্ত জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। ফারসি এবং আরবি ভালো জানতেন। তিনি তার কালের প্রধান মুসলিম রাষ্ট্র ও তার সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন এবং সেখানে তিনি কাজ করেছেন। তিনি সাংবাদিকতার গুরুত্ব বুঝেছিলেন এবং তার মাধ্যমে তিনি কাজ করেছিলেন। তিনি নিজে ফারসিভাষী হওয়া সত্ত্বেও আরবির গুরুত্ব উপলব্ধি করেন এবং আরবিকে তার সাহিত্যের এবং লেখার ভিত্তি করেন। তিনি সে যুগের উম্মতের মূল সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। তিনি বোঝাতে চান যে ঐক্য না থাকার কারণে সমস্যাগুলো হচ্ছে। দ্বিতীয়ত সমস্যা হলো নেতৃত্বের। এছাড়াও অন্যান্য জায়গায় তিনি শিক্ষা ও জ্ঞানের কথা বলেছেন, ভ্রাতৃত্বের, বীরত্বের কথা বলেছেন। জামাল উদ্দীন আফগানীর এসব কথা আজকের মুসলিম জাতির জন্যও প্রযোজ্য।



www.pathagar.com

# ইকবাল ও তার রাজনৈতিক অবদান

আল্লামা ইকবালের কোন পরিচয়টি বড় তা আমি জানি না। ইকবাল অবশ্যই কবি ছিলেন। তিনি দুই ভাষার কবি ছিলেন। তিনি একজন দার্শনিক ছিলেন। মুসলিম দর্শনে তিনি নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন। তিনি নতুন দর্শন দান করেন। মুসলিম উম্মাহকে উজ্জীবিত করার জন্য তিনি 'আসরারে খুদি' বা খুদির দর্শন উপহার দেন। আর সেটিকে আরো ব্যাখ্যা করেন যে, রমুজে বেখুদিতে যে খুদির প্রকাশটা কি আর খুদির বিলীন হওয়াটাই বা কি?

সত্যিকার অর্থেই তিনি একজন বড় দার্শনিক ছিলেন। তিনি খ্যাতিমান দার্শনিকই ছিলেন এমন শুধু নয়, তিনি ইসলামেরও দার্শনিক ছিলেন। শিক্ষায় তিনি দর্শনে এমএ ও পিএইচডি করেন। শিক্ষার দিক থেকেও তিনি এ উপমহাদেশের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এরাবিকেও এমএ করেন। আবার বার এট ল'ও করেছেন। সর্বোপরি তিনি একজন কবি ছিলেন। আর কবি এমন এক প্রতিভা যার জন্য কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি লাগে না। ডিগ্রি ছাড়াই বড় হতে পারে। বড় হয়ও তারা। এ সবকিছু মিলেই ইকবাল।

ইকবালের রাজনৈতিক দিকটি মানুষ তেমন খেয়াল করে না। কিন্তু উপমহাদেশের রাজনীতিতে তার অবদান খুবই বেশি। তাকে খুবই বড় একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে আমি দেখি। তিনি নির্বাচনে অংশ নিয়ে লাহোর থেকে পাঞ্জাব সংসদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে অনেক ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও তিনি গণতন্ত্রের, মূলত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পক্ষপাতি ছিলেন। পার্লামেন্টের ভিতরেও তিনি সক্রিয় ছিলেন। তবে তিনি সেকুলার গণতন্ত্রকে পছন্দ করতেন না। গণতন্ত্র যদি ইসলামভিত্তিক হয় তাহলে সেটিকেই তিনি প্রকৃত গণতন্ত্র বলে মনে করতেন, যেখানে আল্লাহ তায়ালার আইন হবে আর শাসন হবে মানুষের।

রাজনীতির ক্ষেত্রে ইকবালের দু'টি অবদানকে আমি সবচেয়ে বড় মনে করি। একটি হলো মুসলিম লীগে তার সক্রিয় ভূমিকা পালন। তখন অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ ছিল সারা ভারত উপমহাদেশের মূল প্রতিষ্ঠান। সে প্রতিষ্ঠানের তিনি এক সময়ের প্রেসিডেন্টও ছিলেন। তিনি তার সাধ্যমতো মুসলিম লীগকে এগিয়ে নেয়ার জন্য কাজ করেছেন। সে মুসলিম লীগ ভারতীয় রাজনীতিতে



www.pathagar.com

প্রভাব বিস্তার করেছিল। তার দ্বিতীয় সবচেয়ে বড় অবদান হলো, তিনি এলাহাবাদ কনফারেন্সে ১৯৩০ সালে ভারতের পশ্চিম ও পূর্ব দিকে দু'টি মুসলিম রাষ্ট্রের কথা বলেছিলেন । এ দু'টি এলাকাতেই মুসলিমরা মেজরিটি। তিনি এটি দেখতে পেয়েছিলেন যে, সারা ভারতে হিন্দু মেজরিটি এবং সেখানে মুসলিমরা সত্যিকার স্বাধীনতা পাবে না। মুসলমানরা সংখ্যায় অল্প হলে কথা ছিল। কিন্তু এরা বড় একটি জাতি। তারা ভারতের পূর্ব দিকের দু'টি প্রদেশে মেজরিটি অর্থাৎ বেঙ্গল এবং আসামে, যেটি বর্তমানে নয়টি প্রদেশে বিভক্ত হয়ে গেছে। এ অঞ্চল আর পশ্চিম দিকের মুসলিম মেজরিটির প্রদেশ নিয়ে দু'টি আলাদা রাষ্ট্রের কথা ইকবাল বলেন।

তিনি মুসলিম জাতীয়তাবাদের কথা বলেন। তিনি জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ইসলামের সমন্বয় ঘটান। জাতীয়তাবাদের ধারণা হলো, প্রত্যেক জাতির স্বায়ত্তশাসনের অধিকার আছে। ভাষাভিত্তিক হোক আর এলাকাভিত্তিক হোক, প্রত্যেক জাতির তার স্বায়ত্তশাসন চাওয়ার অধিকার আছে। ইকবাল এটিকে ইসলামের সাথে সমন্বয় ঘটান। তিনি বললেন, ইসলামের ভিত্তিতেও জাতীয়তা হতে পারে। আর এ জাতির সাথে পাশ্চাত্যের তত্ত্বের মিলন ঘটালেন এ বলে – আদর্শিক মুসলিম জাতি, তারা যে ভূখণ্ডে সংখ্যাগরিষ্ঠ সে এলাকায় স্বাধীন রাষ্ট্র করতে পারবে। ওয়েস্টার্ন থিওরি ছিল, জাতি সাধারণ এলাকাভিত্তিক, ভাষাভিত্তিক বা বর্ণভিত্তিক হবে এবং তার আলোকে সেখানে যারা মেজরিটি তাদের রাষ্ট্র হতে পারে। তবে তাদের মধ্যে এ আদর্শিক জাতির কোনো ধারণা ছিল না। কিন্তু ইকবাল সেখানে ইসলামভিত্তিক জাতির কথা বললেন। মুসলমানদেরকে আদর্শিক জাতি বললেন। তিনি যেখানে মুসলমানরা মেজরিটি সেখানে স্বাধীন হওয়ার কথা বললেন। এর মাধ্যমে তিনি ইসলামের সঙ্গে আধুনিক জাতীয়তাবাদের একটি সমন্বয় ঘটালেন। এ সমন্বয়ের মাধ্যমেই তিনি পাকিস্তান দাবি করলেন। এক পর্যায়ে পূর্ব অংশ ও পশ্চিম অংশ মিলে একটি জোরদার আন্দোলন হলো। সে আন্দোলনের ফলস্বরূপ ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠন হলো। পরবর্তীতে সেখান থেকে বাংলাদেশে হলো।

ভারতের এ রাজনৈতিক বিবর্তনে ইকবালের ভূমিকা অনেক বড়। ইসলামের ভাবধারা, চেতনার সঙ্গে তিনি আধুনিক জাতীয়তার সমন্বয় ঘটিয়ে তাকে ইসলামিকরণ করে ফেললেন, অথবা আমরা বলতে পারি তাকে ইসলামাইজ করে ফেললেন। এটি তার একটি বিরাট অবদান। এ কাজটি তার আগে কেউ করেনি। এ দিক থেকে ইকবাল অনেক বড় রাজনীতিবীদ ছিলেন। তার কথা আমরা ইতিহাস থেকে বাদ দিতে পারবো না।



www.pathagar.com

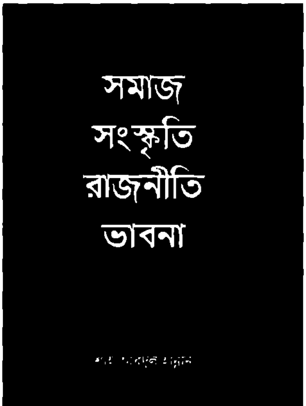


সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি ভাবনা

প্রকাশকাল : আগস্ট ২০১২, দি পাইওনিয়ার, দি উইটনেস

www.pathagar.com

www.pathagar.com

# ইসলামী ব্যাংকের বিরুদ্ধে প্রচারণা নেপথ্যে কী কারণ

বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যমের একটি অংশ বেসরকারি ব্যাংকিং সেক্টরে এ দেশের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে নেমেছে।

২০০৬ সালের সিরিজ বোমা হামলার জঙ্গি নেতা শায়খ আব্দুর রহমানের গোপন আস্তানায় ইসলামী ব্যাংকের সিলেট শাখার কিছু চেক বই উদ্ধারের পর থেকেই এ ঘটনার সূত্রপাত। একই বাড়ি থেকে একটি সরকারি ব্যাংক ও আরেকটি প্রাইভেট ব্যাংকের চেক বই উদ্ধার করা হলেও সংবাদপত্রগুলোর ওই বিশেষ গ্রুপটি তা চেপে গেছে উদ্দেশ্যমূলকভাবে। ইসলামী ব্যাংক ইতোমধ্যে এ ব্যাপারে তাদের অবস্থান ব্যাখ্যা করেছে এভাবে–

> কতিপয় সংবাদপত্র ও টেলিভিশন চ্যানেল 'সূর্যদীর্ঘল বাড়িতে ইসলামী ব্যাংকের একজন ডিপোজিট ক্লায়েন্টের চেক বই পাওয়ার ঘটনাকে ব্যাংকের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সন্দেহজনক বিষয় হিসেবে তুলে ধরছে। জনগণ তথা ক্লায়েন্টদের মাঝে ব্যাপক সংশয় নিরসনের জন্য বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনীয়তা আমরা অনুভব করছি।
>
> প্রকৃত ঘটনা হলো, জনৈক এফ সাইদুর রহমান ব্যাংকিং বিধিমালা মোতাবেক ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের লালদীঘিরপাড় শাখায় ১৯৯৯ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি একটি অ্যাকাউন্ট খোলেন। ওই শাখার অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার মোঃ আবু ওয়ালিদ চৌধুরী (বর্তমানে বিশ্বনাথ শাখার ম্যানেজার) অ্যাকাউন্ট ওপেনিং ফরমে পরিচয়দানকারী (ইন্ট্রোডিউসার) হিসেবে সই করেন। তারপর দীর্ঘদিন ওই অ্যাকাউন্টে আর কোনো লেনদেন হয় নি। সাইদুর রহমানের লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে অ্যাকাউন্ট পুনঃসচল করা হলে মোট ৪ লাখ ১৫ হাজার (৬ হাজার মার্কিন ডলারের চেয়ে কিছু কম) টাকা ভিন্ন ভিন্ন ৮টি টিটির মাধ্যমে ব্যাংকের গাজীপুর ও সাভার শাখা থেকে এ অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করা হয়। দৈনন্দিন ব্যাংকিং ডিউটিতে এ লেনদেনের মধ্যে সন্দেহজনক কিছু খুঁজে পাওয়া যায়নি। শায়খ



www.pathagar.com

আব্দুর রহমানের গোপন আস্তানা থেকে চেক বইগুলো উদ্ধারের পর ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিকভাবে ওই শাখাগুলোতে অডিট ও তদন্ত দল পাঠালে টিটি ইস্যুর ক্ষেত্রে কিছু ত্রুটি চিহ্নিত করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংকে বিষয়টি জানানো হয় এবং সংশ্লিষ্ট অফিসারদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক নিজেও বিষয়টি তদন্ত করে এবং এ ত্রুটির ব্যাখ্যা চেয়ে 'কারণ দর্শাও' নোটিস পাঠায়। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড যথাসময়ে এ চিঠির ইতিবাচক জবাবও পাঠিয়েছে।

আমরা পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করতে চাই, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড কোনো রকম সন্ত্রাসী কার্যক্রমকে সমর্থন দেয় না। এসব কর্মকাণ্ডে আর্থিক সহায়তা দানের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা তো দূরের কথা, সিডিউল্ড ব্যাংক হিসেবে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড বাংলাদেশ ব্যাংকের বিধিবিধান ও পদ্ধতি মোতাবেক কাজ করে যাচ্ছে।

এ বিবৃতি প্রদানের পরও সংবাদ মাধ্যমের একটি বিশেষ অংশ ইসলামী ব্যাংকের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে, যা ব্যাংকিং সেক্টর, শেয়ার মার্কেট ও অর্থনীতিতে মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে। এখানে এসব সংবাদপত্র থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেয়া যাক ঃ

১. গত ৩০ মার্চ ২০০৬ দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার শিরোনাম ছিল 'জামায়াত কানেকশনে ইসলামী ব্যাংকের ত্রিশঙ্কু অবস্থা ঃ শেয়ারের মূল্য আরো কমেছে'–যুগান্তর এ ঘটনার ওপর রিপোর্টিংয়ে জামায়াত কানেকশনের প্রসঙ্গ এনেছে এমনভাবে, যা যুক্তিহীন ও অবান্তর। এতে করে একটি ব্যাংকের ওপর জনগণের আস্থা বিপজ্জনকভাবে কমে যেতে পারে। ফলে দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যাংকটি হারাতে পারে জনগণের আস্থা। এর ফলে ব্যাংকিং সিস্টেম ও অর্থনীতিতে কী ধরনের বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে, যুগান্তরের এ ব্যাপারে কোনো দূরদর্শিতা নেই।

২. ২৯ মার্চ একই পত্রিকায় এ ধরনের শিরোনামে আরেকটি রিপোর্ট ছাপা হয়েছিল, 'ইসলামী ব্যাংকের জঙ্গি কানেকশন ঃ শেয়ার মূল্যে ব্যাপক দরপতন'–এ শিরোনামের প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে, 'ধারণা করা হচ্ছে সারাদেশে ইসলামী ব্যাংকের বিভিন্ন শাখায় জঙ্গিদের নামে-বেনামে অসংখ্য হিসাব রয়েছে। ... এর আগেও ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে লক্ষ কোটি টাকার লেনদেন করেছে জঙ্গি নেতারা।' যদি পত্রিকাটি এত সব কথা জানেই, তবে কেন কেন্দ্রিয় ব্যাংককে তথ্যগুলো জানিয়ে দিচ্ছে না? পত্রিকাটি কেন্দ্রিয় ব্যাংকের বিশ্বস্ত সূত্রের



www.pathagar.com

বরাত দিয়ে বলেছে, 'কেন্দ্রিয় ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকের বিরুদ্ধে খুব দ্রুত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে যাচ্ছে।' কেন্দ্রিয় ব্যাংকের একজন সাবেক কর্মকর্তা হিসেবে আমি জানি, এ ব্যাংক এমন কোনো তথ্যই কারো কাছে প্রকাশ করে না, যা কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। অবশ্য আমি এটাও জানি না যে, কেন বাংলাদেশ ব্যাংক (কেন্দ্রিয় ব্যাংক) বিষয়টিকে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করে দিচ্ছে না, যাতে করে কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানে এর বিরূপ প্রভাব না পড়ে। কেননা, কোনো আর্থিক সিস্টেমের সুনাম রক্ষা করা কেন্দ্রিয় ব্যাংকেরই কাজ। আমি মনে করি, ব্যাংকিং অ্যাক্টে কিছু সংশোধন আনতে হবে। এটাই সময়ের দাবি। এখানে এমন একটি ধারা যোগ করা দরকার, যার মাধ্যমে কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কিংবা আর্থিক সিস্টেমের ওপর ক্লায়েন্টের আস্থা নষ্ট করার যাবতীয় প্রচেষ্টা ও চক্রান্তকে একটি মারাত্মক শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৩. ২৪ মার্চ দৈনিক জনকণ্ঠের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, 'কতিপয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও একটি বামপন্থি দল ইসলামী ব্যাংককে নিষিদ্ধ বা বন্ধ করে দেয়ার পক্ষে দাবি উত্থাপন করেছেন।'

অবশ্য এও দেখতে পেলাম যে, আরো ১৭টি ব্যাংক সম্পর্কে এ নেতৃবৃন্দ ও দলটি নিশ্চুপ, যেগুলোর বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে অর্থায়নের অভিযোগ বাংলাদেশ ব্যাংক তদন্ত করছে। ১৭টি ব্যাংকে তদন্তের উপর প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ২০০৬ সালের ২৯ মার্চ দৈনিক আমার দেশ পত্রিকায়।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, ইসলামী ব্যাংক তথা ইসলাম ও ইসলামী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এটা সুপরিকল্পিত অপপ্রচারের নমুনা। এটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এটা হলো পুরনো সেই ইসলামবিদ্বেষ, যা কোনো না কোনো অজুহাতে ইসলামের বিরোধিতা করা এবং যা কিছুই ইসলামী সে সবকিছুর মধ্যেই দোষ অন্বেষণ করার একটি রোগ। আমি শুধু এটুকুই আশা করতে পারি, বাংলাদেশের জনগণ ও ব্যাংকের শুভানুধ্যায়ীরা বিষয়টি অনুধাবন করতে পারবেন।



www.pathagar.com

# ইসরাইলকে কেন স্বীকৃতি দেয়া সঙ্গত নয়

•

২০০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসরাইলের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে তুরস্কের প্রধান শহর ইস্তাম্বুলে সাক্ষাৎ করেছেন। সাক্ষাতের পরপরই ইসরাইলের সাথে পাকিস্তানের অনেক দিন থেকে যে গোপন যোগাযোগ আছে, সে বিষয়টি স্পষ্ট হয়। এর আগে বিষয়টি স্পষ্ট হয়নি। আমরা এ-ও জানি, এ ঘটনার পর পাকিস্তানের সব বিরোধী দল মুত্তাহিদা মজলিসে আমল (এমএমএ), এআরডি, পিপিপি (পাকিস্তান পিপলস পার্টির পার্লামেন্টারি গ্রুপ, যা বেনজির ভুট্টোর নেতৃত্বাধীন) এবং নওয়াজ শরিফের মুসলিম লীগ ধর্মঘট আহ্বান করে। এ কর্মসূচি পাকিস্তানে জোরালোভাবে পালন করা হয়। পূর্ণ হরতাল পালিত হয়েছে গোটা পাকিস্তানে। সব বিরোধী দল লাহোরে একত্রে বৈঠকে বসেছিল। বিভিন্ন বিষয়সহ পাকিস্তান-ইসরাইল ইস্যুকে সামনে রেখে এরা একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করে।

এ প্রসঙ্গে এই মুহূর্তে পাকিস্তান-ইসরাইল ইস্যু থেকে বেরিয়ে এসে যদি আমরা বাংলাদেশের দিকে দৃষ্টি দিই তাহলে দেখবো, ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের কোনো কোনো পত্রিকায় এ কথা লেখা হয়েছে যে, ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেয়া হোক। আমার মনে পড়ে, ২০০৩ সালের শেষদিকের কথা। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের একটি অংশ দাবি করেছিল ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য। তাদের কথা ছিল, একজন কংগ্রেস সদস্য যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে একটি বিল এনেছেন ইসরাইলের স্বীকৃতির সাথে বাংলাদেশের পণ্যকে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করার বিষয়টি সম্পর্কিত করার জন্য। এ কথায় আমাদের ব্যবসায়িক মহলের একটি অংশ সাথে সাথে ঘাবড়ে যান এবং তারা এ দাবি উত্থাপন করে বসলেন। অথচ তখন তারা এটা ভাবেননি, যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের যে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক এর সাথে ইসরাইলের স্বীকৃতির সম্পর্কের কী যুক্তি আছে? এটা তো শুধু আমেরিকার সাথে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের বিষয়। তার সাথে ইসরাইলের স্বীকৃতির কী সম্পর্ক আছে? একজন কংগ্রেস সদস্য একটা বিল উত্থাপন করলেন বলে সাথে সাথে ঘাবড়ে যেতে হবে কেন? যা হোক, আমার মনে পড়ে, এ ঘটনার পরপরই একটি থিংক ট্যাংক সংগঠনের ঘরোয়া সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম। পনেরো জনের মতো লোক সেখানে ছিলেন। বেশ কয়েকজন সাংবাদিকও ছিলেন। সেনাবাহিনীর কয়েকজন সাবেক জেনারেল



www.pathagar.com

ছিলেন। নিরাপত্তা বিশ্লেষকও ছিলেন কয়েকজন। সেখানেও অন্যান্য আলোচনার মধ্যে ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেয়ার বিষয়টি চলে আসে। সেখানে একজন সাংবাদিক অনেক যুক্তি দেখালেন–কেন ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেয়া দরকার এবং আমাদের না করার কোনো যুক্তি নেই। তার কথা মিসর, জর্দান, তুরস্ক ইসরাইলের সাথে চুক্তি করেছে; তাহলে আমরা কেন করবো না? আমি লক্ষ্য করলাম, তার বক্তব্যের পর সে হাউজের সাত-আট জন মোটামুটিভাবে তার বক্তব্যকে সমর্থন করে বসলেন। ওই পরিস্থিতিতে আমি কথা বললাম। জোর দিয়ে এর বিরোধিতা করলাম। আমার যুক্তি পেশ করলাম। এরপর অনুষ্ঠানের সভাপতি একপর্যায়ে এই আলোচনা বন্ধ করে দেন। আবার একই জায়গায় আরেকটি সভা অনুষ্ঠিত হলো। আমি লক্ষ্য করলাম, সেখানেও পাকিস্তানের ইসরাইলি যোগাযোগের কারণে সে বিষয়ে আলোচনা হয় এবং দু-একজন ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেয়া উচিত বলে মন্তব্য করলেন। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, বাংলাদেশের উচ্চপর্যায়ের একটা অংশ ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেয়ার পক্ষে। তাদের কাছে এটা বড় প্রশ্ন নয়, ইসরাইল অবৈধভাবে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র। তাদের কাছে এটাও বড় প্রশ্ন নয়, ইসরাইল জাতিসঙ্ঘের অন্তত ৫০টি প্রস্তাব ভঙ্গ করেছে এবং ফিলিস্তিনের দুই-তৃতীয়াংশ জবরদখল করে রেখেছে; পূর্ব জেরুজালেম দখল করে রেখেছে, যেটা তাদের নয়। যদি আমরা মেনেও নিই, ১৯৪৭ সালে জাতিসঙ্ঘ তাদের যা দিয়েছিল তা তাদের থাকবে, তাহলেও পূর্ব জেরুজালেম তাদের বহু আগেই ছেড়ে দেয়া উচিত ছিল। এরা পশ্চিম তীরে দুইশ'-আড়াইশ' বসতি গড়ে তুলেছে। গাজাতেও বসতি গড়েছিল। সম্প্রতি সেখান থেকে তা তুলে নিয়েছে। টিভিতে আমরা তাদের কান্না, দুঃখ-বেদনার চিত্র দেখেছি। ইসরাইল রাষ্ট্র ফিলিস্তিনিদের প্রতি যে অত্যাচার-নির্যাতন করেছে, এটা তার তুলনায় খুবই সামান্য ব্যাপার। তাদের বরং ট্রাকে করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু এটাই টিভিগুলোতে ব্যাপকভাবে দেখানো হয়েছে, মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়েছে। অথচ ফিলিস্তিনিদের বাড়ি-ঘর ধ্বংসের আগেকার ঘটনাগুলোর চিত্র খুব কমই দেখানো হয়েছে। যা-ই হোক, বাংলাদেশে যারা ইসরাইলের পক্ষে আছেন, তাদের কাছে এসব ইস্যু বড় নয়। এটাও এরা মানছেন না, গাজায় এখনো আকাশ ও সমুদ্রসীমা ইসরাইলের নিয়ন্ত্রণে। তারা এসব কিছু ভাবতে রাজি নন। এরা একে খুবই সাদামাটা দৃষ্টিতে দেখছেন। তারা এটা দেখছেন না যে, মুসলিম বিশ্বের ৫৭টি দেশের মধ্যে মাত্র পাঁচ-সাতটি দেশ ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক রেখেছে। তার কারণও আমরা জানি। তুরস্ক স্বীকৃতি দিয়েছে, কেননা তাদের সে সময়কার ক্ষমতাসীন সরকার পাশ্চাত্যেরই অনুসারী ছিল। মিসর একটা পর্যায়ে তা করেছে। আমরা জানি, মিসর তার সিনাই উপত্যকা উদ্ধারের জন্য এটা করেছে। হয়তো তার স্বীকার করা ঠিক হয়নি; কিন্তু তারপরও তার একটা যুক্তি পাওয়া যায়। মিসর বাধ্য হয়েছে। আর তার



www.pathagar.com

দেশের জনগণের মতামতের দামই বা কী? সেখানে তো তখন কোনো গণতন্ত্র ছিল না। জর্দানেও একই ব্যাপার। অথচ মুসলিম বিশ্বের মূল অংশই এখনো ইসরাইলকে স্বীকার করেনি এবং তারা স্বীকার করতে রাজি নয়।

এখন প্রশ্ন হলো, ইসরাইলকে স্বীকার করলে আমাদের এমন কী লাভ হবে? আমাদের যদি মহালাভ হতো, তাহলে আমরা চিন্তা করতাম। ইসরাইল কত বড় রাষ্ট্র? এটি কয়েক হাজার বর্গমাইলের ছোট্ট একটা দেশ। বাংলাদেশের প্রায় দশ ভাগের এক ভাগ বা তার চেয়েও ছোট। তার জনসংখ্যাও মাত্র ৩০-৪০ লাখ। তাহলে প্রশ্ন, ইসরাইল কী এমন একটা বাজার, যার কাছে আমরা আমাদের পণ্য বিক্রি করবো? আর সে পণ্য না বেচার কারণে আমাদের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে? ইসরাইল এমন কী রাষ্ট্র, যার এমন সব পণ্য আছে, যেগুলো আমরা অন্যখানে পেতে পারি না? কম্পিউটার কিংবা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি কি আমাদের ইসরাইল থেকে আনতে হবে? আমাদের সাধারণ যন্ত্রপাতিও কি ইসরাইল থেকে আনতে হবে? আমাদের প্লেন, অস্ত্র কি ইসরাইল থেকে আনতে হবে? এগুলো কি অন্য কোথাও পাওয়া যায় না? এগুলো তো চীন, রাশিয়া, আমেরিকা, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান সবখানে পাওয়া যায়। তাহলে কী এমন মহা প্রয়োজন পড়ে গেল যে, আমরা ১৯৪৭ থেকে যে দেশের পণ্য আনিনি, আজ তা আনতে হবে? আজকে কী ঘটনা ঘটে গেল বা এমন কী পরিস্থিতির মহা উন্নয়ন ঘটে গেল, যে কারণে ইসরাইলকে আমাদের স্বীকৃতি দিতে হবে? এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক এ কথা মনে রাখতে হবে, ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৪৮ সালে জাতিসঙ্ঘের প্রস্তাবের মাধ্যমে। তখন জাতিসঙ্ঘের সদস্য রাষ্ট্রসংখ্যা ছিল ৫০ বা ৫৫। তার প্রায় সব দেশই ছিল আমেরিকান, লাতিন আমেরিকান অথবা ইউরোপের দেশ। এশিয়া ও আফ্রিকার দেশ ছিল গুটিকয়েক। এর বাইরে আর কারা সদস্য ছিল? তখন ভারত-পাকিস্তান স্বাধীন হয়ে সবে জাতিসঙ্ঘের সদস্য হয়েছে। ১৯৪৮ সালে যে ভোটাভুটি হয় পাকিস্তান তার বিরোধিতা করেছিল। আমার জানামতে, ভারতও বিরোধিতা করেছে। কাজেই ইসরাইল এ রকম পরিস্থিতিতে পাশ্চাত্যের চাপিয়ে দেয়া একটা রাষ্ট্র। আর তা করা হয় তখনকার জাতিসঙ্ঘের মাধ্যমে। কিন্তু সে জাতিসঙ্ঘ কাদের? সেটা বিশ্বের জাতিসঙ্ঘ ছিল না, যদিও নাম জাতিসঙ্ঘ। সেখানে বলতে গেলে আফ্রিকা নেই, এশিয়া নেই। এত বড় দুটো মহাদেশ প্রায় নেই। সেখানে শক্তির জোরে পাশ্চাত্য একটা প্রস্তাব পাস করেছিল। মনে রাখতে হবে, সেই প্রস্তাবটি মূলত অবৈধ ছিল। আজ আমরা শুধু ইতিহাসের বাস্তবতার কাছে আত্মসমর্পণ করছি। কিন্তু এটা তো ঠিক, বর্তমান ইসরাইলি ভূখণ্ডে একটি মাত্র রাষ্ট্র থাকার কথা। তার নাম প্যালেস্টাইন বা ফিলিস্তিন। ইসরাইল রাষ্ট্র কখনো ছিল না। সেখানে জোর করে ইহুদি বসতি স্থাপন করা হলো, ইহুদি নিয়ে আসা হলো। জোর করে সীমান্ত করে দেয়া হলো। ওরা



www.pathagar.com

একের পর এক যুদ্ধ করে সবটুকু জায়গা দখল করে নিল। স্থানীয় অধিবাসীদের বের করে দিল। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের পর গোটা ফিলিস্তিন দখল করে নিল। তাও চল্লিশ বছরের বেশি হয়ে গেছে।

ইসরাইল রাষ্ট্রের পেছনে কোনো নৈতিকতা নেই, তাকে জবরদস্তিমূলক বৈধতা দেয়া হয়েছে। সামরিক আইনের যেমন আইনগত বৈধতা নেই, তেমনি ইসরাইল জোর করে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র হওয়ার কারণে তারও আইনগত কোনো বৈধতা নেই। জাতিসঙ্ঘের একটি প্রস্তাবের মাধ্যমে বৈধতা পেয়ে গেলেও তার নৈতিক কোনো ভিত্তি নেই। এই অবৈধ রাষ্ট্র এখনো মূল ফিলিস্তিনিদের রাষ্ট্র করতে দিচ্ছে না; জেরুজালেম মুক্ত করতে দিচ্ছে না। উদ্বাস্তুদের ফিরতে দিচ্ছে না; এ রকম অনেক সমস্যা বিরাজমান। শেষ পর্যন্ত কী হবে আমরা জানি না। এ অবস্থায় কেন আমরা ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেব? একটি অবৈধ রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয়ার এমন কী প্রয়োজন পড়ে গেল? যতক্ষণ পর্যন্ত না ফিলিস্তিনিরা নিজেরা স্বীকৃতি না দিয়েছে, ততক্ষণ কি স্বীকৃতি দেয়া যায়? হ্যাঁ, ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে ফিলিস্তিন যদি স্বীকার করে নেয়, আমরাও ইসরাইলকে স্বীকার করে নেব। এটা তো আমেরিকার মতো নয়। আমেরিকার সাথে আমাদের অনেক ব্যবসায়-বাণিজ্য করতে হয়। অথচ ইসরাইল তেমন কোনো বড় দেশ নয় যার সাথে সম্পর্ক না রাখলে আমাদের ক্ষতি হবে। এ স্বীকৃতি কি মানবতার, ইনসাফের বা ইসলামের দাবি? কিন্তু এ কথাগুলো দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের এলিটদের মাথায় ঢুকছে না। কেন ঢুকছে না? তারা ব্রেন ওয়াশড। তারা বিবিসি শোনেন, সিএনএন শোনেন। ইংরেজি পত্রিকা পড়েন।

কাজেই আমি বাংলাদেশ সরকার এবং প্রধান দলগুলোকে এ ব্যাপারে আগেই সাবধান করতে চাচ্ছি এবং অনুরোধ করছি, তারা যেন অনৈতিক বিষয়টি মেনে না নেয়।



www.pathagar.com

# ইতিহাস ঐতিহ্য ও মুসলিম জাগরণ

আমি নিজে জীবনে অনেক ইতিহাস পড়ে বুঝলাম, ইতিহাস হলো বড় শিক্ষক। মানুষ কী কী ভালো কাজ করেছে এবং সেটা কারা করেছে, তাদের কী যোগ্যতা ছিল, কোন কোন পরিস্থিতিতে সফল হওয়া যায় তা ইতিহাস পাঠে জানা যায়। এখানে ব্যক্তিগত একটা বিষয় থাকে যে-লোকটা কত যোগ্য। আবার পরিস্থিতির একটা ব্যাপার থাকে। অনেক সময় যোগ্য লোকও পরিস্থিতির কারণে অনেক কিছুই করতে পারেন না। পরিস্থিতি অনুকূল হলে কম যোগ্য লোকও পারেন। এগুলোর ইতিহাস পড়লে আমরা জানতে পারি, যারা বড় কিছু অর্জন করেছেন, তাদের কী কী যোগ্যতা ছিল এবং তাদের সময়ের পরিস্থিতিটা কেমন ছিল।

তেমনিভাবে মানুষের ব্যর্থতাগুলো জানা যায়। ব্যক্তির দোষের কারণে ইতিহাসে কী কী বিষয় ব্যর্থ হচ্ছেন, আবার পরিস্থিতির কারণে কারা কারা ব্যর্থ হয়েছে, তা জানা যায়। কাজেই ইতিহাস একটা বড় শিক্ষক। যেসব বিষয় অবশ্যই পড়তে হবে, তার মধ্যে একটা হচ্ছে সাহিত্য, আরেকটা ইতিহাস। আরো অনেক কিছু আছে যেটা পড়তেই হবে। সাহিত্য জীবনের দর্পণ। তা পড়ে একটা সমাজ কেমন ছিল তা জানা যায়। এটা মনে করা ঠিক হবে না যে, শরৎচন্দ্র পড়লে আমি শুধু উপন্যাস পড়লাম। তা না, ভিন্ন সমাজকেও বুঝলাম। ওই সময়ের হিন্দুসমাজের দ্বন্দ্বগুলোও বুঝলাম। একই কথা সত্য সবার ক্ষেত্রে। শেক্সপিয়ার পড়লে আমরা জানতে পারি, ওই সময়ের সাহিত্যের উপজীব্য কী ছিল? সেই সমাজ কেমন ছিল? সেখানে বড়লোকেরা কেমন ছিল? সাধারণ মানুষ কেমন ছিল? কী কী ধরনের প্রশ্ন তাদের সামনে ছিল?

আমাদের ইতিহাস ও সাহিত্য দুটোই লাগবে। অথচ ব্যাপকভাবে এ দুটোর চর্চাই কমে গেছে। ধর্মের বিষয়ে পড়াশোনা নেই। ধর্মকে তো ফিলোসফিই বলা যায়। এটাও মানুষ পড়ছে না। সাহিত্য ও ইতিহাসও কম পড়ছে আগের তুলনায়। তারা পড়ছে বিজনেস। আর অবশ্যই সায়েন্স বা বিজ্ঞান শিখছে, যে সায়েন্সের মাধ্যমে টেকনোলজি তৈরি করা যাবে। যে সায়েন্সের মাধ্যমে বিশ্বের প্রকৃতি জগতের অনেক ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে; যার সূত্র বের করা যায়, কারণগুলো জানা যায়। কিন্তু তারপরও এই সায়েন্স আর বিজনেস পড়ে মানুষ হওয়া যায় না। এর দ্বারা রোবট হওয়া যায়। বর্তমানে বিশ্বের বেশিরভাগ মানুষ কিন্তু কম-বেশি রোবট। হতে পারে, ব্যতিক্রম এখনো আছে এশিয়ার কিছু



www.pathagar.com

দেশে। কিংবা যদি বলি মুসলিম ওয়ার্ল্ডের কথা, আফ্রিকার কিছু কিছু দেশ; এখনো তারা রোবট হয়নি। কিন্তু বাকি বিশ্ব রোবট হয়ে গেছে। ইউরোপ রোবট হয়ে গেছে। আমেরিকা, জাপান, অস্ট্রেলিয়া রোবট হয়ে গেছে। এই হচ্ছে অবস্থা। আমরা তো রোবট চাই না। তাহলে আমাদের ফিলোসফি বা ধর্ম পড়তে হবে। সাহিত্য ও ইতিহাস পড়তে হবে।

ইতিহাস বিকৃত করা যায় না। ইতিহাসের ওপর কোনো যোগ-বিয়োগ করা যায় না। ইতিহাস হচ্ছে যা ঘটেছে এবং কারা ঘটিয়েছে এদের কথা। কী ঘটেছিল তার বর্ণনা। এটা সাহিত্য নয়। এখানে গল্প বানানোর কোনো অবকাশ নেই। ইতিহাস আর সাহিত্য এক জিনিস নয়। ইতিহাস অবশ্যই সত্য ঘটনাভিত্তিক হতে হবে। এখানে আমাদের পছন্দমতো বাড়িয়ে দিলাম বা কমিয়ে দিলাম–এগুলো চলবে না।

আমার মনে হচ্ছে, আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার একটা ব্যর্থতা হলো, এখানে সেকুলারিজম থেকে অনেক কিছু আসছে। মানুষ রোবট হচ্ছে আধুনিক সভ্যতার কারণে। আধুনিক সভ্যতার মূল ভিত্তি সেকুলারিজম। এটা এনলাইটেনমেন্ট মুভমেন্টের ফল। এই মুভমেন্টের দু'টি কথা ছিল। একটা ছিল খোদায়ী কোনো ব্যাপারে আমরা জড়িত নই এবং সব হচ্ছে ইহজাগতিক ব্যাপার। আরেকটা ব্যাপার ছিল, তাদের র‍্যাশনালিজম। অর্থাৎ সব কিছু যুক্তির ওপর নির্ভরশীল। এখানে ঐশ্বরিক কোনো ব্যাপার নেই এবং রাষ্ট্রের সাথে এগুলোর কোনো যোগাযোগ নেই। এ ধারণা থেকেই একসময় সেকুলারিজম শব্দটা জনপ্রিয় হয়। এর ফলেই ক্রমে ক্রমে মানুষের শিক্ষা থেকে ধর্ম বাদ পড়ে গেল। বিশেষ করে পাশ্চাত্যে এটা বাদ পড়ে যায় এবং নৈতিকতার গুরুত্ব কমে যায়। ফলে আর ধর্মীয় বিষয় অধ্যয়নের গুরুত্ব রইল না।

পরবর্তী সময়ে আরো দেখা গেল, তারা এই স্বার্থপরতার মধ্যে বলতে লাগল, টাইম ইজ মানি। তার মানে সময় অন্য কোনো কাজে নষ্ট করা যাবে না; অর্থোপার্জনের কাজে ব্যবহার করতে হবে। যা দিতে হবে 'মানি'র জন্য দিতে হবে। তাই যদি হয়, তাহলে আমাকে ব্যবসায় শিখতে হবে বেশি করে, যা অর্থ দেয়, তার ব্যবস্থা করতে হবে এবং সেটা করতে গিয়েই মানুষ বিজনেস সায়েন্সে চলে গেল। পিওর সায়েন্স, টেকনোলজির সাইডে ছিল কিছুটা। কোনোটাই খারাপ না যদি সব কিছু মিলে হতো। ধর্ম ও নৈতিকতাকে সাথে নিয়ে যদি করা হতো। কিন্তু ধর্ম বাদ দেয়ার কারণে এগুলো একেবারে একপেশে, একতরফা, একমুখী হয়ে গেল। এসব কারণেই মানুষ শেষ পর্যন্ত রোবট হয়ে যাচ্ছে; আমাদের ছেলেমেয়েরাও। যখন তরুণ ছেলেমেয়েদের দেখি, মনে হয় না যে, তাদের জীবনে কোনো উচ্চ লক্ষ্য আছে। তাদের সামনে লক্ষ্য হচ্ছে, একটা সুন্দর মেয়েকে কিংবা সুন্দর ছেলেকে বিয়ে করতে হবে। ঘুরে বেড়াতে হবে, মজা করতে হবে। খাওদাও, ভোগ করে মরে যাও।


www.pathagar.com

এর চেয়ে উত্তম কোনো লক্ষ্য শিক্ষাব্যবস্থাও দিচ্ছে না। সায়েন্স, বিজনেসে কোথাও নেই হায়ার মোরাল কোর্স। এটা একমাত্র আছে রিলিজিয়ন বা এথিকসে। আর ইতিহাসে কিছু পাওয়া যায়। সাহিত্যে পাওয়া যায়। কাজেই মানুষ রোবট হয়ে গেছে এবং হচ্ছে।

যদি এর থেকে ফিরে আসতে হয়, ধর্মেই ফিরে আসতে হবে। এটা বলতে বোঝাচ্ছি না যে, ধর্ম বলতে ইসলাম সবখানেই। আমি অবশ্যই ইসলাম চাই। তারপরও বাস্তববাদী বলেই মনে করি, যেখানে হিন্দু ধর্মই প্রধান, সেখানে হিন্দু ধর্মেই ফিরে আসতে হবে। বৌদ্ধদের বৌদ্ধ ধর্মের দিকেই ফিরে আসতে হবে। খ্রিস্টানদের ফিরে আসতে হবে খ্রিস্টান ধর্মের দিকে। কেননা, কোনো কিছু চাপিয়ে দেয়া উচিত নয়। যদি পরিবর্তন চাই, তাহলে সবখানেই ধর্মের দিকে ফিরে আসতে হবে। কেননা আমরা মুসলিম বিশ্বে হয়তো করলাম কিছুটা, কিন্তু আমরা তো বিচ্ছিন্নভাবে থাকতে পারবো না। টিকতেও হয়তো পারবো না। এজন্য বিশ্বব্যাপী দরকার ধর্মে ফিরে যাওয়ার একটা আন্দোলন। খ্রিস্টান ও হিন্দুদের যদি এ রকম উদ্যোগ থাকে, এটাকে স্বাগত জানাই। তবে বিজেপির মতো হওয়া উচিত নয়, যেখানে মুসলিমবিরোধী একটা চেতনা আছে। বরং এ রকম হতে হবে যে, হিন্দু ধর্মের প্র্যাকটিস তারা পুরোপুরি করবে। নৈতিক মূল্যবোধ পুরা নেবে, আইন থাকলে তাও মানবে। কিন্তু অন্য ধর্মের লোকদের তারা মানবাধিকার দেবে। ইসলামের ক্ষেত্রে একই কথা। এ রকম হওয়া সম্ভব। পোপ বর্তমানে যেসব কথা বলছেন, তা এ রকমই। ব্যাক টু ফ্যামিলি ভ্যালুস, রিজেক্ট সেকুলারিজম–এ রকম কথাই বলছেন তিনি। চার্চ অব ক্যান্টারবারি এ কথাই বলছেন। কারণ, হয়তো বস্তুবাদ, সেকুলারিজম ও নাস্তিকতার প্রভাব তারা বেশি অনুভব করছেন। তার প্রভাব এই রোবটের মতো লোকগুলোর ওপর কতটা পড়বে, যদি মৌলিক শিক্ষা সংশোধন না করা হয়? হ্যাঁ, তারা পারবেন যদি তাদের দাওয়াত খুব বেশি হয়। তাদের সত্যিকার মুভমেন্ট, সেখানে দাওয়াত থাকবে, যেমন আমরা বলি দাওয়াতের কথা। যেমন ইসলামপন্থিরা যতই ত্রুটিপূর্ণ হোক না কেন, তারা বলে, আমাদের দাওয়াত দিতে হবে, লোকদের বোঝানোর চেষ্টা করতে হবে। আমরু বিল মারুফ করতে হবে। নেহি আনিল মুনকার করতে হবে। খ্রিস্টান ধর্মের তাৎপর্যও এটাই। ইসলামে বলা হয়েছে আমরু বিল মারুফ, কিন্তু খ্রিস্টান ধর্মে এই মূল কথাটা যে নেই, তা বলা যাবে না। নিশ্চয়ই ঈসা (আঃ) চেয়েছেন যে, ধর্মের কথা অন্যদের বলো। চার্চের এ ব্যাপারে অনেক দায়িত্ব। তাদের ভালো লোকদের অনেক দায়িত্ব আছে এটা করার জন্য।

গোটা বিশ্বেই ব্যাক টু রিলিজিয়ন, ব্যাক টু মোরালিটি, ব্যাক টু এথিকস–এটা হতে হবে। না হলে মানুষের মুক্তি নেই। মানুষ একেবারেই বর্বর, স্বার্থপর হয়ে যাচ্ছে। প্রতারক, বাটপাড়, লোভী হয়ে যাচ্ছে। জাতির ওপর জাতির অত্যাচার, ব্যক্তির ওপর ব্যক্তির অত্যাচার, শ্রেণির ওপর শ্রেণির



www.pathagar.com

অত্যাচার। সব সম্পদই একমাত্র আমেরিকার—এটা কী করে হলো? এটা তো অত্যাচারেরই অন্য নাম। কাজেই অনেক মৌলিক প্রশ্ন এর সাথে জড়িত। আমাদের দেশে ইতিহাস চর্চা হচ্ছে না, তা বলবো না। হচ্ছে এই অর্থে যে, আমরা যে ইতিহাস পড়ি, উপমহাদেশের যে ইতিহাস পড়ি, কম-বেশি কিছু ভালো লেখক আছেন যারা সেটা লিখছেন। তবে কিছু লেখক হয়তো বা বিকৃত করছেন। বেশিরভাগ লেখকই ভালো লিখছেন। কিন্তু আমাদের ইতিহাসের কোথাও কোথাও যেসব বিকৃতি চলে আসছে, সেসব দূর করতে হবে। এটা করতে হবে একদল সাহসী লোককে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর জন্ম নিয়েছে, এমন লোক তা করতে পারবে, আগের লোকেরা পারবে না। ইতিহাস আপন গতিতে চলে; এটা এই অর্থে ঠিক যে কোনো এক ব্যক্তি ইতিহাস নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। ইতিহাসে কোটি কোটি লোক জড়িত। তাই একটা ছোট গোষ্ঠি এটা বদলাতে পারবে না। রেকর্ডিং ভুল হতে পারে, কিন্তু কেউ না কেউ সেই রেকর্ডিং চ্যালেঞ্জ করবে। যেমন আওরঙ্গজেব নিয়ে অনেক কথা আছে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে হিন্দু ঐতিহাসিকেরাই বলছেন, এগুলোর অনেক কিছুই মিথ্যা। মনে করি ইতিহাস নিজের গতিতে চলে এই অর্থে যে, কোনো এক ব্যক্তি এটাকে বদলাতে পারে না। কারো হাতে এটার নিয়ন্ত্রণ নেই। একটা পার্টিও এটা নিয়ন্ত্রণ করে না। কোটি লোকের যে একটা গতি, কোটি লোকের যে একটা মিলিত চিন্তা, এর প্রতিফলন ঘটবেই।

আমার মনে হয়, ইতিহাস আমাদের পড়ানো হচ্ছে না। এসএসসিতেও ইতিহাস খুব ভালো করে নেই। তাদের বোধহয় সীমাবদ্ধতাও আছে, এত সাবজেক্ট কোনটা ছেড়ে কোনটা পড়াবে। কিন্তু ইতিহাস পড়তে হবে। কিছু হলেও পড়তে হবে। ওপরের দিকে ইতিহাস থাকতে হবে। গ্র্যাজুয়েশন কোর্সে যে সাবজেক্টই পড়ুক, একটা অংশ ইতিহাসের ওপর পড়া উচিত। শুনেছি, হার্ভার্ডে যে সাবজেক্টেই পড়ুক, ইতিহাস যেহেতু বেসিক একটা নলেজ, এটা পড়তে হবে। এখন আমাদের কোনো কোর্স যদি একশ' ত্রিশ ক্রেডিটের হয়, তার মধ্যে আমরা যা পড়াচ্ছি, সবটাই পড়ালাম। কিন্তু অর্ধেক অর্থাৎ ৬৫ ক্রেডিটে পড়ালাম। বাকিটা আমরা দশ সাবজেক্ট পড়ালাম। তাহলে একটা ব্যাপক উপলব্ধি হবে। কিভাবে করতে হবে, কবে হবে জানি না। কিন্তু করতে হবে। ইতিহাস ও সাহিত্যকে উপেক্ষা করা যাবে না।

ঐতিহাসিকভাবেই মানতে হবে, কালচারের ভিত্তি ধর্মই ছিল। এটা না মানা মানে বাড়াবাড়ি। হিন্দুদের ক্ষেত্রে হিন্দু ধর্ম প্রাথমিকভাবে। মুসলিমদের ক্ষেত্রে ইসলাম ধর্ম, আর অন্যরা মাইনর গ্রুপ। খ্রিস্টানরা তো অনেক পরে এসেছে। বৌদ্ধ ধর্মই বৌদ্ধদের কালচারের ভিত্তি ছিল। পরবর্তী সময়ে একটা কালচার এসেছে পশ্চিমাদের থেকে। সেটা সবাইকে কম-বেশি প্রভাবিত করছে। ড্রেস প্যাটার্নে, ভাষায়, বিনোদনে প্রভাব পড়েছে। যেটুকু ভালো এটুকু হয়তো বা বাদ দেয়া যাবে না। কিন্তু যা মন্দ তা গ্রহণ করা উচিত নয়।



www.pathagar.com

তাই আমাদের বর্তমান কালচারে একটা মিশ্রণ ঘটছে। দেশে একটা মিক্সড কালচার সৃষ্টি করার চেষ্টা হচ্ছে, যেন এখানে হিন্দু ধর্ম ও ইসলাম মিশে যায়। অথবা এর কাছাকাছি যেন চলে আসে ধর্ম হিসেবে। এখানে মঙ্গল প্রদীপ দিয়ে শুরু করা হবে। আর্ট কলেজ বেসিক্যালি হিন্দু থটভিত্তিক বা হিন্দু প্র্যাকটিসভিত্তিক হবে। কিন্তু আমি মনে করি, মানুষের মৌলিক পরিচয় হচ্ছে ধর্ম। কুরআনও তাই বলে। আল্লাহ পাক সূরা বাকারায় বলেছেন, 'লা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন'-তোমরা মৃত্যুবরণ কোরো না, যতক্ষণ না তোমরা মুসলিম হয়েছো। অবাক লাগে, আল্লাহ তায়ালা বললেন না যে, আমেরিকান বা পাঞ্জাবি বা ভারতীয় না হয়ে মোরো না। কিংবা বাঙালি না হয়ে মোরো না। এটা প্রমাণ করে-রাব্বুল আলামিনের কাছে মূল পরিচয় হচ্ছে মুসলিম পরিচয়। তাই হিন্দু ধর্ম একজন হিন্দুর আসল পরিচয়। এই পরিচয়ের ভিত্তিতে যদি বাংলাদেশে দুটি কালচার থাকে, তাতে সমস্যা নেই। এক রাষ্ট্রে কয়েকটা কালচার থাকতেই পারে। ভারত এক রাষ্ট্র হলেও অন্তত বিশটা ভাষা আছে সে দেশে। কী সমস্যা এতে? যে ভাষা বেশি চলে, সেটা রাষ্ট্রভাষা হলো। ইসলাম যারা মানে না, মুসলিম আইডেন্টিটির মধ্যে যে কোনো রকম আপোস নেই, এটা তারা বুঝতে পারে না। আমার একাধিক আইডেন্টিটি আছে। আমি একই সাথে কিশোরগঞ্জের মানুষ। একই সাথে বাংলাদেশের মানুষ। একই সাথে বাংলাভাষী। এটা মানতে পারছে না এরা। এখানে তারা মিক্সড আপ করতে চাচ্ছে। অথচ এটা অযথা। কাজেই ভিন্ন কালচারকে মেনে নেয়াই ভালো। কিন্তু একদল সেকুলার ইচ্ছা করে ইসলামকে দুর্বল করার জন্য বাঙালি কালচার এবং বাঙালিত্বকে বড় করে দেখাচ্ছে। বাঙালিত্বও একটা বিষয়। কিন্তু এটা মৌলিক নয়। বিশ্বাস যেমন মৌলিক, এক আল্লাহর ওপর বিশ্বাস ও আখিরাতে বিশ্বাস যেমন মৌলিক, কোন ভাষায় কথা বললাম এটা অতটা মৌলিক নয়। বিশ্বাসই মানুষের কার্যকে, সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে। সেই বিশ্বাস আসে ধর্ম থেকে। যে মূল্যবোধ মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে, সেটা আসছে ধর্ম থেকে। আমি কী মাছ খেলাম, এটা আমাকে নিয়ন্ত্রণ করে না। এ দেশের তৈরি সবজি খেলাম, এটা আমার জীবনধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে না। কিন্তু এটাকেই কিছু লোক প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছে। এই বিষয়টাকে মৌলিকভাবে চ্যালেঞ্জ করা দরকার। এটা করছে মূলত তারা, যারা ইসলামকে সহ্য করতে পারছে না। এটা করছে যারা নাস্তিক বা নাস্তিকের কাছাকাছি, তারা। যারা বামপন্থি, যারা না বুঝে মনে করছে আমাদের আর কিছু করার নেই, এখন ইসলাম বিরোধিতাই আমাদের একমাত্র কাজ। যেহেতু আমাদের কিছু করার নেই, আমরা কী প্রতিষ্ঠা করবো? সোসালিজম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। কমিউনিজম সম্ভব নয়। তাহলে আমরা কাজ নিলাম ইসলামবিরোধিতা করার-এমন মনোভাব। তাদের যে ব্যর্থতা তারা তা মানতে পারছে না। তাদের উচিত ছিল ইসলামকে বিচার-বিবেচনা করা। তারপর যদি এটা



www.pathagar.com

গ্রহণযোগ্য হয়, তাহলে গ্রহণ করা। কিন্তু সেই বিচার তারা করতে পারছে না। কারণ অন্ধ বিদ্বেষ দ্বারা তারা পরিচালিত। নিজেদের পরাজয় তারা মানতে পারছে না।

ইসলাম বলে মুনকার গ্রহণ কোরো না। শিরক আর ফাহেশা গ্রহণ কোরো না। এই তিনটা জিনিসকে বর্জন করে আমরা অন্য কিছু নিতেও পারি সাবধানতার সাথে; যদিও নেয়া কোনো বিজয়ী জাতির পরিচয় নয়। বিজয়ী জাতি নিজে উদ্ভাবন করে। ভারত থেকে যে কালচারটা আসছে, তার অর্ধেক হচ্ছে শিরকভিত্তিক, আর অর্ধেকটা হচ্ছে ওয়েস্টার্ন, এটা মুম্বাইতে হয়ে আসছে। এই দুটোই মুসলিমদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। অবস্থাটা এরকম যে, ওরা জিততে পারছে না। কিন্তু আমরাও জিততে পারছি না। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আস্তে আস্তে বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচার-প্রসার হচ্ছে। এমনকি বাংলাদেশেও দেখছি, ইসলামের প্রচার-প্রসার ঘটছে। এটা চূড়ান্ত পর্যায়ে বিজয়ী হবে। বামপন্থিদের ভিত্তিটা দুর্বল। পজিটিভ কোনো ভিত্তি নেই। 'লা ইলাহা' শুধু চলে না 'ইল্লাল্লাহু' ছাড়া। ওদের শুধু লা ইলাহা আছে, লা ইসলাম আছে। কিন্তু তার পরিবর্তে কিছু নেই। সেকুলারিজম কোনো পজিটিভ আইডিয়া নয়। এটা বলে 'ধর্ম থাকবে না রাষ্ট্রে'। ডেমোক্র্যাসি ইসলামেও আছে। স্টাইলে সামান্য কিছু বেশি-কম হতে পারে। আমার মনে হয়, এ ক্ষেত্রে জিতে যাবে ইসলামপন্থিরা, যদি তারা অনেকটা  তুরস্ক, তিউনিসিয়া ও মিসরের মতো বুদ্ধিমান হয়।

মনে হয়, অনেক সময় চলে গেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে চৌদ্দশ' বছর চলে গেছে। উনিশ শ' সাতচল্লিশের পরে এখানে প্রধানত মুসলিম আইডেন্টিটি ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে একটা অন্ধ জাতীয়তাবাদ চলে এলো। সেটা আমাদের মুসলিমত্ব কমিয়ে দিলো। কমিউনিস্টদের সফলতা হচ্ছে, তারা আমাদের মুসলিমত্ব ভোলাতে ও কমাতে পারছে। তবে এখন তাদের এই প্রচেষ্টা থমকে গেছে এ কারণে যে, ইসলামিস্টরা আবার কম-বেশি জেগে উঠেছে। তাদের মধ্যে ছোট হলেও একটা ইন্টেলেকচুয়াল গ্রুপ তৈরি হচ্ছে। বিশ্বব্যাপীই ইন্টারন্যাশনাল ইন্টেলেকচুয়াল গ্রুপের প্রভাব পড়ছে।

৩ মে ২০১২, দৈনিক নয়া দিগন্ত



www.pathagar.com

# পারিবারিক নির্যাতন একটি বিশ্ব সমস্যা

নারীর মর্যাদা রক্ষায় আগ্রহী আমার এক ভাতিজি যে আমেরিকায় পিএইচডি করার শেষ পর্যায়ে রয়েছে। আমাকে এক চিঠিতে লিখে -

> আপনি কি জানেন যে বাংলাদেশের গ্রামের এবং শহরের ইমামরা কি যৌতুক, স্ত্রীকে প্রহার, এসিড নিক্ষেপের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখার জন্য ট্রেনিং পেয়েছেন বা তাদের উদ্বুদ্ধ করা হয়? এ সবের ফলে বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত নারীরা কষ্ট পাচ্ছেন। আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানি বাংলাদেশের ওয়াজ-মাহফিলে ও খুতবাতে সাধারণত নারীদের স্বামীদেরকে মানতে, খেদমত করতে এবং সম্মান করতে বলা হয়। কিন্তু পুরুষদেরকে তাদের স্ত্রীদের সম্মান করতে কদাচিৎ বলা হয়। কোনো কোনো সময় আমি নিজে শুনেছি, এ ওয়াজকারীগণ পুরুষদের স্ত্রীর প্রতি ভালো ব্যবহার করতে বলেন। নিশ্চয়ই এটা ভালো কথা। কিন্তু ভালো ব্যবহার করা, দয়ালু হওয়া 'সম্মান করা' থেকে আলাদা। আমার কাছে মনে হয় যে যতক্ষণ না স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারিবারিক সম্মানবোধ হবে, ততদিন স্বামীর রাগের মাথায় স্ত্রীদের আঘাত করার প্রবণতা থেকে যাবে। কেননা, স্বামী সাধারণত শারীরিকভাবে শক্তিশালী হয়ে থাকে এবং কোনো কোনোভাবে নিজেকে উৎকৃষ্ট মনে করে। সুতরাং পুরুষরা বাড়ির কর্তা হিসেবে যেমন– ছেলেমেয়েদের শারীরিকভাবে শাস্তি দিতে পারে তেমনি স্ত্রীকেও শারীরিকভাবে শাসন করতে পারে বলে মনে করে।
>
> যদিও অধিকাংশ, বিশেষ করে মুসলিম সমাজে নারী ও শিশুদেরকে তাদের শারীরিক দুর্বলতার কারণে এক করে দেখার প্রবণতা রয়েছে, তথাপি আমি মনে করি নারীকে শিশুর সঙ্গে এক করে দেখা সঙ্গত নয়। তাকে পূর্ণ বয়স্ক পুরুষের মতোই মনে করতে হবে যে তারও পূর্ণ গঠিত মগজ ও অনুভূতি রয়েছে। তারও একই ধরনের সম্মান পাওয়ার অধিকার রয়েছে। আমি এসব উল্লেখ করছি, কেননা, ঐসব এখানে আমার এক বন্ধুর সঙ্গে আলোচনায় এসেছে।'



www.pathagar.com

আমি এর উত্তরে অত্যন্ত সংক্ষেপে লিখি যে:

> ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ মসজিদ মিশন - এসব সংগঠন ইমামদের ট্রেনিং দিয়ে থাকে। কিন্তু তাদের ট্রেনিং প্রোগ্রামে এমন কিছু আছে বলে জানি না যে স্ত্রীকে মারা একটি নিন্দনীয় কাজ এবং একটি অপরাধ। তবে ইমামরা এসিড নিক্ষেপ ও যৌতুকের বিরুদ্ধে কখনো কখনো কথা বলে থাকেন। তোমার এ কথা সঠিক যে, তারা স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্মান অথবা নারীর প্রতি সম্মান করার কথা কদাচিৎ বলে থাকেন। তারা প্রকৃতপক্ষে এসব শব্দের পার্থক্যের তাৎপর্য বুঝে বলেন বলে আমার মনে হয় না। যারা নিয়মিত আলোচনা করেন তাদের কেউ কেউ নারীর প্রতি অত্যন্ত সম্মানসূচক আলোচনা করে থাকেন। আমার কোনো সন্দেহ নেই, অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে। সামনে মুসলিম নারীর অবস্থা আরো দ্রুত পরিবর্তন হবে।

এর উত্তরে আমার ভাতিজি একটি লম্বা পত্র দেয়। এর সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ: 'আমার মনে পড়ে অল্প বয়সে আমি পত্রিকা পড়ার সময় দেখতাম প্রত্যেকদিন স্ত্রীকে প্রহার করার ঘটনা। আমাদের প্রতিবেশী এবং আত্মীয়দের মধ্যেও আমি এসব গৃহবিবাদের (domestic abase) কথা শুনতাম। পাশ্চাত্যে এর মূল কারণ মদ এবং মাদকজাতীয় দ্রব্য (alcohol and drugs)। কিন্তু ইসলামে এসব হারাম। সুতরাং মুসলমানদের মধ্যে এগুলো হবে কেন? আমার মনে হয় ইমামদের খুব ভালো করে শিক্ষা দিতে হবে। তাহলে হয়তো ফল হতে পারে।

আমি কোনো মাওলানাকে বলতে শুনি না যে, যেসব নারীর শিক্ষার জন্য তাদের পিতামাতা অনেক অর্থ ব্যয় করেছেন, ঐসব নারীও যুগের প্রেক্ষাপটে বেশি সময় ধরে অনেক বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন এবং এখন যদি তাদের শিক্ষা অনুযায়ী কাজ করতে চান তাহলে তাদের স্বামীদের উচিত ঘরের কাজে সাহায্য করা এবং স্ত্রীদেরকে তাদের শিক্ষা অনুযায়ী কাজ করতে সুযোগ করে দেয়া। আমার মনে হয় মাওলানাদের যদি সুযোগ থাকতো তাহলে অধিকাংশ বিষয়ে নারীরা হয়তো পড়াশোনারই সুযোগ পেত না। কেননা, মাওলানাদের অধিকাংশই মনে করেন, মেয়েদের কাজ হচ্ছে ঘর-সংসার করা। যদি একজন মহিলা পদার্থবিদ্যা পড়ে পদার্থবিদ হন যে কাজে হয়তো তাকে ল্যাবরেটরিতে অনেক সময় দিতে হয়, তাহলে তার স্বামীর চা কে বানাবে?

চাচা, আমি আপনার কাছে স্বীকার করছি, যদিও অন্য কোথাও বলব না যে নারী হিসেবে আমি আমেরিকায় আমার নিজের দেশ থেকে অনেক বেশি সম্মান পাই। চাচা আমি আপনার কাছে আমার কিছু দুঃখ প্রকাশ করছি।'

এর উত্তরে আমি বিস্তারিত লিখেছি। তাতে নারী সমস্যার অনেক দিক তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আমি লিখেছি - 'স্নেহের ভাতিজি, আমি তোমার সঙ্গে একমত যে, পাশ্চাত্যের তুলনায় মুসলিম বিশ্বে মদ ও মাদকদ্রব্যের সমস্যা কম



www.pathagar.com

হওয়ার কারণে এখানে স্ত্রীর উপর শারীরিক নির্যাতন (wife abuse) হওয়ার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। কুরআনেও এর কোনো সত্যিকার ভিত্তি নেই। কিছু লোক অবশ্য তাদের আচরণকে যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ করার জন্য কোনো কোনো আয়াতের অপব্যাখ্যা করে। এটি অবশ্য একটি ভিন্ন বিষয়, যার উপর তুমি ড. আব্দুল হামিদ আবু সুলেমানের বই 'Marital Discord' পড়ে দেখতে পার।

পূর্বেও আমি বলেছি, আমার মনে হয় নারীদেরকে অন্তত প্রকাশ্যে পাশ্চাত্যে অধিক সম্মান করা হয়। কিন্তু আম্মু! আমি নিশ্চিত নই যে, এ সম্মান প্রদানে তারা কতটুকু আন্তরিক। আমি পড়ে থাকি এবং শুনে থাকি যে সেসব দেশের নারীরা ধর্ষণের (rape) ভয়ে সবসময় আতঙ্কিত থাকে। এ ব্যাপারে আমি তোমার কাছে সত্য জানতে চাই।

আমার মনে হয় মুসলিম বিশ্বে মানবাধিকার এবং সহনশীলতার ব্যাপারে গভীর (serious) সমস্যা আছে। এটি হওয়ার কারণ হলো, এখানে নানা কারণে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ শিকড় গাড়তে পারেনি। এমনকি পাশ্চাত্যও কিছু ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের উপর একনায়কত্বকে পছন্দ (favor) করেছে। আমি বিশ্বাস করি, মুসলিম বিশ্বে গণতন্ত্রের অগ্রগতি হবে। তাহলে সকল সংখ্যালঘু এবং অসুবিধাগ্রস্তরা সুবিধা পাবে।

আম্মু! আমি মনে করি, পুরুষরা আরো বহুদিন এরকমই থাকবে। তারা তাদের স্ত্রীদের কাছে চা এবং খাবার চাইবে। আমি জানি না, কিভাবে এর পরিবর্তন হবে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, এটা চিরদিন চলতে পারে না। আমি বুঝি না, যেখানে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল রাষ্ট্রীয় এবং নবীজীবনের দায়িত্বের ব্যস্ততা সত্ত্বেও ঘরের কাজ করতেন, সেখানে আমরা পুরুষরা কেন ঘরের কাজে সহায়তা করব না?'

Domestic Violence বা পারিবারিক নির্যাতন বা স্ত্রী নির্যাতনের সমস্যাটি একটি বিশ্বজনীন সমস্যা। আমাদের এ বিষয়ে গভীর নজর দিতে হবে এবং এ সমস্যার সমাধান করতে হবে।



www.pathagar.com

# বিশ্বের সবচেয়ে বড় সমস্যা স্রষ্টাকে ভুলে যাওয়া

দার্শনিকভাবে দেখলে, বিশ্বের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে আল্লাহকে ভুলে যাওয়া, স্রষ্টাকে ভুলে যাওয়া। আল্লাহ নিজেই বলেছেন, 'ইয়া আইয়্যুহাল ইনসানু মা গাররাকা বি রাব্বিকাল কারিম' অর্থাৎ 'হে, মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহিমান্বিত রব সম্পর্কে উদাসীন করল?' (কুরআন ৮২: ৬)।

সত্যিকার অর্থেই বেশির ভাগ মানুষ বাস্তবে স্রষ্টাকে ভুলে গিয়েছে। ইউরোপ-আমেরিকায় নাস্তিকের সংখ্যা অনেক। রাশিয়া পূর্বে অফিসিয়ালি নাস্তিক ছিল। এখনো সেখানে নাস্তিকতার হার কম নয় বরং অনেক হবে। অন্যদিকে যারা বিশ্বাসী বলে দাবি করে তাদের মধ্যেও অনেকে সন্দেহবাদী (skeptic)। অর্থাৎ বলবে না স্রষ্টা নেই। কিন্তু বাস্তবে স্রষ্টাকে স্মরণ করবে না বা তাঁর আদেশ মেনে চলবে না। স্রষ্টাকে মেনে চলে, এ রকম লোকের সংখ্যা খুব কম।

খ্রিস্টানদের মধ্যে যারা স্রষ্টাকে বিশ্বাস করে, তাদের মধ্যে স্রষ্টার কার্যকর আনুগত্য কম। সে তুলনায় মুসলমানদের অবস্থা ভালো। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে নাস্তিক নেই বললেই চলে এবং যারা বিশ্বাসী তারা কোনো না কোনো পর্যায়ে আমল করে। যারা নিজেদেরকে সেকুলার বলে দাবি করেন, তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত আমল করেন। তারাও নামাজ পড়েন, ইফতার করেন, সেহেরি খান, হালাল-হারাম দেখে চলেন। তারাও কুরবানি, হজ, ওমরা ও ঈদ পালন করেন। সুতরাং মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের অনুশীলন তুলনামূলক ভালো।

স্রষ্টাকে ভুলে যাওয়ার ফলে দুটি সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। একটি হলো বস্তুবাদ ও নাস্তিকতা। আরেকটি হলো গোঁড়া সেকুলারিজম। সেটিও স্রষ্টাকে প্রায় অস্বীকার করার কাছাকাছি একটি অবস্থা। বিশ্ব সংকটের মূলে কাজ করছে এ দুটি–একদিকে বস্তুবাদ ও নাস্তিকতা এবং অন্যদিকে সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ।

স্রষ্টাকে ভুলে যাওয়ার প্রভাব শিক্ষাব্যবস্থার উপরও পড়েছে। শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে সেকুলারিজমের উপর দাঁড়িয়ে আছে। বর্তমান বিজ্ঞান শিক্ষাতে রয়েছে সেকুলারিজমের গভীর ছাপ। ইউরোপের পণ্ডিতরা এমনকি বর্তমানে মুসলমান বিজ্ঞানীরাও তাদের বইগুলো 'বিসমিল্লাহির রাহম্যানির রাহিম' দিয়ে



www.pathagar.com

শুরু করেন না। কিন্তু মুসলমানরা যখন বিজ্ঞানে উন্নতি করল (চিন ও ভারত থেকে গ্রহণ করে), তখন তারা অনেক দিকে বিজ্ঞানের বিস্তার ঘটাল। সে সময় ঐসব মুসলমানরা তাদের বিজ্ঞানের প্রত্যেক বই 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' দিয়ে শুরু করতেন। তারা স্রষ্টায় বিশ্বাসী ছিলেন গভীরভাবে। কিন্তু ইউরোপীয় বিজ্ঞানীরা বিশ্বাসী না হওয়ায় (অথবা সেকুলার হওয়ায় কিংবা স্রষ্টায় বিশ্বাস করা তাদের কাছে একটি লজ্জার বিষয় হওয়ায়) তারা স্রষ্টার কথা উল্লেখ করেন না। আমাদের মুসলিম বিজ্ঞানীরা এটি এখন লিখতে পারেন; কিন্তু তারাও লিখছেন না। এখন না লেখা রেওয়াজ হয়ে গেছে। অথচ আগে লেখাটাই রীতি ছিল।

এখন বিজ্ঞানের বইগুলোতে আল্লাহ বা গড শব্দের উল্লেখ নেই। স্রষ্টা (creator) শব্দটি লেখা হয় না। এটি একটি অদ্ভুত ব্যাপার। কোথাও কোথাও প্রকৃতি (Nature) শব্দের উল্লেখ আছে। কিন্তু এই প্রকৃতি কী সেটি একেবারেই স্পষ্ট নয়। তারা একবারও ভাবে না যে, এসব প্রাকৃতিক আইন আছে কিভাবে, আইনপ্রণেতা ছাড়া কি কোনো আইন হয়? তারা নাকি খুব যুক্তিবাদী, কিন্তু আমি তো কোনো যুক্তি দেখছি না।

আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক ভালো দিক আছে, অনেক অবদান আছে–তা আমরা মানি। কিন্তু এর পেছনে কাজ করছে এমন একটি মন যেটি স্রষ্টার প্রশ্নে, আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয়বাদিতায় ভুগছে। স্রষ্টাকে স্পষ্ট স্বীকৃতি দিচ্ছে না; আল্লাহর নাম উল্লেখ করছে না; এটি উল্লেখ করা সভ্যতাবিরোধী মনে করছে, এটি একটি পশ্চাৎপদ ব্যাপার মনে করছে। এই যে ধারণা এটা আমাদের কালচারকে খারাপ করে ফেলছে। আমাদের কালচারে সংশয়বাদ ও নাস্তিকতার প্রভাব পড়ছে।

সমাজবিজ্ঞানেরও একই রকম অবস্থা। সমাজতত্ত্ব ধরেই নেবে যে ধর্ম একটি মানবসৃষ্ট বিষয়। অথচ সমাজবিজ্ঞানীগণ এভাবে দেখাতে পারতেন যে, স্রষ্টাই আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন; আমাদেরকে একটি সামাজিক প্রবণতা বা সামাজিক মন দিয়েছেন। স্রষ্টার সার্বিক পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই আমাদের মধ্যে সমাজবদ্ধ হওয়ার মানসিকতা রয়েছে। এজন্য আমরা একতাবদ্ধ হই এবং সমাজ গঠন করি।

শিক্ষা ক্ষেত্রে অন্যান্য ডিসিপ্লিনেরও একই অবস্থা। যেমন–নৃবিজ্ঞানও স্বীকার করছে না যে, মানুষকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। এটিকে বিজ্ঞানীগণ একেবারেই বাদ দিয়ে দিচ্ছেন। নৃবিজ্ঞান মানব সৃষ্টির ইতিহাস বের করার চেষ্টা করছে মাটি খুঁড়ে বের করা হাড় এবং অন্যান্য নৃতাত্ত্বিক চিহ্ন থেকে। এসব থেকে তারা যে ইতিহাস লিখছে তাতে তারা বলছে, মানুষ এমনি এমনিই হয়েছে; কোনো স্রষ্টা নেই।

এখানে উল্লেখ করতে চাই যে, দারিদ্র্য বিশ্বের একটি বড় সংকট, দারিদ্র্যের কারণে মানুষের একটি বিরাট অংশ ভালো হতে পারে না। এ সংকটের মূলেও



www.pathagar.com

রয়েছে ঐ আল্লাহকে না মানা, বস্তুবাদ এবং সেকুলারিজম। মানুষ বস্তুবাদী হয়ে গেছে। গরীবের জন্য, দারিদ্র্য দূর করার জন্য কাজ করার প্রয়োজনীয়তা সে উপলব্ধি করছে না। অনেকেই দারিদ্র্য দূর করার জন্য ওয়াদা করে থাকে। আসলে তারা ওয়াদা করার জন্য ওয়াদা করে, কথা বলার জন্য বলে। সত্যিই কি কার্যকরভাবে তারা এগুলো চায়? বিশেষ করে দেশের পুঁজিবাদীরা এগুলো চায় না বলেই মনে হয়। কারণ পুঁজিবাদের তত্ত্বে গরীবের কথা নেই। প্রফিটের কথা আছে, মুক্তবাজারের কথা আছে। সেখানে সরকারি হস্তক্ষেপ না করার কথা বলা হয়েছে। বিভিন্ন ব্যবস্থা নেয়ার মাধ্যমে বাজারের বিকৃতি (Market distortion) দূর করার কথা পুঁজিবাদী তত্ত্বের কোথাও নেই। গরিবের ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে হবে–এটা পুঁজিবাদের কোথাও বলা নেই। যদিও এটা এখন পুঁজিবাদী দেশে করা হচ্ছে। কিন্তু এ ব্যবস্থা তারা পুঁজিবাদের কাঠামো থেকে বের হয়ে এসেই নিচ্ছে। উপনিবেশবাদ (Colonialism) এবং সাম্রাজ্যবাদ (Imperialism)-ও এসেছে বস্তুবাদ থেকেই। নিজের ভোগ ও জাতির ভোগের প্রেরণা থেকেই এসবের উৎপত্তি। এ সবকিছুর মূল উদ্দেশ্য মানুষকে শোষণ (exploit) করা। এই যে বস্তুবাদী স্বার্থপরতা এবং পুঁজিবাদ–এসব পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। এ সবকিছু মিলে মানুষকে দায়িত্বহীন বানিয়েছে, তাকে ভোগবাদী করে তুলেছে। দায়িত্বশীল কাদেরকে বলা যেতে পারে? যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং দুনিয়াকে শোষণ করে না।

সুতরাং সকল সমস্যার মূল কারণ যদি বলতে হয় তাহলে আমি বলব, 'স্রষ্টাকে ভুলে যাওয়া'। এজন্য যুগে যুগে নবী-রাসূলরা আহ্বান করেছেন আল্লাহকে মানো এবং বলো, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই।

এ সমস্যার সমাধান হচ্ছে মানুষের মধ্যে স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা। মুসলিমদের এমনকি অমুসলিমদের জন্যও বলব, যেকোনো ধর্মের প্রতি বিশ্বাস নাস্তিকতা থেকে ভালো। প্রত্যেক ধর্মের একটা এথিক্স বা নীতিবোধ আছে। নাস্তিকতার কোনো নীতিবোধ নেই। এটি তো নিজেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন মনে করে। নাস্তিক বিশ্বাস করে যে তার কোনো বিচার হবে না, তার কোনো জবাবদিহিতা নেই; সুতরাং দুনিয়ায় যা ইচ্ছা সে করতে পারে। এ ধরনের লোক সমাজের জন্য ভয়ঙ্কর। এজন্য সবার মধ্যে স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে হবে। আল্লাহকে চেনাতে হবে যতদূর সম্ভব। সঠিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এভাবেই সমাজ তথা বিশ্ব থেকে স্বার্থপরতা দূর হতে পারে, সমাজের মূল রোগ তথা মূল সমস্যা দূর হতে পারে।



www.pathagar.com

# ধর্মীয় মিলিট্যান্সির উপর বিআইআইএসএস-এর সেমিনারে আমার অংশগ্রহণ ও অভিজ্ঞতা

ফরাসি ও জার্মান দূতাবাস এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এন্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস)-এর যৌথ উদ্যোগে ২০০৪ সালের ১০-১৩ অক্টোবর বিআইআইএসএস-এ একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এর বিষয় ছিল Religious Militancy and Security in South Asia। অর্থাৎ দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তা ও ধর্মীয় জঙ্গিবাদ। এই সেমিনারের উদ্বোধন করেন তদানীন্তন আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ। তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। তিনি গুরুত্বের সাথেই বলেন, ইসলাম আমাদের অন্য ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুই হতে শিখিয়েছে। কোনোরকম অসহিষ্ণুতা শেখায়নি। বাংলাদেশের বহু শতাব্দীর সহিষ্ণুতার ঐতিহ্য রয়েছে। বাংলাদেশ ধর্মীয় দৃষ্টিতে বর্তমান সময়ের অন্যতম শান্তিপূর্ণ দেশ। এটা আমাদের বিরুদ্ধে একটি প্রোপাগান্ডা যে, বাংলাদেশের আমরা সবাই মৌলবাদী হয়ে গেছি। এ ধরনের বক্তব্য, যা সাধারণত বিভিন্ন কর্নার থেকে আসে সে সম্পর্কে তিনি বলেন এগুলো মূলত অপপ্রচার। তিনি জোর দিয়ে বলেন এ ধরনের অবস্থা বাংলাদেশে কখনো হবে না। এটা ভারতে হতে পারে। তিনি আরো বলেন, কোনো জিনিস না থাকলেও তা বড় করে দেখানো হলে প্রোপাগান্ডার কারণে বড় হয়ে যায়। তিনি আরো বলেন, চারদলীয় জোট সরকার সব ধরনের টেররিজমের বিরুদ্ধে সেটা যে নামেই হোক না কেন, যার পক্ষ থেকেই হোক না কেন, দেশি-বিদেশি যেই হোক না কেন। তিনি এ কথাগুলো তুলে এনে স্পষ্ট বক্তব্য দেন। তিনি আহমদিয়া ইস্যুকে একটি লোকাল ইস্যু হিসেবেই মন্তব্য করেন। এটা কোনো জাতীয় ইস্যু নয়। যদি কেউ আইন ভঙ্গ করে, শাস্তি পাবে। আমি এ প্রসঙ্গে বলেছি, আমরা জানি যে, ইতোমধ্যে মাওলানা উবায়দুল হকসহ দেশের শ্রেষ্ঠ আলেমগণকে নিয়ে গঠিত জাতীয় শরিয়াহ কাউন্সিল এক সংবাদ সম্মেলনে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, ইসলাম কোনো সন্ত্রাসের পক্ষে নয়। আহমদিয়া ইস্যুতেও তারা বলেছেন, তারা আহমদিয়াদের অমুসলিম বলেই মনে করেন এবং সরকারের উচিত তাদের অমুসলিম ঘোষণা করা। কিন্তু তাদের ধর্মীয় স্থানের বা তাদের উপরে কোনো প্রকার আঘাতকে তারা সমর্থন করেন না।



www.pathagar.com

ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ আরো উল্লেখ করেন, ভারতে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের মতো ঘটনা ঘটলেও বাংলাদেশে তার প্রতিক্রিয়ায় তেমন কিছু ঘটেনি। বর্তমানে আমাদের আইন শৃঙ্খলার যে পরিস্থিতি তাতে দারিদ্র্যও একটি বড় কারণ। এটি আমাদেরকে দূর করতে হবে। এ জন্যই সরকার দারিদ্র্য বিমোচনের চেষ্টা করছে। তিনি বলেন, ৯/১১ এর পর থেকে দুনিয়া পরিবর্তন হচ্ছে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যেন ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না হয়ে যায়। উদ্বোধনের পর প্রথম দিনে দুটি কার্য অধিবেশন ছিল। প্রথম অধিবেশনে দুজনে দুটি প্রবন্ধ পড়েন। প্রথম প্রবন্ধ পড়েন মালদ্বীপের তথ্য মন্ত্রণালয়ের ডাইরেক্টর জেনারেল ইব্রাহিম ওয়াহিদ এবং অন্যটি পড়েন সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটি ঢাকার ভাইস চ্যান্সেলর ড. এম শমসের আলী। এই সেশনের বিষয় ছিল Frameworking Religious Militancy। ধর্মীয় উগ্রতা বলতে আমরা কী বুঝবো? এ প্রসঙ্গে তারা যেভাবে সেমিনারে রিলিজিয়াস মিলিট্যান্সির সাবজেক্ট খাড়া করা হয়েছে তা কতটা যুক্তিসংগত হয়েছে তার প্রশ্ন তোলেন। ড. শমসের আলী বলেন ধর্ম বা ইসলাম মিলিট্যান্সির কারণ নয়। সব ধর্মই শান্তির কথা বলে। যারা অপব্যবহার করে তারাই শুধু দায়ী। ধর্মকে দায়ী করা ঠিক হবে না। তিনি মৌলবাদের যে ব্যবহার তা বড় ধরনের অপব্যবহার বলে উল্লেখ করেন এবং তার নিন্দা করেন। এটা ব্যবহার করা সংগত নয় বলে তিনি মন্তব্য প্রকাশ করেন।

এ অধিবেশনে আমি আলোচনায় অংশ নিয়ে কয়েকটি বিষয়ের উপর কথা বলি। আমি এই সেমিনারের যে ছয়টি কর্ম অধিবেশন হয়েছিল তার পাঁচটিতে অংশ নিয়েছিলাম। প্রথম কর্ম অধিবেশনে আলোচনায় আমি বলি, এই যে রিলিজিয়াস মিলিট্যান্সি বলা হচ্ছে, অন্যান্য মিলিট্যান্সি বা উগ্রতা থেকে বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে–এটা একটা পক্ষপাতিত্বের কারণে হচ্ছে। এটা একটা মতলব হাসিলের জন্য করা হচ্ছে। এর কোনো যুক্তিসংগত কারণ নেই। কেন অন্য কোনো মিলিট্যান্সির স্টাডি না করে আমরা শুধু রিলিজিয়াস মিলিট্যান্সির স্টাডি করবো। আমি আরো বলি, বিশ্বে মিলিট্যান্সি নামে যা হচ্ছে তার বেশির ভাগই রাজনৈতিক ধরনের। এগুলো ধর্মীয় ধরনের নয়। ফিলিস্তিনে যা কিছু হচ্ছে তা মূলত রাজনৈতিক ধরনের। কাশ্মীর, ইরাক, চেচনিয়াতে যা কিছু হচ্ছে তা মূলত রাজনৈতিক ধরনের, ধর্মীয় বলা ঠিক হবে না।

আমি লক্ষ্য করেছি, মিলিট্যান্সি সম্পর্কে যেসব আলোচনা হয়েছে তাতে ইসলামী রাষ্ট্র করা বা করতে চেষ্টা করাই যেন অপরাধ। সেখানে আমি বলেছিলাম, ইসলামী রাষ্ট্র করা কোনো ভুল হতে পারে না যদি তা গণতান্ত্রিকভাবে, সাংবিধানিকভাবে করা হয়, আইনসংগতভাবে করা হয়। সেটা রাজনীতির অংশ হিসেবে হতে হবে। আরেকটি শর্ত হচ্ছে, অন্যান্য ধর্মের অধিকার যেন এতে নষ্ট না হয়। ইসলামী রাজনীতি করা কোনো অপরাধ হতে পারে না এ কথাও সেখানে বলেছিলাম। আমি আরো বলেছিলাম, ধর্মীয় উগ্রতা অনেক সময় রাষ্ট্রের পক্ষ থেকেও হতে পারে। যেমন ফ্রান্সে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে



www.pathagar.com

হিজাব নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। মুসলিম মেয়েরা সেখানে মাথা ঢেকে স্কুল-কলেজে বা সরকারি প্রতিষ্ঠানে যেতে পারবে না। এটা তো রাষ্ট্রের তরফ থেকে মিলিট্যান্সি। দ্বিতীয় সেশনে তিনটি পেপার পড়া হয়। এর মধ্যে একটি পেপার সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেটা হচ্ছে জেরেমি কডরোর পেপার। ফ্রান্সের এই তরুণ স্কলার পিএইচডি থিসিস করছেন। তার বিষয় ছিল From Jihad to Politics: Nationalisation of Bangladesh Islamist Party। এর উপর তিনি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর উপর স্টাডি করেন। সেখানে তিনি দেখান, বাংলাদেশ হওয়ার আগেও জামায়াতে ইসলামী জিহাদের ইস্যুতে তাদের মত পরিবর্তন করেছিল। তিনি উল্লেখ করেন, ১৯৭০-এর নির্বাচনে জামায়াত আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা দেয়ার দাবি করে এবং পরবর্তী সময়ে ১৯৭১-এ সামরিক বাহিনীকে সমর্থন দেয় এবং পরে আবার বাংলাদেশকে পুরোপুরি মেনে নেয়। এর মধ্য দিয়ে তিনি বোঝাতে চাচ্ছেন যে, জামায়াতে ইসলামীর পলিসি পরিবর্তন হয়েছে। শেষে তিনি মন্তব্য করেছেন, বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামীর পলিসি বর্তমানে খুব প্রাগমেটিক। বাস্তববাদী হিসেবে তারা কাজ করছে। এটাকে পার্টির জাতীয়করণ হয়ে গেছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

আমি এই সেশনের উপরও বক্তব্য রেখেছিলাম। এর আলোকে আমি বলেছিলাম, লেখকের মধ্যে একটা সন্দেহ আছে যে যারা উম্মাহ নিয়ে চিন্তা করে তারা জাতীয় রাজনীতি করে কিভাবে? কিন্তু আমার আলোচনায় আমি ব্যাখ্যা করেছিলাম এভাবে–উম্মাহর সঙ্গে ন্যাশনাল স্টেট বা জাতীয় রাষ্ট্রের ধারণার কোনো বিরোধ নেই। কেননা, একই সঙ্গে আমাদের উম্মাহর অনুভূতি থাকতে পারে এবং আমরা জাতীয় রাষ্ট্রের সদস্য হতে পারি। ইসলামী শরিয়াহকে একটি জাতীয় রাষ্ট্রে যেমন বাংলাদেশে কার্যকরী করতে কোনো বাধা নেই। কারণ, শরিয়াহ যে কোনো রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা করা যায়। ইসলামের অন্যতম মূল হচ্ছে তার শরিয়াহ। এক সময় বিশ্বব্যাপী একটা খিলাফত রাষ্ট্র ছিল; কিন্তু বর্তমান পরিবর্তিত বিশ্ব রাজনীতিতে ৫০টি ইসলামী রাষ্ট্র যদি হয় এবং প্রত্যেকটি যদি শরিয়াহ বাস্তবায়ন করে তাহলে সেগুলো তো ইসলামী রাষ্ট্রই হলো। এরপর তিনি বলেছিলেন, জামায়াতে ইসলামী পলিসি Oscillate (বার বার পরিবর্তন) করেছে। তিনি এর দু-একটি উদাহরণ দিয়েছিলেন। আমি বলেছিলাম, একটি পার্টির দু-একটি পলিসি পরিবর্তনের ভিত্তিতে Oscillate (বারবার পরিবর্তন) করেছে বলা ঠিক নয়। সেটা তখনই ঠিক হয়, যখন একটা পার্টির পলিসি দ্রুত অনেক বিষয়ে পরিবর্তন হয়। কিন্তু জামায়াতে ইসলামীর ক্ষেত্রে এটা হয়েছে তা বলা যায় না। আরেকটি প্রসঙ্গ উঠেছিল যে, ইসলাম একটি ইউটোপিয়া-আকাশকুসুম কল্পনার মতো, তা বাস্তবে সম্ভব নয়। আমি এর বিরোধিতা করে বলেছিলাম, এটা সত্য নয়। ইসলাম খেলাফতে রাশেদিনের সময়, উমাইয়াদের সময়, আব্বাসীয়দের সময় কায়েম ছিল। সেগুলো ইসলামী রাষ্ট্রই ছিল। শুধু একটিই পার্থক্য যে, রাজতন্ত্র এসে গিয়েছিল। এটুকু বাদ দিলে অন্য সব ঠিক ছিল।



www.pathagar.com

বিষয়টি একটা উদাহরণ দিয়ে এই লেখায় বলা যায় যে, এটা একটা ঘরের মতো। এর যদি একটি জানালা বা একটি বেড়া ভেঙে যায় বা জীর্ণ হয়ে যায় তাহলে কি আমরা বলবো তা ঘর নয়? সুতরাং রাজতন্ত্র আসার জন্যই যে ইসলামী রাষ্ট্র ছিল না, তা বলা ঠিক নয়। তদুপরি ইসলামে পরবর্তী সময়ের যে রাজতন্ত্র তা ছিল ভিন্ন রকম। তাতে শরিয়াহই আইন হিসেবে গণ্য ছিল। কাজেই সাধারণ রাজতন্ত্রের সাথে এই রাজতন্ত্রের মিল খোঁজা ঠিক হবে না। সাধারণ রাজতন্ত্র নিজেই আইন। জেরেমি কডরো জামায়াতে ইসলামীর প্রশংসা করে বলেছিলেন, এরা বাস্তববাদী হয়ে গেছে। আমি সেক্ষেত্রে বলেছিলাম, বিশ্বব্যাপী অধিকাংশ ইসলামী দলই খুব বাস্তববাদী পলিসি অনুসরণ করে। যেমন–ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, তুরস্কের ইসলামী দলগুলো অনুসরণ করছে। এই সেমিনারে পরের দিন সকালের অধিবেশন ছিল Militant Religency and Interest of South Asia-এর উপর। এ অধিবেশনের চেয়ারম্যান ছিলেন সাবেক প্রধান বিচারপতি মোস্তফা কামাল সাহেব। জার্মানির ওয়াসনার ও ইন্ডিয়ার শান্দ্রিশ্রী পণ্ডিত প্রবন্ধ পড়েন। এই অধিবেশনে মোস্তফা কামাল সাহেব খুব গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, ধর্ম কোনো অশান্তির বিষয় নয়। পশ্চিমারাই সবখানে মিলিট্যান্সির সমস্যা সৃষ্টি করছে। তারা ফিলিস্তিনের সমস্যার সমাধান করেনি। তারা মিলিট্যান্সির জন্ম দিয়েছে; ইরাকে, আফগানিস্তানে আক্রমণ করেছে। তারা ফ্রান্সে হিজাব নিষিদ্ধ করেছে। এসব করে তারা মিলিট্যান্সির জন্ম দিচ্ছে। তিনি আরো বলেন, ওয়েস্টের মানবাধিকারের কথা বলাটা মানায় না।

এর পরের সেশন ছিল খুবই বিতর্কমূলক। সেটাতে পাকিস্তানের এক ভদ্রলোক যে পেপার পড়েন তা নিয়ে তেমন বিতর্ক হয়নি। কিন্তু আরেকটি পেপার ছিল ফ্রান্স ক্রিপেনবার্গের পেপার, যা নিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় হেডিং হয়। তার প্রবন্ধের নাম ছিল The Terror as Worship অর্থাৎ সন্ত্রাসকেই ইবাদত মনে করা বা গাইডবুক মনে করা। তিনি তাতে উল্লেখ করেন, ৯/১১-এর ঘটনার সাথে যেসব লোক জড়িত ছিল তাদের বাসস্থান চেক করে এফবিআই চার পাতার একটি ডকুমেন্ট পায়। তাতে লেখা ছিল–আগের রাতে কী কী দোআ-দরূদ পড়তে হবে, কী কী ভাবতে হবে, কীভাবে গোসল করতে হবে, যাতে তারা শহীদি মৃত্যুর জন্য তৈরি হবে, প্লেনে ওঠার আগে কী কী করতে হবে, ওঠার পর কী কী করতে হবে, ফাইনাল অপারেশনের সময় কী কী করতে হবে। তিনি বলেছেন, এগুলোকে কেউ বানোয়াট মনে করলেও আমি গুরুত্বপূর্ণ মনে করি এজন্যই যে, এর সাথে ইসলামের ইতিহাসের অনেক বক্তব্যের সঙ্গতি আছে। কারণ, ইতিহাসে জিহাদে নিয়তের কথা বলা হয়েছে। এসব ডকুমেন্টেও নিয়তের কথা বলা হয়েছে। তারা আমেরিকাকে জাহেলি সমাজ বলেছে। সাইয়েদ কুতুব এসব কিছুকে জাহেলি সমাজ বলেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি সূরা আনফাল ও তাওবা কোট করেছেন। সেখানে মুশরিকদের



www.pathagar.com

আক্রমণের কথা বলা আছে। এসবের সাথে এফবিআই'র ডকুমেন্টের মিল থাকায় তা গুরুত্বের সাথে দেখা উচিত বলে তিনি মনে করেন। এফবিআই তিন-চার জায়গা থেকে এটা পেয়েছে। তিনি শেষ করেছেন অন্যের বক্তব্যকে কোট করে, যা তিনি সমর্থন করেছেন বলেই মনে হয়। তাতে বলা হয়েছে, যে কোনো মন্দের সাথে যদি সংঘর্ষ হয় তাহলে এটা যথেষ্ট হবে না যে, যদি আমরা শুধু মন্দ থেকে দূরে সরে যাই এ কথা বলে যে তারা খুব খারাপ। বরং মন্দ সম্পর্কে যদি লিখতে হয় তাহলে লেখককে এটা ভেতর থেকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে এবং যারা এসব কাণ্ড করেছে তাদেরকেও বোঝার চেষ্টা করতে হবে। এজন্য নয় যে, তাদেরকে সহানুভূতি দেখানোর জন্য; বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে বোঝা। তিনি তার প্রবন্ধের এক জায়গায় মন্টসোমারি ওয়াট (Montsomery watt)-কে কোট করে বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় অত্যাচারিত ছিলেন; কিন্তু মদিনায় এসে তিনি যুদ্ধ শুরু করেন। শব্দটা ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম War Lord হয়ে যান। এটাই পরবর্তী সময়ে পত্রিকায় হেডিং হয়ে যায়।

তার লেখাটিকে প্রায় সবাই নিন্দা করেছেন। আমি বলেছিলাম, এফবিআই'র কোনো ডকুমেন্টের উপর ভিত্তি করে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো ঠিক নয়। আমরা এটাও নিশ্চিত নই যে, যারা এই কাণ্ড ঘটিয়েছে তারা এফবিআই'র এজেন্ট ছিল না। কারণ, এর অপরাধীদের কোনো কোর্টে বিচার হয়নি; তারা অপরাধী হিসেবে আমেরিকার কোনো কোর্টেও প্রমাণিত নয়। তার কথা থেকে মনে হয়, এরা সবাই ইসলামের সৈনিক ছিল এবং তারা ইসলামের জন্য জিহাদ করেছে; তারা শহীদি মৃত্যুর জন্য রওনা হয়েছে; তারা একটা ইসলামের মহৎ কাজ করেছে। তিনি এ কথাগুলো স্পষ্ট করে না বললেও তা-ই মনে হয়।

কিন্তু আমি ব্যাখ্যা করেছিলাম, প্রকৃতপক্ষে একথা সত্য নয়। ইসলামের সকল মতের যত আইন বই আছে তাতে সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে নিষ্পাপ বেসামরিক লোকদের হত্যা করা, নারী-শিশু ও পুরোহিতদের হত্যা করা, ধর্মস্থান ধ্বংস করা, ফসল নষ্ট করা হারাম। সুতরাং যারাই এই কাজ করেছে, তারা কোনো মতেই ইসলামের কাজ করেনি। তার দায়-দায়িত্ব কোনোভাবেই ইসলামের নয়, তারা যদি মুসলিম হয়েও থাকে (সেটা আমরা জানি না)। তারা যত দোআই করুক না কেন তাদের সেই দোআ ইসলামসম্মত নয়। যেমন সেই বিল্ডিংয়ে সবাই বেসামরিক ছিলেন। তাদের মধ্যে ২০/৩০ ভাগ নারী ছিলেন। এর ফলে কত শিশু পিতা হারালো, মাতা হারালো। তারা এতিম হলো। কাজেই এগুলোকে কিছুতেই ইসলামসম্মত বলা যায় না। আর ইসলামের সকল ফকিহ মোটামুটি একমত যে, যদি কোনো মুসলিম অমুসলিম রাষ্ট্রে বাস করে তাদের ঐ রাষ্ট্রের আইন মেনে চলতে হবে। সুতরাং ঐ দেশে বসবাসরত মুসলিম নামধারী কেউ এটা করলে সেটা অন্যায় বলে গণ্য হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুক্তি বাতিলের ব্যাপারে



www.pathagar.com

ক্রিপেনবার্গের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলেছিলাম, ইসলামের যে আন্তর্জাতিক নীতি তা পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল ছিল। তখন মুশরিকরা বারবার চুক্তি ভাঙতো, অত্যাচার করতো। মুসলমানদের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করতো না। এ সমস্ত পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। তাঁর সকল নীতি পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল ছিল। তিনি বদরের বন্দীদের মুক্ত করে দিয়েছেন; প্রয়োজনে হুদায়বিয়ার সন্ধি করেছেন; বনি কুরাইজার বিরুদ্ধে শক্ত পদক্ষেপ নিয়েছেন; আবার মক্কা বিজয়ের পর সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। সুতরাং ইসলামের আন্তর্জাতিক নীতি পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল। এ প্রসঙ্গে আমি ড. সুলেমানের 'ইসলাম ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' বইয়ের কথা উল্লেখ করেছিলাম। মূল বইটি হলো Towards an Islamic Theory of International Relation। শেষে বলেছি, ইসলামী রাষ্ট্রে কে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে? এটা কোনো ব্যক্তি পারে না। এটা রাষ্ট্রকে ঘোষণা করতে হয়। রাষ্ট্রের যিনি মূল তাকে ঘোষণা করতে হয়। যে কেউ আতা বা হাতা নামে (ক্রিপেনবার্গের উল্লিখিত নামে) যুদ্ধ ঘোষণা করবে সেটা ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয় এবং এর দায়-দায়িত্ব ইসলামের উপর আসে না। এই সেশনে আমার মতো অন্যরাও প্রতিবাদ করে বক্তব্য রেখেছেন।

তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এ সেমিনারের দুই দিনের বিষয়বস্তুর উপর আলোচনা করেছি। শুধু একটি পেপার বাকি ছিল প্রফেসর ক্রিশ্চান ওয়াগনারের। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছেন জাস্টিস মোস্তফা কামাল। পেপারটি ছিল 'রিলিজিয়ান, স্টেট এন্ড কনফ্লিক্ট ইন সাউথ এশিয়া'। প্রফেসর ওয়াগনার একজন সিনিয়র রিসার্চ এসোসিয়েট, জার্মান ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল এফেয়ার্স, বার্লিন। তিনি তার পেপারে বলেছেন, সাউথ এশিয়ায় ধর্ম রাষ্ট্রগঠনে ভূমিকা রেখেছে। ধর্ম নেপাল, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান গঠনে ভূমিকা রেখেছে। একটি সোশ্যাল ফোর্স হিসেবে এখানে ধর্ম অত্যন্ত শক্তিশালী; কিন্তু ধর্ম জাতিকে সবসময় ধরে রাখতে সমর্থ হয়নি। যেমন–পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ইসলামী ভিত্তি থাকা সত্ত্বেও পরে ভাগ হয়ে যেতে হয়েছে। ভারতেও হিন্দু ধর্ম মেজরিটি; কিন্তু জাতি গঠনে হিন্দু ধর্ম কোনো বড় ধরনের ভূমিকা পালন করছে না। সেখানে ভাষা বা আঞ্চলিক স্বার্থ ধর্মের উপরে চলে যায়; স্থানীয় স্বার্থও বেশি প্রধান্য পায়। এসব কথা বলে তিনি বলেছেন, রাষ্ট্র সৃষ্টিতে ধর্মের বিরাট ভূমিকা থাকে, কিন্তু রাষ্ট্রকে গড়ে তোলা বা ধরে থাকার ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে ধর্মের প্রভাব ব্যাপক–এ কথা বলা যায় না। তিনি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন যে আন্তর্জাতিক নীতিতে ধর্ম কোনো ভূমিকা পালন করে না। আন্তর্জাতিক নীতি মূলত জাতীয় স্বার্থেই নির্ধারিত হয়।

আমি এ পেপারের উপর আমার বক্তব্যে বলেছি, ধর্ম আপাত দৃষ্টিতে যদিও দক্ষিণ এশিয়ার একটি রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তাদেরকে এক রাখতে পারেনি কিন্তু তা সত্ত্বেও সেখানে ধর্ম কোনোভাবে দায়ী ছিল না। এর জন্য রাজনীতি ও



www.pathagar.com

রাজনীতিবিদরাই দায়ী ছিলেন। আমি আরেকটি কথা বলেছি, আন্তর্জাতিক নীতির ক্ষেত্রে ধর্ম ভূমিকা পালন করেনি এটা ঠিক নয়। কথা হলো, আন্তর্জাতিক নীতিতে ধর্ম প্রকাশ্যে ভূমিকা পালন করে না; কিন্তু আমরা যদি এর গভীরে যাই তাহলে দেখবো, ধর্ম একটি ফ্যাক্টর হিসেবেই দেখা দেয়। এ প্রসঙ্গে আমি আরো বললাম, ভারতে যে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ বৈরিতা কখনো কখনো প্রকাশ পায় তার পেছনে ধর্ম বা ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি নেই এ কথা কী করে বলা যায়। এটা শুধু জাতীয় স্বার্থেই করে থাকে তা আমরা কিভাবে বলতে পারি। ভারত যে ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলছে, তার আশপাশের মুসলিম দেশ ও আরব বিশ্বকে এবং এসব দেশের জনগণের মতামতকে উপেক্ষা করে ইসরাইলের দিকে হাত বাড়িয়েছে এর পেছনে কোনো ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি নেই বা গভীর একটি ধর্মীয় ক্রিয়া নেই, তা কী করে বলা যায়। তার যে রাজনৈতিক মিত্রতা ইসরাইল ও আমেরিকার সাথে গড়ে উঠছে তা যে মুসলিম ব্লককে মোকাবিলা করার একটা কৌশল নয়, সে কথা আমরা কী করে বলতে পারি। কাজেই আন্তর্জাতিক লেবেলে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই বলে মন্তব্য করা ঠিক হয়েছে বলে মনে হয় না। এই সেমিনারের শেষ দিনে দুটি পেপারের প্রথমটি পড়েন দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি সৈয়দ আনোয়ার হোসেন 'রিলিজিয়াস মিলিট্যান্সি এন্ড ইন্টারফেইথ ডায়ালগ'-এর উপর। তাতে তিনি বলেছেন, রিলিজিয়াস মিলিট্যান্সি শব্দটি সঠিক নয়। তিনি জিহাদ সম্পর্কে বলেন, ইসলামে কোনো আক্রমণাত্মক জিহাদ নেই। তিনি রিলিজিয়াস মিলিট্যান্সি না বলে রিলিজিয়াস ফ্যানাটিজম বলা যায় বলে মন্তব্য করেছিলেন। তিনি ইন্টারফেইথ ডায়ালগের ক্ষেত্র কী কী হতে পারে উল্লেখ করে ডায়ালগের কল্যাণকর দিক এবং সিভিল সোসাইটির ভূমিকার কথা স্বীকার করেন। সেই সাথে তার কী ভিত্তি হবে তাও বলেছিলেন। পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

তার এই পেপারের উপর আমি একটি বিষয়ের দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তিনি তার প্রবন্ধের এক জায়গায় বলেছেন, গবেষণায় দেখা যায় ধর্মের ব্যবহারের একটা অভ্যন্তরীণ দিক আছে আবার এর বাহ্যিক একটা দিক আছে। তিনি বলেছেন, বহির্মুখী বা লোকদেখানো যে প্র্যাকটিস তা ব্যক্তিস্বার্থকেন্দ্রিক হয় এবং বাইরে তার প্রকাশ বেশি থাকে। তা আত্মস্থ করা হয় না এবং তা একটা এক্সিবিশনের মতো বা লোকদেখানোর মতো (exhibitionist)। আমি এ প্রসঙ্গে বলেছি, ইসলামের ক্ষেত্রে বিশেষ করে কিছু প্র্যাকটিস প্রকাশ্যেই করা হয়। যেমন জামাআতে নামাজ পড়া, ঈদের নামাজ পড়া বা হজ্জ করা। এগুলো শুধু আত্মিক ব্যাপারই নয়, এর প্রকাশের দিকও আছে। এসব যারা করে তারা এক্সিবিশন বা প্রদর্শন করে তা কি সঠিক কথা? আমি তাকে এ কথা বলি এবং অনুরোধ করি যে এ অংশটুকু সংশোধন করার জন্য। না হলে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ থাকবে। সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল ভারতের আজগর আলী ইঞ্জিনিয়ারের 'রিলিজিয়ন, ডেমোক্র্যাসি



www.pathagar.com

এন্ড সেকুলারিজম'-এর উপর আলোচনা। এখানে তিনি বলেন, ডেমোক্র্যাসি ভারতে ছিল না। এটা বিদেশ থেকে এসেছে। ডেমোক্র্যাসি আসার পর থেকেই বড় কোন্দল শুরু হয়েছে। অর্থাৎ, এর আগে কোনো কোন্দল ছিল না। মোগল আমলে কোনো কোন্দল ছিল না। গণতন্ত্র আসার পর থেকেই কথা উঠলো কে কতটা সিট পাবে। পার্লামেন্ট, মিউনিপিস্যালিটিতে আসন নিয়ে সমস্যা দেখা দিলো এবং কোন্দল সৃষ্টি হলো। এক পর্যায়ে হিন্দু-মুসলিম বিরোধের রূপ ধারণ করলো। এসবের জন্য তিনি গণতন্ত্রকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন। অবশ্য তিনি বলেননি; গণতন্ত্র বাদ দিতে হবে যা কিন্তু তিনি চাচ্ছেন। তিনি সেকুলারিজম নিয়ে আলোচনা করে বলেছেন, বর্তমান ভারতের ভিত্তি সেকুলারিজম এবং তা ধর্মবিরোধী নয়। তিনি বলেছেন, নেহরু শক্তভাবে চেষ্টা করেন যাতে এটা হিন্দু রাষ্ট্র না হয়। চারদিকে ইসলামী রাষ্ট্র, হিন্দু রাষ্ট্র ও বৌদ্ধ রাষ্ট্র হয়েছে; কিন্তু ভারত যাতে হিন্দু রাষ্ট্র না হয়ে সেকুলার রাষ্ট্র হয়। সব ধর্ম যেমন সমান থাকে সেরকম চেষ্টা নেহরু করেছিলেন। ইন্ডিয়ান কংগ্রেসে অনেক ধর্মপ্রাণ লোক ছিলেন যারা হিন্দু রাষ্ট্রই চেয়েছিলেন, তারপরও নেহরুই জয়লাভ করেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন যে, সেকুলার রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও ভারতে অনেক রায়ট হয়েছে। তিনি বলেন, ধর্মকে রাজনীতিতে আনা ঠিক নয়; এতে সমস্যা বাড়ে।

আমি এ পেপারের উপরও খুব সিরিয়াস আলোচনা করেছি। আমি প্রশ্ন করলাম, আপনার আলোচনা থেকে সেকুলারিজমকে কী করে একটি ধর্মীয় রাষ্ট্রের তুলনায় সুপিরিয়র বলে গণ্য করা যায়। কেননা, আমরা আপনার আলোচনায় দেখি, মোগল আমলে (যে রাষ্ট্রের আইন ছিল শরিয়াহ) সেখানে তো কোনো দাঙ্গা হয়নি। ভারত ১৯৪৭-এ ভাগ হয়ে পরে ১৯৫২-তে সেকুলার রাষ্ট্র হওয়ার পর থেকে অসংখ্য দাঙ্গা হয়েছে। প্রতি বছর শত শত ছোট-বড় দাঙ্গা হয়েছে। আজকাল হয়তো তা অনেকটা কম। এই বিবেচনায় আমরা সেকুলার রাষ্ট্রকে কী করে উন্নত বলতে পারি। এ প্রসঙ্গে আমি উল্লেখ করলাম প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যাদের মধ্যে হলো তারা তো ধর্মীয় রাষ্ট্র ছিল না। মূলত তারা সেকুলার রাষ্ট্রই ছিল।

এর ফলে ৮ থেকে ১০ কোটি লোক মারা গেল। এগুলো তো আমেরিকা, ব্রিটেন, রাশিয়া, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালির মতো সেকুলার রাষ্ট্রই করলো। তাহলে তারা কী করে সুপিরিয়র হয়? সেক্ষেত্রে যদি ইসলামী রাষ্ট্র হয়, সেখানে সব মৌলিক অধিকার দেয়া হয়, অমুসিলম নাগরিকের সিভিল রাইট সাংবিধানিকভাবে দেয়া হয়, তাহলে তাতে অসুবিধা আছে? যেমন–আমরা দেখেছি পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে সাংবিধানিকভাবে সবাইকেই সিভিল রাইট দেয়া হয়েছে। এসব রাষ্ট্র যদি ইসলামী রাষ্ট্র হয়ে যায় তাহলে কী সমস্যা হবে? কোনো সমস্যা আমি দেখি না। এটা নির্ভর করবে অপব্যবহারের উপর। এখন



www.pathagar.com

অপব্যবহার যে কেবল ইসলামী রাষ্ট্র করবে তার কী যুক্তি? সেকুলার রাষ্ট্রেও অপব্যবহার হচ্ছে। আজ যতই বাইবেলে হাত দিয়ে শপথ নিক না কেন, আমেরিকা একটি সেকুলার রাষ্ট্র। তাদের নোটে আল্লাহর কথা লেখা আছে 'In God we trust'– আল্লাহর উপর আমরা আস্থা রাখি। কিন্তু বাস্তবে তারা সম্পূর্ণ সেকুলার রাষ্ট্র। তারাই তো ইরাক আক্রমণ করলো। আফগানিস্তান ও ফিলিস্তিনে সমস্যা করলো।

আমি দ্বিতীয় আরেকটি কথা বললাম, পশ্চিমাদের বিবেচনায় যে সেকুলারিজম অর্থাৎ বস্তুবাদ–এর মানে রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। ইসলামের অধিকাংশ বড় বড় স্কলারই বলেছেন, সেই অর্থে ইসলামে সেকুলারিজমের কোনো স্থান নেই। ওআইসি রেজুলেশনে একটি প্রস্তাব আছে যে, পাশ্চাত্য যে অর্থে সেকুলারিজম গ্রহণ করে ইসলামে সেরকম সেকুলারিজম নেই। এ কথা আলাদা যে, কোনো কোনো রাষ্ট্রে সহিষ্ণুতাকেই সেকুলারিজম বলা হয়। এটা আসলে সেকুলারিজম শব্দের অযথা ব্যবহার। সে কথা আলাদা। এ ছাড়া মূল অর্থে সেকুলারিজমের সাথে ইসলামের কোনো সঙ্গতি নেই। এসব আমি উল্লেখ করেছি।

আলোচনার এক জায়গায় আজগর আলী ইঞ্জিনিয়ার উল্লেখ করেছেন, ১৮৭১ সালে স্যার সৈয়দ বলেছিলেন যে, হিন্দু শব্দের অর্থ হচ্ছে ইন্ডিয়ান। সিন্ধু নদীর পূর্ব তীরে যারা বাস করে সেই অর্থে তারা হিন্দু। এ কথা আসলে একটি পাসিং রেফারেন্স ছিল। বলতে গিয়ে চলে আসে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. শহীদুজ্জামান তার বক্তব্যে বলেন, যেহেতু শব্দের রুটের দৃষ্টিতে এই অর্থের কোনো ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি নেই, তাই হিন্দু নামে পরিচিত হতে আমাদের কী অসুবিধা আছে? তার পরে আমার বক্তব্য থাকায় আমি পরিষ্কার বলেছি, প্রকৃতপক্ষে হিন্দু শব্দের যেই অর্থই পূর্বে থাকুক না কেন, এখন হিন্দু বলতে আর ভারতীয় বোঝায় না, হিন্দু একটি বিশেষ ধর্মকেই বোঝায়। সুতরাং কোনো মুসলিমই আর রাজি হবেন না হিন্দু হতে। এটা ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ কোথাও নয়। কিন্তু তিনি তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে আমার কাছে একটা নোট লিখে পাঠান যে, ইসলাম তো আমাদেরকে সত্য কথা বলতে শিক্ষা দিয়েছে, সত্যের জন্য সংগ্রাম করতে বলেছে। তাহলে মূল অর্থে হিন্দু শব্দ ব্যবহার করতে আমাদের কী কী অসুবিধা আছে? আমি তাঁর স্লিপের উল্টা পৃষ্ঠায় লিখে দিলাম, আপনি এ চেষ্টা করবেন না; এটা গ্রহণযোগ্য হবে না; কোনো ব্যক্তিই এটা মানবে না। আল্লাহ কুরআনেই আমাদের 'মুসলিম' নাম দিয়েছেন। কুরআনে মুসলিম জাতিকে হিন্দু বলা হয়নি। সুতরাং আপনি এমন বিষয় নিয়ে সংগ্রাম করতে যাবেন না। আমি আশা করি, তিনি এ বিষয়ে আর সংগ্রাম করবেন না।

আজগর আলী সাহেব এক জায়গায় বললেন, ১৯১১ সালে মুসলিম লীগ সম্পর্কে আল্লামা শিবলী নোমানী বলেছিলেন, এটা হচ্ছে রাজা এবং জমিদারদের



www.pathagar.com

পার্টি (Party of feudal lords)। আমি বলেছিলাম, মুসলিম লীগ তো তার পরে এগিয়ে গেছে; এক জায়গায় থেমে থাকেনি। যেমন থেমে থাকেনি বিজেপি, কংগ্রেস। এই মুসলিম লীগই ১৯৪৬ সালে বাংলাদেশের ৯৭ ভাগ মুসলমানের ভোট পেয়েছিল। ঐ ভিত্তিতেই পরবর্তীকালে বিভক্তি হয়েছিল। তিনি তার শেষ বক্তব্যের সুযোগ যখন আসে তখন বলেছিলেন, এ কথা ঠিক যে ৯৭ ভাগ ভোট পেয়েছিল কিন্তু তখন ভোটার ছিল মাত্র ১০-১৫ ভাগ। কেননা, ভোটার হতে হলে শিক্ষা বা জমির মালিক হতে হতো। এ কথা বলে তিনি ঐ কথাকে খাটো করার চেষ্টা করেন। এ কথায় সাধারণ লোক হয়তো ভুল বুঝবে। কিন্তু বাস্তব হলো, যে ভিত্তিতে তা হয়েছিল সেটা তো সারা ভারতের ক্ষেত্রে একই ছিল। তাই এর বিরোধী ৩ ভাগ তো সে একই ভিত্তিতে হয়েছে। ভারতের কংগ্রেস তো সে ভিত্তিতেই ভোট পেয়েছে। তাহলে আমাদের তো সে ভিত্তিকেই ভিত্তি করে দেখতে হবে এবং এটা সবাই জানে যে, সেটা জনপ্রতিনিধিত্বশীল ভোট ছিল। কাজেই আজগর আলী সাহেবের এই বক্তব্য সত্যিকার অর্থে কোনো একাডেমিক বক্তব্য হয়নি। কিন্তু সেটার প্রত্যুত্তর দেয়ার কোনো সুযোগ সেমিনারে থাকে না। আমি আশা করিনি যে তিনি এমন কথা বলবেন। যাই হোক, এই সেমিনারে উপস্থিত থেকে আমি অনেক জিনিস লক্ষ্য করি। সমগ্র সেমিনারের একটা বড় অংশের মত হচ্ছে মিলিট্যান্সির পেছনে ধর্ম আছে। ধর্ম এবং রাজনীতিকে আলাদা করতে হবে। এ কথা বলা মানে ইসলামের মূলে আঘাত করা। যেখানে আল্লামা ইকবালের মতো ব্যক্তি, যিনি ইসলামের অনেক বড় দার্শনিক ছিলেন। তিনি বলেছেন, যখনই ধর্ম ও রাজনীতি আলাদা হবে সেখানে থাকবে শুধু বর্বরতা। একটা জিনিস এখানে লক্ষ্য করলাম, এ ধরনের সেমিনার বিশ্বে অনেক জায়গায় অনেক হচ্ছে। ইসলামিস্টরা এগুলোকে কখনো ভালো করে মোকাবিলা করতে পারবে না, যদি তারা অত্যন্ত যোগ্য না হয়; তারা যদি পশ্চিমা রাজনীতি, দর্শন, অর্থনীতি সবকিছু গভীরভাবে না জানে; সারা বিশ্বে এসব বিষয়ে কী লেখা হচ্ছে তার খোঁজ না রাখে। আমরা যদি সামান্য পড়ি তাহলে আমরা ভুল করবো। কুরআনের মাহাত্ম্য এবং ইসলামের মাহাত্ম্যকে প্রচার ও প্রকাশ করার জন্য আমাদের গভীর পড়াশোনার প্রয়োজন আছে। তবেই আমরা এগুলোর মোকাবিলা করতে পারবো। এগুলো শুধু রাজনৈতিক স্লোগান দ্বারা প্রতিহত করা যাবে না। ইসলামিস্টদের এর গভীরে যেতে হবে।



www.pathagar.com

# সামাজিক সমস্যা সমাধানে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ইমাম প্রশিক্ষণ প্রকল্প

দেশের সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে প্রায় দশ বছর আমি ইমামদের সামনে বক্তব্য রেখেছি। অন্যান্য বিষয়ও ছিল, কিন্তু সামাজিক সমস্যা সম্পর্কেই সেখানে বেশি প্রাধান্য দিয়েছি। এ কাজে আমাকে জড়িত করেন তৎকালীন মহাপরিচালক আবু জাফর মোহাম্মদ শামসুল আলম। শামসুল আলম সাহেব পাকিস্তান সুপিরিয়র সার্ভিসের ১৯৬৩ সালের আমার ব্যাচের অফিসার। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ডিজি হিসেবে সত্তরের দশকের শেষের দিকে যোগদান করেন। তিনি করিৎকর্মা ব্যক্তি। তিনিই ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে একটি শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করান। তিনি ফাউন্ডেশনের প্রকাশনাকে ব্যাপক করেন। অনেক গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করেন। তার সময়ে তিনি শত শত নতুন বই প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। তার নেতৃত্বেই ইমাম প্রশিক্ষণ পরিকল্পনার ব্যাপক উদ্যোগ নেয়া হয়।

ঢাকার মোহাম্মদপুরে ইমাম প্রশিক্ষণের একটি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছিল। একটা ছিল টাঙ্গাইলে। সেখানে ইমাম প্রশিক্ষণের জন্য একটি প্রজেক্ট তারা করেছিল। চট্টগ্রামেও ছিল। আমি ঢাকার সেন্টারে বহু ব্যাচের সামনে বক্তব্য দিয়েছি; টাঙ্গাইল ও চট্টগ্রামের বেশ কয়েকটি ব্যাচেও বক্তব্য রেখেছি।

ইমাম প্রশিক্ষণের ব্যাপারে বিশ্বের মুসলিম দেশসমূহে কোথায় কেমন সিস্টেমেটিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে তা আমার জানা নেই। বাংলাদেশেও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আগে মসজিদ মিশনসহ এরকম কিছু প্রতিষ্ঠান হয়তো ইমাম প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকতে পারে। কিন্তু এর ব্যাপক পরিকল্পনা ইসলামিক ফাউন্ডেশনই নিয়েছে। এর বর্তমান রূপ কেমন আছে তা আমি ঠিক জানি না। কিন্তু সত্তরের দশকের শেষের দিকে ও আশির দশকের যে অবস্থা দেখেছি তা ইমামদের সঠিক প্রশিক্ষণের জন্য উপযুক্ত ছিল না। তার মাধ্যমে ঠিক যোগ্য ইমাম তৈরি সম্ভব নয়। যাদের মনোনয়ন করা হতো তাদের যোগ্যতা অতি সাধারণ মানের ছিল। কারিকুলামের মধ্যেও বেশির ভাগ ছিল নানা ধরনের হাঁস-মুরগি পালন, সুস্বাস্থ্যের বিষয়গু ইত্যাদি। এগুলো থাকার গুরুত্ব আমি অস্বীকার করব না। কমিউনিটি লিডার গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এগুলোর দরকার আছে; কিন্তু যদি ইসলামী সমাজ গড়ে তুলতে হয় তার জন্য খুব উচ্চ পর্যায়ের



www.pathagar.com

ইসলামী উপাদান বা বিষয়বস্তু বাড়ানোর দরকার ছিল। সেগুলো ইসলামিক ফাউন্ডেশন করতে পারেনি। হয়তো তার জন্য কোনো সমস্যা ছিল। আর সেটা যেহেতু সরকারি প্রতিষ্ঠান কাজেই কোনো অগ্রসর কথাবার্তা বলাও মুশকিল। তাদের মধ্যে ভালো বক্তা তৈরি করা, তাফসির বা খুতবা কি ধরনের হবে তা শেখানোর বিষয়টির অভাব ছিল।

আমি দেখেছি, আলেমদের বেশির ভাগের কাছে আধুনিক বক্তৃতা পদ্ধতির বিষয়টি জানা নেই। এটা নিজেদের মধ্যে রপ্ত করার জন্য তারা প্রয়োজনে নিজ নিজ এলাকার স্কুলগুলোতে গিয়ে বিভিন্ন ক্লাসরুমে বসতে পারেন। দেখতে পারেন কিভাবে শিক্ষকগণ ছাত্রদের ক্লাস নিচ্ছেন। এটা কলেজে গিয়েও করতে পারেন। এটা অবশ্যই অনুমতি নিয়ে করতে হবে। তারা দেখতে পারেন শিক্ষকরা কিভাবে বিষয়গুলো আলোচনা করেন। বিশেষভাবে তারা বাংলা, ইতিহাস, ভূগোল বা সমাজবিজ্ঞান পড়ানোর সময় কী স্টাইল ব্যবহার করেন তা তাদের আত্মস্থ করা দরকার। এর মাধ্যমে তারা আধুনিক স্টাইল শিখতে পারবেন। এ কাজ তাদের করা দরকার। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ইমাম প্রশিক্ষণ প্রকল্পের মধ্যে কর্তৃপক্ষের উচিত হবে ইমামদের জন্য চার-পাঁচটি ছোট ট্যুর রাখা। একেকটা ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থীদের কয়েকটি গ্রুপে ভাগ করে বিভিন্ন কলেজে কয়েকটি ক্লাসে অবজারভার হিসেবে নিয়ে যাওয়া। তাহলে তারা বুঝবেন কী করে একটি বিষয়কে ধারাবাহিকভাবে গুছিয়ে বলতে হয়। এ জিনিসের অভাব তাদের মধ্যে দেখা যায়। এটা যদিও একটা সমালোচনা কিন্তু তা অবশ্যই বন্ধুত্বপূর্ণ সমালোচনা। যারা এ রকম বন্ধুত্বপূর্ণ সমালোচনা গ্রহণ করতে পারে না তাদের উন্নতি হয় না।

এখানে অনেক বিষয় একত্র হয়ে যাচ্ছে–ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ইমাম প্রশিক্ষণ, শামসুল আলম সাহেব। তবু বলব, শামসুল আলম সাহেব ইসলামিক ফাউন্ডেশনে অনেক ধরনের কাজ শুরু করেছিলেন। তারপরে আছেন আবু ফায়েদ মোহাম্মদ ইয়াহিয়া সাহেব। তিনিও আরেক করিৎকর্মা ব্যক্তি ছিলেন। যেটা পছন্দ করতেন জান দিয়ে করতেন। আর পছন্দ না করলে তিনি তা করতে পারতেন না। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিবস উপলক্ষ্যে বড় করে ১৫ দিনের সিরাতুন্নবী সম্মেলন তিনিই শুরু করেছিলেন। এরই একটা অংশ হিসেবে বায়তুল মুকাররমে মাসব্যাপী বইমেলা চালু করা হয় সে সময়। এরাই বিশ্বকোষ প্রকল্প চালু করেন। সেটা বর্তমানে শেষ হয়েছে। আল কুরআনে অর্থনীতি এবং ইসলামের আইনের ক্ষেত্রে 'বিধিবদ্ধ ইসলামের আইন' নামে দুটি প্রকল্পও চালু করা হয়। প্রকল্প দুটিতে আমিও জড়িত ছিলাম।

এ দুজন মহাপরিচালকের নেতৃত্বেই ইসলামিক ফাউন্ডেশন খুবই ব্যাপক আকার ধারণ করে। অনেক দেশেই এ ধরনের প্রতিষ্ঠান নেই। অবশ্য এটাকে আরো ইফেক্টিভ করার দরকার আছে। এর নিজস্ব রিসার্চ সাইড খুব দুর্বল। এর



www.pathagar.com

জন্য তারা ইসলামিক ফাউন্ডেশন ইউকে-কে ভিত্তি ধরতে পারে। বিখ্যাত ইসলামী স্কলার প্রফেসর খুরশিদ আহমদ ইউকেতে এটা প্রতিষ্ঠা করেছেন। অথবা আমেরিকার ভার্জিনিয়াতে যে ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট (আইআইআইটি) আছে তা থেকেও কিছু জিনিস গ্রহণ করতে পারে; নতুন আইডিয়া নিতে পারে। তাহলে বাংলাদেশের ইসলামিক ফাউন্ডেশন আরো ভালো কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারবে। এখন মূল বিষয় ইমাম প্রশিক্ষণের দিকে যাই। যেটা করতে গিয়েই এত বড় ভূমিকা দিতে হলো। ইমাম প্রশিক্ষণে ক্লাস নিতে গিয়ে আমি একটা বিষয় দাঁড় করালাম–'সামাজিক সমস্যা সমাধানে আলেমদের ভূমিকা' নামে। তখনকার সময়ে যেসব সমস্যা আমাদের সামনে ছিল তারই উপর আমি গুরুত্বারোপ করি। আমি শুরু এভাবে করতাম যে সামাজিক সমস্যা অর্থনৈতিক সমস্যার চেয়ে কোনো অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। অর্থনৈতিক সমস্যা গুরুত্বপূর্ণ। তার সমাধান করা দরকার। না করলে অনেক সমস্যা হবে। সামাজিক সমস্যাও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আমি একটা উদাহরণ দিতাম এভাবে, একটা গ্রামে অর্ধেক লোক দরিদ্র হতে পারে, তাহলে অর্ধেক লোকের কষ্ট হয়। কিন্তু একটা গ্রামে যদি একজন গুণ্ডা থাকে তাহলে তার জন্য গোটা গ্রামের শান্তি নষ্ট হয়। এর মধ্য দিয়ে আমি বোঝাতাম, সামাজিক সমস্যা কিভাবে একটা সমাজকে গভীরভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

অর্থনৈতিক সমস্যা বড় নাকি সামাজিক সমস্যা বড় অথবা চরিত্র ভালো করতে হবে আগে নাকি দারিদ্র্যের সমস্যা সমাধান করতে হবে আগে–এ বিতর্কে গিয়ে আমরা সময় নষ্ট করে ফেলি; কিন্তু বাস্তবে একত্রেই সব মোকাবিলা করা দরকার। কেউ বলেন, সমাজকে ঠিক করতে হলে আগে অর্থনীতিকে ঠিক করতে হবে, যাতে লোক চোর-টোর না হয়। আবার কেউ বলবেন, প্রথমে আমাদের নৈতিকতা গড়ে তুলতে হবে। এ বিতর্কেই তারা সময় কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু দুটোই সমান গুরুত্বপূর্ণ। দারিদ্র্যও দূর করতে হবে, নৈতিকতাও ঠিক রাখতে হবে। তেমনিভাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার কোনটা বড় সে বিতর্কে না গিয়ে বলতাম, আপনারা সমাজের লিডার, আপনাদের সামাজিক সমস্যা সমাধানে কাজ করতে হবে।

আমি তাদের গুরুত্বের বিচারে অশিক্ষা ও নিরক্ষরতার কথা বলতাম। শিক্ষা তো মুসলিম নর-নারীর জন্য ফরজ এবং অমুসলিমদের জন্যও এটা জরুরি। আমি তাদের বলতাম যে, ইমামরা যদি পরিশ্রম করতে রাজি হন তাহলে সমাজ থেকে তারা অশিক্ষা, নিরক্ষরতা অনেকাংশে দূর করতে পারবেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে তারা যেন মেয়েদের অবহেলা না করেন; পুরুষ ও নারীদের মধ্যে যেন পার্থক্য না করেন। এ প্রসঙ্গে আমি যা বলেছি তার উপর আমার 'দেশ সমাজ রাজনীতি' বইয়ে একটি প্রবন্ধ আছে। সেখান থেকে আমি কিছুটা উদ্ধৃতি দিচ্ছিঃ 'কুরআন শরিফ চর্চার সাথে সাথে বাংলা, অংক, ইংরেজি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয়



www.pathagar.com

বিদ্যা সবাইকে শিখতে হবে। মহিলাদের শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরত্ব দিতে হবে। উপরে যে হাদিস উদ্ধৃত করা হয়েছে (প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর জ্ঞান শিক্ষা করা ফরয) তাতে পুরুষ ও মহিলাদের শিক্ষার কোনো পার্থক্য করা হয়নি; আমরাই বরং নারী-পুরুষের পার্থক্য করেছি। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার ব্যাপারে কোনো পার্থক্য করেননি। ইমাম সাহেবদের উদ্যোগে এ শিক্ষার ব্যবস্থা মসজিদে অথবা মসজিদের সাথে ঘর করে অথবা বারান্দায়ও করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে একটি কথা উঠতে পারে, মেয়েদের মসজিদে আসার অধিকার আছে কি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে মহিলারা মসজিদে নামাজে শরিক হতেন (বুখারি, হাদিস নং ৮১৬, ৮১৯, ৮২৪)। তাই প্রয়োজনে মসজিদে মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা যাবে।' (পৃষ্ঠা: ২০)।

এ সমস্যার পাশাপাশি আরেকটি সামাজিক সমস্যার কথা আমি তাদের বলতাম। সে সময় আমাদের দেশে সন্ত্রাস, অপরাধের অবস্থা বর্তমান সময়ের চেয়ে কম ছিল। বর্তমানের মতো এত চাঁদাবাজি, মাস্তানি ছিল না; পরিস্থিতি এত খারাপ ছিল না। তা সত্ত্বেও আমি ইমামদের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখার জন্য বলেছি। সমাজে যাতে অপরাধ কমে যায় তার জন্য চেষ্টা করার কথা বলেছি। প্রতি বছর খুতবাতে চার-পাঁচ বার অপরাধ বিশেষ করে খুন, ধর্ষণ, দাঙ্গা-ফাসাদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখার জন্য বলেছি।

আমি তৃতীয় আরেকটি সমস্যা তাদের সামনে তুলে ধরে তাদেরকে ভূমিকা রাখার জন্য বলতাম। সেটার উপর তাদের এখনো ভূমিকা রাখা উচিত। সেটা হলো নারী নির্যাতনের বিষয়। আমি সাম্প্রতিক সময়ে একটি কথা বলেছি, যেটা আলেমদের চক্ষু উন্মিলনে সাহায্য করবে। আমার আম্মা জমিদারের কন্যা ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি অল্প বয়সেই দেখেছি তিনি তার সম্পত্তির অধিকার চেষ্টা করেও নিতে পারেননি। নানাভাবে আমার মায়ের ভাইয়েরা এবং অন্যরা এমন ব্যবস্থা করেন, যেন তিনি তার সম্পত্তির অধিকার না পান। এই ছিল মাত্র ৫০-৬০ বছর আগের ঘটনা। মেয়েরা সম্পত্তি পায়, এ ব্যাপারে কুরআনের বিধানের পক্ষে নেতৃত্ব দেয়ার দরকার ছিল আলেমদের; কিন্তু আমি কোনোভাবেই তাদেরকে কুরআনের এ বিধান কার্যকর করার জন্য নেতৃত্ব দিতে দেখিনি।

তালাকের নামে বাড়াবাড়ির বিষয়টি আমি তুলে ধরতাম। মুসলিম নারীদের রক্ষায় তালাকের অপব্যবহার রোধ করার জন্যও তারা নেতৃত্ব দেননি। আমি তাদের সামনে এসব বিষয় তুলে ধরেছি এবং তাদেরকে অনুরোধ করেছি যে, তারা যেন এ বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে। সবসময় নারীদের বলা হচ্ছে, স্বামীদের আনুগত্য করতে হবে। কিন্তু আমি তাদের বারবার বলেছি, আনুগত্য কেবল ভালো কাজে হয় মন্দ কাজে হয় না। এই কথা সমাজকে জানাতে হবে। মুসলিম শরিফ, আবু দাউদ, নাসাই-এর হাদিসটি ব্যাপকভাবে বলা দরকার।



www.pathagar.com

এটা শুধু স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রেই নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যদি না বলা হয় তাহলে যেটা হবে তাতে প্রকৃতপক্ষে ইসলামের কোনো কল্যাণ হবে না, অকল্যাণই হবে।

তখন আমি দারিদ্র্য ও ছিন্নমূলদের সমস্যা সম্পর্কেও কথা বলতাম। ইমামরা যে দারিদ্র্য দূর করে ফেলতে পারবে বা ছিন্নমূলদের সমস্যা দূর করে ফেলতে পারবে–এমনটা আমি বলতাম না; কিন্তু বলতাম তাদের উচিত হবে এমন ব্যবস্থা করা, যাতে দরিদ্রদের ব্যবস্থা হয়। এর জন্য সাংগঠনিক বা সামাজিকভাবে যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা করা, ফসলের যাকাত (ওশর) আদায় করা এবং সেগুলোকে বন্টনের ব্যবস্থা করা। এরকম কাজ তারা করতেই পারেন। করাই উচিত। বিশেষভাবে নদীভাঙনের কথা বলতাম। নদীভাঙনের ফলে বহু লোককে শহরে আসতে হবে।

মেয়েরা যদি একা একা আসে তাহলে তারা খুব বেশি বিপদে পড়ে যায়। এজন্য যাতে তাদের শহরে আসতে না হয় এবং গ্রামেই পুনর্বাসিত হতে পারে–এ রকম উদ্যোগ তাদের নিতে বলতাম।

আরেকটি বিষয় ছিল বখাটে ছেলে প্রসঙ্গে। বখাটে ছেলেদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে, যেটা পূর্বে অনেক কম ছিল। এ ব্যাপারে আমি বলতাম, যেসব ছেলে মসজিদে আসে তারা ভালো ছেলে, এদেরকে সংগঠিত করতে হবে। এরা সংঘবদ্ধ হলে বাকি বখাটেদের সংশোধন করা এমনকি দমন করা (যেটা যেখানে সম্ভব) তা করার চেষ্টা করতে হবে। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ। জুমার সময় অনেক ছেলেই মসজিদে আসে, তাদের সঙ্গে যদি ইমাম সাহেবরা সম্পর্ক বৃদ্ধি করেন, তাদেরকে নিয়ে বসেন, কুরআনের তাফসির কোর্স করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী, খলিফাদের জীবনী, সাহাবিদের জীবনীসহ পরবর্তীকালের বড় স্কলারদের বই যদি পড়ান এবং সংঘবদ্ধ করা সম্ভব হয় তাহলে বখাটেদের নিয়ন্ত্রণ করা বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে অনেক সহজ হয়ে যাবে। এটা আলেমগণ করতে পারেন। শহরের পাড়ার মসজিদের ইমামরাও এ কাজ করতে পারেন। জুমুআর নামাজের পর যুবক মুসল্লিদের নিয়ে বসতে পারেন। সমাজের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। এভাবে বসাটা অসম্ভব কিছু নয়। তবে যথেষ্ট জটিল। পরিশ্রম ছাড়া কোনো কিছু সম্ভব নয়। আর করতে পারলে অসম্ভবও নয়।

এ ধরনের বিষয়গুলোককে কেন্দ্র করে আমি প্রায় একশ'র মতো ব্যাচে ক্লাস নিয়েছি। কিন্তু আমি জানি না, এর ফল কী হয়েছে। তবে মনে হয় তেমন ফল হয়নি। অবশ্য এর কারণ আমি আগেই বলেছি, অধিকাংশ ইমাম মানসম্পন্ন না হওয়ায় তাদের গ্রহণ করার ক্ষমতা সীমিত। ইতোমধ্যে হয়তোবা ফাউন্ডেশনের ইমাম প্রশিক্ষণের কোর্স অনেক উন্নত হয়েছে–সেটা আমারও দেখা দরকার। আর যদি না হয়ে থাকে আমি আশা করি তারা এ বিষয়গুলো বিবেচনা করে দেখবেন।



www.pathagar.com

# মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর শ্রেষ্ঠ কৃতি তাঁর 'তাফসীরুল কোরআন'

মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাবেক বঙ্গে বিগত পাঁচশত বছরে যেসব মহান (great) ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের একজন। সম্ভবত চার-পাঁচ জনের মধ্যে হবেন। তিনি রাজনীতিতে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন, শ্রেষ্ঠ আলেমদের একজন ছিলেন এবং সংবাদপত্র জগতের পুরোধা ছিলেন। সর্বোপরি তিনি ছিলেন লেখক। ইতিহাস, সাহিত্য, নবীজীবন এবং কুরআনের গবেষক এবং সাহিত্যিক।

নবীজীবনের উপর রচিত তাঁর 'মুস্তাফা চরিত' যারাই পড়েছেন তারাই জানেন যে তিনি কত বড় গবেষক ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি তাতে কল্পকাহিনী ত্যাগ করেছেন, কেবল প্রামাণ্য বিষয়সমূহ গ্রহণ করেছেন। তিনি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের বিভিন্ন কুটিল এবং অপ্রামাণ্য সমালোচনার যুক্তিসঙ্গত উত্তর দিয়েছেন। তাতে তিনি এ সংক্রান্ত কিছু হাদিসও পরীক্ষা করেছেন এবং এসব হাদিসের মতন (text) পরীক্ষা করে, উসূলবিদদের মতন (text) পরীক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালার ভিত্তিতেই গ্রহণযোগ্য নয় বলেছেন। তাঁর সঙ্গে সবাই একমত হবেন এ কথা বলা যায় না। কিন্তু তাঁর গবেষণা আমাদের পথ দেখাবে, বিচার-বিবেচনা বৃদ্ধি করবে। তাঁর 'মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস' একটি অসামান্য কৃতি। এ বিষয়ে এর চেয়ে অধিক এবং বিশ্লেষণমূলক বই খুব কমই আছে।

মাওলানা আকরম খাঁর অসামান্য শ্রেষ্ঠ কৃতি হচ্ছে তাঁর কুরআনের অনুবাদ ও তাফসির 'তাফসীরুল কোরআন'। এ তাফসির তিনি সাধু ভাষায় লিখেছেন। কিন্তু অনুবাদ অত্যন্ত প্রাঞ্জল, সহজবোধ্য, মিষ্ট, যেন নদীর মতো প্রবহমান। অনেক অনুবাদের চেয়ে তাঁর অনুবাদ ভালো। আমার কাছে তাঁর অনুবাদ বাংলায় শ্রেষ্ঠ অনুবাদ মনে হয়েছে। অনুবাদে তিনি অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। শব্দ ব্যবহারে তিনি অসামান্য দক্ষতা দেখিয়েছেন। কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছিঃ

১. 'তাকওয়া' শব্দের তিনি কয়েকটি অর্থ করেছেন। এর মধ্যে একটি হচ্ছে সংযম। যেমন তিনি সূরা বাকারায় 'লায়াল্লাকুম তাত্তাকুন'-এর অনুবাদ করেছেন 'নিশ্চয় তোমরা সংযমশীল হইতে পারিবে'।



www.pathagar.com

২. 'ফাসেক' শব্দের তিনি অনুবাদ করেছেন, 'দুষ্কর্মপরায়ণ'। এটি আমার বিবেচনায় খুবই সুন্দর অনুবাদ হয়েছে। (দ্রষ্টব্য: সূরা বাকারার ২২ নং আয়াতের অনুবাদ, তাফসীরুল কোরআন, ঝিনুক প্রকাশনী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৮)।

৩. তিনি সূরা বাকারার ৩১ নং আয়াতের 'আসমায়া' শব্দের অনুবাদ করেছেন 'বস্তুতত্ত্বগুলো', যা এর অসাধারণ অনুবাদ। (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৫৪)।

তিনি যথাসম্ভব তাঁর অনুবাদে নারী সম্পর্কিত বিষয়সমূহে সাবধানতা অবলম্বন করেছেন এবং যেখানে নারীর অগ্রগণ্যতা আছে তা উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি সূরা আলে ইমরানের ৩৬ নং আয়াতের 'লাইসায্ যাকারু কাল উন্সা' বাক্যাংশের অনুবাদ করেছেন 'অথচ পুরুষ তো নারীর সমতুল্য নহে'। (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৩৯৫)।

যারা সব সময় সূরা নিসার ৩৪ নং আয়াতের কথা বলেন, তাদের এ আয়াতের কথাও মনে রাখা উচিত। তাঁর তাফসিরে বিভিন্ন ঘটনার অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। তিনি নবীদের মুজিজায় বিশ্বাস করতেন; কিন্তু অপ্রামাণ্য যুক্তিহীন কথা বিশ্বাস করতেন না। তিনি মূসা (আ)-এর বনী ইসরাইলসহ মিসর থেকে পলায়নের অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা করেছেন। তার মূল কথা হলো, তাঁরা লোহিত সাগর দিয়ে পার হননি, নীল নদ দিয়ে পার হয়েছেন। পূর্বের তাফসিরগুলোতে প্রধান বাইবেলের যাত্রাপুস্তক ও কিংবদন্তীগুলোকে ভিত্তি করা হয়েছে। কুরআনের কোনো অকাট্য আয়াত বা প্রামাণ্য হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয়। এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

"আলোচ্য আয়াতে (সূরা বাকারার ৫০ নং আয়াত) প্রথম অংশে 'ফারাকনা' ও 'আলবাহর' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বাহর শব্দের অর্থ সম্পর্কে অভিধানকাররা বলেছেন,

১. অধিক পরিমাণে সঞ্চিত পানি, কেবল লোনা পানি (কামুছ)।
২. প্রত্যেক নহরই বাহর (জাওহারী)।
৩. বাহর স্থলের বিপরীত শব্দ; লোনা পানি, প্রত্যেক বড় নহর, যেকোনো প্রশস্ত বস্তু (মাওয়ারেদ)।

ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, রাজপ্রাসাদের অনতিদূরে নীল নদের তীরবর্তি কোনো এক অঞ্চলে ইসরাইলীদের বসবাস ছিল। (সেখান থেকে) তারা যাইতেছিল পূর্ব পুরুষের দেশে। ... ফিলিস্তিন ও যেরুসালেমই ছিল তাদের গম্যস্থান। মিশরীয় সীমা অতিক্রম করার পরই তাহারা উপস্থিত হইয়াছিল ছীনা উপদ্বীপে এবং তীহ প্রান্তরে। কোরআন মজীদে এর যথেষ্ট প্রমাণ মওজুদ আছে (তাহা ৮০ আয়াত প্রভৃতি)।"

তারপর আকরম খাঁ সাহেবের বক্তব্য হচ্ছে, মিসর থেকে ৫০০ মাইল গভীর সমুদ্র পথ পার হয়ে আরবে উপনীত হয়ে সেখান থেকে ফিলিস্তিন যাওয়া



www.pathagar.com

যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। কেননা, তাদের লোকসংখ্যা ছিল অনেক এবং তাদের যানবাহনও ছিল না। পায়ে হেঁটে এত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করা অত্যন্ত দুষ্কর ছিল। তার পরিবর্তে মিসর থেকে একটি হ্রদ বা তার বেলাভূমি পার হয়ে সিনাই পৌঁছা অনেক সহজ ছিল। তিনি বলেছেন, ফেরাউন যে স্থানে ডুবে মরেছিল তার জন্য বাহর এবং ইয়াম দুটি শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে এবং দুটির অর্থই নদী বা যেকোনো জলাশয় হিসেবে গ্রহণ করা যায়। ফেরাউন যে লোহিত সাগরে ডুবে মরেছিল, এটা ইহুদি বাইবেলের যাত্রাপুস্তকের বর্ণনা মাত্র। কুরআন বা হাদিসে এ দাবির কোনো সমর্থন নেই।

এরপর তিনি উপসংহার করেছেন এভাবে, 'সুয়েজখাল কাটার পূর্বে ভূ-মধ্যসাগর হতে সুয়েজ শহর পর্যন্ত দীর্ঘ এই ভূভাগটা ক্ষুদ্র-বৃহৎ বিভিন্ন হ্রদ, বিল, হাওর নানা শ্রেণির জলাভূমিতে পূর্ণ ছিল এবং বহুস্থানে এখনও আছে। মরা কোটালের সময় এই অঞ্চলের পানি স্বাভাবিক নিয়মে অনেক কম হইয়া যাইত। এ সময়ে অপেক্ষাকৃত উঁচু চরগুলো ভাসিয়া উঠিত। তাহার পার্শ্ববর্তী অগভীর জলাভূমিগুলো শুষ্ক হইয়া যাইত। আবার ভরা কোটালের সময় জোয়ারের পানি দ্রুতবেগে প্রবেশ করিয়া ঐ স্থানগুলোকে ডুবাইয়া ফেলিত। ... হযরত মূসা আল্লাহর নির্দেশ অনুসারেই ঠিক সময় অর্থাৎ উপযুক্ত তিথিতে মিসর হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন এবং তিনি পথের নির্দেশও লাভ করিয়াছিলেন আল্লাহর হুজুর হইতে। তাই বনী ইসরাইল রক্ষা পাইয়াছিল এবং সেইজন্যই ফেরাউন ডুবিয়া মরিয়াছিল। আমার মতে, হযরত মূসার নবীজীবনের প্রধানতম মো'জযা ইহাই।' (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৭৯-৮৭)।'

তিনি তাঁর তাফসিরে কুরআনে কোনো মানসুখ আয়াত না থাকার অভিমত সমর্থন করেছেন। তিনি সূরা বাকারার ১৮৪ ও ১৮৫ নং আয়াতের তাফসিরে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, "এই আয়াতে (১৮৪ নং আয়াতে) 'ইউতীকূনাহূ' শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে।"

তিনি 'ইউতীকূনাহূ' শব্দের অনুবাদ করতে গিয়ে বলেছেন, "আমি ইহার অনুবাদ করিয়াছি–"যাহারা রোজা রাখিতে সমর্থ হয় বিশেষ ক্লেশের সহিত' বলিয়া। আমার মতে ইহাই সঙ্গত অনুবাদ। ইমাম রাযী (র)-ও এই অভিমতের সমর্থন করিতেছেন (তফসীরে কাবীর, দ্বিতীয় খণ্ড)। ইমাম রাগিবও তাহার অভিধানে আলোচ্য শব্দের এই অর্থ দিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাফসীরের রাবীগণের অধিকাংশ ইহার অর্থ করিয়াছেন, 'যাহারা রোজা রাখিতে সমর্থ হওয়া সত্ত্বেও রোজা না রাখে, তাহারা রোজার বদলে ফিদিয়া (মিসকীনের খানা) প্রদান করিবে।' এ অসঙ্গত অনুবাদের ফলে, এ যামানার একদল প্রগতিশীল পণ্ডিত ব্যবস্থা দিতেছেন যে, কোনও ওযর-আপত্তি না থাকিলেও ফিদিয়া দিয়া রোজা ভাঙ্গা যাইতে পারে। অন্যদিকে একদল রাবী ও তাফসীরকার বলিতেছেন, ১৮৪ আয়াত নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ১৮৫ আয়াত



www.pathagar.com

দ্বারা মানছুখ বা রহিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইহা আল্লাহর কালাম। একটা আয়াত নাযিল করার পর মুহূর্তে তাহাকে মানছুখ করিয়া দেয়ার খামখেয়ালি তাহাতে সম্ভবপর হইতে পারে না। বস্তুত কোরআন মাজীদে মানছুখ আয়াত একটিও নেই।" (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ২২৪-২২৫)।

সূরা বাকারার ২২৮ নং আয়াতের তাফসির প্রসঙ্গে তিনি অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত টীকা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "এই প্রসঙ্গে আরও বলা হইতেছে যে, স্ত্রীর যেরূপ দাবী ও অধিকার রহিয়াছে স্বামীর উপর, স্বামীরও সেরূপ দাবী ও অধিকার রহিয়াছে স্ত্রীর উপর। উভয়ে নিজ নিজ কর্তব্য অবহিত হইয়া চলিলে, সংসারেই স্বর্গের সুখ-শান্তি নামিয়া আসে। নারীর তুলনায় পুরুষের দর্জা এক ডিগ্রী বেশী, অর্থাৎ পুরুষের কর্তব্য নারীর তুলনায় অধিক। সূরা নিসার ৩৪ আয়াতে পুরুষকে নারীর 'কাউয়াম' বা রক্ষণাবেক্ষণকারী বলা হইয়াছে। মেসেল শব্দের অর্থ similar, equal নহে।" (প্রাগুক্ত, সূরা বাকারার টীকা ১৮১, পৃষ্ঠা: ২৭৫)।

তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, পূর্বকালের দাসীদেরকে বিবাহ ছাড়া অন্যভাবে গ্রহণ করা বৈধ ছিল না। তিনি লিখেছেন, "একশ্রেণীর আলেম মনে করেন যে, দাসী-বাঁদীদের বিবাহ করার নির্দেশ এ আয়াতে দেয়া হয় নাই। তাহারা মনে করেন যে, দাসী-বাঁদীদিগকে মালেকানা স্বত্বাধিকারের বলে যথেচ্ছভাবে সম্ভাব করা যাইতে পারে, সে জন্য বিবাহের দরকার হয় না। আমি দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিতেছি যে, এই অভিমত ইসলামের সাধারণ আদর্শ ও কোরআন প্রবর্তিত বিশেষ নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত একটি সিদ্ধান্ত ছাড়া আর কিছুই নহে।" (প্রাগুক্ত, সূরা নিসা, টীকা নং ৭, পৃষ্ঠা: ৫৮০)। এরপর তিনি তাঁর অভিমত সম্পর্কে সকল যুক্তি পৃষ্ঠা ৫৮১-৮২-তে তুলে ধরেছেন।

মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর এ তাফসিরগ্রন্থ এক অসাধারণ আধুনিক তাফসির। এক্ষেত্রে মুহাম্মদ আসাদের তাফসিরের সাথে অনেকাংশে মিল রয়েছে। তাঁকে তাফসিরের ক্ষেত্রে 'এ উপমহাদেশের আসাদ' গণ্য করা যায়।

তাঁর যুক্তিবাদী তাফসির অনেকের কাছে অপছন্দ হতে পারে; কিন্তু স্বীকার করতে হবে যে, তিনি তাঁর তাফসিরে যুক্তি ছাড়া কোনো মত দেননি। এ তাফসিরের পুনর্মুদ্রণ ও ব্যাপক প্রচার হওয়া প্রয়োজন।



www.pathagar.com

# সমাজ ও সংস্কৃতিতে নারীর অবস্থান

নারী মানব জাতির অংশ। ইসলামের দৃষ্টিতে পুরুষ ও নারী উভয়ই মানবজাতির অংশ। সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার হিসেবে যেটা পাই, সে উত্তরাধিকারে নারীদের ভূমিকা আমরা বিশেষভাবে দেখতে পাই। নারী বা পুরুষের সংস্কৃতি আলাদা নয়। তবে কতগুলো বিষয় গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখা যায়। যেমন সংস্কৃতি উত্তরাধিকারের স্থানান্তর। অর্থাৎ প্রজন্মের কাছে উত্তরাধিকারের ট্রান্সফারের বিষয়টির দিকে লক্ষ্য করলে দেখব এটা মায়েরাই বেশি করেছে। মায়েদের সাথেই তার সন্তানদের বেশি ঘনিষ্ঠতা থাকে। তাদের মাধ্যমেই কৃষ্টি-কালচার সন্তানদের মধ্যে বেশি বেশি প্রবেশ করে থাকে। মায়ের সাথেই বন্ধনটা বেশি থাকে। অন্যদেরও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে ভূমিকা অবশ্যই থাকে; কিন্তু মায়েদের ভূমিকাটাই বেশি। এটা আমরা স্বীকার না করে পারি না।

সংস্কৃতির সাথে আরেকটি ইস্যু হচ্ছে আমাদের যে সংস্কৃতির বিকাশ হয়েছে, সংস্কৃতিকে যে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করি, তার প্রধান অংশ হলো জীবনাচার। যদি আমরা এটাকে অন্যদিকে নিয়ে যাই যেমন আর্টের ক্ষেত্রে–আর্টকে যদি সংস্কৃতির অংশ হিসেবে নিয়ে আসি তাহলে আমরা সেখানে আজকাল যে জিনিসটি দেখতে পাই সেটা হলো নারীকেন্দ্রিক ফিগারাইজেশন। আজকে নারীর ফিগারাইজেশনই বেশি চলছে। নারীকে যেভাবে আজকে উপস্থাপন করা হয় সেটাই হয়ে গেছে আজকের আর্ট। যেটা আমরা ইসলামের ক্ষেত্রে দেখিনি। ইসলাম আর্টকে দেখিয়েছে স্টাইলাইজেশন অর্থাৎ লতা-পাতার অথবা জ্যামিতিক ফর্মের স্টাইলাইজেশন। ইসলাম নারীর ফিগারাইজেশন চায়নি। এ কারণেই ইসলামে নারীর মর্যাদা রক্ষিত হয়েছে অনেক বেশি। ইসলাম নারীকে যৌনতার আলোকে বিচার করেনি। আদর্শ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। ইসলামে নারীর একটি আইডিয়াল লেবেল আছে যা পাশ্চাত্যে নেই। পাশ্চাত্যে আর্ট মানেই হচ্ছে রাজা-বাদশাহদের চিত্র বা নারীর নানাভঙ্গির চিত্র। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নারীর এটা একটা অপব্যবহার আমরা দেখি। ইসলামে নারীকে সম্মান করতে দেখি।

আমরা যদি আধুনিককালে ফিরে আসি তাহলে দেখতে পাই নারী সংস্কৃতির একটা অংশ হিসেবে সাহিত্যে, নাটকে, মিডিয়াতে ভূমিকা রাখছে প্রধানত নাচে, গানে। আমরা দেখি যে নারীর উপস্থাপন তুলনামূলকভাবে যৌনতাকেন্দ্রিক হয়ে



www.pathagar.com

যাচ্ছে। আমার মতে এটা একটা মানসিক রোগ। এটা যৌনতাকেন্দ্রিক একটা অবসেশন (Obsession), এটা মনোবিকার। সবকিছুতে একটা যৌনতা নিয়ে আসা। সবখানে যৌনতা আনার তো কোনো প্রয়োজন নেই। যৌনতার নির্দিষ্ট একটা ক্ষেত্র আছে। অথচ সবখানেই আজ এটা হয়ে গেছে। আবার সেই যৌনতার বিস্তার ঘটেছে নারীকে কেন্দ্র করে। নাটক, সিনেমা, পত্রপত্রিকা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাই হয়েছে। নাচে, গানে সবখানেই নারীকে প্রধান হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। পুরুষের ভূমিকা খুব কম। নারীই প্রধান হয়ে গেছে। তাছাড়া পর্নোগ্রাফির বিষয়টি তো আছেই। সেখানে নারীকে পর্নোগ্রাফির প্রধান চরিত্র হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। বিজ্ঞাপনে নারীকে যেভাবে দেখানো হচ্ছে তা তো আছেই। প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে পাশ্চাত্য প্যাটার্নে নারীর অবমূল্যায়নই হচ্ছে। নারীকে মর্যাদা দেয়া হচ্ছে বলা হয় কিন্তু আমি নারীর অমর্যাদাই দেখতে পাচ্ছি। এটা তাদের লক্ষ্য কি না জানি না তবে এটা বাস্তবতা।

এদিক থেকে ইসলামের যে সংস্কৃতির মডেল তা অত্যন্ত উন্নত। এটা তৌহিদভিত্তিক। স্রষ্টা, সৃষ্টিকর্তাকে মানতে হবে। তিনি এক। মূর্তি বা দেবী নন। এদিকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে ইসলামে কোনো ধরনের অশ্লীলতা নাই। বিশেষ করে পোশাকের ব্যাপারে কুরআন এটা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে পোশাকের ব্যাপারে শালীনতা বজায় রাখতে হবে। তাকওয়ার একটা গুরুত্ব এখানে রয়েছে। সূরাতুল আরাফে শরীর ঢেকে রাখার কথা বলা হয়েছে। পোশাকের অন্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য বর্ধন। এ দুটোর মধ্যে ব্যালেন্স করতে হবে। ইসলামের দৃষ্টিতে এটাই সঠিক ও বাস্তবসম্মত। যদিও অভিযোগ করা হচ্ছে ইসলামই নারীকে অবমূল্যায়ন করেছে। কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদা সবচেয়ে বেশি। ইসলামই তার মর্যাদা দিচ্ছে সবচেয়ে বেশি। যা কিছু অবমূল্যায়ন তা পাশ্চাত্যই করছে।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নারীর অবদান কি? সেই ক্ষেত্রে আমি বলব অবদান সমানই। আমাদের আচার-আচরণে, ফ্যামিলি লাইফে, উঠা-বসায়, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর ভূমিকার পার্থক্য তেমন দেখছি না। তবে উত্তরাধিকার ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে তার অবদানকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখি যেটা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। সার্বিকভাবে নারীর অবদান কোনোভাবেই হালকা করে দেখার বা ভাবার কিছুই নেই।

নারীদের বর্তমান অপব্যবহার সম্পর্কে এমন নয় যে তারা অসচেতন। তবে নারীরা অসহায়। বস্তুবাদের প্রভাবও আছে। নারীরা গঠনগত দিক দিয়েও কিছুটা দুর্বল। নৈতিকতাহীন রাষ্ট্রব্যবস্থায় তারা কিছু করতে পারে না। কিন্তু তারা যখন অন্য নারীকে বিজ্ঞাপনচিত্রে দেখে তখন কষ্ট পায়। এটাতো আমাদের ক্ষেত্রেও সত্য। আমরা যখন নাটকে এসব দেখি কষ্ট পাই। কিন্তু আমরা কি করতে পারি?



www.pathagar.com

বস্তুবাদের যে কথা বলা হয় তা ঠিকই। আসলে বস্তুবাদ, পুঁজিবাদ তো ক্ষতি করছেই। বস্তুবাদের এক অর্থ নাস্তিকতা টাইপের চিন্তাধারা, অন্য অর্থ ভোগবাদ, যেভাবে পারো মানুষের মাঝে যৌনতাকে ছড়িয়ে দাও। এর মাধ্যমে বাজার বাড়াও, বিক্রি কর। ক্যাপিটালিজমেও একই কথা। ক্যাপিটালিজম মুনাফা চায়। মুনাফা যত পারে বাড়াতে চায়। তারা যদি মনে করে যৌনতাকে বিক্রি করে তা করা যায়, তখন তারা তাই করবে এবং করছে। সেখানে মোরালিটির স্থান নেই। বস্তুবাদেও মূল্যবোধের স্থান নেই। এখানে মূল বিষয় হচ্ছে লাভ কোথায়, লোকসান কোথায়। এখানে মানবতার, জাস্টিসের স্থান নেই। আসলেই এখানে এগুলোর কোনো স্থান নেই। মুখে হয়তো কিছুটা আছে কিন্তু অন্তরে নেই, বাস্তবায়নে নেই। সুতরাং একথা ঠিক বস্তুবাদ ও পুঁজিবাদের প্রভাব নানাভাবে পাবলিক লেভেলে, ইকোনোমিক লেভেলে এবং মার্কেটিং লেভেলে পড়েছে। এটা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যেভাবেই হোক পড়েছে। বস্তুবাদের প্রভাব এখন সবকিছুতেই পড়ছে। নারীরা এবিউজড হচ্ছে। কিন্তু তারা যাতে এবিউজড না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। আমরা আসলে একটা অদ্ভুত মানসিক জটের মধ্যে আটকে গেছি। ফলে আমরা এগুতে পারছি না। নারীরা যদি পুরুষদের মর্যাদা, সম্মান দিতে পারে তাহলে পুরুষরা কেন নারীদের যথাযথ মর্যাদা, সম্মান দিতে পারবে না। মায়ের ক্ষেত্রে এক নিয়ম, বৌ-এর ক্ষেত্রে আরেক নিয়ম, মেয়ের ক্ষেত্রে আরেক নিয়ম। কিন্তু তারা সবাই তো এক নারী জাতির অংশ। এটাও আমরা ভুলে যাই যে তারা মানবজাতিরও একটা অংশ।



www.pathagar.com

# কর্মজীবী মেয়েদের বাসস্থান সমস্যা

আমাদের দেশে কর্মজীবী মহিলাদের সংখ্যা বাড়ছে। এ কথা সত্য যে, ৩০-৪০ বছর আগে কর্মজীবী মহিলাদের সংখ্যা হাতেগোণা যেত। আমাদের যে সামাজিক প্রেক্ষাপট ছিল তাতে মহিলারা সাধারণত বাড়িতে থাকতো, বাইরে কাজকর্ম খুব কম করতো। কিছু মহিলা শুধু শিক্ষাক্ষেত্রে কাজ করতেন। গার্লস স্কুল, গার্লস কলেজে পড়াতেন। সংখ্যায় খুব কম হলেও কিছু মহিলা ডাক্তার ছিল, কিছু ছিল নার্সিং পেশায়। এটা অবশ্য ১৯৬০-এর আগের কথা।

পরবর্তী পরিবর্তিত পরিস্থিতির আলোকে যে উন্নয়ন ঘটল তাতে নারী শিক্ষা বাড়তে লাগলো এবং নারী শিক্ষার বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ বা বাধা ছিল তা উঠে গেল। সেটা এ কারণেই হলো যে নারীদের বাধা দেয়ার কোনো কারণ ছিল না। তাদের নিয়ন্ত্রণ করার কোনো ভিত্তি ছিলোনা। এ কথা সবার জানা যে, ইসলাম সকল পুরুষ ও সকল নারীর জন্য শিক্ষার গুরুত্ব দিয়েছে। কুরআনে শুরু থেকেই 'ইকরা'র উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সুতরাং নারীকে শিক্ষা থেকে যে বঞ্চিত করা হয়েছিল তা সঠিক ছিল না।

যাই হোক; পরবর্তীকালে শিক্ষার প্রসার হলো। স্বাভাবিকভাবে শিক্ষিত মেয়েদের সংখ্যা বাড়তে লাগল। বিশেষ করে শহরাঞ্চলে যে সকল পরিবার বাসা করে বা স্থায়ীভাবে থাকতে শুরু করে, ক্রমে ক্রমে গ্রামের সাথে তাদের সম্পর্ক কমে আসলো। বিভিন্ন শহরগুলোতে কারো বাসাবাড়ি, কারো ব্যাংকে কিছু অর্থ - এই ছিল তাদের সম্পদ। এতে পরিস্থিতি এমন দেখা দিল যে, প্রত্যেকেরই চাকরি করার দরকার। এমনও পরিবার ছিল যে, শুধু নারী-নির্ভর বা কন্যাসন্তান ছিল। সেখানে তারা চাকরি না করে কি করবে? তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব কে নেবে? আজকাল যা অবস্থা, এমনভাবে সমাজটা গড়ে উঠেছে যে একজনের বেতন পর্যাপ্ত নয়। তখন স্বামী-স্ত্রী দু'জনকেই চাকরি করতে হয়। এ প্রেক্ষিতে, নারীর জন্য চাকরি করা জরুরি হয়ে পড়ে। আমি সবার কথা বলছি না, তবে অনেকের ক্ষেত্রেই এটি প্রযোজ্য। এর ফলে সরকারি প্রতিষ্ঠানে, প্রাইভেট সেক্টরে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে, কর্পোরেশনগুলোতে নারীর সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। সরকারি তরফ থেকেও প্রাইমারি স্কুলগুলোতে শিক্ষক নিয়োগে নারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়।



www.pathagar.com

এসবের সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি উন্নয়ন ঘটে। সেটি হলো গার্মেন্টিস সেক্টরের বিকাশ। এ বিকাশ শুরু হয় '৭৪--এর পর থেকে বা ৮০-র দশক থেকে। সে বিকাশের ফল হচ্ছে আজকে আমাদের দেশে কয়েক হাজার গার্মেন্টিস শিল্প গড়ে উঠেছে। সেখানে ১০-১৫ লক্ষ শ্রমিক কর্মরত আছে। তার মধ্যে আবার প্রায় ৮০% শ্রমিকই নারী।

এসব পরিস্থিতিতে সন্দেহ নেই যে, নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে। আজকে এখানে তার একটি-দু'টি সমস্যার বিষয়েই বলা হচ্ছে। এর মধ্যে একটি হলো, এ সকল নারীদের থাকার ব্যবস্থা কি? আমি দেখছি অনেক নারী প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়েই চাকরি পেয়েছে। হতে পারে কোনো কারণে বিয়ে হয়নি। এ সকল নারীদের বিশেষ করে যারা বিভিন্ন সেক্টর, কর্পোরেশন, ইউনিভার্সিটি, কলেজে চাকরি করে, তাদের পরিবার যদি ঢাকায় না থাকে, বাবা-মা ঢাকায় না থাকেন তাহলে এ সকল চাকরিরত মেয়েদের থাকা বা বাসস্থানের একটা বড় ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। আসলে তাদের জন্য বর্তমানে থাকার ভালো ব্যবস্থা নেই। কর্মজীবী মহিলাদের একটি সংগঠন আছে। ঢাকায় চারটি কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল আছে - নীলক্ষেত, বেইলি রোড, খিলগাঁও এবং মিরপুরে। হয়তোবা এরকম আরো কয়েকটি আছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা অত্যন্ত কম। আমি দেখেছি, আমার এক ভাতিজি একটি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে চাকরি করে। তার ঢাকায় নিজের থাকার জায়গার অভাব। আমাদের বাসায় অনেকদিন ছিল। তার একটি স্থায়ী ব্যবস্থা দরকার। বাস্তব পরিস্থিতিতে বিয়ে-সাদীর দেরি হচ্ছে। অবশেষে সে একটি হোস্টেলে থাকার ব্যবস্থা করে নেয়। মেয়েটি মাস্টার্স পাস। এ ব্যবস্থাটি সে করে নেয় অনেক অনুরোধ করে বা ধরাধরি করে।

ফলে, এই যে আশ্রয়ের ব্যাপারটি, আমি মনে করি সবার চেষ্টাতে আনার দরকার। শহরের পরিবারগুলোকেও এ ব্যাপারে এগিয়ে আসা দরকার। এ ধরনের আত্মীয়দের থাকার জন্য জায়গার ব্যবস্থা করে দেয়া দরকার। আমাদের সমাজে নানা কারণে কিছুসংখ্যক মেয়েদের বিয়েতে দেরি হচ্ছে। যে ৫/৭ ভাগ মেয়ের বিয়ের সমস্যা হচ্ছে তাদের বিষয়টি আর অবহেলা করা সম্ভব নয়। যারা পত্র-পত্রিকায় লেখেন তাদের দৃষ্টি এসব ক্ষেত্রে কতটুকু আকৃষ্ট হয়েছে আমি জানি না। তবে তাদের দৃষ্টি দেয়া দরকার। যারা বড় বড় কলাম লেখেন তাদের এ ব্যাপারে দৃষ্টি দেয়া দরকার। তেমনিভাবে যারা বিভিন্ন এনজিওর সাথে জড়িত আছেন তাদেরও এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার।

আমার মনে হয় বড় বড় এনজিওগুলোর দু'-একটি করে হোস্টেল করা দরকার। যদি বড় বড় আট-দশটি এনজিওর প্রত্যেকে একটি করে হোস্টেল করতে পারে তাহলে বিরাট ব্যাপার হবে। মেয়েদের ফ্রি খাওয়ানোর দরকার নেই। ন্যূনতম খরচের বিনিময়ে তারা এ ব্যবস্থা করে দিবে। অর্থাৎ থাকা-খাওয়ার খরচ নিতে হবে এবং ব্যবস্থাপনার যে খরচ সেটি নিতে হবে। এক্ষেত্রে



www.pathagar.com

খেয়াল রাখতে হবে - এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ খরচ যেন আমরা বাড়িয়ে না ফেলি। যদি বেশি করে ফেলি তাহলে তো মেয়েদের জন্য থাকা কঠিন হয়ে যাবে। এ ভিত্তিতে এনজিওগুলো হোস্টেল তৈরি করতে পারে।

সরকারের পক্ষে সারা ঢাকা শহরে বড় বড় ১০টি হোস্টেল গড়ে তোলা উচিত বলে আমি মনে করি। এটি তেমন কোনো বড় ব্যাপার নয়। সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্ট্রি এটি করতে পারে। চাইলে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন কয়েকটি করতে পারে। আমার মনে হয় সেগুলো করতে হবে।

এর পাশাপাশি আরেকটি দিকে খেয়াল করতে হবে সেটি হচ্ছে গার্মেন্টিস শ্রমিকদের বেশিরভাগে বাসস্থানগুলো মূলত বস্তি। সেখানে হয়তোবা তারা বাপের সঙ্গে থাকে। ভাই চাকরি করেন, বোন চাকরি করেন, স্বামীও চাকরি করছেন। এরা বস্তিতে থাকছে। বস্তিগুলো মোটেও ভালো নয়। সেটি একটি বড় ধরনের ব্যাপার। বস্তির সমস্যাগুলো আলাদাভাবে দেখা দরকার। সেখানে পানি-গ্যাসের সুবিধার অভাব রয়েছে। বিদ্যুতের সুবিধার অভাব রয়েছে। মেয়েদের নিরাপত্তার অভাব রয়েছে। রাস্তাঘাটের অভাব রয়েছে। সেগুলো অবশ্য সিটি কর্পোরেশনের দেখার ব্যাপার ছিল। সেটিও করা দরকার।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমি বলবো গার্মেন্টিস সেক্টরের যে সংগঠন বিজিএমইএ রয়েছে তারা কেন গার্মেন্টিসের নারী শ্রমিকদের থাকার ব্যাপারটি বড় করে দেখছেন না? তারা কেন ২০/৩০টি হোস্টেল মেয়েদের জন্য করতে পারেন না। সেখানে শুধু ঐ মেয়েরাই থাকবে যারা গার্মেন্টিসে চাকরি করে। তাদের চাকরি না থাকলে চলে যাবে। থাকার জন্য তারা পুরো খরচ নেবে। আগের মতোই বলবো, কম-বেশি খরচ নিম্ন পর্যায়ে রাখার চেষ্টা করতে হবে। অনেক স্টাফ করে অনেক বেতন ধরে হোস্টেলের খরচ বাড়ানো যাবে না। মিনিমাম স্টাফ রেখে যত মেয়ে থাকবে তাদের খরচের মধ্যেই তা ধরে নেয়া যায় - যেটা আমাদের করা উচিত বলে আমি মনে করি। তাদের নিরাপত্তাজনিত ব্যাপারটি তো আছেই। সেটি আমরা কিভাবে অস্বীকার করতে পারি। নিজেরা দায়িত্ব পালন না করলেও অস্বীকার করতে পারি না। এ বিষয়টির প্রতি আমি মনে করি বিজিএমইএ'র দৃষ্টি দেয়া দরকার। সরকারের মিনিস্ট্রি অব লেবারের নজর দেয়া দরকার। তারা সবাই মিলে এটি করবেন। এটি করতে এককালীন যে টাকা খরচ হবে এরপরে আর লাগবে না। এটি দান হিসেবেই গণ্য হবে। এটির মালিক বিজিএমইএ থাকবে।

মেয়েদের আরেকটি সমস্যা হচ্ছে নিরাপত্তা সমস্যা। অনেক ঘটনা ঘটে। বিয়ের পরের ঘটনা কম, আগেই বেশি ঘটে। তাদের নির্যাতিত হওয়া, লাঞ্ছিত হওয়া, যৌনভাবে লাঞ্ছিত হওয়া - এসব ঘটনা ঘটে অনেক। বিজিএইমএ'র এই দিকে বড় ধরনের দৃষ্টি আছে বলে মনে হয় না। তারা ভুলে থাকার চেষ্টা করেন এবং বিষয়টি এড়িয়ে যাচ্ছেন বলে মনে হয়।



www.pathagar.com

সরকারের নিরাপত্তা কর্মকর্তারাও যে খুব একটা ভাবেন আমি সেটাও মনে করতে পারছি না। তা না হলে বার বার বছরের পর বছর এসব ঘটনা কিভাবে ঘটছে? ফলে এ ব্যাপারেও বড় ধরনের উদ্যোগ নেয়া দরকার বলে আমি মনে করি। আমি একই সঙ্গে এটাও মনে করি তাদের বাসস্থানের সমাধান হওয়া উচিত। তাদের জন্য কম খরচের হোস্টেলের ব্যবস্থা করা উচিত। সেখানে শুধু যারা গার্মেন্টিসে চাকরি করে তারাই থাকবে। তাহলে এ সমস্যার সমাধান হতে পারে। অবশ্যই প্রাইভেট সেক্টরে এ সমস্যার সমাধান করা গেলে বেশি ভালো হয়। সরকারের পক্ষে করা অনেক কঠিন হয়ে যায়। বিজিএমইএ এবং সিটি কর্পোরেশন কিছু কিছু করলে এবং সরকার কিছু করলে এ সমস্যার সমাধান করা সহজ হয়ে যায়। তাহলে সেটা ভালো হয় বলে আমি মনে করি।



www.pathagar.com

# আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য

সংস্কৃতি কী এবং কী নয় এ সম্পর্কে বিতর্ক রয়েছে এক শ' বছরের। এ বিতর্ক বৃদ্ধি পায় মার্কসিজমের উত্থানের পর। মার্কসিজমের উত্থানের পর একটি নতুন দর্শন আসে Art for life sake নামে। তখন এ নিয়ে একটি বিতর্ক দেখা দেয় যে, Art for art sake না Art for life sake। এ বিতর্ক আগে ছিল না। কমিউনিস্টরা এ বিতর্ক তুলে ধরে। এটি করতে গিয়ে তারা বাড়াবাড়িও করে। আর্ট এখানে সংস্কৃতি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। সংস্কৃতির ভেতর যে একটি সৌন্দর্য থাকতে হবে তা তারা হাইলাইট করতে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। তারা সম্পূর্ণভাবে এটিকে উপেক্ষা করে।

অন্যদিকে যারা 'আর্ট ফর আর্ট সেক'-এর পক্ষে তারাও এ ইস্যুকে রাজনীতিকরণ করে। তারা বলেন, আর্ট আর্টের জন্য। অর্থাৎ এর মধ্যে সৌন্দর্য থাকতে হবে, সৌন্দর্যের চেতনা থাকতে হবে। যা কিছুই সুন্দর করে এবং সৌন্দর্যমণ্ডিত করে জীবনের বিভিন্ন দিককে, সাহিত্যকলায় তা-ই সংস্কৃতি।

সংস্কৃতির প্রশ্নে যদি আমরা সুবিচার করতে চাই তাহলে সেখানে আর্ট বা সংস্কৃতিতে দুটো দিকই থাকতে হবে। জীবনের জন্য তা প্রয়োজনীয় হতে হবে। জীবনের জন্যই হবে, জীবনকে বাদ দিয়ে নয়। তার মাধ্যমে জীবনকেই ধারণ করতে হবে। এটিই সত্য কথা। অন্যদিকে এটিও সত্য যে, যা কিছু সুন্দর নয় তা আর্ট বা সংস্কৃতি হবে না, তা জীবনের জন্য হলেও। কাজেই দুটি উপাদানই প্রয়োজন। দুটিই সত্য। এ বিতর্কের পরিসমাপ্তির প্রয়োজন রয়েছে। তবে আমার মনে হয় বর্তমানে তার পরিসমাপ্তি কিছুটা হয়েও গেছে। মার্কসিজমের পতনের পর এ বিতর্ক আর খুব একটা আছে বলে মনে হয় না।

যেকোনো আদর্শভিত্তিক দলও এ কথা তুলতে পারে যে আর্ট ফর লাইফ সেক। এ তর্ক ইসলামপন্থিদের দরকার নেই। ইসলামপন্থিদের সংস্কৃতির মধ্যে দুটি জিনিসের সমন্বয় ঘটাতে হবে।

সংস্কৃতির ডাইমেনশনের কথা বলতে গিয়ে তার বিভিন্ন ডাইমেনশনের কথা আসে। গান ও সঙ্গীত, সাহিত্য থেকে আরম্ভ করে নাটক, সিনেমা সব কিছুই সংস্কৃতির মধ্যে রয়েছে। আরেকটি দিক থেকে বলতে গেলে বলা যায়, মানুষের



www.pathagar.com

জীবনাচারই সংস্কৃতি। মানুষের গোটা জীবনপদ্ধতিই সংস্কৃতি। সে হিসেবে সংস্কৃতির আরো ব্যাপক অর্থ দাঁড়ায়।

সংস্কৃতির সংজ্ঞার ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে কিছুটা মতপার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু মৌলিকভাবে আমরা স্বীকার করি, সংস্কৃতি একটি ব্যাপক বিষয়। সংস্কৃতি গোটা জীবনব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট। সংস্কৃতি প্রতিটি জাতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তার যেমন অনেক দিক বা ডাইমেনশন রয়েছে, তেমনি সর্বোপরি এটি জীবনকে সার্ভ করতে হবে। সৌন্দর্যকেও সার্ভ করতে হবে। আবারো বলি এটিকে সুন্দরও হতে হবে এবং জীবনের জন্যও হতে হবে।

সংস্কৃতিকে কয়েকটি ভিত্তির উপর দাঁড়াতে হবে। সুস্থ বিশ্বাসের ওপর সংস্কৃতিকে দাঁড়াতে হবে। যদি দুর্নিতীগ্রস্ত চিন্তার (Corrupt thought) ওপর সংস্কৃতি দাঁড়ায় সে সংস্কৃতিও দুর্নিতীগ্রস্ত হবে। কারণ বিশ্বাস আচরণকে প্রভাবিত করে। সংস্কৃতি হচ্ছে আচরণ। তার পেছনে রয়েছে বিশ্বাস। এ বিশ্বাস দুর্নিতীগ্রস্ত হলে আচরণও তাই হবে। বিশ্বাস সুস্থ হলে সেটিও সুস্থ হবে। এখানে মুসলিম জাতির কথা বললে তার ভিত্তি অবশ্যই তৌহিদ হতে হবে। তৌহিদ বলতে আমরা বুঝি একজন স্রষ্টা রয়েছেন। সব সৃষ্টির একটি উদ্দেশ্য রয়েছে। আমরা মানুষ। আমরা আল্লাহর প্রতিনিধি। আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে তার মিশনকে এ বিশ্ব, আকাশ সর্বত্র কার্যকর করা। এ জন্য মুসলিম সংস্কৃতিকে সব সময়ই শিরকমুক্ত হতে হবে। মুসলিম সংস্কৃতি এমন হতে হবে যেন প্রতিনিধির মর্যাদা রক্ষা পায়। তার যে প্রতিনিধি মানুষ, তার সাথে খাপ খায়। অর্থাৎ তা ভদ্র হতে হবে, সৌন্দর্যমণ্ডিত হতে হবে। মার্জিত হতে হবে। অমার্জিত হলে চলবে না। এটি অশ্লীলতামুক্ত হতে হবে।

কাজেই সংস্কৃতির প্রথম ভিত্তি হচ্ছে বিশ্বাস। ইসলামের ক্ষেত্রে এটি হচ্ছে তৌহিদ। তেমনি যদি আমরা ইসলামের বাইরে গিয়ে দেখি তাহলে অমুসলিমদের মধ্যেও সুস্থ বিশ্বাস থাকতে হবে। সেটি তৌহিদ নাও হতে পারে। সেটি আমার দৃষ্টিতে সঠিক নাও হতে পারে। কিন্তু আমার দৃষ্টিতে যা-ই হোক না কেন যদি স্রষ্টার ওপর বিশ্বাস থাকে, মানবতাবাদী হয় তাহলে তার ওপরেও যে সংস্কৃতি গড়ে উঠবে সেটিও ভালো হবে। মানবতার একটি অংশ মুসলিম। বাকি অংশ অমুসলিম। তাদের সংস্কৃতি ভালো হবে যদি তা সুস্থ বিশ্বাসের ওপর হয়। তাদের ক্ষেত্রে সেটি স্রষ্টার ওপর হতে হবে। যদি নাস্তিকতার ওপর হয় তাহলে ক্ষতি হবে। যদি স্রষ্টার অস্তিত্বের ওপর ভিত্তিশীল হয় তাহলে তা নাস্তিকতার চেয়ে অনেক ভালো হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। সেটি যদি মানবতাবাদী হয় তাহলে অবশ্যই ভালো হবে। কিন্তু সেটি যদি জাতিপূজা বা গোত্রপূজা হয় তাহলে সেটি হবে অসুস্থ সংস্কৃতি।

তাহলে আমরা বলতে পারি, সংস্কৃতির জন্য সুস্থ বিশ্বাস লাগবে। দ্বিতীয়ত, তা অশ্লীলতামুক্ত হতে হবে। যদিও এটি প্রথমটির সাথে সম্পর্কযুক্ত। যদি



www.pathagar.com

সংস্কৃতি সুস্থ বিশ্বাসের ওপর হয় তাহলে তা অশ্লীলতামুক্ত হবেই। কারণ কোনো সুস্থ বিশ্বাসই বলে না অশ্লীলতা ভালো। এ সংস্কৃতি অবশ্যই মানবজাতির জন্য হতে হবে। সংস্কৃতিকে মানবজাতির উদ্দেশ্য পূরণ করতে হবে, মানবতাবাদী হতে হবে, কল্যাণধর্মী হতে হবে।

সংস্কৃতির আরেকটি ভিত্তি হচ্ছে সৌন্দর্যচেতনা। এখানে সুন্দর চেতনা থাকতে হবে। কোনো কিছুই অসুন্দর করা যাবে না। কাজেই সার্বিকভাবে বলা যায় সংস্কৃতির ভিত্তির জন্য একটি সুস্থ বিশ্বাস লাগবে। মানবতাবাদী ও মানুষের প্রয়োজনে হতে হবে। অশ্লীলতামুক্ত হতে হবে। কল্যাণধর্মী হতে হবে এবং সৌন্দর্য-চেতনামণ্ডিত ও সৌন্দর্য-বুদ্ধিমণ্ডিত হতে হবে।

এ জন্য আমাদের বিভিন্ন পার্থক্যকে (Pluralism) মেনে নেয়া দরকার। বিশ্ব এক রকম নয়। বিশ্ব এক জাতি মিলে হয়নি। আল্লাহ তায়ালা নিজেই বলেছেন, আমি যদি চাইতাম সবাই ইসলামের অনুসারী হয়ে যেতো। সবাই সিরাতুল মুস্তাকিমের পথে থাকতো। কিন্তু আমি তো এ রকম পরিকল্পনা করিনি। আমি মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছি। অর্থাৎ সবাই এক পথে আসবে না আমার দেয়া এ স্বাধীনতার কারণে।

সংস্কৃতি কি মানুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত? নিয়ন্ত্রিত হলে কতটুকু? এটি আসলে ইয়েস ও নোর (Yes and No) প্রশ্ন। এটি ঠিক যে সংস্কৃতিকে মানুষ নির্মাণ করে। একা এক ব্যক্তিই সংস্কৃতি নির্মাণ করে না। অনেকে মিলে, অনেক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে একটি সংস্কৃতি শত বছরে, হাজার বছরে গড়ে ওঠে। তাই যদি হয় তাহলে এটি কে গড়লো? মানুষ গড়লো। কিন্তু কোনো এক ব্যক্তি বা এক প্রজন্মের বা এক বংশের এর ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। এ অর্থে বলা যায় এটি মানুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। কিন্তু আবার এটিও তো সত্য যে সংস্কৃতি মানুষই তৈরি করেছে। সব মানুষ মিলে তৈরি করেছে। সুতরাং আমরা বলতে পারি সংস্কৃতি প্রকৃতপক্ষে মানুষই তৈরি করে এবং এ অর্থে মানুষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু এ অর্থে আবার নিয়ন্ত্রিত নয় যে কোনো একটি জাতি, কোনো একটি জেনারেশন (Generation) এ সংস্কৃতি নির্মাণ করেনি। অথচ আমরা তো জেনারেশন ধরে চিন্তা করি, আমরা তো ঐতিহাসিকভাবে একত্রে অবস্থান (exist) করছি না–সুতরাং এ অর্থে আবার বলা যায় সংস্কৃতি মানুষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। এটি একটি ঐতিহাসিক বিকাশ (Historical Identity)। এ জন্যই আমি বিভিন্ন জায়গায় বলে থাকি যে সংস্কৃতিকে নিয়ে খেলা চলবে না। সংস্কৃতি মানুষের গভীর চেতনা থেকে উৎসারিত। এটি খুব স্পর্শকাতর। সংস্কৃতি নিয়ে সাবধানে এগোতে হবে। যেহেতু আমি একজন ইসলামপন্থি, এ কথা সে জন্য ইসলামপন্থিদেরও বেশি করে বলি। আমার অনেক কিছুই পছন্দ হবে না, কিন্তু সেটিকে সরাতে হবে আস্তে আস্তে। ধৈর্য ধরে সরাতে হবে। যেটি রাখলে চলে সেটি রাখতে হবে।



www.pathagar.com

কারণ ইসলামের শুরুতেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সরাসরি ইসলামবিরোধী নয় এমন স্থানীয় রীতিনীতি, আচার-আচরণকে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আরব কাস্টমসকে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। ইবনে তাইমিয়ার একটি বিখ্যাত ফতোয়া আছে, যে কোনো দেশের স্থানীয় কাস্টমস (রীতিপ্রথা) তা যদি সরাসরি ইসলামবিরোধী না হয়, একেবারে সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ না হয়, তাহলে সেটি থাকবে।

আমরা এ ব্যাপারে অনেক সময় কিছুটা হঠকারিতা করে বসি। কিছুটা বাড়াবাড়ি করে বসি। এগুলো থেকে আমাদের মুক্ত হতে হবে। ইসলামের যে মহত্ত্ব, সামগ্রিকতা, ব্যাপকতা এবং বহু মত ও পথের সুযোগ আছে সে সুযোগের বিষয়টি মনে রাখতে হবে। যদি এ মত ও পথের সুযোগ না থাকতো তাহলে এতগুলো মাজহাব হলো কিভাবে? সুন্নিদের চারটি মাজহাব হলো কিভাবে? শিয়াদের মধ্যে কয়েকটি মাজহাব হলো কী কারণে? এটি হয়েছে এ কারণে যে ইসলামে এ অপশনটি আছে।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমাদের বিভিন্ন মতামতকে মানতে হবে। এখানে বিভিন্ন মত-পথের স্বীকৃতি আমাদের দিতে হবে। বিশ্বব্যাপী ইসলামের যে সংস্কৃতি তার তো একেক দেশের একেক সংস্করণ। ইন্দোনেশিয়ার ইসলামী সংস্কৃতি রূপে রসে রঙে একই সাথে ইসলামিক হবে, ইন্দোনেশিয়ানও হবে এবং তার মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব থাকবে না। সংস্কৃতির ভেতর যদি সুস্পষ্ট ইসলামবিরোধী কোনো মৌল উপাদান না থাকে তাহলে তা ইসলামী সংস্কৃতি হতে বাধা নেই। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তেমনিভাবে তা প্রযোজ্য মরক্কো, নাইজেরিয়া, পাকিস্তানের ক্ষেত্রে। প্রত্যেকের নিজস্ব রঙ হবে। আমার মনে হয় এটি অনেকটা এ রকম হবে যে, একই বাগানে ইসলাম তার মধ্যে ১০০টি ফুলগাছ। এ বিষয়গুলো ইসলামী সংস্কৃতি কর্মীদের ভেবে দেখা দরকার।

বিশ্বায়ন বর্তমান বিশ্বে একটি মেজর ঘটনা। সেটি মূলত ঘটেছে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে। এ অবস্থায় আগামী দিনগুলোতে সংস্কৃতি কতটুকু ভিন্ন থাকবে বলা মুশকিল। আমার মনে হয় সংস্কৃতির অনেক কিছু এক হয়ে যাবে। যেমন পোশাক-পরিচ্ছদ বিশ্বব্যাপী ক্রমেই কাছাকাছি চলে আসতে পারে। এটি অসম্ভব নয়। স্বীকার করতে হবে, ইতোমধ্যেই পুরুষ পোশাকের ক্ষেত্রে শার্ট-প্যান্ট প্রায় এক হয়ে গেছে। যদিও নারী পোশাকের ক্ষেত্রে ঠিক অন্য রকম হয়েছে। মুসলিম বিশ্বে তো নারীর পোশাক নানাভাবে অন্য রকমই রয়ে গেছে। ফলে আমি মনে করি, অনেক ক্ষেত্রে কাছাকাছি এলেও যেসব ক্ষেত্রে এক হবে না, সেসব ক্ষেত্রে পরিবর্তন থেকে যাবে। যেমন খাওয়া-দাওয়া, এর উপকরণাদি একেক জায়গায় একেক রকম থেকে যাবে। আবার প্রত্যেক এলাকার নিজস্ব গানের সুর আলাদা থেকে যাবে। প্রত্যেক এলাকার নিজস্ব প্রকৃতি, নদী, সমুদ্র, বন, ফসল, মাঠ আছে। তার একরকম আলাদা সুর আছে।


www.pathagar.com

সুতরাং গানে, সঙ্গীতে এ পার্থক্য থেকে যাবে। প্রত্যেক এলাকার জনগোষ্ঠীর নিজস্বতার জন্য এবং অন্য জনগোষ্ঠী ও এলাকার ভিন্নতার জন্য সাহিত্যেও একটি পার্থক্য থেকে যাবে।

সংস্কৃতির নিয়ামক হলো ধর্ম বা বিশ্বাস। এটি এক অর্থে সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। সে নিয়ামকের আলাদা বৈশিষ্ট্যের জন্য সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য থেকেই যাবে। হতে পারে, শত সংস্কৃতি না থাকতে পারে, কিন্তু অন্তত পাঁচ-দশটি সংস্কৃতি বিশ্বে থেকে যাবে। তবে কতো দিনে তা হতে যাচ্ছে তা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। কিন্তু অনেক দিকেই ঐক্য বাড়বে। সাংস্কৃতিক ঐক্য বাড়বে। অনেক বেশি পারস্পরিক যোগাযোগ বাড়বে। আবার অনেক ক্ষেত্রেই পার্থক্য থেকে যাবে।

এখানে আগ্রাসন (aggression) ও ইন্টারঅ্যাকশনকে (interaction) যদি এক না করে পার্থক্য করতে পারি তাহলে ভালো হবে। ইন্টারঅ্যাকশনকে আমরা পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বা লেনদেন বলি, আর আগ্রাসন হচ্ছে পরিকল্পিতভাবে চাপিয়ে দেয়া। আমাদের অবশ্যই পরিকল্পিত চাপিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করতে হবে। 'লা ইকরাহা ফিদদিন'-এর ভেতরও এ তাৎপর্য রয়ে গেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদিদের সাথে প্রথম চুক্তিতেই তাদের সম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা দিয়ে দিলেন। সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা দিলেন। এটি প্রমাণ করে সংস্কৃতিকে জোর করে বদলে দেয়া ইসলামও নয়, মানবতাও নয়। এখানে আগ্রাসনের ব্যাপারেও আমাদের এ দিকটি খেয়াল রাখতে হবে।

পাশ্চাত্যের কালচার দুর্ভাগ্যজনকভাবে হলেও বস্তুবাদের ওপর ভিত্তিশীল। বস্তুবাদ হলো ভোগবাদ ও স্বার্থপরতা। তার কারণেই কালচার খুব নোংরা হয়ে গেছে। কালচার নারীকেন্দ্রিক হয়ে গেছে। নারীর অপব্যবহারকেন্দ্রিক হয়ে গেছে। এটিকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়ার যে প্রবণতা তা রুখতে হবে। এটিকে রুখতে পশ্চিমাদের মধ্যে যারা ভালো তাদেরও উৎসাহিত করতে হবে। পশ্চিমা বস্তুবাদ নাস্তিকতা না হলেও নাস্তিকতার কাছাকাছি। এটির বিরুদ্ধে সারা বিশ্বের সবাইকে রুখে দাঁড়াতে হবে। এ বস্তুবাদ মানবতার জন্য কল্যাণকর নয়।

সংস্কৃতির বাইরে কোনো মানুষ হতে পারে না, সমাজ হতে পারে না। তাই তার পক্ষে সংস্কৃতিবিমুখ হওয়াও সম্ভব নয়। তবে সুশিক্ষার অভাবে, দারিদ্র্যের কারণে কিছু লোক যদি অপরাধী হয়ে যায় তাহলে তার সংস্কৃতি হয়ে যাচ্ছে কুসংস্কৃতি বা অপসংস্কৃতি। আবার প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত একটি সংস্কৃতি আছে। কেউ দেশের গান পছন্দ করে, কেউ হামদ-নাত পছন্দ করে। এটি হলো একটি দিক। আর গানবাজনা হলো কালচারের বাইরের একটি দিক। যদিও এগুলোই বেশি, তারপরও এসব কিছু কালচারের মূল দিক নয়। কালচারের মূল দিক হচ্ছে জীবনাচার, পুরো জীবন। প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি উচ্চারণ, বক্তব্য, চলাচল,



www.pathagar.com

ভ্রমণ, কথন সব কিছু হচ্ছে তার কালচার। আমরা খুব গভীরভাবে না দেখার কারণে গান-নাচকেই বড় ভেবে এসব বিষয়কে ছোট ভাবি। কিন্তু এগুলো না থাকলেও একটি জাতির পক্ষে সংস্কৃতিবান হওয়া সম্ভব। এগুলো বাদ দিয়েও জাতি সংস্কৃতিবান হতে পারে। অনেক জাতিই আছে যাদের গান খুব পপুলার নয়, যাদের নাচ নেই–তাতে কিছু আসে-যায় না।

আমরা বিনোদনের নামে যা খুশি তাই করতে পারি না। জীবনের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বিনোদন। বিনোদন প্রয়োজন। আধুনিক বিশ্বে বিনোদনকে গুরুত্ব দিতে হবে। মানুষের দৈনিক জীবনের একটি বড় অংশ রাস্তায় চলে যায়। তার সাথে অফিসের সময়। প্রতিটি ক্ষেত্রেই মানুষ ব্যস্ত। এ অবস্থায় তার জন্য অবশ্যই একটি সুস্থ বিনোদনের ব্যবস্থা থাকতে হবে। বিনোদনকে সুস্থ হতে হবে–অসুস্থ হওয়া যাবে না, অশ্লীল হওয়া যাবে না। কুস্বভাব সৃষ্টি করে, অপরাধ ছড়ায় এমন কিছু করা যাবে না। খারাপ যা খুব কম ঘটে তাকে নাটকে এনে জাতিকে জানাতেই হবে তা আসলে জরুরি নয়। সাহিত্যের নামে যেটি করা হয়–একটি পরিবারের দুর্ঘটনা গোটা জাতিকে জানানো হয়। কিন্তু তা যদি সুন্দর কিছু হতো তাও কথা ছিল।

আসলে বিনোদনের মধ্যে একটি সীমা থাকতেই হবে। সে সীমা থাকতে হবে আইন ও কাস্টমসের মাধ্যমে। এ ব্যাপারে স্বাধীনতার নামে আমরা কদাচারকে অনুমোদন করতে পারি না। আমরা এমন স্বাধীনতা চাই না যে স্বাধীনতা মানুষকে অমানুষ বানায়।

১৭ জুলাই ২০১২, দৈনিক নয়া দিগন্ত



www.pathagar.com

# কাজী নজরুল ইসলাম ঃ প্রসঙ্গ ভাবনা

কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যের এক দিকপাল। প্রধানত যে তিন জন ব্যক্তি আধুনিক বাংলা সাহিত্য গড়ে তুলেছিলেন তাদের অন্যতম। এ তিন জন ব্যক্তির মধ্যে একজন মাইকেল মধুসূদন দত্ত, অন্যজন হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তৃতীয় জন কাজী নজরুল ইসলাম।

কাজী নজরুল ইসলাম সাহিত্যের বিভিন্ন দিকের চর্চা করেছেন। তার উপন্যাস, নাটক, ছোট গল্প ও গান রয়েছে। তার প্রবন্ধ রয়েছে; অনুবাদও আছে। অনুবাদের মধ্যে আমপারা, রুবাইয়াতে ওমর খৈয়াম রয়েছে। অর্থাৎ সাহিত্যে নজরুলের ব্যাপক বিস্তার রয়েছে। কিন্তু তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো কবিতা ও গানের ক্ষেত্রে। কবিতার মধ্যেও নানা বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

একদিকে তিনি বিপ্লবী কাব্যের রচয়িতা। তিনি তার বিপ্লবী কবিতার মাধ্যমে তৎকালীন ভারতবর্ষের বাংলাভাষী অঞ্চলের মানুষ এমনকি ভারতবাসীকে উজ্জীবিত করেছেন, অন্যদিকে মুসলিম জাতিকে তিনি তাঁর কাব্যের মাধ্যমে উজ্জীবিত করেছেন। সেই সাথে তিনি আরবি ও ফারসি শব্দের যেগুলো বাংলা ভাষায় কম-বেশি জনগণের মধ্যে ছিল এবং পুরনো বাংলায় যার ব্যবহার দেখা যায়, তাকে নতুনভাবে তার কবিতায় নিয়ে আসেন। কাব্যের ক্ষেত্রে এটা তার সবচেয়ে বড় পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং এক্ষেত্রে তিনি যে অত্যন্ত সাফল্য অর্জন করেছেন তা প্রায় সবাই স্বীকার করেন। আমি এমন কাউকে জানি না, যিনি নজরুলের এই পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে অন্যায় বা ভুল বলেছেন কিংবা সঠিক বলেননি; বরং আমি বেশির ভাগ লেখককে বলতে দেখেছি, নজরুল অসম্ভব দক্ষতা ও যোগ্যতায় আরবি-ফারসির যেসব শব্দ মুসলিম জনগণের মুখের ভাষার সাথে ছিল সেগুলোকে কবিতায় নিয়ে এসেছেন।

কাজী নজরুল ইসলাম গানের ক্ষেত্রে অসম্ভব প্রতিভা দেখিয়েছেন। অসংখ্য গান লিখেছেন। সুন্দর ও কালোত্তীর্ণ গান লিখেছেন। এ গানের মধ্যে আবার একটি অংশ হচ্ছে ইসলামী গান বা ইসলামী সঙ্গীত। ইসলামী সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বিশেষ করে তার হামদ ও নাতের ক্ষেত্রে এবং অন্য ধরনের গজলের ক্ষেত্রে তিনি যে দক্ষতা দেখিয়েছেন এখনও কেউ বাংলা সাহিত্যে তা অতিক্রম করতে



www.pathagar.com

পারেনি। এমনকি গোলাম মোস্তফা, ফররুখের মতো প্রতিভা যে কাজ করেছেন তাতে হামদ-নাতের ক্ষেত্রে নজরুলের সমকক্ষ কিছুই করতে পারেনি।

সুতরাং নজরুলের সাহিত্য নিয়ে আমাদের দেশে অনেকেই লিখেছেন। শাহাবুদ্দীন আহমদ তাদের একজন। তিনি একজন সাহিত্য সমালোচক। তিনি নজরুলের উপর অনেক লিখেছেন। তিনি ফররুখসহ অন্য সাহিত্যিকদের উপরও অনেক সমালোচনা লিখেছেন। তবে তিনি সবচেয়ে বেশি লিখেছেন কাজী নজরুল ইসলামের উপর। সেখানে তিনি নজরুলের গানের উপর এবং আরবি-ফারসি শব্দসহ বিভিন্ন ভাষার শব্দের ব্যবহার ও প্রয়োগের উপর বলেছেন। সেদিকে আমি নতুন করে কিছু বলতে চাই না। কিন্তু এ প্রসঙ্গে আমি যেসব বিষয়কে এ মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি, তার মধ্যে কয়েকটি কথা এখানে নিয়ে আসব।

একজন বড় সাহিত্যিককে কী মানদণ্ডে বিচার করা হবে বা কিসের ভিত্তিতে বিচার করা হবে? যেমন কিসের ভিত্তিতে আমরা শেক্সপিয়ার ও দান্তেকে মূল্যায়ন করব? কিংবা কিসের ভিত্তিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা কাজী নজরুল ইসলামকে বিচার করব? কিসের ভিত্তিতে ইকবাল ও গালিবকে বিচার করব? আমার মনে হয়, এ গ্রেট সাহিত্যিকদের বিচারের মানদণ্ড প্রধানত একটি। তা হচ্ছে তার সাহিত্যকর্ম। সেটা হচ্ছে কতটুকু সাহিত্য হয়েছে, তার কবিতা কতটুকু কবিতা হয়েছে, তার গান কতটুকু গান হয়েছে এবং সেটা সাহিত্যের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হয়েছে কি না? আর এটা করাই সঠিক। এমনকি আমরা তা করেও থাকি, যদিও তা আমরা অনেক সময় উপলব্ধি করি না। যেমন আমরা যখন শেক্সপিয়ারের নাটক মূল্যায়ন করি তখন এ ভিত্তিতে করি না যে, তিনি খ্রিস্টান ছিলেন কিংবা বলা যায়, খ্রিস্ট ধর্মের আলোকে আমরা শেক্সপিয়ারকে বিচার করি না।

অন্য সাহিত্যিকদের মধ্যে টলস্তয়, পুশকিন বা পার্ল বার্ককে আমরা বিচার করি না যে তিনি কতটা খ্রিস্টান ছিলেন। বিষয়টি আমরা যদি অন্যের ক্ষেত্রে করি তাহলে সেটা আমাদের দেশের লেখকদের ক্ষেত্রেও করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ, নজরুলকেও সেই সাহিত্যের মানদণ্ডেই বিচার করতে হবে।

আমি স্বীকার করি, একজন মুসলিম হিসেবে আমার খুব ভালো লাগে, যদি কোনো কবি ইসলামকে ধারণ করেন; ইসলামের মেসেজ ধারণ করেন, একে ব্যক্ত করেন এবং তা তুলে ধরেন। এটা পূর্ণ করলে বেশি খুশি লাগবে, আংশিক করলেও আমি খুশি হব। তারপরও আমি কোনো সাহিত্যিকের বিচারের মানদণ্ড এটা ধরতে পারি না। এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের খেয়াল রাখা উচিত।

যেকোনো কারণেই হোক, যে মানদণ্ডে আমরা শেক্সপিয়ারকে বিচার করি না, সেখানে কেন আমরা নজরুল ইসলাম বা রবীন্দ্রনাথকে বিচার করব। কবি রবীন্দ্রনাথের কোনো রাজনৈতিক মত বা বক্তব্য পছন্দ না-ও হতে পারে। তাই



www.pathagar.com

তাকে সেই মানদণ্ডে না নিয়ে সাহিত্যের আলোকে বিচার করতে হবে। তেমনিভাবে কাজী নজরুল ইসলামকেও রাজনৈতিক মতাদর্শের মাধ্যমে বিচার করা সঙ্গত হবে বলে মনে করি না।

এর মধ্যে আরেকটি প্রশ্ন এসে যায়। কাজী নজরুল ইসলাম কিছু পূজার গান লিখেছেন, যাকে শ্যামা সঙ্গীত বলা হয়। আমরা এটাকে কিভাবে দেখব? তিনি এসব গান কেন লিখেছেন, এর কারণ তিনিই ভালো জানেন। সেটা কোনোভাবেই বাদ দেয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের কি এটা প্রমাণ করতেই হবে যে, কাজী নজরুল ইসলাম সর্বাংশে ইসলামের অনুসারী ছিলেন। যেহেতু তিনি অনেক পূজার গান লিখেছেন, তাই এটা আমরা পুরো প্রমাণ করতে পারব না। আর এর প্রয়োজনও নেই। আমি মনে করি এ তর্কও অপ্রয়োজনীয় বরং কারো সাহিত্যকর্ম থেকে যার যেটুকু বা যেটা ভালো লাগে আমরা সেটা নেব। এতে আমি কোনো অসুবিধা দেখি না।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি বিষয় আমাদের সমাজে এসে যায় বলেই আমি কথাটি শুধু তুলেছি। আমাদের বাল্যকালে আমি একটি অকারণ তর্ক দেখেছি। হিন্দু ছেলেরা বলত, রবীন্দ্রনাথ অনেক বড়, নজরুল ইসলাম এমন কিছু নয়। আর আমরা উল্টা বলতাম, নজরুল ইসলাম বড়, রবীন্দ্রনাথ অত বড় নয়। এ তর্ক এখনো সরবভাবে না হলেও নীরবভাবে আছে। কিন্তু এ তর্কের কী প্রয়োজন? আমি মনে করি, প্রয়োজন নেই। আমরা তো অন্যান্য কবি-সাহিত্যিকদের আলোচনায় এ রকম তুলনামূলক আলোচনা করি না যে কে বড়? তাহলে এ দু'জনের ক্ষেত্রে এরকম কেন? এ আলোচনা আসলে একেবারেই নিরর্থক যে রবীন্দ্রনাথ বড় না নজরুল বড়। আসলে এই ধরনের আলোচনা থেকে দূরে থাকাকেই আমি সঠিক মনে করি।

কেউ কেউ বলেন, নজরুল ইসলাম সবচেয়ে বড় অসাম্প্রদায়িক ছিলেন। এ কথা বলার তাৎপর্য হচ্ছে, অন্যরা যেন অসাম্প্রদায়িক নন; কিংবা ইকবাল অসাম্প্রদায়িক নন; ফররুখ বা আমি নিজে অসাম্প্রদায়িক নই। যদিও আমি কবি-সাহিত্যিক কোনোটাই নই, তবুও আমি মনে করি এটা বলা ভুল। নজরুল ইসলাম তার পদ্ধতিতে, তার মতো করে অসাম্প্রদায়িক ছিলেন। তিনি হয়তো মনে করেছেন, তিনি ইসলামের জন্য লিখবেন। এটিই তার প্রধান ক্ষেত্র; কিন্তু তিনি সমাজের হিন্দুদের জন্যও কিছু লিখবেন। শুধু এ কারণেই অসাম্প্রদায়িক বলা এবং অন্য সম্প্রদায়ের জন্য যদি কিছু লেখা না হয় তাহলে অসাম্প্রদায়িক হওয়া যায় না–এ কথা আমার উপলব্ধিতে আসে না। আমি মনে করি সেও অসাম্প্রদায়িক, যে নিজেরটা লিখল কিন্তু অন্যের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়াল না; বিদ্বেষ পোষণ করল না।

এ দৃষ্টিতে কিছু লোক ছাড়া, যারা সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়িয়েছেন যেমন 'আনন্দ মঠের' লেখক বঙ্কিম চন্দ্র; যিনি স্পষ্ট মুসলিমবিদ্বেষী ভূমিকা পালন



www.pathagar.com

করেছেন। এ রকম যদি কেউ করে থাকেন তবে তার কথা আলাদা। না হলে সবাই মোটামুটি অসাম্প্রদায়িক।

একটা কথা বলা হয়, রবীন্দ্রনাথ মুসলমানদের সম্পর্কে কিছু লেখেননি। কিন্তু এ কথা তো আরো অনেকের ক্ষেত্রেই বলা যায়। যেমন–শেক্সপিয়ার, তিনি তো মুলমানদের জন্য কিছুই লেখেননি। তাহলে কী করে তাকে গ্রেট বলব। ফেরদৌসী, রুমী–এরা তো মুসলিমদের বাইরে কারো জন্য কিছু লেখেননি। তাহলে কি তারা গ্রেট নন? গ্রেট হওয়ার জন্য কি আলাদা করে সবার জন্য লিখতে হবে? বা না লিখলেই কি আমরা তাকে মন্দ বলব?

এ কথা তো বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের একটা বিরাট অংশের সাথে মানুষের গভীর অনুভূতির সম্পর্ক রয়েছে। সেখানে প্রকৃতির উপলব্ধিকে তো কোনো ধর্মের বলে উল্লেখ করা সঠিক হবে না। কেউ কেউ তার অন্তর্নিহিত সুরের মধ্যে ধর্মীয় অনুভূতি রয়েছে বলে প্রশ্ন করতে পারেন। তাহলে তো বলা যায় সবারই অন্তর্নিহিত সুরের মধ্যে তার বিশ্বাসের কথা রয়েছে। দুনিয়ার এমন কোনো ব্যক্তি নেই, যে তার অন্তর্নিহিত সুরের মধ্যে কিছু না কিছু তার বিশ্বাসের প্রতিফলন নেই। তাহলে এক্ষেত্রে একজনের জন্য এই যুক্তি আনা কতটা যুক্তিসঙ্গত হবে?

আমি মনে করি সাহিত্যের ক্ষেত্রে কবিকেই শুধু তার রাজনীতি বা বিশ্বাস দ্বারা বিচার করা ঠিক হবে না। তাঁদেরকে অবশ্যই সাহিত্যের মানদণ্ড দিয়েই প্রথমত বিচার করতে হবে। আমি সবচেয়ে বেশি খুশি হই, যদি কোনো কবি ইসলামকে ধারণ করেন। সেটা তো সাহিত্য বিচারের অন্য একটা দিক। সেটা সাহিত্যিকদের আদর্শিক শ্রেণিকরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

শেষে বলতে চাই, আমার জীবন গঠনে কাজী নজরুল ইসলাম প্রভাব বিস্তার করেছেন। অল্প বয়সেই তার কবিতা পড়েছি, সেগুলো আমাকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে খুব কম লোকই আছে যারা তার হাম্‌দ-নাত বা কবিতা দ্বারা প্রভাবিত হননি। যদিও আমরা উপলব্ধি করি না কিন্তু আমাদের গঠনে তা প্রভাব বিস্তার করে আছে। আমি ব্যক্তিগত ও গভীরভাবে তার খুবই অনুরাগী। আমি মনে করি, বাংলাদেশে নজরুলচর্চা খুবই ব্যাপক।



www.pathagar.com

# ঈদ সংস্কৃতির স্বরূপ ও মূল্যায়ন

ঈদ ইসলামের দুটি প্রধান অনুষ্ঠান–এটা আমরা সবাই জানি। ঈদের শুরু কিভাবে হয়েছিল সেটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দুটি ঈদের শুরু হলো এভাবে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় গেলেন তখন তিনি দেখলেন যে তারা দুটি অনুষ্ঠান পালন করে। সেই দুটি অনুষ্ঠান বদলে দিয়ে তিনি এই দুটি ঈদের ব্যবস্থা করলেন। একটি হলো সফলভাবে রোজা শেষ করার আনন্দ। আরেকটি হচ্ছে হজ্জের যে অনুষ্ঠান, যাতে বিশ্ব মুসলিম শরিক হচ্ছে মক্কায় তারই পাশাপাশি সারা বিশ্বের মুসলিমরা যুগপৎভাবে ঈদ পালন। অর্থাৎ মক্কায় হজ্জ হচ্ছে এবং সারা দুনিয়ায় ঈদ উৎসব হচ্ছে। আবার এর সঙ্গে ঐতিহাসিক ঘটনা জড়িয়ে দেয়া হয়েছে। হযরত ইবরাহিম (আ)-কে তাঁর ছেলে কুরবানী করতে বলে আল্লাহ তাআলা যে মহাপরীক্ষা করেছিলেন সেই পরীক্ষায় তাঁর যে বিজয়, সেটাকে সামনে রেখে এই ঈদের ও হজ্জের অনুষ্ঠান করা হলো।

এটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ দিক যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ দুটি অনুষ্ঠান বদলে দিলেন কেন? আগের অনুষ্ঠানগুলোর ভিত্তি ছিল পারস্যের অনুকরণে। পারস্য তৎকালীন অন্যতম সুপার পাওয়ার ছিল। তাদের জাতির মধ্যে ঐ অনুষ্ঠানগুলো ছিল। এসব অনুষ্ঠান মূলত কিছুটা প্রকৃতিভিত্তিক ছিল। সেই কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব অনুষ্ঠান তেমন পছন্দ করেননি। এ অনুষ্ঠানগুলোতে প্রকৃতিকে বেশি সম্মান দেখানো হচ্ছিল। সেজন্যই তিনি এ পরিবর্তনটি করলেন। এর থেকে আমাদের মনে রাখতে হবে যে মুসলিমদের যে অনুষ্ঠানমালা হবে তাতে এ মূলনীতিটি আমাদের খেয়াল রাখা উচিত।

ইসলাম আনন্দ-উৎসবকে স্বীকার করেছে। যেমন–রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেসব অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিয়ে নতুন কোনো অনুষ্ঠান চালু না-ও করতে পারতেন; কিন্তু তিনি তা না করে তাদের ঐ দুটি অনুষ্ঠানের পরিবর্তে বিকল্প দুটি নতুন অনুষ্ঠান দিয়েছেন। এ থেকে আরেকটি নীতি পাওয়া যায়, তা হলো–মানুষের যে সত্যিকার প্রয়োজন সে প্রয়োজনকে উপলব্ধি করতে হবে। স্বীকার করতে হবে, মানতে হবে। সেটা করতে গিয়ে যদি দেখা যায়, প্রচলিত পদ্ধতিগুলো ভালো নয়, তাহলে তার বিকল্প দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই কার্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষের



www.pathagar.com

স্বাভাবিক প্রয়োজন পূরণ করতে হবে। প্রয়োজন হলে তার বিকল্পও দিতে হবে। এ বিষয়ও আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে। আজকের মানুষের মধ্যে আনন্দের যে প্রয়োজন রয়েছে তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীকার করেছিলেন। স্বীকার করেই তিনি এ দুটি অনুষ্ঠান দেন এবং তার নাম রেখেছেন 'ঈদ' তথা আনন্দ, উৎসব। তিনি অন্য নাম রাখতে পারতেন। অথচ তিনি ঈদ নাম রাখলেন কেন? একে আনন্দ-উৎসবের সঙ্গে সম্পর্ক করলেন কেন? এটা আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক। এটা প্রমাণ করে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে বৈরাগ্যবাদী ছিলেন না। বৈরাগ্যবাদ তিনি সমর্থন করেননি। সুস্থ স্বাভাবিক জীবনকে তিনি পছন্দ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিখ্যাত হাদিস হচ্ছে, 'ইসলামে কোনো বৈরাগ্যবাদ নেই'। এ ছাড়াও কুরআন মাজিদে বৈরাগ্যবাদকে নিন্দা করা হয়েছে। কুরআন মাজিদের বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে, ইসলামে বৈরাগ্যবাদ গ্রহণযোগ্য নয় এবং ইসলাম বৈরাগ্যবাদের ধর্ম নয়। বৈরাগ্যবাদ কোনো সুস্থ-স্বাভাবিক জীবন নয়।

এ থেকে আমরা বলতে পারি, ইসলামী সংস্কৃতির শুরুটা কী রকম হবে তা আমরা ঈদ থেকে পাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ঈদের ব্যবস্থা করলেন তাতে তিনি ঈদের দিনটি শুরু করলেন নামাজ দিয়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিন খাওয়া-দাওয়া করতে বললেন, নতুন কাপড়-চোপড় পরতে বললেন, বেড়াতে উৎসাহিত করলেন। বেড়ানোকে, দাওয়াত দেয়াকে উৎসাহিত করলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঈদের দিনটি শুরু করতে হবে সালাত দিয়ে–এই ব্যবস্থা রাখলেন।

আগের দিনে আরব দেশে আমাদের মতো এত দেরিতে ঈদ হতো না। সেখানে ঈদ হয়ে যেত খুব ভোরে। তখন সূর্য ওঠার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঈদের নামাজ পড়া হয়ে যেত। নামাজ পড়েই বাকি কাজে লেগে যেত। এ দিকও ইসলামী সংস্কৃতির একটি বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করে। এর বৈশিষ্ট্য হলো, আমাদের আনন্দ-অনুষ্ঠানের ভিত্তি হতে হবে আল্লাহকে স্মরণ করা। সেটা ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা সালাত দিয়ে শুরু করার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। অন্যান্য অনুষ্ঠান শুরু করতে হবে আল্লাহর স্মরণে। তাই যেকোনো সুন্দর অনুষ্ঠান যদি আমরা করি তার শুরু হওয়া উচিত আল্লাহকে মনে করার মধ্য দিয়ে।

এ বৈশিষ্ট্য আরো প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন তাতে কুসংস্কারের কোনো স্থান নেই। এর মধ্যে কোনো অসাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের অবকাশ নেই। সেখানে সব কিছুই সুন্দর। আসলে সব কিছুই সুন্দর হতে হবে। এর মধ্যে স্থান নেই কোনো ধরনের পূজার। তা মানুষেরই হোক বা প্রকৃতিরই। আমাদের দেশে ঈদ যেভাবে পালিত হচ্ছে সে বিষয়ে কিছু বলা দরকার। প্রথমত, ঈদে বেড়ানো একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-আশাক এসব ব্যাপার ঠিক আছে। কিন্তু যেটুকু ঠিক নেই



www.pathagar.com

তা হলো, পাশ্চাত্যেরই প্রভাবে আমাদের মধ্যে অনেক অশালীন পোশাকের প্রচলন হয়েছে। এটা দূর করা সহজ ব্যাপার নয়। এ প্রসঙ্গে একটি কথা এখানে বলা প্রয়োজন যে, দুনিয়াতে যেকোনো সংশোধন দাওয়াত দ্বারাই সম্ভব। মানুষের মনকে জয় করতে হবে। মনকে জয় করেই সংশোধন আনতে হবে। কারণ, একটি ইসলামী রাষ্ট্র হবে, সেই রাষ্ট্র আইন করে এগুলো করবে, সেটা যথেষ্ট জটিল প্রক্রিয়া। তা কতটা করতে পারবে, সে প্রশ্ন থেকে যায়। সেটা করতে পারলে ভালো। সংবিধান মোতাবেক একটি দল ক্ষমতায় এসে সংসদে আইনের মাধ্যমে এগুলো করতে পারলে ভালো। কিন্তু সেটা করা কতটা সম্ভব হবে তা জানি না এবং এর জন্য অপেক্ষা করার কোনো প্রয়োজন নেই। মূল জিনিস হলো সমাজের সংশোধন। কল্যাণ করতে হবে দাওয়াতের মাধ্যমে। যদি মুসলিম জাতির ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা সকলে দাওয়াতে বেশি সময় দেন, ইসলামের মূল ধারা, মূল্যবোধকে যদি তারা বুদ্ধিমানের মতো জাতির সামনে উপস্থাপন করতে পারেন বন্ধু-বান্ধবদের কাছে, নিজেদের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে তাহলে এই সংস্কার সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি।

এ ধরনের আরো কিছু বিষয় আছে। আজকাল চ্যানেলগুলোর উপর অনেকে নির্ভর করছেন। ঘরের অনেকেই চ্যানেলগুলো দেখে সময় ব্যয় করছেন। নারীরা করছেন বেশি। যদি সেসব অনুষ্ঠান আরো ভালো হতো, শালীন হতো, সুস্থ ও কল্যাণকর হতো তাহলে জাতির জন্য ভালো হতো। এগুলোর পরিবর্তনও আবার দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার; কঠিন ব্যাপার–মানতে হবে। এক্ষেত্রে দাওয়াত ছাড়া মানুষের সংশোধনের কোনো পথ দেখছি না। মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করা, তাকে বোঝানো, ইসলামকে মানতে বলা ছাড়া কোনো পথ দেখছি না। আমাদের এ কথাও মনে রাখা উচিত যে আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করব। তারপর যারা মানবে না বা ইসলামকে অনুসরণ করবে না, তার জন্য আল্লাহ্ তো বিচারক রয়েছেনই। সেটা আল্লাহ্ দেখবেন। আমাদের হাতে সবকিছু নয়।

আরেকটি কথা এখানে বলা প্রয়োজন। আমাদের আনন্দ-উৎসব কি এই দুটি ঈদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে, এর বাইরে কি কিছু করা যাবে না? যাবে। যেমন–একটি স্বাধীনতা দিবস পালন করাই উচিত। আর ইতিহাসের বড় বড় ঘটনা, যেমন আমরা এখন বঙ্গভঙ্গের শতবর্ষ পালন করছি। সেটা আমরা পালন করতেই পারি। আমাদের ভাষা নিয়ে একটা সংগ্রাম হয়েছিল, সেই দিবস তো আমরা পালন করতেই পারি। এ রকম অন্যান্য বড় ঘটনা বা দিবসকে আমরা অবশ্যই পালন করতে পারি। তবে ইসলামের মূলনীতিকে খেয়াল রাখতে হবে। সেটা হতে হবে আল্লাহকে স্মরণ রেখে করা এবং ইসলামে যা কিছু অবৈধ বলা হয়েছে তা না করা। তবে অনুষ্ঠান অনেক করা বা বাড়ানো ঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুষ্ঠান কেন মাত্র দুটি করলেন, এটাও তো



www.pathagar.com

একটা চিন্তার বিষয়। তিনি কেন ইবরাহিম (আ)-এর জন্মদিবস পালন করলেন না, তিনি কেন আদম (আ)-এর জন্মদিবস পালন করলেন না–এই প্রশ্ন তো আসে। কেন দুটি করলেন? এ থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে অনেক বেশি অনুষ্ঠান করাও ঠিক নয়। কেননা, তাতে মানুষের জীবন ভারী হয়ে যায়। যেমন আমাদের প্রতিবেশী সমাজের বারো চাঁদে তেরো পার্বণ, তার মানে এত অনুষ্ঠান যে জীবন অনেকটা ভারী হয়ে যায় এসব অনুষ্ঠানের জন্য তৈরি হওয়া, এর জন্য খরচ করা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে। এতে ব্যয়, সময় খরচ বেড়ে যায়। সেজন্য মনে হয় খুব বেশি বেশি অনুষ্ঠান করা জীবনকে ভারী করে ফেলার শামিল। কুরআনের সূরা আ'রাফের একটা আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি পিঠের বোঝা নামিয়ে দেন এবং পায়ের শিকল কেটে দেন। এর মানে তিনি অহেতুক অনুষ্ঠান কমিয়ে দেন। অহেতুক সামাজিক বিধি-বিধান কমিয়ে দেন। তিনি মানুষের জীবনকে সহজ করে দেন। এ বিষয়ও আমাদের সংস্কৃতিতে মনে রাখতে হবে।

আরেকটি জিনিস একটু আগে বললাম, তিনি তো ইবরাহিম (আ)-এর জন্মদিবস পালন করতে পারতেন। তিনি কেন তা করেননি। অন্যদিকে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিবস, মৃত্যুদিবস পালন করতে পারতেন; কিন্তু তারা তা করলেন না কেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে কেন তার জন্মদিবস পালন করলেন না? আমাদের নেতা-নেত্রীরা তো নিজের জন্মদিবস পালন করেন। সাহাবায়ে কেরামগণ ইবরাহিম (আ) বা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম-মৃত্যুদিবস পালন করলেন না কেন? এটা এজন্য নয় যে এগুলো অবৈধ; বরং আজকে বড় স্কলারদের অনেকেই বলেছেন, যদি আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মদিন পালন করে ইসলামী শিক্ষা আলোচনা করি তাহলে তা বৈধ হবে। কিন্তু তারপরও প্রশ্ন থেকে যায়, তখন সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এসব কেন করলেন না। আমার মনে হয়, তারা আমাদের চেয়ে বাস্তববাদী ছিলেন। তারা মনে করতেন, জন্মদিবস তো একটাই, যেদিন জন্ম নিয়েছি, আর তো কোনো জন্মদিবস আসবে না। মৃত্যুদিবস একটাই, সেই মৃত্যুদিবস আর কখনো ফিরে আসে না এবং জীবনকে ভারী করার কোনো মানে হয় না। বাস্তবতার দাবি হচ্ছে কাজে ব্যস্ত থাকা এবং এসব পুরনো জিনিস নিয়ে ব্যস্ত না হওয়া।

এই যে সাহাবায়ে কেরামদের বাস্তবজীবন, বাস্তবতামুখী জীবন এটা কিন্তু তাদের একটা মহান সভ্যতা (great civilization) গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। তারা যে বিশ্ব জয় করেছিলেন তার কিন্তু একটা বড় কারণ ছিল তারা ছিলেন খুবই বাস্তববাদী মানুষ। আমাদেরকে এসব দিক খেয়াল রাখতে হবে।



www.pathagar.com

# একজন লেখক প্রকৃতপক্ষে বইয়েরই প্রোডাক্ট

কিছু দিন আগে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা লেখকদের নিয়ে একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে আমাকে কিছু বলতে হয়েছিল। সেখানে কথা বলার জন্য উক্ত সাপ্তাহিকের লেখক, সাংবাদিক বন্ধুদের উদ্দেশে আমি পয়েন্ট আকারে কিছু নোট করি। পয়েন্টগুলো থেকে বক্তৃতা দেয়ার পর সেখান থেকে কমবেশি সংক্ষিপ্ত আকারে লিখে রাখা হয়। তারই উল্লেখযোগ্য অংশ এখানে তুলে ধরা হলো। আমার বক্তৃতার মূল দিকগুলো ছিল প্রধানত সংবাদপত্র ও মিডিয়াকেন্দ্রিক এবং সেই সাথে সাংবাদিকদের প্রতিভার বিকাশ ও মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কিছু কথা।

এ কথা সত্য যে, আজকের দিনে প্রধান প্রধান এবং কম-বেশি বিশ্বব্যাপী সংবাদপত্র তথা মিডিয়া মূলত তাদের হাতে, যারা ইসলামপন্থি নয়। মিডিয়ার উপর এই একক আধিপত্য দীর্ঘদিন ধরেই চলে আসছে। পশ্চিমা কিছু দেশ ও গোষ্ঠীর দ্বারাই মূলত এটা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। আর এ মিডিয়ার দ্বারা তাদেরই উদ্দেশ্য পূরণ হচ্ছে। তারা এটাকে নিজেদের মতো করেই ব্যবহার করছে। সেই সাথে এসব মিডিয়া ইসলামবিরোধী কাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। মিডিয়ার এই একচেটিয়া আধিপত্য দুটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। এটা একই সঙ্গে ইসলামপন্থিদের দুর্বলতা ও ব্যর্থতা এবং পাশ্চাত্যের যোগ্যতার প্রমাণ। বিষয় দুটি হলো প্রযুক্তি (Technology) ও যোগ্যতা (Efficiency)। তারা আমাদের থেকে অনেক যোগ্য। আমরা এখনো নিজেদেরকে যোগ্য হিসেবে গড়ে তুলতে পারিনি। সেই সাথে পাশ্চাত্যে উচ্চ পর্যায়ের প্রযুক্তির ব্যবহারের তুলনায় আমরা প্রযুক্তিকেই সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারিনি। আমরা প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে অনেক পিছিয়ে আছি। আমাদের দেশেও মোটামুটি একই অবস্থা। অর্থাৎ যারা ইসলামপন্থি নয় এবং যারা ইসলামকে অপছন্দ করে তাদের দ্বারাই আজ মিডিয়া নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপীই তাদের আধিপত্য লক্ষ করার মতো।

কিন্তু আমাদের এ পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। অবশ্যই ইসলামকে সঠিকভাবে তুলে ধরতেও মিডিয়ার সাহায্য নিতে হবে। কিন্তু কে এই বিশ্বকে পরিবর্তন করতে পারে–এর উত্তরে বলা যায়, একজন যোগ্য লেখকই পৃথিবীকে পরিবর্তন করতে পারে। একজন লেখকের লেখা মানুষের মনে রেখাপাত করতে পারে; মানুষের মনে নাড়া দিতে পারে। যে লেখক যত যোগ্য তার প্রভাব সমাজে



www.pathagar.com

সেভাবেই পড়বে। একজন লেখক প্রকৃতপক্ষে বইয়েরই প্রোডাক্ট। মানুষের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি লাগবে। কিন্তু এর পেছনে রয়েছে 'চিন্তা'। এ চিন্তার বহিঃপ্রকাশ একজন লেখক তার লেখার মাধ্যমেই করে থাকে। কাজেই আমাদের অবশ্যই খুবই যোগ্য লেখক গড়ে তুলতে হবে। ভালো লেখা আলোড়ন তুলবেই। আমাদেরকে ভালো লেখার যোগ্যতা অর্জন করতেই হবে।

ভালো লেখক, যোগ্য লেখক তৈরি করতে গেলে বা হতে হলে আমাদের ভালো করে পড়াশোনা করতে হবে। লেখক-সাংবাদিকদের ইতিহাস ভালো জানতে হবে। ইতিহাস যাদের ভালো জানা থাকবে না তারা প্রচুর ভুল করবে। তাদের ভুলগুলো হবে নানা ধরনের। তাদেরকে অর্থনীতি জানতে হবে। তাদেরকে নিজেদের ধর্ম ভালো করে জানার পাশাপাশি অন্য সব ধর্ম সম্পর্কেও জানতে হবে। কেননা, আমরা যদি হিন্দু কিংবা খ্রিস্ট ধর্ম ও তাদের সম্পর্কে না জানি তাহলে আমরা কী করে তাদের কথা লিখব। তাদের সুবিধা-অসুবিধাগুলো জানব। আমরা কী করে সুবিচার করব অমুসলিমদের প্রতি, যদি আমি সংখ্যালঘুদের ধর্ম না জানি। তাদের সম্পর্কে ভালো না জানা থাকলে কোনো লেখক-সাংবাদিকের পক্ষে এটা সম্ভব নয়। তাই সঠিক ও সুন্দরভাবে অন্যকে কিছু জানাতে হলে তাদের সম্পর্কে সত্যিকার অর্থেই ভাবতে হবে। কুরআন তো সুবিচার করতে বলে। সেই সাথে ইসলাম সম্পর্কে ভালো করে জানতে হবে। ইসলামকে গভীরভাবে জানতে হবে।

তথ্য পরিবেশন সঠিক হতে হবে। বাড়িয়ে বা কমিয়ে বলা যাবে না। আমাদের কোনোভাবেই মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করা যাবে না। তথ্যকে মিথ্যা বা বিকৃত করে উপস্থাপন করা যাবে না। বস্তুনিষ্ঠভাবে সংবাদ পরিবেশন করতে হবে। 'তোমরা সত্যকে মিথ্যা দিয়ে আবৃত করো না'–কুরআনের এই বাণী স্মরণ রাখা সাংবাদিকদের জন্য জরুরি। কিন্তু আমরা এ মিথ্যা কাজই করছি তথ্যে, সংবাদপত্রে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় এ কাজই করা হয়ে থাকে।

অন্যের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে হবে। গান্ধী এক ভারত রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছেন। তিনি এ ছাড়া আর কী করতে পারতেন? কায়েদে আযম আলাদা রাষ্ট্র চেয়েছিলেন–এটা কি দোষের? এটা উভয়েরই পলিটিক্যাল রাইট। রবীন্দ্রনাথ তার নিজস্ব চিন্তা-চেতনার দ্বারাই অনুপ্রাণিত হবেন, এটাই তো স্বাভাবিক। অথচ আমরা তার দু-একটি বিষয় নিয়েই বিতর্কে লিপ্ত থাকি। তার বিরোধিতা করি। প্রকৃতপক্ষে একজন লেখককে অন্যের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে হয়। অন্যের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা ছাড়া বড় লেখক হওয়া যায় না। যেসব লেখা 'বেসড অন ফ্যাক্টস অ্যান্ড ফেয়ার' সেসব লেখাই টিকবে। যেসব লেখা সত্য, তথ্য ও যুক্তিনির্ভর সেসব লেখাই মানুষের কাছে গ্রহণীয় হবে।

একজন লেখককে লেখার সময় অবশ্যই আক্রমণাত্মক ভাষা পরিহার করতে হবে। আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে শত্রুকে জয় করা এবং এটাই আমাদের উদ্দেশ্য হতে হবে। কোনো জাতিকে আমরা হীন বলে উল্লেখ করবো



www.pathagar.com

না। তাদের প্রতি বিদ্বেষমূলক কথা বলবো না। আমাদের এন্টি সেমেটিজম পরিহার করতে হবে। পাশ্চাত্যে এটা খুবই খারাপভাবে দেখা হয়। ইসরাইল নীতির বিরোধিতা আমরা করব। বালফোর ডিক্লারেশন, ইসরাইলের চক্রান্তের বিরোধিতা করা যায়। তবে ঢালাওভাবে ইহুদিদের শত্রুতার মানসিকতা পরিহার করতে হবে। ভারতের ব্যাপারে আমাদেরকে সতর্ক হতে হবে। আমরা অযথা ভারতবিরোধী ভূমিকা নেব না। ভারতের অন্যায়কে অবশ্য বলতে হবে। ভারতের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের প্রয়োজন আছে।

আন্তর্জাতিক বিষয়গুলো সম্পর্কে একজন লেখকের খুব ভালো করে জানা থাকতে হবে। আন্তর্জাতিক বিষয়, ঘটনা প্রবাহ, রাজনৈতিক অবস্থা, বিভিন্ন সংস্থা, গ্রুপ, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্পর্ক, অর্থনৈতিক বিষয়াবলি প্রভৃতি সম্পর্কে জানা থাকতে হবে।

নারী সম্পর্কে সাবধান হতে হবে। আমরা হিউম্যান রাইটসের ক্ষেত্রে কেয়ারলেস। ইসলামের যে সৌন্দর্য, নবেল ভেল্যু (Noble Value), সংস্কৃতি, সৌকর্য তা আমরা শিখিনি। আমরা মানুষের মনে কষ্ট দিচ্ছি।

আমাদের অ্যাডভান্স ইসলামী সাহিত্য পড়তে হবে। এটা করতে পারলে আমরা অনেকভাবে উপকৃত হব। আমাদের মধ্যে যে গোঁড়ামি আছে তা কেটে যাবে। আমাদের গোঁড়ামি দূর করার ক্ষেত্রে এটা অত্যন্ত জরুরি। পুরনো মতের সাথে নতুন মতকেও জানতে হবে। একই সঙ্গে তুলনামূলক স্টাডি এবং অগ্রসর সাহিত্য পড়তে হবে। এতে আমাদের বিচার-বুদ্ধির ক্ষমতা সাউন্ড হতে বাধ্য। যেকোনো বিষয়ে এর ফলে আমরা অতি বাড়াবাড়ি পরিহার করতে সক্ষম হব। বাড়াবাড়ি বা গোঁড়ামি থেকে দূরে থাকতে পারব। আবার সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারেও তা সহায়ক হবে। বেশি বেশি পড়া থাকলে, জানা থাকলে লেখায় গভীরতা আসবে, সাবধানতা আসবে।

আমি আগেই প্রযুক্তির কথা উল্লেখ করেছি। বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির যুগে এসে আমরা প্রযুক্তি সম্পর্কে জানব না তা হতে পারে না। আমাদের প্রযুক্তির ব্যবহার জানতে হবে। একে উপযুক্ত করে ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। লেখক সাংবাদিকদের অবশ্যই কম্পিউটারে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। সার্বিকভাবে প্রযুক্তির লেবেল উচ্চ পর্যায়ের হতে হবে। যাদের ইফিসিয়েন্সি যত বেশি তারা তত বেশি যোগ্য।

একজন লেখককে মানসম্পন্ন লেখা লিখতে হলে যেসব দিক তুলে ধরা হলো মোটামুটি সেসব দিক বিবেচনা করতে হবে, জানতে হবে। একটি ভালো লেখা প্রভাব ফেলতে বাধ্য। কাজেই আমাদের সে যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। কাউকে ওভার ইস্টিমেট বা আন্ডার ইস্টিমেট করে, কাউকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আক্রমণ করে, হেয় করে লেখক হওয়া যায় না। এ জন্য লেখককে অবশ্যই সৎ ও কমিটেড হতে হবে।



www.pathagar.com

# উৎসব পালন ঃ বিভিন্ন দিক

আমি যতটুকু জানি ইসলাম উৎসব পালনের পক্ষে। ইসলাম উৎসবের বিরোধী নয়। মক্কায় আমরা ইসলামভিত্তিক কোনো উৎসবের শুরু হতে দেখিনি; কিন্তু মদিনা যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উৎসবের দিকে নজর দেন এবং দেখেন যে মদিনায় দুটি উৎসব পালিত হয় যেগুলো তিনি পছন্দ করেননি। কারণ ঐসব উৎসব এমন ছিল, যা তিনি ইসলামের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বা সঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে করেননি। এজন্য তিনি মদিনার মুসলিমদের ডেকে বললেন, আমি তোমাদের এই দুই উৎসবের পরিবর্তে এর চেয়ে ভালো দুটি উৎসব দিচ্ছি–একটি ঈদুল ফিতর এবং অন্যটি ঈদুল আযহা।

এ থেকে আমরা উৎসবের ব্যাপারে একটি নীতিমালা পাই। প্রথমত আমরা এই নীতিমালা পাই যে, ইসলাম উৎসবকে গ্রহণ করেছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে উৎসবের প্রবর্তন করেছেন তাকে তিনি 'ঈদ' বললেন। অথচ এর আগে উৎসবের ক্ষেত্রে 'ঈদ' শব্দ ছিল না। তার মানে আনন্দ উৎসবের একটা অংশ হবে–এটাকে তিনি নীতি হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। দ্বিতীয়ত লক্ষ্যণীয় যে, তিনি উৎসবকে নিষিদ্ধ করেননি। উৎসবকে নিষিদ্ধ না করে তিনি যেটা করলেন, বদলে দিলেন–অর্থাৎ যা ছিল তার থেকে ভালো কিছু করলেন। এটাকে আমরা একটা নীতি হিসেবে পাচ্ছি। তিনি উৎসবের সংখ্যা কমিয়ে দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেননি।

এখন ইসলামের উৎসবের দিকে তাকালে এর প্রকৃতি কী রকম তা দেখতে পাব। ইসলামের উৎসবের প্রকৃতি হিসেবে আমরা দেখতে পাই যে, এই উৎসব আল্লাহর নামে শুরু হয়। প্রথমেই নামাজের ব্যবস্থা। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা উভয় উৎসবই নামাজের মাধ্যমে শুরু হয়। এরপর ঈদের অন্যান্য উৎসব ও আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে কুরবানি থাকে, নতুন পোশাক-আশাকের ব্যবস্থা থাকে; খেলাধুলা, বেড়ানোও থাকতে পারে। আমরা এটুকু জানি যে, এসব ব্যবস্থা মদিনাতে সে সময় ছিল। নতুন কাপড় বানাতে উৎসাহ দেয়া, একে-অপরের বাড়ি যাওয়া, খাওয়া-দাওয়া করা–এসব ব্যবস্থা ছিল। দুঃখীদের জন্যও ব্যবস্থা ছিল। এ জন্যই ঈদুল ফিতরের সময় ফিতরার ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে কেউ বাদ না যায়। এর মানে হলো, ইসলামের লক্ষ্য হচ্ছে



www.pathagar.com

উৎসবে অন্যদেরকে শরিক করে নেয়া। সে সময়ের অবস্থায় তারা তাদের মতো করে শরিক করতেন। আজকের পরিস্থিতিতে আমাদের যেভাবে সম্ভব সেভাবে শরিক করতে হবে।

এরপর উৎসবকে অন্য আরেকটি মূলনীতির আলোকে দেখব। এই নীতি হচ্ছে 'উরফ' বা স্থানীয় রীতি-রেওয়াজ, যেটাকে ইসলাম গুরুত্ব দিয়েছে। ইসলামী আইনের অন্যতম ভিত্তি হচ্ছে উরফ। যেসব বিষয়ের উপর ইসলামী আইন দাঁড়িয়ে আছে–একদিকে কুরআন-সুন্নাহ, ইজমা-কিয়াস ও ইজতিহাদ আছে– এর বাইরে যেসব নীতিমালা আছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে 'উরফ'। অর্থাৎ স্থানীয় সামাজিক প্রথা (custom) কী বলে। তার মানে আইন প্রণয়নের অন্যতম একটি ভিত্তি হচ্ছে 'উরফ'। অর্থাৎ, ইসলাম উরফকে মর্যাদা দেয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা, মদিনা বা আরব দেশে যে উরফ ছিল তার বেশির ভাগই বহাল রেখেছেন। কিছু কিছু উরফ যেগুলোকে তিনি ইসলামী নীতিমালার বিরুদ্ধে পেয়েছেন সেগুলো বাদ দিয়ে বাকি সব তিনি রেখে দিয়েছেন। এ থেকে বোঝা যায়, যে দেশেই ইসলাম থাকুক না কেন, স্থানীয় যে উরফ বা রীতি-রেওয়াজ আছে তা বহাল রাখা যায় যদি তাতে এমন কিছু না থাকে যা ইসলামের দৃষ্টিতে একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন–শিরকের কোনো উপাদান, প্রকৃতির পূজা ও অশ্লীলতা প্রভৃতি যেন না থাকে। অথবা অন্য কোনো ক্ষতিকর উপাদান যেন না থাকে, কেননা ইসলামের মূলনীতি হচ্ছে কোনো ক্ষতিকে মেনে নেয়া যাবে না, অন্যেরও ক্ষতি করা যাবে না, নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া যাবে না। এ নীতিমালার আলোকে উৎসবে কোনো ক্ষতিকর আচার-অনুষ্ঠানকে গ্রহণ করা ঠিক হবে না। প্রকৃতিকে পূজা করা, যার মাধ্যমে তার একটা বিশেষ শক্তি আছে বলে প্রকাশ পায়, তা করা যাবে না। সে ধরনের কাজ করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। যেমন–বটবৃক্ষকে যদি আমরা বেশি সম্মান করি তাহলে মনে হবে, বটবৃক্ষের একটা বিশেষ ক্ষমতা আছে। এ রকম কিছু আগুনকেও করা যাবে না। প্রদীপকে মঙ্গলের চিহ্ন মনে করা যে এর মাধ্যমে মঙ্গল আসে তাও ঠিক নয়। এগুলো ইসলাম স্বীকার করে না।

যদি এমন দেখা যায় যে, কোনো উৎসবে অনেক বৈধ জিনিস আছে কিন্তু কিছু কিছু অবৈধ জিনিস ও অশ্লীলতা আছে, তা হলে এ ব্যাপারে ইসলামের দাবি কী? এ ব্যাপারে ইসলামের বা সুস্থ চিন্তার দাবি হলো এই–যেখানে অবৈধ-বৈধ মিশে যাবে সে উৎসবে যোগদান না করাই সঙ্গত। আর যারা পারবেন তারা সংশোধন করার চেষ্টা করবেন। যদি সংশোধন করতে না পারেন তাহলে আমি অন্তত মনে করি তাতে না যাওয়া ভালো। যদি সংশোধন হয় তাহলে তা জাতীয় উৎসব হবে। সবাই শরিক হতে পারবে। যেখানে বৈধ-অবৈধ মিলে যাচ্ছে সেখানে আমি অবৈধ উপাদান বাদ দিতে বলব। তাহলে গোটা জাতি নির্দ্বিধায় তাতে শরিক হতে পারবে।



www.pathagar.com

আমাদের দেশে কোনো কোনো উৎসবে আজকাল অশ্লীলতার প্রকাশ হচ্ছে বলে আমি মনে করি। এমন অনেক অদ্ভুত কাজ করা হচ্ছে, যা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয় না। যেমন–আমাদের ঐতিহাসিক কালচারের বিপরীতে মুসলিম ছেলেরা এখন ধূতি পরে, ছেলে-মেয়ে রাস্তায় হাত ধরাধরি করে চলে কিংবা রাস্তায় কোনো উৎসবে নাচে। এগুলো তো গ্রহণ করা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব হবে না। এগুলোতে একটা অংশ যোগদান করলেও জাতির অধিকাংশই অবশ্যই এর থেকে দূরে থাকবে। এগুলো বিবেচনা করে আমার মত হচ্ছে, যা কিছু সমাজ, জাতি গ্রহণীয় মনে করে না তা যেন এর উপর চাপিয়ে দেয়া না হয়।



www.pathagar.com

# মাদরাসা শিক্ষার সংস্কার প্রসঙ্গে

মাদরাসার দাখিল ও আলিম শ্রেণিতে বিজ্ঞান ও মানবিক শাখা চালু থাকা সত্ত্বেও সেখানে ব্যবসায় শিক্ষা শাখা নেই। বিষয়টি আমার জানাই ছিল না। এটা নেই, কেন নেই বা এটা করার দরকার–এ সম্পর্কে আমি গত ১৫-২০ বছরে কোনো লেখা দেখিনি। বিষয়টি আমার নজরে আসেনি। কিন্তু যখন বিষয়টি জানতে পারলাম তখন আমি বলবো, এটা না থাকার কোনো যুক্তি পাচ্ছি না। যখন বিজ্ঞান ও মানবিক শাখা করা হলো তখনই ব্যবসায় শিক্ষা শাখা চালু করতে পারলে ভালো হতো। কেন তারা করেনি বা কেন তারা বিজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত করবে, ব্যবসায় শিক্ষা করবে না তার কোনো কারণ আমার মাথায় আসছে না। হয়তো কোনো কারণ ছিল, যে জন্য তারা এটা করতে চায়নি। কিংবা তারা ভেবেছে মাদরাসা শিক্ষায় এত ভাগ ইসলামের অংশ থাকতে হবে। বাকিটা আমরা আস্তে আস্তে চেষ্টা করবো। হয়তো ভেবেছে বিজ্ঞান নিলে এর বিরাট ক্ষেত্র, তাই টেকনিক্যাল সাইডে তারা অনেক দূর যেতে পারবে। তখনো হয়তো ব্যাংকিং ও ইন্স্যুরেন্স এতটা প্রসার লাভ করেনি, যেটা গত বিশ বছরে করেছে। বর্তমান সময়ের আলোকে হয়তো তাদের সে রকম খেয়াল হয়নি। আবার হতে পারে, মাদরাসা ছাত্রদের মেরিট গ্রাউন্ডের বিবেচনায় আর্টসকে দেয়া যুক্তিসঙ্গত মনে করেছে। বিজ্ঞান যেহেতু বিশ্বে একটা বিরাট ক্ষেত্র সেজন্য তা রাখা হয়েছে। এগুলো সবই আমি তাদের পক্ষ নিয়ে ধারণা করে বলছি। কিন্তু আমি যেহেতু তাদের পেপার পড়িনি কাজেই বলতে পারবো না যে কী ব্যাকগ্রাউন্ডে এটা করা হয়নি। আমি মনে করি, করাই সঙ্গত ছিল; করলে ভালো হতো।

এর দায়-দায়িত্ব কাদের? দায় দুই রকমের হয়। একটা হচ্ছে নির্দিষ্ট করে দায়ী করা, আরেকটা হচ্ছে সাধারণভাবে দায়ী করা। সাধারণভাবে বললে বলবো, জাতির ব্যর্থতা। গোটা জাতিরই ব্যর্থতা এজন্য যে, জাতির পক্ষ থেকে কোনো অংশই এ ব্যাপারে সঠিকভাবে পদক্ষেপ নেয়নি। আবার এখন সঠিক মনে হচ্ছে, তখন হয়তো তাদের মাথায়ই আসেনি। যেমন আমিও তো এ বিষয়ে লিখিনি– তাহলে আমিও দায়ী। আমাকে যিনি এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন তিনিও তো এটা লেখেননি, তাহলে তিনিও দায়ী। গোটা জাতিই একত্রে দায়ী। তবে বেশি দায়ী হচ্ছেন মাদরাসার শিক্ষকবৃন্দ। তাদেরই তো ছাত্রদের সমস্যাগুলো সবচেয়ে বেশি বোঝার কথা। তাদের ভবিষ্যৎ কী হবে, তা বোঝা উচিত ছিল।



www.pathagar.com

তাদের এ ব্যাপারে বক্তব্য রাখা উচিত ছিল, চেষ্টা করা উচিত ছিল, আন্দোলন করা উচিত ছিল। আন্দোলন বলতে আমি সহিংস আন্দোলন বোঝাচ্ছি না। ছাত্রদেরও এর জন্য আন্দোলন করা দরকার ছিল। তাদের তো কত দাবি-দাওয়া থাকে। তারা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, আরবি বিশ্ববিদ্যালয় চায়; কিন্তু এ দাবিতে আন্দোলন করেছে বলে আমার জানা নেই। তবে সর্বোপরি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে গত ৩০ বছরে যারা দায়িত্বে ছিলেন তাদের সবারই কম-বেশি ভুল হয়েছে বলে আমি মনে করি। নির্দিষ্ট করে এক্ষেত্রে এর চেয়ে বেশি আর বলতে চাচ্ছি না।

ব্যবসায় শিক্ষা শাখা দ্রুত চালু করা দরকার–এ সম্পর্কে আমি একমত। যেহেতু অনেক দিন এটা হয়নি, প্রকৃতপক্ষে তারা যদি এটা করতে চান তাহলে দাখিল লেভেলেই কমার্স রাখা দরকার। তা না হলে উপরের ক্লাসে পড়তে পারবে না। শুধু তাই নয়, যদি ব্যবসায় শিক্ষা শাখা পূর্ণাঙ্গ রূপ চাই তাহলে কামিল লেভেলেও এটা খুলতে হবে। কামিল লেভেলে কামিল হাদিস, কামিল ফিকাহ, কামিল তাফসির এগুলোর সঙ্গে কামিল অর্থনীতি, কামিল বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, সেই সঙ্গে কামিল পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মোট তিনটি বিভাগ অন্তত খুলতে বলবো।

আর তা যদি করতে হয় তাহলে ফাজিলেও সেভাবে শিক্ষাক্রম সাজাতে হবে। আলিম ও দাখিলে তো অবশ্যই করতে হবে। ভবিষ্যতে মাদরাসার সামগ্রিক সংস্কারের অংশ হিসেবে এটা করতে হবে। ছাত্ররা যদি ইউনিভার্সিটিগুলোতে না যায় তাহলেও যেন তারা যথাযোগ্যভাবে অর্থনীতি, পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ও বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন শিখতে পারে। কিন্তু সেটা তো মাদরাসার সামগ্রিক সংস্কারের ব্যাপার। এ প্রশ্নও একদিন উঠবে যে, কেন আগে এ চিন্তা করা হয়নি। ২০ বছর পর কেউ প্রশ্ন করবেন, এর জন্য কারা দায়ী, কেন এ রকম চিন্তা করা হলো না।

মাদরাসা শিক্ষা সংস্কারের ব্যাপারে আমি আলাদা করে লিখেছি। আমি কওমি মাদরাসাকে তাদের একটি দাওরা হাদিসের পাশাপাশি আরো কয়েকটি খুলতে বলেছি। নিচের দিকে ঠিক রেখে উপর দিকে দাওরায়ে পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, দাওরায়ে বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন খোলা যেতে পারে। তা হলে মাদরাসার ছেলেরা প্রায়ই সমপর্যায়ের হয়ে যাবে। তা ইসলামের জন্য কল্যাণকর হবে। দেশের জন্য কল্যাণকর হবে। নৈতিকতার জন্য ভালো হবে। কিন্তু এ মুহূর্তে আমরা বলছি, আলিম ও দাখিলে এটা করা হোক এজন্য যে, ছাত্ররা চাইলে যাতে সাধারণ কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ব্যবসায় শিক্ষা ও ব্যবসায় প্রশাসনের সাবজেক্ট নিতে পারে, বিবিএতে ভর্তি হতে পারে। আর আমি তো তাদেরকে বলেছিও, কামিলে গিয়ে এসব বিষয়ে ডিগ্রি দিতে হবে। তাতে ইসলামের সবই থাকবে। কামিলে গিয়ে শুধু সেসব বিষয় যেমন অর্থনীতি, বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মতো



www.pathagar.com

বিষয়গুলো বেশি থাকবে। এ পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য। যদি দেশে একটি ইসলামী সরকার থাকে বা ইসলামে কমিটেড ধরনের সরকার থাকে তাহলে এটা খুবই সম্ভব। এতে দুটো শিক্ষাধারা এক হলো না কিন্তু কাছাকাছি চলে এল, যেন রেললাইনের সমান্তরাল দুটি লাইন। কাজেই এ প্রশ্নের মূল উত্তরে আমি বলবো, আর বিলম্ব না করে এ কাজ করা উচিত। তবে প্ল্যানিং ভালো করে করা উচিত। অপরিকল্পিতভাবে করলে ক্ষতি হবে। ততটুকু সময় নিতে হবে, যতটুকু প্ল্যানটা ভালো করে করতে লাগে; যাতে এর জন্য উন্নত কারিকুলাম করা যায়; কারিকুলাম যেন দায়সারা গোছের না করা হয়; কাউকে কোনো রকমে খুশি করার জন্য যেন না করা হয়; সর্বোপরি তা যেন সমান যোগ্যতাসম্পন্ন লোক তৈরি করতে সাহায্য করে।

দু'পক্ষের কোনো পক্ষেই আমি নই। আমি কামিলের মান দেয়ার পক্ষে। সরকার যেটা সুবিধাজনক মনে করে, সেটা করা উচিত এবং আলেম সাহেবদেরও বুঝতে হবে, পদ্ধতিগত ঝগড়ায় গিয়ে তাদের লাভটা কী? প্রশ্ন হচ্ছে মান দেয়ার। এসব যুক্তি খুব দুর্বল যে, 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি যদি একজন হিন্দু হন'? যদি ভিসি হিন্দু ভদ্রলোকও হন তাহলে তাতে সমস্যা কোথায়? কারিকুলাম তো আর তিনি তৈরি করেন না।

আলেমরা এখনো স্বাতন্ত্র্য বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা করেন, যা হওয়া উচিত নয়। তারা যেটা দাবি করতে পারেন সেটা হলো, কী ধরনের সিলেবাস হওয়া উচিত। এটা কতগুলো শব্দের ঝগড়ামাত্র যে, আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে হবে, না জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে হবে। অদ্ভুত ঝগড়া! বাংলাদেশে তো অদ্ভুত ঝগড়াই হয়। এগুলো আসলে সম্পূর্ণটাই অর্থহীন ঝগড়া। আসল কথা হচ্ছে কামিলের মান। মান চাই। হতে পারে কোর্সের উন্নয়ন দরকার। তা যদি হয় তাহলে আলেম সাহেবরা কেন একমত হয়ে বলে দেন না যে, এই কোর্স হওয়া দরকার। এটা যদি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনেও যায় তাহলেও তো কোর্স নির্ধারণ এক ব্যক্তি করবেন না বা এক ব্যক্তির ব্যাপার নয়। এই কোর্স সরকারও করে দিতে পারে। আর যেকোনো কোর্সের অনুমোদনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)-তে যেতে হবে। তেমনি একটা সেকুলার সরকারের অধীনে কি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চলতে পারে না? এগুলো আসলে শব্দের ঝগড়া ছাড়া অন্য কিছু নয়। এগুলো কূটতর্ক, এগুলো ভালো নয়। তাদের নজর দেয়া উচিত ছিল যেভাবেই করেন, করুন। আগে মান দিয়ে দিন, যার অধীনেই দিন না কেন। আমি হলে তা-ই করতাম।

আমরা জানি, ব্রিটিশ আমলে আলিয়া মাদরাসার প্রিন্সিপ্যালের প্রথম কয়েকজনই ছিলেন ইংরেজ। তাদের হাতেই মাদরাসা শিক্ষাধারা গড়ে উঠেছে; যদিও কোর্স তৈরি করেছেন মুসলমানরা। ওয়ারেন হেস্টিংসের ডায়েরিতে আছে, কলকাতার মুসলিম নেতারা তাকে অনুরোধ করলেন যে ১৭৫৭ সাল থেকে



www.pathagar.com

আপনারা ক্ষমতায় আছেন। আমাদের অবস্থা তো কাহিল। আমরা একটা মাদরাসা নতুন করে করতে চাই, আপনি মাওলানা মজদুদ্দীন সাহেবকে বলুন। তখন ওয়ারেন হেস্টিংস মাওলানা মজদুদ্দীনকে ডেকে কোর্স তৈরি করে দেয়ার জন্য অনুরোধ করলে মাওলানা সাহেব দরসে নেজামির আলোকে কোর্স তৈরি করে দিয়েছেন। এটাই হলো ইতিহাস। কাজেই রাজনীতিতে আলেমরা আসুন, তা আমি চাই। কিন্তু রাজনীতি মানে দলাদলি নয়। রাজনীতিতে এসে দেশের শাসনে অংশ নিতে চাইলে নেবেন; কিন্তু যে রকম দলাদলি ও শব্দের ঝগড়া তাতে তো আমরা অন্যদের মতোই হয়ে গেলাম। অন্যরা সংলাপ নিয়ে ঝগড়া করে, আমরা শব্দ নিয়ে ঝগড়া করছি।

আমার দাবি, আমি মান চাই এবং দ্রুত চাই, আপনি যার মাধ্যমেই দেন না কেন। তাতে যদি অসুবিধা হয় আমি আবার আন্দোলন করতে হলে করবো। তখন বলবো, অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দিন। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে নাম ইচ্ছা দিতে পারেন। নামে কী আর অসুবিধা?



www.pathagar.com

# যে সংঘাতের সীমান্ত নেই

আমরা দেখতে পাচ্ছি বিশ্বব্যাপী একটি সংঘাত চলছে। এ সংঘাত পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে ইসলামী সভ্যতার। এ সংঘাত সম্পর্কে আমরা ঠিক সচেতন ছিলাম না। এ কথা ঠিক যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং ইসলামী সভ্যতার মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল। নানা পর্যায়ে, বিশ্বাসে, জীবনব্যবস্থায় দ্বন্দ্ব বা পার্থক্য ছিল এবং নানা ধরনের সংঘাতও হয়েছে। মুসলিম শাসকগণ অনেক খ্রিস্টান দেশ দখল করেছেন। ইতিহাসে দেখা যায় তারা ইরাক, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, মিসর দখল করেছিলেন। এসব দেশে খ্রিস্টান ও ইহুদি জনগোষ্ঠী ছিল। পরবর্তীতে তুর্কি খিলাফত পূর্ব ইউরোপের অনেক অংশ দখল করেছেন।

এদিকে ক্রুসেডের সময় আমরা দেখেছি, তারা মিসরের একটি অংশ, ফিলিস্তিনের একটি অংশ এবং সিরিয়া দখল করেছেন। পরবর্তীতে ইউরোপীয় বা খ্রিস্টান শাসকগণ গোটা বিশ্বকে দখল করেছেন। তারা গোটা এশিয়া ও আফ্রিকা দখল করে নিয়েছেন, যার অধিকাংশই মুসলিম দেশ ছিল। সুতরাং একটা পার্থক্য, দ্বন্দ্ব ও সংঘাত সব সময়েই ছিল। কিন্তু দীর্ঘদিন পর্যন্ত কোনো তত্ত্ব খাড়া করানো হয়নি যে দুটোর মধ্যে একটি সংঘাত আছে। হতে পারে তা অস্পষ্ট ছিল বা স্পষ্টকরণ করা হয়নি। তবে পরিস্থিতি সবসময় যে সংঘাতের ছিল তা নয়, অনেক সময় এটা ছিল পারস্পরিক প্রতিযোগিতার। পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্কও ছিল বিভিন্ন সময়ে। কিন্তু এটাকে একটি সার্বিক ও সংঘাতের রূপ হিসেবে হান্টিংটনই উপস্থাপন করেন তার 'ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশন 'বইয়ের তত্ত্বে। হান্টিংটনের এ তত্ত্ব মানুষকে নতুনভাবে দ্বন্দ্বের মধ্যে নিয়ে গেছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ইসলামী সভ্যতা কোনোটাই তো এক রূপ নয়। পাশ্চাত্য সভ্যতারও ভ্যারিয়েশন আছে; তবে গুণগতভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সার্বিক একটা সাযুজ্য আছে। সেটা অনেকটা বস্তুবাদ ও সেকুলারিজম। এতে সামাজিক জীবন স্রষ্টার নির্দেশনার অধীন হবে না; রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রভৃতি ধর্মীয় নীতির অধীন হবে না। এ ধরনের সেকুলারিজম ও আধুনিক সভ্যতা দুনিয়ার বুকে একটি বস্তুবাদের রূপ ধারণ করেছে। বেশি উপার্জন, বেশি ভোগ, বেশি এনজয়মেন্ট এ সভ্যতার পেছনে কাজ করছে। এ কথা আলাদা যে তারা ভালোও অনেক কিছু



www.pathagar.com

করে থাকে। তা সত্ত্বেও বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার পেছনে সার্বিকভাবে একটা ঐক্য আছে। অন্যদিকে ইসলামী সভ্যতার মধ্যেও কিছু পার্থক্য আছে। তা সত্ত্বেও সার্বিকভাবে এর মধ্যে একটা ঐক্য রয়েছে—তা ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, মরক্কো বা তুরস্ক যাই হোক না কেন; তাদের বিশ্বাস মূলত একই রকমের; তাদের কালচারে বিরাট সামঞ্জস্য রয়েছে; তাদের প্রীতিবোধ এক ধরনের; তারা কুরআন-সুন্নাহকে অনুসরণ করে।

এখন আমি সংঘাতের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করছি। এ সংঘাত এমন যে যার কোনো সীমান্ত খুঁজে পাই না। কারণ হচ্ছে এ দুই সভ্যতার সংঘাত এখন চলছে প্রতিটি গ্রামে, পাড়ায়, মহল্লায়, শহরে। এমনিভাবে প্রতিটি অফিসে ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। সেখানে একদিকে রয়েছে পাশ্চাত্য কালচারের নানাবিধ চর্চা, যার মাধ্যমে আমরা পাশ্চাত্যের কালচারকে গ্রহণ করি এবং এর ফলে আমাদের বিনোদনও তাদের মতো হয়ে যায়; আমাদের সিনেমা তাদের মতো হয়ে যায়; আমাদের মিডিয়া তাদের মতো হয়ে যায়; আমাদের নাটক ও সাহিত্য যৌনতাভিত্তিক হয়ে যায়। এ কালচারের সংঘাত আজ টেলিভিশনের মাধ্যমে ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে। তারা এটাকে ঢোকাতে চেষ্টা করছে আর আমরা এটাকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছি। শুধু প্রতিরোধই করছি না, যেসব মুসলিম এখন ইউরোপ-আমেরিকায় গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন, তারা আবার পাশ্চাত্য কালচারের ভেতরেই সেখানেও ইসলামী কালচারে সুপিরিয়র। আমাদের পরিবার শক্তিশালী। আমরা পিতা-মাতাকে সম্মান দিই এবং বাচ্চাদের প্রতি বেশি বেশি খেয়াল করি। আমাদের মধ্যে অবৈধ যৌনতা অপছন্দনীয় এবং নিষিদ্ধ। আমরা পরিবার ব্যবস্থা রক্ষা করি। পাশ্চাত্যও নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

সুতরাং পাশ্চাত্য সভ্যতা কিছুটা চাপের মধ্যে পড়ছে। তারা এসব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছেন। শুধু আমরাই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন তা নয়, তারাও এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছেন। এটা সত্য যে, পাশ্চাত্যের অনেকেই ইসলামের প্রতি সহানুভূতিশীল। অনেকে ইসলামও গ্রহণ করছেন। এটাকেও একটা চ্যালেঞ্জ বলে তারা মনে করেন। তাই তারা রাজনৈতিকভাবে মুসলিম বিশ্ব ও তৃতীয় বিশ্বকে ডমিনেট করার চেষ্টা করছেন। বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বকে তারা বেশি ডমিনেট করার চেষ্টা করছেন। তারা নানাভাবে তাদের পক্ষের লোক সৃষ্টির চেষ্টা করছেন। ইন্টেলেকচুয়ালদেরকে তাদের পক্ষে নেয়ার জন্য তারা নানাভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও তারা চেষ্টা করছেন তাদের প্রাধান্য ধরে রাখতে। বিশেষ করে এশিয়া ও আফ্রিকার সম্পদ লুট করে তারা তাদের অর্থনীতিকে গড়ে তুলেছেন। গত দু শ' বছরে তারা এসব অপহরণ করেছেন। এখন তারা ঐ প্রাধান্য বজায় রাখতে চান। এর মাধ্যমে তারা বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বকে গ্লোবালাইজেশনের নামে একটা অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন করছেন।


www.pathagar.com

শিক্ষার ক্ষেত্রেও সংঘাত আছে। তারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে গড়া সামাজিক বিজ্ঞানের মাধ্যমে আমাদেরকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন। তারা বলছেন, ক্যাপিটালিজম শ্রেষ্ঠ। এর মন্দ দিকগুলো সম্পর্কে মোটেই তারা বলছেন না। ক্যাপিটালিজমের থিওরির মধ্যে যে গরিবের সমস্যার কোনো উল্লেখ নেই এবং এর যে কোনো সমাধান নেই, এসব তারা বলছেন না। তারা ক্যাপিটালিজমকে সুপিরিয়র করার চেষ্টা করছেন, কিন্তু আসলে এটা তো সুপিরিয়র নয়। এর মধ্যে অনেক সমস্যা রয়েছে; বাজারব্যবস্থার ক্ষেত্রে অনেক ব্যর্থতা রয়েছে। যেমন–

দুঃখি লোকের কোনো কথাই ক্যাপিটালিজমে নেই। এটি একটি অমানবিক সুবিচার অস্বীকারকারী ব্যবস্থা। সমাজবিজ্ঞানে যা পড়ানো হচ্ছে তাতে স্রষ্টার কোনো স্থানই নেই। এতে ধরেই নেয়া হচ্ছে ধর্ম মানুষের সৃষ্টি। অথচ দেখানো যেতে পারতো যে, স্রষ্টা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমরা এই সমাজ তৈরি করেছি। স্রষ্টা নিজেই তো মানুষের স্বভাবের মধ্যে সমাজবদ্ধতা রেখেছেন। কাউকে তিনি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র হিসেবে সৃষ্টি করেননি। সবাইকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে আমরা সমাজবদ্ধভাবে বাস করতে বাধ্য; পরিবার গঠন করতে বাধ্য; আমরা একে অপরের উপর নির্ভরশীল। পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় তা না করে এটাকে একটি মানবসৃষ্ট বিষয় হিসেবেই দেখানো হচ্ছে। এ সংঘাত মূলত মুসলিম সভ্যতা, ইসলামী সভ্যতার সাথে বিশেষ করে সংস্কৃতি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে, মূল্যবোধের ক্ষেত্রে। এটিকে যদি আমাদের প্রতিরোধ করতে হয়, উল্টিয়ে দিতে হয়, এ সংগ্রামে যদি আমাদেরকে জিততে হয় তাহলে এর জন্য আমাদের অসংখ্য যোগ্য লোক লাগবে। এ সংঘাত মোকাবেলার জন্য নেতা লাগবে, কর্মী লাগবে। কিন্তু কোথায় লাগবে? এর উত্তর হলো, সব জায়গায় লাগবে, কেননা এ সংঘাতের কোনো নির্দিষ্ট সীমান্ত নেই। প্রত্যেক পাড়ায় লাগবে, কেননা প্রত্যেক পাড়ায় তাদের সাপোর্টার তৈরী হয়ে আছে। সুতরাং যারা প্রকৃতপক্ষে ইসলামী সভ্যতা ও কালচারের জন্য কাজ করতে চান, যারা পাশ্চাত্য সভ্যতার সব কিছুকে অবাধে মানতে চাননা বা যারা মুসলিম সভ্যতার প্রাণকে রক্ষা করতে চান, তৌহিদকে রক্ষা করতে চান (অর্থাৎ সব কিছুর ভিত্তি হতে হবে স্রষ্টার স্বীকৃতি, স্রষ্টা আছেন এটাকে বাদ দেয়া বা এড়িয়ে যাওয়া যাবে না) তাহলে এজন্য আমাদের অবশ্যই যোগ্য নেতা লাগবে, কর্মীও লাগবে। প্রত্যেক গ্রামে, পাড়ায়, প্রাইমারি স্কুলে, কলেজে, মহল্লায়, সংবাদপত্রে, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার জগতে অসংখ্য এবং যোগ্য নেতা লাগবে যারা এ সংঘাতকে মোকাবেলা করতে সক্ষম। এর মানে, ইসলামী সংগঠনের সকল কর্মীকে স্ব স্ব স্থানে কর্মী ও নেতা হতে হবে। যেমন বাংলাদেশের আটষট্টি হাজার গ্রামে অন্তত আটষট্টি হাজার নেতা লাগবে। শহরে যদি বিশ-ত্রিশ হাজার পাড়া থাকে তাহলে শহরের জন্য বিশ-ত্রিশ হাজার নেতা লাগবে। এটা সহজ বিষয় নয়। লেখালেখির ক্ষেত্রেও লাগবে। সুতরাং এর জন্য অসংখ্য কর্মী ও অসংখ্য নেতা দরকার। বিষয়টি আমাদেরকে বুঝতে হবে। আমরা যারা ইসলামের জন্য কাজ



www.pathagar.com

করি, ইসলামী সভ্যতার জন্য কাজ করি তাদেরকে ভাবতে হবে যে আমরা আমাদের সময়ের কতটুকু এই কাজে ব্যয় করছি। আমরা যদি বিভিন্ন পেশাজীবীর দিকে তাকাই তাহলে দেখবো, তারা দিনের ১২/১৪ ঘণ্টা রোজগারের পেছনে দৌড়াচ্ছেন, এরপর আর তাদের সময় থাকে না। তারা তাদের প্রয়োজনকে বাড়িয়ে নিয়েছেন। গোপন বস্তুবাদ অনেককে গ্রাস করেছে। এর পরিবর্তন চাইলে তিনি পড়াশোনায় সময় দিতে পারতেন; নিজের যোগ্যতাকে বাড়াতে পারতেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা করা হচ্ছে না। যদি ব্যবসায়ীদের দিকে দেখি, তারা শুধু আট ঘণ্টাই নয় বেশির ভাগ সময়ই ব্যবসায়ের পেছনে দিচ্ছেন। তার তো আর সময় নেই। তাহলে আল্লাহ্ তাআলা তাকে যে মূল জিনিস দিয়েছেন তার জীবন (জীবন মানে সময়) এ জীবনের সবটাই তো তিনি তার ব্যবসায়ের পেছনে দিয়ে দিলেন। আর সেখানে তিনি যে সম্পদ অর্জন করেছেন তার সামান্যই হয়তো আল্লাহর পথে ব্যয় করছেন। কিন্তু তিনি তো তার সময় নামক যে জীবন সেখান থেকে কিছুই বা তেমন কিছুই দিচ্ছেন না। আইডিয়াল হবে যদি আমি আট ঘণ্টা ব্যবসায় পেশায় ব্যয় করি এবং ন্যূনতম পাঁচ-ছয় ঘণ্টা বিনিময় ছাড়া মানবসেবায়, জাতির সেবায়, সমাজ সেবায়, দুঃখির সেবায়, ইসলামের সেবায় নিয়োগ করতে পারি।

এই যে অবস্থা, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ইসলামী সভ্যতার মধ্যে যে সংঘাত এর কোনো সীমান্ত নেই। কোনো এক জায়গায় লোক পাঠিয়ে দিলাম তাতে হবে না। কোনো বর্ডার এখানে দেখা যায় না। এটি একটি বর্ডারলেস যুদ্ধ বা সংঘাত। এখানে আমাদের অসংখ্য কর্মী লাগবে। কাজ করা লাগবে। কাজের জন্য এটি একটি ভালো নির্দেশক যে কতটা সময় আমি ব্যয় করছি পয়সার বিনিময়ে এবং কতটুকু কোনো কিছুর বিনিময় ছাড়া মানবতার জন্য ব্যয় করছি; সমাজ, জাতি, ইসলামের জন্য ব্যয় করছি; দুঃখি ও অসহায়দের পেছনে ব্যয় করছি। এ বিষয়গুলো ইসলাম ও ইসলামী সংগঠনের নেতা, কর্মী, আলেম, ছাত্রকর্মী সবাইকে অনুসরণ করতে হবে বলে আমি মনে করি।



www.pathagar.com

# শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির অগ্রগতি

শিল্প ও সাহিত্য সম্পর্কে বর্তমান সময়ে আমার যেটুকু পড়াশোনা করার দরকার অন্যান্য নানা ব্যস্ততার কারণে আমি এ মুহূর্তে সে রকম পড়াশোনা করতে পারছি না। বিভিন্ন জাতীয় ইস্যুতে আমি জড়িত আছি। আন্তর্জাতিক ইস্যুগুলোর প্রতি নজর রাখতে হয়। ইন্টারনেটে অনেক কাজ করতে হয়। এসব কারণেই শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে যতটুকু পড়া দরকার তা হচ্ছে না। তবে মোটামুটিভাবে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকের সাহিত্য পাতাগুলো আমার দেখা হয়। সাহিত্য পত্রিকার মধ্যে হাতের কাছে যেগুলো পাই সেগুলো দেখার চেষ্টা করি।

এসব দেখে আমার ধারণা হলো যে, বর্তমান সাহিত্যে কোনো বড় ধরনের গুণগত পরিবর্তন হয়নি। একই মানে চলছে। সাহিত্য ও সংস্কৃতি মিলে শুধু এতটুকু লক্ষ্য করছি যে, এসব ক্ষেত্রে আগে যে একতরফা একটা ব্যাপার ছিল অর্থাৎ বামধারার প্রাধান্য সেটা কমেছে। সেই তুলনায় সাহিত্যের ক্ষেত্রে যারা ইসলামীমনা বা কিছুটা হলেও ইসলামীমনা, কিছুটা হলেও নৈতিকতায় বিশ্বাসী, আদর্শে বিশ্বাসী তারা বিগত কয়েক বছরে বেশ এগিয়ে এসেছেন। আমি দেখতে পাচ্ছি, গানের ক্ষেত্রে বর্তমানে এদের মধ্যে বেশ কয়েকটি গ্রুপ সংগঠিত হয়েছে। এ গ্রুপগুলো দীর্ঘদিন ধরে কাজ করলেও গত পাঁচ-সাত বছরে প্রবল হয়েছে। তারা বিভিন্ন নামে কাজ করছে এবং তাদের মান ভালো বলেই আমার মনে হচ্ছে। এদিকে কিছু কিছু মিডিয়া নতুন নতুনভাবে আসার ফলে অনেক যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও অতীতে বিভিন্ন সময়ে যারা অপাংক্তেয় হয়েছিল, তারা তাদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পাচ্ছে। এদের মধ্যে গায়ক, লেখক, বক্তা, চিন্তাবিদসহ নানা শ্রেণির মানুষ যুক্ত আছে। দিগন্ত টিভিতে মাহযুবা বা হিজাবপরিহিতা মেয়েদের উপস্থিতি একটি যুগান্তকারী ব্যাপার। সেখানে বারো জন সংবাদ পাঠক-পাঠিকার মধ্যে নয় জনই মেয়ে। এটি গণমানুষের মাঝে প্রভাব ফেলেছে। এটিও একটি কালচারের ব্যাপার। পোশাক-আশাক কালচারের বাইরে নয়।

আমার মনে হচ্ছে যে, পাশ্চাত্যের শত প্রচারণা সত্ত্বেও আমাদের কালচার আগের সেই পরিস্থিতি থেকে ক্রমান্বয়ে বেরিয়ে আসছে, কিছু সেক্টর ছাড়া। সাধারণভাবে জনগণ পাশ্চাত্য কালচারকে বেশি গ্রহণ করছে বলা যাবে না; বরং সেখান থেকে সরে আসছে। বামপন্থি কালচার অনেকটা ইসলামবিদ্বেষপ্রসূত



www.pathagar.com

বিষয় হিসেবে কালচারের ক্ষেত্রে নাটক-সিনেমা প্রভৃতিতে ধর্মের বিষয়গুলোকে তাদের মতো বানিয়ে নিয়েছে।

ইসলামকে পরাজিত করতেই তারা এরূপ করছে। এভাবে তারা যেটা করতে চায়, সেটা মুসলিম গণমানুষের মধ্যে তেমন প্রভাব ফেলতে পারছে বলে আমার মনে হয় না। যদি জনগণের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টিও আমরা গুরুত্বপূর্ণ মনে করি তাহলে বলবো, এখানে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা বেড়েছে। মুসলিমদের মধ্যে অমুসলিমদের প্রতি যে উন্নাসিকতার ব্যাপার ছিল তা দূর হচ্ছে।

আমরা সবাই যে মানুষ, এ বোধের যে অভাব বা ঘাটতি ছিল তা কমে যাচ্ছে বলেই আমি মনে করি। এখন দেশের বড় বড় আলেমরা অমুসলিমদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন। ইসলামী আন্দোলনের লোকদের দেখছি, তারা আমাদের দেশের অমুসলিমদের অধিকারের ব্যাপারে অনেক সচেতন হয়েছেন; তারা তাদের গঠনতন্ত্র পরিবর্তন করে অমুসলিমদের পূর্ণ সদস্য করার ব্যবস্থা করেছেন। সার্বিকভাবেই আমি বলবো, এ ধারার কার্যক্রম বাড়ছে।

এদিকে আমাদের দেশে মুসলমান-হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সবাই মিলে 'ইন্টারফেইথ হারমোনি' নামে একটি সংগঠনের ব্যাপারে কাজ করে যাচ্ছে। এর বর্তমান সভাপতি ড. পরেশ চন্দ্র মণ্ডল। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ শিক্ষক, সংস্কৃত ও পালি বিভাগের প্রধান ছিলেন। এ সংগঠনের সাথে আমিও জড়িত আছি। এর সঙ্গে আরো অনেক ব্যক্তি জড়িত আছেন। নারীরাও জড়িত আছেন। সার্বিক বিচারে আমি দেখতে পাচ্ছি, আমাদের কালচারের একটি বিরাট দিক হলো সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক, তারও উন্নতি হচ্ছে। এ ব্যাপারে পারস্পরিক বিদ্বেষ বাড়ানোর যে চেষ্টা, সেটি এখন নেই বললেই চলে। আর যেটুকু যে বা যারা করে থাকেন তারা মূল ধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত নন। তা গুটিকয়েকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

এটি ঠিক যে, আমাদের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি লক্ষ্যণীয় দিক হলো, একটি বিরাট জনগোষ্ঠীকে ইচ্ছে করে কিছু মানুষ কর্তৃক উসকে দেয়া। গত দু বছরের মধ্যে দেখা গেছে, একটি গোষ্ঠী দ্বারা বিড়ালকে মোহাম্মদ বানিয়ে উসকে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, যেটা অপ্রয়োজনীয় ছিল। একটি নির্বোধ গল্প বানিয়ে এ কাহিনী সাজানো হয়েছে। গল্প নির্বোধ হলেও আসলে কাহিনীকারই দুষ্ট। সে এমনভাবে কাহিনী বানিয়েছে যে, মনে হয় কাহিনীটা নির্দোষ; কিন্তু আসলে একটি দোষের কাজকে নির্দোষ প্রমাণের এটি একটি অপচেষ্টা ছিল। এর ফলে জনগণের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হয়েছে। তবে যাই হোক, সেটি মিটমাট হয়েছে। সেটিও একটা ভালো দিক। আমাদের সমাজে উসকানি দেয়ার যেমন লোক আছে, আবার মীমাংসা করারও লোক আছে। এ ব্যাপারে মরহুম খতিব উবায়দুল হক সাহেব প্রশংসনীয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। আমি এটির প্রশংসা করি যে, শেষ পর্যন্ত উক্ত পত্রিকার দুই সম্পাদক এসে মাফ চেয়েছেন।



www.pathagar.com

পত্রিকায় তাদের হাত জোড় করে মাফ চাওয়ার ছবি প্রকাশ হয়েছে। তবে তারা এটা মনে রেখেছেন কি না, তা বলতে পারবো না। কেননা, তাদের পত্রিকার ভূমিকায় খুব একটা পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না। তেমনিভাবে ভাস্কর্যের নামে উসকানি ছড়ানো হয়েছে। ভাস্কর্য ও মূর্তিকে এক করে ফেলা হচ্ছে। ইসলামে যে মূর্তি নিষিদ্ধ এবং ইসলামে যে মূর্তি নেই, মুসলিম সমাজ যে কখনোই মূর্তিকে গ্রহণ করে না, সেটিকে তারা ভুলে গিয়ে মূর্তিকে ভাস্কর্য বলে চালিয়ে দিচ্ছে। ভাস্কর্য যদি তারা করতেই চান তবে ঐতিহাসিক কোনো বিষয় বা স্থানকে করা যেতে পারে। যেমন– আহসান মঞ্জিল, লালবাগের কেল্লা কিংবা মীর জুমলার কামানকে করা যেতে পারে। এ রকম নানা জিনিসকে করা যেতে পারে। এখানে নানা কিছু করার অবকাশ থাকলেও সেদিকে না গিয়ে ঐ গোষ্ঠী দ্বারা সমাজে উসকানি সৃষ্টি করা হচ্ছে।

এমনিভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, মাদরাসা ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার মাধ্যমে সমাজে বিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে। এটি ইচ্ছে করেই করা হচ্ছে। তারা যদি যোগ্য হয় তাহলে তারা পড়বে। এ পর্যন্ত তারা পড়েও আসছে। কিন্তু হঠাৎ করে একজন বামপন্থি শিক্ষকের নেতৃত্বে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে মাদরাসা ছাত্রদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ডিপার্টমেন্টে পড়তে না দেয়ার একটি চক্রান্ত করা হয়। এই চক্রান্তে অনেক লোক জড়িত। যদিও এ চক্রান্ত সফল হয়নি বা হবে না, ইনশাআল্লাহ। কেননা, বিষয়টি মূলত ভুল এবং ভ্রান্তিপূর্ণ। এটি মানবতা ও ইনসাফের বিরোধী। এটি স্বাভাবিক বিষয়েরও বিরোধী।

আমি দেখতে পাচ্ছি, কিছু লোকের মধ্যে অর্থাৎ সেকুলার বা বাম একটি অংশের, যারা মূলত সমাজের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ–এ রকম উসকানি বা উত্তেজনা সৃষ্টি করাটা একটা স্টাইল হয়ে গেছে। তবু বলতে হয়, আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতিতে এ রকম একটি অগ্রগতি হয়েছে বলে মনে করি। এ প্রসঙ্গে আমি হিজাবের কথাই আবার বলি, আমাদের সমাজে হিজাবের ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সার্বিকভাবেই এর ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং উত্তরোত্তর আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। মেয়েরা এটিকে অনেক বেশি শালীন এবং তাদের জন্য সম্মানজনক বলে মনে করছে। তারা এর মাধ্যমে প্রদর্শনকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। তারা এ পোশাককে সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবেই গুরুত্ব দিচ্ছে।

আবার যদি আমি সাহিত্যের ক্ষেত্রে ফিরে আসি তাহলে বলবো, সাহিত্যে খুব বড় ধরনের পরিবর্তন আমি লক্ষ্য করছি না। ইসলামপন্থিদের এক্ষেত্রে অগ্রগতি লক্ষ্য করছি। তবে বামদের গতি আগের তুলনায় শ্লথ বলে মনে হচ্ছে। এর মান নিয়ে কোনো মন্তব্য করবো না। মান বোধ হয় কম-বেশি একই রয়ে গেছে। কোনো কোনো লেখক, সাহিত্যিক, কবির লেখার মানের পতন হয়েছে। একই জিনিস তারা বারবার বলার চেষ্টা করেন। এখানে আমি কারো নাম নিতে চাই না।



www.pathagar.com

বিশ্বব্যাপী তাকালে দেখা যায়, শত বাধা সত্ত্বেও ইসলামপন্থিদের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল। তারা দিন দিন শক্তিশালী হচ্ছে। আমেরিকার নির্বাচনে পর্যন্ত মুসলমানরা সেখানে ওবামার পক্ষে কাজ করেছেন এবং তাকে সাপোর্ট দিয়েছেন। সার্বিকভাবে সারা বিশ্বে ইসলামী স্কলারদের সংখ্যা বাড়ছে। তারা মানসম্পন্ন সাহিত্য সৃষ্টি করছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়ছে। তাদের শক্তি বাড়ছে। বর্তমান ফিন্যান্সিয়াল ক্রাইসিসে এটি প্রমাণ হয়েছে, এসব প্রতিষ্ঠান অনেক বেশি সুষ্ঠু ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে এবং এ ধরনের ক্রাইসিস তারা বেশি মোকাবেলা করতে পারে। এর মূল কারণ হচ্ছে, এখানে সুদ ও ফটকাবাজি নেই। ফটকাবাজির জন্য সুদটা সুবিধা। এখানে ঋণ বিক্রিও নেই।

যাই হোক, আমি যা বলতে চাই তা হলো, ইসলামের শক্তি সবদিক দিয়েই বাড়ছে বলে আমার মনে হচ্ছে। মিসরে বাড়ছে, ইন্দোনেশিয়াতে বাড়ছে, তুরস্কে বাড়ছে, তিউনিসিয়ায় বাড়ছে। ইন্দোনেশিয়ার সোসাইটির সাথে নানা কারণে আমার অনেক যোগাযোগ হয়েছে। সেখানে ইসলামের শক্তি আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে তা আমি যোগাযোগের মাধ্যমে জানতে পেরেছি। বাংলাদেশেও অনেক শক্তিশালী হয়েছে। যেহেতু এখানে ইসলামের শক্তি বাড়ছে, সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এখানে ইসলামিস্টদের শক্তি বাড়তে থাকবে। ভবিষ্যতে এখানে ইসলামের সৌন্দর্য, আধ্যাত্মিকতা, মহত্ত্ব ও মানবিকতা অনেক বেড়ে যাবে। সে তুলনায় বামরা পিছিয়ে পড়বে। তাদের নতুন করে লোক তৈরি হচ্ছে না। পুরনোরাও একপর্যায়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে। এখানে ইসলামের চেতনাই মূল হবে। সবখানেই মানবতার বিস্তার ঘটাতে হবে। সারা বিশ্বকেই মানবতাবাদে ও নৈতিকতাবাদে ফিরে আসতে হবে।



www.pathagar.com

# সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও ধর্ম

যেকোনো সংস্কৃতির ভিত্তিকে আমি 'বিশ্বাস' বলে মনে করি। কারণ, আমাদের জীবনের কাজগুলোই যদি সংস্কৃতি হয়ে থাকে, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে আমাদের বিশ্বাসেরই প্রতিফলন। সেই বিশ্বাস থেকেই মূল্যবোধের জন্ম এবং তা-ই জীবনের নিয়ামক হয়। অর্থাৎ, বিশ্বাস মূল্যবোধ আকারে দেখা দেয় বা বিশ্বাস থেকেই মূল্যবোধ উৎসারিত। কাজেই দেখা যাচ্ছে, মূল্যবোধের সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। যে যা-ই বিশ্বাস করে তার মূল্যবোধ সে রকম হবে এবং তার সংস্কৃতি মূল্যবোধের সঙ্গে সম্পর্কিত হবে।

এখন এ বিশ্বাস বা মূল্যবোধের ধর্ম ছাড়া অন্য কোনো ভিত্তি আমি দেখি না। বিশ্বব্যাপী জনগণের দিকে তাকালে আমি দেখি, তাদের সকলের মূল বিশ্বাসগুলো ধর্ম থেকে এসেছে। এটিই বাস্তবতা, এটিই সত্য কথা। এই যে উপমহাদেশের বিশাল হিন্দু জনগোষ্ঠী, তারা তাদের বিশ্বাস তাদের হিন্দু ধর্ম থেকে পেয়েছে। মুসলিম জনগণ তাদের বিশ্বাসগুলো প্রকৃতপক্ষে তাদের ধর্ম থেকে পেয়েছে। বিশ্বব্যাপী যে খ্রিস্টান সমাজ তারা তাদের মূল বিশ্বাস তাদের ধর্ম ও বাইবেল থেকে পেয়েছে। এটি গোটা মানবজাতির জন্য সত্য। মুসলমানরা এটি কুরআন থেকে পেয়েছে। হিন্দুরা এটি বেদ বা গীতা থেকে পেয়েছে। আবার এসব ধর্মের পেছনের দিকে তাকালে দেখবো, প্রধান প্রধান প্রায় সব ধর্মই স্রষ্টার কথা বলছে। এক স্রষ্টার কথা বলছে। ইসলামে তো সুস্পষ্টভাবে আল্লাহ তাআলাই একমাত্র স্রষ্টা। হিন্দু ধর্মের ক্ষেত্রেও মূল স্রষ্টা ঈশ্বরই, তারপরে তারা নানা রকম দেব-দেবীকে যোগ করেন। খ্রিস্টানরাও God the Father-কেই আসল 'গড' মনে করে। বৌদ্ধ ধর্মে এটুকুই পার্থক্য যে, গড সম্পর্কে তাদের অস্পষ্টতা রয়েছে। তাদের এ কথা কোথাও নেই যে, গড বা স্রষ্টা নেই।

যাই হোক, আমি বলবো, মানুষের বিশ্বাস থেকেই তার মূল্যবোধ জন্ম নেয়। মানুষের বিশ্বাসই তার জীবনাচার বা জীবনপদ্ধতিকে, জীবনের কাজগুলোকে প্রভাবিত করে। সুতরাং এ সবই স্রষ্টা সম্পর্কিত। আবার দেখলাম, বিশ্বাস আসে ধর্ম থেকে। তাই আমরা দেখি, ধর্ম থেকে বিশ্বাস, বিশ্বাস থেকে মূল্যবোধ এবং এসবের ভিত্তিতে মানুষের সংস্কৃতি। সবগুলোই এখানে সম্পর্কিত।



www.pathagar.com

আমি এখানে আরেকটি কথা যোগ করবো। আমি বিভিন্ন সময় বলেছি, বিশ্বাস যদি সঠিক হয় তার সংস্কৃতি সুন্দর হবে। সংস্কৃতি সুন্দর হওয়া প্রয়োজন। সংস্কৃতির অর্থের মধ্যেও সৌন্দর্যচেতনার একটি দিক রয়ে গেছে। আমরা মুসলিমরা তৌহিদে বিশ্বাস করি এবং আমাদের মূল্যবোধ অশ্লীলতাকে স্বীকার করে না। এটি আমাদের সংস্কৃতিকে সুন্দর করতে সাহায্য করে। এ বিশ্বাস বা ধর্মীয় শিক্ষার মধ্যে যদি কোনো দুর্বলতা বা কুসংস্কার দেখা দেয় তাহলে তাতে সৌন্দর্যের হানি হবে।

মূল্যবোধকে কারা নষ্ট করছে? আমি দেখি, মূল্যবোধ নষ্ট হচ্ছে মূলত নাস্তিক, অর্ধনাস্তিক ও বস্তুবাদীদের দ্বারা। কারণ, কার্যকরভাবে যারা নাস্তিক বা নাস্তিকের মতো চলে, এদের একটা সংখ্যা ইউরোপে আছে। আমেরিকায় সে তুলনায় কম। নাস্তিকরাই আস্তিকতা ও ধর্মের বিরুদ্ধে বলে; ধর্মকে কুসংস্কার বলে। যদি তা-ই হয় তাহলে বিশ্বাস আর থাকে না, যা জন্ম নেয় ধর্ম থেকে। ধর্মই বিশ্বাস ও মূল্যবোধের উৎস। কাজেই বিশ্বব্যাপী মূল্যবোধ নষ্ট করা তাদেরই কাজ, যারা সরাসরি নাস্তিকতাবাদ প্রচার করছে এবং তাদের দ্বারা যারা প্রভাবিত হচ্ছে। বস্তুবাদ মূলত নাস্তিকতারই অন্য নাম। ফিলোসফিক্যাল বস্তুবাদ মানে নাস্তিকতা। একটা হচ্ছে সাধারণভাবে বস্তুবাদী অর্থাৎ ভোগ ইত্যাদি; কিন্তু আমরা যদি ফিলোসফিক্যাল বস্তুবাদ বলি, তার মানে হলো নাস্তিকতা। আর বিশ্বব্যাপী এরাই মূল্যবোধকে ধ্বংস করার জন্য কাজ করছে। তারা বুঝে করুক আর না বুঝেই করুক, আমার মনে হয় তারা বুঝেই করছে। তারা ধ্বংস করছে। ফলে মানুষ মূল্যবোধহীন জীবে পরিণত হচ্ছে। সভ্যতা মূল্যবোধহীন হয়ে যাচ্ছে। অর্থনীতি মূল্যবোধহীন হয়ে যাচ্ছে। রাজনৈতিক আচরণ মূল্যবোধহীন হয়ে পড়ছে। এটা অরাজকতা, উচ্ছৃঙ্খলতা সৃষ্টি করছে; বর্বরতা, হিংস্রতা সৃষ্টি করছে। এই হচ্ছে মূল্যবোধহীন অবস্থার পরিণতি।

বলা যেতে পারে, নাস্তিকতাও তো একটি বিশ্বাস। হ্যাঁ, আমি স্বীকার করি, নাস্তিকতাও একটি বিশ্বাস। কিন্তু নাস্তিকতায় বিশ্বাসের অর্থ কোনো কিছুকে বিশ্বাস না করা, কোনো কিছুকে চিরন্তন মনে না করা, কোনো কিছুকে পবিত্র মনে না করা। নাস্তিকতায় বিশ্বাসী ব্যক্তি নিজেকে কারো কাছে দায়বদ্ধ মনে করে না। তাই তারা উচ্ছৃঙ্খল হতে পারে, বিশৃঙ্খল হতে পারে। অন্তত তত্ত্বের দিক থেকে সে যেকোনো কিছু করতে পারে। সে ধ্বংসাত্মক হতে পারে, লম্পট হতে পারে, নীতিহীন হতে পারে, খুনি হতে পারে–সবকিছুই হতে পারে সে তত্ত্বগতভাবে। কারণ, যেহেতু নাস্তিকের বা বস্তুবাদীর কোনো দায়বদ্ধতা নেই। এখন যদি মূল্যবোধের কথা বলতেই হয়, তাহলে এগুলোই তার মূল্যবোধ। আসলে এগুলো মূল্যবোধ নয়; অপমূল্যবোধ। যদি অপসংস্কৃতির জায়গায় আমি অপমূল্যবোধ বলতে পারি তাহলে বলা যায়, নাস্তিকতা অপমূল্যবোধের জন্ম দেয়।

আসলে সত্যের সঙ্গে মিথ্যার, ধর্মের সঙ্গে অধর্মের, নাস্তিকতার সঙ্গে আস্তিকতার এক প্রকারের সংগ্রাম চলছে। বিষয়টি সকল বিশ্বাসী ব্যক্তির বোঝা



www.pathagar.com

দরকার এবং তা বুঝে এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। না হলে মানবতা এমনিতেই পতনের দিকে এগিয়ে গেছে, তার আরো পতন হবে। তা একেবারেই পতিত মানবতা হয়ে যাবে; পতিত সমাজে পরিণত হবে। অর্থাৎ মূল্যবোধহীন সমাজ মানে পতিত সমাজ; মারাত্মক সমাজ।

সংস্কৃতিতে ধর্মের ভূমিকা নিয়ে অনেকে প্রশ্ন করে এবং ধর্মকে সবসময় সংস্কৃতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। নাস্তিকের সংখ্যা বিশ্বাসীর তুলনায় এ বিশ্বে অনেক কম। তবে নাস্তিকতার প্রভাবে অনেক মানুষ বস্তুবাদী ও স্বার্থপর হয়ে গেছে। ধর্ম বিশ্বব্যাপী একটি বাস্তবতা। এই বাস্তবতাকে উৎখাত করা সম্ভব হয়নি। এটা মানুষের গভীরে প্রোথিত। গভীরে এর শেকড়। এ জন্য বিশ্বে যে নাস্তিক রাষ্ট্র হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন তারা ৬০/৭০ বছর চেষ্টা করার পর নিজেই উৎখাত হয়ে গেছে। সেখানে সকল ধর্ম আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং শক্তিশালী হচ্ছে। তাদের মন থেকে শেকড় উপড়ে ফেলতে পারেনি।

আমি মনে করি, এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করা যাবে না। সুতরাং এটিকে উৎখাতের চেষ্টা সফল হতে পারেনি, সফল হতে পারে না। যতই দিন যাচ্ছে, ধার্মিক লোকের মধ্যে শিক্ষা বাড়ছে। শুধু ইসলাম ধর্মের নয়; অন্য ধর্মেরও যোগ্য প্রতিনিধি বেশি করে সামনে আসার চেষ্টা করছে। সুতরাং আমি মনে করি যে, ধর্মকে বাদ দেয়া একেবারে অবাস্তব হবে। ধর্ম যদি থাকে তাহলে সেটাই মানুষের মূল বা প্রধান বিশ্বাসের ভিত্তি হবে। এটাই হচ্ছে মৌলিক বিশ্বাস। তারপর তাকে হিসাব দিতে হবে কি হবে না, বিচার হবে কি হবে না এটি মৌলিক বিশ্বাস। এটি ধর্ম থেকেই আসবে। এটি পানি থেকেও আসবে না, আকাশ থেকেও আসবে না।

সুতরাং মৌলিক বিশ্বাস যদি ধর্ম থেকে আসে তাহলে বাকি সকল মৌলিক মূল্যবোধ, সকল মৌলিক আচরণ বা জীবনাচার তার ভিত্তিতেই গড়ে উঠবে। তাতে অন্য কোনো কিছু প্রভাবের কারণে ত্রুটি থাকতে পারে, কিন্তু সংস্কৃতিকে ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না বা বিচ্ছিন্ন হবে না। এই চেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি, হবে না।

আবার সংস্কৃতিকে ধর্ম থেকে আলাদা করার চেষ্টা সঠিক চেষ্টা নয়। প্রথমত ধর্ম কোনো ক্ষতিকর কিছু নয় যে, এটিকে ধ্বংস করতেই হবে। বরং ধর্মের মূল বাণী একেবারেই সহজ যে, তোমার স্রষ্টা রয়েছে এবং তুমি দায়বদ্ধ, তোমার হিসাব দিতে হবে। কাজেই তুমি ভালো পথে চলো। তুমি মন্দ কাজ করো না। এই হচ্ছে ধর্মের কথা। এটি মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে। এটি মানুষকে নিজকে নিজে শৃঙ্খলিত হতে শেখায়। ধর্মকে যদি অপব্যবহার করা হয়, সেটিকে মানুষ এখন মোকাবেলা করতে পারে। সেটি করতে সে সক্ষম। নানা কারণে যদি কোনো গোঁড়ামি, অতি গোঁড়ামি দেখা দেয়, কোনো অপব্যাখ্যা হয়, অপকাজ হয় তাহলে তা দমন করা সম্ভব। যেহেতু ধর্মের মূল বিষয়টি সঠিক এবং যেহেতু ধর্মের মূল প্রভাব সঠিক সুতরাং ধর্ম অবশ্যই কল্যাণকর। একে উপলব্ধি করতে



www.pathagar.com

হবে। অন্য কোনো জিনিসই ধর্মের সমান কল্যাণকর নয়। কোনো জিনিসই নেই যে, ধর্মের সমান হতে পারে। নাস্তিকতা, বস্তুবাদ কোনো জিনিসই নয়। ফলে ধর্মকে খাটো করে দেখার অবকাশ নেই এবং ধর্মের ভিত্তিতেই মানুষের সংস্কৃতি গড়ে উঠতে হবে, জীবনব্যবস্থা গড়ে উঠতে হবে। ধর্মের ভিত্তিতেই তার সামগ্রিক সংস্কৃতি, রাজনৈতিক সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক-সামাজিক সংস্কৃতি, পারিবারিক সংস্কৃতি গড়ে উঠা উচিত।

আমি এতক্ষণ যা বললাম, তা বিশ্ব প্রেক্ষাপটেই বললাম। বাংলাদেশের মূল ধর্ম ইসলাম। ইসলামই এ দেশের ভিত্তি হবে। ইসলামের ব্যাপারে কিছু ভুল বোঝাবুঝি আছে আধুনিক সমাজে। এমনকি গ্রামীণ সমাজেও যেসব কুসংস্কার ভুল বোঝাবুঝি আছে তা আমাদের আস্তে আস্তে পরিষ্কার করতে হবে। আধুনিক সমাজে অনেক অস্পষ্টতা আছে কতগুলো বিষয়ে সেগুলোকেও দূর করতে হবে। এও হতে পারে যে, আমাদের ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া হয়, তাতে ইসলামের আধুনিক গবেষণার বিষয়গুলো তারা জানে না। এটি একটি সংকট। তাই আমাদের মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামের আধুনিক গবেষণাগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। গত একশ'-দুই শ' বছর ধরে আল্লামা ইকবাল, মাওলানা মওদূদী, সাইয়েদ কুতুব, ইসমাইল রাজি আল ফারুকি, মুহাম্মদ আসাদ, প্রফেসর খুরশিদ আহমদের মতো বড় বড় স্কলাররা যেসব কাজ করেছেন–এ পর্যায়ের লোকদের রিসার্চগুলোকে যেকোনো ভাবে হোক, মাদরাসা কারিকুলামে নিয়ে আসতে হবে। ইসলামের ক্ষেত্রে আধুনিক রিসার্চগুলো যোগ করে মাদরাসা কারিকুলাম যদি পরিবর্তন করা হয় তাহলে ইসলাম এ জাতির জন্য একটি অজেয় শক্তিতে পরিণত হবে। ইসলাম মানবজাতির একটি অজেয় শক্তি হতে পারে, যেমন অতীতে হয়েছিল। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, ইনশাআল্লাহ হবে। আমি মনে করি যে, বাংলাদেশে ইসলাম একটি অজেয় শক্তি হবে। এটি ছোট দেশ হলেও এই শক্তির জোরে সে টিকে থাকবে। অন্য কোনো কিছু বাংলাদেশে নিজেকে স্থায়ী করে নিতে পারবে না। বাংলাদেশের মানুষের মন-মানসিকতায়, চিন্তা, শক্তিতে মূল্যবোধে, দৃঢ়তায় এই শক্তি ইসলাম।

এখানে অপসংস্কৃতি বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে–এই প্রশ্ন তোলা যায়। কিন্তু আমার বিশ্বাস অপসংস্কৃতি মূলত দুর্বল। এটি টেকার মতো কিছু নয়। এটি একটি ফ্যাশনের মতো। ফ্যাশন যেমন টেকে না টেকার মতো বিষয় নয়, ফেনা যেমন টেকে না, অপসংস্কৃতি নিজেই সলিড কিছু নয়। একটি অপসংস্কৃতি দেখা যায়, আবার তা চলে গিয়ে আরেকটা আসে। সেটা গিয়ে আরেকটা আসে। অপসংস্কৃতি হয়তো কোনো না কোনো কর্মে থেকে যাচ্ছে নানা কারণে; কিন্তু এটা নিজে সলিড কোনো কিছু নয়। এর প্রকৃতি খুবই দুর্বল। এটি সাময়িক একটি চেতনা, সাময়িক আকর্ষণ। এর মধ্যে কোনো গভীরতা নেই। কিন্তু ধর্ম ও তার মূল বিশ্বাস অত্যন্ত গভীর। এটিকে যদি আমরা ছড়িয়ে দিতে পারি, জনগণকে সচেতন করতে পারি, তাহলে তা শক্তিশালী হবে। অপসংস্কৃতির শক্তি খুবই



www.pathagar.com

সামান্য। বাহ্যিকভাবে এটি বেশি দেখা যায় মূলত প্রচারের কারণে। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, প্রত্যেকটি পত্রিকা তাদের পাতাগুলোতে নানা রকম আধুনিক ফ্যাশন দিচ্ছে, সারা দেশে আমাদের ৯০ ভাগ নারী হিজাব পালন করে। যদি ঢাকা শহরে ধরি, তাহলে এখানে ৫০ ভাগের বেশি হিজাব করে। কিন্তু এই হিজাবের উপরে ফ্যাশনের পাতায় কোনো স্থান নেই। অথচ ঐ যে ৫/১০ ভাগ উগ্র নারী-পুরুষ আছে, দিনকে দিন, সপ্তার পর সপ্তাহ তারা সকল পাতা দখল করে আছে। এটি কি বাংলাদেশের জনগণকে প্রতিনিধিত্ব করে? কিন্তু দেশের ৯০ ভাগ নারী বা ঢাকার যে ৫০ ভাগ নারী হিজাব ব্যবহার করে তাদের কথা এসবে আসছে না। এটি ইসলামিক দৈনিকগুলোরও ব্যর্থতা। এটি নয়া দিগন্তের, সংগ্রামের করা উচিত। এটিও একটি ব্যর্থতা যে, আমরা বুঝতে পারছি না। মাত্র শতকরা দশ জনের জন্য আমরা ফ্যাশনের এ পাতাগুলো দিয়ে যাচ্ছি। হিজাবের কত রকমের ডিজাইন আছে, পোশাক, স্কার্ফ কত সুন্দর হতে পারে, কত রকম হতে পারে, কী রকম কাপড় হতে হবে, কী রকম বুটিক হতে পারে, কারুকাজ হতে পারে–এগুলো কি আসতে পারতো না? এসবের মধ্যে ভেরিয়েশন আনতে পারতো না? ফলে প্রোপাগাণ্ডা অনেক সময় ক্ষুদ্রাংশের প্রতিনিধিত্ব করে।

মূল্যবোধের শক্তি যদি দুর্বল থাকে তাহলে প্রোপাগাণ্ডার ফলে তা দুর্বল থাকে। আর যদি কোনো দেশে 'ভালো কাজের আদেশ, মন্দ কাজের নির্দেশ'–কুরআনের এই মৌলিক নির্দেশ পালন করা হয়, তাহলে প্রপাগাণ্ডা তাকে দুর্বল করতে পারবে না। ইসলামে সমাজকে রক্ষা করার জন্য একটি স্থায়ী ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, সেটি হলো সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ। যদি প্রত্যেকে এটি করে তাহলে প্রোপাগাণ্ডা সফল হতে পারবে না। ফলে অপসংস্কৃতি এখানে সফল হতে পারবে না।

হতে পারে সেকুলারিজমের প্রভাব সমাজে এখনো আছে। কিন্তু সেকুলারিজমের উত্থান যেটি ছিল তা থিতিয়ে গেছে। এ দেশের একদম নাস্তিক কিছু বাদে যারা সেকুলারিজম করে তারা মুসলিম। তাদের ৯৯ ভাগই বিশ্বাসে মুসলিম। এখন ৯৯ ভাগের ভুল বোঝাবুঝি যদি আমরা দূর করে দিতে পারি, যোগাযোগ ও প্রচারের মাধ্যমে এবং যিনি প্রচারক তিনি যদি যোগ্য হন তাহলে আমার মতে, এটি দূর হয়ে যাবে। আবার দেখা যায়, গত শতাব্দীর ষাটের দশকে এলিটদের মধ্যে খুব সামান্যই ইসলামের পক্ষে ছিল। এখন সে অবস্থা নেই। কাজেই ইসলাম সেকুলারিজমকে থামিয়ে দিয়েছে। এলিটদের মধ্যে ইসলামের প্রভাব বাড়াতে হবে। সার্বিকভাবে ইসলামের প্রভাব বাড়ছে। এ কথাও ঠিক, ইসলামের কর্মীর সংখ্যাও বেড়েছে। কাজেই বলা যায় অপসংস্কৃতি, সেকুলারিজম ইসলামের কাছে টিকবে না। তারা সমাজের মূল নিয়ামক হবে না।



www.pathagar.com

# শিক্ষা, সভ্যতা, ধর্ম ও সেকুলারিজম

বিশ্বের ইতিহাসকে পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, বৈজ্ঞানিকদের মতে প্রত্যেকটি Cell এর যেমন একটা Nucleus থাকে, তেমনিভাবে একটি আদর্শ হিসেবে সেকুলারিজমের উত্থানের আগে পর্যন্ত সভ্যতা, শিক্ষার Nucleus বা কেন্দ্র ছিল ধর্ম। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, নাস্তিকতা ইতিহাসে কোনো সভ্যতার ভিত্তি ছিল না। শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল একটি নৈতিক ভিত্তি সৃষ্টি করা, নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ সৃষ্টি করা। এ কথা ইসলামের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ইসলামি যুগের শুরুতে, মধ্যযুগে এবং অতি সাম্প্রতিককালেও ঔপনিবেশিক যুগের আগে পর্যন্ত মুসলিম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব ছিল কুরআন, হাদিস ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিরাতের ওপর বা ফিকাহর ওপর। মোটকথা, এর সবগুলোর ওপর গুরুত্ব দেয়ার সাথে সাথে ইতিহাস, ভূগোল, রাষ্ট্র পরিচালকদের কর্তব্য, সরকারি নীতিমালা অথবা শাসনকার্যের নিয়মকানুন নিয়ে আলোচনা করা ও শিক্ষা দেয়া হয়েছে। হজরত আলী (রা.) কর্তৃক মালিক আল মুশতারকে পাঠানো চিঠিতে গভর্নর বা রাষ্ট্রনায়কের দায়িত্ব কি সে ব্যাপারে আলোকপাত করা হয়েছে। এর দ্বারা শুধু এ কথা প্রমাণ হয় যে, শিক্ষার মর্মমূলে ছিল ধর্ম বা ইসলাম, তথা চরিত্র ও নৈতিকতা। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বা সামাজিক বিজ্ঞান যাই শিক্ষা দেয়া হতো, তা ছিল এ মূলকে কেন্দ্র করে।

বৌদ্ধদের ইতিহাসেও দেখা যায় একই সত্যের পুনরাবৃত্তি। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষা প্রদান করা হতো, তারও মধ্যে দেখা যায়, শিক্ষাব্যবস্থার মূলে ছিল চরিত্র বা বৌদ্ধ ধর্মের নৈতিকতা। এর সাথে তারা ভারতে প্রচলিত অন্যান্য বিদ্যাকেও শামিল করে নিয়েছিলেন। হিন্দু ধর্মের প্রাথমিক যুগের দিকে তাকালে দেখা যায়, বিদ্যা শিক্ষার মূল ছিল বেদ। 'বেদ' মানেই বিদ্যা। তাদের প্রাচীন ফিলসফির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল বেদ। অর্থাৎ শিক্ষার কেন্দ্র ছিল এই বেদই। এর সাথে যুদ্ধবিদ্যা, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র বা অর্থনীতি ও অন্যান্য শাস্ত্রও যোগ করা হয়েছিল প্রয়োজনকে সামনে রেখে।

খ্রিস্টানদের অতীতে গেলেও দেখা যায়, তাদের শিক্ষাও ছিল গির্জাকে কেন্দ্র করে। প্রত্যেকটা গির্জা একটা কলেজ বা শিক্ষালয় ছিল। সেখানে যা পড়ানো



www.pathagar.com

হতো, তার মূল ভিত্তি ছিল বাইবেল তথা Old Testament ও New Testament। এ থেকে একটা কথাই প্রমাণিত হয় যে, ১৮০০ শতাব্দীর শেষভাগে যখন Enlightenment শুরু হলো এবং যার 'সন্তান' হিসেবে Secularism-এর উদ্ভব হলো – তার আগে পর্যন্ত শিক্ষা ওই রকমই ছিল। তার ফল এই দাঁড়িয়েছিল যে, বিভিন্ন বিদ্যার ক্ষেত্রে জানার পরিমাণ কমবেশি থাকলেও মানুষ নৈতিক দৃষ্টিতে ভালো ছিল। বেশির ভাগ মানুষ, তিনি হিন্দু হোন, বৌদ্ধ হোন, মানুষ হিসেবে দানশীল ছিলেন। অন্তত মানবিক গুণাবলীর দৃষ্টিতে তারা আজকের চেয়ে ভালো মানুষ ছিলেন। অমানুষ ছিলেন না।

১৮০০ শতাব্দীর শেষে যে পরিবর্তন বা যে মুক্তবুদ্ধির আন্দোলন হলো তার আগে ইউরোপে দু'টি আন্দোলন হয়েছিল। প্রথমটি রেনেসাঁ বা পুনর্জাগরণ। এটা ছিল আর্ট ও লিটারেচারের ক্ষেত্রে; ধর্ম বা রাজনীতির ক্ষেত্রে নয়। এর পরেরটি হচ্ছে Reformation Movement যার মানে হলো, খ্রিস্টান চার্চের মধ্যে থেকেই আপত্তি উঠলো যে, পোপই কি বাইবেলের একমাত্র ব্যাখ্যাতা? এর কোনো বিস্তারিত ব্যাখ্যায় না গিয়ে বলতে চাই যে, এরই ফলে চার্চ নানাভাবে বিভক্ত হলো, যেমন - লুথারের নেতৃত্বে Lutherian Church, Kelvin এর নেতৃত্বে Kelvinist Church, British Priest দের নেতৃত্বে Anglican Church, Baptist Church ও অন্যান্য। এর সবগুলোকে একত্রে বলা হয়ে থাকে Protestant Movement, যেটা হলো Reformation এর ফল। তৃতীয় যে আন্দোলন হলো সেটা হয়েছিল ফ্রান্সে। সেটা শুরু হয় মুক্তবুদ্ধির আন্দোলনের নামে। ১৮০০ শতকের শেষে এবং ফরাসি বিপ্লবের আগে ও পরে এর প্রভাব বজায় রইল। যেকোনো কারণেই হোক, এই আন্দোলনের বেশির ভাগ নেতারা ছিলেন নাস্তিক বা গুপ্ত নাস্তিক কিংবা নাস্তিকের মতো। মানব ইতিহাসে এই প্রথম এরা এই দর্শন নিয়ে এলেন যে, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কাজ থেকে ধর্মকে বিদায় করতে হবে। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক ব্যাপারে ধর্মের কোনো ভূমিকা থাকবে না। ধর্ম থাকতে হলে কারো অন্তরে থাকবে, যদি কেউ রাখতে চায়। অর্থনীতি, সংস্কৃতি, রাজনীতি, আইনসভা এসব থেকে ধর্মকে দূরে রাখতে হবে। এ আন্দোলনের মূল বক্তব্য ছিল ওয়াহি নয়, যুক্তিই জীবনের ভিত্তি হবে এবং আল্লাহর শাসন কায়েম হবে না। যে কারণেই হোক, এই আন্দোলন ইউরোপের তৎকালীন নেতৃত্বকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়। এটা মোটামুটি গৃহীত হয়ে যায় এবং ক্যাথলিক বা প্রটেস্টান্ট চার্চ এটাকে বাধা দিয়ে কুলাতে পারেনি। এর ফল হয় ভয়াবহ, যা এখন আলোচনা করবো।

প্রথম কুফল হলো এই, শিক্ষা থেকে ধর্মকে আলাদা করা হলো। এভাবে যে স্কুল ব্যবস্থা গড়ে উঠল তাতে মানুষ নিতান্ত স্বার্থপর হয়ে গড়ে উঠল। তারা ভোগবাদী হয়ে পড়ল। ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ কমে গেল। যে ধর্মের দ্বারা কোনো



www.pathagar.com

কাজ হয় না, তার প্রতি সম্মানও কমে গেল। নীতিবোধের যে শ্রেষ্ঠত্ব বা প্রাধান্য তাও লোপ পেল। নীতিহীনতা, স্বার্থপরতা নিয়ে মানুষ গড়ে উঠল। এই স্কুলে জেনারেলরা গড়ে উঠলেন, পলিটিশিয়ান ও চিন্তাবিদরা তৈরি হলেন। তাদের মনের গভীরে এই মনোভাব স্থায়ী হলো যে, জনসমাজের জন্য ধর্মের প্রয়োজন নেই, চাই সেটা পার্লামেন্ট, মার্কেট, স্টক এক্সচেঞ্জ, ব্যাংক, যাই হোক না কেন। এই যে ব্যক্তিগত এক ধরনের মনমানসিকতা গড়ে উঠল তার ভিত্তিতে তাদের সামাজিক আচরণ তৈরি হলো।

এর ফলে সব ক্ষেত্রে তার প্রভাব কার্যকর হলো। অর্থনীতির ক্ষেত্রে সোশ্যাল ডারউইনিজম প্রবেশ করল অর্থাৎ 'Survival of the fittest' কে মূলমন্ত্র করে নেয়া হলো। 'কেবল যোগ্যতমই টিকে থাকবে। এর মানে, যারা যোগ্যতম নয়, তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হোক, কিছু আসে যায় না। প্রাকৃতিক ক্রিয়াকে আমরা বাধা দেবো কেন? এভাবেই কোনো জাতি যদি এ উপমহাদেশের লোক হয়ে বা আফ্রিকা বা চীনের লোক হয়ে প্রতিযোগিতায় যোগ্যতম প্রমাণিত না হয় বা টিকতে না পারে, তারা হেরে যাবে। এখানে কোনো নীতিবোধ, দয়ামায়ার প্রয়োজন নেই। এটাই বরং যুক্তিযুক্ত যে, যোগ্যতমকে আমরা এগিয়ে দিলাম।' এটাই ছিল সোশ্যাল ডারউইনিজম, যা ছিল খ্রিস্টান ধর্মের বিরোধী, ইসলামের বিরোধী। খ্রিস্টান ধর্ম বলেছে তোমার প্রতিবেশীকে ভালোবাসো, বলেছিল চ্যারিটির কথা। আর ইসলাম 'ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ বা আল্লাহর পথে ব্যয়ে', জাকাতের কথা বলেছে। এটা একটা বড় ব্যাপার। নিকট আত্মীয়দের প্রতি দায়িত্ববোধ একটা বড় ব্যাপার। সেকুলারিজম বা মুক্তবুদ্ধির আন্দোলন অর্থনীতির ক্ষেত্রে গডকে বাদ দিয়ে চিন্তা করার রীতি চালু করল। যে পুঁজিবাদ চালু হয়েছে ৫০০ বছর আগে, তাও বাস্তবে এত নীতিহীন ছিল না। খ্রিস্টান নীতিবোধ তার ক্রিয়াকে 'মডারেট' করত। অবশ্য তারা সম্পূর্ণ প্রতিযোগিতাভিত্তিক মার্কেট চালু করেছিল। মুক্তবুদ্ধির আন্দোলনের আগ পর্যন্ত পুঁজিবাদের সেই ভয়াবহ চিত্র তৈরি হয়নি।

কিন্তু পুঁজিবাদ যখন সেকুলারিজমের (যার প্রকৃত অর্থ রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ধর্মবর্জনবাদ) সঙ্গী হলো, তখন ইউরোপে শ্রমিককে এমনভাবে শোষণ করা হলো, তাদের শুধু বেঁচে থাকার অবস্থায় রেখে দেয়া হলো; তাও শুধু উৎপাদনের স্বার্থে। পরে এর প্রতিক্রিয়াতেই কমিউনিজমের জন্ম হলো। সমাজতন্ত্রের উদ্ভব হলো। অর্থনীতির ক্ষেত্রে মুক্তবুদ্ধির মতবাদ বা সেকুলারিজম আরোপের ফল হলো এই, অর্থনীতির ক্ষেত্রে অমানবিকতা ও নীতিহীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল এবং বলা হলো, এটা হচ্ছে পজিটিভ সাইন্স; অর্থনীতি একটি অবমিশ্র বিজ্ঞান; এর মধ্যে নীতিবোধ থাকবে না, নীতি থাকবে না। যেমনভাবে বাতাস বা পানির জন্য আমরা কোনো নীতি দেই না, তেমনি অর্থনীতির কোনো নীতি থাকবে না। এটা নিজের গতিতে চলবে।



www.pathagar.com

এগুলোর পরিণাম অর্থনৈতিক সঙ্কট। এটা হয়েছে অতি লোভ ও অতি লোভের আকাঙ্ক্ষা থেকে এবং রিবা (সুদ) তাকে সাহায্য করেছে। সুদ না থাকলে এটা কখনোই হতো না।

আমি এ পর্যন্ত মুক্তবুদ্ধি আন্দোলন ও সেকুলার আন্দোলনের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করেছি। এর অন্য ফল হলো, মানুষ মুখে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, ভ্রাতৃত্বের কথা বলল; কিন্তু একই সাথে সেকুলার শিক্ষায় শিক্ষিত সন্তানরা দুনিয়া বিজয়ে বের হয়ে গেল। ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, জার্মানি, ইতালি, স্পেন, হল্যান্ড প্রায় সারা দুনিয়া দখল করে নিল। দুই আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, আফ্রিকার প্রায় ১০০ শতাংশ এবং এশিয়ার প্রায় ৭০ শতাংশ দখল হলো। তা করতে গিয়ে এরা পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হলো এবং ওই সব দেশের স্থানীয়দের সাথে পর্যন্ত যুদ্ধ করল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মুক্তবুদ্ধির অনুসারীরা সারা দুনিয়া জয় করল। তাদের নীতিহীনতা এই জয় এনে দিলো। কেননা কোনো নীতিবাদী সমাজ এভাবে পররাজ্য আক্রমণ করতে পারে না, দখল করতে পারে না। তারা লুট করল বিশ্বকে। আফ্রিকার মতো একটা সমৃদ্ধ মহাদেশকে তারা বিরান করে ফেলল। লোহাসহ নান ধরনের খনিজসম্পদ, স্বর্ণ, হীরা, সবকিছুই তারা লুট করে নিলো। দক্ষিণ আমেরিকাকে স্পেনীয়রা লুট করল। ব্রিটিশরা আমাদের বাংলাকে লুট করল, যেমন আফ্রিকাকে করা হয়েছে। লুটতরাজ ছিল তাদের আসল কাজ। তার মানে হচ্ছে, সেকুলারিজমভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থায় তৈরি হওয়া লোকেরা মানুষকে চরমভাবে শোষণ করল। তার পর তারা বলল, আমরা তাদের Civilise করেছি। যারা নিজেরা Uncivilised তারা অন্যকে কিভাবে Civilise করবে? তারা যখন বণিক হিসেবে মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে এসেছিল, তখন মুঘল সম্রাটের যে Culture, যে Refinement, যে Etiquette ছিল, তার ধারে কাছেও এ বণিকরা ছিল না। যা-ই হোক, আমি বলি, তাদের রাজনৈতিক আচরণটাই ছিল নীতিহীনতা। তারা পরস্পর মারামারি করল। ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড ভারতের দখল নিতে চেষ্টা করল। শেষে ইংল্যান্ড একাই অঞ্চলটা দখল করল। অনুরূপভাবে আমেরিকায় ফ্রান্স, ব্রিটেন ও স্পেনীয়রা লড়াই করল। অবশেষে দক্ষিণ আমেরিকা স্পেনের আওতায় গেল। উত্তর আমেরিকা গেল ব্রিটিশ আওতায়। আফ্রিকাতে ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি ও পর্তুগাল লড়াই করল। পর্তুগাল মোজাম্বিক এলাকা নিলো। ডাচরা সাউথ আফ্রিকাসহ কিছু এলাকা নিয়ে গেল। মাগরেব বা উত্তর আফ্রিকা নিলো ইতালি ও ফ্রান্স। ওমর মোখতারের ফিল্মে এর কাহিনী রয়েছে।

আমরা দেখতে পাচ্ছি, ধর্মকে বাদ দিয়ে যে মুক্তবুদ্ধির আন্দোলন করা হলো তার মাধ্যমে কী ধরনের লোক তৈরি হলো। তারা দুনিয়া দখল করে বেড়াল। লুটতরাজ করল। নিজেদের মধ্যে লড়াই করল। কিন্তু শান্তি আনল



www.pathagar.com

না। এর ফল হলো, তারা দুনিয়াকে শান্তি দিতে পারল না। তারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ করল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ করল। পাশ্চাত্য সভ্যতার গর্ভ থেকে চারটি অত্যন্ত ক্ষতিকর মতবাদের জন্ম হয়েছে। ফ্যাসিজম, কমিউনিজম, ক্যাপিটালিজম ও সেকুলারিজম। এগুলো হচ্ছে কেবল ডেমোক্র্যাসি ছাড়া তারা ভালো কিছু করতে পেরেছে বলে মনে হয় না।

স্রষ্টাকে যারা কোনো স্থান দিতে রাজি নয়, তারা পরিবার ও জেন্ডার ইস্যুতে পশুর মতো হয়ে গেল। তারা মনে করল, পরিবারের গুরুত্ব নেই। এটি হলো নারীদের দাবিয়ে রাখার একটি প্রতিষ্ঠান তাদের দাস বানানোর জন্য। তারা বরং পশুর মতো থাকাই ভালো মনে করল। পরিবার করার কোনো প্রয়োজন নেই। তারপর যদি কেউ পরিবার গঠন করেও, তবে এটা হবে সন্তান জন্মদানের জন্য। তা পশুর মতোই হবে। এমনও হতে পারে, একটা কমিউন হবে। সে কমিউনে ১০০ জন পুরুষ ও ১০০ জন নারী থাকবে। কার শিশু কেউ জানবে না। সবাই মিলে শিশুদের পালবে। তারা এমন একটা ধারণাও নিয়ে এলো যে, তত দিন পর্যন্ত একটা পশু তার বাচ্চা পালে, যত দিন পর্যন্ত নিজের খাবারটা নিজে খেতে না পারে। তত দিন পর্যন্ত বাঘও পালে, কুকুরও পালন করে যত দিন পর্যন্ত বাচ্চা নিজের পায়ে দাঁড়াতে না পারে। মানুষকেও তাই করতে হবে। মনোভাব এমন, 'কেন ৩০ বছর পর্যন্ত খাটব আমি? কেন আমি ত্যাগ স্বীকার করব? সন্তান জন্ম নিয়েছে এবং প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে; সে এখন বড় হয়েছে। সে নিজের কাজ করে বেড়াক। আমার কোনো দায়িত্ব নেই। আমার স্বার্থ কেন ত্যাগ করব? আমি কেন আমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বাদ দেবো?' সুতরাং পরিবারের যে বর্তমান দুর্দশা সেটা অনেকটা সেকুলার মতাদর্শের কারণেই। আরো খারাপ হতে পারত, কিন্তু খ্রিস্টবাদের যেটুকু প্রভাব এখনো রয়েছে, তার জন্য অতটা হয়নি। যতটা ভালো থাকল, তা সম্পূর্ণভাবে খ্রিস্টান মতাদর্শের কারণে। আর যতটা মন্দ হলো তা এই মুক্তবুদ্ধির আন্দোলনের কারণে; জীবন ও নৈতিকতাকে আলাদা করার সেকুলার মতাদর্শের কারণে।

এর সমাধান কী? আমার জানা মতে, দু'ভাবে এর সমাধান হতে পারে। একটা হলো, মুসলিম হিসেবে আমরা আল্লাহর কাছে, তাঁর নির্দেশনার দিকে যাই বা নিজেদেরকে সোপর্দ করি। সব সমস্যার মূল কারণ হচ্ছে মুক্তবুদ্ধির মিথ্যা দর্শন। তাদের কথা হচ্ছে, গডকে বাদ দাও। অথচ তাকেই সবচেয়ে কাছে রাখতে হবে। তাকে সব সময় অবলম্বন করতে হবে। তাঁর ওপর আস্থা রেখেই জীবনযাপন করতে হবে। তার কাছে আমরা সব দিক দিয়ে আবদ্ধ, দায়বদ্ধ। তাকে বাদ দেয়া চলবে না। এটা হলো মুসলিম হিসেবে আমাদের বক্তব্য। হিন্দু হিসেবে যদি কেউ বলে, তাহলে বলতে হবে স্রষ্টার দিকে যাওয়া, নৈতিকতার দিকে, ধর্মের দিকে ফিরে যাওয়া। তাই সমাধান হিসেবে বলছি,



www.pathagar.com

যেভাবেই হোক, মানুষকে নৈতিক শিক্ষা ফিরিয়ে আনতে হবে। নৈতিক শিক্ষার জন্য ধর্ম ছাড়া আর কোনো ভিত্তি নেই।

মুসলিম দেশে ইসলামকে ভিত্তি করতে হবে এবং অমুসলিমদের বিকল্প থাকবে। অমুসলিমদের দেশে তাদের ধর্মকে কেন্দ্র করে তাদের নৈতিকতার ভিত্তিতে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। সেখানে মুসলিমদের জন্য বিকল্প থাকবে বলে আশা করি।

এভাবে যদি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে ওঠে, তবে আশা করা যায়, ভালো মানুষ তৈরি হওয়া শুরু হবে। ভালো লোক তৈরি হলে সবক্ষেত্রে ভালো আসবে। সব ক্ষেত্রেই ভালো লোক তৈরি হবে। রাজনীতি, অর্থনীতি, পরিবার - সব ক্ষেত্রে। কেবল থিওরি দিলেই কিছু হবে না। আর আমার কথাতেই সব কিছু বদলে যাবে না। তবে মানবতাকে পুনরুদ্ধারের কাজ তো শুরু করতে হবে। এ কথাও আমরা জানি অসম্ভব বলে কিছু নেই।

প্রাসঙ্গিক আরো কিছু কথা বলা প্রয়োজন। বিজ্ঞানের বিরোধী ছিল বলে খ্রিস্টিয়ান চার্চের বিরুদ্ধে বক্তব্য, এটা কতটা প্রপাগাণ্ডা আর কতটা সত্য জানি না। এটা খতিয়ে দেখতে হবে। যদি এরকম কিছু হয়ে থাকে, তাহলে তা ভুল ছিল। চীন ও ভারতে বিজ্ঞান অনেক উৎকর্ষ লাভ করেছে। এখানে বিজ্ঞানীদের কখনো বিরক্ত করা হয়নি।

মুসলিমদের হাতে বিজ্ঞান উৎকর্ষ লাভ করেছে। মুসলিম ইতিহাসে বিজ্ঞানীদের ওপর কোনো অত্যাচার হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। খ্রিস্টবাদের মধ্যযুগে যেটা হয়েছে, তাকে Generalize করা মোটেও ঠিক হবে না। কে বলতে পারবে যেকোনো আন্দোলন - সেটা কমিউনিস্ট হোক, গণতান্ত্রিক হোক তার মধ্যে কোনো ত্রুটি হয়নি? খ্রিস্টবাদকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে দেয়া তাদের অতি প্রতিক্রিয়া। তারা শুধু বলতে পারত, 'এটা ঠিক না; এটা দেয়া যাবে না। বিজ্ঞানকে নিজের পথে চলতে দিতে হবে।'

এখানে উল্লেখ করতে চাই ইসমাইল আল রাজীর বই তওহীদ-এ উল্লিখিত মন্তব্যের কথা। তিনি বলেছেন, God is not against science, God is the condition of science, not an enemy of science। আল্লাহ আছেন বলেই তিনি একটা শৃঙ্খলা স্থাপন করেছেন। এটা আছে বলেই বিজ্ঞানের সূত্র বের করা সম্ভব হয়েছে। আল্লাহ না থাকলে কোনো শৃঙ্খলা থাকত না, কোনো বিজ্ঞানও সৃষ্টি হতো না।

বিজ্ঞানের কারণে যে উন্নয়ন হয়েছে কোনো ধর্ম তাতে হস্তক্ষেপ করেনি। খ্রিস্টিয়ান ইউরোপে যে দুই-একটা উদাহরণ পাওয়া যায়, সেটাকে তাদের ভুল বলে গণ্য করতে পারি। কিন্তু খ্রিস্টান নেতৃত্ব বা পোপরা কেউই বিজ্ঞানের বিরোধী নন। আমরা বুঝতে পারি যে, মানবজাতি ছিল মূলত ধার্মিক, সেটাকে



www.pathagar.com

সেকুলাররা সেকুলারমনা করে দেয়। তাদের আবার ধার্মিকমনা করতে হবে। ইসলামিমনা করতে হবে। ধার্মিক মন ও সেকুলার মনের মধ্যে পার্থক্য কী? ইসলামি মন হচ্ছে, সেই মন যেকোনো সমস্যা হলে যার এ সমাধান খুঁজে কুরআন ও সুন্নাহতে। তারপর অন্যান্য দিকে। অন্য দিকে, সেকুলার মন চিন্তা করে না আল্লাহর কিতাবে কী আছে? সে ভাবে, আমাদের যুক্তিবাদী পণ্ডিতরা কী বলেছেন; রাজনৈতিক পণ্ডিতরা কী বলেছেন বা রাশিয়া, চীন, আমেরিকা, কানাডা কী করেছে। তারা দুনিয়াকে ধার্মিকমন থেকে সেকুলার মনে নিয়ে গেল। তাই আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে সারা দুনিয়াকে একটা নৈতিক ছকে নিয়ে আসা; ধার্মিক মনকে ফিরিয়ে আনা।

'সেকুলার' শব্দটির ব্যবহার হয়েছে মুক্তবুদ্ধি আন্দোলনের পরে, উনবিংশ শতাব্দী থেকে। মুক্তবুদ্ধির ধারণা গ্রহণ করে পুরো শিক্ষিতসমাজ মোটামুটি সেকুলার হয়ে গেছে। আমাদের অসংখ্য লোক নামাজি, আবার সেকুলার। তারা সমস্যার সমাধান ইসলামে খোঁজেন না। এসব সেকুলার মনকে ইসলামি মনে পরিবর্তন করতে হবে। এ জন্য তাদের কিছু মৌলিক বই পড়াতে হবে। এ ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। আশা করি, যথাযোগ্য চেষ্টা করলে আমরা সাফল্য লাভ করব, ইনশাআল্লাহ।



www.pathagar.com

# শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট
# সব ধর্মীয় শিক্ষার অবমূল্যায়ন প্রধান বৈশিষ্ট্য

জাতীয় শিক্ষানীতির চূড়ান্ত খসড়ার সাধারণ দিকগুলো যেমন: প্রকৌশল শিক্ষা, চিকিৎসা, তথ্য-প্রযুক্তি, নারী শিক্ষা, ব্যবসায় শিক্ষা, কৃষি শিক্ষা আইন শিক্ষা, ললিতকলা শিক্ষা অথবা গ্রন্থাগার শিক্ষা সম্পর্কে এ মুহূর্তে আমার কোনো মন্তব্য নেই। এগুলো সব শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত থাকে। এগুলো টেকনিক্যাল বিষয়, যা নিয়ে খুব বেশি মতবিরোধ হয় না। এ ক্ষেত্রে চলমান শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট খুব বেশি ভিন্ন নয়। তবে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও মাদরাসা শিক্ষা এবং রিপোর্টের সংশ্লিষ্ট সংযোজনী ২ ও ৩ নিয়ে কথা বলার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এখানেই শিক্ষা কমিশন তাদের মূল পরিবর্তন করেছে। এখানে তাদের লক্ষ্য স্পষ্ট নয়। যে কাজটি তারা করেছেন, তা হচ্ছে রিপোর্টে তারা প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও মাদরাসা শিক্ষায় ধর্মকে 'ডাউন গ্রেড' করেছেন। ধর্মের গুরুত্ব কমিয়ে এনেছেন। এটা যেমন মুসলমানদের ক্ষেত্রে সত্য, তেমনি অন্য ধর্মের লোকেরাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

এভাবে ধর্মকে বিশেষ করে ইসলামকে অবহেলা করা বর্তমান সংবিধানের প্রধানতম মূলনীতি 'স্রষ্টার প্রতি অবিচল আস্থা'র লঙ্ঘন। এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, ধর্ম হচ্ছে অতীতকাল থেকে জীবন, সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল ভিত্তি। টেকনিক্যাল শিক্ষা দ্বারা মনুষ্যত্ববোধ সমৃদ্ধ হতে পারে না। এসব শিক্ষা মূলত আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য দরকার। মানুষ যেন ভিক্ষুক না হয়, পরমুখাপেক্ষী না হয় সেজন্য টেকনিক্যাল শিক্ষা দরকার। কিন্তু মানুষের মনুষ্যত্ববোধ সৃষ্টি ও তা বিকাশের জন্য দরকার ধর্মীয় শিক্ষা। এ কথা সব ধর্ম ও জাতির ক্ষেত্রে সত্য।

আমি লক্ষ্য করেছি, রিপোর্টের ভূমিকায় 'অসাম্প্রদায়িকতা'র কথা বলা হয়েছে। ধর্ম শিক্ষার কথা বলা হয়নি। 'অসাম্প্রদায়িকতা ও 'বিজ্ঞানমনস্ক' এ শব্দগুলো একটি বিশেষ মহলের রাজনৈতিক পরিভাষা। এসব তাৎপর্যহীন ব্যবহার নয়।

সবচেয়ে বড় পরিবর্তন আনা হয়েছে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও মাদরাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ধর্ম শিক্ষাকে ঐচ্ছিক করা হয়েছে। অথচ



www.pathagar.com

ধর্মশিক্ষা ১৯৭২ সাল থেকে আবশ্যিক ছিল। এমনকি মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের সময় ড. কুদরৎ-ই-খুদার শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে উল্লেখ করা হলেও তিনি তা আমলে নেননি, তিনি ধর্মের প্রতি অনীহা পছন্দ করেননি।

নবম ও দশম শ্রেণিতে দেখা যায়, আরবি বা ধর্ম নেয়া যাবে অন্য আটটি বিষয়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে। কিন্তু আমরা সবাই জানি, আরবি শিক্ষা ও ধর্ম শিক্ষা এক নয়। আরবি শিক্ষা কেবল একটি ভাষা। এখানে আরবিকে কৃষি, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, ভুগোল, হিসাববিজ্ঞান এসবের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হবে। নবম ও দশম শ্রেণিতে মানবিক শাখায় ১১টি বিষয়ের মধ্যে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা ঐচ্ছিক হিসেবে নেয়া যাবে। অথবা এর পরিবর্তে আরবি, সংস্কৃত অথবা পালির যে কোনো একটি নেয়া যাবে। অর্থাৎ ধর্ম কিংবা আরবি নেয়া যাবে আরো নয়টি বিষয়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে। যার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হবে তার মধ্যে রয়েছে উচ্চতর বাংলা, উচ্চতর ইংরেজি, অর্থনীতি, কৃষিশিক্ষা ইত্যাদি। এসবের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ধর্মশিক্ষা ঐচ্ছিক হিসেবে শিক্ষার্থীরা নেবে কি না তা অনিশ্চিত থেকে যাবে।

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতেও একই অবস্থা। ধর্ম এখানে ঐচ্ছিক বিষয়। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দশটি বিষয়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে আরবি, সংস্কৃত কিংবা পালির মধ্য থেকে একটি নেয়া যাবে। মানবিকের ক্ষেত্রে এজন্য প্রতিযোগিতা করতে হবে ১৬টি ঐচ্ছিকের মধ্যে। একই সঙ্গে ব্যবসা শিক্ষায় ৯টি বিষয়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে আরবি, পালি কিংবা সংস্কৃতের একটি নেয়া যাবে।

মাদরাসা শিক্ষায় ইসলামী শিক্ষার জন্য থাকবে এক হাজার নম্বরের মধ্যে মাত্র তিনশ' নম্বর। এ ছাড়া ঐচ্ছিক হিসেবে ১৯টি বিষয়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে আল হাদিস কিংবা ফিকাহ নিতে পারবে। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত মাত্র চারশ' নম্বরের ইসলামী শিক্ষা পড়তে পারবে, যা বর্তমানে এগারোশ' নম্বরের মধ্যে সাতশ' নম্বরের রয়েছে। মাদরাসার প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে থাকবে ১০০ নম্বরের আরবি, ধর্ম শিক্ষা নয়। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণিতে থাকবে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা ১০০ নম্বর এবং অন্যান্য ইসলামী বিষয় মিলে এক হাজারের মধ্যে মাত্র ৪০০ নম্বর। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ইসলামী বিষয় থাকবে মাত্র ৪০০ নম্বরের। এ সবই আগের তুলনায় অনেক কম।

লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, মাদরাসা শিক্ষায় ইসলামী বিষয় কমে যাচ্ছে, যা শিক্ষার্থীদের ফাজিল ও কামিলের জন্য উপযুক্ত করবে না। তাদের বড় আলিম হওয়ার সম্ভাবনা রুদ্ধ হবে। তাদের সাধারণ শিক্ষার দিকে চলে যেতে হবে। এক পর্যায়ে ফাজিল ও কামিল থাকার যুক্তি থাকবে না। যেহেতু এসব শিক্ষার্থীরা সাধারণ শিক্ষার দিকে চলে যাবে, সেহেতু এক সময়ে মাধ্যমিক পর্যায়ও তুলে দেয়ার দাবি উঠবে। আর তখন মাদরাসা ও সাধারণ মাধ্যমিক এক করে দেয়ার চিন্তা করার সুযোগ সৃষ্টি হবে।



www.pathagar.com

১৭৮৭ সালের দিকে লর্ড হেস্টিংসের সময়েই মাদরাসা শিক্ষা শুরু হয়। আর বর্তমান কওমি মাদরাসার শিক্ষা শুরু হয় ১৮৬৫ সালে দেওবন্দ মাদরাসা প্রতিষ্ঠার পর থেকে।

সাধারণ শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে ১০০ নম্বর ধর্মীয় শিক্ষা আছে, যা শেখানো হবে গল্প ও জীবনীর মাধ্যমে। অর্থাৎ এটাও ধর্মীয় শিক্ষার পদ্ধতি নয়। দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত ধর্ম শিক্ষা নেই। অথচ সাধারণ শিক্ষায় ললিতকলাকে আবশ্যিক করা হয়েছে। এটা তারা কীভাবে করতে চান, তা আমি বুঝতে অক্ষম।

প্রস্তাবিত শিক্ষা রিপোর্টে ধর্ম শিক্ষা খুব সামান্য। কিন্তু ধর্মই হলো মানুষের বিশ্বাসের মৌলিক বিষয়। এর মাধ্যমেই মানবিক গুণাবলি অর্জিত হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষা কমিশনের বিভ্রান্তি ভালো চিন্তার ফল বলে মনে করা যায় না। আমি কমিশন ও সরকারের কাছে আবেদন জানাতে চাই, ধর্ম শিক্ষাকে মাধ্যমিক পর্যায়ে ঐচ্ছিক করা গ্রহণযোগ্য নয়। এটাকে আবশ্যিক করতে হবে। তেমনিভাবে মাদরাসা শিক্ষার ইসলামী শিক্ষা অংশ কমানো অগ্রহণযোগ্য। আশা করি, কমিশন এ বিষয়ে কোনো জটিলতা তৈরি করবে না। তারা এ দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষের (তা সে যে ধর্মেরই হোক) প্রাত্যহিক জীবনের ধর্মীয় অনুশাসন সম্পর্কে জানার বিষয়ে বাধা সৃষ্টি করবে না। কোনো স্বনির্ভর দেশেও ধর্মকে এভাবে অবহেলা করা হচ্ছে না। বিশেষ করে মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ কমাতে ও মানবিক মূল্যবোধ বাড়াতে ধর্মীয় মূল্যবোধ শিক্ষার বিকল্প নেই। নৈতিক শিক্ষা ধর্মের ভিত্তি ছাড়া দেয়া যায় এর কোনো প্রমাণ নেই।

পাশ্চাত্যে যৌন জীবনে, পারিবারিক জীবনে যে বিশৃঙ্খলা এবং অর্থনৈতিক জীবনে যে চরম স্বার্থপরতা তার সবকিছুর পেছনে রয়েছে ধর্মকে অবহেলা করা। যে কাজ শেখ মুজিবুর রহমান করেননি, সে কাজ এ সরকারের করা ঠিক হবে না। দেশের সাধারণ মানুষ তা ভালোভাবে নেবে না।



www.pathagar.com

# সাংবাদিকদের পাঠাভ্যাস জরুরি

বাংলাদেশের সংবাদপত্র সম্পর্কে আমার ধারণা কেন জানি খুব ভালো নয়। বিশেষ করে দৈনিক পত্রিকাগুলো পড়ে আমি কখনো খুব স্বস্তিবোধ করিনি। অল্প বয়সে এটা আমি বুঝিনি। ছোটবেলা থেকেই আমার রাজনৈতিক সংস্পর্শ ছিল। ফলে খুব একটা বাছ-বিচার করতে পেরেছি বলা যায় না। তখন যদি আমার দলের সমর্থনে কোনো লেখা লিখত তাহলে খুব ভালো লাগত। বিরুদ্ধে লিখলে খারাপ বোধ করতাম। কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে সংবাদপত্র সম্পর্কে ধারণার পরিবর্তন হয়।

সংবাদ ও সংবাদ পরিবেশনই সংবাদপত্রের মূল দিক। এটা দেশে-বিদেশে যেকোনো সংবাদপত্রের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু সেটা সবসময়ই মনে হয়েছে পক্ষপাতমূলক। রাজনৈতিক খবর হলে একেবারেই পক্ষপাতমূলক। অন্যান্য খবরের প্রায় ক্ষেত্রে মনে হয়েছে পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার জড়িত। যেমন–কোনো সরকারি কর্মচারীর ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত নিউজ করা হচ্ছে কিংবা কোনো দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তার বিষয়টি ব্যক্তিগত পছন্দের কারণে নিউজ হচ্ছে না। এখানে সরকারি কর্মচারীদের সম্পর্কে একটি কথা বলতে চাই, তারা যেহেতু সরকারি রুলসের আওতায় নিজেদের আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারেন না, প্রেস কনফারেন্স করতে পারেন না, কথায় কথায় বিবৃতি দিতে পারেন না–তাদের বিবৃতি দিতে গেলে একটি অনুমতি লাগে, ফলে সরকারি কর্মচারীদের ব্যাপারে তাদের দোষত্রুটি যাই হোক না কেন, তা খুব অনুসন্ধান না করে লেখা উচিত নয়। তারা তো তাদের সীমাবদ্ধতার কারণে সেভাবে উত্তর দিতে পারবেন না। আমি সরকারি কর্মচারী ছিলাম বলে জিনিসটা একটু বেশি বুঝি। যাই হোক, রাজনৈতিক খবরের ক্ষেত্রে আমার বয়স হওয়ার পর থেকে সংবাদপত্রে একপেশে খবর পেয়েছি, কোনো পত্রিকায় একটু বেশি কোনো পত্রিকায় একটু কম। কিন্তু যাকে সন্তোষজনক বলা হয় তা আমি পাইনি। খবরের মধ্যে অনেক অর্থনৈতিক খবর থাকে। সেখানে দেখি কিছু খবর ছাড়া বেশির ভাগই হালকা এবং কাঁচা, গভীর নয়। সেসব খবর অন্তর্নিহিত কারণে না পৌঁছে শুধু লেখার জন্য লেখা। কারো কাছ থেকে কিছু শুনলাম বা কিছু একটা ধারণা আছে, লিখে দিলাম। সেগুলো অগভীর, দুর্বল, হালকা। অন্যান্য রিপোর্টের ক্ষেত্রেও বাড়িয়ে বলা বা কমিয়ে বলার প্রবণতা আছে।


www.pathagar.com

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এগুলো হচ্ছে কেন? এগুলো হচ্ছে প্রধানত সাংবাদিকদের জন্য। কেউ হয়তো তর্ক করে বলবে, মালিকদের জন্য। মালিকরা এডিটরিয়াল পলিসি নিয়ন্ত্রণ করতে চান। তারা সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক সুরেও কথা বলেন। একেকজন একেক দলের পক্ষে কথা বলবেন। এটা হতে পারে। কিন্তু মালিকরা তো আর সবকিছু বলে দেন না। মালিকের দোষ থাকলেও আমার মনে হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দায়িত্ব সাংবাদিকের। ব্যতিক্রম তো আছেই। এজন্য আমি বলব, সাংবাদিকদের মনোগঠন, শিক্ষা, পড়াশোনা, জানাশোনা হচ্ছে আসল বিষয়, যা সংবাদপত্রের বর্তমান অবস্থার পেছনে আসল কারণ। আর তা-ই যদি হয় তার জন্য এটা অত্যন্ত জরুরি যে সংবাদপত্রে যোগ্য শিক্ষিত লোকেরাই আসবেন। আমি এটা মেনেই নিচ্ছি যে বর্তমানে শিক্ষিত লোকেরাই সাংবাদিকতার পেশায় নিয়োজিত আছেন। তাদের ডিগ্রিও আছে; কিন্তু আমাদের দেশের সব ডিগ্রিই যে খুব উঁচুমানের তা বলা যাচ্ছে না। এখানে কিছু ক্ষেত্র ছাড়া লেখাপড়ার মানও খুব একটা ভালো নয়। কাজেই শুধু ডিগ্রি হলেই যে কোনো ব্যক্তি জানে তা বলা যায় না। তাই নিজের পড়াশোনা বা জানাশোনার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না। এটা সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে আরো বেশি প্রযোজ্য।

সাংবাদিককে যদি দেশ, জাতি, সম্প্রদায়, বিবেকের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে হয় তাহলে তাকে অবশ্যই জানতে হবে, অনেক কিছু জানতে হবে এবং গভীরভাবে জানতে হবে। কী কী তার জন্য পড়া প্রয়োজন, কী কী না পড়লে সংবাদপত্রের সার্বিক মান ও দায়িত্বশীলতা আসবে না, কী কী পড়লে আসবে তা জানতে হবে। এর জন্য সাংবাদিকতার টেক্সট বইয়ের জ্ঞান তার থাকা উচিত। বেশির ভাগ পুরনো সাংবাদিকই জার্নালিজম পড়ে আসেননি। বর্তমানে জার্নালিজম পড়া সাংবাদিক বাড়ছে। দু ধরনের ব্যক্তির মধ্যে তো কিছু পার্থক্য আছেই। কাজেই যারা জার্নালিজম ডিগ্রি নিয়ে আসেননি তাদের সংখ্যাই বেশি, তাদেরই জন্য জরুরি জার্নালিজম সম্পর্কিত টেকনিক্যাল নলেজ জেনে নেয়া। বিশেষ করে জার্নালিজমের এথিকস বা সাংবাদিকতার নীতিবোধ ভালো করে তাদের জানতে হবে। এ সংক্রান্ত বইগুলো একবার নয়, কয়েকবার মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে। সম্ভব হলে আত্মস্থ করতে হবে।

আমার মনে হয় যারা জার্নালিজম পড়েন তাদের অনেক রিলেটেড বিষয়, টেকনিক্যাল-ননটেকনিক্যাল বিষয় পড়তে হয়। কিন্তু আমি মনে করি, ভালো সাংবাদিক হতে গেলে তাকে ইতিহাস ভালো করে পড়তে হবে; সমাজ ও সংস্কৃতি ভালো করে জানতে হবে। ইতিহাস ভালো করে জানলে একজন সাংবাদিক আধুনিক ঘটনাকে ভালোভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবেন; ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ ভালো করে করতে পারবেন। এতে তিনি একজন ভালো এডিটর হতে পারবেন; ভালো পোস্ট লিখতে পারবেন; ভালো বিশ্লেষণ করতে পারবেন। কাজেই ইতিহাস জানা উচিত এবং ভালোভাবে নিরপেক্ষ ইতিহাস জানা উচিত।



www.pathagar.com

পক্ষপাতমূলক লেখকের বই পড়ে ইতিহাস জানা ঠিক হবে না। আওরঙ্গজেবকে যারা খুব বিরুদ্ধাচরণ করে লিখেছেন তাদের লেখা দ্বারা আওরঙ্গজেবের মূল্যায়ন করা ঠিক হবে না। আবার আকবরকে পূজা করেন এমন লেখকের বই পড়ে আকবরকে বোঝা ঠিক হবে না। বিভিন্ন বই পড়তে হবে। তবে ইতিহাস যদি স্বীকৃত ঐতিহাসিকদের বই থেকে পড়া হয় তাহলে ভালো।

সাংবাদিকদের সমাজ এবং সংস্কৃতিকে জানতে হবে। এগুলো জানলে বোঝা যাবে সমাজের কম্পোনেন্টস কারা কারা; কোন বিষয়ে তাদের আবেগ আহত হয়; কোন বিষয়গুলো স্পর্শকাতর; লোকেরা কোন বিষয়ে আহত হয়, উদ্বেলিত হয়। তাহলে আমরা সমাজের দ্বন্দ্ব এড়াতে পারব। কোন কথা বললে দ্বন্দ্ব বাড়বে তা বুঝতে পারব। শান্তি ও সমঝোতার পক্ষে কাজ করতে পারব। এর জন্য সংস্কৃতিতেও গভীর পড়াশোনা দরকার। সমাজকে জানা দরকার। সেই সাথে সমাজতত্ত্বকেও বোঝা দরকার। এর দ্বারা সমাজের গভীরতর দিকগুলো, সমাজের মানসিকতা, জনগণের মানসিকতা ও সমাজের বিভিন্ন প্রপঞ্চ (social phenomena) ভালো করে জানা যাবে।

সাংবাদিকদের বিশেষভাবে ধর্মকে ভালো করে জানা দরকার। কারণ, সমাজ-সংস্কৃতি বিনির্মাণের পেছনে মূল শক্তি হচ্ছে ধর্ম। কী কী উপাদানে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তা নিয়ে যত তর্ক করা হোক না কেন, যতই গভীরে যাব ততই দেখব সংস্কৃতির পেছনে মূল শক্তি হচ্ছে ধর্ম। মুসলিমদের ক্ষেত্রে ইসলাম, হিন্দুদের ক্ষেত্রে হিন্দু ধর্ম, খ্রিস্টানদের ক্ষেত্রে খ্রিস্ট ধর্ম। সুতরাং বাংলাদেশের সাংবাদিকদের জন্য এটা অত্যন্ত জরুরি যে পলিটিক্স দ্বারা প্রভাবিত ও পক্ষপাতদুষ্ট না হয়ে বাংলাদেশের ৯০ ভাগ লোকের যে ধর্ম, যে আদর্শ-বিশ্বাস সে সম্পর্কে তথা ইসলাম সম্পর্কে গভীরভাব জানা। আর তা না জানলে তিনি সমাজকে ধারণ করতে পারবেন না। সাময়িকভাবে কিছু দেশি-বিদেশি শক্তি ও সংগঠনকে খুশি করতে পারবেন; কিন্তু সমাজকে তিনি খুশি করতে পারবেন না। সমাজের কাছে তিনি যেতে পারবেন না। সমাজ তাকে গ্রহণ করবে না। সাময়িকভাবে তার মনে হবে যে তিনি বিজয়ী কিন্তু আসলে তিনি পরাজিত। এটা অত্যন্ত জরুরি যে ইসলাম, ইসলামের ইতিহাস, এর মূল গ্রন্থ কুরআন, এর মূল চরিত্র মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামসহ অন্যান্য যেসব দিক– সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, এর শিক্ষাবলী তাকে জানতে হবে। একই সঙ্গে অন্যান্য ধর্মকেও ভালো করে জানা প্রয়োজন। বাংলাদেশে যারা সংবাপত্রে কাজ করবেন তারা বিশেষ করে হিন্দু ধর্ম, যা প্রায় ১০ ভাগ লোকের ধর্ম, ভালো করে না জানলে তা খুবই ভুল হবে। তারা সেটা ভালো করে জানলে এ সমাজে তাদের প্রতি অবিচার হবে না; তাদের অনুভূতি বুঝতে সাহায্য হবে; তাদের দৈনন্দিন সমস্যা, দুঃখ-বেদনা বুঝতে সাহায্য করবে। কাউকে অকারণে আঘাত দেয়া কখনো কল্যাণকর হতে পারে না। এটা তো যুদ্ধক্ষেত্র নয় যে, একে অপরকে আঘাত দিতে হবে। কোন কথা বলা ঠিক নয়, কোন কথা বললে



www.pathagar.com

অকারণে কষ্ট দেয়া হবে অথচ আমার বা আমার ধর্মের কোনো লাভ হবে না সেটা আমাদের মনে রাখতে হবে।

আমাদের সাংবাদিকদেরকে শিক্ষিত লোক হতে হবে। আমি যখন ইকোনমিস্ট পড়ি তখন দেখি প্রত্যেক ব্যক্তিই অতি শিক্ষিত। আমাদের অতি শিক্ষিত না হোক, শিক্ষিত তো হতে হবে। এখানে আমাদেরকে স্ব-শিক্ষিতই হতে হবে। কেননা, সব বিষয়ই তো আমরা ইউনিভার্সিটিতে পড়িনি। একটি বা কিছু বিষয় পড়তে হয়েছে। তাই সংবাদপত্র যদি সমাজের দর্পণ হয়ে থাকে বা তাকে যদি সমাজের দর্পণ হতে হয় তাহলে সাংবাদিকদেরও তো সে আয়না হতে হবে। আর সাংবাদিকরা যদি না পড়েন তাহলে আয়না হবেন কিভাবে? তাই বাংলাদেশের সংবাদপত্রকে গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা যদি আমাদের হয় তাহলে এসব বিষয়ের দিকে নজর দিতে হবে।

একজন রিপোর্টারের রিপোর্টের সাথে পড়ার সম্পর্কটি এ রকম যে, যদি তার জার্নালিজমের এথিকস ভালো করে জানা থাকে এমনকি রিলিজিয়াস এথিকসও, তাহলে রিপোর্টিংয়ে তিনি যাই ঘটেছে তা-ই বলবেন; অন্যায় পক্ষ নেবেন না। এথিকস ভালো করে জানা না থাকলে, এমনকি আবার সেই একই কথা ধর্ম সম্পর্কে ভালো জানা না থাকলে নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পর্কে ভালো জানা না থাকলে তিনি তার রিপোর্টিংয়ে পরিবর্তন করবেন তার ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের দ্বারা। আর পড়া থাকলে এ রকম হবে না। তখন নিরপেক্ষ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ইসলামিস্ট পত্রিকাগুলোর ক্ষেত্রেও এ বিষয়গুলো প্রযোজ্য। তাদেরও ধর্মের গভীর বিষয়গুলো দেখতে হবে। কুরআনে বলা হয়েছে, 'তোমরা সত্যকে মিথ্যা দ্বারা আবৃত করো না।' কাজেই নিজেদের বিরুদ্ধে গেলেও জাস্টিস করতে হবে, জানতে হবে। এখানে আত্মস্থ করার প্রশ্ন আছে। রিপোর্টিংয়ের আরেকটি দিক হচ্ছে, ঘটনা সম্পর্কে বুঝতেও সাহায্য করবে, যদি সে সম্পর্কে সব তথ্য তার জানা থাকে। যেমন–কোনো দলের রিপোর্টিং করতে গেলে যদি সে দল সম্পর্কে সব জানা থাকে তাহলে সে সম্পর্কিত ঘটনা বর্ণনায় তা সাহায্য করবে। তাই রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে বেশি করে এথিকস ও মোরালিটি বিশেষভাবে জড়িত। এখানে এথিকস গুরুত্বপূর্ণ।

আবার অর্থনৈতিক রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে অর্থনীতি না জানলে একেবারেই হবে না। একেবারে সরাসরি ঘটনা যেমন–ছিনতাই ঘটনার রিপোর্টের জন্য অতটা বিদ্যা জানা জরুরি না হলেও তার জন্য এথিকস জানতে হবে; কিন্তু অর্থনৈতিক রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে অর্থনীতি জানা একেবারেই জরুরি–মুদ্রানীতি, মুদ্রাস্ফিতি, ব্যাংকিং প্রভৃতি ভালো করে জানতে হবে। রিপোর্টারকে অনেক সময় মতামত ব্যক্ত করতে হয়; কিন্তু বিষয় সম্পর্কে ভালো না জানা থাকলে কিভাবে তিনি মন্তব্য করবেন। ফলে জ্ঞানের প্রয়োজন।



www.pathagar.com

ওভার অল জ্ঞান থাকলে একজন রিপোর্টারের রিপোর্টে গভীরতা আসবেই; কিন্তু এর কারণ কী, তা ঠিক বুঝিয়ে বলাও যাবে না। চারদিকের জ্ঞান যখন সে অর্জন করবে তার রিপোর্টে অন্য সাবজেক্টেরও একটা প্রভাব চলে আসবে। অন্য সাবজেক্ট তাকে এমন একটা অ্যাঙ্গেল এনে দেবে, যা না হলে হতো না। আমি দেখেছি পাঁচটা নতুন বই পড়ার পর যদি কোনো বক্তৃতা দিই তখন আমার বক্তৃতা কিছুটা পরিবর্তন হয়ে যায়। তখন বোঝা যায় এই নতুন পাঁচটা বই আমাকে প্রভাবিত করেছে। এটা আমার নিজের বেলায় প্রায়ই ঘটে। তা হলে রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রেও তা-ই হবে। যতই তিনি পড়বেন ততই তার লেখায় সাবধানতা আসবে, গভীরতা আসবে; ব্যাপারটি ঠিক অঙ্ক করে দেখানো যাবে না।

আমি একটি দৈনিকের এডিটরিয়ালে কিছু দিন লিখেছি। সেখানে আমি নানা দিক নিয়ে লিখতে পেরেছি। সামাজিক, অর্থনৈতিক, আন্তর্জাতিক, ধর্ম সব ধরনের বিষয়ের উপর লিখতে পারলাম কী করে? এটা পারলাম যেহেতু আমার সব ধরনের পড়াশোনা ছিল। আমি একটা বই পড়িনি, প্রত্যেক বিষয়ের উপর অনেক বই পড়েছি। তাই আমার পড়াশোনা যদি ব্যাপক হয় তাহলে আমি যে কোনো বিষয়ে বিচরণ করতে পারব। সুতরাং যদি দেশে এ রকম সাংবাদিক বাড়ে তাহলে তার মান বাড়বে। আর যদি তিনি এথিক্যাল হন তাহলে অনেক উচ্চ মর্যাদা পাবেন। তাকে গণ্য করা হবে। ঐ সাংবাদিক সম্পর্কে বলা হবে যে তিনি বানিয়ে বলেন না। আর যদি মিথ্যা বলেন তাহলে তার মর্যাদা অবশ্যই অন্যরকম হয়ে যাবে। কিন্তু মানতে হচ্ছে, এ রকম সাংবাদিক আমাদের দেশে দুর্ভাগ্যজনকভাবে কম হয়েছে। নাম বলা অন্যায় হবে, কিন্তু পাকিস্তান আমলে অনেক সিনিয়র সাংবাদিককেও দেখা গেছে রাজনীতিতে পক্ষপাত করতে। তারাও একপেশে ছিলেন। পোস্টের ক্ষেত্রে অনেকে খুবই আক্রমণাত্মক, বিদ্রূপাত্মক ছিলেন। সেগুলোকে স্ট্যান্ডার্ড বলা সম্ভব হচ্ছে না। আমি দুঃখের সঙ্গে বলছি, এ মুহূর্তে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া উল্লেখযোগ্য তেমন কোনো নাম মনে করতে পারছি না। তবে আমি এখানে কারো নাম উল্লেখ করতে চাই না।

আমি সাংবাদিকদের ট্রেনিংয়ের ক্ষেত্রে জানি না তাদের জন্য কী ব্যবস্থা আছে। তবে সেসব প্রতিষ্ঠান এ অর্থে ব্যর্থ যে সাংবাদিকদের প্রভাবিত করতে পারছে না। তারা টেকনিক্যাল শিক্ষা কিছু দিচ্ছেন কিন্তু খুব গভীর কিছু করছেন না। তাদের কোর্স ও প্রশিক্ষকের সমস্যা হয়তো আছে। সংবাদপত্রের রিপোর্টিংয়ে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে তারা পারেনি। তার ফলাফল ভালো নয়। এক্ষেত্রে সাংবাদিক ইউনিয়নগুলোরও হয়তো ব্যর্থতা আছে। তারা নীতিমালা অনুসরণ করতে পারছে না। এটা বাংলাদেশের সংবাদপত্রের বেদনার কাহিনী। লন্ডনের ইকোনমিস্টের মতো পত্রিকায় তথ্য থাকলেও খুবই সূক্ষ্ম মারপ্যাঁচের মাধ্যমে ইসলামকে আঘাত করা হয়। টাইম, নিউজউইকেও একই অবস্থা। আমাদের থেকে শতগুণে স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকা হলেও আমি বলব, তারা মোরাল



www.pathagar.com

স্ট্যান্ডার্ডে অপরাধী। সুতরাং বিশ্বব্যাপী এ সংকট আছে। এর মানে বিশ্বব্যাপী একটি মোরাল সংকট আছে। আবার বিশ্বব্যাপী বিবেচনা করলে এর সহজ সমাধানও নেই। এর জন্য বিশ্বব্যাপী একটি মোরাল রেভ্যুলেশন দরকার। কিন্তু কে করবে? সে রকম লোক লাগবে।

এটা অস্বীকার করা যাচ্ছে না যে, সংবাদপত্রের মাধ্যমে জাতি, বিশ্বের জনগণ কিছু না কিছু জানছে। তবে ফেয়ারনেসের অভাবে কাউকে দু-তিনটি পত্রিকা পড়ে একটা ধারণা নিতে হয়।

বাংলাদেশে সংবাদপত্রের সংস্কারে কাজ করা উচিত। ভালো সাংবাদিক তৈরি করা উচিত। ভালো সাংবাদিক মানে ভালো মানুষ। তাদের জ্ঞানী হতে হবে। সেই বড় হবে, যে জ্ঞানে বড় হবে। সংবাদপত্রকে ফোর্থ পিলার বলা হয়। যদি এই ফোর্থ পিলার শক্তিশালী হয় তাহলে বাংলাদেশ শক্তিশালী হবে।



www.pathagar.com

# সংবাদপত্রের সততা ও নিরপেক্ষতা

সংবাদপত্রের একজন নিয়মিত পাঠক হওয়া সত্ত্বেও আমি কেন জানি কখনো সংবাদপত্রের সততা ও নিরপেক্ষতার উপর পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারিনি। যখনই সংবাদপত্রের সততা বা নিরপেক্ষতার প্রশ্ন আসে তখন কেউ কেউ বলেন, নিরপেক্ষতা বলে কিছু নেই এবং এ কথা বলে নিরপেক্ষতার গুরুত্বকে খাটো করার চেষ্টা করেন। কেউ এটিও বলতে চান যে নিরপেক্ষতা মানে মুনাফিকি। আসলে এটি হচ্ছে বিষয়টির অতি সরলীকরণ। প্রকৃতপক্ষে এটি ভুল ব্যাখ্যা বা অপব্যাখ্যা; নিরপেক্ষতার যে প্রয়োজনীয়তা তাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া। সংবাদপত্র এবং অন্যান্য মিডিয়ার দায়িত্ব জনগণকে সত্য তথ্য অবহিত করা এবং তাদের যে এডিটরিয়াল পলিসি তা যথাসম্ভব সততার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া। কোনোভাবেই মিথ্যা তথ্যের ভিত্তিতে এডিটরিয়াল কমেন্ট করা ঠিক নয়। এডিটরিয়াল অবশ্যই সত্যের উপর ভিত্তিশীল হতে হবে।

সংবাদপত্রগুলো যে দৃষ্টিভঙ্গি ফলো করে তাতে পাঠক হিসেবে আমি সন্তুষ্ট হতে পারিনি। আমরা বিশ্বব্যাপী গত একশ' বছর ধরে একটি নৈতিক সংকটের অভাব বোধ করছি। বিশেষ করে এটি শুরু হয়েছে যখন থেকে শিক্ষাকে সেকুলারাইজ করা হয়। অর্থাৎ শিক্ষা থেকে নৈতিকতাকে যে সময় থেকে বাদ দেয়া হয়, খাটো করে দেখা হয় তখন থেকেই প্রকৃতপক্ষে বিশ্বব্যাপী নৈতিক সংকট শুরু হয়েছে। এ নৈতিক সংকটের ফল হচ্ছে বিশ্বব্যাপী দুর্নীতি, সামাজিক ক্ষেত্রে দুর্নীতি, রাজনৈতিক দুর্নীতি, আর আন্তর্জাতিক নীতিতে দুর্নীতি বা মুনাফিকি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে দুর্নীতি, ডিপ্লোম্যাসির নামে যে নীতিহীনতা এটি আজ ব্যাপক হয়েছে এবং ক্রমেই বিস্তার লাভ করছে। এ নৈতিক সংকটের প্রতিফলন হচ্ছে সংবাদপত্রে। এর প্রভাব পড়ছে সার্বিকভাবে মিডিয়ায়। এটি আলাদা কিছু নয়; তারই একটি অংশ মাত্র। বিষয়টি আমাদেরকে এভাবেই বিবেচনা করতে হবে।

বিবিসি, সিএনএন-এর অন্যান্য অনুষ্ঠান (যা অনেক ক্ষেত্রে অশ্লীল) বাদ দিয়ে যদি শুধু প্রতি ঘণ্টায় পরিবেশিত সংবাদের দিকে তাকাই তাহলে দেখবো তারা সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে খুবই পক্ষপাতিত্ব করে। বিশেষ করে ইস্যুটি যদি মুসলিম বিশ্বের বা তৃতীয় বিশ্বের হয় তাহলে তাদের নিরপেক্ষতা ও সততা



www.pathagar.com

এক্ষেত্রে থাকে না বললেই চলে। যদি উত্তর কোরিয়ার ব্যাপার হয় তাহলে তারা তিলকে তাল করে। আফগানিস্তান, ইরাক, প্যালেস্টাইনের ব্যাপারে তারা নিরপেক্ষ থাকে না। এসব মিডিয়া তাদের জন্মলগ্ন থেকে এ ইস্যুগুলোতে একপেশে নীতি অনুসরণ করে যাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই তারা তাদের ইচ্ছা ও সুবিধামতো পক্ষপাতিত্ব করে থাকে। কোনো ব্যক্তি যদি এক ক্ষেত্রে দুর্নীতিপরায়ণ হয়, তাহলে তার কাছ থেকে অন্য ক্ষেত্রে আমরা নীতিবোধের আশা করতে পারি না। এটি গেল ইলেকট্রনিক মিডিয়ার একটি দিক।

আবার বিদেশী সংবাদপত্রগুলোর দিকে তাকালেও এরকমই চিত্র আমরা দেখবো। সব বিদেশী পত্রিকা আমার পড়া সম্ভব হয় না; কিন্তু আমি বিশ্ববিখ্যাত তিনটি পত্রিকার মাধ্যমে বিষয়টি বিচার করতে পারি। পত্রিকা তিনটি হলো – 'দি ইকোনোমিস্ট', 'টাইমস' এবং 'নিউজউইক'। এ তিনটি পত্রিকাই মানের দিক থেকে ভালো ও তথ্যসমৃদ্ধ পত্রিকা। সাধারণ লোক বুঝতেই পারবে না যে এর ভেতরে কী ধরনের তথ্য বিভ্রান্তি ঢুকে আছে। একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তিই বুঝতে পারবেন কিভাবে এগুলোতে তথ্য বিকৃতি করা হচ্ছে। অবাক হতে হয় এদের মধ্যেই আবার সবচেয়ে খ্যাত ইকোনোমিস্ট পত্রিকাটি যখনই তৃতীয় বিশ্ব বা মুসলিম ইস্যু আসে তখন আর জাস্টিস করতে পারে না বা সততা দেখাতে ব্যর্থ হয়। ঐ একই ব্যাপার – তাদের কাছেও উত্তর কোরিয়া শয়তান; ইসরাইল আণবিক অস্ত্র বানালেও শয়তান নয়। যদি উত্তর কোরিয়ার পাশে চীনের মতো একটি দেশ না থাকতো তাহলে আমেরিকা যে এতোদিনে উত্তর কোরিয়া আক্রমণ করতো না, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই। এ কথা সত্য যে, উত্তর কোরিয়ার উপর আক্রমণ চীন অনেকটা আটকে রেখেছে।

ইকোনোমিস্টকে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে ইরাক যুদ্ধ সমর্থন করতে দেখা গেছে। দুর্বল শক্তি ইরাক একটি সবল শক্তির প্রেসারের সম্মুখীন। ইরাক সব সময় তার উপর হামলার আতঙ্কের সম্মুখীন। সে অবস্থায় ইকোনোমিস্টের মতো একটি পত্রিকা তার এডিটরিয়ালে একবার নয়, দশবারেরও বেশি আমেরিকাকে উসকিয়েছে। তারা বলেছে, যুদ্ধ করতে হবে, যুদ্ধ করাই সমাধান, যুদ্ধ ছাড়া এ ইস্যুর সমাধান নেই। আমি এ কথা বলি না যে, ইকোনোমিস্টের কারণেই যুদ্ধ হয়েছে। ইকোনোমিস্টকে রেসপনসিবল পত্রিকা বলা হয়। কিন্তু আমি এতো বড় উসকানিতে এই পত্রিকাকে কোনোভাবেই রেসপনসিবল বলতে পারি না। এর কাজ বরাবরই ইরেসপনসিবল ছিল। আফগানিস্তানের ব্যাপারেও পত্রিকাটি উসকানি দিয়েছে। উত্তর কোরিয়ার ব্যাপারেও একই ধরনের উসকানি তারা সম্ভবমতো দিচ্ছে। এদিক থেকে সংবাদপত্রের খুব ভালো একটি ভূমিকা আমি পাই না।

আবার দেশের সংবাদপত্র সম্পর্কে বলতে গেলে খুব সাবধানেই কথা বলতে হয় যাতে দেশীয় রাজনীতির উত্তাল তরঙ্গে আমি যেন জড়িয়ে না পড়ি।



www.pathagar.com

আগেই বলেছি, এখানকার এডিটরিয়াল পলিসি আমি খুব একটি ফেয়ার পাই না। সংবাদের ক্ষেত্রে এখানে ঘটনাকে খুব বেশি ফলাও করে বা কম করে দেখানোর অভিযোগে কম-বেশি প্রায় সব পত্রিকা জড়িত। আমি বুঝি না এটি কী করে ফেয়ার রিপোর্টিং হয়? তারা কী করে দাবি করবে যে তাদের পত্রিকা সৎ ও নিরপেক্ষ?

আবার অন্যদিকে সংবাদপত্রগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, ইসলামিস্টদের তারা বলবে সাম্প্রদায়িক, সন্ত্রাসী। সাম্প্রদায়িক টাইটেল দিয়েই এটিকে তারা বিশেষভাবে প্রচার করতে থাকবে। কিন্তু আমরা জানি, এ দেশের বৃহত্তম ইসলামি দলটি কোনো ধরনের সাম্প্রদায়িকতার সাথে জড়িত নয়; কিন্তু সংবাদপত্রগুলো এটিই সব সময় বলে যাবে। এ প্রধান দলটি সাম্প্রদায়িক তো নয়ই এবং সন্ত্রাসী তৎপরতায় জড়িত থাকারও কোনো প্রমাণ নেই। তারা সবসময় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। তা সত্ত্বেও তাদেরকেই সবসময় সাম্প্রদায়িক এবং সন্ত্রাসী বলা হয়। এ সমস্ত রিপোর্টিং রাজনৈতিকভাবে রঞ্জিত এবং আইডিওলজিক্যালি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তাদের ভাষায় কোনো হিন্দু বা বৌদ্ধ সাম্প্রদায়িকতা নেই। তাদের কাছে সাম্প্রদায়িকতা মানে ইসলাম। এটি হয়ে গেছে। একে আমরা কোনোভাবেই পত্রিকাগুলোর জন্য সততা বা নিরপেক্ষতা বলতে পারি না।

তেমনিভাবে কোনো ইসলামিস্টের 'ব্রাহ্মণ্যবাদী' বা 'রামবাবুদের কারসাজি' প্রমুখ শব্দ ব্যবহারকে ভালো বলা যায় না। আর এগুলো ইসলামিস্টদের মানায় না। তাই এগুলো বলা উচিত নয়। এমন নাম দেয়া ভালো নয় যা লোকে পছন্দ করে না। সার্বিক বিবেচনায় বলা যায়, কোনো একদিনের পত্রিকা হাতে নিলে দেখা যাবে কিভাবে এখানে রিপোর্টিং খুব পক্ষপাতমূলক ও একপেশে হচ্ছে। আর প্রায় কোনো পত্রিকাই এ দোষ থেকে মুক্ত নয়। এটিই বেদনার কথা, দুঃখের কথা।

কিন্তু এর কি কোনো সমাধান নেই? আমার মন বলে, বিশ্বে এবং াদেশে যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে তাতে আপাত দৃষ্টিতে আমি কোনো মাধান দেখছি না। তবে এ রকম একটি হতাশাব্যঞ্জক কথা দিয়ে শেষ করা কোনোভাবেই ঠিক নয়; কল্যাণকরও নয়। সেদিক থেকে আমি বলবো, মানবজাতির মধ্যে নৈতিকতাকে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিতে হবে। এ কাজ বিশ্বব্যাপীই হতে হবে। নৈতিকতা যদি বিশ্বব্যাপী কিংবা স্থানীয়ভাবে ফিরিয়ে আনা না যায় তাহলে এর কোনো সমাধান নেই, এ অবস্থার উত্তরণও সম্ভব নয়। বিশ্বব্যাপী নৈতিকতাকে ফিরিয়ে আনা বা নৈতিকতার বিজয় অর্জন – এটি তো অনেক বড় কথা। ছোট করে বললেও বলতে হয়, বাংলাদেশের এক দল সিনিয়র সাংবাদিক যারা নৈতিকতায় বিশ্বাস করেন, তাদেরকে একটি শক্ত আন্দোলন করতে হবে। যেমন আমরা দেখছি ফিল্মস্টারদের মধ্যেই একদল



www.pathagar.com

অশ্লীলতার বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে। তেমনিভাবে আমি মনি করি, সংবাদপত্রের ভেতরও একদল সিনিয়র সাংবাদিককে খুব দৃঢ় মনোবল নিয়ে সততা ও নিরপেক্ষতার পক্ষে আন্দোলন করতে হবে। সেই সাথে আমাদের প্রেস ইনস্টিটিউট, যেখানে সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, সেখানে অন্যান্য নিয়মিত বিষয়ের সাথে সবচেয়ে বড় প্রশিক্ষণ দিতে হবে সততা ও নিরপেক্ষতার উপর।

আমার মনে হয়, সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণের সবচেয়ে বড় দিক হতে হবে নিজের মত ও পথের ঊর্ধ্বে উঠে সততা দেখানো। যেমন আল্লাহতায়ালা কুরআনে বলেছেন, 'তুমি সত্যের পথে সাক্ষী হও–তা যদি তোমার নিজের বিরুদ্ধেও হয়, তোমার আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধেও হয়, তোমার বাবা-মায়ের বিরুদ্ধেও হয়।' (সূরা নিসা ঃ ১৩৫)।

এই যে নীতিমালার কথা আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, তা-ই সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে ভিত্তি হওয়া উচিত।

১৪.০৩.২০০৪



www.pathagar.com

নারী ঃ ইসলাম ও বাস্তবতা

প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর ২০১১, দি পাইওনিয়ার

www.pathagar.com

www.pathagar.com

# ইসলামে নারীর মর্যাদা, অধিকার ও ক্ষমতায়ন

সমাজে নারীর অবস্থান এবং অধিকার নিয়ে আমরা নানা কথা শুনে থাকি। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা বিষয়ে বর্তমানে যে কথাগুলো বলা হয়, তার মধ্যে অনেকগুলোই গ্রহণযোগ্য। আবার কিছু কিছু কথার সাথে দ্বিমত পোষণ করার অবকাশ আছে। নারী-পুরুষ সকলেরই অধিকার প্রতিষ্ঠা হওয়া অনস্বীকার্য। কারণ সমাজ দিনে দিনে সামনে এগুচ্ছে। তাই শুধু নারী বা শুধু পুরুষের নয় বরং সকল মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

গত পঞ্চাশ বছরে সমাজ অনেকটা এগিয়েছে। এ সময়ে পুরুষের সাথে নারীরাও সমান না হলেও, এগিয়ে এসেছে। বেগম রোকেয়ার সময়ে যে সমাজ ছিল, সে সমাজকে আমরা অনেক পেছনে ফেলে এসেছি। তিনি দেখেছিলেন যে, সে সময়ে মেয়েরা লেখাপড়ার কোনো সুযোগই পেত না। সে সময়ে বেগম রোকেয়া নারী শিক্ষার ব্যাপারে সাহসী উদ্যোগ না নিলে আজ নারীরা কেউই কিন্তু পড়ালেখা শিখতে পারতো না। সারা পৃথিবীতে, বিশেষ করে আমাদের দেশে মানুষের উপর; বিশেষ করে নারীর উপর যে অত্যাচার চলছে তার একটা ফাউন্ডেশন আছে, ভিত্তি আছে। অত্যাচারটা আকাশ থেকে আসছে না। নারীর উপরে পুরুষের, কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীর যে অত্যাচার, তার আইডিওলজিক্যাল ফাউন্ডেশনটা (ideological foundation) হলো - সাধারণভাবে মানুষ বিশ্বাস করে, বিশেষ করে পুরুষরা বিশ্বাস করে যে নারী পুরুষের চেয়ে ছোট, তাদের কোয়ালিটি খারাপ এবং তারা নিচু। এই বিশ্বাস অবশ্য নারীর মধ্যেও কিছুটা বিদ্যমান। মানুষের মধ্যে কতগুলো বিভ্রান্তি থেকে এ বিশ্বাসের জন্ম। আর এই বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে আছে নারীদের প্রতি অবহেলা, বঞ্চনা এবং নির্যাতন।

আমাদের দেশ থেকে যদি নারী নির্যাতন বন্ধ করতে হয়, তবে ইসলামকে বাদ দিয়ে তা করা যাবে না। আমি এটা খুব পরিষ্কারভাবে বলতে চাই যে, ইসলামকে বাদ দিয়ে আমাদের মতো শতকরা নব্বই ভাগ মুসলিম জনগোষ্ঠীর দেশে চলা যাবে না। যারা ইসলাম থেকে বিদ্রোহ করেছে তারা কিন্তু টিকতে পারেনি, পারছে না। যারা বিদ্রোহ করেছিলেন তাদের পরিণতি ভালো হয়নি, খারাপ হয়েছে। আমি বিনীতভাবে বলতে চাই যে, ইসলামের কাঠামোর মধ্যে



www.pathagar.com

আমরা যদি এগুতে পারি, তবে তা সবচাইতে ভালো হবে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, ইসলামে এরকম একটি ফ্রেমওয়ার্ক আছে, যা নারীদের সামনে এগিয়ে দিতে পারে।

আমি ইসলামের কোনো সাময়িক (Temporary) ব্যাখ্যা দেয়ার পক্ষে নই। সত্যিকার অর্থেই ইসলাম নারীকে ক্ষমতায়িত করেছে এবং নারীকে সম্মানিত করেছে। নারীকে অধিকার দিয়েছে। সেগুলো ব্যাখ্যা করার আগে আমি 'আইডিওলজিক্যাল ফাউন্ডেশন'-এর নতুন ভিত্তি যেটা হতে পারে সেটা বলতে চাই।

কি সেই ভিত্তি যে ভিত্তির ওপর নারী পুরুষের মৌলিক সাম্য বিদ্যমান? আল্লাহ মানুষের চেহারা এক রকম করেননি। সকল দিক থেকে, in every dot যেকোনো দু'টি মানুষ সমান নয়। ওজন, উচ্চতা, রঙ, শিক্ষা ইত্যাদি সবকিছুতে একটি মানুষ থেকে আরেকটি মানুষ আলাদা। কিন্তু মৌলিকভাবে প্রতিটি মানুষ সমান। আল্লাহর কাছে সমান। তার চারটি প্রমাণ আমি আপনাদের দিচ্ছি।

প্রথমত, আল্লাহ তায়ালা এ কথা খুব স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, মূল মানুষ হচ্ছে 'রুহু'। যাকে আমরা আত্মা বলি। মূল মানুষ কিন্তু শরীর নয়। দেহ তো কবরে পচে যাবে। আমরা যারা ইসলামে বিশ্বাস করি তারা জানি, মূল মানুষ হলো 'রুহু'। আল্লাহ সকল মানুষকে, তার রুহুকে একত্রে সৃষ্টি করেন, একই রকম করে সৃষ্টি করেন এবং একটিই প্রশ্ন করেন। আল্লাহর প্রশ্নের উত্তরও নারী-পুরুষ সকলে একই দিয়েছিল। সূরা আরাফের একটি আয়াত হলো:

> স্মরণ কর, তোমাদের প্রতিপালক আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের বংশধরকে বের করেন এবং তাদের নিজেদের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন 'আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?' তারা বলে, 'হ্যাঁ, অবশ্যই তুমি আমাদের প্রতিপালক, আমরা এর সাক্ষ্য দিচ্ছি।' এটা এজন্য যে তোমরা যেন কেয়ামতের দিন না বলো, 'আমরা তো এ বিষয়ে জানতাম না।' (সূরা আরাফ: আয়াত ১৭২)।

তার মানে আল্লাহর সঙ্গে একটি পয়েন্টে সকল নারী এবং পুরুষের একটি চুক্তি হলো যে, আপনি আমাদের প্রভু, আমরা আপনাকে মেনে চলবো। এক্ষেত্রে পুরুষের চুক্তি আলাদা হয়নি। নারীর চুক্তি আলাদা হয়নি। সুতরাং আমরা দেখলাম, আমাদের ideological foundation এর প্রথম কথা হচ্ছে এই যে, মূল মানুষ হচ্ছে 'রুহু' এবং তা সমান। এই সাম্যের পরে যদি কোনো অসাম্য থেকে থাকে তাহলে তা অত্যন্ত নগণ্য, insignificant, very small. তার মানে হচ্ছে, মানুষের আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব এক এবং সে মানুষ হিসেবে এক। এটি হলো নারী-পুরুষের সাম্যের প্রথম ভিত্তি।



www.pathagar.com

দ্বিতীয়ত, আমরা পুরুষরা গর্ব করি যে, আমাদের শারীরিক গঠন বোধহয় নারীর তুলনায় ভালো, আল্লাহ বোধহয় আমাদেরকে তুলনামূলকভাবে শ্রেষ্ঠ করে বানিয়েছেন এবং মেয়েরা আনকোয়ালিফায়েড বা অযোগ্য। কিন্তু আল্লাহ একটি কথা কুরআনে খুব পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন যে, সকল মানুষের মধ্যে পার্থক্য আছে, কিন্তু প্রতিটি মানুষ ফার্স্ট ক্লাস। যারা নামাজ পড়েন তারা এই আয়াত জানেন, সুরা 'তীন'-এ আল্লাহ্ বলেছেন:

নিশ্চয়ই আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে, সর্বোত্তম কাঠামোয়।

(সূরা তীন: আয়াত ৪)।

এখানে পুরুষকে বলেননি। তার মানে আমাদের গঠনে পার্থক্য আছে, আমরা এক নই, আমরা ভিন্ন কাঠামোর। কিন্তু সবাই ফার্স্ট ক্লাস।

সুতরাং নারী-পুরুষের মৌলিক সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য, নতুন নারী আন্দোলনের জন্য অথবা নতুন মানব আন্দোলনের জন্য এটা দ্বিতীয় ভিত্তি। পুরুষদের একথা বলা ঠিক হবে না যে, মেয়েদের স্ট্রাকচার খারাপ। আল্লাহ তাতে অসন্তুষ্ট হবেন। যারা মোমেন, যারা বিশ্বাসী - তারা এ কথা বলবেন না। সুতরাং নারী-পুরুষের মৌলিক সাম্যের এটা হলো দ্বিতীয় প্রমাণ। মৌলিক এ কারণে বলছি যে, নারী-পুরুষের মধ্যে ছোটখাটো পার্থক্য বিদ্যমান।

তৃতীয়ত, আল্লাহ তায়ালা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, সকল মানুষ এক পরিবারের। আদম এবং হাওয়ার পরিবারের। সূরা নিসার প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ বলছেন:

> হে মানব জাতি, সেই রবকে তুমি মানো যিনি তোমাদেরকে একটি মূল সত্তা (নফস) থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং সেই সত্তা থেকে তার সঙ্গীকে সৃষ্টি করেছেন এবং এই দুইজন থেকে তিনি অসংখ্য নারী ও পুরুষ সৃষ্টি করেছেন। (সূরা নিসা: আয়াত ১)।

তার মানে আমরা এক পরিবারের। আমরা হচ্ছি বনী আদম। আদমের সন্তান। আল্লাহ পাক কুরআন শরীফে অন্তত ২০/৩০ বার বলেছেন 'ইয়া বনী আদামা' (হে আদমের সন্তানেরা)। বাপ-মা এবং সন্তানেরা মিলে যেমন পরিবার তৈরি হয়, তেমনি ইসলামের দৃষ্টিতে মানব জাতি একটি পরিবার। সব পরিবারের ওপরে হলো মানব জাতির পরিবার। তার মানে আমাদের মৌলিক যে সম্মান ও মর্যাদা তা সমান। ছোটখাটো কারণে আমাদের মধ্যে পার্থক্য হয়ে যায়। তবে জাগতিক মর্যাদা আসল মর্যাদা নয়।

আইনের ভাষায় যেমন বলা হয়, আইনের চোখে সকল মানুষ সমান, তেমনি আল্লাহর কাছেও সবাই সমান। আল্লাহর কাছে সম্মানের একমাত্র ভিত্তি হলো তাকওয়া। আল্লাহ বলেননি যে, তার কাছে পুরুষ সম্মানিত বা নারী সম্মানিত। আল্লাহ বলেছেন:



www.pathagar.com

> তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকি। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন। (সূরা হুজুরাত: আয়াত ১৩)।

আল্লাহর কাছেই যদি মর্যাদার এই ভিত্তি হয়, তাহলে মানুষের পার্থক্যে কি কিছু যায় আসে? আল্লাহ বলেছেন তিনি তাকওয়া ছাড়া (আল্লাহকে কে মানে আর কে মানে না) কোনো পার্থক্য করেন না। অতএব আমরা এক পরিবারের সন্তান, আমাদের মৌলিক মর্যাদা সমান।

কুরআনের সূরা নিসার একটি আয়াতের শেষ অংশে আল্লাহ বলেছেন:

> এবং ভয় পাও সেই আল্লাহকে, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের কাছে অধিকার দাবি করে থাকো এবং ভয় পাও গর্ভকে বা মাকে। (সূরা নিসা: আয়াত ১)।

আল্লাহ বলেছেন গর্ভকে ভয় পাও। কুরআন শরীফের এই আয়াতটির তাফসিরে মিশরের বিখ্যাত আলেম সাইয়েদ কুতুব লেখেন, 'এই ভাষা পৃথিবীর কোনো সাহিত্যে কুরআনের আগে লেখা হয়নি। আল্লাহ গর্ভকে ভয় করতে বলে মাকে সম্মান করার কথা বলেছেন, নারী জাতিকে সম্মান করার কথা বলেছেন।' (সূরা নিসার তাফসির - সাইয়েদ কুতুব)। সুতরাং আমাদের মৌলিক সামাজিক মর্যাদা এক্ষেত্রেও সমান বলে প্রতীয়মান হলো। এটা আমাদের নতুন আইডিওলজিক্যাল ফাউন্ডেশনের তৃতীয় প্রমাণ।

চতুর্থত, আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টির সময় বলে দিলেন যে, 'তোমরা সবাই খলিফা'। তিনি বললেন, 'ইন্নি জায়েলুন ফিল আরদে খলিফা'। আল্লাহ বলেননি যে, তিনি নারী পাঠাচ্ছেন বা পুরুষ পাঠাচ্ছেন। এমনকি তিনি বলেননি যে, তিনি মানুষ পাঠাচ্ছেন; আল্লাহ বললেন, তিনি খলিফা পাঠাচ্ছেন। পাঠালেন মানুষ, বললেন খলিফা। মানুষকে তিনি খলিফা নামে অভিহিত করলেন। খলিফা মানে প্রতিনিধি। আমরা পুরো মানব জাতি হচ্ছি আল্লাহর প্রতিনিধি। পুরুষ-নারী নির্বিশেষে আমরা প্রত্যেকে তাঁর প্রতিনিধি - আল্লাহর প্রতিনিধি। তবে এ কথা ঠিক যে, যদি আমরা গুনাহ করি, অন্যায় করি, খুন করি, অত্যাচার করি, জুলুম করি, ঈমান হারিয়ে ফেলি তাহলে আমাদের খলিফা মর্যাদা থাকে না। কিন্তু মূলত আমরা আল্লাহ পাকের খলিফা। (দ্রষ্টব্য: সূরা বাকারা: আয়াত ৩০, সূরা ফাতির: আয়াত ৩৯)।

এই খলিফার মর্যাদার মধ্যেই রয়েছে সকল ক্ষমতায়ন - যে ক্ষমতায়নের কথা আমরা বলি। ক্ষমতা ছাড়া কেউ কোনো দায়িত্ব পালন করতে পারে না। খেলাফতের দায়িত্ব পালন করতে গেলে প্রত্যেক নারী এবং পুরুষের কিছু ক্ষমতা লাগবে। নারীর ক্ষমতায়নের ভিত্তি এই খেলাফতের মধ্যে রয়েছে। শুধু নারী নয়, খেলাফত শব্দের মধ্যে নারী, পুরুষ, গরীব, দুর্বল সকলের ক্ষমতায়নের ভিত্তি রয়েছে। সুতরাং নারী-পুরুষ মৌলিক সাম্যের এটি হলো চতুর্থ প্রমাণ।



www.pathagar.com

ইসলাম চায় every man, every woman, every person should be empowered (প্রত্যেককে ক্ষমতায়িত করতে)। কিন্তু এই মুহূর্তে যদি নারীরা বঞ্চিত থেকে থাকে, তবে তাদেরকে ক্ষমতায়িত করতে হবে। পুরুষরা কোনোদিন বঞ্চিত হলে তাদেরকে ক্ষমতায়িত করতে হবে। তবে যে বঞ্চিত তার কথা আমাদেরকে আগে ভাবতে হবে, নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য বর্তমানে আমাদের আগে কাজ করতে হবে।

আজকে মেয়েদের আসল কাজ কি তা নিয়ে কথা উঠছে। তারা কি ঘরে বসে থাকবে - এমন প্রশ্ন উঠছে। কোনো মেয়ে যদি তার স্বাধীন সিদ্ধান্তে ঘরে থাকতে চায়, তবে তার সেটা করার অধিকার আছে। পুরুষের ক্ষেত্রেও বিষয়টি প্রযোজ্য। কিন্তু আল্লাহ কোথাও বলেননি যে, নারীদের ঘরে বসে থাকতে হবে, বাইরের কাজ নারীরা করতে পারবে না। বরং আল্লাহ মূল দায়িত্ব নারী পুরুষের একই দিয়েছেন। সূরা তাওবার ৭১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন যে, নারী পুরুষের দায়িত্ব ৬টি। আয়াতটিতে বলা হয়েছে: 'মোমেন পুরুষ এবং মোমেন নারী একে অপরের অভিভাবক (ওয়ালী), একে অপরের বন্ধু, একে অপরের সাহায্যকারী।' (সূরা তাওবা: আয়াত ৭১)।

এই আয়াত কুরআন শরিফের সর্বশেষ সূরাসমূহের অন্তর্ভুক্ত। উল্লেখিত বিষয়ে আগে যে সকল আয়াত আছে সেগুলোকে এই আয়াতের আলোকে ব্যাখ্যা করতে হবে। এই আয়াতে বলা আছে যে, নারী-পুরুষ একে অপরের অভিভাবক, গার্জিয়ান। অনেকে বলেন যে, নারী গার্জিয়ান হতে পারে না; কিন্তু আল্লাহ বলেছেন নারী গার্জিয়ান হতে পারে। কুরআনে এক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য নেই। নারী পুরুষের নির্ধারিত ৬টি দায়িত্ব হচ্ছে:

১. তারা ভালো কাজের আদেশ দিবে।

২. মন্দ কাজের ব্যাপারে নিষেধ করবে।

৩. উভয়ে নামাজ কায়েম করবে।

৪. যাকাত দিবে।

৫. আল্লাহকে মানবে।

৬. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মানবে।

এসব কথার মাধ্যমে আল্লাহ নারীদের সকল ভালো কাজে অংশগ্রহণকে স্বীকৃতি দিচ্ছেন। এটাই ইসলামের নীতি। এ বিষয়ে আল্লাহ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, যারা এই ৬টি দায়িত্ব পালন করবে তাদের উপর আল্লাহ তায়ালা রহমত করবেন। কুরআনের বেশ কয়েকটি তাফসির পড়ে এবং পবিত্র কুরআন ও সুন্নাতে রাসূলে পুরোপুরি বিশ্বাসী একজন মানুষ হিসেবে আমি বিশ্বাস করি যে, এই ৬টি দায়িত্বের মধ্যে নারী পুরুষ সবাই সমান। রাজনীতি, সমাজসেবা, ইত্যাদি সব কাজই এ ৬টির আওতায় পড়ে।



www.pathagar.com

আজ আমরা ইসলামের মূল জিনিস পরিত্যাগ করে ছোটখাটো জিনিস নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। মানুষের তৈরি বিভিন্ন কিতাবের ওপর নির্ভর করছি। আল্লাহর মূল কিতাবকে আমরা সেই তুলনায় গুরুত্ব দিচ্ছি বলে মনে হচ্ছে না। এখানে একটি কথা বলা দরকার, ইসলামকে কেউ যদি অন্যের মাধ্যমে শেখেন তবে তারা কখনো মুক্তি পাবেন না। তাই প্রত্যেককে কুরআনের পাঁচ ছয়টি তাফসির নিজে পড়তে হবে। অনেকে অনুবাদের মধ্যে তাদের নিজেদের কথা ঢুকিয়ে দেয়। ফলে পাঁচ ছয়টি তাফসির পড়লে আমরা বুঝতে পারবো কোথায় মানুষের কথা ঢুকেছে; আর আল্লাহর কথাটা কি? কয়েক রকম ব্যাখ্যা পড়লে আমরা ঠিক করতে পারবো, কোন ব্যাখ্যাটা ঠিক। মেয়েদের মধ্যে বড় তাফসিরকারক হয়নি। মেয়ে তাফসিরকারক থাকলে হয়তো লিঙ্গ পক্ষপাতিত্ব (gender bias) হতো না। তবে কুরআন শরীফের কিছু তাফসির আছে যেগুলো লিঙ্গ পক্ষপাতিত্ব মুক্ত (free from gender bias) ; যেমন মোহাম্মদ আসাদের 'দি ম্যাসেজ অব দি কুরআন'।



www.pathagar.com

# ইসলামে আর্থিক সুবিধা পুত্রের চেয়ে কন্যার বেশি

সদ্য প্রস্তাবিত নারী উন্নয়ন নীতিতে সরকার উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষকে সমান করতে চাচ্ছে। তা করা হলে সূরা নিসার ১১ নং আয়াতে নির্দেশিত বিধানের সরাসরি লঙ্ঘন করা হবে। অথচ এটি একেবারেই অপ্রয়োজনীয়। আয়াতটিতে বলা হয়েছে–

> 'আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছেন: পুরুষের অংশ দু'জন মেয়ের সমান। যদি (মৃতের ওয়ারিশ) দু'য়ের বেশি মেয়ে হয় তাহলে পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিনভাগের দু'ভাগ তাদের দাও। আর যদি একটি মেয়ে ওয়ারিশ হয় তাহলে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক তার। যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকে তাহলে তার বাপ-মা প্রত্যেকে সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে। আর যদি তার সন্তান না থাকে এবং বাপ-মা তার ওয়ারিশ হয় তাহলে মাকে তিনভাগের একভাগ দিতে হবে। যদি মৃতের ভাই-বোন থাকে, তাহলে মা ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে। এ সমস্ত অংশ বের করতে হবে মৃত ব্যক্তি যে ওসিয়ত করে গেছে তা পূর্ণ করার এবং সে যে ঋণ রেখে গেছে তা আদায় করার পর। তোমরা জানো না তোমাদের বাপ-মা ও তোমাদের সন্তানদের মধ্যে উপকারের দিক দিয়ে কে তোমাদের বেশি নিকটবর্তী। এসব অংশ আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ অবশ্যই সকল সত্য জানেন এবং সকল কল্যাণময় ব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত আছেন।'

প্রকৃতপক্ষে ইসলামে পুত্রের চেয়ে কন্যার আর্থিক অধিকার এবং সুবিধা বেশি। নিম্নের বিশ্লেষণই তা প্রমাণ করবে।

আমার নিজের কথাই বলি। আমরা অনেক ভাই-বোন ছিলাম। আমার মরহুম আব্বার সমগ্র সম্পত্তির মূল্য আজকের বাজারদরে প্রায় ৯০ লক্ষ টাকা হবে। আমরা প্রত্যেক ভাই ১৫ লক্ষ টাকার উত্তরাধিকারী হয়েছিলাম এবং প্রত্যেক বোন ৭.৫ লক্ষ টাকার উত্তরাধিকারী হয়েছিল। অর্থাৎ আমার সুবিধা বোনের তুলনায় ৭.৫ লক্ষ টাকা বেশি ছিল। অন্য দিকে ইসলামী বিধান মোতাবেক (দ্রষ্টব্য: সূরা বাকারা, সূরা নিসা ও সূরা তালাক) আমাকে আমার স্ত্রী, পুত্র ও কন্যার ভরণপোষণ ব্যয় বহন করতে হয়েছে। আজকের মূল্যে তা অন্তত ৩০ হাজার টাকা মাসিক খরচ হবে। আমার স্ত্রী ৩০ বছর বিবাহিত জীবনের পর মারা যান। এ সময়ে



www.pathagar.com

আমাকে প্রতি মাসে ৩০ হাজার টাকা করে ৩০ বছর ধরে ব্যয় করতে হয়েছিল, যার পরিমাণ (৩০,০০০ X ১২ X ৩০) = ১ কোটি ৮ লক্ষ টাকা। এর পরও পিতা হিসেবে আমার কন্যার জন্য আমাকে অনেক খরচ করতে হয়েছে।

অন্যদিকে আমার বোনের কোনো অর্থ ব্যয় করতে হয়নি বোনের স্বামী, পুত্র বা কন্যার ভরণপোষণের জন্য। কেননা কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক তারা এর জন্য দায়িত্বশীল নয়। অর্থাৎ ভরণপোষণের ক্ষেত্রে যেখানে আমাকে ১ কোটি ৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে হয়েছে, সেখানে এ পরিমাণ অর্থ আমার বোনকে ব্যয় করতে হয়নি। এ ক্ষেত্রে বোনের সুবিধা ১ কোটি ৮ লক্ষ টাকা। যদি আমার ৭.৫ লক্ষ টাকা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া অধিক সুবিধা বাদ দেয়া হয় তাহলে বোনের নিট সুবিধা হয় (১,০৮,০০,০০০-৭,৫০,০০০ = ১,০০,৫০,০০০/-) ১ কোটি ৫০ হাজার টাকা। এ হিসাবে আমি মোহরানা ধরিনি। অসংখ্য ক্ষেত্রে হিসাব করে দেখেছি, সার্বিক আর্থিক সুবিধা ইসলামী বিধানে পুত্রের চেয়ে কন্যার বেশি।

পিতামাতার উত্তরাধিকার বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সমান। ভাইবোনরা, যে ক্ষেত্রে তারা উত্তরাধিকারী হয়ে থাকেন, বেশ কিছু ক্ষেত্রে সমান পান। এসব ক্ষেত্রেও সব শ্রেণির পুরুষের আর্থিক দায়িত্ব নারীর চেয়ে একইভাবে বেশি।

হিসাব করে দেখেছি, আমেরিকার জনগণ যদি ইসলামী আইন অনুসরণ করে, তাহলে নারীরাই অধিক সুবিধা পাবে। সেখানে উত্তরাধিকার খুব সামান্যই পাওয়া যায়। কেননা বেশির ভাগ মানুষ ক্রেডিট কার্ডে চলে, তাদের সঞ্চয় নেই বা থাকলেও ৯৯ শতাংশ ক্ষেত্রে তা খুবই সামান্য। সে দেশে মাসিক খরচ যদি মাত্র দুই হাজার ডলারও ধরি তাহলে ৩০ বছরের বিবাহিত জীবনে ইসলামী আইন মোতাবেক নারীর সুবিধা হবে (২০০০x১২x৩০) = ৭,২০,০০০ ডলার (বাংলাদেশী টাকায় প্রায় ৫ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা)।

সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, পুরুষ ও নারীর আর্থিক সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে ইসলাম মূলত নারীদের অধিক সুবিধা দিয়েছে। তাই উত্তরাধিকার আইন বদলের যে কোনো প্রচেষ্টা অপ্রয়োজনীয়। তদুপরি ৯০ ভাগ মুসলিম অধিবাসীর বাংলাদেশে এ ধরনের সরাসরি কুরআন-বিরোধী বিধান প্রবর্তন জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। দেশে উত্তেজনা সৃষ্টি হবে। আমি সরকারকে অনুরোধ করি, যেন তারা এ উদ্যোগ থেকে সরে আসেন। নারীদের সব ধরনের অধিকার দেয়া হোক, তাদের অধিকার যাতে তারা সত্যিকার অর্থেই পায় এবং কেবল কথায় যাতে তা সীমাবদ্ধ না থাকে, তার জন্য ব্যবস্থা নিন। কিন্তু সরাসরি কুরআন ও ধর্মের সাথে সংঘর্ষশীল ব্যবস্থা নেবেন না। এসব বিধান ভালো করে কার্যকরও হয় না। যেসব আইনের পেছনে নৈতিকতার সমর্থন রয়েছে, ধর্মের সমর্থন রয়েছে, সেগুলো বেশি কার্যকর হয়। ধর্মবিরোধী আইন কখনোই সত্যিকার অর্থে কার্যকর হয় না। কেননা আইনের পেছনে দরকার নৈতিক ভিত্তি।

১০ মার্চ ২০১১, দৈনিক নয়া দিগন্ত



www.pathagar.com

# তালাকপ্রাপ্তা নারীর খোরপোষ

তালাকপ্রাপ্তা নারীর খোরপোষ সম্পর্কে কিছু নতুন বিতর্ক সৃষ্টি করা হচ্ছে অথচ কুরআন ও হাদিসের আলোকে বিষয়টি সব সময়ই মীমাংসিত ছিল। ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাসে কোনো মহলই এ কথা বলেননি যে ইদ্দতের পর তালাকপ্রাপ্তা নারী পূর্বতন স্বামীর নিকট থেকে ভরণপোষণ পাবেন। ১৯৮৫ সালে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট শাহবানু কেসে এ ধরনের একটি রায় দেওয়ার পর বিষয়টি মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। পরে ভারতীয় মুসলমানদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের প্রতিবাদের মুখে ভারতীয় পার্লামেন্ট ১৯৮৬ সালের মুসলিম মহিলা (তালাক পরবর্তী অধিকার) আইন পাস করে। এই আইন তালাকের পর যে মহিলার নিজেকে ভরণপোষণ করার মতো সম্পত্তি নাই তার ভরণপোষণের দায়িত্ব তার সন্তানদের উপর, সন্তান না থাকলে আইনত তার উত্তরাধিকারী এমন আত্মীয়-স্বজনের উপর এবং তাও না থাকলে প্রাদেশিক ওয়াকফ বোর্ডের উপর অর্পণ করেছে। তারা যদি নিজেরাই এ দায়িত্ব পালন না করেন তবে কোর্ট তা আদেশ দিয়ে করতে বাধ্য করবেন। এ আইনটি ইসলামের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়েছে। ইসলামী বিধানে কেবল এ ধরনের তালাকপ্রাপ্তা দুঃস্থরাই নয় অন্যান্য দুঃস্থদের জন্য পূর্ণ ভরণপোষণের দায়িত্ব সন্তান/মাতাপিতার, তারপর আত্মীয়দের এবং তা না করলে সমাজের বা সরকারের। এই ইসলামী বিধান কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজনীয় আইন করা সঙ্গত।

বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু লেখা থেকে মনে হয় যে, ইসলাম তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের খোরপোষ সম্পর্কে পূর্ণ কোনো বিধান দেয়নি। অথচ প্রকৃতপক্ষে কুরআন ও রাসূলের হাদিসে এ সম্পর্কে পূর্ণ নির্দেশাবলী রয়েছে। সূরা তালাকের প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে:

> হে নবী, তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীদেরকে তালাক দিবে তখন তাদেরকে ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে তালাক দাও আর ইদ্দতের সময়কাল সঠিকভাবে গণনা কর এবং তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করো। (সূরা তালাক: আয়াত ১)।

ইসলামে তালাক ও ইদ্দতকে নানা কারণে সংযুক্ত করা হয়েছে। এ সবের মধ্যে রয়েছে রিজয়ী তালাকের ক্ষেত্রে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার



www.pathagar.com

অধিকার, স্ত্রীর গর্ভে কোনো সন্তান আছে কিনা তা নির্ধারণ, খোরপোষের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। সূরা তালাকের ৩নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'গর্ভবতী নারীর ইদ্দতের সীমা হল প্রসব না করা পর্যন্ত' এবং ৫নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, 'তালাকপ্রাপ্ত নারীরা যদি গর্ভবতী হয় তবে তাদের ভরণপোষণ কর যতক্ষণ না তাদের প্রসব হয়।' অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা গর্ভবতী নারীর ক্ষেত্রে ভরণপোষণকে আল্লাহ ইদ্দতের সঙ্গে সম্পর্কিত করেছেন এবং তাদের এ সময়ের ভরণপোষণকে ওয়াজিব বা অবশ্য কর্তব্য করেছেন। তেমনিভাবে সূরা তালাকে ১-৫নং আয়াতে অন্যান্য ধরনের তালাকপ্রাপ্তাদের উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে যে: 'ইদ্দতকালে তাদেরকে সেস্থানে থাকতে দাও যেখানে তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী বসবাস কর। আর তাদেরকে সংকটে ফেলার জন্য যন্ত্রণা দিও না।' (সূরা তালাক: আয়াত ৬)। অর্থাৎ যেখানে গর্ভবতী তালাকপ্রাপ্তাদের ক্ষেত্রে ভরণপোষণের (বা নাফাকা) কথা বলা হয়েছে সেখানে অন্য তালাকপ্রাপ্তাদের ক্ষেত্রে কেবল বাসস্থানের (বা সাকানা) কথা বলা হয়েছে। অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস, সাহাবাদের মতামতের ভিত্তিতে অধিকাংশ ইমাম সব ধরনের তালাকপ্রাপ্তাদের ক্ষেত্রেই থাকা ও খাওয়া-দাওয়া সবই ইদ্দতকালে স্বামীর উপর ওয়াজিব গণ্য করেছেন। অন্যদের মধ্যে হযরত উমর, আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ, ইমাম জয়নুল আবেদীন, ইমাম ইবরাহীম নখয়ী, হযরত আয়শা (রা.), আবু হানিফা এ মত গ্রহণ করেছেন। (বুখারী, কিতাবুত তালাক; দারেকুতনী; আলজাস্‌সাস; আহকামুল কুরআন; হিদায়া; আবুল আ'লা মওদুদী, তাফহীমুল কুরআন, সূরা তালাকের তাফসির)।

কুরআন ও হাদিস সম্পর্কে যথার্থ অভিজ্ঞ নন এমন কিছু আধুনিক লোক সূরা বাকারার ২৩৬, ২৪১ ও সুরা আহযাবের ৪৯নং আয়াতে স্বামী কর্তৃক তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে যে 'মাতা' দেওয়ার কথা বলা হয়েছে তার ভিত্তিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে খোরপোষ দিতে বলেছেন। প্রথমত, 'মাতা' শব্দ বলতে খোরপোষ বুঝায় না। আরবী সুবিখ্যাত অভিধান 'আল মুনজিদ' ও 'আল মাগরিব'-এ বলা হয়েছে 'মাতা' অর্থ সাময়িক উপকার সাধন, সামান্য পুঁজি, স্ত্রীলোককে যেসব সাধারণ দ্রব্যাদি তালাকের পরে দিয়ে দেওয়া হয়। কোনো প্রাচীন ও আধুনিক তাফসিরেই 'মাতা' অর্থ খোরপোষ করা হয়নি। খোরপোষের জন্য কুরআনে যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তা হচ্ছে নাফাকা। দ্বিতীয়ত, 'মাতা' দেওয়ার যে কথা উপরোক্ত আয়াতসমূহে বলা হয়েছে তার অর্থ অনির্দিষ্টকালের খোরপোষ করা সূরা তালাকের (যা সূরা বাকারার পরে নাজিল হয়েছে) বিধানের বিপরীত হবে যা কোনোভাবে সঠিক হতে পারে না, তা হলে কুরআনে বৈপরীত্য আছে এ ধরনের অভিযোগের সুযোগ দেওয়া হবে।

সূরা বাকারা ও সূরা আহযাবে যে 'মাতা'র কথা উল্লেখ করা হচ্ছে তা কেবল সেসব তালাকপ্রাপ্তার জন্য যাদেরকে স্পর্শ করা ও মোহরানা ঠিক করার



www.pathagar.com

পূর্বে তালাক দেওয়া হয়েছে। নিম্নে আয়াতসমূহ উল্লেখ করা যাচ্ছে: 'তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের স্পর্শ করার কিংবা তাদের জন্য মোহরানা ঠিক করার পূর্বে তালাক দিলে তাতে কোনো দোষ নাই। এই অবস্থায় তাদেরকে কিছু (মাতা) দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। অবস্থাশালী ব্যক্তি তৌফিক অনুযায়ী এবং দরিদ্র ব্যক্তি নিজ সামর্থ অনুযায়ী সঠিক প্রচলিত পন্থায় এটা আদায় করবে। বস্তুত এটা মুহসিন (নেক) লোকদের উপর আরোপিত কর্তব্য।' (সূরা বাকারা: আয়াত ২৩৬)। সুরা বাকারার ২৪১ নং আয়াতে এ কথাই জোর দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। এ আয়াতে 'মুহসিন' শব্দ ব্যবহার না করে 'মুত্তাকী' শব্দ ব্যবহার করে বলা হয়েছে যে, তালাকপ্রাপ্তাদের 'মাতা' দেওয়া মুত্তাকী লোকদের অবশ্য কর্তব্য। সূরা বাকারা দ্বিতীয় হিজরীতে নাজিল হয়। তারও চার বছর পর নাজিল হওয়া সূরা আহযাবে একই কথা বলা হয়েছে: 'হে মুমিনগণ! তোমরা মুমিন নারীগণকে বিবাহ করার পর তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিলে তোমাদের জন্য তাদের পালনীয় কোনো ইদ্দত নেই যা তোমরা গণনা করবে। তোমরা তাদেরকে কিছু সামগ্রী দিবে এবং সৌজন্যের সাথে তাদেরকে বিদায় করবে।' (সুরা আহযাব: আয়াত ৪৯)। এ আয়াতে স্পষ্ট হচ্ছে যে 'মাতা' হচ্ছে মূলত তাদের জন্য যাদের ইদ্দত পালন করার প্রয়োজন নেই। এভাবে এ আয়াতেও ইদ্দতের সঙ্গে খোরপোষের সম্পর্ক প্রমাণিত হচ্ছে।

উপরের আলোচনা থেকে প্রমাণিত হলো যে, তালাকপ্রাপ্তা মহিলারা ইসলামী আইনে কেবল ইদ্দতকালেই খোরপোষ পাবেন। এছাড়া তারা অবশ্য ইসলামী আইন মোতাবেক তাদের মোহরানাও পাবেন। এখানে একথাও উল্লেখ্য যে, তালাককে ইসলাম পছন্দ করেনি। কিন্তু প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামে তালাককে বৈধ করা হয়েছে। অবশ্য তালাকের অপব্যবহার ও সুন্নাত বিরোধী একত্রে তিন তালাক দেওয়ার কাজ করার জন্য শাস্তির বিধান রেখে আইন করা যেতে পারে। কিন্তু তালাক সংঘটিত হওয়ার পরও অনির্দিষ্টকালের জন্য পূর্ব স্বামীকে তালাকপ্রাপ্তার দায়িত্ব বহন করতে বাধ্য করা কোনক্রমেই যুক্তিযুক্ত নয়। তালাকের পর পূর্ব স্বামী কেন অনির্দিষ্টকালের জন্য পূর্ব স্ত্রীর ভরণপোষণ বহন করবে যখন বিনিময়ে সে কিছুই পাচ্ছে না। পুরুষরা তো দূরের কথা কোনো নারীও তার ভাইয়ের জন্য তা চাইতে পারে না। এ ধরনের বিধানের ফলে পরিশেষে বিবাহের পরিবর্তে কেবল উচ্ছৃংখলতা বৃদ্ধি পাবে। পাশ্চাত্যে এ ধরনের বিধানের জন্যই পুরুষদের মধ্যে বিবাহ না করে অন্য নারীর সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর মতো বাস করার প্রবণতা ব্যাপক হয়েছে যাতে পুরুষরা অবাস্তব খোরপোষ আইন হতে রক্ষা পায়।

অবশ্য সব দুঃস্থ নারী-পুরুষের জন্য যারা নিজেদের ভরণপোষণ করতে অক্ষম তাদের নিরাপত্তার জন্য প্রথম প্যারায় উল্লেখিত একটি ব্যাপক ভরণপোষণ আইন বিধিবদ্ধ করা প্রয়োজন।



www.pathagar.com

# ইসলামে শালীনতা, পোশাকের দর্শন ও বিধানাবলী

পুরুষ ও স্ত্রীলোকের পোশাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে ইসলামী আইন যথাযথ উপদেশ ও নির্দেশনা দান করেছে। ইসলাম যথাযথ পোশাক-পরিচ্ছদের মাধ্যমে দু'টি বিষয় প্রতিষ্ঠা করতে চায়। প্রথমত, মানবদেহ ঠিকমত আচ্ছাদন করা। কারণ, বিশ্রীভাবে দেহ সৌষ্ঠব প্রদর্শন ঠিক নয়। দ্বিতীয়ত, সৌন্দর্যায়ন ও ভূষণ বাড়িয়ে তোলা। পবিত্র গ্রন্থ কুরআনে বলা হয়েছে:

> হে বনী আদম! তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকবার ও বেশভূষার জন্য আমি তোমাদেরকে পোশাক দিয়েছি এবং সর্বোত্তম পোশাক হচ্ছে তাকওয়ার পোশাক। (সূরা আরাফ: আয়াত ২৬)।

দেহ ঠিকমত আচ্ছাদন করা ও ভূষণের মধ্যে ভারসাম্য থাকা উচিত। যদি এই ভারসাম্য বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে শয়তানের পথ অনুসরণ করা হবে। এ সম্পর্কে কুরআন বলে:

> হে বনী আদম! শয়তান তোমাদের প্রথম পিতামাতাকে যেভাবে বেহেশত থেকে বহিষ্কার করেছিল এবং তাদেরকে তাদের লজ্জাস্থান উভয়ের সামনে দেখানোর জন্য বিবস্ত্র করেছিল, তোমাদেরকে কিছুতেই শয়তান যেন সেভাবে প্রলুব্ধ না করতে পারে। (সূরা আরাফ: আয়াত ২৭)।

পুরুষ ও স্ত্রীলোকের জন্য একই ধরনের পোশাক পরিধান করতে ইসলাম অনুমতি দেয়নি। ইসলাম পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মধ্যকার প্রভেদ রক্ষা করতে চায়। পুরুষ ও স্ত্রীলোকের একে অপরের পোশাক পরিধানের মধ্যে কোন বাহাদুরী নেই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

> 'পুরুষের স্ত্রীলোকের মতো পোশাক পরিধান করা নিষিদ্ধ এবং স্ত্রীলোকের পুরুষের মতো পোশাক পরিধান করা নিষিদ্ধ।' (বুখারী)।

ইসলাম পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যবহারে জাঁকজমক ও আড়ম্বরতা নিষিদ্ধ করেছে। কুরআন এ সম্পর্কে বলেছে:

> 'আল্লাহ জাঁকজমকপূর্ণ (গর্বিত) লোককে পছন্দ করেন না।' (সূরা হাদীদ: আয়াত ২৩)।



www.pathagar.com

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

> 'যে ব্যক্তি জাঁকজমক বা গর্ব দেখানোর জন্য তার পোশাক জমি পর্যন্ত স্পর্শ করায় (বিনা কারণে পোশাক লম্বা করে) আল্লাহ শেষ বিচারের দিনে তার দিকে তাকাবেন না।' (বুখারী)।

পোশাক-পরিচ্ছদ অবশ্যই পরিষ্কার হতে হবে। কারণ, ইসলাম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উপর জোর দিয়েছে। মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

> 'পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন কর। কারণ ইসলাম ধর্মে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।' (ইবনে হারান)।

হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্ত্রীলোকদেরকে স্বর্ণালংকার ও সিল্কের বস্ত্র পরিধান করার অনুমতি দিয়েছেন। তিনি এগুলো পুরুষদের পরিধান করার অনুমতি দেননি। এর কারণ, সম্ভবত এগুলো স্ত্রীলোকদের জন্যই প্রকৃতিগতভাবে উপযুক্ত এবং পুরুষদের জন্য খুব একটা উপযুক্ত নয়।

পুরুষ ও স্ত্রীলোক অবশ্যই শালীনতাপূর্ণ পোশাক পরিধান করবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ হচ্ছে যে, মানুষ তার দেহ যথাযথভাবে আচ্ছাদন করবে। পুরুষদের নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখতে হবে। এছাড়া অন্যান্য অংশ বিভিন্ন কারণে খোলা রাখা যেতে পারে। স্ত্রীলোক অবশ্যই তার দেহ যথাযথভাবে ঢেকে রাখবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, একটি বয়স্ক মেয়ের জন্য তার দেহ খোলা রাখা ঠিক নয়। সে অবশ্যই তার মুখমণ্ডল ও হাতের সামনের অংশ খোলা রাখতে পারে। (আবু দাউদ তার হাদিস গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন)।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন যে, স্ত্রীলোকদের এমন পাতলা পোশাক পরতে অনুমতি দেওয়া হয়নি যা তার শরীর দেখাতে পারে। (ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন)। ইসলাম মেয়েদের বয়স হওয়ার পর ভাল করে বুক ঢেকে ওড়না পড়তে বলেছে। ফ্যাশনের নামে অনেক কিশোরী ও যুবতী ওড়না পরা বাদ দিয়েছে। অনেকে আবার গামছার মতো ওড়না গলায় জড়িয়ে রাখছে অথবা একদিক দিয়ে ঝুলিয়ে রাখছে। ওড়না গামছা নয়; যা দিয়ে ভাল করে মাথা ও বুক ঢাকা হয় না তাকে ওড়না বলা চলে না। এই প্রবণতা রোধ করা প্রয়োজন। তা না হলে পরবর্তীকালে কিশোরীদের মধ্য পাশ্চাত্যের মতো স্কার্ট ও হাফ প্যান্ট পরার রেওয়াজ চালু হয়ে যেতে পারে।

সূরা নূরের ৩১ নং আয়াতে আল্লাহ পাক নারীদের ওড়না পরার নির্দেশ দিয়েছেন। আয়াতটি হলো:

> মুসলিম নারীদেরকে বলুন তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে; তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশ



www.pathagar.com

পায় তা ব্যতীত তাদের সাজসজ্জা ও সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে, তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার ওড়না দিয়ে আবৃত করে। (সূরা নূর: আয়াত ৩১)।

উপরের বিধান ঘরে-বাইরে দু'স্থানেই প্রযোজ্য। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সূরা নূরের ৩০নং আয়াতে পুরুষদেরকেও তাদের দৃষ্টি সংযত রাখার ও তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উপরোক্ত আয়াতে 'খুমুর' (এক বচন 'খিমার') শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'খিমার' শব্দের অর্থ 'ওড়না' বা চাদর জাতীয় পোশাক। জাহিলিয়াতের যামানায় স্ত্রীলোকেরা মাথার উপর এক প্রকারের চাদর দ্বারা পিছনের খোপা বেঁধে রাখত। সম্মুখের দিকের বোতাম খোলা থাকত। এতে গলা ও বুকের উপরাংশ স্পষ্ট দেখা যেত। বুকের উপর কোর্তা ছাড়া আর কিছু থাকত না (ইবনে কাসীর, কাশশাফ, মুহাম্মদ আসাদ লিখিত 'মেসেজ অব দি কুরআন', মাওলানা মওদুদীকৃত তাফহীমুল কুরআন, সুরা নূরের তাফসির অংশ)। এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর মুসলমান নারী ও কিশোরীদের মধ্যে ওড়না ব্যবহার করার রেওয়াজ চালু হয়। ঈমানদার মহিলারা এ নির্দেশ শুনে অনতিবিলম্বে তদনুযায়ী আমল শুরু করেন। এর প্রশংসা করে হযরত আয়েশা (রা:) বলেছেন, যখন সূরাটি নাযিল হয় তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হতে লোকেরা শুনে নিজের স্ত্রী, কন্যা ও বোনদেরকে এ আয়াতের কথা শুনায়। আয়াত শুনে প্রত্যেকে উঠে ওড়না বা চাদর দিয়ে সর্বাঙ্গ জড়িয়ে নেয়। পরের দিন ফজরের নামাজে যত স্ত্রীলোকই মসজিদে নববীতে হাজির হয় তারা সকলেই ঐভাবে ওড়না বা চাদর পরা ছিল। এ পর্যায়ের আর একটি বর্ণনায় হযরত আয়েশা (রা:) বলেন যে, নারীরা পাতলা কাপড় পরিত্যাগ করে মোটা কাপড়ের ওড়না বানিয়ে নিয়েছিল। (তাফসিরে ইবনে কাসীর, আবু দাউদ, কিতাবুল লিবাস; তাফহীমূল কুরআন, সূরা নূরের তাফসির)।

উপরের আলোচনায় সুস্পষ্ট হয় যে, মাথা ও বুক ঢেকে নারী ও কিশোরীদের ওড়না পরার নির্দেশ কুরআন থেকে এসেছে। এটা কারো বানানো বিধান নয়। অথচ অধিকাংশ লোক জানে না যে, ওড়না পরা কুরআনের নির্ধারিত অবশ্য কর্তব্য। এছাড়া অন্যান্য প্রমাণের ভিত্তিতে 'গায়ের মাহরামদের' (অর্থাৎ যাদের সঙ্গে কোনো নারীর বিবাহ বৈধ) সামনে মাথা ঢাকা ফরজ এবং চেহারা, হাতের সামনের অংশ ও পায়ের পাতা ছাড়া শরীরের কোনো অংশ খোলা রাখা বৈধ নয়। (আবু দাউদ ও হিদায়া, নজর অধ্যায়)।

পোশাকের ফ্যাশনের নামে কুরআনের বিধান অমান্য করে আজ ওড়না উঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা অনেকে করছেন। অনেক বয়স্ক মেয়েকে ওড়না ছাড়া বাইরে চলাফেরা করতে দেখা যাচ্ছে। টেলিভিশনের অনেক অনুষ্ঠানাদিতেও ওড়না ছাড়া মেয়েদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে ও অংশগ্রহণ



www.pathagar.com

করতে দেওয়া হচ্ছে। অথচ ওড়না ব্যবহার ইসলামী শালীনতার সর্বোত্তম উদাহরণ। বাংলাদেশের মুসলিম জনগণের দায়িত্ব হচ্ছে এ সংক্রান্ত কুরআনের নির্দেশ কার্যকরী করা।

আমাদের পোশাক প্রস্তুতকারকদের প্রভাবিত করা কর্তব্য যেন তারা উপযুক্ত ওড়না ও শেলোয়ারসহ পোশাক ডিজাইন করে। আর তারা যেন এমন পোশাক ডিজাইন না করে যার মাধ্যমে সমাজে ইসলামী শিক্ষার বিরোধী বেহায়াপনা ছড়িয়ে পরে।

ইসলাম স্ত্রীলোকের সম্ভ্রমের প্রতি মর্যাদা দেয় এবং খারাপ লোকদের ক্ষুধার্ত চক্ষু থেকে নিরাপদে রাখতে চায়। তাই ইসলাম স্ত্রীলোকদের তার সাধারণ পোশাকের উপরে চাদর ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছে, যখন সে কাজের জন্য বা অন্যান্য উদ্দেশ্যে বাইরে যায়। কুরআন এ সম্পর্কে বলেছে:

> হে নবী! আপনার পত্নী, কন্যা ও মুমিনদের নারীদেরকে চাদর (মাথা ও বুক আচ্ছাদন করে) পরিধান করতে বলুন। এটাই ভালো স্ত্রীলোকের পরিচয়ের উত্তম পথ এবং এতে করে তাদের কখনও বিব্রত করা হবে না। (সূরা আহযাব: আয়াত ৫৯)।

চাদরটি বড় হওয়া সঙ্গত। চাদরের বুনন ভাল হওয়া প্রয়োজন। মহিলাদের দিকে নজর দেওয়া নিয়ে বিখ্যাত ফিকাহ্র গ্রন্থ হিদায়াতে প্রাথমিক যুগের হানাফী ইমামদের মতামত নিম্নলিখিতভাবে উল্লিখিত আছে, 'বেগানা পুরুষের নারীর চেহারা ও হাতের তালু ছাড়া অন্য অংশের দিকে দৃষ্টি করা জায়েজ নহে। কেননা আল্লাহ বলেছেন, 'নারীরা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না, কেবল সে সৌন্দর্য ছাড়া যা স্বতই প্রকাশ হয়ে পড়ে।' তাছাড়া চেহারা ও হাত প্রকাশ করার প্রয়োজন আছে পুরুষদের সঙ্গে বিভিন্ন কাজ-কারবারে লেনদেন করার জন্য। আবু হানিফা বলেছেন, পায়ের দিকেও নজর করা জায়েজ। কেননা ইহারও প্রয়োজন অনেক সময় দেখা দেয়। আবু ইউসুফ হতে বর্ণিত আছে হাতের কনুই পর্যন্ত দেখা জায়েজ। কারণ ইহাও অনেক সময় স্বতই প্রকাশ হয়। তবে কুচিন্তা হতে নিরাপদ না হলে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া চেহারার দিকে তাকাবে না।' (হিদায়া, নজর অধ্যায়)।

যদি মানব জাতি ইসলাম প্রদত্ত পোশাক-পরিচ্ছদের নীতি মেনে চলে, তাহলে তা অবশ্যই পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সম্ভ্রম নিশ্চিত করবে এবং একটি সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করবে।



www.pathagar.com

# পতিতাবৃত্তি ঃ কারণ ও প্রতিকার

আমাদের দেশে অন্যান্য স্থানের মতো মংলাতেও বারবনিতাদের এক বড় কলোনী আছে। এদের খদ্দের হচ্ছে স্থানীয় লোকজন ও বিদেশী জাহাজের নাবিকরা। শুধু মংলা কেন, সারাদেশেই অসামাজিক কার্যকলাপের প্রসার হচ্ছে। সারাদেশের অধিকাংশ থানায় বোধহয় বারবনিতাদের ছোট বা বড় আস্তানা গড়ে উঠেছে। এজন্য এ সমস্যা সমাধানে আমাদেরকে সমস্যার গোড়ায় যেতে হবে। গোড়ার দিকে যাবার আগে সমস্যার প্রকৃতি সম্পর্কে আরেকটু আলোকপাত করা দরকার।

সমস্যাটি পুরাতন তবে আমার মনে হয়, বৃটিশরা আসার আগে পতিতাবৃত্তি এদেশে সরকারি মঞ্জুরীপ্রাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক বা সংঘবদ্ধ রূপ পরিগ্রহ করেনি। বৃটিশ আমলেই পতিতাবৃত্তি বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। তদানীন্তন শাসক, হিন্দু জমিদার ও ভূ-স্বামী শ্রেণি ছিল এই পতিতাবৃত্তির জন্মদাতা। এদেশের মানুষের নৈতিক বিকৃতি সাধন ছিল এর অন্যতম লক্ষ্য।

বৃটিশ শাসনের পর নতুন করে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার শুভলগ্নে বাংলাদেশের গ্রাম-গঞ্জ থেকে পতিতাবৃত্তির অবসান ঘটে। কিন্তু শহরের আনাচে-কানাচে বৃটিশ শাসক চক্রের অধঃস্তন এদেশীয় শাসকরা পতিতাবৃত্তির কলঙ্ক স্পট নানা অজুহাতে আগলে রাখে। উত্তরকালে ধর্মীয় শিক্ষা বিবর্জিত শিক্ষার ফল হিসেবে বিজাতীয় অর্থ ব্যবস্থার বদৌলতে জনগণের মধ্যে আর্থিক বৈষম্য ও শোষণ-নিপীড়ন বৃদ্ধি পায়। এসবকেই মূলধন করে শহরের ভিড়ে লুকিয়ে থাকা পতিতাবৃত্তি আজ পাখা মেলেছে। আজ গোটা দেশে প্রায় ১ লক্ষ হতভাগ্য নারী পতিতাবৃত্তিতে রয়েছে। এসব হতভাগ্য মেয়ে সামাজিক অবস্থারই এক অসহায় শিকার। স্বেচ্ছায় হয়তো কেউ এ পথে আসতে পারে, কিন্তু তাদের সংখ্যা দু'-চার জনের বেশি হবে না। অধিকাংশই এ পথে এসেছে বাধ্য হয়ে। পতিতাবৃত্তির মূলে দারিদ্র্য এবং দারিদ্র্যজনিত পরিবেশ পরিস্থিতিই চৌদ্দআনা ক্ষেত্রে সক্রিয়। এই দারিদ্র্যের কারণ অনেক। দেশে সরকার আছে কিন্তু দেশের বিত্তহীন ও সহায়হীনদের অভিভাবকত্ব করার কেউ নেই। ফলে বিত্তহীন ও সহায়হীন মেয়েদের অনেকে দুশ্চরিত্র লোকের শিকারে পরিণত হয়ে অবশেষে পতিতালয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

নদী শিকস্তির কারণে প্রতি বছর বাংলাদেশে অন্তত ১ লক্ষ লোক পথে দাঁড়াচ্ছে। এদের অন্তত ৫০ হাজার শিশু ও যুবতী নারী। এই নদী শিকস্তি



www.pathagar.com

লোকদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত দুর্বল, তারা শহরে এসে ভিড় জমাচ্ছে। এদেরকে রাস্তাঘাটে থাকতে হয়। এসব সহায়সম্বলহীন গরীবরা শেষ পর্যন্ত নারী ব্যবসায়ীদের হাতে পড়ে।

তাছাড়া বাংলাদেশে এ পর্যন্ত যতগুলো দুর্ভিক্ষ হয়েছে, সবগুলোতেই মানুষের দাম কমে গেছে, মেয়ে মানুষের দাম কমেছে আরও বেশি। দেখা গেছে, একটি রুটির বিনিময়ে একটি মেয়ে স্বাভাবিক জীবন ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। ৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ এর একটি দৃষ্টান্ত। এই দুর্ভিক্ষের সময় দেখা গেছে নিম্নবিত্ত ও বিত্তহীন অনাহারী পরিবারগুলোর মেয়েরা দুশ্চরিত্র ও টাউট লোকদের কবলে পড়ে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়েছে। লঙ্গরখানায় রুটি দুধ দেয়ার নাম করে অনাহারী মেয়েদের সর্বনাশ করা হয়েছে। এসব মেয়েদের পক্ষে আর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাওয়া সম্ভব হয়নি। এরাই পরে পতিতালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে।

অতএব এ কারণ দূর না করে পতিতাবৃত্তি বিলুপ্তির কোনো উপায় নেই। অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে। দেশের নৈতিকতাকে রক্ষা করতে হলে সমস্যার গোড়ায় হাত দিতে হবে এবং নারীদের পুনর্বাসনে এক মহাপরিকল্পনা নিতে হবে। যেখানে প্রতিটি বড় শহরে এমনকি ছোট শহরেও ছিন্নমূল নারীরা হাজারো সংখ্যায় রাস্তায় বসবাস করে, সেখানে কি করে এ সমস্যা সরকারের প্ল্যানিং কমিশন, পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে না তা ভাবতেও অবাক লাগে।

এ সমস্যার সমাধানের জন্য মহাপরিকল্পনা নিতে হবে, শুরু করতে হবে নদী শিকস্তি সমস্যা থেকে। আমরা যেহেতু জানি যে, প্রতিবছর লক্ষাধিক লোক নদী ভাঙ্গনের শিকার হয়ে থাকে, সেহেতু এ সমস্যার মোকাবিলার জন্য আমাদের স্থায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। এজন্য পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠা করা উচিত। যেসব এলাকায় সাধারণত নদী ভাঙ্গন হয় তার আশেপাশে এসব লোকদের সাময়িক আশ্রয়দানের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক রিসিপশন ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করতে হবে। একই সঙ্গে ভূমি প্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় তাদের বিভিন্ন চরাঞ্চলে পুনর্বাসন ব্যবস্থা সম্পন্ন করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে ভূমি প্রশাসন মন্ত্রণালয়কে পূর্ব থেকেই ব্যবস্থা রাখতে হবে যেন, পরবর্তী নদী ভাঙনের শিকার লোকদের কোনো চরে বা বাসযোগ্য জমিতে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা যায়। নতুন পুনর্বাসিত এলাকায় স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কৃষির সুবিধা সৃষ্টির জন্য স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতার প্রয়োজন হবে। কাজেই উপরে উল্লিখিত কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে একটি সমন্বয় কমিটিকেও কাজ করতে হবে।

যদি এভাবে নদী শিকস্তিসহ অন্যান্য কারণে প্রতি বছরের জন্য একটি স্থায়ী পুনর্বাসন ব্যবস্থা নেয়া হয় তবে ভবিষ্যতে শহরাঞ্চলে ছিন্নমূল জনতার ভিড় অনেক কমবে, বিপন্ন মহিলাদের সংখ্যাও কমে আসবে।



www.pathagar.com

এভাবে নদী শিকস্তি, বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত, নিঃসম্বল ও ঠিকানাহীনদের পুনর্বাসনের সাথে সাথে বর্তমানে যেসব মহিলা অসামাজিক কাজে লিপ্ত আছে, তাদের পুনর্বাসনের জন্য আলাদা পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করতে হবে। আগেই বলেছি, এই ধরনের পতিতা মহিলাদের সংখ্যা এক লক্ষের বেশি হবে না। এদের মধ্যে যাদেরকে বাড়িতে ফিরিয়ে নেয়া সম্ভব হবে না, তাদেরকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উইমেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল হোমে পুনর্বাসিত করতে হবে। এজন্য অর্থের ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে। যদি সরকার সমাজকল্যাণ বিভাগ ও শিল্পমন্ত্রণালয় বিশেষ করে কুটির শিল্প কর্পোরেশনের মধ্যে সঠিক সমন্বয়ের ব্যবস্থা করেন তবে পুনর্বাসিত মহিলাদের ট্রেনিং দিয়ে যেসব দ্রব্যাদি তৈরি করা যায় তার বিক্রয়মূল্য হতেই তাদের খরচের একটা বড় অংশ উঠে আসবে। তাদের চরিত্র সংশোধনের যথাযোগ্য উদ্যোগ নিতে হবে। তারপর তাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজে নিয়োগ করাও সম্ভব হবে। নানা ধরনের শিল্পে ট্রেনিং পাওয়ার পর তাদের অধিকাংশই স্বাধীন জীবনে ফিরে যেতে পারবে। তারপরেও যারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারবে না তাদের দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে।

এসব পদক্ষেপ ছাড়া জাতীয় জীবনের এই বিরাট ক্ষত, অবক্ষয়, অসামাজিক কার্যকলাপের এই প্লাবন ও নারীদের অসম্মান কিছুতেই দূর করা সম্ভব হবে না। আমাদের এ কথা মনে রাখা দরকার, নারী পুনর্বাসনের বিষয়টি পুরুষের পুনর্বাসনের চেয়ে অধিক প্রাধান্য পেতে হবে। কারণ, পুরুষ রাস্তায় থাকলেও যে বিপদ হয় না সে বিপদ সহজেই মহিলাদের উপরে আসে।

পরিশেষে নারী ব্যবসায়ীদের জন্য কঠোর শাস্তি প্রবর্তন করা দরকার। যারা নারীদের অপহরণ করে বা তাদের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত করায়, তাদের জন্য মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত প্রবর্তন করা উচিত। এজন্য বাংলাদেশ দণ্ডবিধি আইনের ৩৪৮, ৩৬৬, ৩৭২, ৩৭৩, ৩৭৫, ৩৯৭, ৩৯৮ ও ৫০৯ ধারাকে পুরোপুরি নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে। আর নারী ব্যবসায়ী ও দালালদের খুঁজে বের করা কঠিন নয়। আজ দেশে যে পতিতালয়গুলো রয়েছে, তাকে কেন্দ্র করে প্রায় ২৫ হাজার দালাল, সর্দার, মালিক, গুণ্ডা ও মাসী কাজ করছে। এদের সহজেই খুঁজে বের করা যায় এবং এদের কালো হাতের কারসাজি দমন করতে পারলে পতিতাবৃত্তি আজ যে কাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে আছে, সেই কাঠামোকেই ধ্বসে দেয়া সম্ভব।

আমাদের বিশ্বাস এসব কোনো কিছুই আমাদের মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টির বাইরে নেই। তবে দৃষ্টি থাকলে কিংবা জ্ঞান অথবা জানা থাকলেই কোনো উপকার হয় না। চাই কাজ। দুঃস্থ মহিলাদের স্বার্থে, দেশ ও জাতির স্বার্থে এবং জাতীয় আদর্শের স্বার্থে আমাদের মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে এদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।



www.pathagar.com

# শহরাঞ্চলের ছিন্নমূল দুঃস্থ মহিলাদের পুনর্বাসন

এ প্রবন্ধে সেইসব দুঃস্থ মহিলাদের পুনর্বাসন প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে যারা গ্রামাঞ্চল থেকে শহরে-নগরে এসে পাড়ি জমিয়েছে। এসব মহিলার অধিকাংশই বিবাহিতা কিন্তু স্বামীহারা অথবা স্বামী পরিত্যক্তা। এদের প্রায় প্রত্যেকের সাথেই এক বা একাধিক শিশুসন্তানও দেখা যায়। এসকল শিশুর জীবিকা এই মহিলাদের উপরই নির্ভরশীল। এসব নারীর মধ্যে কিছুসংখ্যাক অবিবাহিতা যুবতী মেয়েও দেখা যায়। দুর্ভাগ্যবশত এদের ভরণপোষণ করার মতো অভিভাবক না থাকায় জীবিকার অন্বেষণে এরা শহরে চলে এসেছে। শহরের এসব দুঃস্থ মহিলাদের অবস্থা গ্রামীণ দুঃস্থ মহিলাদের তুলনায় অধিক সংকটময়। শহরে এদের জন্য নিরাপদ তেমন কোনো আশ্রয় নেই। ফলে এদেরকে দুষ্ট লোকদের ভয়ে সর্বদাই সন্ত্রস্ত থাকতে হয়। একইভাবে শহরের দুঃস্থ পুরুষদের ওই বিপদ নেই যা শহরের দুঃস্থ নারীদেরকে মোকাবিলা করে চলতে হয়। সুতরাং শহর-নগরের এসব দুঃস্থ নারীদের পুনর্বাসনের বিষয়টি অন্যান্য দুঃস্থ পুরুষ এবং নারীর তুলনায় অধিকতর গুরুত্ব পাবার দাবি রাখে।

স্বাধীনতাপূর্বকালে অবস্থা এতটা মারাত্মক ছিল না। কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধকালের ধ্বংসলীলা, স্বাধীনতা-উত্তর অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং ১৯৭৪-৭৫ সালের দুর্ভিক্ষ এই অবস্থাকে মারাত্মক রূপ দিয়েছে। এসময়ে শত শত পরিবার সর্বস্ব হারিয়ে অসহায় অবস্থায় গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে এসেছে। সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, একমাত্র ঢাকা মহানগরীতেই এই সব ছিন্নমূল মহিলার সংখ্যা ছিল তৎকালীন সময়ে ৫০ হাজার। দেশের সবক'টি শহর মিলিয়ে এদের সংখ্যা হয়তো এক লাখেরও বেশি হবে। এদের প্রায় প্রত্যেকের সাথেই আবার ২/৩টি করে শিশু সন্তানও রয়েছে। সুতরাং শিশু সন্তানসহ শহরাঞ্চলে ছিন্নমূল নারীর সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ৩ লাখ।

বয়সের দিক থেকে এসব ছিন্নমূল মহিলাদের মধ্যে ১৫ থেকে ৩০ বছরের নারীর ভিড়ই বেশি দেখা যায়। এসব দুঃস্থ নারীদের অসহায় অবস্থার সুযোগে বিভিন্ন শ্রেণির অপরাধ প্রবণ লোকেরা এদের উপর নানা অত্যাচার চালাতে কুণ্ঠাবোধ করে না। দুঃস্থ নারীরাও অনেক সময়েই এইসব দুষ্ট লোকের অসৎ ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। এভাবে সমাজ ক্রমেই নৈতিক দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ছে। বাড়ি ভাড়ার উচ্চমূল্যের কারণের সাথে শহরের এক


www.pathagar.com

বিপুলসংখ্যক স্বল্প বেতনভুক্ত চাকুরে ও শ্রমজীবীকে তাদের পরিবার-পরিজন হতে বিচ্ছিন্ন থেকে দিন যাপন করতে হয়। শহরে নানাবিধ অশ্লীল পত্র-পত্রিকা ও নৈতিকতা বিবর্জিত সিনেমা এদের নৈতিক মানের অবনতি ঘটাচ্ছে ব্যাপকভাবে। তদুপরি হাতের কাছে এসব ভাসমান দুঃস্থ নারীর অবস্থান যৌন অপরাধকে মারাত্মকভাবে বর্ধিত করছে।

মানবিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক দিক বিবেচনা করেই দুঃস্থ মহিলাদের পুনর্বাসনের প্রশ্নে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া উচিত। বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে এইসব ভাগ্যাহত মহিলাদের সাহায্যে এগিয়ে আসা। কিন্তু সমস্যার ব্যাপকতা ও গভীরতা এ বিষয়ে যে তৎপরতা দাবী করে সে তুলনায় আমাদের সরকার যে প্রচেষ্টা নিয়েছেন তা খুবই নগণ্য বলা যায়। এ ব্যাপারে সমস্যার যথাযথ সমাধান করতে হলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন হচ্ছে একটি ব্যাপক ভিত্তিক মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা। অবশ্য এই মাস্টার প্ল্যানকে দুই অংশে ভাগ করে তার এক অংশে (১) দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ নিতে হবে; অন্য অংশে (২) স্বল্পমেয়াদি বা আপাত পদক্ষেপসমূহ নেয়া যেতে পারে।

দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় প্রথমে আমাদেরকে সমস্যার মূল কারণ উদঘাটন করে তার সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে। দুঃস্থ মহিলাদের দলে দলে শহরে চলে আসার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে নদীর ভাঙন। বাড়িঘর, জমিজমাসহ বিরাট বিরাট গ্রাম ভেঙে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়া বাংলাদেশের নিত্য বছরের ব্যাপার। এর ফলে এ দেশে প্রতিবছর কমপক্ষে ৫০ হাজার মানুষ সর্বস্ব হারিয়ে অসহায় অবস্থায় পতিত হয়। এর মধ্যে ২০/২৫ হাজার মানুষ আবার নতুন করে তাদের আশ্রয় ও জীবিকার বিকল্প ব্যবস্থা কিছুতেই করতে পারে না। ফলে এরাই জীবিকার অন্বেষণে নগরে চলে আসে। এদের মধ্যেই সেই সব দুঃস্থ মহিলা ও শিশু রয়েছে। নদীর ভাঙন পীড়িত এসব দুঃস্থ মানুষের শহরে আগমন বন্ধ করতে না পারলে দুঃস্থ মহিলাদের সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হবে না।

যাহোক এ সমস্যার সমাধান নিয়মিতভাবেই করা যেতে পারে যেহেতু নদীভাঙন এলাকাসমূহ এবং ভাঙনের সময়কাল সবই আমাদের জানা আছে। এ উদ্দেশ্যে পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় ও ডেপুটি কমিশনারের পুনর্বাসন বিভাগ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের সমন্বয়ে একটি স্থায়ী পুনর্বাসন বিভাগ স্থাপন করা যেতে পারে। দেশের যে সব এলাকায় সাধারণত নদীর ভাঙন হয়ে থাকে সেসব এলাকায় এর শাখা অফিস খুলে সহজেই পুনর্বাসন কাজ পরিচালনা করা যেতে পারে। মহকুমা অফিস নদী ভাঙন এলাকায় যথাসময়ে রিসিপশন ক্যাম্প স্থাপন করে নতুন করে ভাঙনের কবলে নিপতিত লোকদেরকে এ ক্যাম্পে অস্থায়ীভাবে আশ্রয় দেবে। সেই সাথে অন্যান্য চর এলাকা কিংবা নতুন করে জেগে ওঠা অঞ্চলে এমন উন্নয়ন সাধন করা উচিত যাতে ভাঙনের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত নিরাশ্রয় লোকদেরকে সেখানে পুনর্বাসিত



www.pathagar.com

করা যায়। এজন্য কৃষি, শিক্ষা, সমাজকল্যাণ এবং ভূমি প্রশাসন মন্ত্রণালয়সমূহের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ে সমন্বয় সাধন করা দরকার যাতে এসব নতুন এলাকাসমূহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয়, কৃষি, কৃষিঋণ এবং অন্যান্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনার দিক থেকে যথার্থভাবে পুনর্বাসন উপযোগী করা সম্ভব হয়।

দ্বিতীয়ত, দেশে ব্যাপকভাবে বা স্থানীয়ভাবে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে সাথে সাথে এমন ব্যবস্থা নেয়া দরকার যাতে দুর্ভিক্ষ পীড়িত দুঃস্থ জনতা শহরে চলে যেতে বাধ্য না হয়। এজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবশ্যই নেয়া উচিত। যে কোনো স্থানে দুর্ভিক্ষ অবস্থা দেখা দেয়ার সাথে সাথে সেখানে গ্রামভিত্তিক লঙ্গরখানা খুলতে হবে। কেননা গ্রামে গ্রামে লঙ্গরখানার পরিবর্তে ইউনিয়ন ভিত্তিক লঙ্গরখানা তেমন উপকারী হয় না। বিশেষ করে মহিলাদের পক্ষে প্রতিদিন খাবারের জন্য এত দূরে যাওয়া খুব কষ্টকর হয়ে পড়ে। এজন্য গ্রামে গ্রামে লঙ্গরখানা খুলে স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষকে যথার্থভাবে কাজে লাগান উচিত। এসব দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপসমূহ কার্যকর করা হলে নদীর ভাঙন এবং দুর্ভিক্ষজনিত কারণে শহরে লোক চলে আসার প্রবণতা বন্ধ হবে।

এরপর স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে যে সব নারী ইতোমধ্যেই শহরে চলে এসে ভাসমান অবস্থায় জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে সেসব দুঃস্থ নারীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। উপরে প্রস্তাবিত পুনর্বাসন বিভাগের উপরই এ দায়িত্ব ন্যস্ত করতে হবে। বিভাগ প্রতিটি প্রধান শহরে অস্থায়ী ক্যাম্প স্থাপন করে শহরে ভাসমান নারী এবং তাদের শিশু সন্তানদেরকে উক্ত ক্যাম্পে স্থানান্তরিত করবে। অতঃপর শহরের মিল-ফ্যাক্টরিতে বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে যাদেরকে কাজে নিয়োগ করা সম্ভব তাদেরকে কাজে লাগাতে হবে। বাকি মহিলাদেরকে তাদের নিজ নিজ গ্রাম বা ইউনিয়নে পাঠিয়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পুনর্বাসিত করতে হবে। পূর্বে উল্লিখিত সংখ্যা ধরে হিসাব করে বণ্টন করা হলেও গ্রাম প্রতি বা ইউনিয়ন প্রতি এদের সংখ্যা হবে ৫ জন বা ৭৫ জন। প্রতি গ্রামে এই অল্প ক'জন দুঃস্থ মহিলাদের পুনর্বাসন করা খুব কঠিন কাজ নয়।

সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রচেষ্টা চালিয়ে এদের কিছু সংখ্যককে তাদের আত্মীয়-স্বজনের কাছে পুনর্বাসিত করা যেতে পারে। তবে অধিকাংশ দুঃস্থ নারীকে পুনর্বাসিত করার দায়িত্ব পুনর্বাসন বিভাগকেই নিতে হবে। অবশ্য এ কাজে শিল্প মন্ত্রণালয়, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন, সমবায় মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য সকল উপায়ে পুনর্বাসন বিভাগকে সহযোগিতা দিতে হবে।

যাই হোক, সরকারকে একাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। উন্নয়ন কাজের জন্য যেখানে হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে সেখানে এত বিরাট একটা মানবিক কারণে সামান্য কয়েক শত কোটি টাকা খরচ অবশ্যই করা উচিত।



www.pathagar.com

# একজন শ্রেষ্ঠ নারী বেগম রোকেয়া

বেগম রোকেয়া ছিলেন একজন চিন্তাবিদ। সে সাথে সত্যিকার অর্থেই একজন ইসলামি চিন্তাবিদও ছিলেন। যিনি ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা, গবেষণা ও ব্যাখ্যা করেন তিনিই ইসলামি চিন্তাবিদ। তিনি ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তি বা ভুল দূর করেন। কাজেই এসব অর্থে বেগম রোকেয়াকে ইসলামি চিন্তাবিদ বলতে হবে। অবরোধ, নারী স্বাধীনতা, পর্দা, অশ্লীলতা, যৌতুক প্রথা, বিধবা বিবাহ, বাল্য বিবাহ, তালাক নিয়ে ভ্রান্তি ও বাড়াবাড়িসহ বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি ইসলামের সঠিক অবস্থান তুলে ধরেছেন।

রোকেয়াকে নিয়ে যারা বিতর্ক সৃষ্টি করতে চান, তারা তার সামগ্রিক লেখনী ও জীবনের শিক্ষা বাদ দিয়ে খণ্ডিত কিছু উদ্ধৃতি ব্যবহার করেন। এসব বিতর্ক ইতোমধ্যেই নানাভাবে অত্যন্ত সার্থকতার সাথেই খণ্ডন করা হয়েছে। বেগম রোকেয়ার একটি উদ্ধৃতি দেয়া হয় যাতে তিনি বলেছেন,

> 'আমরা প্রথমত যাহা মানি নাই পরে ধর্মের আদেশ ভাবিয়ে শিরোধার্য করিয়াছি। ... আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ ঐ ধর্মগুলোকে ঈশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।'

এখানে কিছু ভুল বোঝাবুঝি হতেই পারে। কিন্তু যদি রোকেয়ার সামগ্রিক সাহিত্যের আলোকে এ মন্তব্য ব্যাখ্যা করা হয় তাহলে দেখা যাবে এসব হচ্ছে মূলত তার ক্ষোভের কথা। এখানে ধর্মগ্রন্থ বলতে কোনোভাবেই কুরআন বা হাদিসকে বোঝানো হয়নি। বরং সে সময় ধর্মগ্রন্থের নামে কিছু অর্ধশিক্ষিত ব্যক্তির বই প্রচলিত ছিল যাতে নারী অধিকারের বিপক্ষে বলা হতো। কুরআনে সামগ্রিকভাবে নারী পুরুষের সাম্যের কথা বলা হয়েছে। তিনি আরো বলেছেন,

> 'যদি ঈশ্বর কোনো দূত রমণী-শাসনের নিমিত্ত প্রেরণ করিতেন, তবে সে দূত বোধহয় কেবল এশিয়ায় সীমাবদ্ধ থাকিতেন না। দূতগণ ইউরোপে যান নাই কেন? আমেরিকা এবং সুমেরু হইতে কুমেরু পর্যন্ত যাইয়া 'রমণী জাতিকে নরের অধীনে থাকিতে হইবে' ঈশ্বরের এই আদেশ শুনান নাই কেন? ঈশ্বর কি কেবল এশিয়ারই ঈশ্বর?'

তার এ কথায় দূত বলতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মনে করা সঙ্গত হবে না। বরং যেসকল পুরুষ অন্যায়ভাবে এ অঞ্চলে নারীকে দাবিয়ে



www.pathagar.com

রাখার চেষ্টা করেছেন তাদেরকেই বোঝানো হয়েছে। কেননা রোকেয়া তার বিভিন্ন লেখায় হজরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিভিন্ন প্রসঙ্গে প্রাণভরে স্মরণ করেছেন। তারচেয়েও বড় কথা 'মতিচূর' প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'স্ত্রী জাতির অবনতি' ১৩১১ ভাদ্রের 'নবনূর'-এ প্রকাশিত হয়েছিল 'আমাদের অবনতি' শিরোনামে। এতে মূল প্রবন্ধের ২৩'শ থেকে ২৭'শ পর্যন্ত পাঁচটি পরিচ্ছদ পরিবর্জিত হয়ে নতুন সাতটি অনুচ্ছেদ সংযোজিত হয়েছিল যাতে আর কোনো ভুল বোঝাবুঝির সুযোগ ছিল না। অথচ আজও রোকেয়ার এ দু'-একটি উদ্ধৃতিকে অপব্যাখ্যা করা হচ্ছে। (দ্রষ্টব্য: এ এ রহমান, বেগম রোকেয়া ও ইসলাম, দি উইটনেস কর্তৃক প্রকাশিত 'রোকেয়া সন্ধানে' হতে)।

১৩৩৮ সালের মাসিক মোহাম্মদীতে রোকেয়া মুসলমানদের নামের বিকৃতির বিষয়ে কঠোরভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মুসলমানদের নাম আরবি ভাষায় হবে এটিই ট্রাডিশন। এটি তাকে সঠিক পরিচয় দেয়। রোকেয়া এর উপর দৃঢ় থাকতে বলেছিলেন। অথচ আমাদের বর্তমান প্রজন্মকে এ থেকে দূরে সরানোর চেষ্টা চলছে। আমাদের নামের এরকম বিকৃতি থেকে সরে আসতে হবে।

তিনি ১৩৩৮ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা মাসিক মোহাম্মদীতে স্পষ্টভাবে বলেছেন,

> 'ছেলেবেলায় আমি মার মুখে শুনতাম, 'কোরআন শরীফ ঢাল হয়ে আমাদের রক্ষা করবে' এসব কথা অতি সত্যি। কোরআন শরীফের সার্বজনীন শিক্ষা আমাদের নানা কুসংস্কারের বিপদ থেকে রক্ষা করবে। কোরআন শরীফের বিধান অনুযায়ী ধর্ম-কর্ম আমাদের নৈতিক ও সামাজিক অধঃপতন থেকে রক্ষা করবে।'

এতো স্পষ্ট বক্তব্যের পরও কোনো কোনো বুদ্ধিজীবীর মতে রোকেয়া কোনো বিশেষ ধর্মকে বাতিল করেননি, বাতিল করেছেন সর্ব ধর্মকেই। বস্তুত এ ধরনের মন্তব্য চরম মিথ্যাচার ও একাডেমিক ডিজঅনেস্টি। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এরাই বাংলাদেশের বর্তমান সময়ের নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিজীবী সেজে বসে আছে। বেগম রোকেয়া একজন উঁচু মানের সমাজ সংস্কারক ছিলেন। উপমহাদেশের গত হাজার বছরের ইতিহাসে তার মতো এতো বড় সমাজ সংস্কারক খুব কম ছিলেন। শুধু উপমহাদেশে নয় সমগ্র বিশ্বের কয়েকজন সেরা সমাজ সংস্কারকের নাম বললে তার নাম বলতে হয়। এটি সরকার ও আমাদের দায়িত্ব যে এতো বড় প্রতিভাকে সমগ্র বিশ্বে পরিচিত করা।

যারা প্রকৃতই রোকেয়ার চিন্তা-চেতনাকে তুলে ধরতে চান তাদের দায়িত্ব হচ্ছে বেগম রোকেয়ার অপব্যবহার রোধ করা। বেগম রোকেয়াকে যারা ইসলাম বিরোধীদের দলভুক্ত বলে প্রচারণা চালান তাদের শৃঙ্খল থেকে রোকেয়াকে মুক্ত করে সঠিকভাবে তুলে ধরার দায়িত্ব আমাদেরই। কুরআনে বলা হয়েছে,

> সকল মানুষের রূহ একই সঙ্গে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন।
> (সূরা আরাফ ঃ আয়াত ১৭২)।



www.pathagar.com

অতঃপর আল্লাহ বলেন, তিনি মানব ও মানবী উভয়কে সর্বোত্তম কাঠামোতে সৃষ্টি করেছেন (সূরা তীন)। এরপরও যারা বলেন, নারী পুরুষের চাইতে দুর্বল বা নারীর হৃৎপিণ্ড ছোট কিংবা মগজ ছোট - তারা কুরআনের বিপরীত কথা বলেন। সূরা নিসার প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, সকল মানব-মানবী হযরত আদম (আ.) থেকে সৃষ্ট। অতএব আমাদের মধ্যে অকারণ বিভাজন কেন? নারী স্বাধীনতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময় থেকেই শুরু হয়েছে। বর্তমান শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ আল্লামা আবদুল হালিম আবু শুক্কাহ-এর গবেষণার ফসল ছয় খণ্ডের বিশাল গ্রন্থ 'রাসূলের যুগে নারী স্বাধীনতা' থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে দুঃখের বিষয় মুসলমানরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষাকে ধারণ করতে পারেনি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দৃষ্টিতে মেয়েদের দেখতেন সে দৃষ্টিতে আমরা দেখি না। প্রাথমিক ইসলামি পৃথিবী ছিল তেমনই এক পৃথিবী যেখানে পুরুষ ও নারী ছিল একে অপরের বন্ধু ও অভিভাবক। তারা একসাথে নামাজ পড়তেন, সামাজিক কাজ করতেন, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করতেন – এমনকি যুদ্ধেও অংশ নিতেন।

বেগম রোকেয়াও সেরকম এক পরিপূর্ণ ইসলামি সমাজে বিশ্বাস করতেন। তারপরও তাকে ইসলাম বিরোধী হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়। তার ব্যাপারে সমাজে বিভ্রান্তি লক্ষ্য করা যায়। বলা হয়, তিনি ধর্ম ও পর্দার বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। এটি একেবারেই একটি ভুল ধারণা।

বিশ্বের অন্যান্য স্থানের ন্যায় আমাদের উপমহাদেশের নারীরা বহুকাল যাবৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বঞ্চিত ও নির্যাতিত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীদের ব্যাপারে সংকীর্ণতা আমাদের সমাজের বৈশিষ্ট্য, যার প্রধান কারণ হলো কুসংস্কার ও বাড়াবাড়ি। এসবের বিরুদ্ধে যে কণ্ঠটি সবচেয়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছে তা হলো বেগম রোকেয়া। তারই প্রচেষ্টায় একশ' বছর পূর্বের তুলনায় বর্তমানে নারীর অবস্থা কিছুটা উন্নতি লাভ করেছে বলে মনে হয়। বেগম রোকেয়া যে সামাজিক প্রেক্ষাপটে অন্ধত্ব ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন সে বিবেচনায় তার বলিষ্ঠতা ও সাহসিকতা আমাদেরকে অভিভূত করে। সে সমাজে এমন বিপ্লবী কথা উচ্চারণ করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। কিন্তু বেগম রোকেয়া নির্ভীক চিত্তে তার বক্তৃতায়, লেখায় ও কাজে নারী মুক্তির কথা ব্যক্ত করেছেন এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণের কথা বলেছেন।

সেসব দিক থেকে বেগম রোকেয়া যে কোনো বিবেচনায় এ উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ কয়েকজন নারীর একজন।



www.pathagar.com

# পতিতাবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রতীক শবমেহের

শবমেহের একটি ছন্দময় অপূর্ব সুন্দর নাম। গ্রামবাংলার এক কিশোরী যে পতিতাবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জীবন দেয়। শত অত্যাচারের মুখেও সে এই বৃত্তির পরিচালকের নিকট আত্মসমর্পণ করেনি। তাই শবমেহের নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে, পতিতাবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের এক প্রতীক।

শবমেহেরের মায়ের মুখে জানা যায়, সে নরসিংদী জেলার মাধবদী গ্রামে জন্মগ্রহণ করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের কয়েক মাস পর শবমেহেরের পিতা মারা যান। দরিদ্র ঘরের সন্তান শবমেহেরকে তখন তার মা চেনারদি গ্রামে সেলিম খাঁর বাড়িতে কাজ দেয়। সেখানে জরিনা নামে এক মেয়ের সঙ্গে তার সখ্যতা গড়ে ওঠে। এই জরিনার খালুর চোখে পড়ে যায় শবমেহের। বেড়াবার নাম করে জরিনা শবমেহেরকে খালুর বাড়ি নিয়ে যায়। এই জরিনা ও তার খালুই শবমেহেরকে টানবাজার পতিতালয়ে রহিমা সর্দারণীর নিকট বিক্রি করে দেয় (খিলগাঁও ইসলামী পাঠাগার, ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'শবমেহের' স্মরণিকা হতে)।

শবমেহের পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। সে খদ্দেরদের ঘর থেকে বের করে দেয়। এরপর শুরু হয় তার উপর অকথ্য অত্যাচার। শবমেহেরের মায়ের বক্তব্যে জানা যায় যে, রহিমা রড দিয়ে শবমেহেরকে বুকে, পেটে প্রহার করে অজ্ঞান করে ফেলে। জ্ঞান ফেরার পর পুনরায় কারেন্টের শক দেয়। তারপর মুগুর দিয়ে তাকে পেটায়। শবমেহের অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকে। সে মারা গেছে মনে করে তাকে গর্তে ফেলে দিতে পাঠায় রহিমা। পথে তার একটু জ্ঞান ফিরে আসলে একটি মেয়েকে সে ধর্মের বোন ডেকে তাকে বাঁচাতে অনুরোধ করে। সে মেয়ে তখন তাকে রেল লাইনের ধারে এক লিচু গাছের নিচে রেখে দেয়। অপর এক লোক তাকে ট্রেনে তুলে নিয়ে আসে। অন্য একজন তাকে কমলাপুর থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে রেখে যায়। হাসপাতালের বারান্দায় সে একদিন ছিল। তারপর এক ওয়ার্ড বয় একজন ডাক্তারের সহযোগিতায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে দেয় (দ্রষ্টব্য: ঐ)। কয়েকদিন হাসপাতালে থাকার পরে সে ৯ এপ্রিল ১৯৮৫ সালে মারা যায়। তখন তার বয়স ছিল ১৪ বছর।



www.pathagar.com

নারায়ণগঞ্জের সেশন কোর্টে এ কেসের বিচার হয়েছিল। বিচারের রায় থেকে দেখা যায় যে, পোস্টমর্টেমে তার শরীরে অসংখ্য আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়। তার বাম উরুতে ১৬" x ৬", তার ডান উরুতে ১০" x ৩", অন্যান্য স্থানে ৪" x ৩", ২" x ১" এবং ২.৫" x ১" আঘাত পাওয়া যায়। এছাড়াও তার মাথা, ফুসফুস, যকৃত, কিডনী ও অন্যান্য সব স্থানে আঘাতের ফলে পুঁজ, রক্ত ইত্যাদি জমেছিল (শবমেহেরের মামলার আদালতের রায় হতে)।

এতসব অত্যাচার সত্ত্বেও শবমেহের নতি স্বীকার করেনি এবং পতিতাবৃত্তিকে গ্রহণ করেনি। তার বিদ্রোহের মাধ্যমে সে নারীত্বকে সম্মানিত করেছে। ৯ই এপ্রিল তাই শবমেহের দিবস পালিত হয়।

শবমেহেরের মতো হাজারো মেয়েকে বাঁচাতে হলে তাই পতিতাবৃত্তিকে সুপরিকল্পিতভাবে বন্ধ করতে হবে। আমরা সবাই জানি যে প্রতি বছর হাজার হাজার মেয়েকে জোর করে পতিতাবৃত্তিতে নিয়োগ করা হচ্ছে। পতিতাবৃত্তি বন্ধ না করে এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। অনেকে বলে থাকেন, পতিতালয় না থাকলে ধর্ষণ বৃদ্ধি পাবে - একথা যথাযথ নয়। ইউরোপ ও আমেরিকায় অনেক অনুমোদিত ও অননুমোদিত পতিতালয় থাকা সত্ত্বেও সেখানে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মহিলা ধর্ষিতা হচ্ছে। ধর্ষণের মূল কারণ অশ্লীল সামগ্রির বিস্তার। অবশ্য সব সমাজেই বদমাশদের দ্বারা কিছু ধর্ষণ হতে পারে। কিছু ধর্ষণের ভয়ে পতিতালয় খোলা রেখে লক্ষ লক্ষ মেয়ের সর্বনাশের পথ খোলা রাখা যায় না। পতিতালয় না থাকলে পতিতারা ছড়িয়ে যাবে এ কথাও গ্রহণযোগ্য নয়। পতিতালয় থাকলেও কিছু পতিতা ছড়িয়ে থাকে। তাদেরকে খুঁজে বের করে পুনর্বাসিত করতে হবে এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে শাস্তি দিতে হবে।



www.pathagar.com

# গৃহকর্মীর মূল্যায়ন ও মর্যাদা

ঘরে যারা কাজ করেন, তারা দুই ধরনের। এক গ্রুপে আছেন আমাদের মা, বোন ও স্ত্রীদের একটি অংশ। বাইরে আমরা যারা কাজ বা সার্ভিস করি, তাদের চেয়ে অনেক বেশি কাজ করেন এবং সময় দেন তারা। ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে তাদের কাজের সাধারণভাবে পূর্ণ মূল্যায়ন করা হয় না। এমনকি অনেকে মনে করেন তারা বেকার। তাদের কাজের মূল্য আসলে অনেক। তাদের ঘর পরিচালনার কাজ, সন্তানদের মানুষ করার কাজ, রান্নাবান্নার কাজ ইত্যাদির মূল্য যোগ করলে তার পরিমাণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্বামীর আয়ের চেয়ে অধিক হবে। কিন্তু বর্তমান আলোচনা তাদের বিষয়ে যারা বিভিন্ন গৃহে গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করে থাকে।

আমার পরিচিত এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তার বাসায় এক মহিলা কাজ করেন। তিনি সম্মানিত কৃষক পরিবারের কন্যা। অল্প বয়সে তার পিতা মারা যান। পরে আর্থিক দৈন্যের কারণে বাসার কাজ গ্রহণ করেন। তার বয়স চল্লিশ। কিন্তু বাসার ছেলেমেয়েরা তাকে 'তুমি' বলে, 'বুয়া' বলে। বুয়া শব্দটির উৎপত্তি যাই হোক না কেন, বর্তমানে তা তুচ্ছার্থেই ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশে বাসায় যারা কাজ করেন, তাদের বেশির ভাগই কিশোরী বা মোটামুটি বয়স্কা নারী এবং তাদের বেশির ভাগই এসেছেন গ্রামের কৃষক সমাজ অথবা যারা কোনো কারণে ভূমিহীন হয়ে পড়েছে এমন পরিবার থেকে। কৃষক সমাজ আমাদের দেশে সবচেয়ে সৎ সমাজ। তাদের মধ্যে অনীতি ও দুর্নীতি সবচেয়ে কম। কৃষক পরিবার থেকে আগতা এসব মহিলার বা গার্হস্থ্য কর্মচারীর পদের নাম 'বুয়া' বা এ ধরনের কেন হবে? এটিও তো একটি কাজ বা জব যা ঘরে করা হয়। এটি বাইরের সার্ভিসের মতোই একটি সার্ভিস। কেন তাদের নাম গৃহ ম্যানেজার বা ম্যানেজার বা সহকারী ম্যানেজার হতে পারে না? রাসূল (সা.)-এর এ ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল? তিনি তো তাদের 'আমার কন্যা' বা 'আমার পুত্র' বলতেন। এর আলোকে দেখলে আজকে যাদের 'গৃহভৃত্য' মনে করা হচ্ছে, তাদের পদবির পরিবর্তন দরকার; যেমন আমি আগে উল্লেখ করেছি। তাদের বেতন, কাজের সময়, ছুটি, সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে অনেক কথা আছে। আইনে তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুবই কম। এসব দিকে সবাইকেই নজর দিতে হবে। অসম্ভব কিছু নয়, বাস্তবসম্মত পদক্ষেপই নিতে হবে।

৮ ফেব্রুয়ারি ২০১০, দৈনিক নয়া দিগন্ত



www.pathagar.com

# শিশু গ্রহণ আইন

আমাদের দেশে যাদের সন্তান নাই তারা সাধারণত পালনের জন্য অন্যের সন্তান গ্রহণ করে থাকেন। পথে পাওয়া শিশু সরকারি প্রতিষ্ঠানে স্থান দেয়ার পর তাদের পুনর্বাসনের প্রয়োজন রয়েছে। এসব শিশুর অনেকেই পিতৃ-মাতৃ পরিচয়হীন হয়ে থাকে। কেননা, দু'-এক দিনের শিশুকেও অনেক সময় রাস্তায় ফেলে দেয়া হয় এ উদ্দেশ্যে যে, রাস্তা থেকে কেউ না কেউ তাদের তুলে নিয়ে লালনপালন করবে। সরকারি এতিমখানায় এতিমদেরও পুনর্বাসনের প্রয়োজন রয়েছে।

পাশ্চাত্যে এসব শিশুকে দত্তক হিসেবে গ্রহণ করা হয়। তাদেরকে সন্তান হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং তাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার দেয়া হয়। ঐ সব দেশে এ জন্য আইন রয়েছে। বাংলাদেশেও ১৯৭২ সালে আন্তঃদেশ দত্তক আইন করা হয়েছিল। সেই আইনের আওতায় বাংলাদেশের শিশুদের বিদেশীদের নিকট দত্তক দেয়া হতো। কিন্তু বিদেশে এসব শিশুদের অবৈধ ব্যবহারের কিছু ঘটনা ঘটার ফলে এই আইন বাতিল করা হয়।

বাতিল করার অন্য একটি কারণ ছিল - মুসলিম শিশুদের খৃস্টান বা অন্য ধর্মাবলম্বী হিসেবে গড়ে ওঠার সম্ভাবনা। এটা ছিল বাস্তব পরিস্থিতি। কেননা, দত্তক গ্রহণকারীরা ছিল সাধারণত আমেরিকা ও ইউরোপের খৃস্টান।

ইসলাম সব শিশুকে ভালোবাসার নজরে দেখে। ইসলাম পথে পাওয়া বাচ্চার (ফিকাহর পরিভাষায় যাদেরকে লাকিত বলে) অধিকারও রক্ষা করে। এসব অসহায় বাচ্চাকে পথ থেকে তুলে নেয়া ওয়াজিব। মুসলিম দেশে এসব শিশু পাওয়া গেলে তাদেরকে মুসলিম গণ্য করতে হবে (হিদায়া, লাকিত অধ্যায়)।

ইসলাম কোনো অভাবী পিতামাতার সন্তান বা অন্য অসহায় শিশুর দায়িত্ব গ্রহণকে খুবই ভালো কাজ মনে করে। তাদেরকে সন্তানের মতোই পালন করা কর্তব্য। তবে এসব শিশু তাদের আসল পিতার নামেই পরিচিত হবে। যদি পিতার নাম জানা না থাকে, তবুও তাদের সে শিশু পালকের বংশের শিশু এ মিথ্যা পরিচয় ইসলাম জায়েজ মনে করে না। এ রকম করা হলে ইসলামের উত্তরাধিকার ও বৈবাহিক আইনের জটিলতা ও পরিবর্তন সূচিত হয়। যার উত্তরাধিকার নাই তাকে উত্তরাধিকার দেয়ার অর্থ অন্যের উত্তরাধিকারে হস্তক্ষেপ করা।



www.pathagar.com

তেমনিভাবে যার সঙ্গে বিবাহ বৈধ (যেমন - পালকের কন্যা) তার সঙ্গে বিবাহ অবৈধ মনে করাও ইসলামী শরিয়ত বিরোধী মত এতে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও ইসলাম পালিতদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় আইনের বিরোধী নয় বরং সমর্থক। কেননা এসব শিশুদের অধিকার রক্ষা করাও ইনসাফের দাবি। এ রকম আইন না করা হলে শিশুরা অসহায় হয়ে থাকবে। তাই এসব শিশুদের স্বার্থরক্ষার জন্য বাংলাদেশে প্রয়োজনীয় আইন করা দরকার যাতে ব্যবস্থা থাকতে পারে যে পালিত শিশুর পূর্ণ ভরণপোষণের জন্য পালক দায়ী থাকবে এবং কোনো অবস্থাতেই এই শিশুকে মানসিক ও দৈহিক নির্যাতন করা যাবে না। তেমনিভাবে পালক পালিতের পক্ষে সম্পত্তির অনধিক ১/৩ অংশ উইল (অসিয়ত) করবে এ বিধানও থাকতে পারে। সরকারকেও এ ধরনের শিশুর স্বার্থ দেখার ক্ষমতা আইনে দেয়া যেতে পারে। এ বিধানও এ আইনে রাখা যেতে পারে যে, পালক যদি অভাবগ্রস্ত বা অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহলে তার ভরণপোষণ করা সক্ষম ও বয়স্ক পালিত ব্যক্তির দায়িত্ব হবে।

এ আইনের নামকরণ করা যায় 'বাংলাদেশ শিশু গ্রহণ ও প্রতিপালন আইন'।

৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮, দৈনিক ইনকিলাব



www.pathagar.com

# শিশু গ্রহণ ও পালন আইন প্রণয়ন

পৃথিবীর সব দেশেই কিছু পরিবারে সন্তান থাকে না। সেসব পরিবার সাধারণত পালনের জন্য অন্যের সন্তান গ্রহণ করে থাকে। এটি অত্যন্ত স্বাভাবিক। কারণ প্রত্যেকেরই সন্তানের কামনা থাকে। বাংলাদেশ দরিদ্র দেশ হওয়ার কারণে এখানে অসহায় শিশুর সংখ্যা অনেক। এসব শিশুর অনেককেই সন্তানহীন পরিবার পালনের জন্য গ্রহণ করে থাকে। অনেক পরিবার মানবিক দায়িত্ব মনে করেও এ ধরনের দু'-এক জন শিশুকে মানুষ করে থাকে। অনেকেই গরিব আত্মীয়-স্বজনের সন্তানকেও পালনের জন্য গ্রহণ করে থাকে।

অনেক সময় দু'-এক দিনের শিশুকে পথে পাওয়া যায়। বিশেষ করে অবৈধ সম্পর্কের মাধ্যমে যেসব শিশু জন্মগ্রহণ করে তাদেরকে পথে রেখে দেওয়া হয়, এই মনে করে যে কেউ না কেউ তাকে তুলে পালবে। প্রকৃতপক্ষেই অনেক সহৃদয় ব্যক্তি তাদের তুলে নিয়ে মানুষ করে থাকেন। এসব শিশুকে উদ্ধার করার জন্য সামাজিক ব্যবস্থাও থাকা উচিত। এসব অল্প বয়স্ক শিশুকে রক্ষা করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এজন্য প্রত্যেক হাসপাতালে এবং এতিমখানায় বিশেষ ব্যবস্থা থাকা উচিত।

বিশেষ করে অবৈধ শিশুদের পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার ১৯৭২ সনে 'আন্তঃদেশ দত্তক আইন' প্রণয়ন করেছিলেন। এ আইনের আওতায় বাংলাদেশের শিশুদের বিদেশীদের নিকট দত্তক দেওয়া হতো। পরবর্তীকালে এ আইন বাতিল করা হয়। বিদেশে এসব শিশুদের অপব্যবহার সংক্রান্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এ আইন বাতিল করা হয়েছিল। তদুপরি দেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক আমাদের দেশের মুসলিম শিশুদের খৃস্টানদের নিকট প্রতিপালিত হওয়া সঙ্গত মনে করেননি এবং এ দেশেই ব্যবস্থা করা তারা সঙ্গত মনে করেছেন। কেননা কিছু শিশুকে বিদেশে দত্তক দিলেই আমাদের সমস্যার সমাধান হবে না। দারিদ্র্যের যুক্তিতে তাদেরকে অন্য জাতির কাছে তুলে দেওয়া যায় না।

অবৈধ শিশু ছাড়া অন্য পালিত শিশুদের জন্যও আমাদের দেশে কোনো আইন নেই। তাই এসব শিশুর ভবিষ্যৎ নির্ভর করে পালকের মর্জির উপর। পালক যদি ভাল হন তাতে তাদের ভবিষ্যৎও উজ্জ্বল হয়। নতুবা তারা পরে



www.pathagar.com

নির্যাতিত হয়ে পড়ে। এসব কিছু বিবেচনা করে পালিতদের স্বার্থ রক্ষার জন্য আইন প্রণয়ণ করা প্রয়োজন।

এ ধরনের আইন প্রণয়নের সময় দেশের জনগণের ধর্মীয় আইনের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কেননা আমাদের জনগণের কাছে এমন কোনো আইন গ্রহণযোগ্য হবে না যা ধর্মের কোনো মূলনীতির বিরোধী হবে। এ প্রসঙ্গে ইসলাম এ সম্পর্কে কি বলে তা প্রথমত দেখা যেতে পারে। ইসলাম অসহায় শিশুকে অত্যন্ত ভালোবাসার নজরে দেখে। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতগুলো উল্লেখ করা হলো:

> হে নবী! লোকে তোমাকে ইয়াতিমদের সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, তাদের সুব্যবস্থা করা উত্তম। (সূরা বাকারা: আয়াত ২২০)।
>
> (আল্লাহ তোমদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন) সেই হুকুমগুলি যা অসহায় শিশুদের সম্পর্কে তোমাদের দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে এতিমদের প্রতি ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করবে।'(সূরা নিসা: আয়াত ১২৭)।
>
> এতিমদের তাদের ধন-সম্পদ দিয়ে দাও এবং তাদের সাথে সম্পদ বদল করবে না। তোমাদের সম্পদের সঙ্গে তাদের সম্পদ মিশিয়ে গ্রাস করো না। (সূরা নিসা: আয়াত ২)।

আল কুরআনে সাধারণভাবে সুবিচারের কথা এবং বিশেষভাবে এতিমদের প্রতি সুবিচারের কথা বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। উপরে সূরা নিসার ১২৭ নং আয়াতে অসহায় শিশুদের কথা এতিমদের থেকে আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে।

পথে পাওয়া শিশুও ইসলামের নজরে নিষ্পাপ। তাদেরকে অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। ফিকাহর ভাষায় এসব পথে পাওয়া শিশুকে 'লাকিত' বলা হয়। এ সম্পর্কে হানাফি ফিকাহর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'হিদায়া'-তে রয়েছে 'পথ থেকে বাচ্চা কুড়িয়ে নেওয়া প্রশংসনীয় কাজ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা ফরয। ফরয তখন হয় যখন কুড়িয়ে না নিলে শিশুর মৃত্যুর সম্ভাবনা দেখা দেয়। মুসলিম দেশে এ ধরনের শিশু পাওয়া গেলে তাকে মুসলিম গণ্য করতে হবে।' (হিদায়া, লাকিত অধ্যায়)।

এ পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, শিশুদের পালনের জন্য গ্রহণ করা অত্যন্ত প্রশংসনীয় কাজ। এ কাজকে আমাদের দেশে আরো উৎসাহিত করতে হবে। সরকারের পক্ষে সব শিশুর ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। কাজটি যথাযথভাবে করার জন্য পালক ও পালিতের স্বার্থ রক্ষা করে একটি আইন করা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত হবে। তবে এ ক্ষেত্রে ইসলামের একটি বিশেষ বিধানকে কিছুতেই এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। এটি হচ্ছে – শিশুর বংশপরিচয় যদি জানা নাও থাকে তবুও



www.pathagar.com

তাকে পালকের ঔরসজাত সন্তান – এ কথা প্রচার করা যাবে না। সূরা আহযাবের ৪নং আয়াতে এ কথা সুস্পষ্ট করা হয়েছে যে, পালক পুত্র কখনো ঔরসজাত পুত্র বলে গণ্য হবে না। তবে অমুসলিমদের বেলায় (যদি তারা অমুসলিম শিশু পালনের জন্য গ্রহণ করেন) তাদের ধর্মীয় আইন অনুসারে শিশুর পরিচয় নির্ধারিত হবে।

ঔরসজাত পুত্র না হওয়ার আইনগত তাৎপর্য রয়েছে। এর প্রথম তাৎপর্য হচ্ছে ঔরসজাত সন্তান যেভাবে স্বতঃই উত্তরাধিকার পেয়ে থাকে পালিত পুত্র সেভাবে উত্তরাধিকার পাবে না। সেজন্য পালক ব্যক্তিকে হয় জীবদ্দশায় হিবা করে সম্পত্তি দিতে হবে বা অসিয়ত করে যেতে হবে যাতে পালকের মৃত্যুর পর সম্পত্তির অনধিক তিনের এক অংশের উত্তরাধিকার পেতে পারে। তেমনিভাবে এর অন্য তাৎপর্য হচ্ছে পালিত শিশু পালকের পুত্র-কন্যাকে বিবাহ করতে পারবে। ভাই-বোনের মধ্যে ইসলামে বিবাহ হতে পারে না। কিন্তু পালিত শিশু যেহেতু পিতার বংশের ভাই-বোন নয়, সেহেতু এই নিষেধাজ্ঞা তার বেলায় প্রযোজ্য হয় না। ইসলামের এইসব বিধান প্রতিটি ব্যক্তিরই তার বংশের স্বার্থ রক্ষার সহায়ক।

কিন্তু ইসলামের এ বিধান ভঙ্গ না করেও শিশুদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য আইন প্রণয়ন করা খুবই সম্ভব। এ আইনে নিম্নোক্ত বিধান রাখা যেতে পারে:

(ক) পালক পালিতের পূর্ণ ভরণপোষণের জন্য দায়ী থাকবে।

(খ) পালক পালিতের উপর কোন মানসিক বা শারীরিক নির্যাতন করতে পারবে না।

(গ) পালক জীবদ্দশায় হিবা করে বা অসিয়তের মাধ্যমে পালিতের ভবিষ্যত আর্থিক নিরাপত্তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করে যাবে। তবে শর্ত থাকে যে, অমুসলিম কর্তৃক পালিত শিশু তাদের ধর্মীয় আইন অনুসারে সম্পত্তি পেতে পারবে।

(ঘ) সরকারের এ ধরনের শিশুর স্বার্থ দেখার অধিকার থাকবে।

(ঙ) নির্যাতনের ক্ষেত্রেও সরকার এসব শিশুকে পালকের অধিকার থেকে নিজ কর্তৃত্বে নিতে পারবে।

(চ) পালক অসুস্থ ও অভাবগ্রস্ত হলে পালিত ব্যক্তি যদি সক্ষম হয় তবে পালকের ভরণপোষণ করতে বাধ্য থাকবে।

এ আইনের নামকরণ করা যায়, 'বাংলাদেশ শিশু গ্রহণ ও প্রতিপালন আইন'।



www.pathagar.com

# বাংলাদেশে যৌতুক
# প্রয়োজন একটি সামাজিক আন্দোলন

যৌতুক কি সে সম্পর্কে একটি তাত্ত্বিক আলোচনা প্রথমে করা দরকার। ড. হাম্মুদা আবদাল আতি (Hammudah Abdal Ati) তার বিখ্যাত (The Family Structure in Islam (ইসলামের পারিবারিক সংগঠন) বইয়ের একটি অধ্যায়ে এর তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন। সেটি তিনি সমাজবিজ্ঞান এবং ইতিহাসের আলোকে করেছেন। তিনি সেখানে বলেছেন যে, ইতিহাসে এটি ছিল 'কনের মূল্য' (Bride Price) - এটি বরপক্ষ দিত কন্যাপক্ষকে। কন্যাকে নয়। কেননা কন্যাপক্ষ তাদের একজন সদস্যকে হারাচ্ছে। তাদের একজন সদস্য অন্য পরিবারে, গোত্রে বা সমাজে চলে যাচ্ছে - এটি তাদের নেট ক্ষতি। সুতরাং এর একটি ক্ষতিপূরণ তাদের করতে হবে। সে ক্ষতিপূরণের জন্য বরপক্ষ কন্যাপক্ষকে কিছু দিত। এটি ছিল এক ধরনের ক্ষতিপূরণ এবং এক ধরনের মূল্য। এটি ছিল কন্যার মূল্য এবং কন্যাপক্ষকে এক ধরনের ক্ষতিপূরণ দান করা।

এখন দেখার বিষয় হচ্ছে ইসলামের যে মোহর সেটি যৌতুক কি না। যে সংজ্ঞা দেখানো হলো তার আলোকেও বিবেচনা করে দেখা হবে। এটি আসলে যৌতুক নয়। এর প্রথম কারণ হলো, এটি কন্যাপক্ষকে দেয়া হচ্ছে না। কন্যা হারাবার জন্য পাত্রপক্ষ কন্যাপক্ষকে এটি দিচ্ছে না। এটিই হচ্ছে এর তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য। এর মালিক কন্যার পরিবারের পরিবর্তে কন্যা নিজে হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, এ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিতে একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা ড. হাম্মুদা আবদাল আতি সে বইতে উল্লেখ করেছেন। তাতে তিনি আরো দেখাচ্ছেন যে, অতীতে ইসলামের ইতিহাসে বা ইসলামী সাহিত্যে এরকম মতামত আছে যে এটিও এক ধরনের মূল্য। সেটি হচ্ছে কন্যাকে যে সম্ভোগ করা হচ্ছে তার মূল্য। এ কথা কেউ কেউ বলেছেন। তবে ড. আতি এ মতকে কুরআনের আলোকে এবং ইসলামের শিক্ষার আলোকে বাতিল করেছেন। তিনি বলছেন এটি কখনোই কন্যা সম্ভোগের মূল্য হতে পারে না। কেননা এ সম্ভোগ একতরফা নয়। যদি এ সম্ভোগ একতরফা হতো তাহলে একজন আরেকজনকে তার মূল্য দিচ্ছে এ কথাটি বলা যেত। সুতরাং ইসলামের ইতিহাসে এরকম যে একটি মত আছে



www.pathagar.com

সেটিকে তিনি অগ্রহণযোগ্য বলেছেন। তিনি বলছেন যদি এটি কোনোই মূল্য না হয় তাহলে এটি কি? তিনি এটিকে বিবাহের উপহার (Marital Gift) বলে উল্লেখ করছেন। এতে একটি ছেলে যে মেয়েকে বিয়ে করছে তাকে দিচ্ছে। তিনি এ প্রসঙ্গে সূরা নিসার ৪নং আয়াত উল্লেখ করছেন।

'ওয়াআতুন নিসায়া সাদাকাতে হিন্না' অর্থাৎ 'তোমরা স্বেচ্ছাকৃতভাবে তোমাদের স্ত্রীদেরকে উপহার দাও'। এ দেয়াকে কুরআনে সাদাকা শব্দে উল্লেখ করা হয়েছে। এটিই কুরআনের মূল পরিভাষা। অন্যান্য যেসব শব্দ কুরআনে ব্যবহার করা হয়েছে তার মধ্যেও গিফটের বা উপহারের অর্থ রয়ে গেছে। এর মধ্য দিয়ে আমরা যৌতুকের প্রকৃতি সম্পর্কে দেখলাম। হাম্মুদা আবদাল আতি এ কথাগুলো সুস্পষ্ট করে বলে একটি মূল্যবান কাজ করেছেন।

এখন আমরা বাংলাদেশের দিকে তাকালে দেখবো, আমাদের দেশে যৌতুক একটি সামাজিক ব্যাধির রূপ ধারন করেছে। এ সম্পর্কে কোনো বিতর্ক আছে বলে আমার জানা নেই। এটি একটি সর্বসম্মত বক্তব্য হয়ে গেছে যে যৌতুকের নামে যা নেয়া হচ্ছে তা একটি সামাজিক ব্যাধি এবং এটি ইসলাম সম্মতও নয়। এ বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ে কোনো মতবিরোধ নেই।

যৌতুক সংক্রান্ত যতগুলো আইন আমাদের দেশে করা হয়েছে তা যথার্থ করা হয়েছে। ভালো হয়েছে। এসব আইনের মধ্যে তেমন কোনো ক্রটি আছে বলে আমার জানা নেই এবং যেসব আইনের উন্নয়ন সম্ভব সেটি একটি স্টাডির বিষয়। গবেষণার বিষয় যে এ আইনের আর কি উন্নয়ন করা সম্ভব। কিন্তু এ আইনের কারণে বা আইন নেই বলে যৌতুক দূর হচ্ছে না এ কথা বলা সঠিক হবে না। সরকারি তরফ থেকে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে যৌতুককে যদি দূর করতে হয় তার জন্য আমাদের বাংলাদেশে কী করা প্রয়োজন। নিশ্চয় আমি বলব, বর্তমান আইনকে কার্যকর করা দরকার। অন্যান্য যেসব ব্যবস্থা সরকার নেয় বা নিচ্ছে তাও নিতে হবে। কিন্তু যেটি আমরা এখনও করতে পারছি না তা হলো জনগণকে সচেতন করে তোলার প্রচার অভিযান বা বোঝাবার বিষয়টি। তা যথোপযুক্তভাবে এখনো আমরা করে উঠতে পারিনি। এ কাজটি আমাদের করতে হবে। এ রোগ, ব্যাধি, ক্যান্সার, বালা বা বিপদ থেকে বাঁচার জন্য আমাদের একটি বড় ধরনের সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

২০০৪ সালের জুলাই মাসে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত একটি সেমিনারে যোগদান করি। সেখানে মাননীয় সমাজকল্যাণমন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্য অত্যন্ত জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গও উপস্থিত ছিলেন। সিরডাপ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সেমিনারটিতে অনেক ভালো উপস্থিতি ছিল। সেখানে অনেক প্রস্তাবই আসে। আমি একটি প্রস্তাব রেখেছিলাম। সেটি হচ্ছে, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় যদি যৌতুকবিরোধী একটি



www.pathagar.com

সপ্তাহ অন্তত আগামী কয়েক বছর ধরে পালন করে তাহলে সমস্যা কমে যাবে। তারপর আর সপ্তাহ পালনের প্রয়োজন হবে না। যতদিন পর্যন্ত সমস্যাটি বড় আকারে আছে ততদিন পর্যন্ত আমরা একটি দিবস পালন না করে যদি প্রতি বছর একটি সপ্তাহ যৌতুকবিরোধী ঘোষণা দিয়ে পালন করি তাহলে ভালো হবে। এটি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় করতে পারে। তাদের যেহেতু প্রত্যেক উপজেলা পর্যায়ে অফিস রয়েছে, তারা ব্যাপকভাবে এ কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে। সপ্তাহব্যাপী সেখানে সাত দিনে সাতটি অনুষ্ঠান হতে পারে। সেখানে সেমিনার হতে পারে। ওয়াজ মাহফিল হতে পারে। আলেমদের সক্রিয় করা যেতে পারে। ইমাম, শিক্ষক, ছাত্র, নারীদের জড়িত করা যেতে পারে। এভাবে যদি একটু ব্যাপক আকারে কয়েক বছর ধরে করা যায় তাহলে সচেতনতা বেড়ে যাবে। আমার মনে পড়ে মাননীয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রী বলেছিলেন যে, তারা এটি বিবেচনা করে দেখবেন।

কাজেই মূল কথা হিসেবে আমি বলবো, আইন যথেষ্ট। কিন্তু দরকার হচ্ছে সামাজিক অ্যাকশনের। সেটিকে সামাজিক আন্দোলন ধরে নিতে হবে। এটি যেমন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দায়িত্ব নিতে পারে বলেছি তেমনি বাংলাদেশের সকল এনজিওকে একটি সপ্তাহ পালনের কথা আমি বলব। বিশেষ করে বড় বড় এনজিও যেমন - ব্র্যাক, আশা, গ্রামীণ ব্যাংক, প্রশিকা বা আমওয়াব গ্রুপ বা ইসলামী ব্যাংকের যে রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (আরডিএস), তাদের প্রত্যেকের উচিত উদ্যোগ নেয়া। সরকার ঘোষণা দিলে নিজস্বভাবেও কর্মসূচি নিতে পারে।

এ বিষয়ে দেশের বিশিষ্ট আলেমদের অংশগ্রহণ করা উচিত। তাদের সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত যে বছরে তারা অন্তত ৫-৬টি জুমায় এই যৌতুক বিষয়ের উপর খুতবা দেবেন। সমস্যা তো ছেলেরাই করছে, ফলে তারা খুতবার মাধ্যমে ছেলেদের বোঝাতে পারে। তাহলেও এ ব্যাপারে অগ্রগতি হতে পারে। সে সাথে রাজনৈতিক দল ও দলের কর্মীদের যতটা সম্ভব অংশ নেয়া উচিত। সংবাদপত্রগুলোকে আরো শক্ত ও মিলিতভাবে কাজ করা উচিত। তাদের ফেডারেশনও একটি তারিখ নির্দিষ্ট করে সেদিন সকল পত্রিকায় একই সাথে এ বিষয়ে লেখা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিতে পারে। যৌতুক বাংলাদেশের দশ পনেরটি বড় সমস্যার মধ্যে একটি। এটিকে সহনীয় পর্যায়ে আনার জন্য সামাজিক আন্দোলনের কোনো বিকল্প আমি দেখতে পাই না।

২৪ জুলাই ২০০৪



www.pathagar.com

# সিভিল কোড প্রসঙ্গে

১৯৮৭ সনে অনুষ্ঠিত 'ওমেন ফর ওমেন' এর সম্মেলনে অন্যান্য দাবির সঙ্গে 'ইউনিফরম সিভিল কোড'-এর দাবি করা হয়। সিভিল কোডের অর্থ পার্লামেন্ট কর্তৃক বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার সম্পর্কে এমন একটি আইন তৈরি করা যার ভিত্তি শরিয়ত হবে না। অর্থাৎ পার্লামেন্ট মর্জিমাফিক স্বাধীনভাবে এ সম্পর্কে একটি আইন তৈরি করবে। তারা অবশ্য ইচ্ছা করলে ইসলামী শরিয়তের কোনো কোনো অংশ এ সিভিল কোডে গ্রহণ করতে পারবেন। আবার না চাইলে তারা ইসলামী শরিয়ত সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করতে পারবেন। পার্লামেন্ট প্রয়োজনমতো এবং মর্জিমতো সময়ে সময়ে অন্যান্য আইনের মতো এ আইনেও সংশোধন করতে পারবেন। ইউনিফরম সিভিল কোডের অর্থ এ আইনটি সব নাগরিকের উপর প্রযোজ্য হবে। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে।

আমাদের অনেকেই না বুঝে যে এ ধরনের দাবি করছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তারা যদি স্পষ্টভাবে জানতেন যে, এ ধরনের আইন ইসলামী শরিয়তের সম্পূর্ণ খেলাফ হবে, তবে তারা এ দাবি করতেন না। তাদের অবশ্যই বুঝানো দরকার যে এসব বিষয়ে ইসলামী শরিয়তের বিধানকে উপেক্ষা করা বা ইসলামী শরিয়তের বিধানকে পার্লামেন্টের মর্জির অধীন করা সুস্পষ্টভাবে আল্লাহর অবাধ্যতার শামিল। কেননা ইসলামী শরিয়তকে কখনো কোনো পার্লামেন্টের অধীন করে দেয়া যায় না।

এরকম করা বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রের মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত অধ্যায়ের ৪১নং অনুচ্ছেদেরও বিপরীত কাজ হবে। এ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক নাগরিকের যে কোনো ধর্মবিশ্বাস, আমল ও প্রচারের অধিকার রয়েছে। যদি কাউকে তার নিজস্ব ধর্মের বিধান অনুযায়ী বিবাহ, তালাক বা উত্তরাধিকারের অধিকার হতে বঞ্চিত করা হয় তবে তা তার ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হবে।

আমাদের শিক্ষিত বোনদের একটি অংশ আরো একটি বড় ভুল করছেন। অবশ্য আমাদের শিক্ষিত ভাইদের একটি অংশ সম্পর্কেও একই কথা খাটে। তারা ভাবছেন যে, ইউনিফরম সিভিল কোড হলে পুত্র, কন্যা এবং স্বামী-স্ত্রীর উত্তরাধিকার সমান হয়ে যাবে। তালাকের ক্ষেত্রেও তাদের অধিকার সমান হয়ে



www.pathagar.com

যাবে। কিন্তু তাদের এ ধারণা ঠিক নয়। পাশ্চাত্যে কি ঘটছে তার উদাহরণ দিলেই এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হবে। পাশ্চাত্যে বর্তমানে উত্তরাধিকার নির্ধারিত হয় 'উইল' বা অসিয়তের মাধ্যমে। শতকরা ৯৯ জন উইল রেখে যান। সে উইলেও বলে দেয়া হয় যে, কোনো ব্যক্তির স্ত্রী, পুত্র, কন্যারা তার মৃত্যুর পর কে কতটা সম্পত্তি পাবেন। তিনি যে কোনোভাবে তার সম্পত্তি সম্পর্কে উইল করে যেতে পারেন। তিনি যে কাউকে সম্পত্তির কিছু নাও দিতে পারেন। তিনি তার পরিবারের বাইরের কাউকে বা কোনো প্রতিষ্ঠানকে সব সম্পত্তি দিয়ে যেতে পারেন। 'উইল'-এর এই নিরংকুশ ধারণা পাশ্চাত্যের নিরংকুশ মালিকানার ধারণা হতে উদ্ভূত। অর্থাৎ উইলের ব্যাপারে পাশ্চাত্যে যে কোনো ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারী হতে পারেন। কাজেই সেখানে কে কতটা সম্পত্তি পাবে তা ধরা-বাঁধা নেই বা সুনিশ্চিত কিছু নেই। উইলের মাধ্যমে যে মেয়েরা বা স্ত্রীরা বেশি পাবেন এর কোনো নিশ্চয়তা নেই।

মানুষকে এ ধরনের স্বেচ্ছাচারী হওয়ার সুযোগ ইসলাম দেয়নি। ইসলামে প্রত্যেকের দায়িত্ব-কর্তব্য বিচার করে নির্দিষ্ট অংশের উত্তরাধিকার দেয়া হয়েছে। যদি স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক দায়িত্ব দেখা হয় (এবং স্ত্রী মোহরানা পায় এবং স্বামী তা দেয় তা বিচার করা হয়) তাহলে কিছুতেই বলা যায় না যে, স্ত্রী স্বামী হতে কম পায়। আমার নিজের কথাই বলি। আমার বোন আমার পিতা থেকে ৭.৫ লক্ষ টাকা উত্তরাধিকার পান। আমি পাই ১৫ লক্ষ টাকা। অন্যদিকে আমার বোনকে তার জন্য, তার সন্তানের জন্য, তার স্বামীর ভরণপোষণের জন্য কোনো খরচ করতে হয়নি। অথচ আমাকে ত্রিশ বছরে ১ কোটি ৮ লক্ষ টাকা খরচ করতে হয়েছে (মাসিক খরচ ৩০ হাজার টাকা ধরে)। এ হিসাবে আমার বোনের সামগ্রিক সুবিধা ১ কোটির বেশি (১,০৮,০০,০০০ - ৭,৫০,০০০)। এসব বিচার করলে ইসলাম কোনো অবিচার করছে এ কথা বলা যায় না।

যা হোক যদি আমাদের দেশে সিভিল কোড হয় তবে সম্পত্তি সে কোড মোতাবেক বণ্টিত হওয়ার সত্যিকার সুযোগ খুব কমই হবে। কেননা তখন লোকেরা সাধারণত পাশ্চাত্যের মতো উইল করে যাবে এবং উইলের উপর কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করা কঠিন হবে। বর্তমানে 'উইল'-এর উপর আমাদের যে বিধিনিষেধ আছে তা ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের কারণে। কেননা ইসলামী আইনে উত্তরাধিকারীর পক্ষে কোনো উইল করা যায় না এবং যারা উত্তরাধিকারী নন কেবল তাদের পক্ষে সম্পত্তির তিন ভাগের এক অংশ উইল করা যায়। কিন্তু যেইমাত্র সিভিল কোড হবে তখনই ইসলামী শরিয়তের এসব বিধিবিধান আর কার্যকরী থাকবে না। তখন যে কেউ যেভাবে ইচ্ছা উইল করতে পারবে এবং পাশ্চাত্যের স্বেচ্ছাচার আমাদের দেশে শুরু হবে। এতে আমাদের দেশের মেয়েদের কোনো কল্যাণ হবে এ কথা বলা যায় না। অনেকে মেয়েদেরকে সম্পত্তি থেকে নানা যুক্তিতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করে যেতে পারে।



www.pathagar.com

পাশ্চাত্যে শতকরা যে ২/১ জন উইল করে যায় না তাদের ক্ষেত্রে কি হয়? যারা উইল করে যায় না, তাদের জন্য 'উইলবিহীন সম্পত্তি সংক্রান্ত' আইন পাশ্চাত্যে প্রচলিত রয়েছে। এ আইনের ভিত্তিতে তাদের সম্পত্তি বণ্টিত হয়। এ আইন এক এক দেশে বা রাজ্যে এক এক রকম। সাধারণত এসব আইনে পুত্র-কন্যাকে, স্বামী-স্ত্রীকে সম্পত্তি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পিতামাতাকে বা ভাই-বোনকে কোনো অধিকার দেয়নি। দাদা-নানার সম্পত্তিতে নাতির অধিকারের তো প্রশ্নই নাই। ইসলাম যে পিতামাতাকে এবং কোনো ক্ষেত্রে ভাই-বোনকে সম্পত্তির অধিকার দিয়েছে এটা প্রমাণ করে যে, ইসলামী আইন এ ব্যাপারে কত উদার।

তালাকের সম-অধিকার সম্পর্কেও একথা বলা যায় যে, এ ব্যাপারে ইসলামী আইন পরিত্যাগ করা হলে স্ত্রী তালাকের অধিকার সমান হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। সিভিল কোডে স্ত্রীর যেটুকু তালাকের অধিকার রয়েছে তাও সে হারাবে। কেননা সিভিল কোডে তালাকের ব্যাপারে প্রত্যেকের অধিকার কোর্টের ক্ষমতার অধীন হয়ে যাবে। কোর্টের অনুমতি ছাড়া স্ত্রী কোনো অবস্থাতেই স্বামীকে তালাক দিতে পারবে না। অর্থাৎ ইসলামী আইন তালাকের ব্যাপারে স্ত্রীকে যে 'খোলা' তালাকের অধিকার দিয়েছে তাও তার থাকবে না। পাশ্চাত্যে তাই হয়েছে। এতে স্ত্রীদের অবস্থা কোনোভাবেই পূর্বের চেয়ে ভালো হবে না।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, ইসলামী শরিয়তকে পরিত্যাগ করে সিভিল কোড করা হলে তা কেবল ইসলাম ও শাসনতন্ত্র বিরোধীই হবে না, তা নতুন স্বেচ্ছাচারের জন্ম দিবে এবং নারীদের অধিকার ব্যাহত করবে।



www.pathagar.com

# নাতির সম্পত্তির অধিকার

ইসলামের উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি প্রসূত একটি অভিযোগ হচ্ছে যে, ইসলাম নাতি-নাতনীকে উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত করেছে। এতে অভিযোগকারীদের মতে ভয়ানক অবিচার করা হয়েছে।

ইসলামী আইন না জানার কারণেই যে এ অভিযোগের জন্ম হয়েছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। ইসলাম কারা সম্পত্তি পাবে না তার কোনো তালিকাই দেয়নি। ইসলাম সাধারণ অবস্থায় কারা উত্তরাধিকারের মাধ্যমে সম্পত্তি পাবে তার তালিকা দিয়েছে। যারা পাবে তাদের মধ্যে পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা, স্বামী-স্ত্রী ও কোনো কোনো অবস্থায় ভাই-বোনের উল্লেখ করা হয়েছে (দ্রষ্টব্য: সূরা নিসা: আয়াত ৭, ১১, ১২, ১৭৬)। যারা পাবার তালিকার বাইরে পড়েছেন তারা কেউ সাধারণ অবস্থায় উত্তরাধিকার পাবেন না - তারা হচ্ছেন (সম্পদশালী হোক কি অভাবগ্রস্ত) চাচা-মামা, ফুফু-খালা, দাদা-দাদী, নাতি-নাতনী ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন। সুতরাং এ কথা বলা যায় যে ইসলাম বিশেষভাবে নাতি-নাতনীকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে এ কথা সত্য নয়।

নাতি-নাতনীও কোনো কোনো পরিস্থিতিতে উত্তরাধিকার পেতে পারেন। যেমন - কারো দু'সন্তান রয়েছে এবং তার জীবদ্দশায় এ দু'সন্তান যদি নাতি-নাতনী রেখে মারা যায় তবে এ ক্ষেত্রে নাতি-নাতনী দাদার উত্তরাধিকার পাবেন। এ রকম বিশেষ পরিস্থিতিতে চাচা-মামা, ফুফু-খালা, দাদা-দাদীও সম্পত্তি পেতে পারেন। কিন্তু এসব হচ্ছে বিশেষ পরিস্থিতি। সাধারণ অবস্থায় এরা উত্তরাধিকার পান না।

মনে প্রশ্ন জাগে যে নাতি-নাতনীর মতো নিকট আত্মীয়রা যদি দাদার-নানার সম্পত্তি না পান, তাহলে তাদের জন্য ইসলাম কি ব্যবস্থা করেছে? ইসলামে কেবল নাতি-নাতনী নয় বরং অন্যান্য নিকট আত্মীয়দের জন্য (যদি তারা অভাবগ্রস্ত হয়) তিনটি বিধান রয়েছে।

প্রথমত, ভরণপোষণের আইন। নাতি-নাতনীর জন্য পিতার অবর্তমানে দাদার উপর (যদি তিনি আর্থিক দিক দিয়ে সক্ষম হন) ভরণপোষণ করা ওয়াজিব। দাদা অক্ষম হলে চাচাদের উপর এবং তাদের অক্ষমতা থাকলে নানা ও মামাদের উপর তাদের ভরণপোষণ ওয়াজিব হবে। ভরণপোষণ ওয়াজিব



www.pathagar.com

যতক্ষণ শিশুরা পূর্ণবয়স্ক এবং স্বাবলম্বী না হয়। এ ছাড়া প্রত্যেক ব্যক্তির উপর তার অন্যান্য নিকট আত্মীয়ের ভরণপোষণ করা ওয়াজিব যদি সেই অভাবগ্রস্ত আত্মীয়কে ভরণপোষণ করার জন্য তার পিতা বা সন্তান না থাকে। ইসলামের ভরণপোষণ আইনকে 'কানুনে নাফাকা' বলা হয় এবং এর ভিত্তিতে একটি আধুনিক ভরণপোষণ আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এর ফলে তালাকপ্রাপ্তা নারীর খোরপোষের বা নাতিদের কি হবে এসব প্রশ্ন কমবে।

দ্বিতীয়ত, ইসলাম অভাবগ্রস্ত নাতি-নাতনীদের জন্য আরো দু'টি পথ রেখেছে। দাদা-নানা তাদের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ সম্পদ হিবা করে দিয়ে দিতে পারেন অথবা অসিয়ত বা উইল রেখে যেতে পারেন যে দাদা-নানার মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকার পাবে না এমন নাতি-নাতনীরা কতটুকু সম্পত্তি পাবেন। তবে উইল ১/৩ অংশ সম্পত্তির বেশি করা যায় না। উইল উত্তরাধিকারীর পক্ষেও করা যায় না। এ রকম মনে করা ঠিক নয় যে দাদা-নানা নাতির স্বার্থ দেখবেন না এবং নাতি-নাতনীদের পক্ষে হিবা বা উইল করবেন না। নাতি-নাতনীদের জন্য আগ্রহ দাদা/নানার চেয়ে অন্য কারো বেশি হওয়ার কথা নয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, কুরআন এ ধরনের ক্ষেত্রে অসিয়ত করাকে অবশ্য কর্তব্য করে দিয়েছে। (সূরা বাকারা: আয়াত ১৮০)। অন্যান্য অভাবগ্রস্ত নিকটাত্মীয়দের সমাধানও হিবা বা অসিয়তের মধ্যে নিহিত রয়েছে।

উপরের আলোচনায় প্রমাণ হয় যে, অসহায় নাতি-নাতনীরা (যদি তাদের পিতা থেকে প্রাপ্ত বা নিজস্ব সম্পদ না থাকে) পূর্ণ বয়স্ক ও স্বাবলম্বী না হওয়া পর্যন্ত ভরণপোষণ পাবেন এবং সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে যে, হিবা বা অসিয়তের মাধ্যমে দাদা/নানা থেকে সম্পত্তি পাবে তাহলে সমস্যাটা থাকেই না। তবুও যদি কোনো সমস্যা দেখা দেয় এবং ইসলামী রাষ্ট্র ও আইন চালু থাকে তাহলে তাদের দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের। এখানে এ কথা উল্লেখ করা দরকার যে, প্রত্যেক দাদা/নানাকে ধনী মনে করা ও প্রত্যেক নাতি-নাতনীকে দরিদ্র মনে করা বাস্তবসম্মত নয়।

আরো একটি প্রশ্ন এ হতে পারে যে, আল্লাহ এ ধরনের নাতি-নাতনীদের সম্পত্তির অধিকার দিলে কি ক্ষতি হতো? আসলে আল্লাহ্ তার মহাজ্ঞানে তাদেরকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী না করে উপরে যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে সেভাবে সমাধানটি দিয়েছেন। এর অনেক যুক্তি আছে। ইসলাম তার উত্তরাধিকার আইনকে অনেক উদার করেছে। আধুনিক পাশ্চাত্য উত্তরাধিকার আইনে পিতামাতার সাধারণত কোনো অংশ নেই। ইসলাম তা দিয়েছে। পাশ্চাত্যের আইনে ভাই-বোনদের কোনো উত্তরাধিকার নেই। পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্তুতির অবর্তমানে ভাইবোনকেও ইসলাম উত্তরাধিকার দিয়েছে। অনেক ধর্মীয় উত্তরাধিকার আইনে কন্যা ও স্ত্রীর কোনো উত্তরাধিকার নেই। ইসলাম তা দিয়েছে। এর ফলে অভিযোগ করা হয় যে, ইসলামে সম্পত্তি টুকরা টুকরা হয়ে



www.pathagar.com

যায়। আল্লাহ্ পাক তাই দ্বিতীয় প্যারায় উল্লিখিত উত্তরাধিকারীদের বাইরে চাচা-মামা, ফুফু-খালা, নাতি-নাতনীদেরকে উত্তরাধিকার দেননি বরং তাদের জন্য উপরে উল্লিখিত অন্য ব্যবস্থা করেছেন।

ইসলাম দাদার মৃত সন্তানের স্থানে তার নাতি-নাতনীকে গণ্য করার নীতি গ্রহণ করেনি। এভাবে যদি প্রতিনিধিত্ব দেয়া হয়, তাহলে আরো অনেক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন উঠবেই। যেমন - দাদার মৃত সন্তানের স্ত্রীরও তাহলে উত্তরাধিকার পাওয়া উচিত। তেমনিভাবে সন্তান রেখে যায়নি এমন মৃত পুত্রের স্ত্রী কোন যুক্তিতে বাদ যাবে? তাছাড়া যদি প্রতিনিধিত্বের নীতিকে গ্রহণ করা হয়, তবে কোনো ব্যক্তির মৃত পিতা-মাতা, স্ত্রী-স্বামীর জায়গায় মৃতদের আত্মীয়-স্বজনরা কেন স্থান গ্রহণ করবে না? ইসলাম এসব জটিলতা সৃষ্টি করে তার উত্তরাধিকার আইনকে ধ্বংস করতে চায়নি। ইসলাম যা করেছে তা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত হয়েছে। তবে মুসলমানদের আচরণে অনেক অন্যায় আছে যা আইনের কঠোর প্রয়োগের মাধ্যমে অবশ্যই দূর করতে হবে।


www.pathagar.com

# তালাক পরবর্তীতে নারীর নিরাপত্তা একটি সামাজিক সমস্যা

কয়েক দিন আগে আমার বাসায় দু'জন মহিলা অ্যাডভোকেটের সাথে কথা হচ্ছিল, তারা মহিলাদের একটি বড় সমস্যার কথা তুলে ধরেন। তারা বলেন, সমাজে গ্রামাঞ্চলে ও শহরে তালাকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব নারীর সমস্যা হচ্ছে, তালাকের পর তাদের যাওয়ার কোনো স্থান থাকে না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পিতা না থাকলে বাপের বাড়ি যাওয়াতেও সমস্যা হয়। ভাইয়েরা এবং ভাইদের পরিবার বিষয়টি সদয়ভাবে নিতে চায় না; সব ক্ষেত্রে নয়, অনেক ক্ষেত্রে। পিতা থাকলে সমস্যা কিছু কম হয়।

এ সমস্যা আলোচনা করতে গিয়ে আমি এবং ওই দুই আইনজ্ঞ মহিলা একমত হই যে, ইসলাম নারীদের পিতামাতার সম্পত্তিতে যে অধিকার দিয়েছে সেই অধিকার যদি পুরোপুরিভাবে পিতার বাসস্থানে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে এ ধরনের নারীদের দুর্ভোগ অনেক কম হবে। আমরা আরো একমত হই, পিতার বাসস্থান যদি ক্ষুদ্র হয় তার মধ্যেও কন্যাদের সম্পত্তির অধিকার (বিশেষ করে ঘরবাড়িতে অধিকার) পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। এটি দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান নয়, এটি এসব নারী সম্পর্কিত সামাজিক সমস্যার অন্যতম সমাধান।

এ প্রসঙ্গে এ কথাও বলা ভালো, পিতার সম্পত্তিতে কন্যার অধিকার পুত্রের তুলনায় কম, এ আলোচনায় আমরা যাচ্ছি না। কিন্তু এটুকু উল্লেখ করছি, সব বিচারে দেখা গেছে যদি সম্পত্তির অধিকারের সাথে ভরণপোষণের অধিকার একত্রে দেখা হয় তাহলে ইসলামের এ সংক্রান্ত আইনে কোনো অসঙ্গতি দেখা যাবে না। উপরন্তু দেখা যাবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নারীরই সুবিধা। এ সম্পর্কে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রভাষক ও যুক্তরাষ্ট্রে পাঠরত কানিজ ফাতিমার লেখা রয়েছে। যেটি গুগল সার্চ করে যে কেউ দেখতে পারেন (Kaniz Fatima - inherritence)।

এ কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন, তালাক হলে স্ত্রীর ভরণপোষণের অধিকার সাবেক স্বামীর দায়িত্বে থাকে না (ইদ্দতের সময় ছাড়া)। সেই সময় সেই নারী যদি নিজের ভরণপোষণ না করতে পারে তাহলে তার ভরণপোষণের দায়িত্ব আত্মীয়স্বজনের ওপর বর্তায়। তা না হলে সরকারের ওপর বর্তায়। ভারতে এ



www.pathagar.com

ব্যাপারে দায়িত্ব প্রাদেশিক ওয়াকফ বোর্ডের ওপর ন্যস্ত রয়েছে। তা করা হয়েছে আইন করে।

এই ভিত্তিতে আমি মনে করি, বাংলাদেশ সরকার ও জাতি নিম্নরূপ ব্যবস্থা নিতে পারে।

(ক) ইসলামী আইন মোতাবেক সর্বাবস্থায় পিতার সম্পত্তিতে কন্যার অধিকার, বিশেষ করে ঘরবাড়ির ওপর বহাল করতে হবে। এ ব্যাপারে সারা দেশে প্রজ্ঞাবান আলেম ও সমাজপতিদের বিশেষ নজর দিতে হবে। তা করা হলে সব নারীর আর্থিক অবস্থা তুলনামূলকভাবে ভালো হবে এবং তালাকের ক্ষেত্রে তাদের সমস্যা অপেক্ষাকৃত কম হবে।

(খ) সরকারকে একটি আইন করার পরামর্শ দিতে চাই, সব তালাকপ্রাপ্তা নারী নিজেদের ভরণপোষণে সক্ষম নয় (এবং যাদের ভরণপোষণে কোনো আত্মীয় নেই) তাদের ভরণপোষণ সরকার থেকে করা হবে একটি প্রকল্পের আওতায়। যেমন আমাদের প্রকল্প রয়েছে বেকারদের, বৃদ্ধদের ও বিধবাদের জন্য। তাদের আলাদা শ্রেণি বিবেচনা করতে হবে। তাদের সংখ্যা প্রকৃতপক্ষে বেকারদের বা অভাবী বৃদ্ধদের তুলনায় অনেক কম হবে। তাই এদের জন্য আলাদা শ্রেণি না করার কোনো যৌক্তিকতা দেখা যায় না।

২ নভেম্বর ২০১০, দৈনিক নয়া দিগন্ত



www.pathagar.com

# পতিতাবৃত্তি নিষিদ্ধ করে তাদের পুনর্বাসন করতে হবে

পতিতাবৃত্তি ছাড়া মানুষ চলতে পারে না - এমন নয়। খিলাফতে রাশেদার সময় এ পেশা ছিল না। উমাইয়া ও আব্বাসী আমলেও তা প্রকাশ্যে ছিল না। উপনিবেশবাদের পূর্বের মুসলিম বিশ্বে এটি থাকলেও গোপনে ছিল এবং খুব সামান্যই ছিল। বর্তমানে ইরান ও সউদি আরবে পতিতালয় নেই। সুদানেও এ পেশা উৎখাত করা হয়েছে। পাকিস্তানেও পতিতালয় বর্তমানে নেই। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থাও এ পেশার উৎখাত চায়। কেননা এটা মানবতার চূড়ান্ত অবমাননা। এর ফলে বিপুল সংখ্যক লোকের স্বাস্থ্য হুমকির সম্মুখীন হয়।

পতিতালয় অব্যাহত রাখার পক্ষে নানান যুক্তি দেয়া হয়, যা মূলত সঠিক নয়। একটি যুক্তি দেয়া হয় যে, তা হলো পেশার অধিকার নষ্ট হবে। এ যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। খুন ও ডাকাতি যেমন পেশা নয়, তেমনি দেহ ব্যবসাকে পেশার স্বীকৃতি দেয়া যায় না। পতিতালয় না থাকলে ধর্ষণ বৃদ্ধি পাবে - এ যুক্তিও গ্রহণযোগ্য নয়। পতিতালয় না থাকার কারণে সউদি আরব বা ইরানে ধর্ষণ ব্যাপক হয়নি। অন্যদিকে পতিতালয় থাকলেই ধর্ষণ কম হবে - এই যুক্তি সঠিক নয়। যুক্তরাষ্ট্রে অসংখ্য পতিতালয় থাকা সত্ত্বেও বছরে প্রায় দু' লক্ষের মতো ধর্ষণ হয়। এ ছোট্ট একটি উদাহরণ থেকে প্রমাণ হয়, ধর্ষণের সাথে পতিতালয় থাকার কোনো সরাসরি সম্পর্ক নেই। পতিতালয় রেখে যদি ধর্ষণ বন্ধ করতে হয়, তাহলে প্রত্যেক শহর ও গ্রাম-গঞ্জে পতিতালয় স্থাপন করতে হবে। আর যদি এভাবে পতিতালয় স্থাপন করতে হয়, তাহলে কি আরো অধিক সংখ্যক নারী অপহরণ ও নির্যাতনের শিকার হবে না? তবে এ কথা হতে পারে যে, পতিতালয় বন্ধ করার পর সাময়িকভাবে দু'একটি এলাকায় ধর্ষণ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। এজন্য সেসময় অতিরিক্ত সতর্কতার প্রয়োজন পড়বে। পতিতাদের বিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে, বিশেষ করে তাদের সাথে, যারা তাদের কাছে যেত। মুঘল বাদশাহ আওরঙ্গজেব এ ব্যবস্থা তার সময় কিছু পতিতার ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছিলেন। (দ্রষ্টব্য: মহাকবি ইকবাল, ড. আবু সাঈদ নূরুদ্দীন, পৃষ্ঠা ৩০৭-৩০৮)।

সুতরাং বাংলাদেশ সরকার যদি এ সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান চান, তাহলে কিছু আধুনিক লোকের কথা না শুনে আল্লাহর দেয়া বিধান মেনে নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে দুই-তিন মাসের মধ্যে একটি সার্ভে করতে পারেন যে, কত পতিতার



www.pathagar.com

পুনর্বাসন প্রয়োজন হবে। তারপর পতিতাবৃত্তিকে সুস্পষ্ট আইন করে নিষিদ্ধ করতে পারেন এবং এসব পতিতাদের উপরোক্তভাবে বিবাহ এবং কাজের মাধ্যমে পুনর্বাসন করতে পারেন। আমাদের বাজেটের বার্ষিক ব্যয়ের অংশ থেকে কিছু অর্থ এ পুনর্বাসনে ব্যয় করা মোটেই কষ্টকর হবে না। একই সাথে ধর্ষণের জন্য বিচার ও শাস্তি ত্বরান্বিত করতে হবে, প্রয়োজনে বিশেষ কোর্টের মাধ্যমে । তেমনিভাবে দেশের হাউজিং পলিসি সঠিক করা প্রয়োজন, যাতে শহরের জনসাধারণ সকলে ছোট বাসা হলেও পেতে পারে। অবশ্য এটা সময়ের ব্যাপার। যাতায়াতের ব্যবস্থাও উন্নত করতে হবে, যাতে শহরের আশেপাশের লোক শহরের বাইরে থেকে সহজে এসে শহরে কাজ করতে পারে, বিশেষ করে প্রধান শহরসমূহে। এর ফলে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্নতা কমে যাবে। তেমনিভাবে বিবাহকে সহজ করার জন্য সামাজিক প্রচারণা চালাতে হবে এবং প্রয়োজনে যারা আর্থিক কারণে বিবাহ করতে পারছে না তাদেরকে কিছুটা সাহায্য করতে হবে। অর্থাৎ সামাজিক সুস্থতা ও শান্তি এবং পতিতা সমস্যার দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের জন্য একটি উন্মুক্ত পরিকল্পনা নিয়ে আমাদের এগুতে হবে।



www.pathagar.com

www.pathagar.com

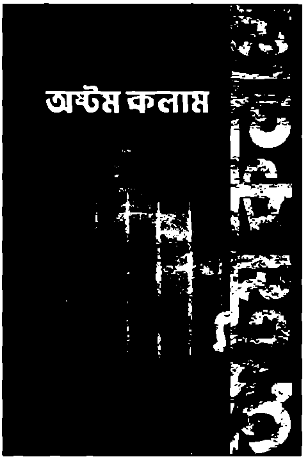


অষ্টম কলাম

প্রকাশকাল : আগস্ট ২০১১, দি পাইওনিয়ার

www.pathagar.com

www.pathagar.com

# রাষ্ট্রধর্মের ইতিহাস ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ

রাষ্ট্রধর্মের তাৎপর্য সম্পর্কে কিছু ভুল বোঝাবুঝি আছে। কেউ কেউ বলেছেন, রাষ্ট্রের কোনো ধর্ম থাকতে পারে না। কেবল ব্যক্তির ধর্ম থাকে। আসল বিষয়টি না বোঝার কারণেই এ কথার অবতারণা করা হয়। প্রশ্ন হচ্ছে, রাষ্ট্রের চলার জন্য কোনো আদর্শ থাকবে কি না। তার কোনো মৌলিক নীতিমালার প্রয়োজন আছে কি না। আধুনিক ইতিহাসে দেখতে পাই, রাষ্ট্রের সংবিধানে নানা আদর্শের কথা বলা থাকে। অনেক সংবিধানে রয়েছে গণতন্ত্রের উল্লেখ। অনেক সংবিধানে কমিউনিজমকে রাষ্ট্রীয় আদর্শ ঘোষণা করা হয়, অর্থাৎ রাষ্ট্র কমিউনিজমের নীতিমালা অনুসরণ করবে। অনেক সংবিধানে সোস্যালিজমের কথা বলা হয়। কিছু সংবিধানে কেসুলারিজমকে রাষ্ট্রীয় আদর্শ বা অন্যতম রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

উল্লেখ্য, যেসব রাষ্ট্রে কমিউনিজমকে রাষ্ট্রীয় আদর্শ ঘোষণা করা হয়েছে, সেসব রাষ্ট্রে সবাই কমিউনিস্ট নয়। আবার যেসব রাষ্ট্রে সেকুলারিজমকে রাষ্ট্রীয় আদর্শ ঘোষণা করা হয়েছে, সেসব রাষ্ট্রে সবাই সেকুলার নয়, তারা সেকুলারিজমের (রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে ধর্ম বাদ দেয়া) নীতিতে বিশ্বাস করে না। রাষ্ট্রীয় আদর্শ হওয়ার জন্য এটা জরুরি নয় যে, একশত ভাগ লোককে সে আদর্শে বিশ্বাসী হতে হবে।

বিংশ শতাব্দীতে বেশির ভাগ মুসলিম রাষ্ট্রে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ রাষ্ট্র তার আইন, প্রশাসন, অর্থনীতি এসব ক্ষেত্রে ইসলামকে আদর্শ হিসেবে অনুসরণ করবে। ইসলাম যেহেতু একটি জীবনব্যবস্থা এবং কেবল আনুষ্ঠানিক ইবাদত নয়, তাই ওই সব দেশ ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করা সঙ্গত মনে করেছে। তাদের কাছে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম অর্থ রাষ্ট্রের নামাজ পড়া নয়, রোজা পালন নয়, হজ করা নয়। তার অর্থ রাষ্ট্রের ইসলামী আইন অনুসরণ করা। ইসলামী আইনের অন্যতম দিক হচ্ছে অমুসলিমদের সব নাগরিক অধিকার প্রদান; যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনা সনদের মাধ্যমে অমুসলিম নাগরিকদের প্রদান করেছিলেন।

সুতরাং রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বিষয়টিকে না বুঝে যেভাবে তার বিরুদ্ধে যুক্তি দাঁড় করানো হচ্ছে, তা সঙ্গত নয় মোটেও। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, কয়েকটি



www.pathagar.com

মুসলিম রাষ্ট্র ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম না করে অন্যভাবে ইসলামকে রাষ্ট্রের ভিত্তি বানিয়েছে। যেমন ইরান নিজেকে ইসলামিক রিপাবলিক বা ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেছে এবং কুরআন ও সুন্নাহকে আইনের ভিত্তি হিসেবে ঘোষণা করেছে। একই ব্যাপার ঘটেছে পাকিস্তানের ক্ষেত্রে। তারাও দেশকে ইসলামিক রিপাবলিক এবং কুরআন ও সুন্নাহকে আইনের উৎস ঘোষণা করেছে। মদিনাভিত্তিক ইসলামী রাষ্ট্রে ইসলামিক রিপাবলিক বা রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ছিল না। কিন্তু সেখানে সম্পূর্ণ আইন ছিল কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক। বিচারকরা ইসলামী শরিয়তের ভিত্তিতে বিচার করতেন। শাসকেরা ইসলামী মূল্যবোধের এবং আইনের ভিত্তিতে দেশ চালাতেন। অবশ্য পরে ইসলামের খেলাফত ব্যবস্থা পরিবারভিত্তিক হয়ে যায় (যা যথার্থ ছিল না)। কিন্তু রাষ্ট্রের অন্য সব কিছু ইসলামী নীতিমালাভিত্তিক ছিল, আইন ও বিচার তো অবশ্যই। এ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মনে করি, বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে।

বাংলাদেশের ৯০ শতাংশ মুসলিম রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলাম পরিত্যাগ করতে চান না। কুরআনও তাদের পূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করতে বলেছে।

আরো উল্লেখ করা যায়, পাশ্চাত্যের অন্তত চল্লিশটি খৃস্টান রাষ্ট্রে রাষ্ট্রধর্ম হয় ক্যাথলিক বা প্রোটেস্ট্যান্ট খৃস্টবাদ। এর অর্থ হচ্ছে, দেশগুলো ওই সব ধর্মের নীতিবোধ ও মূল্যমান অনুসরণ করবে। সুতরাং মুসলিম বিশ্বে অনেক দেশে যে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম করা হয়েছে বা বাংলাদেশে করা হয়েছে, তা সঙ্গতই হয়েছে।

৮ মে ২০১১, দৈনিক নয়া দিগন্ত



www.pathagar.com

# নারীনীতি নিয়ে বিভ্রান্তি ঃ কিছু সংশোধন জরুরি

ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটির ডাকা হরতাল সফল হওয়ার পর নানা প্রচারণা শুরু হয়েছে। কেউ বলছেন বাংলাদেশ তালেবান রাষ্ট্র হয়ে যাচ্ছে, কেউ বলছেন বাংলাদেশ উগ্রতার পথে রয়েছে। অথচ বাংলাদেশে ছাত্র, শ্রমিক ও রাজনীতিকরা কত আন্দোলন করেছেন, কত হরতাল করেছেন এবং কত গাড়ি ভাঙচুর করেছেন, সে সময় উগ্রতা বা মৌলবাদের অভিযোগ ওঠেনি। আমরা ৬ দফা আন্দোলন দেখেছি, শিক্ষা আন্দোলন দেখেছি, পোশাক শিল্প শ্রমিকদের আন্দোলন দেখেছি, তখন উগ্রতা বা মৌলবাদের কথা ওঠেনি।

একটি ইংরেজি দৈনিকের সম্পাদক নিজের নামে কলাম লিখেছেন, যার মূল শিরোনাম হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীকে সর্বাত্মক সাহায্য দিতে হবে। তিনি তার মন্তব্যে বলেছেন, ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি হরতালে ব্যাপকভাবে ভাঙচুর করেছে এবং পরিকল্পনা করেই করেছে। তারা রাস্তার পাশে বাস, ট্রাক ভাঙচুর করেছে, এসব পরিকল্পনার ইঙ্গিত বহন করে। সম্পাদক বলেন, নারী উন্নয়ন নীতিমালার ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে এবং এর লক্ষ্যকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। তিনি দৃঢ়ভাবে মনে করেন সরকারকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করতে হবে পশ্চাৎপন্থি লোকদের দমন করার জন্য। পাকিস্তান সম্পর্কে বলেছেন, এটি হচ্ছে গোঁড়ামি ও উগ্রতার পরিণতির উদাহরণ এবং এ ধরনের উগ্রতা আমাদের দেশে চাই না।

আমি মনে করি, সম্পাদক সাহেবের মন্তব্য খুবই আবেগপ্রবণ এবং পুরো ইস্যুটি তিনি একপেশে উপস্থাপন করেছেন। তিনি উল্লেখ করেননি যে হরতালের আগে পুলিশ কর্তৃপক্ষ বলেছিল তারা শক্তভাবে হরতাল প্রতিহত করবে এবং যশোরে কওমি মাদরাসার এক ছাত্রকে পুলিশ বর্বরভাবে হত্যা করেছে। তিনি উল্লেখ করেননি সরকারদলীয় ছাত্ররা পুলিশের সঙ্গে যোগ দিয়ে হরতালকারীদের পিটিয়েছে। আমরা জানি, সাধারণভাবে ইসলাম অনুসারীরা কখনো সম্পদ ধ্বংস করা সমর্থন করে না। অবশ্য এটি বাংলাদেশের সংস্কৃতি হয়ে গেছে যে ছাত্র, শ্রমিক, রাজনৈতিক কর্মীরা এ ধরনের ভাঙচুর করে থাকে। এটি একটি জাতীয় ক্যান্সারে পরিণত হয়েছে। এটি কেবল বিশেষ গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য নয়।

সম্পাদক সাহেব নারী উন্নয়ন নীতিমালা সঠিকভাবে উপস্থাপন করেননি। তিনি যদি ১৬(১), ১৭(২) ধারার বিষয়টি দেখেন তাহলে বুঝবেন। ১৬(১)



www.pathagar.com

ধারায় আছে, 'বাংলাদেশ সংবিধানের আলোকে রাষ্ট্রীয় ও গণজীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।' আমরা বুঝতে পারি না কেন এ ধারাকে শরিয়াহ সাপেক্ষে করা গেল না, যাতে কোনো ধরনের অপব্যাখ্যা করার সুযোগ থাকত না। যদি এ ধারাকে বাংলাদেশ সংবিধান সাপেক্ষে করা যায় তাহলে ইসলামী আইন সাপেক্ষে কেন করা যাবে না। ১৭(২) ধারায় আছে 'নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (CEDAW)-এর প্রচার ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।'

আমরা জানি, সিডও সনদ একটি বিতর্কমূলক দলিল যার সবকিছুর সঙ্গে কোনো জাতি একমত হতে পারেনি। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ প্রায় সব দেশ এ সনদের বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে নিজেদের আপত্তি রেকর্ড করিয়েছে এবং ওইসব ধারা তারা মানতে পারবে না বলে জানিয়েছে। বাংলাদেশও আপত্তি জানিয়েছে। কিন্তু নারীনীতির ১৭(২) ধারায় এসব রিজার্ভেশন সাপেক্ষে এ ধারা কার্যকরী হবে তাও উল্লেখ করা হয়নি। উচিত ছিল এ ধারাটিকে ইসলামী আইন সাপেক্ষে করা অথবা ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের বিধান সাপেক্ষে করা। একই সমস্যা রয়েছে ১৭(৪), ১৭(৬) ও ১৮(৪) ধারায়। এগুলোকে ইসলামী আইন সাপেক্ষে করা দরকার। যদি তা না হয় তাহলে পরে মারাত্মক বিতর্কের সৃষ্টি হবে।

কেন ইসলামপন্থিরা এগুলোর ওপর জোর দিচ্ছে। ইসলামপন্থিরা এসব আপত্তি জানিয়েছে, যাতে আল্লাহর আইনে হস্তক্ষেপ না হয়। ইসলাম সবাইকে ইনসাফপূর্ণ অধিকার দিয়েছে। এখানে ইনসাফ অর্থ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমতা ও কিছু ক্ষেত্রে যার জন্য যা হওয়া উচিত বা সঙ্গত, তা হওয়া বোঝায়। আমরা জানি, ভরণপোষণ ও মোহরানার ব্যাপারে নারীদের অগ্রাধিকার রয়েছে। আমরা কিছু লেখা দেখেছি যাতে প্রমাণ হয়, আর্থিক ক্ষেত্রে ছেলের চেয়ে মেয়ের সুবিধা বেশি। উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে ছেলে মেয়ে থেকে প্রাথমিকভাবে কিছু বেশি পায়, কারণ ছেলে তার পরিবারের ভরণপোষণের ব্যয় বহন করে, মেয়ের ওপর তা কর্তব্য নয়। পরবর্তী সময়ে অধিক ক্ষেত্রে ভরণপোষণের মাধ্যমে নারীরা সব সময় অধিক সুবিধা পায়। সেকুলার মৌলবাদীরা ইসলামকে নিন্দা করতে পারে। কিন্তু তাদের প্রচারণায় ইসলামপন্থিরা ঈমান বিসর্জন দিতে পারে না। সেকুলারিজমের ফল আমরা দেখেছি কীভাবে মানবজাতিকে ধ্বংস করা হচ্ছে। বিশ্বে ভোগবাদ, স্বার্থপরতা, অনৈতিকতা ছড়িয়ে পড়ছে। আমরা এসব চাই না। পাকিস্তানে যে সন্ত্রাস তার জন্য ইসলাম দায়ী নয়, তার জন্য দায়ী আফগান পরিস্থিতি এবং যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন কোয়ালিশন জোট। এর ফলেই পাকিস্তানে তালেবান পরিস্থিতির উদ্ভব। কিন্তু আমরা মনে করি, এসব সন্ত্রাসী সংখ্যায় মাত্র কিছু লোক। তারা যত সুইসাইড বোম্বিং করুক কখনোই সফল হবে না। তারা কেবল কিছু কালের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করতে পারবে।

১৬ এপ্রিল ২০১১, দৈনিক আমার দেশ



www.pathagar.com

# পথশিশুদের রক্ষা করা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণের সামগ্রিক পদক্ষেপ

কিছু দিন আগে পত্রিকায় প্রকাশিত একটি রিপোর্টে দেখা যায়, বাংলাদেশে পথশিশুর সংখ্যা প্রায় ৫০ লক্ষ। 'পথশিশু' অর্থ যাদের থাকার কোনো নির্দিষ্ট স্থান নেই। তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব কারো ওপর নেই এবং তারা অভিভাবকহীন। রিপোর্ট মোতাবেক, ঢাকা শহরে এ রকম পাঁচ লক্ষ পথশিশু আছে। এসব শিশু মাদকের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। মাদক ব্যবসায়ে জড়িয়ে পড়ছে। সর্বোপরি, বিভিন্ন ক্রাইম সিন্ডিকেট বা অপরাধী চক্র তাদেরকে রিক্রুট করছে। এরা বাধ্য হয়েই এসব অপরাধী চক্রে যোগদান করছে। এটি একটি ভয়াবহ অবস্থা। যদি এত অধিকসংখ্যক শিশু একমাত্র ঢাকাতেই মাদকসেবী হয়ে যায় এবং অপরাধে জড়িয়ে পড়ে, তাহলে ভবিষ্যতে কী ভয়ঙ্কর অবস্থা হবে তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে সরকার, এনজিও এবং সব সমাজসেবা সংগঠনকে নজর দিতে হবে। তাদের নৈতিকতা, ধর্মীয় শিক্ষা এবং কিছু না কিছু দক্ষতা (skill) শিক্ষা দিতে হবে। এ ব্যাপারে সরকারের উচিত একটি এনজিও কনসোর্টিয়াম (Consortium) গঠনে উৎসাহিত করা, যাতে তারা এ কাজ সারা দেশে, বিশেষ করে বড় শহরগুলোতে শুরু করে।

এ ব্যাপারে ছাত্র ও কিশোর সংগঠনগুলো বিশেষ উদ্যোগ নিতে পারে। তারা তাদের অফিসে ক্লাস নিতে পারে। গ্রামাঞ্চলে স্কুল ও মাদ্রাসায় এ ধরনের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

এ প্রসঙ্গে এ কথাও উল্লেখ করতে চাই যে, যারা এ ধরনের উদ্যোগ নেবেন তারা যেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তা পান। কয়েক দিন আগে খবর প্রকাশিত হয় যে, পথশিশুদের নিয়ে কাজ করে এমন এক এনজিওর অফিস থেকে একটি আইনশৃঙ্খলা বাহিনী শিশু পাচারকারী হওয়ার অভিযোগে ওই এনজিও'র প্রধানকে (যিনি একজন এমবিবিএস ডাক্তার) গ্রেফতার করেছে। পত্রপত্রিকায় এ গ্রেফতার নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। যা-ই হোক, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিষয়টি দ্রুত ভালো করে খতিয়ে দেখা উচিত, যাতে ভবিষ্যতে পথশিশু নিয়ে কাজ করছে এমন লোকেরা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে না যান।



www.pathagar.com

## দারিদ্র্য দূরীকরণে সামগ্রিক পদক্ষেপ নিতে হবে

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে দেশী-বিদেশী অর্থনীতিবিদ ও চিন্তাবিদরা বলেছেন, দারিদ্র্য দূরীকরণে একটি সামগ্রিক (Holistic) ব্যবস্থা নিতে হবে। কেউ কেউ বলেছেন, দারিদ্র্য একটি রাজনৈতিক ইস্যু এবং এটা দূর করতে হলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শিক্ষা এবং ব্যাপক নিরাপত্তাব্যবস্থা কার্যকর করতে হবে। যুক্তরাজ্যের বাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরেটাস প্রফেসর জিওফ উড বলেন, দারিদ্র্য কেবল একটি টেকনিক্যাল ইস্যু নয়, এটা একটি রাজনৈতিক ইস্যুও। যদি এ দু'টোকে আলাদা করে দেখা হয়, তাহলে কোনো কর্মসূচিই যথাযথ ফল দেবে না। সব পলিসি একত্রে দেখতে হবে এবং সমন্বিতভাবে কার্যকর করতে হবে। মাইক্রোফিন্যান্স বা ক্ষুদ্রঋণ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এর দ্বারা অতি দরিদ্রদের সমস্যার সমাধান হয় না। তারা বাদ পড়ে যায়। তার মতে, দারিদ্র্য বিমোচন নানা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। রাজনৈতিক অর্থনীতি (Political Economy) দরিদ্র জনগণের স্বার্থের বিপক্ষে। ইউএনডিপি'র কিশোর সিং বলেন, গ্রামের দরিদ্রদের জন্য অনেক প্রোগ্রাম আছে। কিন্তু শহরের দরিদ্রদের জন্য প্রোগ্রাম নেই।

দারিদ্র্য দূরীকরণে যে সামগ্রিক কর্মসূচি নিতে হবে, সে ব্যাপারে আমরা একমত। শহরের দরিদ্রদের বিষয়টিও এর অংশ হতে হবে। পথশিশুদের ব্যাপারটিকেও গুরুত্ব দিতে হবে। আমরা এমনও মনে করি যে, কেবল মাইক্রোক্রেডিট কিংবা পুঁজিবাদী উন্নয়ন দ্বারা দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব নয়। পুঁজিবাদ দারিদ্র্য উন্নয়নের সহায়ক নয়, যেমন জিওফ উডও বলেছেন। আমরা 'লেইসেজ ফেয়ার' (Laissez-faire), পুঁজিবাদ বা তাত্ত্বিক পুঁজিবাদ থেকে ফল পাই না। আমাদেরকে এমন মার্কেট ব্যবস্থা নিতে হবে, যেখানে তাত্ত্বিকভাবে প্রয়োজনীয় সরকারি হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ স্বীকৃত। ইসলামের পরিভাষায় একে হিসবা বলা হয়। তেমনি অতি দরিদ্রদের জন্য সরকারিভাবে সুদবিহীন মাইক্রোফিন্যান্স চালু করতে হবে, যেমন ইরান সরকার করেছে। সবার প্রতি সুবিচার এবং আর্থিক সমস্যার সমাধান হবে অর্থনীতির মূল মূল্যবোধ, 'মুনাফার পূজা' নয়। অবশ্য সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রচলিত যেসব ব্যবস্থা রয়েছে, তাও ব্যবহার করে কৃষি শিল্প ও সেবা খাতের অব্যাহত উন্নয়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

২০ এপ্রিল ২০১১, দৈনিক নয়া দিগন্ত



www.pathagar.com

# বিভিন্ন ফসলের বাম্পার ফলনের ক্ষেত্রে আমাদের করণীয়

পত্র-পত্রিকার খবরে দেখা যায়, কোনো কোনো ফসলের বাম্পার ফলন সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে, যেমন - আলু। আমাদের দেশের কিছু অঞ্চলে আলু বেশি হয়ে থাকে এবং কোনো কোনো সময় সেসব এলাকায় আবহাওয়া ভালো থাকলে বাম্পার ফলন হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে যে সমস্যা দেখা যায় তা হচ্ছে, দাম কমে যায় এবং কৃষক তার ন্যায্যমূল্য পায় না। অন্যদিকে রয়েছে কোল্ড স্টোরেজের সমস্যা। আমাদের কোল্ড স্টোরেজের ধারণক্ষমতা কী তা আমার জানা নেই।

যা হোক, যদি দেশে কোল্ড স্টোরেজের অভাব থেকে থাকে, তবে তা পূরণ করার ব্যবস্থা অবশ্যই কর্তৃপক্ষকে করতে হবে। তবে মূল সমস্যা হচ্ছে বাম্পার ফলন হলে সাময়িকভাবে মূল্য কমে যাওয়া। পাইকারেরা বা বড় ব্যবসায়ীরা কিনতে চায় না। যার ফলে দাম পড়ে যায় এবং তখনই তারা কেনে। এটাই হচ্ছে পুরনো মানব-চরিত্র এবং অনেক ব্যবসায়ীর চরিত্র। এটাকে বোধ হয় উপেক্ষা করা যাবে না। তা হলে কী করা যাবে?

আমার মনে হয়, টিসিবিকে আরও বড় করতে হবে। তাদের আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। তাদের গুদাম সংখ্যা প্রয়োজনে বাড়াতে হবে। তা করা গেলে টিসিবি'র পক্ষে বাম্পার ফলনের সময় যেসব এলাকায় এসব অতিরিক্ত ফলন হয়েছে, সেখানে যৌক্তিক মূল্যে আলু বা এ ধরনের ফসল কেনা সম্ভব হবে। বাম্পার ফলনের সময় সরকারের উচিত হবে একটি নিম্নতম মূল্য নির্ধারণ করে দেয়া, যার নিচে কোনো কোল্ড স্টোরেজ বা পাইকার আলু ক্রয় করতে পারবে না। টিসিবিকেও ওই মূল্যেই ক্রয় করতে হবে। যাতে বাজার উঠে যায় এবং কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। এ ধরনের ফসলের মধ্যে আরও রয়েছে পেঁয়াজ, রসুন, মরিচ, আদা, হলুদ ইত্যাদি। অর্থাৎ ওইসব কৃষিপণ্য যা পচনশীল নয়, যা কোল্ড স্টোরেজ ছাড়াই মজুত করে রাখা সম্ভব। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোল্ড স্টোরেজের মাধ্যমে, যেমন - আলু।

উপরে আলু সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, এসব পণ্য সম্পর্কেও একই কথা। কৃষক বাম্পার ফলন হলে যেন সঠিক মূল্য পায়, তাই টিসিবিকে একটা যৌক্তিক মূল্যে এসব পণ্য কিনে নিতে হবে। এখানে উল্লেখ করতে চাই, এই লেখা ধান,



www.pathagar.com

চাল বা গমের জন্য নয়। সেগুলোর বাম্পার ফলন হলে আমাদের কোনো অসুবিধা নেই। আমাদের কিছুটা খাদ্য ঘাটতি রয়েছে যা মার্জিনাল বা সামান্য। বাম্পার ফলন হলে সরকারের খাদ্য সংগ্রহ বাড়াতে হবে নির্দিষ্ট মূল্যে, যা যৌক্তিক হতে হবে এবং উৎপাদন খরচ মেটার পরও যাতে কৃষকের শতকরা ২০ ভাগ মুনাফা থাকে। এ মূল্যের কমে যেন চাতাল মালিকরা কিনতে না পারে। একই উদ্দেশ্য অর্থাৎ কৃষকের স্বার্থ রক্ষা করা। আরও উল্লেখ করা দরকার, বিশ্বব্যাপী খাদ্যের যে পরিস্থিতি এবং আমাদের জনসংখ্যার পরিমাণের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের খাদ্য মজুত ৪০-৫০ লক্ষ টন করা দরকার। বর্তমানে আমরা ২০ লক্ষ টনের বেশি খাদ্য সংগ্রহ করি না। কিন্তু এতবড় জনসংখ্যা ও বিশ্ব খাদ্য পরিস্থিতি সামনে রেখে আমাদের বড় মজুত (স্টক) রাখতে হবে। মজুত রাখা মানে এ নয় যে, বছরের পর বছর তা পড়ে থাকবে। এর মানে হচ্ছে একদিকে কিনব দেশ বা বিদেশ থেকে, অন্য দিকে আমরা ভিজিএফ-রেশনিং ইত্যাদির মাধ্যমে বিক্রি বা বিতরণ করতে থাকব।

এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করতে চাই যে, আমরা যদি চাই খাদ্যমূল্য আর না বাড়ুক এবং স্থিতিশীল হয়ে যাক, তাহলে অবশ্যই আমাদের মজুত আইনকে আরও ভালভাবে প্রয়োগ করতে হবে যাতে মজুতের সীমা ফসল ফলনের সময় বেশি হবে। যখন খাদ্যমূল্য বাড়তে থাকে, তখন মজুতের পরিমাণ অন্যরকম হবে, অর্থাৎ কম হবে। যেমন: চাতাল মালিকরা ফসলের সময় এক হাজার টন মজুত রাখতে পারে। অন্য সময়ে অর্থাৎ যখন খাদ্যমূল্য বেড়ে যায় তখন ৫০ টনের বেশি মজুত রাখতে পারবে না। দ্বিতীয়ত, সরকারের দ্রব্যমূল্য নির্ধারণের যে ক্ষমতা রয়েছে, সেটিও যতটুকু না করলেই নয় ততটুকু প্রয়োগ করতে হবে। অন্তত প্রতি মণ ধান, চাল বা গম একটি নির্ধারিত মূল্যের কমে কিনতে পারবে না। অর্থাৎ একটা নিম্নতম মূল্য ধার্য করা হবে যার নিচে কিনতে পারবে না। আবার একই সঙ্গে চাতাল মালিকরা কত দামের বেশিতে বিক্রি করতে পারবে না, তাও নির্ধারণ করে দিতে হবে। অর্থাৎ প্রথম মূল্য নির্ধারণ কৃষকের স্বার্থে ও দ্বিতীয়টা ভোক্তার স্বার্থে। আমি জানি, দাম নির্ধারণ সহজ নয় এবং কার্যকরী করাও কঠিন। কিন্তু অনেক সময় যেমন ওষুধের ক্ষেত্রে, ভোজ্যতেলের ক্ষেত্রে, ডিজেলের অথবা কেরোসিনের ক্ষেত্রে তা করা হয়ে থাকে। তেমনি এ কঠিন কাজটিই করতে হবে। তাহলেই আশা করা যায় খাদ্যমূল্য বর্তমান পর্যায়ে স্থিতিশীল থাকবে এবং অন্তত কিছু কালের জন্য মূল্যস্ফীতি বন্ধ হবে। অবশ্য এসব মূল্য নির্ধারণ প্রতি বছর কৃষি উৎপাদন খরচকে ভিত্তি করে বদলাতে হবে। এ বিষয়টি একটি জাতীয় সমস্যা। এটাকে রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে সমাধান করতে হবে।

২ এপ্রিল ২০১১, দৈনিক আমার দেশ



www.pathagar.com

# নয়া দিগন্তের একটি কলাম ও বাউল প্রসঙ্গ

নয়া দিগন্তের সর্বজনশ্রদ্ধেয় কলাম লেখক প্রফেসর এবনে গোলাম সামাদের সর্বশেষ লিখিত কলাম "ইসলামে নারীর অবস্থান এবং বিএনপি'র পাশ্চাত্যমুখিতা" সম্পর্কে সবিনয়ে কিছু বলতে চাই। দ্বিতীয় বিষয়টি আগে বলি। তিনি বলেছেন, "বেগম জিয়া যদি পাশ্চাত্যের সহানুভূতি পেতে চান, তবে তাকে স্পষ্ট হতে হবে ইসলাম সম্বন্ধে। কারণ, তিনি জোট বেঁধেছেন ইসলামপন্থি বলে কথিত এমন অনেক দলের সাথে, যারা বিএনপি'র ভাবমূর্তিকে পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে করতে চাচ্ছে বিবর্ণ।" আমি মনে করি না যে, এ কথা নীতি বা বাস্তবসম্মত। পাশ্চাত্যের সাথে সম্পর্কের মানে তাদের আদর্শিক বা বৈদেশিক নীতির গোলামী হতে পারে না। বিএনপি'কে কেন এতটা পাশ্চাত্যমুখী হতে হবে? ১৯৯১ সালে বা ২০০১ সালে বিএনপি'র ক্ষমতা পাশ্চাত্যের সমর্থনে আসেনি। এসেছে বাংলাদেশের জনগণ এবং ইসলামী দলগুলোর সমর্থনে। বিএনপি'র সাথে আছে প্রধান সঙ্গী হিসেবে জামায়াতে ইসলামী। আমি যতটুকু জানি, যুক্তরাষ্ট্র এ দলটিকে মধ্যপন্থি গণতান্ত্রিক দল হিসেবেই জানে। আমেরিকান ডিপ্লোম্যাটদের কাছে আমি এ কথাই শুনেছি। যদি বিএনপি ইসলামী দলগুলোকে সাথে নিয়ে কাজ না করে, জোট করেই হোক বা সমঝোতার মাধ্যমে হোক, তাহলে বিএনপিকে পাশ্চাত্যও ক্ষমতায় আনতে পারবে না।

এখন আসি ইসলামে নারীর অবস্থান প্রসঙ্গে। এবনে গোলাম সামাদ ইসলাম সম্পর্কে অনেক ভালো কথা বলেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার মূল অবস্থান স্পষ্ট হবে তার নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকে। তিনি বলেছেন, 'এখন প্রশ্ন উঠেছে, কুরআনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, সেটাকে আমরা মেনে নেব কি না। ইসলামী আইনে অবশ্য অন্য রকম ব্যাখ্যাও হতে পারে। আর সেটা যে ভুল, তাও বলা যাবে না। তবে বর্তমান যুগে নারী-পুরুষের সমান অধিকারের প্রশ্নটি বড় হয়ে উঠেছে। কুরআন শরিফে নারী-পুরুষকে বলা হয়েছে সমতুল্য। আমরা যদি কুরআন শরিফের এ বক্তব্যের ওপর গুরুত্ব দিয়ে নারীনীতি প্রণয়ন করি, তাহলে তা হতে পারে যুগধর্মের অনুকূলে।'

সোজা কথায় উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রেও নারী-পুরুষ সমান করতে চাচ্ছেন। নারীর মোহরানা দেয়া এবং ভরণপোষণের পূর্ণ দায়িত্ব পুরুষের ওপর দিয়ে কী করে উত্তরাধিকার এক হওয়া সম্ভব বা ন্যায়সঙ্গত, তা আমি বুঝতে অক্ষম। তা



www.pathagar.com

হলে আল্লাহর দেয়া উত্তরাধিকার, মোহরানা ও ভরণপোষণে পুরুষের দায়িত্বসংক্রান্ত তিনটি আইনই বদলে ফেলতে হয়। এগুলো ব্যাখ্যার ওপর নির্ভরশীল নয়, সরাসরি কুরআনের আয়াতভিত্তিক। আইয়ুব খান ও মোস্তফা কামালের উদাহরণ দিয়ে তা যথার্থ বলা খুবই অসঙ্গত। মোস্তফা কামাল তুরস্কেই পরিত্যক্ত। আইয়ুব খানের করা উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিষয়টিও যেকোনো সময় পরিত্যক্ত হতে পারে যদি ইসলামী শক্তি ক্ষমতায় আসে।

আগেই এক লেখায় বলেছি, আর্থিক ক্ষেত্রে ইসলামে কন্যার সুবিধা পুত্রের চেয়ে অধিক। তাই ইসলামী আইনে হস্তক্ষেপ না করেই নারীকে সব ধরনের ন্যায্য অধিকার দেয়া সম্ভব ও সঙ্গত। পাশ্চাত্যকে খুশি করতে নারীনীতি প্রণয়ন করা কোনোভাবেই সঠিক নয়। যেমন তিনি সর্বশেষে তার কলামে বলেছেন, "পাশ্চাত্যের সমর্থন পেতে হলে বিএনপি'র থাকতে হবে সুস্পষ্ট নারীনীতি। না হলে আওয়ামী লীগের পক্ষে যাবে পাশ্চাত্যের সমর্থন।" এ কথা গ্রহণযোগ্য নয়।

## বাউল প্রসঙ্গ

বাউল প্রসঙ্গ নতুন করে সামনে চলে এসেছে। পাংশা উপজেলার আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং কয়েকজন মাদরাসা শিক্ষক কিছু বাউলকে তওবা পড়ান এবং তাদের লম্বা গোঁফ ও চুল কেটে দেন।

একটি জাতীয় দৈনিকে একজন কলাম লেখক ইতিহাস থেকে বাউলদের তওবা পড়ানোর কয়েকটি উদাহরণ দিয়েছেন যা ঘটেছিল ১৯৩২ সালে, ১৯৪২ ও ১৯৮৪ সালে। প্রায় একশ' বছরে এ রকম কয়েকটি ঘটনাকে ব্যতিক্রম হিসেবে গণ্য করা যায়। তবে এ কথা বিবেচনাযোগ্য যে, বাউলরা যেহেতু মুসলিম নামধারী সেহেতু তাদের মুসলিম সমাজ কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করবেই। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বিষয়টি অস্বীকার করা যাবে না; সমাজ অস্বাভাবিক কাজ গ্রহণ করে না।

লেখক বাউলদের অনেক প্রশংসা করেছেন। তার ভাষ্য মতে, 'তাদের দ্বারা বাংলাদেশে এক মানবতাবাদী জাগরণ ঘটে', 'তাদের হাত ধরেই কৃষক সমাজের মধ্যে ঘটেছিল দেশজ রেনেসাঁ', 'বাউলরাই হচ্ছে আমাদের আদর্শ নারী-পুরুষ'। এসবই হচ্ছে অতিরঞ্জিত কথা। লালন নিজে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে অনেক অনেক বড়। কিন্তু সাধারণ বাউলরা তা নন। তারা অস্বাভাবিক জীবন যাপন করেন। তারা অপরিচ্ছন্ন থাকেন, অবাধ যৌনাচারে বিশ্বাস করেন, তাদের পুরুষেরা হায়েজের রক্তপান বৈধ মনে করেন। তাদের নারীরা পুরুষের বীর্যপান বৈধ মনে করেন। বাউলেরা কখনোই কোনো আদর্শ নন, তারা সাধারণ মানুষ। তারা সভ্যতার কিছুই জানেন না, তারা সত্যিকার অর্থে কোনো ধার্মিক লোকও নন। কিন্তু এ কথা অবশ্যই বলতে হবে যে, এসব নিরীহ লোকের ওপর কোনো অত্যাচার বৈধ হতে পারে না। যা করতে হবে মুসলিম সমাজকে, তা বৈধভাবে করতে হবে।

২৬ এপ্রিল ২০১১, দৈনিক নয়া দিগন্ত



www.pathagar.com

# বিচার বিভাগের জবাবদিহিতা ও মাতৃত্ব ছুটি বাড়ানো

বিডি নিউজ ও অন্যান্য সংবাদমাধ্যমের খবরে দেখা যায়, বিচার বিভাগের জবাবদিহিতার বিষয়ে আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ এবং সংসদের আইনসংক্রান্ত স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের মধ্যে ব্যাপক মতবিরোধ রয়েছে। ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ বলেছেন, প্রজাতন্ত্রের তিনটি অঙ্গ সংবিধানে প্রদত্ত সীমানার মধ্যে কাজ করবে। অন্যদিকে সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বলেছেন, বিচার বিভাগকে পার্লামেন্টের কাছে জবাবদিহি করতে হবে, যেমনটি ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানের ৯৬ আর্টিকেলে ছিল। শফিক আহমেদ বলেছেন, যদি ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানে ফিরে যাওয়া হয়, তাহলেও তা থেকে ওই আর্টিকেল বাদ দেয়া হবে।

আমি মনে করি, এ কথা ঠিক যে, প্রজাতন্ত্রের প্রতিটি অঙ্গকে সংবিধান নির্ধারিত সীমানার মধ্যেই কাজ করতে হবে। কিন্তু আমরা দেখেছি, এ নিয়ম সাম্প্রতিককালে বিচার বিভাগ সংবিধানের পঞ্চম ও সপ্তম সংশোধনী বাতিলের ক্ষেত্রে অনুসরণ করেনি। আমাদের সংবিধানে এমন কোনো অনুচ্ছেদ নেই, যাতে কোনো সংসদ কর্তৃক দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত সংবিধান সংশোধনী বাতিলের বিধান আছে আদালতে; বরং বিধান আছে, সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের পদ্ধতি অনুসরণ করেই কেবল সংবিধান সংশোধন করা যেতে পারে। তাই পঞ্চম ও সপ্তম সংশোধনী বাতিল করা বিচার বিভাগের সংবিধানপ্রদত্ত সীমার মধ্যে ছিল না। তার চেয়েও বড় ব্যাপার হচ্ছে, তারা কিছু ক্ষেত্রে সংবিধান প্রণয়নের এবং সংশোধনের মূল ক্ষমতাও (যা জাতীয় সংসদকে দেয়া হয়েছে) প্রয়োগ করেছেন। যেমন, পঞ্চম সংশোধনীকে তারা অবৈধ ঘোষণা করেছেন, আবার অবৈধ ঘোষিত এই সংশোধনী থেকে তারা কিছু অংশকে বহাল রেখেছেন। এই ক্ষমতা সংবিধানে কোথায় কোর্টকে দেয়া হয়েছে? না, তা কোথাও দেয়া নেই।

সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত সবারই জবাবদিহিতার প্রয়োজন আছে বলেছেন। এ কথা সত্য। পার্লামেন্টের সদস্যদের নানাভাবে জবাবদিহি করতে হয়। সর্বোপরি, তাদের জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হয় নির্বাচনের সময়। সব সরকারি কর্মচারী, এমনকি অধস্তন বিচার বিভাগেরও জবাবদিহিতা রয়েছে। তা হলে সর্বোচ্চ কোর্টের জবাবদিহিতা কোথায়, কার কাছে হবে? প্রধান বিচারপতি



www.pathagar.com

বলেছেন, তারা আল্লাহর এবং জনগণের কাছে দায়বদ্ধ। আল্লাহর কাছে দায়বদ্ধতা নিয়ে কোনো মন্তব্য নেই, কেননা আমরা সবাই আল্লাহতালার কাছে দায়বদ্ধ। এটা কেবল বিচারকদের ব্যাপার নয়। অন্যদিকে জনগণের কাছে দায়বদ্ধতার অর্থই হচ্ছে জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী জাতীয় সংসদের কাছে দায়বদ্ধ থাকা। সংসদ সদস্যরা যেমন নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের কাছে দায়বদ্ধ, তেমনি বিচারকরা নির্বাচনের মাধ্যমে দায়বদ্ধ হতে পারবেন না। সুতরাং তাদের দায়বদ্ধতা যদি সত্যিই থাকতে হয়, তাহলে সংসদের কাছেই থাকতে হবে। এ ব্যাপারে আমি সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের সাথে একমত।

## মাতৃত্ব ছুটি বৃদ্ধি ঃ এটা নারীর জন্য জরুরি

নারীর মাতৃত্বকালীন ছুটি বৃদ্ধি করার বিষয়টি অনেক দিন থেকেই সরকারের বিবেচনাধীন ছিল। এটা প্রথমত মাত্র ৪৫ দিন ছিল। পরে বাড়িয়ে চার মাস করা হয়। এখন সরকার এটাকে ছয় মাস করেছে। এর মূল উদ্দেশ্য নারীর গর্ভকালীন এবং গর্ভ-পরবর্তী স্বাস্থ্যের কল্যাণ করা। এ ছাড়া এর ফলে শিশুর মায়ের বুকের দুধ খাওয়ার সুবিধা বৃদ্ধি পাবে।

আমি এ সিদ্ধান্ত সমর্থন করি। আমাদের মনে রাখতে হবে, নারীরা সন্তান ধারণ করেন নিজেদের জন্য নয়, বরং মানবজাতির জন্য। সুতরাং সবাইকে নারীর এ দায়িত্ব পালনে অংশ নিতে হবে, সহায়তা করতে হবে, যাতে তাদের স্বাস্থ্য ভালো থাকে এবং শিশুরা অন্তত কয়েক মাস মায়ের বুকের দুধ ভালো করে পান করতে পারে। কিছু লোক বলেছেন, এর ফলে সরকারের এবং অন্যান্য সংস্থা ও কারখানা, যেখানে নারীরা কাজ করেন, তাদের খরচ বেড়ে যাবে। আমরা এটা অস্বীকার করি না। কিন্তু এ অতিরিক্ত ব্যয় তেমনিভাবে বহন করতে হবে, যেমনিভাবে একটি কারখানা বা অফিস অন্যান্য খরচ বহন করে থাকে। যেভাবে ভাড়া, রক্ষণাবেক্ষণ, কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, ফুয়েল ও অন্যান্য খরচ বহন করে থাকে; এটা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব, যা কিছুতেই এড়ানো যাবে না। মানবজাতির জন্য তারা গর্ভধারণের যে দায়িত্ব পালন করে থাকেন, তার জন্য তাদেরকে অন্যান্য সামাজিক ও মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় না।

আমি আশা করি, সব প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও কারখানা এ আদেশ যথাযথভাবে পালন করবে।

২৯ জানুয়ারি ২০১১, দৈনিক নয়া দিগন্ত



www.pathagar.com

# শেয়ার বাজার ও আইনের শাসন

বিগত রবি ও সোমবার (৯ ও ১০ জানুয়ারি ২০১১) শেয়ারবাজারের ব্যাপক দরপতনের পর দেশের বিভিন্ন শহরে অসংখ্য যুবক ও অন্যরা বিক্ষোভ করে। স্টক মার্কেটে লেনদেন বন্ধ করে দেয়া হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক ও এসইসি কিছু ব্যবস্থা নেওয়ার পর মঙ্গলবার আবার মার্কেট খুলে দেয়া হয়। মঙ্গলবার আবার শেয়ারবাজারের সূচক এক হাজার পয়েন্ট পড়ে যায় (১৫ শতাংশ)। এ ব্যাপক দরপতনের পর অর্থনীতিবিদরা 'বাবল' বা শেয়ার মার্কেটের ফাঁপানো অবস্থার জন্য কিছু ব্যাংককে দায়ী করেছেন। এসব ব্যাংক শেয়ার মার্কেটে ব্যাপকভাবে পুঁজি বিনিয়োগ করেছিল। যার ফলে কিছু শেয়ারের দাম অনেক বেড়ে যায়। তখন ব্যাংকগুলো তাদের কেনা শেয়ার ছেড়ে দেয়। তাদের যা লাভ করার তা তারা করে ফেলে। তাদের ছেড়ে দেওয়া এত শেয়ার স্বল্প সময়ে কেনার চাহিদা না থাকায় এসব শেয়ারের দরপতন ঘটে। ক্ষুদ্র ক্রেতা-বিক্রেতারা পথে বসে। এ ব্যাপারে লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, বিপুলসংখ্যক যুবকের শেয়ার কেনাবেচায় জড়িয়ে যাওয়ার বিষয়টি; এটাই মনে হয় তাদের অধিকাংশের প্রধান পেশা।

যা হোক, আমার মনে হয় আমাদের সাধারণ যুবকের শেয়ার কেনাবেচাকে প্রধান পেশা না করা সঙ্গত। এটা তাদের অতিরিক্ত ব্যবসা হতে পারে। এ ব্যবসা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। লোকসানের সম্ভাবনা অনেক। অনেক প্রতারণা আছে এখানে। সবারই এ ব্যবসা সম্পর্কে সাবধান হওয়া উচিত। এসব কেনাবেচায় শেয়ারের কেবল হাতবদল হয়। এটা নতুন পুঁজি নয়। এর সঙ্গে দেশের প্রকৃত উন্নয়নের কোনো সংযোগ নেই। জুয়া ও সুদ থেকে বাঁচতে হলে কিছু দিন শেয়ার কিনে ধরে রাখা উচিত এবং মার্জিনে (অর্থাৎ ব্রোকার থেকে ঋণ নিয়ে) শেয়ার ক্রয় করা উচিত নয়। সে ক্ষেত্রে মার্জিনে নেয়া ঋণের উপর সুদ দিতে হবে।

আমি এ কথাও উল্লেখ করতে চাই যে ব্যাংকগুলোর শেয়ার মার্কেটে সরাসরি আসা উচিত নয়। তাহলে বারবার 'বাবল' (ফোলা ভাব) সৃষ্টি হবে। ব্যাংকের দায়িত্ব প্রকৃত বিনিয়োগ করা, যাতে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এসবের মধ্যে রয়েছে শিল্প ও আমদানি-রপ্তানিতে বিনিয়োগ। ব্যাংকের জন্য শেয়ার কেনাবেচায় জড়িয়ে পড়া প্রকৃত উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত করবে।



www.pathagar.com

## আইনের শাসন দুর্বল হচ্ছে

'আইনের শাসন দুর্বল হচ্ছে: আমাদের তা বন্ধ করতে হবে' জাতীয় দৈনিকের এ প্রতিবেদনে দেখা যায় বক্তারা এক গোলটেবিল বৈঠকে বলেন, দেশের জনগণ আইনের শাসন নিয়ে খুব চিন্তিত ও ভীত এবং তারা মনে করেন এই অবস্থায় কেউ সুষ্ঠু বিচার পাবে না। বক্তারা আরো বলেন, আমাদের দেশে যদি প্রত্যেক বিভাগে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত না হয় তাহলে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে না। আইনকে অমান্য করার জন্য তারা আইন প্রণেতা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং আদালতকে সমালোচনা করেছে। রাজধানীর প্রেসক্লাবে সভ্য সামাজিকভিত্তিক সংস্থা 'সুশাসনের জন্য নাগরিক' (সুজন) একটি গোলটেবিলের আয়োজন করেছিল যার শিরোনাম ছিল 'বাংলাদেশে বর্তমানে আইনের শাসন'। সুজনের সভাপতি অধ্যাপক মোজাফ্‌ফর আহমেদ বলেন, জাতীয় নির্বাচনের পরে জনগণ একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশের আশা করে কিন্তু তা অর্জন হয়নি।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (TIB) এর চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হাফিজ উদ্দিন খান বলেন, প্রত্যেক জায়গায় যদি স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা না যায়, তাহলে আইনের শাসন কখনো প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তিনি আরও বলেন, আমরা আশঙ্কা করি দেশে অঘোষিত ফ্যাসিজম বিদ্যমান। বিগত ৪০ বছর ধরে বিচারপতি নিয়োগের প্রক্রিয়ায় কোনো স্বচ্ছতা পাওয়া যায়নি। এর মধ্যে ছিল রাজনীতিকরণ। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের পরিচালক সুলতানা কামাল বলেন, জনগণ আদালতের প্রতি তাদের বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে এবং তারা বিশ্বাস করে না যে, তারা এখান থেকে সাহায্য পেতে পারে। কলামিস্ট আবুল মকসুদ বলেন, আইন হলো একটি নৈতিক ইস্যু, এর প্রয়োগ হওয়া উচিত নিরপেক্ষভাবে, রাজনৈতিকভাবে নয়। তিনি বলেন, আমরা এটা দেখছি, আইনের প্রয়োগ হচ্ছে রাজনৈতিক এবং কিছু ব্যক্তিস্বার্থে। তিনি বলেন, দেশ বর্বর হয়ে যাচ্ছে এবং শাসন হচ্ছে পশুর মত হিংস্র। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিষয়ের অধ্যাপক আসিফ নজরুল বলেন, আমরা ভালো কার্যকরী আইন তৈরী করতে পারি না, কিন্তু আমরা খারাপ আইন খারাপভাবে প্রয়োগ করতে পারি।

আমি মনে করি বক্তারা আমাদের জীবনের প্রেক্ষিতে কিছু দুঃখজনক বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। কোনো বিচার নেই পুলিশের আচরণের মধ্যে। ম্যাজিস্ট্রেটরা সমানে রিমান্ডে দিচ্ছেন কিন্তু রিমান্ডে কী অত্যাচার হচ্ছে সেটা তারা বিবেচনায় নিচ্ছেন না। কেস দাখিলের আগে সিনিয়র রাজনীতিকদের গ্রেফতার করা হয়। জামায়াতে ইসলামীর সিনিয়র নেতারা কোন্ কেস দ্বারা ৮/৯ মাস ধরে জেলে আছেন? এ অবস্থার পরিবর্তন জরুরি। সিভিল সোসাইটি এবং অন্য সবাইকে এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা নিতে হবে।

১৫ জানুয়ারি ২০১১, দৈনিক আমার দেশ



www.pathagar.com

# শেয়ারবাজার সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা

বাংলাদেশের শেয়ারবাজারে নানা অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটেছে। হঠাৎ করে দরপতন কোনো অস্বাভাবিক বিষয় নয়। তবে দরপতন ঘটলে বিক্ষোভ, রাস্তা অবরোধ, গাড়ি ভাঙচুর অন্যান্য দেশে হয় বলে আমার জানা নেই।

শেয়ারবাজারের বর্তমান পরিস্থিতি আলোচনার আগে এ সংক্রান্ত কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা করতে চাই। শেয়ার হচ্ছে মালিকানার অংশ। শেয়ার কিনে আমরা বিভিন্ন ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হয়ে থাকি। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, ওই কোম্পানির লাভে অংশীদার হওয়া, যাকে ডিভিডেন্ড (Dividend) বলা হয়। এটা সুদ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। ইসলামে সুদ অবৈধ এবং লভ্যাংশ বৈধ।

অন্যদিকে যারা নতুন ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠান করতে চান তার জন্য শেয়ার বিক্রি হচ্ছে ব্যাংক ঋণের বিকল্প পুঁজি সংগ্রহের উপায়। এ জন্য ক্যাপিটাল মার্কেট বা পুঁজিবাজার হচ্ছে ফিন্যান্সিয়াল মার্কেট বা অর্থবাজারের (ব্যাংক ব্যবস্থার) বিকল্প পুঁজি সংগ্রহের মাধ্যম। পুঁজি সংগ্রহ ও শেয়ার কেনা সহজ করার জন্য স্টক মার্কেটের উদ্ভব হয়েছে। নতুন পুঁজি সংগ্রহের জন্য প্রথমবারের মতো যখন শেয়ার ছাড়া হয় তখন সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের নিয়মমাফিক শেয়ার ক্রয় করতে হয়। এগুলোকে প্রাইমারি শেয়ার বলা হয় এবং এগুলো ক্রয়-বিক্রয়কে প্রাইমারি মার্কেটের কাজ বিবেচনা করা হয়। পরবর্তী সময়ে যদি এসব শেয়ার বিক্রি বা ক্রয় করতে হয় তাহলে তা নিয়মমাফিক করা যায় এবং এটাকে সেকেন্ডারি স্টক মার্কেট বলা হয়।

একটি কথা সবারই জানা দরকার যে, বর্তমানে স্টক মার্কেটে দৈনিক যে কমবেশি দু'হাজার কোটি টাকার শেয়ার লেনদেন হয়, তা নতুন পুঁজি নয়। এসব শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে পুঁজিবাজারের প্রকৃত পুঁজি বৃদ্ধি পায় না। অধিকাংশ শেয়ার মালিক এভাবে কেনাবেচাও করে না। তারা শেয়ার কেনার পর সাধারণত তা ধরে রাখে এবং যথাসময়ে কোম্পানির লভ্যাংশ পায়। আমারও কিছু শেয়ার আছে। আমি এসব শেয়ার ধরে রেখেছি এবং দৈনিক বাজারে কি হচ্ছে তা খেয়ালও করি না। আমি প্রতি বছর লভ্যাংশ পেয়ে থাকি।

আর একদল লোক তারা মূলত শেয়ার ধরে রাখেন না, কিনেন এবং বেচেন। তারা সারাদিন ইন্টারনেটে নজর রাখেন কোনটার দাম বাড়ছে এবং কোনটার



www.pathagar.com

কমছে। তারা তাদের বুঝ মোতাবেক শেয়ার ছেড়ে দেন বা কিনেন। তার লভ্যাংশের জন্য শেয়ার কেনাবেচা করেন না। তারা এ কাজ করেন কেনাবেচার মাধ্যমে মুনাফা করার জন্য। এটা এক নতুন পেশায় পরিণত হয়েছে।

এই পেশায় কিছু লোকের লাভ বা লোকসান অবশ্যই হয়। কিন্তু এর দ্বারা অর্থনীতির কোনো কল্যাণ হয় এটা আমার মনে হয় না। এই ব্যবসা অনেকটা জুয়ার কাছাকাছি। কারও মতে জুয়াই। কেনাবেচার এ চরিত্র দূর হতে পারে যদি কোনো শেয়ার কেনার পর তার বিক্রির ওপর শর্তারোপ করা হয় যে অন্তত ৭ দিন ধরে রাখতে হবে, না হলে তা জুয়া থেকে পৃথক করা কঠিন হবে। আমি আমার বন্ধুদের সব সময়ই বলি তারা যেন এ ব্যবসায় থাকতে হলে এরকম কিছুদিন শেয়ার ধরে রাখেন। আরও একটি বিষয় হচ্ছে মার্জিনে শেয়ার না কিনা। তা হলে সুদে জড়িয়ে যেতে হবে। যারা সুদ বৈধ মনে করেন না তাদের এটি বাদ দিতে হবে।

শেয়ারবাজার সারাবিশ্বেই পরিকল্পিতভাবে কিছু লোক প্রভাবিত করে থাকে যাকে ম্যানিপুলেশন (manipulation) বলা হয়। ১৯৯৬ সালে যখন আমি ব্যাংকিং সচিব, তখন দেখেছি কীভাবে শেয়ারবাজারকে ম্যানিপুলেট করা হয়েছিল, আমি নিজেও এটা বন্ধ করতে সক্ষম হইনি। এ থেকে শেয়ারবাজারকে বাঁচানোর জন্য সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনকে সব সময় সতর্ক থাকতে হবে। সাধারণ জনগণকে সাবধান থাকতে হবে। তারা খুব চিন্তা করে শেয়ার কিনবেন। তারপর শেয়ার ধরে রাখবেন। তারা লভ্যাংশের জন্য শেয়ার কিনবেন। দরপতনে ঘাবড়াবেন না। সেটা ম্যানিপুলেশনেও হতে পারে। আবার স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় এটা ঠিক (correct) হয়ে যাবে। ম্যানিপুলেটররা খুবই চালাক। তাদের মোকাবিলা করা কঠিন। সুতরাং তাদের ফাঁদে পা দেবেন না। দরপতন হলেই শেয়ার বেঁচে দেবেন না। এসব হতেই থাকবে। এটাকে বেশি গুরুত্ব দেবেন না।

২১ ডিসেম্বর ২০১১, দৈনিক আমার দেশ



www.pathagar.com

# একটি সামাজিক ও একটি আইনি সমস্যা

কয়েকদিন আগে দু'জন মহিলা অ্যাডভোকেটের সাথে কথা হচ্ছিল, তারা মহিলাদের একটি বড় সমস্যার কথা তুলে ধরেন। তারা বলেন, সমাজে গ্রামাঞ্চলে ও শহরে তালাকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব নারীর সমস্যা হচ্ছে, তালাকের পর তাদের যাওয়ার কোনো স্থান থাকে না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পিতা না থাকলে বাপের বাড়ি যাওয়াতেও সমস্যা হয়। অনেক ক্ষেত্রে ভাইয়েরা এবং ভাইদের পরিবার বিষয়টি সদয়ভাবে নিতে চায় না। পিতা থাকলে সমস্যা কিছু কম হয়।

এ সমস্যা আলোচনা করতে গিয়ে আমি এবং ওই দুই আইনজ্ঞ মহিলা একমত হই যে, ইসলাম নারীদের পিতামাতার সম্পত্তিতে যে অধিকার দিয়েছে সেই অধিকার যদি পুরোপুরিভাবে পিতার বাসস্থানে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে এ ধরনের নারীদের দুর্ভোগ অনেক কম হবে। আমরা আরো একমত হই, পিতার বাসস্থান যদি ক্ষুদ্র হয় তার মধ্যেও কন্যাদের সম্পত্তির অধিকার (বিশেষ করে ঘরবাড়িতে অধিকার) পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। এটি দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান নয়, এটি এসব নারী সম্পর্কিত সামাজিক সমস্যার অন্যতম সমাধান।

এ প্রসঙ্গে এ কথাও বলা ভালো, পিতার সম্পত্তিতে কন্যার অধিকার পুত্রের তুলনায় কম, এ আলোচনায় আমরা যাচ্ছি না। কিন্তু এটুকু উল্লেখ করছি, সব বিচারে দেখা গেছে যদি সম্পত্তির অধিকারের সাথে ভরণপোষণের অধিকার একত্রে দেখা হয় তাহলে ইসলামের এ সংক্রান্ত আইনে কোনো অসঙ্গতি দেখা যাবে না। উপরন্তু দেখা যাবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নারীরই সুবিধা। এ সম্পর্কে দারুল ইহ্সান বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রভাষক ও যুক্তরাষ্ট্রে পাঠরত কানিজ ফাতিমার লেখা রয়েছে। যেটি গুগল সার্চ করে যে কেউ দেখতে পারেন (Kaniz Fatima - inherritence)।

এ কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন, তালাক হলে স্ত্রীর ভরণপোষণের অধিকার সাবেক স্বামীর দায়িত্বে থাকে না (ইদ্দতের সময় ছাড়া)। সেই সময় সেই নারী যদি নিজের ভরণপোষণ না করতে পারে তাহলে তার ভরণপোষণের দায়িত্ব আত্মীয়স্বজনের ওপর বর্তায়। তা না হলে সরকারের ওপর বর্তায়। ভারতে এ ব্যাপারে দায়িত্ব প্রাদেশিক ওয়াকফ বোর্ডের ওপর ন্যস্ত রয়েছে। তা করা হয়েছে আইন করে।



www.pathagar.com

এই ভিত্তিতে আমি মনে করি, বাংলাদেশ সরকার ও জাতি নিম্নরূপ ব্যবস্থা নিতে পারে।

(ক) ইসলামী আইন মোতাবেক সর্বাবস্থায় পিতার সম্পত্তিতে কন্যার অধিকার, বিশেষ করে ঘরবাড়ির ওপর বহাল করতে হবে। এ ব্যাপারে সারা দেশে প্রজ্ঞাবান আলেম ও সমাজপতিদের বিশেষ নজর দিতে হবে। তা করা হলে সব নারীর আর্থিক অবস্থা তুলনামূলকভাবে ভালো হবে এবং তালাকের ক্ষেত্রে তাদের সমস্যা অপেক্ষাকৃত কম হবে।

(খ) সরকারকে একটি আইন করার পরামর্শ দিতে চাই, সব তালাকপ্রাপ্তা নারী নিজেদের ভরণপোষণে সক্ষম নয় (এবং যাদের ভরণপোষণে কোনো আত্মীয় নেই) তাদের ভরণপোষণ সরকার থেকে করা হবে একটি প্রকল্পের আওতায়। যেমন আমাদের প্রকল্প রয়েছে বেকারদের, বৃদ্ধদের ও বিধবাদের জন্য। তাদের আলাদা শ্রেণি বিবেচনা করতে হবে। তাদের সংখ্যা প্রকৃতপক্ষে বেকারদের বা অভাবী বৃদ্ধদের তুলনায় অনেক কম হবে। তাই এদের জন্য আলাদা শ্রেণি না করার কোনো যৌক্তিকতা দেখা যায় না।

## নতুন এক আইনি সমস্যা

আজকাল লক্ষ্য করছি, কোনো কোনো মামলায় কয়েক হাজার লোককে অজ্ঞাতনামা বলে আসামি করা হচ্ছে। যেমন আশুলিয়াতে যখন গার্মেন্টিস শিল্পে অস্থিরতা দেখা দেয় এবং ওখানে যখন বিভিন্ন আন্দোলন হয় তখন সেখানে অজ্ঞাতনামা কয়েক হাজার লোককে আসামি করা হয়েছে। তেমিনভাবে সিরাজগঞ্জে ট্রেন দুর্ঘটনায় কয়েকজন লোক মারা যাওয়ার পর কয়েক হাজার লোককে অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়েছে, নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে ঘটনার পর কয়েক হাজার লোককে অজ্ঞাতনামা করে আসামি করা হয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের বেতন বৃদ্ধির আন্দোলনে কয়েক হাজার অজ্ঞাতনামা লোককে আসামি করা হয়েছে।

এ ধরনের মামলা পাকিস্তান আমলে এবং বাংলাদেশ শুরুর সময় দেখিনি। আমি এ ধরনের অসংখ্য অজ্ঞাতনামা লোককে আসামি করে পুলিশ কর্তৃক মামলা করার কোনো যৌক্তিকতা দেখি না। এর ফলে জনগণের হয়রানির বড় সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ কথা অস্বীকার করা কঠিন, পুলিশ প্রশাসনের সর্বপর্যায়ে দুর্নীতির ব্যাপকতা রয়েছে। দুর্নীতির প্রধান উপায় হচ্ছে হয়রানি করে টাকা অর্জন করা।

এর পরিপ্রেক্ষিতে এবং এ বাস্তবতাকে সামনে রেখে এ রকম অজ্ঞাতনামা হাজার হাজার লোককে আসামি করা অসঙ্গত। সরকারকে আমি অনুরোধ করি, এ বিষয়টি বিবেচনায় নেয়ার জন্য, যাতে মানুষকে হয়রানি করার সুযোগ সৃষ্টি না হয়। এ ব্যাপার আইনে বা বিধিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা যেতে পারে।



www.pathagar.com

এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা, আজকাল দেখা যাচ্ছে কেউ কোনো রাজনৈতিক মন্তব্য করলে এবং তা কারোর পছন্দ না হলে বিভিন্ন স্থানে মামলা করা হয়। মামলা যারা করে তারা ওই ঘটনার সাথে সম্পর্কিত নয়। কারো না কারোর পরিকল্পনার মাধ্যমে এসব করা হয়ে থাকে। আমরা দেখেছি মাহমুদুর রহমানের একটি লেখা জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের একটি চুক্তি সম্পর্কে মন্তব্যের জন্য তার বিরুদ্ধে ২০-২৫টি মামলা করা হয়। ওই সব মামলাকারী ঘটনার সাথে জড়িত নয় এবং যাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছিল তাদের কোনো আত্মীয় নয়। একই কায়দায় দেখেছি ড. আবদুল্লাহ তাহেরের একটি রাজনৈতিক বক্তব্যে। তার বিরুদ্ধে কয়েক জায়গায় মামলাও করা হয়েছে। একই ধরনের মামলা হয়েছে ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া ও খোন্দকার দেলোয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে।

এর প্রতিবিধান হওয়া দরকার, এভাবে যদি সরাসরি সম্পর্কিত নয় এমন ব্যক্তিরা বিভিন্ন স্থানে একজনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন জায়গায় মামলা করে এবং পুলিশ ও কোর্ট যদি ওগুলো আমলে নেয় তাহলে অতি ধনী ছাড়া এসব মামলা মোকাবেলা কী করে তারা করবে?

আমার মনে হয়, আইনবিদদের ও আইন মন্ত্রণালয়ের এ বিষয়ে চিন্তা করতে হবে। এ জন্য আইনে পরিবর্তন আনতে হবে। সরাসরিভাবে সম্পর্কিত নয় এমন ব্যক্তিরা যেন এভাবে ২০-২৫টি মামলা করতে না পারে। সে রকম বিধান করা দরকার।

২ নভেম্বর ২০১০, দৈনিক নয়া দিগন্ত



www.pathagar.com

# 'জিহাদি' শব্দের অপব্যবহার

বিভিন্ন সময় আমরা দেখেছি ইসলামের বিরুদ্ধে কোনো কোনো মহলের পক্ষ থেকে মর্যাদাহানিকর বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করতে। এর মধ্যে আছে উগ্র (fanatic), মৌলবাদী (fundamentalist) সহ বিশেষ কিছু শব্দ। ইসলাম ও মুসলমানদের অপবাদ দেয়ার জন্য সম্প্রতি আরো একটি নতুন শব্দ উদ্ভাবন করা হয়েছে – জিহাদিস্ট (jihadist)। জিহাদিস্ট বা জিহাদপন্থি শব্দটি আরবি 'মুজাহিদুন' শব্দটিকে ইংরেজিতে বিকৃতভাবে রূপান্তরিত করে সন্ত্রাসী (terrorist) বোঝাতে ব্যবহার করা হচ্ছে। উল্লেখযোগ্যসংখ্যক লেখক, সংবাদপত্র, বিশ্লেষক বিশেষ করে যারা ইসলামবিদ্বেষী, তারা এ জিহাদিস্ট শব্দকে বেশ জোরেশোরেই ব্যবহার করতে শুরু করেছেন। এটি তারা সন্ত্রাসী বোঝানোর জন্যই ব্যবহার করছেন। প্রকৃতপক্ষে কোনোভাবেই সন্ত্রাস জিহাদের কোনো অনুবাদ নয়। জিহাদিস্ট হচ্ছে 'জিহাদ' শব্দের প্রকৃত ব্যবহারের বিপরীতে একটি কটূক্তিপূর্ণ ব্যবহার।

'জিহাদ' ইসলামে ব্যবহৃত একটি সামগ্রিক শব্দ। এর মানে হলো প্রচেষ্টা বা struggle করা। যখন জিহাদ শব্দটি ফি সাবিলিল্লাহ বা আল্লাহর পথের সাথে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়, তখন এর অর্থ হয় ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম; আত্মসংশোধন ও সমাজ সংশোধনের জন্য দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম; মুসলিম ভূখণ্ড ও সমাজ রক্ষার জন্য সংগ্রাম। কোনো কোনো সময় এটি মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামও। ইসলামের অতীতের কোনো স্কলারই সন্ত্রাসী তৈরি বা সাধারণ নাগরিক হত্যা, নারী ও শিশু হত্যার মতো বিষয়ের সাথে জিহাদ শব্দটিকে সমার্থক বলে বিবেচনা করেননি। এ পরিপ্রেক্ষিতে উত্তর আমেরিকান ফিকাহ কাউন্সিলের সভাপতি ড. মুজাম্মিল এইচ সিদ্দিকীর গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা তুলে ধরা হলো।

> জিহাদ ইসলামের সবচেয়ে বেশি ভুল বোঝাবুঝি ও অপব্যবহারগত একটি বিষয়। কিছু মুসলমানও আছেন, যারা নিজেদের স্বার্থে জিহাদের অপব্যাখ্যা করে থাকেন। অনেক অমুসলিম এতে ভুল বুঝে থাকেন। কিছু অমুসলিম আছেন যারা ইসলাম ও মুসলমানদের দোষী করতে এর অপব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। জিহাদ মানে 'পবিত্র বা



www.pathagar.com

ধর্মযুদ্ধ' বোঝায় না। জিহাদ বলতে বোঝায় 'সংগ্রাম' বা 'লড়াই'। কুরআনে যুদ্ধের জন্য যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তা হলো হরব (Harb) বা কিতাল (Qital)। 'জিহাদ' বলতে বোঝায় ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্তরে আন্তরিক ও সচেতন সংগ্রাম। এটি সমাজে ভালো কিছু করার এবং সমাজ থেকে অন্যায়, নির্যাতন, মন্দকে দূর করার সংগ্রাম। এই সংগ্রাম আধ্যাত্মিক এবং একই সাথে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অনাচারের বিরুদ্ধে। জিহাদ হলো ভালো কিছু করার জন্য কঠিন পরিশ্রম করা। কুরআনে এই শব্দ বিভিন্নভাবে ৩৩ বার ব্যবহার করা হয়েছে। এটা মাঝে মধ্যে অন্য কিছু ধারণার সাথে যেমন, বিশ্বাস, অনুশোচনা, সঠিক চুক্তি ও অভিবাসনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। জিহাদ হলো কারো বিশ্বাস এবং কারো মানবাধিকার রক্ষা করা। 'জিহাদ' প্রায় ক্ষেত্রেই যুদ্ধ নয়, যদিও যুদ্ধের জন্য এই পরিভাষা ব্যবহৃত হতে পারে। ইসলাম শান্তির ধর্ম। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, ইসলাম শোষণকে সমর্থন করে। উত্তেজনা ও বিবাদ দূর করতে কারো সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা থাকা উচিত, ইসলাম এটাও শিক্ষা দেয়। ইসলাম দ্বন্দ্ব-সজ্ঘাতহীনভাবে সমাজে পরিবর্তন ও সংস্কারের ব্যাপারে উৎসাহ দেয়। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম শান্তিপূর্ণ উপায়ে এবং যতটুকু সম্ভব শক্তি প্রয়োগ ছাড়াই অন্যায়কে দূর করার কথা বলে। ইসলামের ইতিহাসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আজকের সময় পর্যন্ত বেশির ভাগ সময়ই মুসলমানরা শোষণ-নির্যাতন প্রতিরোধ করেছে এবং শান্তিপূর্ণভাবে ও দ্বন্দ্ব-সজ্ঘাত ছাড়াই স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছে। ইসলাম যুদ্ধের সময়েও সঠিক নৈতিকতার শিক্ষা দেয়। ইসলামে যুদ্ধ অনুমোদিত; কিন্তু তা তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন সব ধরনের শান্তিপূর্ণ উদ্যোগ যেমন সংলাপ, মধ্যস্থতা এবং চুক্তিগুলো ব্যর্থ হয়ে যায়। এটা একেবারে শেষ ব্যবস্থা। তাই যতটা সম্ভব এড়িয়ে যাওয়া উচিত। জোর করে জনগণকে পরিবর্তন করা, জনগণকে অধীনস্থ করা, ভূখণ্ড দখল করা কিংবা সম্পদ বা নিজ গৌরবকে তুলে ধরা জিহাদের উদ্দেশ্য নয়। মূলত জিহাদের উদ্দেশ্য হলো জীবন, সম্পত্তি ও ভূমি রক্ষা, অন্যায় ও নির্যাতন থেকে নিজের সম্মান ও স্বাধীনতা রক্ষা করা, অন্যকে রক্ষা করা।

আমাদের এ ব্যাপারে জোর দিতে হবে যে, নির্দোষ জনগণের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসকে, সেটা নির্যাতন, নিপীড়ন কিংবা আত্মঘাতী হামলা যেকোনো উপায়ে হোক না কেন, কোনো অবস্থাতেই ইসলাম অনুমোদন করে না। ইসলাম শোষিত মানুষকে মুক্তির জন্য সংগ্রাম করতে উৎসাহিত করে। ইসলাম



www.pathagar.com

শোষিতদের সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য আদেশ দেয়। কিন্তু ইসলাম কোনো অবস্থাতেই নিরীহ, নিরস্ত্র ও নির্দোষ জনগণের উপর সন্ত্রাসকে সমর্থন বা অনুমোদন করে না। এটা ইসলামের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। কিছু লোক আছে যারা সন্ত্রাসকে স্বীকৃতি দিতে বা সন্ত্রাসের পক্ষে বলতে নিজেদের মনগড়া যুক্তিকে ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু এর কোনো যুক্তি নেই। (দেখুন : www.islamonline.net)।

আমরা এই পরিপ্রেক্ষিতে সচেতন সব লেখক, স্কলারকে জিহাদের বিষয়টি স্পষ্ট করে তুলে ধরতে বলি। সেই সাথে সবাইকে জিহাদের প্রকৃত অর্থের বিপরীতে অসম্মানজনক জিহাদিস্ট শব্দ ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানাই। একই সাথে বিষয়টি ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পশ্চিমা দেশগুলোর সরকার, সংস্থা ও এজেন্সিগুলোর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

১৮ অক্টোবর ২০১০, দৈনিক নয়া দিগন্ত



www.pathagar.com

# ইসলামী ব্যাংকিংয়ে মৌলিক কোনো ত্রুটি নেই

তেসরা অক্টোবর বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে লক্ষ্য করেছি, একজন অর্থনীতিবিদ একটি অনুষ্ঠানে বলেছেন, ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে 'ইসলাম' শব্দটি বাদ দেয়া উচিত। তিনি আরো বলেছেন, "বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের নামে যা হচ্ছে তা 'ধোঁকাবাজি'। ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় আয় কোনোভাবে সুদের বাইরে নয়।" আমি যতটুকু জানি ওই অর্থনীতিবিদ সব সময় ইসলামের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে আছেন। আমি কখনো তাকে ইসলামের পক্ষে একটি কথাও বলতে শুনিনি।

ইসলামী ব্যাংকিং নতুন বিষয় নয়। এর আধুনিক রূপের জন্ম অন্তত ৬০ বছর; যদিও ইসলামের ইতিহাসে সব সময় মুদারাবা, মুশারাকা, বাইমোয়াজ্জেল, ইজারা, ইসতিসনা ইত্যাদি আয়ের ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থ লেনদেন চালু ছিল। আমরা সবাই জানি ইসলামী ব্যাংক এখন বিশ্বের সব মহাদেশেই রয়েছে। এটা রয়েছে ইউরোপে, আমেরিকায়, আফ্রিকায় এবং এশিয়ার প্রায় সব দেশে। এটাও সবার জানা কথা যে, প্রধানত অমুসলিম মালিকানাধীন বহুজাতিক ব্যাংকগুলো ইসলামী ব্যাংকের শাখা বা উইন্ডো খুলছে।

এখানে আমি উল্লেখ করতে পারি যে, মিস্টার গর্ডন ব্রাউন যিনি কিছু দিন আগেও বৃটেনের অর্থমন্ত্রী ছিলেন পরে দেশটির প্রধানমন্ত্রী হন, তিনি নিজে লন্ডনকে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের কেন্দ্র (hub) করতে চেয়েছিলেন। আমি সে সময় লন্ডনে উপস্থিত ছিলাম। মাত্র কয়েক দিন আগে সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, তাদের দেশটাকে ইসলামী অর্থনীতির প্রধান কেন্দ্রে পরিণত করা হবে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে কোনো কুরআন বিশেষজ্ঞ নন, ফিকাহ বিশেষজ্ঞ নন, ইসলামী অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ নন এমন এক অর্থনীতিবিদের মন্তব্যকে আমি কিভাবে একটি একাডেমিক বক্তব্য হিসেবে গ্রহণ করতে পারি? বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ আলেমরা সবাই ইসলামী ব্যাংকের শরিয়াহ কাউন্সিলের সাথে জড়িত। এসব শ্রেষ্ঠ আলেমই ইসলামী ব্যাংকগুলোর কেন্দ্রীয় শরিয়াহ বোর্ডে আছেন। এসব ব্যক্তির মধ্যে ছিলেন জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের সাবেক খতিব মরহুম মাওলানা উবায়দুল হক। জাতীয় মসজিদের বর্তমান খতিব প্রফেসর মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন, দেশমান্য আলেম মাওলানা কামালুদ্দীন



www.pathagar.com

জাফরী, বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ ফকিহ্ রূপে গণ্য মুফতি আবদুর রহমান, দেশের অন্যতম খ্যাতনামা ফকিহ্ মুফতি শামসুদ্দীন জিয়া এবং অন্যান্য ইসলামী চিন্তাবিদ ব্যাংকগুলোর কেন্দ্রীয় শরিয়াহ বোর্ডে কাজ করছেন। আমি নিজেও ইসলামী শরিয়াহ বোর্ডে আছি এবং আরো দু'টি শরিয়াহ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান। এসব খ্যাতনামা আলেম ও চিন্তাবিদ ইসলামী ব্যাংকিংয়ে সুদ আছে এ কথা কখনো মনে করেননি। যদিও সব সময় এসব ব্যাংকের প্রতিটি শাখায় শরিয়াহ অডিট হয়ে থাকে। নিরীক্ষায় যদি কখনো কোনো বিনিয়োগে ইসলামী নীতির ব্যত্যয় দেখা যায়, তাহলে তার আয় সন্দেহজনক মনে করে (যদিও তা প্রমাণিত সুদ নয়) আর নেয়া হয় না। এ অর্থ বরং ভিন্ন খাতে রেখে দরিদ্রদের কল্যাণে ব্যয় করা হয়। এ ধরনের কল্যাণমূলক কাজ অনেক ব্যাংক স্ব-উদ্যোগে করে। কোনো কোনো ব্যাংক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে দারিদ্র্যের উন্নয়নে এ অর্থ ব্যয় করে।

আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি। বিষয়গুলোর দেখভাল করার জন্য বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি শাখা বা উইং রয়েছে। এ শাখার কর্মকর্তারা ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ওপর এখন যথেষ্ট দক্ষ হয়ে উঠেছেন। তারাও শরিয়াহ অডিট করে থাকেন। কোনো ধরনের ক্রুটিবিচ্যুতি পেলে সেটা সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে যথাযথভাবে অবহিত করেন। নির্ধারিত ব্যাংকটিকে বাধ্যতামূলক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দেয়া নির্দেশনা অনুসরণ করতে হয়।

আমি আরো উল্লেখ করতে চাই, কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রায় তিন বছর ধরে সংশ্লিষ্ট সব ব্যাংকের সাথে পরামর্শ করে একটি ইসলামী ব্যাংক গাইডলাইন তৈরি করেছে। অত্যন্ত আন্তরিকতা নিয়ে করা গাইডলাইনটি খুব সুবিস্তৃত। এই গাইডলাইন প্রণয়নে ইসলামী ব্যাংকের কেন্দ্রীয় শরিয়াহ বোর্ড পূর্ণ সহযোগিতা করে। ইসলামী ব্যাংকগুলো এই গাইডলাইন যথাযথভাবে অনুসরণ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ নীতিমালার কোনো ব্যত্যয় হতে দেয় না।

আমার মনে হয়, ওই অর্থনীতিবিদ (যিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রেখেছেন) সুদ ও ব্যবসায় লাভের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বোঝেন না। পবিত্র কুরআন স্পষ্টভাবে বলেছে, আরব জাহিলিয়াতের লোকরা বলত ব্যবসা তো সুদের মতো। কিন্তু আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেন - ব্যবসা ও সুদ এক জিনিস নয়। তিনি আরো ঘোষণা করেন, ব্যবসা হালাল এবং সুদ হারাম। আমাদের এই অর্থনীতিবিদ আরব জাহিলিয়াতের কথাই বলছেন। এটা আধুনিক বা নতুন কিছু নয়। এটা অনেক পুরনো ও বাসি কথা। তিনি কিছুই নতুন উপহার দিচ্ছেন না।

একটি সরকারি ব্যাংকের চেয়ারম্যান একা তার ব্যাংকে ছয়টি ইসলামী শাখা খোলার যে উদ্যোগ চলছিল তাকে বিদ্বেষপ্রসূত হয়ে বন্ধ করতে পারেন কি না বিষয়টি দেখতে আমি সাবেক ব্যাংকিং সচিব হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক



www.pathagar.com

ও অর্থ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করি। বিশেষ করে যিনি সরকারের নিয়োগকৃত একজন চেয়ারম্যান।

ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে 'ইসলাম' শব্দটি প্রত্যাহার করার যে কথা তিনি বলেছেন, তার কোনো যৌক্তিকতা নেই। প্রথমত, ব্যক্তি হিসেবে কেউ আবুল বারাকাত হতে পারেন বা আবদুল হান্নান হতে পারেন, তাদের নামের অর্থ তাদের কাজ ও চরিত্রে প্রতিফলিত না-ও হতে পারে। এ জন্য আমরা কারো নাম পরিবর্তনের দাবি করতে পারি না। যেমন কোনো দেশের গণতন্ত্রের মধ্যে অনেক ক্রটি থাকা সত্ত্বেও দেশটির নাম গণতান্ত্রিক হতে পারে।

আমার জানা মতে, বিশ্বের ইসলামী ব্যাংকিংয়ে কোনো বুনিয়াদি ক্রটি নেই। এ ধরনের কোনো ক্রটি না থাকার কারণে কেউ ইসলামী ব্যাংকের নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব করতে পারে না। ধোঁকা কে বা কারা দিচ্ছেন আশা করি জনগণ খুব ভালো করেই বোঝেন।

আমি বরং উল্লেখ করতে পারি যে, বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্কটের পর পাশ্চাত্য আধুনিক ব্যাংকের পতন হয়েছে। কোনো ইসলামী ব্যাংকের পতন হয়নি। আমেরিকার ট্রেজারি বিভাগ পর্যন্ত চিন্তা করছে কিভাবে তারা ইসলামী ব্যাংকের নীতিমালা গ্রহণ করতে পারে। এক্ষেত্রে জ্ঞানপাপীদের কাছ থেকে সাবধান থাকতে হবে এটাই আমি আশা রাখি।

৪ অক্টোবর ২০১০, দৈনিক নয়া দিগন্ত



www.pathagar.com

# কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

ইসলাম রাষ্ট্রকে কী নজরে দেখে, এ বিষয়টিই আলোচনা করব। কেউ কেউ মক্কায় অবতীর্ণ সূরা কাফিরুনের উল্লেখ করে বলেন, 'ইসলামে রাষ্ট্র করার কোনো বিষয় নেই, ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার'।

সূরা কাফিরুন নাজিলের পটভূমিকা সম্পর্কে ইবনে হাতিম, তাবারানি, তাফসির ইবনে জারির ও ইবনে হিশামের সিরাতে উল্লেখ রয়েছে, মক্কার অমুসলিম নেতারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একটি সমঝোতা প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তাতে তারা বলেছিলেন, তারা মুসলিমদের সাথে এক বছর আল্লাহর ইবাদত করবেন; পরের বছর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলিমদেরকে লাত ও উজ্জার পূজা করতে হবে।

আল্লাহতায়ালা সূরা কাফিরুন নাজিল করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, এ ধরনের ইবাদতের মিশ্রণ গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ এবং লাত-উজ্জার ইবাদত এক সাথে করা যায় না। আল্লাহতায়ালা বলেন:

> 'হে রাসূল! আপনি বলুন, হে কাফের সম্প্রদায়, তোমরা যাদের ইবাদত করো, আমি তাদের ইবাদত করি না। আমি যার ইবাদত করি, তোমরা তার ইবাদত করো না। ... তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্য এবং আমার জন্য আমার দ্বীন।'

এ সূরায় মূলত ইবাদত পদ্ধতির মিশ্রণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। প্রত্যেকে তার ইবাদতের ক্ষেত্রে স্বাধীন তা-ও বলা হয়েছে। এ সূরার অন্য কোনো তাৎপর্য নেই। যদি এর অর্থ সেকুলারিজম (রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ধর্ম বর্জনবাদ) হতো তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা থেকে মদিনা গিয়েই একটি রাষ্ট্র গঠন করতেন না। আমরা সবাই 'মদিনা সনদ'-এর কথা জানি, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদিদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে জারি করেছিলেন। এ সনদের মূল কথা ছিল নিম্নরূপ:

১. সব মুসলিম এক উম্মাহ (একটি আদর্শভিত্তিক জাতি);

২. ইহুদিদের অধিকার সমান, তাদের ওপর অত্যাচার করা যাবে না এবং তাদের শত্রুদের সাহায্য করা যাবে না;



www.pathagar.com

৩. ইহুদি ও মুসলিমরা মিলে একটি মিল্লাত (তারা একই রাজনৈতিক ও জাতীয়তা অর্থাৎ মদিনা রাষ্ট্রের নাগরিক);

৪. তারা মিলিতভাবে মদিনাকে রক্ষা করবে;

৫. সনদের আওতাধীন সবার জন্য এ শহর হবে নিরাপত্তার স্থান;

৬. সব মতবিরোধপূর্ণ বিষয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সিদ্ধান্তের জন্য পেশ করা হবে।

মদিনা রাষ্ট্রটির আইন ছিল ইসলামী আইন। তবে ইহুদিদের ব্যক্তিগত আইন তাদের শরিয়াহ মোতাবেক নির্ধারিত হতো। এ অবস্থা খেলাফতে রাশিদিনের সময় পরিবর্তন করা হয়নি। তারা সবাই শাসক হিসেবে ইসলামকেই অনুসরণ করতেন। রাষ্ট্রের আইন ছিল কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক। এর বাইরে আইনের প্রয়োজন হলে তা ইজতিহাদের মাধ্যমে নির্ধারিত হতো। অসংখ্য নতুন বিধান তারা করেছিলেন। এসবের বেশির ভাগই ছিল প্রশাসন সংক্রান্ত (ইসলামী আইনের পরিভাষায় এসব আইনকে 'সিয়াসা আশশারিয়াহ' বলে)। বিচারব্যবস্থা কাজীদের হাতে ছিল। তারাই ইসলামী আইনের ভিত্তিতে বিচার করতেন।

একই অবস্থা উমাইয়া, আব্বাসীয়, উসমানীয়, ফাতিমীয়, মোগল আমলে অব্যাহত ছিল; এমনকি বাংলাদেশের সুলতানি আমলেও। ইসলামী আইনই রাষ্ট্রের ভিত্তি ছিল। কাজীরাই বিচার করতেন। ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এসব রাষ্ট্রের মূল বৈশিষ্ট্য ইসলাম ও ইসলামী আইনই ছিল।

মুসলিম ইতিহাসে রাষ্ট্র ও ইসলাম কখনোই বিচ্ছিন্ন ছিল না - সে রাষ্ট্রের শাসক সুন্নি, শিয়া, খারিজি যা-ই হোন না কেন। এর পরিবর্তন ঘটেছে উপনিবেশবাদের সময়। যা হোক, ইসলামে বিষয়টি বিতর্কমূলক নয়। বিষয়টিকে বিতর্কিত না করার জন্য সবাইকে অনুরোধ করছি।

৯ আগস্ট ২০১০, দৈনিক নয়া দিগন্ত



www.pathagar.com

# বিচার পদ্ধতির সংস্কার প্রয়োজন

আমরা পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন সময় দেখেছি, বাংলাদেশের নিম্ন আদালতগুলোতে (ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট, জজ কোর্ট) কয়েক লক্ষ মামলা পড়ে আছে। অন্য দিকে উচ্চ আদালতেও (হাইকোর্ট ও আপিলাত বিভাগ) অসংখ্য মামলা পড়ে আছে। মাননীয় প্রধান বিচারপতি ও সাবেক প্রধান বিচারপতিগণ বিচারব্যবস্থার নানা সঙ্কটের কথা উল্লেখ করেছেন।

অন্য দিকে কোর্টে বিলম্ব হওয়ার কথাও আমরা জানি। মামলা শুরু হওয়ার পরও বারবার মুলতবি হওয়া এবং অন্যান্য কারণে বিলম্ব হতেই থাকে। এ পরিস্থিতি নতুন নয়, অনেক দিনের। সমস্যার সমাধান হচ্ছে না, বরং সমস্যা গভীর হচ্ছে।

অন্য দিকে সাধারণ মানুষ (শতকরা ৯৫ জন) অ্যাডভোকেট সাহেব বা ব্যারিস্টার সাহেবদের উচ্চ ফি দিতে অক্ষম। সুতরাং তাদের পক্ষে সুবিচার পাওয়া প্রায় অসম্ভব। তাদের অনেক অভিযোগ কোর্টে আসে না। তারা অনেক অত্যাচার-অন্যায় সহ্য করে নেয়।

অনেকেই জজের বা বিচারকের সংখ্যা বাড়ানোর কথা বলেছেন। তা বাড়ানোও হচ্ছে, হয়তো আরো বাড়ানো হবে। কিন্তু বিচারপ্রক্রিয়া যদি সহজ করা না হয়, তাহলে এ মামলার জট শেষ হবে না।

আমি মনে করি, সুবিচারের স্বার্থে, জনগণের জন্য সুবিচার সহজলভ্য করতে বিচারপ্রক্রিয়ায় বেশ কিছু সংস্কার প্রয়োজন। আমরা ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিতে পারি। আব্বাসী ও মুঘল যুগের বিচারব্যবস্থার দিকে নজর দিতে পারি। তাদের সব কিছু আমরা নিতে পারব না। কিন্তু সে ব্যবস্থার ভালো দিকগুলো নিতে পারি, যার ফলে জনগণ সহজেই সুবিচার পেতে পারে। প্রথমত তাদের বিচারব্যবস্থায় কোনো কোর্ট ফি ছিল না। আমরাও কোর্ট ফি তুলে দিতে পারি। তাতে সাধারণ লোকের পক্ষে কোর্টে আসা সহজ হবে। দুষ্ট লোকদেরও হয়তো সুবিধা হবে। তা দূর করার জন্য যারা মিথ্যা মামলা নিয়ে আসবে, তাদের শাস্তির বিধান রাখা যেতে পারে। রাষ্ট্রকে সেই বিচারব্যবস্থার খরচ বহন করতে হবে, যেমন তারা প্রাইমারি শিক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থার ক্ষেত্রে করছে। এ ফি গ্রহণ ইসলামী খিলাফতের সময় ছিল না।



www.pathagar.com

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার হবে, সবাইকে কোনো উকিলের মধ্যস্থতা ছাড়া (যে কোর্টের এখতিয়ার) কোর্টে মামলা দায়ের করা, তার বক্তব্য কোর্টকে বলার অধিকার দিয়ে বিচার পদ্ধতি (Judicial procedure) সংশোধন করা। যারা উকিল নিতে সক্ষম, তারা উকিল নিতে পারবে। কিন্তু যে পারে না সে সরাসরি কোর্টে হাজির হবে। আসামিও সরাসরি কোর্টে হাজির হবে বা সে চাইলে উকিলের মাধ্যমে হাজির হবে। কোর্টের অধীনে একজন বা বেশি আইনজ্ঞ থাকবেন, কোর্টকে এবং বাদী-বিবাদীকে সাহায্য করার জন্য। আগের মুসলিম আমলে কোর্টকে সাহায্য করার জন্য মুফতি থাকতেন, যাতে লোকেরা সরাসরি কোর্টে হাজির হতে পারে, তার অত্যন্ত সহজ বিধান করে C.P.C. ও C.P.R.C. সংশোধন করতে হবে। এ ব্যাপারে যত সহজ হওয়া যায় তত ভালো।

আমার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার কথা বলি। ১৯৭৫ সালে আমি এক মিথ্যা মামলায় আসামি হয়ে যাই। আমাকে মাসে মাসে হাজিরা দিতে হতো। কখনো ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আমাকে দেখেননি বা ডাকেননি। উকিলের মাধ্যমে আমাকে হাজিরা দিতে হতো। আমার তখন আর্থিক অবস্থা খুবই নড়বড়ে ছিল। কিন্তু উকিলের পয়সা আমাকে জোগাড় করতে হতো।

যদি বিচারব্যবস্থা উপরে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছি সেভাবে সংস্কার হয়, তাহলে এ ধরনের অবস্থা হবে না। বিচার দ্রুত হবে, বাদী নিজেই তার কেস তুলে ধরতে পারবে, আসামি সরাসরি তার উত্তর দিতে পারবে। কোর্ট নিজে প্রশ্ন করে নিশ্চিত হতে পারবে। এর ফলে মামলা জট কমে যাবে এবং একসময় শেষ হয়ে যাবে।

আরেকটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন, আমাদের দেশে 'আইনগত সহায়তা দান' (Legal assistance) পদ্ধতি সত্যিকার অর্থে কাজ করেনি। এতে খুব বেশি হলে এক শতাংশ লোকের কাজ হয়েছে। এ ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করা যায় না।

আরো একটি বিষয় বিবেচনা করা দরকার। বর্তমানে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ়পিল স্তর তিন বা চারবারও হয়ে যায়। আমার মনে হয়, আপিল স্তর দু'টির .বশি হওয়া উচিত নয়। এ বিষয়টি মামলা নিষ্পন্নে অধিক সময় লাগার অন্যতম কারণ। এ ব্যাপারটিও বিবেচনা করা এবং আইন সংশোধন করা দরকার।

১৪ জুলাই ২০১০, দৈনিক নয়া দিগন্ত



www.pathagar.com

# নজরুল জন্মবার্ষিকী ও সাহিত্যিকদের মূল্যায়ন

গত ২৫ মে, ১১ জ্যৈষ্ঠ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১১তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়েছে। এর আগে ২৫ বৈশাখ পালিত হয়েছে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী। বাংলাদেশ সরকার ছাড়াও অনেক প্রতিষ্ঠান বেশ গুরুত্বসহকারে দিবস দু'টি উদযাপন করেছে।

কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ সালের এই দিনে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। যেহেতু তিনি কলকাতায় ভালো ছিলেন না, তাই তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার তাকে ঢাকায় নিয়ে আসে। বাংলাদেশ সরকার তার থাকার জন্য সব ব্যবস্থাই করে। ঢাকায়ই তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের পাশে তাকে সমাহিত করা হয় তারই ইচ্ছানুসারে। প্রতি বছর তার জন্মবার্ষিকীতে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেত্রী পৃথক বাণী প্রদান করে থাকেন।

কবি-সাহিত্যিকের ক্ষেত্রে একটি সত্য আমাদের মানা উচিত যে, তাদের বিচার করতে হবে প্রধানত তাদের সাহিত্যকর্ম দ্বারা। তাদের রাজনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে বিচার করা ঠিক নয় এবং তাদের মহান সাহিত্যকর্মকে খাটো করাও সঙ্গত নয়। আমরা লক্ষ্য করেছি, যখন ফররুখ আহমদ, কাজী নজরুল ইসলাম, আল্লামা ইকবাল এবং রবীন্দ্রনাথের কথা আসে, তখনই কিছু লোকের কাছে তাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিটাই প্রবল হয়ে ওঠে। যেমন - কবি রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তার বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা, শিবাজীকে জাতীয় বীর মনে করা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরোধিতা এসবকেই প্রধান মনে করা হয় এবং তার সাহিত্যকর্মকে প্রকৃত মূল্যায়ন করা হয় না। এটা নিঃসন্দেহ, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গভীরভাবে হিন্দু দর্শনে বিশ্বাস করতেন। তিনি বেদের কথাই প্রচার করেছেন। কিন্তু এর পরও তার সাহিত্যকর্ম বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত এবং সেভাবেই তাকে বিচার করা উচিত।

তেমনিভাবে ইকবাল আলাদা মুসলিম রাষ্ট্রের কথা বলেছিলেন। সেটাই তার ক্ষেত্রে বড় করে দেখা হয়। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন ফার্সি-উর্দু সাহিত্যের একজন মহাকবি; সর্বোচ্চ পর্যায়ের একজন ইসলামী দার্শনিক ও চিন্তাবিদ। তিনি কোনো গোত্র, ধর্ম বা এলাকার বিরুদ্ধে ছিলেন না। তিনি প্রধানত নিজের জাতির কথা বলেছেন।



www.pathagar.com

একইভাবে কবি ফররুখ আহমদের কথা এলেই তার রাজনৈতিক মতামতই বড় করে দেখা হয়। তার সাহিত্যকর্মকে কিছু লোক গুরুত্ব দেন না। কিন্তু তিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি ইসলামের বাণী তার কবিতায় তুলে ধরেছেন। কোনোভাবেই তিনি কোনো ধর্ম বা জাতির বিরুদ্ধে ছিলেন না।

কাজী নজরুল ইসলাম একজন বিশ্বমানের কবি ছিলেন। বাংলা কিংবা অন্য যেকোনো ভাষায় তার মানের খুব স্বল্পসংখ্যক কবিই রয়েছেন। তার কবিতা ও গান বহুমুখী। স্বাধীনতার চেতনাকে উজ্জীবিত করার জন্য তিনি রাজনৈতিক কবিতা লিখেছেন। ব্রিটিশ শাসনামলে তার কবিতা অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াই করার অনুপ্রেরণা জোগায়। শুধু তা-ই নয়, তার গান ও কবিতা সব সময় যেকোনো স্বাধীনতা আন্দোলনে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। তিনি বহু ইসলামী গান ও কবিতা লিখেছেন। তার কবিতায় তিনি কুরআনের অংশবিশেষ অনুবাদ করেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী তুলে ধরেছেন। এ ছাড়া তিনি হিন্দু জনগোষ্ঠী, গরিব এবং বঞ্চিতদের জন্যও কবিতা লিখেছেন।

আমরা লক্ষ্য করেছি, তাকে 'অসাম্প্রদায়িক' কবি প্রমাণ করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করা হয়। নজরুল ইসলাম অবশ্যই সব মানুষের অধিকার চাইতেন; গরিবের, নারীর, অন্য সবার। কিন্তু তিনি অসংখ্য ইসলামী গান ও কবিতা রচনা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী লেখা এবং আমপারার কাব্যে অনুবাদকে সাম্প্রদায়িক কাজ মনে করেননি। নিজের সম্প্রদায়ের জন্য, নিজের জাতির জন্য লেখা অন্যায় হতে পারে না। নজরুল-সাহিত্যের মৌলিক ইসলামী চরিত্রকে অস্বীকার করা ইসলামবিদ্বেষেরই পরিচায়ক। সমাজ যদি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হয় এবং সেই সমাজ ও রাষ্ট্র যদি ইসলামের ভিত্তিতে চলে এবং অমুসলিমদের পূর্ণ অধিকার বহাল রাখা হয়, তাহলে তা সাম্প্রদায়িকতা নয়। একইভাবে যদি কোনো সমাজ খ্রিস্টান বা হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ হয় এবং সে সমাজ ও রাষ্ট্র ওই ধরনের ভিত্তিতে সংগঠিত হয়, তা সাম্প্রদায়িক হবে না, যদি মুসলিম অন্য ধর্মাবলম্বীদের মানবাধিকার বহাল থাকে।

কবি নজরুল ইসলামের সঠিক মূল্যায়ন যে বাংলাদেশে হচ্ছে, তা বলা যায় না। আমরা যতটুকু জানি, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের বাংলা সাহিত্য কোর্সে নজরুলের যথাযোগ্য মূল্যায়ন হচ্ছে না। আশু এর অবসান হওয়া দরকার। আশা করি, সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এ দিকে নজর দেবে।

১৪ জুন ২০১০, দৈনিক নয়া দিগন্ত



www.pathagar.com

# অল্প বয়সে প্রেমে জড়িয়ে পড়া

আমরা সবাই জানি, অল্প বয়সে প্রেমে জড়িয়ে পড়ার অনেক ঘটনা আমাদের সমাজে ঘটছে। এ সবের বেশির ভাগ নানা ধরনের জটিলতা সৃষ্টি করে থাকে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অল্প বয়স অথবা অসম সামাজিক অবস্থার কারণে পিতা-মাতা বিয়েতে রাজি হন না। ফলে অনেক ক্ষেত্রে নানা দুর্ঘটনা ঘটে যায়। এমনকি আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটে। অনেক ক্ষেত্রে অ্যাসিড নিক্ষেপের ঘটনাও ঘটেছে। অনেকে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে। দুই পরিবারের মধ্যে সঙ্ঘাত সৃষ্টি হয়। মামলা-মোকদ্দমা হয়। মামলা হয় নারী অপহরণের। অন্যান্য ক্ষেত্রে ছেলেমেয়েদের ইচ্ছা পূরণ হয় না। তাদের মন ভাঙে। আরো কত কী।

এ সবের কী প্রয়োজন? এত অল্প বয়সে প্রেমে জড়িয়ে পড়ার কী প্রয়োজন বা যুক্তি? এটা পড়াশুনার সময়, গড়ে ওঠার সময়। তবুও এসব হচ্ছে নানা কারণে। একটি কারণ হচ্ছে, ইলেকট্রনিক মিডিয়া।

বিশেষ কোনো টিভি চ্যানেলের কথা বলছি না। সামাজিক বিচারে আসলে বেশির ভাগ চ্যানেলের বেশ কিছু প্রোগ্রাম অবাধ যৌনতাকেই উৎসাহিত করে যাচ্ছে। জীবনটা যেন কেবল 'আমি আর তুমি'। অবাস্তবতায় ভরা এসব প্রোগ্রাম অযৌক্তিক আকাঙ্খা সৃষ্টি করে। আর বিজ্ঞাপনের তো কথাই নেই। গায়ের কাপড় যতটা কমানো যায়, যত ছেড়ে দেয়া যায়, সে চেষ্টাই চলে। কাপড় যেন একটি আগাছা। তাও এসব বেশি হচ্ছে নারীদেরকে নিয়ে। নারীকে যে পণ্য ভাবা হয়, তাদেরকে মানহানি করা হয়, তা বিজ্ঞাপন যারা তৈরি করেন, তারাও ভাবেন না, যারা দেন তারাও না। আর মডেলদের তো কথাই নেই। টাকার জন্য যেন সবই করা যায়। তারা টাকার পূজারী। পাশ্চাত্যের বস্তুবাদ ও সেকুলারিজমের সবচেয়ে খারাপ প্রভাব এটা।

## সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা

ঘটনা আরো ভয়াবহ রূপ নিয়েছে সাম্প্রতিককালে। মার্চের শেষ দিকের কয়েকটি ঘটনা সবাইকে কাঁপিয়ে দিয়েছে। একটি ঘটনা হচ্ছে, একটি ছেলে (যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে) ক্লাসমেটকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু পরিবার অসম্মত,



www.pathagar.com

মেয়েটিও রাজি নয়। এর ফলে ছেলেটি তার এক বন্ধুসহ মেয়ের মা-বাবাকে গুলি করে হত্যা করেছে। অন্য এক ঘটনায় ২২ বছরের এক ছেলেও ক্লাসমেটকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু পারে না, কেননা সে অসচ্ছল পরিবারের। এ কারণে সে অন্য এক ক্লাসমেটের বাড়িতে হামলা চালায়। অস্ত্রের মুখে ক্লাসমেট এবং তার বাবা-মাকে আটক করে একটি গাড়ি এবং ২০ লাখ টাকা চাইলো। তারা ৫০ হাজার টাকার চেক দেন। কিন্তু সে সবাইকে (বাবা-মা ও ক্লাসমেটকে) ছুরিকাঘাতে আহত করে ভোরের দিকে পালিয়ে যায়। আরেকটি ঘটনা পত্রিকায় আসেনি। এক জজ সাহেবের ছেলে আমার পরিচিত পরিবারের মেয়েকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু মেয়ে রাজি নয়। ছেলে এবং ছেলের বাবার অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও মেয়ে রাজি হয়নি। এরপর ছেলে একটি চিঠি লিখে রেখে ঘর ছেড়ে কোথাও চলে যায়। বাবা ঢাকার কোর্টে অপহরণের মামলা করেন। তাতে ওই মেয়ে এবং আরো কিছু নাম আরজিতে উল্লেখ করেছে। মেয়ে তার বাড়িতে। সেখানে এসে পুলিশ হাজির। কয়েক দিন পর ছেলে এসে হাজির হওয়ায় সবাই রক্ষা পান।

আমরা এসব ঘটনায় আতঙ্কিত। বর্তমানে কিশোর-কিশোরী ও ছাত্র-ছাত্রীদের প্রেমের যে রূপ দেখা যাচ্ছে, তা কেবল আইনশৃঙ্খলার বিষয় নয়, এটি বড় ধরনের সামাজিক সমস্যা। এর সমাধান করতে আমাদের সমাজ, সামাজিক মূল্যবোধ ও বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে হবে। পাশ্চাত্য কাঠামোয় অবাধ মেলামেশার সুযোগ করে দেয়া আমাদের সমাজ মানবে না। কেননা এটা ইসলাম, হিন্দু ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। তাই বাবা, মা ও শিক্ষকদের বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড কালচার থেকে ছেলেমেয়েদের রক্ষা করতে হবে। যেখানেই সম্ভব, কো-এডুকেশনের পরিবর্তে আলাদা শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। অশালীন পোশাককে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে পরিধান করার অভ্যাস কর্তৃপক্ষের বন্ধ করার চেষ্টা করতে হবে। অন্তত ছাত্রীদের ওড়নাবিহীন পোশাক, মেয়েদের ছোট কামিজ, হাতাকাটা পোশাক এবং ছাত্র-ছাত্রীদের হাফপ্যান্ট বা খুব টাইট পোশাক পরা নিষিদ্ধ করা যেতে পারে সার্কুলারের মাধ্যমে। ভারতসহ বিশ্বের অনেক দেশের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শালীন পোশাকের বিধান আছে। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় এবং মালয়েশিয়ার ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটির কথা উল্লেখ করা যায় এ প্রসঙ্গে।

শিক্ষার বিষয়টিও উল্লেখ করতে চাই। প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি পর্যায়ে মহৎ ব্যক্তিদের জীবনী পড়ানো প্রয়োজন। বাড়িতে অভিভাবকদেরও তা-ই করা উচিত। বিশেষ করে মুসলিম ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, চার খলিফা (রা.) এবং খাদিজা, আয়েশা ও ফাতেমা (রা.)-এর জীবনী পড়ানো প্রয়োজন। অন্য ধর্মের অনুসারীদের ক্ষেত্রে তাদের ধর্মের এবং ইতিহাসের মহৎ ব্যক্তিদের জীবনী পড়ানো যায়। মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের অল্প



www.pathagar.com

বয়সেই অভিভাবকদের উদ্যোগে কিছুটা হলেও কুরআন অর্থসহ শেখাতে হবে। সর্বোপরি, অভিভাবকদের উচিত, অল্প বয়স থেকেই ছাত্র-ছাত্রীদের শালীন পোশাকের দিকে উদ্বুদ্ধ করা।

অবশ্য সমস্যাটি অনেক বড়। এর সত্যিকার সমাধান অবশ্যই কঠিন। টিভি চ্যানেলগুলোকে আরো সাবধান হতে হবে। তাদের উচিত হবে না অনৈতিকতা ও অবাধ যৌনতার প্রসার হয় এমন সব ছবি, বিজ্ঞাপন, নাটক ইত্যাদি প্রচার করা। এ ব্যাপারে সরকার ও চ্যানেল কর্তৃপক্ষ এক হয়ে একটি নীতিমালাও তৈরি করতে পারে।

৬ মে ২০১০, দৈনিক নয়া দিগন্ত



www.pathagar.com

# সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ কাদের বিরুদ্ধে?

আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িকতার কথা আজকাল বেশি উচ্চারিত হচ্ছে। একশ্রেণীর রাজনীতিবিদ ও সুশীলসমাজের লোক প্রায়ই সাম্প্রদায়িকতার কথা বলে থাকেন। এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা মূলত সেকুলার ও বাম ধারার। এবার ভাষা দিবস পালনের সময় ভাষা আন্দোলন অসাম্প্রদায়িক ছিল, এ কথার ওপর জোর দেয়া হয়েছে, অহেতুক নতুন করে। তাদের জীবনের ঘোষিত লক্ষ্য হচ্ছে, দেশ থেকে সাম্প্রদায়িকতা নির্মূল করা বা দূর করা। তবে তারা সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে অনেক কথা বললেও এ কথা বলে না যে, কাদের বিরুদ্ধে এই অভিযান এবং তারা সরাসরি স্পষ্ট করে বিষয়টি প্রকাশও করেন না। তাদের কাছে মনে হয়, একটি অব্যাখ্যাত শব্দের আড়াল থেকে বক্তব্য দেয়াই সহজ। বলাও হলো, আবার কেউ সরাসরি ধরতে পারল না, কার বিরুদ্ধে বলা হয়েছে।

তবে তাদের সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কিত বক্তব্যগুলো ইঙ্গিতপূর্ণ। আমরা সহজেই সেসব বক্তব্য বা কথাবার্তা থেকে এটা অনুমান করতে পারি যে, এসব সাধারণভাবে ধর্ম ও ধর্মীয় শক্তির বিরুদ্ধে। সেই সাথে বিশেষভাবে তা ইসলামী শক্তির বিরুদ্ধে। তারা কি এর দ্বারা সহনশীলতা বোঝান? অসহিষ্ণুতা দূর করতে চান? প্রকৃতপক্ষে এসব লোকের আচরণই সবচেয়ে অসহিষ্ণু। ধর্ম তো কোনোভাবেই অসহিষ্ণুতা প্রচার করে না কিংবা অসহিষ্ণুতার সপক্ষে কথা বলে না। অন্তত এ যুগে তো নয়ই। ইসলাম প্রকৃতপক্ষে সহনশীলতা, সহমর্মিতার কথাই বলে। ইসলাম ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয়। স্বাধীন ধর্মচর্চার পক্ষেই কথা বলে। কিন্তু কিছু লোক 'সাম্প্রদায়িকতা'র বিরুদ্ধে কথা বলে প্রকৃতপক্ষে ধর্মের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছেন। বাস্তবে আমরা দেখতে পাই, বাংলাদেশে গত ৫০ বছরে ধর্মীয় সজ্ঘাতে লোক মারা যায়নি বা গুটিকয়েক লোক মারা গেছে। তার থেকে শতগুণ বেশি মারা গেছে রাজনৈতিক সজ্ঘাতে বিভিন্ন দলের মধ্যে, রক্ষীবাহিনী কর্তৃক হত্যাকাণ্ডে, বিভিন্ন মাওবাদী ও বাম গোষ্ঠীর হত্যাকাণ্ডে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে সম্প্রদায়গত সজ্ঘাতে। সাম্প্রদায়িকতার শ্লোগান মূলত বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ইসলামের বিরুদ্ধে দেয়া হয়ে থাকে। তারা আসলে চান ইসলামী দলগুলো নিষিদ্ধ হোক - অফিসিয়াল অর্ডার দ্বারা বা সংবিধানের মাধ্যমেই ইসলামী দল নিষিদ্ধ করে। এটা অনৈতিক ও অগণতান্ত্রিক। এই সেকুলার শক্তিগুলো ইসলামী শক্তিগুলো কাজ করুক তা চায় না, তাদের কাজ



www.pathagar.com

করতে দিতেও চায় না। তারা ভয় পান ইসলামী দলগুলো যদি কাজ করতে পারে তাহলে ক্ষমতায় না গেলেও তারা সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করবেন। তারা কোনো প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা পছন্দ করেন না। সে জন্য তারা তাদের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী থাকুক, তা চান না।

তারা ইসলামকে ব্যক্তিগত বিষয়াদির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিতে চান। তারা রাষ্ট্র থেকে ইসলাম দূরে থাকুক তাই চান। তারা আরো চান, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্র থেকেও ইসলাম দূরে থাকুক। সেকুলারিজম প্রকৃতপক্ষে এটাই চায়। এর অর্থ, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ধর্মবর্জন। ধর্মনিরপেক্ষতা কথাটা ভুল অনুবাদ। অবাক লাগে, ইসলাম বা ধর্ম রাষ্ট্রীয় আদর্শ হতে পারবে না অথচ সেকুলারিজম (যা অধর্মের সমার্থক) রাষ্ট্রীয় আদর্শ হতে পারবে - এটা গ্রহণযোগ্য নয়। ইসলাম যেখানে একটি ব্যাপক দ্বীন বা জীবনপদ্ধতি, সেখানে এই প্রত্যাশা কিভাবে সম্ভব? ইসলামের কোনো অংশ বিশ্বাস করা এবং কোনো অংশ বিশ্বাস না করাকে আল্লাহ কুরআনে কঠোরভাবে নিন্দা করেছেন। তদুপরি ইসলাম, ইসলামী আইন এবং রাষ্ট্র সব সময় একত্রে ছিল। এগুলো একটি অন্যের সাথে জড়িত। আমরা মুসলিম ইতিহাসেও এসবের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময় থেকে শুরু করে, খোলাফায়ে রাশেদিন, পরবর্তী খেলাফতের সময় কিংবা সুলতানি আমলেও আমরা তা দেখি; যদিও পরবর্তীকালে তার আদর্শরূপ ছিল না। বাংলাদেশের ও বিশ্বের অন্যান্য মুসলমানদের জন্য ইসলামই তাদের মূল পরিচিতি। তাদের নাম, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-আশাক, আদবকায়দা, তাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইনকানুন, পারিবারিক মূল্যবোধ, তাদের নৈতিকতা, এমনকি তাদের সার্বিক আচরণ - কোনো কিছুতেই ইসলামের চেয়ে বেশি প্রভাব অন্য কোনো কিছু ফেলতে পারেনি। আমরা সবাইকে আহ্বান করব, এসব হীন কাজ থেকে দূরে থাকতে। তাদের দূরে থাকা উচিত সাম্প্রদায়িকতা শব্দের অপব্যবহার থেকে। এটি এখন গালাগালির টার্ম হিসেবেই ব্যবহৃত হয়।

৬ মার্চ ২০১০, দৈনিক নয়া দিগন্ত



www.pathagar.com

# আজকের প্রজন্ম নতুন ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন

আমি নিজে গত শতাব্দীর ষাটের দশকের ছাত্র। সময়ের পরিবর্তনে নিশ্চয়ই সমস্যা বা পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়। কিন্তু গত বিশ বছরে এমন কিছু পরিবর্তন এসেছে যা আগের কোনো প্রজন্ম মোকাবিলা করেছে বলে মনে হয় না।

এখন যারা আঠার বা তার কম বয়সের, তাদের একটা অংশ মোবাইল প্রযুক্তি ও ইন্টারনেট প্রযুক্তির ভয়াবহ নৈতিকতাবিধ্বংসী উপাদানের শিকার। মোবাইলে নানা গোপন ছবি ধারণ এবং কথাবার্তা রেকর্ড করার সুযোগ রয়েছে, যা অনেক সময় অন্য ব্যক্তি জানতে পারে না। তাছাড়া কিছু কোম্পানি এমন সময়ে কলচার্জ কমিয়ে দেয় যার ফলে এ বয়সের ছেলেমেয়েরা প্রায় সারারাত মোবাইলে কথা বলে তাদের বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে। এর ফলে তাদের কান নষ্ট হয়, ঘুম নষ্ট হয়, লেখাপড়া নষ্ট হয়, ভালো করে পরের দিন ক্লাস করা হয় না। এছাড়াও রয়েছে নানা ঘটনা-দুর্ঘটনা, যার সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে।

তেমনিভাবে আগের প্রজন্ম ইন্টারনেট প্রযুক্তির ভালো বা মন্দের সম্মুখীন হয়নি। এ প্রযুক্তির কল্যাণের শেষ নেই, যেগুলো বর্ণনার স্থান এটা নয়। কিন্তু এর অন্য দিকটি হচ্ছে, এ প্রযুক্তির মাধ্যমে পর্নোগ্রাফি এবং নগ্ন যৌনতার অস্বাভাবিক ও সীমাহীন বিস্তার হচ্ছে ঘরে ঘরে বিশেষ করে সাইবার ক্যাফের মাধ্যমে।

বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত এ প্রযুক্তি সরবরাহকারী কোম্পানিগুলো এই ভয়াবহ বিকৃতি প্রতিরোধের কোনো কার্যকর চেষ্টা করছে বলে আমার জানা নেই। আমার নিজের অভিজ্ঞতা হচ্ছে এই যে, আমি নিজে যখন ইন্টারনেটে কাজ করি তখন সময়ে সময়ে বিকৃত যৌন দৃশ্যাবলি স্ক্রিনে চলে আসে। এসব বন্ধ করা কঠিন হয়। এসব ক্ষেত্রে যেভাবেই হোক বিভিন্ন দেশের সরকারকে ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে ভাবতে হবে এবং বসতে হবে যেন এটা বন্ধ করা যায়। আমরা এটুকু জানি, কোনো কোনো দেশ এক্ষেত্রে সফল হয়েছে।

আজকের প্রজন্ম আরও নানা ধরনের নতুন মাত্রার অস্বাভাবিকতার সম্মুখীন। যেমন - আজকাল কিছু ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সুপার স্টার বা এ ধরনের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে হাজার হাজার কিশোরীকে নানা ধরনের সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় নিয়োজিত করছে। যদিও তারা এগুলোকে সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা বলছে না। এসবের আসল উদ্দেশ্য পুঁজিবাদের মূলনীতি অনুযায়ী এসব



www.pathagar.com

কোম্পানির মুনাফা বৃদ্ধি করা। তাতে নৈতিকতার কি হলো সেটা কোনো বিষয় নয়। এসব প্রতিযোগিতার উপস্থাপিকা এবং অংশগ্রহণকারীরা অনেক সময় এমন পোশাক পরিধান করে থাকেন যা আমাদের কালচারে মোটেই সঙ্গত বলা চলে না। তাদের উগ্র সাজসজ্জা থাকে, অনেক সময় পোশাক টাইট হয়, ওড়না থাকে না, কামিজ ছোট হয় এবং উগ্র রংচংয়ের হয়। এগুলো প্রকৃতপক্ষে আমাদের উঠতি বংশধরদের শিক্ষা বা রুচি বা যোগ্যতা কোনোভাবে বৃদ্ধি করছে না।

বর্তমান বস্তুবাদী সভ্যতার প্রভাবেই বলব, এ বয়সের ছেলেমেয়েরা নৈতিকতার ক্ষেত্রে তাদের যা কর্তব্য তা তারা ধরে রাখতে পারছে না। তারাও ভোগবাদী হয়ে যাচ্ছে।

একটি উদাহরণ দিই - আমারই এই ভাগনি, যে হলে থাকে, তার সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে জানতে পারলাম, ছুটির দিনগুলোতে এ বয়সের মেয়েরা বিশেষ করে সাজসজ্জা, ঘুরে বেড়ানো এবং পার্লারে গিয়ে বেশি সময় ব্যয় করে। সে বলল, কোনো ভালো অনুষ্ঠানের দাওয়াত দিলে তারা বলে, এতে কী হবে। এ কয়দিনের দুনিয়াতে ভোগ করাই তো উচিত। এ সুযোগ তো আর আসবে না। তার কথায় বিশ্বব্যাপী সেকুলার চিন্তা এবং পরিস্থিতির ভয়াবহতাই প্রমাণ করে।

আমার নিবেদন, এই প্রজন্মই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ভবিষ্যৎ মানবতা তাদেরই সন্তান-সন্ততি হবে। এটা অভিভাবকদের জন্য একান্ত জরুরি যে তারা এই প্রজন্মকে রক্ষা করার জন্য যথাযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। অমুসলিমদের ক্ষেত্রে কী কী পদক্ষেপ হওয়া উচিত তা তাদেরই ধর্মীয় বা আদর্শিক নেতারা ঠিক করবেন। কিন্তু মুসলিম উম্মার ক্ষেত্রে আমি বলতে চাই, অভিভাবকদের দায়িত্ব হচ্ছে :

১. ৮-১০ বছরের মধ্যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী ছেলে এবং মেয়েকে নিজে পড়িয়ে দেয়া, অন্তত জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী হচ্ছে সর্বোত্তম আদর্শ। এটা ভালো করে না পড়ে কখনোই উত্তম নৈতিকতা অর্জন করা সম্ভব নয়।

২. তেমনিভাবে অন্তত আবু বকর, উমর, উসমান, আলী, ফাতেমা, আয়েশা ও খাদিজার (রা.) জীবনী ১১-১২ বছরের মধ্যে পড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এদের সমান মানুষ পৃথিবীতে হয়নি।

৩. অন্তত খোলাফায়ে রাশেদার ইতিহাস পড়ানোর ব্যবস্থা করা, যাতে তারা আদর্শ শাসনের নমুনা বুঝতে পারে এবং তাদের অতীত ঐতিহ্য জানতে পারে।

৪. তেমনিভাবে এ বয়সের ছেলেমেয়েকে তাদের দেশে ইসলামের আগমন ও বিস্তার এবং শাসনের ইতিহাস পড়িয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা, যাতে তারা তাদের স্থানীয় ঐতিহ্য জানতে পারে।



www.pathagar.com

৫. তাদের অল্প বয়সে অন্তত কুরআন পাকের কিছু অংশের অতি সুন্দর তিলাওয়াত শেখানো, যাতে তাদের মনে কুরআনের সুরের যে সৌন্দর্য, যে মাধুর্য তা তাদের অন্তরকে প্রভাবিত করে। একই সঙ্গে কুরআনের যতটুকু সম্ভব অর্থ পড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করা।

৬. সর্বশেষ হচ্ছে তাদের শুরু থেকেই শালীন পোশাকের দিকে উদ্বুদ্ধ করা। পৃথিবীতে যত নোংরামি হচ্ছে তার একটি কারণ অশালীন পোশাক।

আমি মুসলিম উম্মাহর সরকার, নেতৃবৃন্দ, আলেম, চিন্তাবিদ, কবি, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক নেতৃবৃন্দ, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, ইমাম ও খতিব - সবার নিকট আবেদন করি, এ বিষয়টি আপনারা গভীরভাবে বিবেচনা করুন এবং এ ব্যাপারে সামগ্রিক কার্যকর স্থানীয়, সামাজিক এবং আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নিন।

২৮ জানুয়ারি ২০১০, দৈনিক আমার দেশ



www.pathagar.com

# ধর্মীয় দল নিষিদ্ধ করার অসঙ্গত চিন্তা

আমরা এরই মধ্যে আইনমন্ত্রী শফিক আহমদের বিবৃতি দেখেছি। তিনি বলেছেন, "কেবল 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' এবং 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' রেখে সংবিধানকে ১৯৭২ সালের অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হবে।" তবে এখনো পঞ্চম সংশোধনী মামলার কার্যক্রম শেষ হয়নি, এ অবস্থায় এ ধরনের বক্তব্য দেয়ার যুক্তি বোঝা যায় না। তবে তারা যদি মনে করেন, সংসদে তাদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগে জনগণের মতামতের কোনো তোয়াক্কা না করে সবকিছু পাস করে নেবেন, তাহলে ভিন্ন কথা। তবে এর প্রতিক্রিয়া হতে পারে ভয়াবহ।

আইনমন্ত্রী বলেছেন, 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' রেখে বর্তমান সরকার ১৯৭২ সালের চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি অর্থাৎ সেকুলারিজম ও সোস্যালিজমেও ফিরে যাবে। এটা কিভাবে সম্ভব, তা আমরা বুঝতে পারি না। কেননা 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম'-এর তাৎপর্য হচ্ছে - সব কাজ পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে এবং হুকুমে করা। আর সেকুলারিজমের তাৎপর্য হচ্ছে রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্মকে বর্জন করা। এই দু'টিকে একত্র করার অর্থ হচ্ছে অসম্ভবকে সম্ভব করার চেষ্টা করা অথবা জনগণকে ধোঁকা দেয়া ও আল্লাহর হুকুমের অসম্মান করা। তেমনিভাবে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' রেখে কিভাবে সোস্যালিজম বা সমাজতন্ত্র রাখা যায়? একটি হচ্ছে 'আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা', অন্যটি হলো ধর্মকে নেশাকর 'আফিম' গণ্য করা। সরকার কিভাবে এমন চরম বৈপরীত্যের সমন্বয় করবে? অন্য দিকে একই কথা প্রযোজ্য রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের ক্ষেত্রে। আইনমন্ত্রী বলেছেন, রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বহাল থাকবে। তাহলে কিভাবে একই সাথে সেকুলারিজমকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি রাখা সম্ভব? রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের অর্থ হলো রাষ্ট্র ইসলাম পালন করবে। আর সেকুলারিজমের অর্থ হলো রাষ্ট্র, সমাজ, আইন ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে ধর্মকে বর্জন করা। এসব স্ববিরোধী চিন্তা কিভাবে জ্ঞানী ব্যক্তিরা করতে পারেন, এটা জনগণ বুঝতে পারছে না এবং বোঝা সম্ভবও নয়।

আইনমন্ত্রী আরো ঘোষণা করেছেন, 'সব ধর্মভিত্তিক দল (যার মধ্যে সব ইসলামী দলও পড়ে) নিষিদ্ধ করা হবে'। কার্যত এ ধরনের অগণতান্ত্রিক উদ্যোগ ফ্যাসিজম ছাড়া কিছুই নয়। এর সাথে জনগণের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা



www.pathagar.com

জানি, ভারতে চারটি ইসলামী দল রাজনীতির সাথে জড়িত। আমরা এটাও জানি, ইউরোপের বেশির ভাগ দেশে খৃস্টান পার্টি রয়েছে। জনগণ এটাও জানে, যুক্তরাজ্য, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড - এসব অমুসলিম দেশে ইসলামী দল রয়েছে এবং তাদের সদস্যও পার্লামেন্টে আছেন। কোনো সত্যিকার গণতন্ত্রে শান্তিপূর্ণভাবে তৎপর কোনো দলকে নিষিদ্ধ করা যায় না। এ কথা ঠিক, ১৯৭২ সালের সংবিধানে সব ধর্মীয় দল গঠন নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। তবে এ ধারা ছিল সংবিধানের সবচেয়ে অগণতান্ত্রিক ধারা। এ জন্যই পরে এই অগণতান্ত্রিক ধারা সংবিধান থেকে বাতিল করা হয়েছিল পার্লামেন্ট কর্তৃক এবং গণভোটের মাধ্যমে। আমরা মনে করি, এ ধরনের অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপ বর্তমান সরকার নেবে না। কারণ, তা করা কোনোভাবেই যুক্তিযুক্ত হবে না এবং শান্তির জন্যেও সহায়ক হবে না মোটেও। বরং এ ধরনের পদক্ষেপ জাতির মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি করবে এবং নানা সজ্ঘাত সৃষ্টি হবে। আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করি, আপনি কোনো চরমপন্থি গ্রুপের কথায় এ ধরনের পদক্ষেপ নেবেন না। এটাই এখন বাস্তব সত্য, কিছু চরমপন্থি লোক আপনার সরকারের সব ক্ষেত্রে ক্ষতি করার চেষ্টা করছে। এটা করা হচ্ছে শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে, ভারত সম্পর্কিত নীতির ক্ষেত্রে এবং সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে। আমি আশা করি, আপনি এসব ব্যাপারে দেশের জনগণের ঈমান, আকিদা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও আকাঙ্খার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেবেন এবং ভেবে দেখবেন গভীরভাবে।

৭ জানুয়ারি ২০১০, দৈনিক নয়া দিগন্ত



www.pathagar.com

www.pathagar.com

বিশ্ব পরিস্থিতি, অর্থনীতি ও ইসলাম বিষয়ক বিশ্লেষণ

প্রকাশকাল : মে ২০০৬, বুকমাস্টার

www.pathagar.com

www.pathagar.com

# ইসলাম বহুদলীয় গণতন্ত্রের বিরোধী নয়

**প্রশ্ন :** অনেকেই গণতন্ত্রের সাথে ইসলামের বিরোধ খোঁজার চেষ্টা করেন। গণতন্ত্রের সাথে ইসলামের আদৌ কোনো বিরোধ আছে কি?

**উত্তর :** হ্যাঁ, এটি ঠিক। তবে বিশ্বের সব দেশে এরকম বিরোধ নেই। পাকিস্তানে এ বিরোধ নেই। আমরা যদি একটু পেছনে যাই দেখবো, পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর গঠিত সংবিধানের একটি অংশ ছিল where in the principle of democracy, equality, social justice and freedom shall be observed as enunciated by Islam. এটি ৪৯ সাল থেকেই ছিল। এটি ১৯৫৬ সালে সংবিধানে সংযুক্ত হলো। এর অবজেক্টিভ রেজুলেশন যার ভিত্তিতে জনগণ আন্দোলন করেছিল তার মধ্যে এসব শব্দ ছিল। এটি গেল সে সময়ের কথা। ১৯৭৩-এর সংবিধানে একই অবস্থা। এরপর ২০০২ সালে এমএমএ, আহলে সুন্নাহর চারটি বড় দল ও আহলে শিয়ার একটি বড় দল, এ ৫টি দল মিলে নির্বাচনে শিয়া-সুন্নির ঐক্যের মাধ্যমে একটি গণতান্ত্রিক শাসনের জন্য লড়াই করে–সামরিক শাসনকে প্রত্যাখ্যান করে। তারা তো বলে we shall fight for sovereignty of parliament. তারা পার্লামেন্টকে সার্বভৌম করার কথা বলে। এটিকে তারা আল্লাহর সার্বভৌমত্বের সঙ্গে কোনো সংঘাত বা বিরোধ বলে মনে করে না। আমরাই এ ধারণা পোষণ করি যে কাউকে ক্ষমতা দিলে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব চলে যাবে। কিন্তু এ সার্বভৌমত্ব মানে হলো ক্ষমতা। রাষ্ট্রকে এক ধরনের ক্ষমতা দিতে হয়, পার্লামেন্টকে এক ধরনের ক্ষমতা দিতে হয়। তার সঙ্গে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের নির্ঘাত একটি সংঘাত আছে সে কথা সত্য নয়। আমি এমএমএ-এর বক্তৃতাগুলোতে প্রায়ই দেখি sovereignty of the people and sovereignty of the parliament. তারা এসব শব্দকে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের সাথে সংঘাত বলে মনে করে না। এ প্রসঙ্গে আমি আরেকটি কথা বলবো। ইরানের সংবিধানে দেখেছি সার্বভৌমত্বকে তারা দু'ভাগে ভাগ করেছে– sovereignty of Allah and sovereignty of people. এটি তাদের সংবিধানের ৫৮ ধারায় আছে। সুতরাং সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে আমাদের ধারণা ঠিক নয়। আমাদের আরো ব্যাপকভাবে এ তত্ত্বের বিশ্লেষণ করা দরকার।

ইন্দোনেশিয়া স্বাধীন হলো ৪৭-এর ১৭ আগস্ট। এর কয়েকদিন আগে ১৪ ও ১৫ আগস্ট ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীন হয়। ইন্দোনেশিয়াতেও ৫টি দফায় একমত



www.pathagar.com

হতে দেখা যায়। একে পঞ্চশীলা বলা হলো। আল্লাহর উপর আস্থা (faith in one God) প্রথম। এরপর ডেমোক্রেসি, ন্যাশনালিজম, সোশ্যাল জাস্টিস। সেখানেও আমরা দেখি যারা এর ড্রাফট করেছিল তাদের মধ্যে ছিল ইসলামী আন্দোলনের মোহাম্মদ নাসির, যিনি প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন–তার নেতৃত্বে এটি পার্লামেন্টে পাস করা হয়। সেখানে 'গণতন্ত্র' শব্দের ব্যবহার ছিল। এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সারা মুসলিম বিশ্বে ইসলামী দলগুলো গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করছে। তারা নির্বাচনের জন্য, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছে। নির্বাচিত পার্লামেন্টের জন্য সংগ্রাম করছে। আজকে সৌদি আরবের লোকেরাও একটি পার্লামেন্টের জন্য সংগ্রাম করছে যাতে নির্বাচনের মাধ্যমে তারা সেখানে যেতে পারে।

থিওরিটিক্যাল এনালিসিসে আমরা দেখি মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী (রহ.), ইমাম হাসান আল বান্না (রহ.) সহ ড. ইউসুফ আল কারযাভীর মতো বড় আলেমগণ গণতন্ত্রের মধ্যে কোনো ত্রুটি দেখেন না। তারা গণতন্ত্রকে ইসলামী বলেন। তবে পরিভাষাগতভাবে বোঝাতে আমরা এটিকে ইসলামী গণতন্ত্র বলতে পারি। আসলে মূল বিষয় হলো যেখানে আল্লাহতায়ালার আইন দেয়া আছে সেখানে সেটি মানতে হবে। এটিকেই সার্বভৌমত্ব বলা হয়। আল্লামা ইকবালের যদিও গণতন্ত্র সম্পর্কে ভিন্ন ধারণা ছিল, তারপরও বলেছেন এর থেকে বেটার সিস্টেম নেই। তিনি নিজেও পাঞ্জাব এসেম্বলির সদস্য ছিলেন। ব্রিটিশ আমলেই তিনি ইলেকশন করাকে বৈধ মনে করেছেন। আর সেখানে স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্রে গণতন্ত্রকে বৈধ মনে না করার কোনো কারণ নেই। ইকবাল একটি রূহানী গণতন্ত্রের কথা বলেছেন। রূহানী গণতন্ত্রের মানে হলো আল্লাহর সার্বভৌমত্বের অধীনে, আল্লাহর চূড়ান্ত ক্ষমতার অধীনে মানুষের গণতন্ত্র।

খিলাফত মানেও গণতন্ত্র। খিলাফত হলো প্রতিনিধিত্ব। জনগণের যারা প্রতিনিধি তারা রাষ্ট্র শাসন করবেন। তারা আল্লাহর প্রতিনিধি গণ্য হবেন, ইসলাম মোতাবেক শাসন করবেন–এটিই খিলাফত। গণতন্ত্রে জনগণের প্রতিনিধিরা শাসন করবেন। খিলাফতের বাংলা অনুবাদ আমি গণতন্ত্র করতে পারি। গণতন্ত্র মানে আল্লাহর শাসন লংঘন নয়। আল্লাহর শাসনের বিপরীতে আমরা জনগণের শাসন বলি না। আমরা বলি রাজার শাসনের বিপরীতে জনগণের শাসন। মিলিটারি ডিক্টেশনের বিপরীতে জনগণের শাসন। গণতন্ত্র বলতে আল্লাহর শাসনের বিপরীতে দাঁড়িয়েছে–এটি একেবারেই ভুল ধারণা। প্রকৃতপক্ষে এটি হচ্ছে আমরা রাজার শাসন, স্বৈরশাসন কিংবা রাজতন্ত্রের শাসন চাই না। আমরা জনগণের শাসন চাই। এ শাসন জনগণের। বাস্তবে শাসন তো আল্লাহতায়ালা করেন না। আল্লাহ মানুষকে খলিফা হিসেবে পাঠিয়েছেন। মানুষই সে খলিফার দায়িত্ব পালন করে। দুনিয়া চালাবে খলিফারা।

প্রশ্ন : গণতন্ত্র সম্পর্কে এ ধারণা কি পশ্চিমা অপপ্রচার, না আমাদেরই ভুল বোঝাবুঝি?



www.pathagar.com

**উত্তর :** পশ্চিমারা বলে আমরা গণতন্ত্রের জন্য উপযুক্ত নই। তারা বলে, ইতিহাস প্রমাণ করে যে আমরা গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারছি না। তাদের কথা এ পয়েন্টে। কিন্তু গণতন্ত্র ইসলামিক নয়–এ ধারণা আমাদের ভেতরই একদল লোকের। এরা নিজেরা বুঝতে পারে না যে এরা ইসলামের ক্ষতি করছে। তারা গণতন্ত্রকে ইসলাম বিরোধী হিসেবে দেখাতে চায় যা ইসলামের জন্য সংকট সৃষ্টি করে, বিশেষ করে এলিটদের মাঝে এটিকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার ক্ষেত্রে।

আমরা ইসলামকে অগ্রহণযোগ্য করে তুলছি আমাদের দোষে। এমন যদি হতো ইসলামই গণতন্ত্র চায় না এবং এজন্য এটি অগ্রণহযোগ্য, তাহলে কথা ছিল না। কিন্তু আমাদের ব্যাখ্যার মাধ্যমে আমরা এটিকে অগ্রহণযোগ্য করে রাখতে পারি না। এটি আমাদের ব্যর্থতা। এটি দুঃখের কথা। যাদের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে খুবই কম জ্ঞান আছে তারাই আজ এর বড় প্রবক্তা হয়ে গেছেন। যারা পলিটিক্যাল সায়েন্স ভালো করে পড়েছেন তারা কিন্তু এ কথা তুলছেন না। প্রশ্ন তুলছেন এমন কিছু সংখ্যাক লোক যাদের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে জ্ঞান অত্যন্ত কম, যারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী নন।

**প্রশ্ন :** এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান এবং ইসলামে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও ইসলামী আদর্শভিত্তিক দলগুলো ব্যাপক প্রভাব বিস্তারকারী ভূমিকায় এখনো আসতে পারছে না কেন?

**উত্তর :** আমি যতটুকু বুঝেছি তাতে এর কয়েকটি কারণ আছে। একটি কারণ হলো ইসলামী দলগুলোর ওভারঅল যোগ্যতার ঘাটতি। এ ব্যর্থতা কোনোভাবেই অস্বীকার করা যাবে না। যদি কোনো দোকানদার কিংবা কোনো কোম্পানি তার পণ্য বিক্রি করতে না পারে তার জন্য তো মার্কেটিংয়ের ব্যর্থতাকে দায়ী করা হয়। ইসলাম একটি মহৎ আদর্শ ও জীবন ব্যবস্থা–এটি যদি আমরা বলি এবং মানি, তাহলে এটিকে আমরা সেল করতে পারছি না কেন? তার জন্য সেলসম্যান ও সেলস উইমেন যেই হোক না কেন, সেলস পার্সনকেই আমাদের দোষারোপ করতে হবে। এর কারণ হচ্ছে তাদের মধ্যে যোগ্যতার অভাব, স্টাডির অভাব। যে ধরনের যোগ্যতাসম্পন্ন, পড়াশুনা জানা লোক দরকার সে ধরনের লোকের অভাব।

এ যুক্তি সকল ইসলামিক দলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ইসলামকে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সমস্যা আছে। যেমন–খুৎবার মাধ্যমে প্রতি সপ্তাহে ইসলামের যে বাণী কোটি কোটি লোকের কাছে পৌঁছায় তার মান এতো নিম্ন যে মানুষের মনে ইসলামের মান সম্পর্কে একটি ভুল ধারণা জন্মায়। তারা ভাবে এটি একটি খুবই সাধারণ জিনিস। ইসলামের বিশালত্ব সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা হয় না। ইসলাম যে একটি ইউনিভার্সেল বিষয়, মানবতার মুক্তির বিষয়–তা খুৎবা শুনে মনে হয় না। দু'-এক স্থানের খুৎবা ব্যতীত এ হলো সামগ্রিক অবস্থা। অথচ



www.pathagar.com

বছরের ৫২ সপ্তাহে যদি পরিকল্পিতভাবে খুৎবা দেয়া হতো তাহলে তা যে কতো বড় মহৎ কাজ হতো, তা আমাদেরকে বুঝতে হবে।

ইসলামকে আজ একটি ভীতিকর বিষয় বানানো হয়েছে। হাত কাটা, জেনার শাস্তি পাথর মারা–এ ধরনের বিষয়গুলো খুব বেশি তুলে ধরা হয়েছে এ দেশের মানুষকে পূর্ণরূপে কনভিন্সড করার আগেই। বলা হয় গুলিস্তানের সামনে যদি একটি লোককে ফাঁসি দেয়া হয় কিংবা পাথর দিয়ে মেরে ফেলা হয় তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু এ ব্যাখ্যা জানা জরুরি যে শরিয়াহ আইন মানেই শুধু এসব নয়। ইকোনোমিক আইন, বিজনেস আইন–সবই শরিয়াহ আইন। গভর্নমেন্টের আইন যদি ইসলামভিত্তিক হয় তাহলে তাও শরিয়াহ্ আইন। ফ্যামিলি থেকে শুরু করে কালচারাল ক্ষেত্র পর্যন্ত যে আইন হবে সবই শরিয়াহ আইন। অথচ শুধু ক্রিমিনাল আইনকেই আজ আমরা শরিয়াহ আইন বানিয়ে ফেলেছি।

তেমনিভাবে ছোট ছোট বিষয়গুলোকে বড় বেশি তুলে ধরা হয়েছে। শার্ট-প্যান্ট পরা যাবে না, টুপি পরতে হবে–মসজিদে গিয়ে টুপি না পরলে আগে শাসনই করা হতো। এ যে ছোটখাট বিষয়গুলোকে হাইলাইট করা হয়েছে তা শরিয়াহর মেজাজ কিংবা এর গুরুত্ব বা অগ্রাধিকারের বাইরে। এসব বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ির কারণে তিনটি শ্রেণি ভুল বুঝেছে–যুব সমাজ, নারী সমাজ এবং এলিট শ্রেণি। এটি একটি মারাত্মক অবস্থা। এরকম সমাজে ইসলাম কিভাবে অগ্রসর হবে? অন্যদিকে কৃষক-শ্রমিকদের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত ঠিকমত দেয়া হচ্ছে না। যাদের কাছে পৌঁছাচ্ছে তাদের মধ্যে আবার এ তিন শ্রেণি বাদ পড়ে যাচ্ছে। যদিও যুবকদের মধ্য থেকেই ইসলামী আন্দোলনের লোক বেশি সংখ্যায় আসছে কিন্তু মেজরিটি বাদ পড়া ইসলামের জয়ের জন্য সমস্যা। তবুও আমি বলবো এ দেশের প্রায় ৭০ ভাগ লোক ইসলামকে মেনে চলে। যে দলটি বর্তমানে ক্ষমতায় আছে তারাও নিজের ভোট বাদ দিয়ে বাকি ভোট ইসলামিস্টদের কাছ থেকে পেয়েছে। জেনারেল সাহেবের দলের, এমনকি প্রধান বিরোধী দলের ভোটেরও একটি অংশ ইসলামিস্টদের ভোট। এসব হিসাব বলে দেয় এদেশের এক বিরাট অংশই ইসলামের পক্ষে।

**প্রশ্ন :** বাংলাদেশে ইসলামী দলগুলোর ঐক্যের পথে বাধা কোথায়? এ বাধাগুলো কিভাবে দূর করা যায়?

**উত্তর :** এদের মধ্যে ঐক্য যে হচ্ছে না তাতেই বোঝা যায় কোনো না কোনো কিছু এতে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যদিও আমি মনে করি ইসলামিক দলগুলোর মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং হওয়ার দরকার। আমি ঐক্য বলছি না, বলছি সংযোগ বা বোঝাপড়া থাকা ভালো। একে অন্যকে বোঝা, ঝগড়াঝাটি না হওয়া উচিত। তা ইতিহাসের অনেক পর্যায়েই হয়নি। বর্তমান সরকারে ইসলামী দলগুলোর একটি ঐক্য যদিও আছে তবে তা একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে। কিন্তু মধ্যে বিরাট সময় গেছে যখন এরকম ঐক্য ছিল না।



www.pathagar.com

এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গেলে সবই সেনসিটিভ কথা হয়। ইসলামী দলগুলো ধর্মীয় ছোটখাট বিষয়ে মতবিরোধ করে। যেমন কেউ একজন ইসলামের ইতিহাসের উপর একটি বই লিখে তাতে বিশ্লেষণ করে দেখালেন যে কোনো এক খলিফার অমুক আচরণ ইসলামের সংকট সৃষ্টি করেছে। এতে তিনি হিস্টোরিক্যাল এনালিসিস করলেন। কিন্তু এর ফলে সঙ্গে সঙ্গে সে লেখকের বিরোধিতা শুরু হলো। বলা হলো তিনি ইসলামের বিরোধিতা করেছেন, তিনি নবীর সঙ্গীদের নিন্দা করেছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। কিংবা কোনো আলেম হয়তো ফকিহদের কোনো একটি মতের সমর্থন দিয়ে বললেন যে, সেহরি একটু দেরী করে করা যায়। তখন এটিই ইস্যু হয়ে গেল আরেক দলের বিরোধিতা করার জন্য। আসলে এতে বিরোধিতাকারীদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচয় ফুটে ওঠে।

যারা ইসলামের জন্য কাজ করেন, বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত, তাদের মধ্যে সংকীর্ণতা খুব বেশি। এ সংকীর্ণতার কারণে তারা ছোটকে বড় মনে করেন। যদি শুধু বড়গুলোই তারা দেখতেন তাহলে কোনো মতবিরোধ হতো না। যেমন ইমাম হাসান আল বান্না বলেছেন–আমরা ঐক্যের দিকগুলোকে ভিত্তি করে একত্রে মিলে কাজ করবো আর অনৈক্যের যে ছোটখাট দিক আছে তাতে একে অন্যকে ক্ষমা করে দেব। এ মূলনীতি তারা এখনো এখানে গ্রহণ করতে পারেননি। তারা প্রতিটি ছোট ছোট বিষয়কে নিয়েই অনৈক্যের ভিত্তি দাঁড় করিয়েছেন। ফলে ঐক্য হয়নি। এ সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমাদেরকে উদ্ধার পেতে হবে। এ কারণেই যত সমস্যার সৃষ্টি। আর এটি তাদের শিক্ষার সাথে জড়িত। সে শিক্ষার যদি সংস্কার না হয়, পরিবর্তন না হয়–তাহলে তাদের এ মানসিকতা দূর হবে না। আর মানসিকতার পরিবর্তন না হলে প্রতিবন্ধকতা থেকে যাবে।

আবার আরেক দল লোক আছেন যাদেরকে পীর বলা হয়। তাদের একটি অংশ যে কোনো কারণেই হোক পলিটিক্যাল ইসলামকে ভালো চোখে দেখেননি। তবে নিজেদের প্রয়োজনে তারা নিজেরা কোনো কোনো সময় পলিটিক্সে জড়িয়েছেন। ইসলামের মূল দলগুলো তাদের সমালোচনা ও নিন্দার সম্মুখীন হয়েছে। কেউ যদি পীরদের কাছে যায় তাহলে পীর খুব খুশি হন। আর যারা যান না তাদের উপরে তারা বেজার হয়ে যান।

এমনিভাবে আমাদের তাবলিগ জামাত আছে। তারা সারা দেশে ঘুরে বেড়ায়, সারা পৃথিবী ঘুড়ে বেড়ায়। তারাও আবার এদেরকে না বুঝে ভুল বোঝে। তারা এটি বুঝতে পারেন না যে ইসলামের কাজের বিভিন্ন ডাইমেনশন আছে। কতগুলো হায়ার দিক আছে, কতগুলো সাধারণ দিক আছে। তারা সাধারণ দিক নিয়ে ব্যস্ত–ঠিক আছে, ভালো কথা। কিন্তু যারা হায়ার দিক নিয়ে এগুচ্ছেন, জাতির মূল সমস্যাগুলো নিয়ে কাজ করছেন, আইন ইসলামিক করার চেষ্টা করছেন, শিক্ষা ও কালচারকে ইসলামিক করার চেষ্টা করছেন সেগুলোকে তারা দেখছেন না। প্রকাশ্যে না হলেও অপ্রকাশ্যে তারা উল্টো ইসলামের মূলধারার বিরোধিতা করছেন, কিংবা ভুল বুঝছেন।



www.pathagar.com

তবে ঐক্য না হবার পিছনে আমি কোনো মৌলিক কারণ খুঁজে পাই না। কেন তাদের মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং হবে না? পরিস্থিতি অনেক পরিবর্তন হয়েছে (২০০১ সাল থেকে)। একবার ঐক্য হলে তাতে ফাটল দেখা দেবে বলে আমি মনে করি না। কেননা একবার একত্র হবার পর নতুন করে ফতোয়া দেয়া তো মুশকিল।

**প্রশ্ন :** অনেকেই আগামী কয়েকটি নির্বাচন চারদলীয় জোটের মাধ্যমে করার পরামর্শ দিয়েছেন। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি?

**উত্তর :** এটি কোনো সাময়িক বিষয় নয়। কেবলমাত্র একটি নির্বাচন হলো। তিন-চারটি নির্বাচন মানে পনের-বিশ বছরের ব্যাপার। এখন এ দীর্ঘ সময়ের মধ্য রাজনীতির অবস্থা কি হয় বলা যায় না। এমনকি এটিও বলা মুশকিল যে আগামী দিনগুলোতে চারদলীয় জোটের কি অবস্থা হবে। এ জোট আগামীতে থাকবে কি থাকবে না, একত্রে নির্বাচন করতে পারবে কি না, নতুন কোনো দল আসে কি না–সবই সময়ের ব্যাপার।

বর্তমান পরিস্থিতিতে এরকম চারদলীয় জোটের নির্বাচন বাংলাদেশের জন্য কল্যাণকর। এটি গণতন্ত্রকে সুসংসত করতে সাহায্য করবে। কিন্তু পনের-বিশ বছরের যে সময়কাল, সেখানে সব ফ্যাক্টর তো আর এক থাকবে না। যেমন ক্ষমতার বাইরে অন্য কারোর শক্তি বৃদ্ধি পেতে পারে। সার্বিক বিবেচনায় গণতন্ত্র সুসংসত করার মূল পদ্ধতি এটি নয়। গণতন্ত্র সুসংহত করার মূল পদ্ধতি হবে, we must play by the democratic rule–এটি যেন সব দলই বোঝে। এটি তারা না বুঝলে গণতন্ত্র সুসংহত হবে না। পার্টিতে গণতন্ত্র থাকবে, পার্টির মধ্যে নিয়মিত নির্বাচন হবে, পেশীশক্তি ব্যবহার হবে না বলে সিদ্ধান্ত নিতে পারলে অনেক কিছু করা সম্ভব। এগুলো না মানলে গণতন্ত্র সুসংহত হবে না। এটিও একটি কঠিন ব্যাপার। জোটের দলগুলো যদি ডেমোক্রেটিক রুলসের ব্যাপারে সিনসিয়ারিটি দেখাতে না পারেন তাহলে সমস্যা দেখা দেবে। ভোটে ফেল করলে আমরা নীরবে চলে যাব এবং যারা জিতবে তারা খুব সহজেই ক্ষমতা নেবে–জটিলতা সৃষ্টি বাদেই, এটি আমরা কেন করতে ব্যর্থ হবো? ভারতে আমরা এটি কমবেশি দেখছি। কিন্তু আমাদের ব্যর্থ হবার কোনো কারণ দেখি না।

আমি আবার বলবো চারদলীয় জোটের একত্রে নির্বাচন করার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। ভেরি ফ্রাঙ্কলি, অনেকে মনে করেন এর সাথে গণতন্ত্র সংহত হবার সম্পর্ক আছে। তবে এটি জাতীয়তাবাদের সংহতির জন্য ভালো। বর্তমান প্রেক্ষিতে ইসলামের জন্য এটি সাহায্যকারী। কোনো জোটের সঙ্গেই গণতন্ত্রের ডাইরেক্ট কোনো সম্পর্ক নেই। এর সাথে কে ক্ষমতায় যেতে পারবে কেবল তারই সম্পর্ক আছে।

**প্রশ্ন :** আপনি প্রসঙ্গত তাবলিগ জামাতের কথা বলেছেন। অনেকেই ধারণা করে তাদের কাজের প্রক্রিয়াটি ভালো। অথচ বাস্তবে জাতীয় ইস্যুগুলোতে তারা



www.pathagar.com

সক্রিয় নয়। তাহলে তাবলিগ জামাতের সংকট বা সমস্যা কোথায়?

**উত্তর :** এটিও একটি সেনসিটিভি ইস্যু। এদেশে অনেক লোক তাবলিগ জামাতকে মনে-প্রাণে ভালো জানে, যদিও তারা তাবলিগ জামাতে অংশ নেয় না। সে হিসেবে এখানে সত্য কথা বলাও একটি কঠিন ব্যাপার। তাবলিগ জামাতের উদ্দেশ্যকে আমি ভালো জানি। তাদের উদ্দেশ্যে কোনো ত্রুটি আছে বলে আমি জানি না। কারোর মনের খবরই আল্লাহ ছাড়া কেউ ভালো জানেন না। তবে তাদের আমল তাদের উদ্দেশ্যকে খারাপ বলে না।

দ্বিতীয়ত, তাদের কাজের ধরণ একটি পদ্ধতি মাত্র। সকল পদ্ধতিই বৈধ যাতে শরিয়ত বিরোধী কিছু নেই। তারা যে পদ্ধতি অনুসরণ করে সেটিও বৈধ। তবে তারা যদি দাবি করে বসে তাদের পদ্ধতিই একমাত্র বৈধ পদ্ধতি–এ দাবি সঙ্গত হবে না।

তৃতীয়ত, কথা হলো তাদের পদ্ধতি কতটুকু যুগোপযোগী? আমাদের কাজের উদ্দেশ্য কি–উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজকে পরিবর্তন করা। কিন্তু তারা যে পদ্ধতিতে কাজ করছেন তাতে আজকের যুগে সমাজ পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। এটি নিয়ে অনেক সময় ধরে বিতর্ক হতে পারে। কিন্তু আমি বলবো সমাজ পরিবর্তনের জন্য এ পদ্ধতি উপযুক্ত নয়। আমরা দেখি ফ্রান্স, রাশিয়ার বিপ্লব কিংবা ইউরোপ, আমেরিকার সমাজ পবিরর্তন কিন্তু এ ধরনের পদ্ধতি দ্বারা হয়নি। ইরানের পরিবর্তন এভাবে হয়নি। সুতরং এ পদ্ধতি দ্বারা আমার মতে খুব বড় কিছু হবে না। এর মধ্য দিয়ে কিছু লোক নামাজ শিখতে ও কিছু লোক রোজা রাখতে পারে। অনেকের ধারণা তাদের দ্বারা কিছু লোক কুরআন শিখে ফেলবে। কিন্তু কুরআন শেখার একটি ট্রাডিশনাল পদ্ধতি আমাদের সমাজে আগে থেকেই ছিল। ছিল বলেই আগেও প্রতিটি ছেলেমেয়ে কমবেশি কুরআন পড়া শিখতে পারতো। কাজেই এটি এমন নয় যে তাবলিগ জামাত আসার পরেই এগুলো হয়েছে।

সে সাথে তাদের ত্রুটিগুলোর মধ্যে দেখি তারা অন্যের ভালো কাজ পছন্দ করতে পারে না। এটি আরেক সমস্যা। আমরা তাদের ভালোটার প্রশংসা করি, ফাইন। কিন্তু তারা অন্যদের ভালো জিনিসের প্রশংসা করতে পারছে না। অন্যরা ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করছেন, কাজ করছেন, নির্বাচন করছেন, তার মাধ্যমে আইনও পরিবর্তন করতে চেষ্টা করছেন, শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করছেন, ব্যাংক করছেন, বীমা করছেন, ইসলামিক ইউনিভার্সিটি করছেন, তারা জনগণের কল্যাণের জন্য সংগ্রাম করছেন, পত্রিকা বের করছেন, টিভি চ্যানেল করে অশ্লীলতাকে রুখবার চেষ্টা করছেন–তাবলিগ জামাতে এগুলোর কোনো গুরুত্ব নেই।

আমি বলবো তাবলিগ জামাতের কাজ এ পর্যায়েই থাকবে এবং আমি এর কোনো ব্যাপক বিস্তারও আশা করি না। তাবলিগ জামাতের যতটুকু রাইজ করার করে গেছে। বছরে তারা একবার একটি মাঠে একত্রিত হয়। আবার



www.pathagar.com

ছড়িয়ে পড়ে। আবার একত্রিত হয়। সার্বিক বিবেচনায় এদের আর কোনো উত্থান হবে না। এ পর্যন্ত তারা সমাজের কোনো দিক থেকেই তেমন কোনো প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনি। যেমন শিক্ষার দিক থেকে, কালচারের দিক থেকে এরা কোনো অবদান রাখেনি। তারা পার্লামেন্টে কোনো প্রভাব রাখতে পারেনি। মিডিয়াতেও নয়। এমনকি সমাজসেবাতেও নয়। তারা বলতে পারবে না আমরা ৫০টি এনজিও করেছি এবং তার মাধ্যমে সমাজসেবা করছি। তারা অনেক মাদরাসা, স্কুল, ইউনিভার্সিটি, ব্যাংক, পত্রিকা প্রতিষ্ঠার কথা বলতে পারবে না। সুতরাং এটি তাবলিগ জামাতের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা। তারা সিনসিয়ার লোক, ভালো লোক–কিন্তু তারা ব্যর্থ।

**প্রশ্ন :** তাদের পড়াশুনার সীমাবদ্ধতাও লক্ষ্য করা যায়।

**উত্তর :** আমি সত্যিকারভাবে জানি না তাদের পলিসি কি? এটি আরোপিত কথা কি না তাও জানি না। হতে পারে তারা ফাজায়েলের দু'-তিনটি বই ছাড়া অন্য কিছু পড়ে না। আমি তাদের এমন কোনো নীতি নির্ধারণী বক্তব্য বা স্টেটমেন্ট পাইনি যাতে তারা কুরআন পড়তে নিরুৎসাহিত করে। তবে তারা এগুলোতে উৎসাহিত করে না এরকম একটি ধারণা জনগণের মধ্যে আছে। কারণ তাদেরকে পড়তে কম দেখা যায়। যদি সত্যিই তারা ঐ ধরনের কয়েকটি বই ছাড়া এ বিষয়ে নিরুৎসাহিত করে থাকেন তাহলে আমি মনে করি সেটি তাদের নিজেদের জন্য যেমন বড় ক্ষতি, জাতিরও ক্ষতি। তাদের উচিত তাদের কর্মীদেরকে জানার জন্য উৎসাহিত করা। বিশেষ করে কুরআন মজিদ পুরোপুরি অর্থ ও ব্যাখ্যা সহ জানা উচিত। সে সাথে ইসলামের যেসব আলেম সম্পর্কে তাদের কোনো সন্দেহ নেই সেসব আলেমদের লেখা বই তাদের পড়া দরকার। তারা যদি মনে করেন শামসুল হক সাহেব, নূর মোহাম্মদ আজমী সাহেবের বই পড়া যায়–তাহলে তাদের সেগুলো পড়া উচিত। তবে সব ধরনের বই পড়তে হবে। ইসলামের শুরুর যুগে ইমাম গাজ্জালী তো মুশরিক ও নাস্তিকদের বই পড়েছেন। তারা তো ওইসব বই পড়েই মুশরিক বা নাস্তিকদের উত্তর দিয়েছেন।

**প্রশ্ন :** আসলে তাদের ইসলামের মৌলিক বইগুলো পড়া প্রয়োজন।

**উত্তর :** আবশ্যই। রাসূলের যে জীবনী তা তাদের পড়া উচিত। তাই বলা যায় তাদের বিরুদ্ধে পড়াশুনা না করার অভিযোগ যদি সত্য হয় তাহলে তা মোটেই ভালো নয়।

**প্রশ্ন :** তাবলিগ জামাতকে কি ইসলামী আন্দোলনের জন্য সক্রিয় ভূমিকা রাখা উচিত নয়?

**উত্তর :** তাদের সিস্টেম এমনই যে তারা তা বদলাতে পারছেন না। এটি অনেকেরই দোষ যে একটি সিস্টেমে অভ্যস্ত হয়ে গেলে প্রয়োজনেও তা থেকে



www.pathagar.com

তারা বেরিয়ে আসতে পারেন না। সে দলই ভালো যে নিজেকে রিভিউ করতে পারে এবং প্রয়োজনে চেষ্টা করতে পারে। দোষ অন্যদেরও আছে। অনেকেই তাদের কাঠামোর বাইরে যেতে চেষ্টা করেন না। এটি মোটেই ঠিক নয়।

**প্রশ্ন :** বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা এখনও কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে আসেনি। এটি কেন আসেনি এবং কিভাবে তাদের আরো সক্রিয় করা যায়?

**উত্তর :** সেটি তো আমারও প্রশ্ন। আর এটিই বর্তমান বাস্তবতা। আমাদের দেশে মহিলাদের সামাজিক বা রাজনৈতিক গুরুত্ব ২০-২৫ বছর আগেও এতটা ছিল না। যেমন ভোটের ব্যাপারে সেই ১৯৩৫ সাল থেকেই পুরুষকে সার্বিকভাবে পরিবারের নারীর ভোটের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করতে দেখা গেছে। আমাদের দেশে নারীর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে রাজনৈতিকভাবে খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার আগমনের সময় থেকে। তার আগে গুরুত্ব ছিল, তবে তা কম। এটি একটি প্রেক্ষিত। আবার, হয়তো বা ইসলামী আন্দোলন যতটা পুরুষকে দাওয়াত দেয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছে ততটা নারীকে দেয়ার বিষয়টি বুঝতে পারেনি। তারা মনে করেছে পুরুষকে দাওয়াত দিলেই নারী তার কাছ থেকে দাওয়াত পেয়ে যাবে। এটি একটি ধারণা। কিন্তু সরাসরি দাওয়াত আর ইনডাইরেক্ট দাওয়াত কখনোই এক নয়।

১৯৮০ সালে নারী বর্ষ ঘোষণা করা হলো। ১৯৯০ সালে বেইজিং-এ নারী সম্মেলন হলো। সেখানে নারী ইস্যু আবার আলোচিত হলো। পরিবেশের মতো জেন্ডার ইস্যু বিশ্বব্যাপী একটি এজেন্ডাতে পরিণত হলো। ফলে ইসলামী মুভমেন্টও বাধ্য হলো একে গুরুত্বের সাথে নিতে। এটি যে তাদের পজেটিভ আন্দোলন ছিল তা নয়। এটি একটি রিএ্যাকটিভ অবস্থান ছিল অর্থাৎ একটি ঘটনা ঘটছে, 'আই মাস্ট রেসপন্স নাউ'-সে হিসেবে নারীদেরকে এপ্রোচ করা শুরু হলো। সেটি দেরি হলো এবং একটি বাধ্যগত অবস্থার মধ্য দিয়ে হলো। এ গুরুত্ব আগেই বোঝা উচিত ছিল। আমরা যদি নারী জাগরণ থেকে দূরে থাকি তাহলে বিশ্বব্যাপী আমরা একপেশে হয়ে যাব। এ কারণে আমরা নারী ইস্যু গ্রহণ করলাম। কিন্তু এটিকে এভাবে হিসেব করা ঠিক হয়নি। তারা মানুষ, তারা মানবতার অর্ধেক। তাদের ইস্যু মানুষের ইস্যু, আমাদের ইস্যু। এ হিসেবে নারীর ইস্যু মেরিটের উপর গ্রহণ করা উচিত ছিল। ভালো-মন্দ, দুঃখ-আনন্দ সব বিষয়েই নারী-পুরুষ উভয়েই জড়িত। ইসলামের নারী-পুরুষ সমতার বিষয়টি থিওরিটিক্যালি যতটা বলা হয়েছে বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমরা সে সমতা দেখাতে পারিনি। তারপরও নারীরাও এগিয়ে আসছে। ইসলামিক মুভমেন্টে আরকান বা রুকনদের মধ্যে এক-পঞ্চমাংশ এখন নারী। তাদেরকে শূরাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আস্তে আস্তে সবখানে তারা পলিসি লেভেলে চলে আসছে। বর্তমানে ছাত্রীদের মধ্যে কাজ হচ্ছে। সামগ্রিকভাবে নারীদের মধ্যে ভালো কাজ হচ্ছে।



www.pathagar.com

**প্রশ্ন :** বিশ্বব্যাপী ইসলামী আন্দোলন প্রসঙ্গে ড. ইউসুফ আল কারযাভী বলেছেন, নারী আন্দোলন এখনো পুরুষদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। নারী যদি পুরুষদের নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন এবং তারা যদি নিজেরাই নিজেদের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন তাহলে এর গতি আরো বাড়বে এবং এজন্য দরকার জয়নব আল গাজ্জালীর (মিসরের প্রখ্যাত ইসলামী নারী নেত্রী) মতো নেতৃত্ব। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিষয়টি আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন?

**উত্তর :** জনাব কারযাভীর কথার সাথে আমি একমত। আজকে বাংলাদেশে মেয়েদের মধ্যে বিভিন্নভাবে কাজ হচ্ছে। কিছু স্মল ইন্টেলেকচুয়াল গ্রুপ আছে যারা হাইলি ইন্টেলেকচুয়াল। তারা দেশ-বিদেশে পড়াশোনা করছেন। বিভিন্ন বিশ্বদ্যিালয়ে যোগদান করছেন। এর থেকে অনেকেই এগিয়ে আসবে। এরা আমার জানা মতে দেশের ইসলামী আন্দোলনের প্রধান দলটির সমর্থক। সব মিলিয়ে একটি আধুনিক এবং একই সঙ্গে সম্পূর্ণ ইসলামিক একটি নেতৃত্ব সামনে আসবে।

নারীদের কাজ নারীদের দ্বারা স্বাধীনভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া দরকার। পুরুষের চেয়ে নিঃসন্দেহে নারী ইস্যু নারীরাই বেশি ভালো বুঝবেন। সেখানে নারী ইস্যুতে পুরুষের নিয়ন্ত্রণ থাকা ঠিক নয়, গাইডেন্স নিতে পারে মাত্র। গাইডেন্স তো আমরাও নারীদের কাছ থেকে নিতে পারি। রাসূল (সা.) হুদায়বিয়ার যুদ্ধের সময় যখন কোনো দিক পাচ্ছিলেন না তখন হজরত উম্মে সালমার সঙ্গে পরামর্শ করেন এবং তার পরামর্শ মতোই তিনি কাজ করেছিলেন। তাহলে এটি তো শরিয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ বৈধ। সূরা শূরাতে বলা হয়েছে 'তোমরা পরামর্শ মতো কাজ কর'। তার মানে পুরুষ-নারীও প্রয়োজন অনুসারে পরামর্শ করবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) জীবনের খুবই ক্রিটিক্যাল মুহূর্তে হজরত উম্মে সালমার (রা.) পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন, যখন সাহাবিরা রাসূলকে (সা.) অপমানজক চুক্তি সই করার জন্য অভিযোগ করেন এবং কুরবানি করতে রাজি হচ্ছিলেন না।

মুসলমানরা বিভিন্ন সময় মুসলিম নারীকে নেতা হিসেবে মেনেছে। যখন হজরত উসমান (রা.)-এর রক্তের বদলার কথা উঠল তখন বিরাট একটি অংশ হজরত আয়েশার পক্ষ নিয়েছিলেন। আর আমি এর কোনো যুক্তি বুঝি না যে, কেন জাতি প্রয়োজনে নারীর দিকে টার্ন করবে না?

**প্রশ্ন :** আমাদের দেশে অসংখ্য নারী সংগঠন আছে। অনেকেই নারী অধিকারের নামে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। নারীর অধিকারকে সামগ্রিকভাবে আপনি কোন দৃষ্টিতে দেখেন?

**উত্তর :** আমি সহানুভূতির সাথেই দেখি। দুটি কারণে, একটি হচ্ছে – নারীদের লিটারেট করার দরকার ছিল, কিন্তু ইসলামী মহল এ ব্যাপারে অগ্রসর হচ্ছিল না। নারী শিক্ষার জন্য লড়াই প্রথম দিকে ইসলামিস্টরা করেনি। সে লড়াই তাদেরই করতে হয়েছে যারা ততটা ইসলামিস্ট বলে পরিচিত নন। স্যার সৈয়দ



www.pathagar.com

আহ্মদ আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন। তাকে দারুণ বিরোধিতায় পড়তে হয়েছিল। বেগম রোকেয়া কত বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন শুধুমাত্র মেয়েদের সামান্য একটুখানি লেখাপড়া করানোর চেষ্টা করতে গিয়ে। সত্যি কথা হচ্ছে আমাদের দেশের কনজারভেটিভ একটি অংশ কোনো ক্ষেত্রেই মেয়েদের এগিয়ে নেবার ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়নি। মেয়েরা শত শত বছর ধরে সম্পত্তির অধিকার পাচ্ছিল না। আমার জানা মতে এ জন্য কোনো সামাজিক আন্দোলন বেশিরভাগ আলেম করেননি।

সুতরাং এ প্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাপী নারীর মুক্তির যে আন্দোলন হয়েছে সেটি পজেটিভ। তবে যাদের হাতে হয়েছে তারা যেহেতু ইসলামকে অতো ভালো জানতো না, সেজন্য এটি বিভিন্ন সময় রং ডাইমেনশনে গিয়েছে। আমাদের নেতৃত্ব না দেয়াতে অন্যরা এটিকে মিসগাইড করেছে। তবু আমি মনে করি, সার্বিকভাবে নারীমুক্তি আন্দোলন আশাব্যঞ্জক। আমরাও তো আজ নারী অধিকার আন্দোলনের সাথে জড়িত। এখন আমাদের প্রধান কাজ হচ্ছে এ মুক্ত নারীকে বা আধামুক্ত নারীকে পূর্ণ মুক্ত করা এবং সে সাথে ইসলামাইজ করা।

**প্রশ্ন :** ছাত্রজীবনে অনেক মেয়েই আন্দোলনে নেতৃত্বের পর্যায়ে থাকার পরও বৈবাহিক অবস্থার শুরুর সাথে সাথে তাদের আর সে অবস্থায় দেখা যায় না। এ বিষয়ে আপনার মত কি?

**উত্তর :** এটিকে আমি শুধু দুঃখজনক বলবো। আমি বলবো, আল্লাহতায়ালা যাকে যে মেধা ও যোগ্যতা দিয়েছেন তাকে তা ব্যবহারের সুযোগ করে দেয়া দরকার। স্বামীরা যদি এটিতে বাধা দেয় তাহলে তারা মুনকার কাজ করলো। আল্লাহ বলেছেন, 'ইন্নামাত তায়াতু ফি মারুফ'–আনুগত্য শুধু ভালো কাজের। সঠিক মেধাকে সঠিক ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে স্বামীরা বাধা দেবে তা হতে পারে না। আল্লাহর রাসূল নারীদের যে আনুগত্যের শপথ করিয়েছিলেন তার একটি অংশ ছিল, সূরা মুমতাহিনাতে বলা হয়েছে, 'লা ইয়াছিনাকা ফি মারুফিন'–তারা তোমাকে অমান্য করবে না মারুফ কাজে। তার মানে শুধু মারুফ কাজে অমান্য করা যায় না। মুনকারে অমান্য করা যায়। সেখানে আমার মেধাকে বিকাশ করতে দেবে না, আমাকে লিখতে দেবে না, আমাকে প্রকাশ করতে দেবে না–এটি কখনো কি মারুফ হতে পারে? এটি তো মুনকার। একটি নারীর লেখার ক্ষমতা আছে তাকে লিখতে দেবে না, বক্তৃতার ক্ষমতা আছে বক্তৃতা দিতে দেবে না, সাংগঠনিক যোগ্যতা আছে, সমাজসেবার যোগ্যতা আছে তাকে তা করতে দেবে না, আমি এগুলোকে বলবো মুনকার। নারীরা তা মানতে বাধ্য নয় বলে আমি মনে করি।

**প্রশ্ন :** সেক্ষেত্রে তো সামাজিক বিপর্যয়ও দেখা দিতে পারে?

**উত্তর :** প্রাথমিকভাবে সকল বড় বিপ্লবের শুরুতে কিছু বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এটিকে Teething trouble বলে। এগুলো হবে, কিছু লোক ভয় পেয়ে যাবে।



www.pathagar.com

কিন্তু পিছনো ঠিক হবে না। সমস্যা না হলে ভালো। কিন্তু সেটি হলেও আমাদের মানতে হবে যে বড় অর্জনের জন্য ছোট অসুবিধাকে মেনে নিতে হবে।

**প্রশ্ন : ইসলামিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন দল গঠনের অবকাশ আছে কি না?**

**উত্তর :** ইসলামের শুরুতে কতগুলো গ্রুপের আবির্ভাব ঘটে। তাকে আধুনিক পরিভাষায় দল বলা যায়। প্রথম দিকে সবাই একই ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে আলী (রা.) সমর্থকদের একটি গ্রুপ হয়। এরপর এক পর্যায়ে খারিজীদের উদ্ভব হয়। তাদের কেউ ব্যান্ড করার কথা বলেনি। খারিজীরা ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চরমপন্থী ছিল। তারা ভায়োলেন্সে বিশ্বাস করতো। তবে তাদের মূলত একটি পার্টি হিসেবে আবির্ভাব হয়। তাদের সম্পর্কে হযরত আলী (রা.) বলেছেন, তারা যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো ভায়োলেন্স না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাদের উপর কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করবো না। এরপর বনি উমাইয়ার শাসন কায়েম হলো। তখন আব্বাসী আন্দোলনের মাধ্যমে আব্বাসীয়রা একদিকে তার বিরুদ্ধে রিভল্ট করলো। তারা একটি দল আকারে আবির্ভূত হয়ে বললো খিলাফত আমাদের। আমরা খিলাফত পাওয়ার অধিকারী। বর্তমান প্রশ্নের এটি একটি দিক।

দ্বিতীয় দিক হচ্ছে, ইসলাম ঠিকই ঐক্যের কথা বলেছে। কিন্তু ঐক্য মানে এ নয় যে সকল মুসলমানকে একটি পরিবার হয়ে যেতে হবে–বিভিন্ন পরিবার হতে পারবে না। এর মানে এও নয় যে বিভিন্ন ইসলামী রাষ্ট্র হতে পারবে না। আমরা বাস্তবে বিভিন্ন ইসলামিক রাষ্ট্রকে হিকমাহ বা পারস্পরিক ঐকমত্য বা সম্মতির ভিত্তিতে মেনে নিয়েছি। এমনকি আমরা জানি ইসলামের প্রাথমিক যুগে বিভিন্ন রাষ্ট্র ছিল। একদিকে ছিল আব্বাসীয় খিলাফত। অন্যদিকে উমাইয়ার কিছু লোক পালিয়ে গিয়ে স্পেনে খিলাফত কায়েম করলো। কায়রোতে ফাতেমী খিলাফত ছিল। এ চিত্র বাস্তবে ছিল। আজকে আমাদের একটি ওআইসি আছে। বিশ্বের সকল মুসলিম দেশ এর সদস্য। তারাও রাষ্ট্রের ধারণাকে মেনে নিয়েছে। এটি হলো এ প্রশ্নের উত্তরের দ্বিতীয় কথা। অর্থাৎ ঐক্য মানে এ নয় যে, সব এক পরিবার হয়ে যেতে হবে, এক রাষ্ট্র হয়ে যেতে হবে।

তেমনি আমরা বলতে পারি না যে, যে সমস্ত মাজহাব রয়েছে তাদের সবগুলোকে এক হয়ে যেতে হবে বা আইনের ক্ষেত্রে একটি মতের অনুসারী হতে হবে। আমরা দেখেছি যে, আইনের ক্ষেত্রে অনেক মত থাকলেও এর মধ্যে ৪টি মত হলো প্রধান। এর বাইরেও মাজহাব আছে, এগুলো দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে এবং টিকে গেছে। এখানেও আমরা দেখি ঐক্যের মানে এ নয় যে একটি মাজহাবই হতে হবে। আরো বলা যায়, ঐক্য মানে এ নয় যে, কখনো দুই, তিন বা চার দল হবে না। আমরা দেখি পাকিস্তান বা ইরানের সংবিধান আলেমদের দ্বারা অনুমোদিত। আবার বিভিন্ন মুসলিম দেশের জনগণের প্রত্যেকের মত প্রকাশের অধিকার আছে, প্রত্যেকের দল গঠনের অধিকার আছে। আজকে এটি প্রমাণিত হয়ে গেছে যে মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল হতে পারে। তার বড়



www.pathagar.com

প্রমাণ পাকিস্তানের এমএমএ। তারা বলেনি যে আমাদের এক হয়ে যেতে হবে। কিন্তু সেখানে আজ বিভিন্ন দল একত্রে মিলিত হয়ে ইসলামের জন্য কাজ করছে। কাজেই বলা যায়, ইসলামে যে একটিই দল হতে হবে সে ধারণাটি কল্পিত ও আরোপিত। ইসলামের মূলনীতি হচ্ছে পণ্য এবং পদ্ধতির ব্যাপারে যা কিছু হারাম নয় তা-ই হালাল। সুতরাং এ পদ্ধতি আল্লাহতায়ালা হারাম করেননি। আল্লাহতায়ালা কখনো বলেননি, তোমাদের একটিই দল করতে হবে। তবে উম্মাহ্ এক। উম্মাহর মধ্যে অসংখ্য সংগঠন আছে, মতামত আছে।

সার্বিক বিবেচনায় অসংখ্য দল হওয়ার মধ্যে আমি কোনো নীতিগত বাধা বা আপত্তি তাত্ত্বিকভাবে, ঐতিহাসিকভাবে এবং বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি না। ঐক্যের ব্যাপারে আল্লাহ বলছেন, তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধর। সেখানে কুরআন ও হাদিসের কথা বলা হয়েছে। এটিই ঐক্য। ইসলাম অবশ্যই ঐক্য চায়। আর ঐক্য মানে এ নয় যে সবাইকে এক দল হয়ে যেতে হবে, এক মত হয়ে যেতে হবে। আগেও বলেছি এ ঐক্য সত্ত্বেও বিভিন্ন মাজহাব হয়েছে এবং একে অপরকে মেনেও নিয়েছে। তারা গবেষণার মাধ্যমে বিভিন্ন ফলে (result) পৌঁছানোকে প্রাণের লক্ষণ বলে মনে করছেন। এটি জীবনের লক্ষণ। এটি আমাদের সুষ্ঠু চেতনার লক্ষণ। এটি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়নের লক্ষণ।

**প্রশ্ন :** অর্থাৎ ইসলাম বহু দলে বিশ্বাস করে?

**উত্তর :** অবশ্যই। এর পক্ষে আমি আরো বলতে পারি। ইসলামের বর্তমানে যে শ্রেষ্ঠ দলগুলো আছে তারা প্রত্যেকেই বহুদলীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে। জামায়াতে ইসলামী কখনোই তার মেনিফেস্টোতে বলেনি এক দল হতে হবে। তাদের গঠনতন্ত্রের কোথাও দেখি না যে তারা একদল করতে চায়। তেমনি অন্যান্য ইসলামী দলগুলোও এক দল করার কথা বলেনি। এটি অন্যান্য দেশের ইসলামী দলগুলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। মানবাধিকারের ব্যাপারে যত বই আছে এবং যারাই মানবাধিকারের উপর বই লিখেছেন তারাই বলছেন ইসলামে দল গঠনের অধিকার আছে, মত প্রকাশের স্বাধীনতার কথা আছে। মত প্রকাশের কথাই তো দল। রশিদ ঘানুসী একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ, যাকে এ যুগের ইকবাল বলা হয়, তিনি বহুদলীয় গণতন্ত্রকে অবশ্যই মেনে নেয়ার কথা বলেছেন। হতে পারে আনাচে-কানাচে থেকে কিছু লোক অনেক রকম কথা বলে। কিন্তু যারা চিন্তাবিদ নয় তাদের কথা বাস্তবে গুরুত্ব পাওয়া উচিত নয়।

**প্রশ্ন :** ইসলামী রাষ্ট্রে ইসলামী আদর্শ বিরোধী দল গঠন করা কি সম্ভব?

**উত্তর :** বিষয়টির গভীরে যেয়ে আমাদেরকে ভাবতে হবে। আমরা যদি বলি পারবে না তাহলে অমুসলিমরা অন্য কোনো অমুসলিম দেশে ইসলামী দল গঠন করতে দেবে না। আবার ইসলামের কোথাও সুস্পষ্ট করে বলা নেই যে অমুসলিমরা দল গঠন করতে পারবে না। যে ইসলাম একটি রাষ্ট্রে তাদের



www.pathagar.com

রাজনীতি, সমাজ, আইন, শিক্ষা, সংস্কৃতি সহ সব ব্যাপারে ইহুদিদের স্বায়ত্তশাসন দিয়েছিল সেটি দল গঠন থেকে অনেক বড়। সেখানে আধুনিক ব্যবস্থায় আমি কোনো আপত্তিই দেখি না।

ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধানে বলা থাকবে কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কোনো আইন করা যাবে না। সেখানে অমুসলিমরা যদি মাইনরিটি হয় তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। তারা তাদের অধিকার চাইবে। তাদের উপর কোনো অন্যায় করা হলে তারা তার বিচার চাইবে। তারাও একটি এলাকায় বাস বাস করে বলে সে এলাকার উন্নয়ন দাবি করবে। তাদের শিক্ষা, সংস্কৃতির দাবি করবে। তারা ফরেন পলিসি নিয়ে কথা বলবে। এগুলো বলার অধিকার তাদের আছে। এ রাষ্ট্র তাদেরও। অমুসলিম মানেই ইসলাম বিরোধী এবং ইসলাম বিরোধী কাজ করা তাদের দায়িত্ব এটি ধরে নিলেও তারা সম্পূর্ণভাবে একটি শাসনতন্ত্রকে মেনেই কাজ করবে।

কাজেই আমরা যদি আমাদের মনকে বড় করতে পারি, আমরা যদি ইসলামের মৌলিক বিষয় বুঝতে পারি এবং খুঁটিনাটি বিষয়ের উপর জোর না দিই তাহলে আধুনিককালে অমুসলিমদের ইসলামী রাষ্ট্রে দল গঠনে আমি কোনো আপত্তি দেখি না। এটিকে সমস্যা বলেও মনে করি না। আর যারা এর বিপরীত কথা বলেন তাদেরকে মনে রাখতে হবে তাহলে অমুসলিম রাষ্ট্রও মুসলিমদেরকে সে অধিকার নাও দিতে পারে। আপনি যা করবেন, আপনার উপরও তা আসবে।

**প্রশ্ন :** ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অবস্থা কেমন হবে সে সম্পর্কে আরেকটু বিস্তারিত জানতে চাচ্ছি।

**উত্তর :** আমি অনেকবার বলেছি ইহুদিদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা.) সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিয়ে দিয়েছিলেন। এটি অলমোস্ট রাষ্ট্রের ভেতর রাষ্ট্র–এতোটাই স্বাধীন। এটিও হতে পারে অথবা আধুনিক পদ্ধতিতে হতে পারে। যে কোনো বিকল্পই গ্রহণযোগ্য। আধুনিক পদ্ধতির মত হচ্ছে একটি সংবিধান হবে–তাতে বলে দেয়া হবে কার কি অধিকার। এদিকে ওআইসি তার মানবাধিকার ঘোষণায় সকল নাগরিকের অধিকারের কথা বলে দিয়েছে। সেটি সকলেই ভোগ করবে। এখন প্রশ্ন হলো তারা পলিটিক্যাল কোন কোন পোস্টে যেতে পারবে? এটি খুবই ছোট বিতর্ক। ইন্দোনেশিয়ার সংবিধানে দেখি একজন অমুসলিমও সে দেশের প্রেসিডেন্ট হতে পারেন। পাকিস্তানে ইসলামিক সংবিধান হওয়ার পরও আমরা দেখেছি পাকিস্তানের স্পিকার ছিলেন নন-মুসলিম। প্রেসিডেন্ট দেশের বাইরে গেলে ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে স্পিকারই দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আজকের রাষ্ট্র প্রধান খলিফার পদের সমতুল্য কি না? আমি মনে করি, তা নয়। কেননা খলিফা অনেক ক্ষমতার অধিকারী। তিনি বিচার ক্ষমতা, মিলিটারি ক্ষমতা, রাজনৈতিক



www.pathagar.com

ক্ষমতা, নির্বাহী ক্ষমতা ভোগ করতেন। সেখানে আজকের যুগের ব্যবস্থা অনেক ভিন্ন। এটি সে যুগের খলিফার সমতুল্য নয়।

প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার কাজ করতে হবে সংবিধানের মধ্যেই। কেউ অসাংবিধানিক কাজ করলে তার অধীনের লোকজনই তো তাকে মানবে না। রাষ্ট্র যেহেতু সংবিধানের উপরই ভিত্তি করে থাকে, পার্লামেন্টে যে আইন পাস হবে তা মুসলিম-অমুসলিম যে-ই প্রেসিডেন্ট হোন না কেন তাকে তাতেই সই করতে হবে। আবার কেবিনেটের ভূমিকাও অনেক। আগে সংবিধান লিখিত ছিল না। সবকিছু অস্পষ্ট ছিল, স্বচ্ছ ছিল না। বর্তমানকালে সংবিধানে সবই বলা থাকে। কার কি কাজ তা সবাই জানে। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে যখন আমরা সংবিধান তৈরি করি তখন সবকিছুই স্বচ্ছ ও স্পষ্ট হয়ে যায়। এর মধ্য থেকে কেউ সহজে অন্যায় করতে পারে না। সে যুগে খলিফাদের ক্ষমতা অনেকটা ব্যাপক ছিল। কিন্তু আজকের যুগে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে আইন ও সংবিধান দ্বারা লিখিত হওয়ার কারণে সীমাবদ্ধ। এ রকম চেকস এ্যান্ড ব্যালেন্সের মধ্যে আমি মনে করি একজন অমুসলিম প্রেসিডেন্ট হলে তিনি দেশের কিছুই ক্ষতি করতে পারবেন না। অবশ্য মুসলিম দেশে অমুসলিম প্রেসিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

কাজেই আমি মনে করি যারা অতি থিওরিটিক্যাল তারা ইসলামের ক্ষতি করবে। তারা ইসলামের মূল স্পিরিটকে হারাবে। তারা ছোটখাট বিষয়কে ফাইন টিউনিং করতে গিয়ে আসল বিষয়কে হারিয়ে ফেলবে। এটি হিকমার খেলাপ। এটি পরিস্থিতি মুল্যায়নের ব্যর্থতা হবে। ইসলাম আমাদের সকল পরিবর্তিত পরিস্থিতির মূল্যায়ন করতে শিখিয়েছে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : আহমদ হোসেন মানিক ও ওমর বিশ্বাস
প্রকাশকাল : প্রয়াস, প্রথম সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০০৪



www.pathagar.com

# তৌহিদই আমাদের সংস্কৃতির মূল ভিত্তি

**প্রশ্ন :** বাংলাদেশের বর্তমান সাংস্কৃতিক ধারাকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করবেন?

**উত্তর :** সংস্কৃতি একটি জাতির পরিচয় বহন করে। সংস্কৃতির সংজ্ঞা নিয়ে নানা বিতর্ক থাকলেও মানুষের সামগ্রিক জীবনাচারকেই আমরা সংস্কৃতি হিসেবে বুঝে থাকি। বাংলাদেশের বর্তমান সংস্কৃতির মধ্যে বিভিন্ন ট্রেন্ড রয়েছে। একটি হচ্ছে আবহমান কাল ধরে চলে আসা সংস্কৃতি। এখানে মুসলমানরা যখন আসে এ আবহমান সংস্কৃতিই দু'ভাগ হয়ে যায়। এক ভাগে হিন্দুরা আবহমান সংস্কৃতিকেই মোটামুটি ধরে রাখে। আরেকটিতে মুসলমানরা তাদের মতো করে আবহমান সংস্কৃতিকে বহন করলো। কারণ মুসলমানগণ প্রধানত এ এলাকারই মানুষ ছিল। সেখানে মুসলমানরা আবহমান সংস্কৃতির যেটুকু ধরে রাখার ধরে রাখলো; আর ইসলামের আলোকে, তৌহিদের আলোকে যেটুকু ছেড়ে দেবার ছেড়ে দিল। তাহলে আমরা সংস্কৃতিতে দু'টি ধারা পেলাম। একটি আবহমান সংস্কৃতি যা মূলত হিন্দুদের মধ্যে থেকে যায় এবং অন্যটি আবহমান উপাদানের সাথে কিছু যোগ-বিয়োগ করে পরিণত হওয়া মুসলিম সংস্কৃতি। এখানে এ কথাও বলা দরকার যে মুসলিম সংস্কৃতি প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ হচ্ছে। ইসলামের ভেতর রিফর্মের একটি আন্দোলন আছে–তা মুরুনা বিল মারুফ, নেহি আনিল মুনকার-এর মাধ্যমে। মুসলিম সংস্কৃতিকে ক্রমাগতভাবে বিশ্লেষণ করে তাকে ইসলামের নিকটবর্তী করা বা খাঁটি করার ভেতরগত একটি আন্দোলন সবসময় আছে অর্থাৎ মুসলিম সংস্কৃতি আমাদের দেশে ক্রমাগতভাবে রিফাইন্ড হয়ে ইসলামের নিকটতর হচ্ছে। বিগত দেড়শ-দুইশ বছর ধরে আমাদের দেশে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটে তৃতীয় আরেকটি ধারার সৃষ্টি হয়েছে। এর প্রভাব আমাদের বিভিন্ন সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, ভাষায় পড়েছে। ফলে আমাদের সংস্কৃতি পাশ্চাত্য দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়েছে।

অন্যদিকে আমাদের দেশে সাংস্কৃতিক সংঘাত রয়েছে। এ সংঘাত আদর্শিক; এ সংঘাত ইসলামের সাথে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির। আবার ইসলামি সংস্কৃতি ও হিন্দু সংস্কৃতির মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব আছে। এ দ্বন্দ্বকে সংঘাতে পরিণত করার দরকার নেই। ইসলামের লক্ষ্য হচ্ছে তার নিজের সংস্কৃতিকে রক্ষা করা। কিন্তু যে সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব আমাদের রয়েছে তার ভেতর রাজনীতি বড় আকারে প্রবেশ করছে। যেমন, যারা



www.pathagar.com

ইসলামের বিরুদ্ধে সরাসরি না দাঁড়িয়ে প্রাচীন বাংলার সংস্কৃতির স্লোগান তোলেন তারা আসলে ওটারও তেমন সমর্থক নন। কিন্তু ইসলামের বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর জন্য তারা এটিকে ব্যবহার করে থাকেন। প্রয়োজনে পশ্চিমা মূল্যবোধকে দাঁড় করান। এর মাধ্যমে সরাসরি না করে তারা ঘুরিয়ে ইসলামের বিরোধিতা করে থাকেন। এ সংঘাত আমাদের দেশে রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটি কোনোভাবেই তাদের ভালো কাজ নয়। বাংলাদেশের ৯০ ভাগ মুসলিম তাদের সংস্কৃতিকে ইসলামের আলোকে গড়ে তুলবে বা বিচার করবে এটি খুবই স্বাভাবিক কথা। এতে তাদের কষ্ট পাওয়ার কিছু নেই। তারাও তো নামে মুসলিম। আদতে যদি ইসলামের সংস্কৃতি খারাপ কিছু হতো তাহলে এক কথা, কিন্তু তা তো সত্য নয়। প্রকৃতপক্ষে ইসলামি সংস্কৃতি হচ্ছে সত্য, শ্লীল। এর আসল সত্য হচ্ছে এটি তৌহিদের প্রতিনিধিত্ব করে। এটি এক আল্লাহর দুনিয়া তার সঙ্গে শিরককে না মেশানোয় বিশ্বাস করে। এর মূল্য লক্ষ্য হচ্ছে শ্লীলতা। অশ্লীলতাকে পরিহার করা। এটি তো মানুষের জন্য সবচেয়ে কল্যাণকর এবং এতে ক্ষতিকর কিছু নেই। আবার এ সংস্কৃতি নাস্তিকতাকে বাতিল করে দেয়। এটিও সঠিক যে নাস্তিকতা কোনো ভালো মানুষ তৈরি করে না। নাস্তিকতা হচ্ছে আল্লাহর উপর বিশ্বাস না থাকা। মানুষ দায়িত্বজ্ঞানহীন নয়। বেশিরভাগ মানুষ 'যা ইচ্ছা করি' মনোভাব পোষণ করে না। সুতরাং যে-সমস্ত ইন্টেলেকচুয়ালরা ইসলামের মূল সংস্কৃতির বিরোধিতা করে তারা সঠিক পথে আছে বলে আমি মনে করি না।

সংস্কৃতি সম্পর্কে সার্বিক কৌশলের প্রশ্নে আমি বলবো সংস্কৃতি অত্যন্ত গভীর একটি ব্যাপার। সংস্কৃতিকে আমি সবসময় বলি এটি আইনের চেয়ে গভীর। একটি সংস্কৃতিকে, এমনকি তার কিছু অংশকেও বদলে ফেলা যুগ-যুগের ব্যাপার। এটি আমাদের সবাইকে বুঝতে হবে। সংস্কৃতি একটি সেনসিটিভ বিষয়। সেজন্য সংস্কৃতি নিয়ে কথাবার্তা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা সবই সাবধানে করতে হয়। যেমন আমরা ১৯৫২-তে দেখেছি ভাষার ব্যাপারটি কত সেনসিটিভ হয়ে গিয়েছিল এবং মুসলিম লিগের ব্যর্থতার পেছনে ছিল এ সেনসিটিভিটিকে বুঝতে ব্যর্থ হওয়া। তারা একটি ভুলের কারণে ক্ষমতা হারালো। তারা লোক হিসেবে কোনো অংশে খারাপ ও অযোগ্য লোক ছিল না। তাদের ভেতর দেশপ্রেমও ছিল। কিন্তু যে কোনো কারণে তারা ভাষা ও সংস্কৃতির স্পর্শকাতরতা বুঝতে ব্যর্থ হলো।

মাত্র কয়েকদিন আগের কথা। এবারের বাজেটে পর্যটন শিল্পের বিকাশের জন্য মদের উপর থেকে ট্যাক্স কমানো হলো। কিন্তু একদিনের মধ্যে জাতি এমনভাবে বিস্ফোরিত হলো যে সরকার দু'দিনের মাথায় সিদ্ধান্ত বদলাতে বাধ্য হলেন এবং দ্রুত এ সিদ্ধান্ত বাতিল করে বুদ্ধিমানের পরিচয় দিলেন। প্রকৃতপক্ষে তারা সেনসিটিভিটিকে বুঝতে পেরেছিলেন। ধর্ম যদি সংস্কৃতির অংশ হয় বা সংস্কৃতি যদি ধর্মের অংশ হয়, যেভাবেই আমরা দেখি না কেন, সংস্কৃতির কিছু স্পর্শকাতর বিষয় আছে যেগুলো সরাসরি ধর্মের সাথে সম্পর্কিত এবং সম্পৃক্ত। সেগুলো সবাইকে সাবধানে বুঝতে হবে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন দরকার



www.pathagar.com

মনে হলে তা খুব ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে হবে। খুব দ্রুত তা করা যাবে না। যেটিতে সরকার সহজে জড়াবে না সেটিতে বুদ্ধিজীবীরা মতামত সৃষ্টি করবে। যখন দেখা যাবে বেশিরভাগ মানুষ সে মতামতের দিকে ঝুঁকে পড়ছে তখনই তার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে। এটি অনেকটা পলিথিন ব্যাগ তোলার মতো। কিংবা সবাই যেমন তিন স্ট্রোকবিশিষ্ট ইঞ্জিন রাজপথে রাখা সম্ভব নয় বলে একমত হয়েছে বিষয়টি অনেকটা সেরকম। তেমনিভাবে সাংস্কৃতিক বিষয়ের স্পর্শকাতরতাকে সব সাংস্কৃতিক কর্মী, ডেমোক্রেটকে বুঝতে হবে যে, এসব বিষয়ে জোর করে দ্রুত কোনো কিছু করা সম্ভব নয়।

**প্রশ্ন :** আমাদের দেশে তো বাংলাদেশী সংস্কৃতি ও বাঙালি সংস্কৃতির নামে একটি বিতর্ক আছে।

**উত্তর :** এটি ভাষাগত বিতর্ক। ইংরেজিতে ভাষাগত বিতর্ককে সেমানটিক বলে। কোনটা শুদ্ধ, কোনটা অশুদ্ধ এ নিয়ে তর্ক হতেই পারে। যেমন আমাদের জাতীয়তা বাংলাদেশী না বাঙালি? এ নিয়ে টেকনিক্যালি বিতর্ক চলতে পারে। কিন্তু এ বিতর্ক যারা করছেন উভয়ের কাছেই আমরা দেখি রাজনীতিই প্রধান। যদি আমি দেশভিত্তিক জাতীয়তার কথা বলি তাহলে আমাদের জাতীয়তা বাংলাদেশী হওয়া উচিত বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি। কিন্তু এটি নিয়ে লড়াই করতে আমি পছন্দ করি না। এ বিতর্কের অর্থ হচ্ছে মূল কাজ বাদ দিয়ে অপ্রয়োজনীয় কাজে জড়িয়ে পড়া। তেমনি বাংলাদেশী সংস্কৃতি আর বাঙালি সংস্কৃতির মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে বলে আমি মনে করি না। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মানুষকে বাঙালি বা বাংলাদেশী যা-ই বলা হোক না কেন তাদের মূল সংস্কৃতির উপাদান তো হচ্ছে একটিই। এটিতে তো কোনো পার্থক্য হচ্ছে না। বাঙালি সংস্কৃতি মানে মুসলিম প্রভাবমুক্ত, পাশ্চাত্য প্রভাবমুক্ত প্রাচীন বাঙালি সংস্কৃতি—এ রকম ব্যাখ্যা যদি কেউ দেয় তাহলেই কেবলমাত্র সে অর্থে বাঙালি সংস্কৃতি আর বাংলাদেশী সংস্কৃতি আলাদা হয়ে যাবে। আবার বাঙালি সংস্কৃতি বলতে যদি সব বাংলাভাষীর সংস্কৃতি, সে যে দেশের বাসিন্দাই হোক এবং বাংলাদেশী সংস্কৃতির মানে যদি হয় বাংলাদেশী এলাকার লোকদের সংস্কৃতি তাহলেও পার্থক্য হবে। তবে তারা যদি বাংলাদেশী ও বাঙালি সংস্কৃতি বলতে বাংলাদেশের ভেতরের সংস্কৃতিকে বুঝায় তাহলে এর ভেতর প্রকৃতপক্ষেই আমি কোনো পার্থক্য দেখি না। এটি শুধু সেমানটিকসের ঝগড়া—ভাষাগত ঝগড়া। সেক্ষেত্রে আমি মনে করি একে বাংলাদেশী সংস্কৃতি বলাই ভালো এ অর্থে যে এটি এ এলাকার লোকদের সংস্কৃতি। যেমন আমরা আমেরিকার সংস্কৃতির কথা বলে আমেরিকার লোকদের সংস্কৃতিকে বুঝে থাকি।

আমি মনে করি যারা সচেতন সমাজকর্মী, সাহিত্যসেবী, বুদ্ধিজীবী, সচেতন মুসলিম তাদেরকে এসব অহেতুক বিতর্ক থেকে জাতিকে উদ্ধার করা উচিত। আমরা নিজেরাও এসব বিতর্কে যেন অহেতুক না জড়িয়ে পড়ি। যদি আমাদের



www.pathagar.com

সংস্কৃতিতে কোনো আপত্তিকর কিছু থাকে তাহলে তা আস্তে আস্তে সংস্কার করতে হবে। সেটি ভিন্ন ব্যাপার। কিন্তু এর বাইরে গিয়ে অহেতুক বিতর্কে জড়ালে কোনো কাজ হবে বলে আমার মনে হয় না।

**প্রশ্ন :** কিন্তু এ বিতর্কে আমরা কেন বারবার জড়িয়ে পড়ছি?

**উত্তর :** আমার মনে হয় কিছু লোক এটি করছে এজন্য যে বিতর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে জাতিকে বিভক্ত করলে তাদের সুবিধা হয়। অথবা যারা বোকা, যারা মনে করে এসব বিতর্ক করাই জাতির স্বার্থ–তারাও এটি করতে পারে। এটি বোকাদেরও কাজ হতে পারে অথবা ধূর্তদেরও কাজ হতে পারে যারা জাতিকে ভাগ করে রাখতে চায়। যেহেতু এ রকম বিতর্ক চলছে–আমার মনে হয় এর পেছনে কোনো না কোনো ধরনের শয়তানী বুদ্ধি কাজ করছে। বাংলাদেশকে কারা ভাগ করে রাখতে চায় সেটিও আমাদের এখানে ভাবতে হবে। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের কিছু লোকও ভাবতে পারে আমাদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করে রাখাই ভালো, যতভাবে আমাদেরকে সমস্যায় রাখা যায়–সেটিও হতে পারে। যেমন অতীতে গ্রামদেশে কেউ যদি অন্যের ক্ষতি করতে চাইতো তাহলে তারা সে পরিবারের মধ্যে নানারকম ঝগড়া লাগিয়ে দিতো, নয়তো মামলায় জড়াতো।

**প্রশ্ন :** সংস্কৃতির স্পর্শকাতরতার প্রশ্নে ধর্মের অবস্থান ব্যাখ্যা করবেন কি?

**উত্তর :** মুসলিম বিশ্ব সহ বিশ্বের সবাইকে জানতে হবে ধর্ম খুবই সেনসিটিভ বিষয়। এজন্য অহেতুক ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করাটা সঠিক নয়। এর সাম্প্রতিক উদাহরণে আমি আগেই মদের কথা উল্লেখ করেছি। আমাদের ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে সংস্কৃতিও একই রকম সেনসিটিভ। কাজেই যে কোনো দেশের জন্যই ভাষা, সংস্কৃতিকে সেনসিটিভভাবেই গ্রহণ করতে হবে। এর বড় প্রমাণ হলো বাংলা ভাষার সেনসিটিভিটি বুঝতে না পারার কারণে আমাদের ইতিহাসই পরিবর্তন হয়ে গেল। তাই এসব যদি পরিবর্তনের কথা ভাবা হয় তাহলে তাতে খুবই চিন্তার অবকাশ থাকে এবং এজন্য অনেক লম্বা সময় প্রয়োজন। ইসলামপন্থীদের জন্য ভালো হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব এগুলোর সাথে সমন্বয় করার চেষ্টা করা, পরিবর্তন করতে হলে সেটি পরিকল্পিতভাবে, জনগণের পূর্ণ মেন্ডেট নিয়ে করা। সংস্কৃতির স্পর্শকাতর বিষয়গুলোতে মেন্ডেট না নিয়ে কিছু করা যাবে না।

**প্রশ্ন :** সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মাধ্যমে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের বিশ্বাস ও মূল্যবোধে আঘাত করতে দেখা যায়। আমরা একে কিভাবে মোকাবিলা করতে পারি?

**উত্তর :** আমাদের সবচেয়ে গভীর জিনিস কোনটি? বিশ্বাস। মানুষ যদি গভীরভাবে কোনো জিনিস বিশ্বাস করে তাহলে সে সেভাবেই কাজ করবে।



www.pathagar.com

কারণ মানুষের কাজ নির্গত হয় তার বিশ্বাস থেকে। অর্থাৎ বিশ্বাসের ভিত্তিতেই কাজ হয়। এজন্য আমাদের মূল কাজ হচ্ছে কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান ছড়িয়ে দেয়া। এটিকে আরো সংক্ষেপ করে বলবো, তৌহিদের জ্ঞান ছড়িয়ে দেয়া। ইসলামের মূল পিলার হচ্ছে তৌহিদ–লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আর গোটা কুরআন এর ব্যাখ্যা। এজন্য আমাদের খুব সুন্দরভাবে মানবজাতিকে তৌহিদ বোঝাতে হবে, গভীরভাবে তৌহিদ ও শিরকের পার্থক্য বোঝাতে হবে। আমরা যদি আমাদের ৯০ ভাগ মুসলমানের মনে তৌহিদের উপলব্ধি পুরোপুরি বোঝাতে পারি তাহলে ইসলাম বিরোধী সকল উপাদান আমাদের কালচার তথা মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোর কালচার থেকে চলে যাবে।

আর আগ্রাসন শব্দটিকে ঠিকই ধরা হয়েছে। এক গ্রুপ পাশ্চাত্য থেকে সংস্কৃতি আমদানিকে নিজেদের সমৃদ্ধির জন্য সঠিক ভাবতে পারে। কিন্তু সে ধারণা ঠিক নয়। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ আমাদের জন্য আগ্রাসন। আমরা মুসলিম এবং ইসলামে বিশ্বাসী বলে এর বিপরীত কোনো জিনিস আমাদের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। আমরা ইসলাম ও তৌহিদ বিরোধী এবং শিরক মনোভাবসম্পন্ন কোনো জিনিসকে আমাদের কালচারে আসতে দিতে পারি না। এটিকে যদি আগ্রাসন না-ও বলি তবুও এর মোকাবিলার দায়িত্ব আমাদের। এটি মোকাবিলা বা প্রতিরোধ করার জন্য সরকারের যেসব ব্যবস্থা নেয়া দরকার তা নেয়া উচিত। জনগণকে এ ব্যাপারে কাজ করা উচিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইসলামের চেতনা বৃদ্ধি না করে এটি কখনো করা সম্ভব নয়। মানুষ যদি অসচেতন হয় তাহলে একটি বন্ধ ঘরের সব দরজা জানালা খুলে দিলে বাতাস যেমন হুহু করে ঢুকে পড়ে–আমাদের সংস্কৃতিতেও তেমনি নানাজাতীয় উপাদান ঢুকে পড়বে। কিন্তু আমাদের ঘর যদি বাতাসে ভরা থাকে তাহলে সেটি হবে না। অথবা যদি এভাবে বলি–আমরা যদি ইসলামের জ্ঞানে জ্ঞানী হই, ইসলামের সত্য, ইসলামের সৌন্দর্য, মহত্ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে যদি আমরা সচেতন হই বা সচেতনতা বাড়াই তাহলে আমি মনে করি পাশ্চাত্য কালচার আমাদের কিছু করতে পারবে না।

ইসলাম অত্যন্ত শক্তিশালী একটি বিষয়। ইসলামের আধ্যাত্মিক উপাদান খুব মজবুত। এর মধ্যে এমন সব উপাদান ও নীতিমালা রয়েছে যা মানবজাতিকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে, বড় করতে পারে। এটি এমন একটি জিনিস, যে কোনো ছোটখাটো আক্রমণাত্মক বা অপসাংস্কৃতিক বিষয়কে বাহ্যিকভাবে বড় বলে মনে হলেও তা আসলে এর কিছুই করতে পারবে না। ইসলামের পতনের যুগেই তো পূর্ব এশিয়ার মালয়েশিয়ায়, ইন্দোনেশিয়ায় ইসলামের জোয়ার এসেছে। তাই আমাদের ভয় পাবার কিছু নেই। কারণ ইসলামকে নির্মূল করতে ক্রুসেডাররা পারেনি। এতো বড় ইনভেশন দুনিয়াতে কখনো হয়নি যা চেঙ্গিস খান করেছিল। সেই চেঙ্গিস খান ইসলামের কিছুই করতে পারেনি–উল্টো ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এমনকি প্যালেস্টাইন দখল করেও তা তারা হাতে



www.pathagar.com

রাখতে পারেনি। দেড়শ' বছরের ইম্পেরিয়ালিজমের আক্রমণের নির্মমতাও ইসলামকে শেষ করতে পারেনি।

তাই আমি মুসলিম বিশ্বকে বলতে চাই, ইসলাম ইজ সো স্ট্রং, সো গ্রেট–একে কেউ কিছু করতে পারবে না। এজন্য আল্লাহ শুধু একটি জিনিস আমাদের কাছে চান তা হলো আমরা যেন আমাদের কাজ করে যাই। তাই আমরা যদি তৌহিদের জাগরণ ঘটাতে পারি তাহলে ইনশাআল্লাহুতায়ালা, ইসলামী কালচারের বিরুদ্ধে কিছুই করা সম্ভব নয়। এভাবে যদি আমরা চেষ্টা করি তাহলে ইসলাম বিরোধী কালচার তো আসতেই পারবে না, কুসংস্কারও থাকবে না।

**প্রশ্ন :** আমাদের সংস্কৃতির মূল ভিত্তি হিসেবে কি তৌহিদকে গ্রহণ করতে হবে?

**উত্তর :** আমার তা-ই মনে হয়। তৌহিদ ইসলামের সবকিছুরই মূল। আমাদের লেখক, কবিরা যদি তৌহিদ বোঝে তাহলে তাদের ইসলাম সম্পর্কে আর কিছু বলতে হবে না। তাদের লেখা অটোমেটিক ইসলামিক হয়ে যাবে।

**প্রশ্ন :** এদেশের মানুষের সংস্কৃতির মূল উপাদান হচ্ছে ধর্ম। কিন্তু আমাদের বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমে ধর্মকে দূরে সরিয়ে রাখার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এটি কেন?

**উত্তর :** এর কারণ বিভিন্ন। মিডিয়ায় যারা কাজ করছেন তারা আমাদের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছেন। তারা যে শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে এগিয়েছেন সে শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামকে বড় করে দেখানো হয়নি। ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব, ব্যাপ্তি বা ব্যাপকতাকে দেখানো হয়নি। তারা ইসলামকে সাধারণ একটি ধর্মই জেনে এসেছে। তা-ই শুধু নয়, তারা একটি নেগেটিভ আইডিয়া নিয়েই এগিয়েছে। এটি একটি বড় কারণ–যে কারণে ইসলামকে তারা পজেটিভভাবে নিতে পারতেন, তা নিতে পারছেন না। দ্বিতীয়ত, আমাদের বিগত ৫০ বছরের রাজনীতিতে সেকুলারিজমের অনুসরণ করা হয়েছে। পাকিস্তান আমলে ইসলামিক রিপাবলিক ছিল। কিন্তু সে আলোকে আইন, শিক্ষাব্যবস্থা তৈরি হয়নি। তার ফলে যেসব লোক তৈরি হয়েছে তারা ইসলামীমনা হয়ে গড়ে ওঠেনি।

মিডিয়ার বেশিরভাগ লোকই যদি ইসলামিক মাইন্ডের হয় তাহলে মিডিয়ার বিষয়ও ইসলামের আলোকে হয়ে যাবে। এটি করার উপায় হচ্ছে–যারা ইসলামী মুভমেন্ট করেন, যারা ইসলাম নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন তাদের দায়িত্বই হচ্ছে বেশি বেশি লোক তৈরি করা। এটি সকল ক্ষেত্রের জন্যই প্রযোজ্য। এ ছাড়া এর কোনো সত্যিকার সমাধান নেই। যারা এখন আছেন তাদের ভেতর পরিবর্তন করা কঠিন। বর্তমান অবস্থায় ১০/১৫ ভাগ পরিবর্তন হতে পারে মাত্র। এটি চেষ্টার মাধ্যমে করা সম্ভব। তবে এসমস্ত বয়স্ক লোককে ইসলামিক করা সহজ কথা নয়। তারা বিশ্বাসে হয়তো মুসলিম থাকবে, অনেকে নামাজও পড়বে কিন্তু যাকে আমরা ইসলামাইজেশন বলি–ইসলামকে আত্মস্থ করা, সেটি তাদের জন্য



www.pathagar.com

খুব কঠিন ব্যাপার। সেটি এ বয়সে আর সম্ভব হয় না। এসব গভীর বিষয় ইসলামিক মুভমেন্টকে বুঝতে হবে। আমাদেরকে নতুন লোক তৈরি করতে হবে। শুধু রাজনৈতিক কর্মী তৈরি করলেই হবে না। অসংখ্য সাংস্কৃতিক কর্মী, প্রিন্ট মিডিয়ার কর্মী, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার কর্মী, শিক্ষক, খেলাধুলার লোক তৈরি করতে হবে। ভালো ছবি বানাতে ফিল্মের জন্য লোক তৈরি করতে হবে। অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রেই আমাদের লোক তৈরি করতে হবে। আর লোক তৈরি না করে আমাদের মুক্তি নেই। প্রসঙ্গত বলতে হয়, আমাদের দেশে সেকুলারিজম পঞ্চাশ দশকের প্রথম দিকে শুরু হয়ে আশির দশক পর্যন্ত বাড়তে থাকে। কিন্তু এরপর থেকে সে সংখ্যা কমে আসে। বর্তমানে ইসলামের কাজের অবস্থা ভালো। কাজেই আমরা যদি সেভাবে কাজ করতে পারি, বাকিটুকুও করা সম্ভব।

**প্রশ্ন :** চলচ্চিত্র একটি প্রভাবশালী মিডিয়া। চলচ্চিত্র বিনোদনের একটি বড় মাধ্যমও। কিন্তু এটি আজ অশ্লীলতায় পূর্ণ। এর থেকে উত্তরণের উপায় কি?

**উত্তর :** এর থেকে উত্তরণ খুব কঠিন। তবে আমার মনে হয় আমাদের একটি অল্টারনেটিভ দিতে হবে। আমি মনে করি ইসলামিস্টদের চলচ্চিত্র বিরোধী মনোভাব ত্যাগ করতে হবে এবং একে বৈধ ও প্রয়োজনীয় মিডিয়া হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। চলচ্চিত্রকে শিক্ষা, বিজ্ঞান, শিল্প, কৃষিকাজে ব্যবহার করতে হবে এবং সর্বোপরি বিনোদনের কাজে ব্যবহার করতে হবে। হিজাব কোনো সমস্যা নয়। ইরানীরা যেভাবে ছবি তৈরি করছে সেভাবে ছবি তৈরি করা সম্ভব। কো-একটিংয়ে সমস্যা নেই। কারণ এ কো-একটিং একা একা হচ্ছে না। যদিও ছবিতে আমরা দেখছি একটি ছেলে ও একটি মেয়ে কথা বলছে, আসলে তারা স্যুটিংয়ের সময় বহু মানুষের সামনে কথা বলছে। কারণ সেখানে ক্যামেরাম্যান, প্রযোজক, পরিচালক, সম্পাদক রয়েছেন; দর্শক রয়েছেন। ইসলাম যেটিকে খুলুয়া বলে, অর্থাৎ নিভৃতিতে একা থাকা–সেখানে স্যুটিংয়ের কাজ একা কিংবা গাইরে মাহরেমের মধ্যে হচ্ছে না। আবার গান অশ্লীল না হলে তা-ও থাকবে। অশ্লীলতা যুক্ত না হলে বাদ্যও কোনো সমস্যা নয়। এ মত আমার নয়। ইরানীরা এটি অনুসরণ করছে। ড. কারযাভীও এ মত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ফিল্ম, অভিনয়, গান, বাদ্য সমস্যা নয় যদি তা অশ্লীল না হয় এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিষেধাজ্ঞাকে অশ্লীলতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ধরতে হবে।

অল্টারনেটিভ দেয়ার জন্য আরো অনেক কাজ আছে। আমাদের অবশ্যই টিভি চ্যানেল লাগবে যেখানে আমরা এসব ছবি দেখাবো। যদি ইসলামী সরকার হয় তাহলে তারা বাজে চ্যানেল বন্ধ করে দেবে। এসব ক্ষেত্রে আমি কোনো সমস্যা দেখি না। আসলে সমস্যা আমাদের মনে। আমরা ইসলামের অবজেক্টিভ ঠিক বুঝতে পারছি না। ইসলামকে এগিয়ে নেয়ার জন্য সব মিডিয়া, মিনসকে ব্যবহার করতে হবে। আল্লাহতায়ালা বলেছেন, তুমি তোমার সর্বাত্মক সত্তা দিয়ে এবং সমস্ত মাল দিয়ে জিহাদ কর।



www.pathagar.com

**প্রশ্ন :** আপনি তাহলে কি এ সেক্টরে ইসলামিস্টদের বিনিয়োগ করতে বলবেন?

**উত্তর :** অবশ্যই, অবশ্যই। তাদেরকে বেশি বেশি বিনিয়োগ করা উচিত বলে আমি মনে করি।

**প্রশ্ন :** আমাদের সংস্কৃতিতে অনেক সময় কোনো কিছুকে চাপিয়ে দেয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। সংস্কৃতিকে তার স্বাভাবিক নিয়মে চলতে দেয়া উচিত, না মাঝে-মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত?

**উত্তর :** নিয়ন্ত্রণ খুব কম হবে। সাধারণভাবে ভাষা, সংস্কৃতি এগুলো নিয়ন্ত্রণমুক্ত হওয়া উচিত। এটি নির্ভর করবে পরিস্থিতির উপর। যদি একটি সুস্থ সমাজ হয় এবং সবকিছু সুস্থ থাকে তাহলে নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন উঠছে না। কিন্তু যদি দেখা যায় একটি অসুস্থ জিনিস বের হচ্ছে তাহলে সেখানে জাতির পক্ষ থেকে নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত যাতে ফ্রিডমের নামে সবকিছু না ঢুকে পড়ে, সবকিছু আজেবাজে না হয়ে যায়। সেখানে নিয়ন্ত্রণ থাকাকেই আমি সঙ্গত মনে করি। মানুষ যেন যা-তা করতে না পারে; নোংরামি, নগ্নতা, কুশ্রী জিনিস দেখাতে না পারে।

প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃতি সুন্দর হওয়ার কথা। সংস্কৃতির অন্য অর্থ হচ্ছে সুন্দরের চর্চা, সৌন্দর্যের চর্চা। সেখানে অসুন্দরকে আমরা কিভাবে গ্রহণ করতে পারি? তার জন্য একটি সীমারেখা অবশ্যই টানতে হবে। আইনের মাধ্যমে সে সীমারেখা বদলাতে জাতিকে কাজ করতে হবে। সংস্কৃতির অপব্যবহারের সম্ভাবনা আছে বলে কিছু না কিছু নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার জাতির থাকতে হবে। শুধু সংস্কৃতি কেন, কোনোকিছুই একেবারে লাগামহীনভাবে ছেড়ে দেয়া যায় না। ব্যবসাকে লাগামহীন না করে তারও উপর কতগুলো নিয়ন্ত্রণ রাখা হয়েছে-কোনটা করা যাবে, কোনটা করা যাবে না। আমাদের কোনোভাবে অশ্লীলতা, অসুন্দর, জাতিবিদ্বেষ, ধর্মবিদ্বেষ ছাড়নো উচিত নয়। কোনো ব্যক্তি বা জাতিকে আঘাত করা উচিত নয়। খেলাধুলার মতো এখানেও জাতির জন্য একটি রেফারি বা আম্পায়ার কমিটি থাকতে হবে, যারা এটি দেখাশুনা করবেন। এ কমিটি বাড়াবাড়ি না করে ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে কাজ করবেন।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : আহমদ হোসেন মানিক ও ওমর বিশ্বাস
প্রকাশকাল : প্রয়াস, প্রথম সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০০৪



www.pathagar.com

# কবি গোলাম মোস্তফা প্রকৃতপক্ষেই বাংলাদেশের গুটিকয়েক শ্রেষ্ঠ সন্তানদের একজন ছিলেন

**প্রশ্ন :** কবি গোলাম মোস্তফার সঙ্গে আপনি কিভাবে যুক্ত হলেন?

**উত্তর :** ১৯৫৮ সালে আমার মরহুম আব্বা মোস্তফা সাহেবের বাড়ির সামনের দিকে বাসা নেন। আমাদের বাসা থেকে 'মোস্তফা মঞ্জিল' বা কবি সাহেবের বাড়ি ছিল মাত্র পঁচিশ গজ দূরে। কিছুদিনের মধ্যে আমিই নিজের উদ্যোগে কবি সাহেবের সঙ্গে পরিচিত হই এবং তার একদম নিকট ব্যক্তিতে পরিণত হই। আমি প্রায় চার বছর কবি সাহেবের ব্যক্তিগত সচিবের মতো তার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। তিনি তার সকল বিষয়ে আমার সঙ্গে পরামর্শ করতেন এবং সকল দুঃখ-বেদনা আমাকে বলতেন। যদিও আমি বয়সে অনেক ছোট ছিলাম।

**প্রশ্ন :** মোস্তফা মঞ্জিল ছিল সে সময়ের প্রতিভাবানদের জমজমাট আড্ডাকেন্দ্র। এ ব্যাপারে আপনার স্মরণীয় ঘটনা আমাদের জানাবেন কি?

**উত্তর :** মোস্তফা মঞ্জিল সে সময়ে ঢাকার এককোণায় ছিল কেননা ঢাকা তখন এতো বিস্তার লাভ করেনি। মোস্তফা মঞ্জিলে ছিল অত্যন্ত সুন্দর পরিবেশ। বাড়ির সামনে বাগান ছিল; চারপাশে ভিড় ছিল না। এ পরিবেশেই সে সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বসবাস করতেন। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই সেখানে কবি-সাহিত্যিকরা আসতেন এবং তার কাছ থেকে পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা গ্রহণ করতেন। তবে স্বীকার করতেই হবে যে যারা বামপন্থী ছিলেন তারা কবিকে পছন্দ করতেন না।

**প্রশ্ন :** কবি গোলাম মোস্তফার মধ্যে সরাসরি কোনো রাজনৈতিক তৎপরতা ছিল কি?

**উত্তর :** তিনি সরাসরি কোনো রাজনৈতিক তৎপরতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। তবে তিনি ইসলামকে এবং পাকিস্তানকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন এবং যেসব দল ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী ছিল এবং পাকিস্তানকে সুদৃঢ় করতে চাইতো তিনি তাদের পক্ষে ছিলেন।

**প্রশ্ন :** বাংলাদেশে ইকবাল চর্চায় কবির ভূমিকা কতটুকু?

**উত্তর :** তিনি ইকবালের একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন এবং তার সাধনায় যাদের



www.pathagar.com

প্রভাব রয়েছে তাদের মধ্যে আল্লামা ইকবাল অন্যতম। তিনি ইকবালের কবিতা অনুবাদে হাত দিয়েছিলেন এবং বেশ কিছু সার্থক অনুবাদ করেছেন। যার মধ্যে 'বাঙ্গে দারা'র মুনাজাত কবিতাটি উল্লেখযোগ্য।

**প্রশ্ন :** কবি গোলাম মোস্তফা নিবিড় নিষ্ঠায় যেমন 'বিশ্বনবী' রচনা করেছেন, তেমনি হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গেয়েছেন, উঁচু স্তরের পিয়ানোবাদক ছিলেন। আদতে সংগীত কিংবা সংস্কৃতিতে কবির দৃষ্টিভঙ্গি কি ছিল?

**উত্তর :** তার দৃষ্টিভঙ্গি পুরোপুরি ইসলাম দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল। তিনি গান বা সংগীতের ব্যাপারে ইমাম গাজ্জালী ও রুমী যে দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েছেন তাকে গ্রহণ করেছিলেন। আজকের যুগে আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী তার বিখ্যাত 'ইসলামের হালাল ও হারামের বিধান' গ্রন্থে একই মতামত দিয়েছেন। কবি গোলাম মোস্তফা যে গান ও সংগীতের সাধনা করতেন তাকে তিনি ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ মনে করতেন।

**প্রশ্ন :** জীবনের শেষদিকে কবিকে 'আধুনিক কবিদের দল' যে তীব্র সমালোচনা শুরু করেছিল–এ ব্যাপারে কবির প্রতিক্রিয়া কি ছিল?

**উত্তর :** তিনি সকল সমালোচনাই ধৈর্যের সঙ্গে গ্রহণ করতেন। কারণ তিনি জানতেন, যে বা যারা তার সমালোচনা করছে তাদের অধিকাংশই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে সমালোচনা করছে। তাদের সমালোচনা ছিল মূলত ইসলামী আদর্শের বিরুদ্ধে; কবি গোলাম মোস্তফা উপলক্ষ ছিল মাত্র। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ঐসব সমালোচনা কোনো উন্নত বুদ্ধিবৃত্তিক সমালোচনা ছিল না।

**প্রশ্ন :** কবির সন্তানেরা কবির জীবনাদর্শ সংরক্ষণ, অনুশীলন ও বিস্তারে কতটুকু সফল?

**উত্তর :** আরো অনেক কিছু করা উচিত ছিল কেননা তিনি প্রকৃতপক্ষেই বাংলাদেশের গুটিকয়েক শ্রেষ্ঠ সন্তানদের একজন ছিলেন।

**প্রশ্ন :** আপনি তো কবির জীবনের ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন, তাই আপনি আমাদেরকে কবির জীবনের অভিনবত্বের দিকগুলো জানাবেন কি?

**উত্তর :** কবি সাহেব অত্যন্ত সহজ, সরল লোক ছিলেন। অনেক সময় তাকে আমি শিশুর মতো আগলে রেখেছি। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখ করছি–একবার একজন সাহিত্যিক একটি বই লিখেন। তিনি বইটি কবি সাহেবের কাছে নিয়ে আসলেন এবং একটি ভূমিকা লিখে দেবার জন্য অনুরোধ করলেন।

কবি সাহেব বইটি ভালোভাবে না পড়েই একটি ভূমিকা লিখে ফেলেন। কেননা অনুরোধকারী সাহিত্যিক তার পরিচিত ছিলেন। আমি বইটি পড়ে দেখতে চাইলাম যাতে কবি সাহেবের নাম কোনো আপত্তিকর পুস্তকের সঙ্গে



www.pathagar.com

সম্পৃক্ত না হয়। বইটি পড়ে আমি দেখলাম যে তাতে ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাস সম্পর্কে অনেক বিভ্রান্তিকর তথ্য দেয়া হয়েছে যেসব মত উগ্র শিয়ারা পোষণ করে থাকেন। কবি সাহেবকে আমি বললাম, বইটি সংশোধন না করা পর্যন্ত আপনি এ ধরনের বইয়ের ভূমিকা লিখে দিতে পারেন না।

কিন্তু কবি সাহেব ছিলেন অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির। তাই তিনি উক্ত লেখককে না করতে পারছিলেন না। অন্যদিকে লেখকও তার বই সংশোধন করতে রাজি নন। তখন আমি নিজেই বললাম, এর ভূমিকা দেয়া হবে না যতক্ষণ না আপনি এ বইয়ের কোনো সংশোধন না করবেন। উক্ত লেখক অবশ্য আমার উপর সাংঘাতিক ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

আরেকটি ঘটনা–আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখলের পরে কবি সাহেব তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন। আইয়ুব খান যে অন্যায়ভাবে ক্ষমতা দখল করেছিলেন এটি তিনি বুঝতে সক্ষম হননি। অন্যদিকে আইয়ুব খানের চিন্তাধারার দ্বারাও তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। আইয়ুব খানের এসব চিন্তাধারাকে তিনি ইসলামের আলোকে বিশ্লেষণ করে সমর্থন করতে চাইতেন। অথচ আইয়ুব খানের লক্ষ্য ছিল সত্যিকার নয়–একটি খোড়া গণতন্ত্র যা মূলত ইসলামী ভাবধারার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। তৎকালীন পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠ আলেমগণ আইয়ুব খানের ধ্যান-ধারণাকে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি বলে মনে করতেন না। কিন্তু কবি সাহেব তার সরল বিশ্বাসে আইয়ুব খানের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন এবং তার বই 'আমার চিন্তাধারা'য় শাসনতন্ত্র সম্পর্কে যে লেখাটি রয়েছে তাতে তার সে সময়কার মনোভাবের প্রতিফলন ঘটে।

আমি কবি সাহেবের সঙ্গে এ নিয়ে অনেক তর্ক করেছি, তিনি তার লেখা আমার অনুরোধে অনেক কাটছাঁট করেন কিন্তু পুরোপুরি পরিবর্তন করতে রাজি হননি। অবশ্য যা তিনি লিখেছিলেন তা তিনি পুরোপুরি বিশ্বাস করতেন এবং তিনি তা কোনো স্বার্থে করেননি।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : শাহীন হাসনাত
প্রকাশকাল : শ্রাবণ ১৪০৫, প্রেক্ষণ



www.pathagar.com

# পুলিশ প্রশাসনকে ইউরোপ-আমেরিকার পুলিশ প্রশাসনের আদলে সম্পূর্ণ ঢেলে সাজানো ও পুনর্গঠন প্রয়োজন

**প্রশ্ন :** রুবেল হত্যার বিচারের জন্য সরকারের গৃহীত পদক্ষেপকে কি আপনি যথার্থ মনে করেন?

**উত্তর :** আমি মনে করি রুবেল হত্যা দেশকে নাড়িয়ে দিয়েছে, সরকারের এবং বিরোধী দলের সকল মহলকে চিন্তিত করে তুলেছে। সরকার এর বিচারের উদ্যোগ নিয়েছে। তবে সে উদ্যোগ যথেষ্ট কি না সে ব্যাপারে দ্বিমত থাকতে পারে। কিন্তু আমি মনে করি, সরকার এ ব্যাপারে সার্বিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং আমার ধারণা তারা এর বিচার চায়, শাস্তি চায়। আমি মনে করি, এর শাস্তি হবে।

**প্রশ্ন :** সম্প্রতি পুলিশ এসোসিয়েশন আইজির নেতৃত্বে প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে গিয়ে রাজনৈতিক বক্তব্য দিয়েছে বলে অভিজ্ঞমহল মনে করেন। পুলিশ কি রাজনৈতিক বক্তব্য দিতে পারে?

**উত্তর :** আমার দু'টো কথা। প্রথমটি হলো, পত্রিকায় যে রাজনৈতিক বক্তব্যগুলো দেখা গেছে তা যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে আমি বলবো, কোনো এসোসিয়েশনের পক্ষে এ ধরনের বক্তব্য দেয়া ঠিক নয়, একেবারেই ঠিক নয়। একে সমর্থন দেয়াও ঠিক নয় এবং কেউ দেবে না বলেই আমি মনে করি। তবে পুলিশের বিরুদ্ধে যদি কোনো বক্তব্য এসে থাকে তবে তাদের অধিকার রয়েছে সে সম্পর্কে নিজস্ব বক্তব্য প্রদানের।

**প্রশ্ন :** প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করে পুলিশ সমিতি রুবেল হত্যাকাণ্ডকে তুচ্ছ ঘটনা বলে উল্লেখ করেছে। আসলেই কি রুবেল হত্যা তুচ্ছ ঘটনা?

**উত্তর :** পত্রিকার শিরোনাম যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে আমি বলবো এ ধরনের বক্তব্য রাখা অত্যন্ত বেদনাদায়ক, অত্যন্ত দুঃখজনক ও অত্যন্ত বাড়াবাড়ি। এটি একেবারেই তুচ্ছ নয়, মহাঘটনা। একটি মাত্র ঘটনা দ্বারা বিষয়টি বুঝলে হবে না। বিগত ২৫ বছর ধরে পুলিশ প্রশাসন যেভাবে চলেছে তাতে তাদের কাস্টডিতে এ পর্যন্ত কয়েকশ' লোক মারা গেছে। বলা হচ্ছে, গত দু'বছরে তাদের হাতে ৮৫ জন প্রাণ হারিয়েছে। সুতরাং রুবেল হত্যা একটি ঘটনা মাত্র। তবে এ ঘটনা দ্বারা গোটা জাতির বোঝা উচিত যে, পুলিশ প্রশাসনে কি হচ্ছে। রুবেল



www.pathagar.com

হত্যা ঘটনার প্রেক্ষাপটে আমাদের পুলিশ প্রশাসনকে ইউরোপ-আমেরিকার পুলিশ প্রশাসনের আদলে সম্পূর্ণ ঢেলে সাজানো ও পুনর্গঠন প্রয়োজন। অনেকে হয়তো বলবেন, আমাদের পরিস্থিতি তাদের মতো নয়। কিন্তু পুলিশের হাতে যদি এতো লোক মারা যেতে থাকে, তাহলে কোনো পরিস্থিতিতেই আমরা বর্তমান অবস্থা বহাল রাখতে পারি না। একে পরিবর্তন করতেই হবে।

**প্রশ্ন :** সরকারি কর্মকর্তা যদি রাজনৈতিক বক্তব্য দেয়, তাহলে চাকরিবিধি অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় কি না?

**উত্তর :** পারা যায় এবং নেয়া উচিতও। কিন্তু সরকার বিভিন্ন কারণে নিতে পারে না। তবে আমি আশা করবো, তারা আর এ ধরনের রাজনৈতিক বক্তব্য দেবে না, দিলে সরকার তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

**প্রশ্ন :** গত দু'বছরে সমাজ থেকে অপরাধ দমনের মধ্য দিয়ে বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর সামনে পুলিশ সমিতির এ বক্তব্যকে আপনি কিভাবে দেখছেন?

**উত্তর :** আমি আগেই বলেছি এ ধরনের বক্তব্য না দেয়াই ভালো। কারণ তা দলীয় রাজনীতির পরিচয়ই বহন করে। পুলিশ সমিতি কেন, কোনো সমিতিই এ ধরনের বক্তব্য দিতে পারে না।

**প্রশ্ন :** মানুষের জানমালের নিরাপত্তা ও মৌলিক অধিকার সংরক্ষণে আমাদের সরকারসমূহ কতটুকু সফল বলে আপনি মনে করেন?

**উত্তর :** গত ২৫ বছরে আমাদের সরকারসমূহ এ ব্যাপারে সফল হয়েছে তা বলা যাবে না।

**প্রশ্ন :** আপনি কি মনে করেন পুলিশ বাহিনী রাজনৈতিকভাবে ব্যবহৃত হয়?

**উত্তর :** আমি মনে করি, প্রত্যেক সরকারই পুলিশকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করেছে। তবে পুলিশ তা প্রত্যাখ্যান করত পারে। আমার ধারণা পুলিশ যদি রাজনৈতিকভাবে ব্যবহৃত হতে না চায় এবং সেজন্য যদি কোনো চাপ আসে, পুলিশের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তারা যদি সে চাপের কাছে নতি স্বীকার না করে পদত্যাগ করেন তাহলে এ অবস্থার অবসান ঘটবে। সরকার আর তাদেরকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করতে চাইবেন না। কিন্তু আমি জানি না তারা কেন তা করছেন না। এটি করলে তো তাদের কোনো ক্ষতি নেই। তবে হয়তো তাদের কোনো দুর্বলতা আছে, না হয় যে কোনোভাবে তারা ক্ষমতায় থাকতে চায়, তাই পদত্যাগ করছে না।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : শিকদার আবদুর রব
প্রকাশকাল : ১৯৯৮, সাপ্তাহিক বিক্রম



www.pathagar.com

## এ দেশে ইসলাম কায়েম না হওয়ার পেছনে মূল সমস্যা হচ্ছে সকল পর্যায়ে লিডারশিপ তৈরি না হওয়া

**প্রশ্ন :** আপনি বাংলাদেশ সরকারের সচিব ছিলেন, রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর ছিলেন। এছাড়াও বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। পেশাগত এসব কর্মকাণ্ডে আপনার ধ্যান-ধারণার প্রতিফলন কতটুকু ঘটাতে পেরেছিলেন?

**উত্তর :** আপনার মূল প্রশ্ন হলো এ ধরনের কর্মকাণ্ডে আমি ইসলামের কাজ করতে পেরেছি কি না? আমি বলবো পেরেছি। চাকরি জীবনে আমি সরাসরি রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলাম না বা রাজনীতি নিয়ে কথা বলিনি। আমার অফিসে যারা আসতেন তাদের কাছে আমি রাজনৈতিক কোনো আলাপ করিনি। আমি তাদের প্রধানত ইসলামের দিকে ডেকেছি। আমি তাদের বলেছি, এ দেশকে যদি ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করতে চান, কুরআন-সুন্নাহর আইন দেখতে চান, তাহলে আমাদেরকে পড়তে হবে। আমি সবাইকে পড়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছি। আমি তাদের কুরআনুল করীমকে পড়তে বলেছি, হাদিস পড়তে বলেছি। অগ্রসর (Advance) লিটারেচার পড়তে বলেছি। ইসলামী এডভান্স লিটারেচার মানে গত একশত বছরে যারা উচ্চমানের ইসলামী সাহিত্য রচনা করেছেন তাদের সাহিত্য পড়তে বলেছি। আপনার মনে হয়তো প্রশ্ন জাগতে পারে–একশ' বছরের কথা কেন বললাম। আগের যুগের লেখকরা যে খুব বড় কথা বলেছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তাতে তাদের যুগের প্রতিফলন ঘটেছে। উদাহরণগুলো সেই যুগের, যে বিষয়গুলো তাদের বইতে ব্যবহার করেছেন সেটিও সেই যুগের। ফলে গত একশ' বছরে যারা এডভান্স বই লিখেছেন ইসলামের উপর তা আমি তাদের পড়তে বলেছি।

**প্রশ্ন :** কার কার বই আপনি দিয়েছেন?

**উত্তর :** নির্দিষ্ট কারো বই দেইনি। এ যুগের যারা শ্রেষ্ঠ স্কলার, যেমন–মাওলানা মওদূদী, সাইয়েদ কুতুব, ড. তাহা জাবিল আল আলওয়ানী, ড. জামাল বাদাবি, মোহাম্মদ আল গাজ্জালী, ড. ইউসুফ আল কারযাভী, আমিন আহসান ইসলাহী, আবুল হাসান আল নাদভী–এ ধরনের যারা বড় লেখক তাদের বই আমি দিতে



www.pathagar.com

চেষ্টা করেছি। আমি নিজে কিছু বই লিখেছি–সেগুলো প্রেজেন্ট করেছি। আমি অনেক লিফলেট তৈরি করেছি, যেগুলো ছিল অরাজনৈতিক ধরনের, সেগুলো বিতরণ করেছি। সুতরাং আমি আমার জীবনে অফিসিয়াল কাজের কোনো ক্ষতি না করে, ইসলামের কাজ করতে কোনো প্রতিবন্ধকতা ফিল করিনি। সাবধান হয়েছি, সাবধানে থেকেছি, খেয়াল রেখেছি যাতে আইন ভঙ্গ না করি। সেটি খেয়াল করে অফিসের কাজ ফাঁকি না দিয়ে, ফাইল ওয়ার্ক বাদ না দিয়ে, আরেকটি বিশেষ কাজ আমি করেছি তা হচ্ছে কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলকে ফেবার করিনি। আমি একটি পার্টিকে ভালোবাসি, তাই বলে তাদের পক্ষ নেইনি। আবার একটি পার্টিকে ভালোবাসি না, তাই বলে তাদের প্রতি অবিচার করিনি। ফলে আমার জীবনে এটি কোনো বড় সমস্যা হয়ে দেখা দেয়নি।

**প্রশ্ন :** প্রশ্নগুলো এজন্য করলাম যে, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে যেসব সরকার ছিল তার সবক'টি সেকুলার। সেকুলার প্রশাসনে কাজ করতে আপনার অসুবিধা হয়নি?

**উত্তর :** আসলে সেকুলারিজমের ব্যাপারটিও বুঝার বিষয়। একটি সেকুলারিজম হয় মূলত তাত্ত্বিক সেকুলারিজম, সেটি হচ্ছে পাবলিক লাইফ বা সামাজিক জীবনের সঙ্গে ধর্ম বা ইসলামের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। কিন্তু আমাদের দেশে যে সেকুলারিজমের কথা বলা হচ্ছে সেটি সেরকম নয়। এখানে ধর্ম বা ইসলামেরও একটি ভূমিকা আছে। আমাদের দেশে যে সেকুলারিজম চলছে সেটি আধাআধি সেকুলারিজম–পুরো সেকুলারিজম নয়। সরকারের কাছে ইসলামের অংশ কিছু না কিছু রয়েছে। এটিই আমার বিশ্বাস। ফলে আমি মনে করি, বাংলাদেশে যে সেকুলারিজম রয়েছে সেটি নামে সেকুলারিজম। এটি এ পর্যায়ের নয় যেটি তত্ত্বগতভাবে বইপুস্তকে রয়েছে। সুতরাং আমরা ইসলামের কাজে তেমন কোনো প্রতিবন্ধকতা পাইনি।

**প্রশ্ন :** আপনি তো এখন অবসর জীবনযাপন করছেন। তো সময়গুলো কিভাবে অতিবাহিত করছেন?

**উত্তর :** আমাদের দেশে অবসর বলতে বোঝায় চাকরি থেকে অবসর। কিন্তু চাকরি থেকে অবসর নেয়ার পর আমি ভাবি কোনো রেগুলার চাকরি নেব না এবং আমার সময়টা ইসলামের জন্য ব্যয় করবো, সমাজ ও মানবতার কাজে ব্যয় করবো। আমি গড়ে চার-পাঁচ ঘণ্টা পড়ি। এটি অত্যন্ত জরুরি জিনিস যেটি আমাদের লোকেরা করে না। এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলে দেয়া ভালো যে, আমরা সময় পাচ্ছি না, কিন্তু একটি লোক যদি গভীরভাবে পরিকল্পনা করে তবে সে তার সময়কে ভাগ করে নিতে পারে। যেমন, আমি বলি কারোরই উচিত নয় দশ ঘণ্টার উপর চাকরি বা ব্যবসা বা জবে সময় দেয়া। চাকরিই হোক কিংবা ব্যবসাই হোক, দশ ঘণ্টার মধ্যে লিমিট করা উচিত। দ্বিতীয়ত ছয় ঘণ্টার উপর



www.pathagar.com

ঘুমানো উচিত নয়। তাহলে হলো ষোল ঘণ্টা। এছাড়াও কিছু বিবিধ কাজ আছে। সে কাজগুলো চার ঘণ্টা ধরি। তাহলে হলো বিশ ঘণ্টা। এরপরেও থাকে চার ঘণ্টা। এ চার ঘণ্টা সময় অবশ্যই আমরা ইসলামের পড়াশুনার জন্য ব্যয় করতে পারি। আমি নিজে যেটি করি সেটি হলো চার-পাঁচ ঘণ্টা পড়াশুনা করি। তারপর আমি দু'টো ক্লাস চালাই। একটি ছেলেদের, একটি মেয়েদের–যেখানে এডভান্সড ইসলামী কর্মী তৈরি করার চেষ্টা করছি।

**প্রশ্ন :** আপনি যে ক্লাসগুলো চালান, এগুলো আয়োজন করে কারা?

**উত্তর :** ১৯৮৯-৯০ এ আমার বাসাতেই ক্লাস করি। পরবর্তী সময়ে এটি সংগঠন আকারে রূপ ধারণ করে। মেয়েদের সংগঠনের নাম হয় 'উইটনেস' বা আল্লাহর পথে সাক্ষী। ছেলেদেরটা 'পাইওনিয়ার', কুরআনের পরিভাষায় 'আসসাবেকুম' অর্থাৎ আল্লাহর পথে অগ্রবর্তী বা অগ্রগামী। আস্তে আস্তে তাদের কন্সটিটিউশন হয়, তাদের সেন্ট্রাল কমিটি হয়। তারা চলছে এবং কাজ করছে। তাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আধুনিক এ যুগে ইসলামের যে মূল ইনটেলেকচুয়্যাল ইস্যুগুলো আছে এগুলো বুঝা এবং যেখানে ব্যাখ্যা করা দরকার ব্যাখ্যা করা, জবাব দেয়া, প্রয়োজনে বই করা, আর্টিকেল তৈরির প্রয়োজন হলে আর্টিকেল তৈরি করা। আমার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অনেকে আমেরিকা, ইউরোপে চলে গেছে; কানাডা, অস্ট্রেলিয়া চলে গেছে। তারা একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। পাইওনিয়ার ইন্টারন্যাশনাল নামে তাদের একটি ওয়েবসাইট আছে।

মূলত এটি ইন্টারনেটভিত্তিক ইসলামী ইনটেলেকচুয়্যাল মুভমেন্ট আকারে বিরাট সংগঠনে রূপ লাভ করেছে। প্রসঙ্গত বলে নিই এটি একটি মধ্যবর্তী গ্রুপ–এক্সট্রিমিস্ট নয়। কুরআনের যে আয়াতে (বাকারা-১৪৩) আল্লাহতায়ালা বলেছেন 'ওয়াকাজালিকা জায়ালনাকুম উম্মাতাও ওয়াছাতাল লিতাকুনূ শুহাদায়া আলান নাসি...'–সে আয়াতের ভিত্তিতেই তারা মধ্যবর্তী হয়েছে। তারা সে স্ট্রিম ইসলামী মুভমেন্ট যেগুলো দুনিয়াতে রয়েছে তাদের সাথে মিলেই কাজ করছে। যেমন–ইখওয়ানুল মুসলিমুন, জামায়াতে ইসলামী, আরবাকানের পার্টি, তুরাবীর পার্টি, আনোয়ার ইব্রাহিমের পার্টি, নাহায়তুল উলামা মোহাম্মদীয়া বলতে যে মেইন স্ট্রিম বুঝি তাদের সাথে মিলে কাজ করছে। এটি তো গেল একটি দিক। প্রশ্ন ছিল আমি কিভাবে সময় কাটাই? সেখানেই আমি ফিরে আসি। চার-পাঁচ ঘণ্টা পড়ি, এ দু'টোতে ক্লাস করতে হয়। তারপর ইসলামিক ইকোনোমিকস রিসার্চ ব্যুরোর আমি সভাপতি, সেখানে আমাকে সময় দিতে হয়। তারপর আমি ইবনে সিনা ট্রাস্টে আছি, সেখানে সময় দিতে হয়। আমি মানারাত ট্রাস্টে আছি, সেখানে সময় দিতে হয়। চট্টগ্রাম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ক্যাম্পাস ঢাকায় হয়েছে আমি তার প্রধান। এর প্রশানসটি আমাকে দেখতে হয়। সেখানেও আমাকে কয়েক ঘণ্টা সময় দিতে হয়। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর আমি একজন ডাইরেক্টর, সেখানে আমাকে সময় দিতে হয়। এছাড়া আরো অসংখ্য



www.pathagar.com

সংগঠনের সাথে আমি জড়িত। এছাড়া বাংলাদেশে যেসব ইসলামী মুভমেন্ট রয়েছে তাদের নেতৃবৃন্দ আমার বন্ধু-বান্ধব। তাদের অনেকের সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়। তাদের অনেক সময় পরামর্শ দিতে হয়। কখনো কখনো নেন, আবার কখনো কখনো আমি নিজে দিয়ে আসি। এছাড়া বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়ামের দাওয়াত পাই–তাতে আমি শরিক হই। বিভিন্ন গোলটেবিল বৈঠকে আমি শরিক হই। আমি কিছু লিখি–এখানেও সময় দিতে হয়।

**প্রশ্ন :** এরা কি কোনো সিলেবাস অনুসরণ করে?

**উত্তর :** আমি তাদের প্রথম পড়িয়েছিলাম ড. জামাল আল বাদাবির কিছু লেকচার। ড. আল্লামা জামাল আল বাদাবি ইখওয়ানুল মুসলিমুনের নেতা। তিনি এক হাজার লেকচার তৈরি করেছিলেন। আমি তখন এক-দুইশ' লেকচার ওখান থেকে নিই। 'নুরুল আনোয়ার'কে ভিত্তি করে আমি উসূল আল ফিকাহ্ শিখাই। পরবর্তীকালে ইংরেজিতে ড. হাশিম কামালীর উসূলের উপর আরো ভালো বই পেয়ে যাই। তিনি একজন আলেম। ইন্টারনেটের মাধ্যমে ড. কামালীর বইয়ের ভিত্তিতে আমি উসূল পড়াই। আরবিতে উসূলের যত কাজ হয়েছে ড. হাশিম কামালী তা একত্রে নিয়ে এসেছেন। আমি এটিকে সামারাইজ করে চল্লিশ পৃষ্ঠায় নিয়ে এসেছি। যে কেউ চাইলে ইন্টারনেটের ওয়েবসাইট থেকে এটি ডাউনলোড করে নিতে পারবেন।

যাহোক প্রথমে আমি তাদের উসূল পড়াই। তারপর আমি ইসলামী ল' পড়ালাম। ইসলামিক ফাউন্ডেশন ইসলামী আইনের উপর একটি বিরাট কাজ করেছে 'বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন' নামে। সঙ্গে সঙ্গে ল'-এর উপর আরো কিছু ইংরেজি বই পেয়ে যাই। এসবের উপর ভিত্তি করে আইনগুলো পড়িয়েছিলাম। তারপর আমি ইসলামী অর্থনীতির উপর সিরিজ লেকচার দিতে থাকলাম। এরপর আমি আকিদার উপর পড়ালাম। বিশেষ করে মোহাম্মদ আল গাজ্জালীর 'আকিদাতুল ইসলাম' বইটিকে ভিত্তি করে আকিদা পড়িয়েছিলাম। পুরানো আকিদার বইগুলোর তুলনায় এ বই অনেক উন্নতমানের। পুরানো ঝগড়াঝাটি যেগুলো ঐ যুগের মুতাজিলা, আশারিয়া এবং আহলে সুন্নাহর মধ্যে ছিল তা তিনি সম্পূর্ণ পরিহার করে, কোনোরকম একতরফা দৃষ্টিকোণ গ্রহণ না করে একটি সুন্দর বই লিখেছেন। আমি তো মনে করি মাদরাসাতে এখন যদি আকিদার উপর কোনো বই প্রেসক্রাইব করতে হয় তাহলে মোহাম্মদ আল গাজ্জালীর 'আকিদাতুল ইসলাম'কে আনা দরকার। তিনি ২০০১ সালে ইন্তেকাল করেছেন।

আমি তাদেরকে কোর্সের মধ্যে নিয়ে গেলাম এবং তাদের বললাম, তোমাদের মূল ফোকাস হবে 'র‍্যাপিড ইনটেলেকচুয়্যাল আপগ্রেডেসান'। ঈমান, আখলাক, তাকওয়া, ইসলামের মৌলিকত্ব প্রভৃতি বিষয় তো লাগবেই। সবচাইতে বড় কথা হলো র‍্যাপিড ইনটেলেকচুয়্যাল আপগ্রেডেসান করতে হবে। যেহেতু এটি ইন্টারনেটের যুগ, তাই সারা গ্লোবে ইসলামের যে ইস্যুগুলো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে



www.pathagar.com

সেগুলো পৌঁছাতে হবে। তাদের যেসব গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলোর কথা বললাম তার একটি হলো উসূল আল ফিকাহর জ্ঞান ছড়িয়ে দিতে হবে। কারণ ইউসুফ আল কারযাভী বলেছেন, যত বিভ্রান্তি তার মূল কারণ হচ্ছে উসূল আল ফিকাহর মাধ্যমে ইসলাম না শেখা। কারণ কুরআন-হাদিসের কোনো ব্যাখ্যা যথার্থভাবে করা সম্ভব নয় উসূল আল ফিকাহর জ্ঞান ছাড়া। তেমনিভাবে নারী-পুরুষের Gender-এর সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে আমি প্রথমে স্বীকার করে নিই যে, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি আছে। খুব গোড়া দৃষ্টিভঙ্গি আছে, খুব উদার দৃষ্টিভঙ্গি আছে, মধ্যপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি আছে। এখানে আমরা একটি মধ্যপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছি যার মূল প্রবক্তা হচ্ছেন এ যুগের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ আলেম। যেমন–ড. ইউসুফ আল কারযাভী, মোহাম্মদ আল গাজ্জালী, আবদুল হালিম আবু শুক্কাহ, ড. হাসান তুরাবী, ড. জামাল আল বাদাবি–এ সমস্ত আলেমরা যে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করলেন, আমরা সে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করলাম। আপনাকে তো একটি গ্রহণ করতেই হবে। তাই আমরা মধ্যপন্থাটি গ্রহণ করলাম এবং আমরা যে জ্ঞান অর্জন করলাম তা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে চাইলাম।

গণতন্ত্র সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি আছে সেটি আমরা দূর করার চেষ্টা করছি। এটি অনেকেই জানে না গণতন্ত্র এবং ইসলামের সম্পর্ক অনেক নিকটে। গণতন্ত্রের অনেক কথাই ইসলামের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। গণতন্ত্রে যে নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে, নির্বাচিত সরকারের কথা বলা হয়েছে, জনগণের সরকারের কথা বলা হয়েছে, মানবাধিকারের কথা বলা হয়েছে, স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র বিচার ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে সবই ইসলামের সাথে সংগতিপূর্ণ। ১৯৪৭ সালে যখন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হলো তখন প্রশ্ন উঠল, আমাদের সংবিধানে আমরা গণতন্ত্র শব্দ ব্যবহার করবো কি না? আলেমে-দ্বীন সকলে একমত হলেন যে, গণতন্ত্র শব্দ ব্যবহার হবে। সংবিধানে Where in the principle of democracy equality freedom and social justice as enunciated by Islam shall be fully observed শর্ত লাগিয়ে দিলেন। কারণ প্রত্যেক শব্দেই তো আপত্তি করা যায়। ফ্রিডম শব্দে আপত্তি করা যায়, ইসলামী ফ্রিডম আর অন্য ফ্রিডম ভিন্ন। ইকুয়ালিটিতে আপত্তি করা যায়। কারণ ইসলামী ইকুয়ালিটি আর অন্য ইকুয়ালিটি এক নয়। অর্থাৎ যে কোনো শব্দেই আপত্তি করা যায়। কিন্তু আমাদের সেই গ্রেট আলেমরা ১৯৪৮ সালেই সমস্যার সমাধান করে দেন। কিন্তু এ কথা অনেকেরই মনে নেই–তারা শুধু একটি কথাই পেয়েছে, জনগণের সার্বভৌমত্ব। যারা গণতন্ত্র বিরোধী তারা কি সামরিকতন্ত্র চাচ্ছেন? তারা কি বাদশাহী চাচ্ছেন? নাকি তারা নির্বাচন চাচ্ছেন? আজকের গণতন্ত্র অর্থই হচ্ছে মূলত নির্বাচিত সরকার। এ কথাটি বুঝতে হবে এখানে আমি একটি উসূলের কথা বলতে চাই। উসূলের আলোচনায় শব্দের ক্লাসিফিকেশন করে বলা হয় হাকিকি শব্দ বা মাজাজি শব্দ। হাকিকি মানে শাব্দিক (Literal) এবং মাজাজি মানে হচ্ছে রূপক। যদি রূপক অর্থ হাকিকির ঊর্ধ্বে চলে যায় যেখানে মাজাজি অর্থ প্রাধান্য পেয়ে যায়,



www.pathagar.com

সেখানে মাজাজি অর্থ এখন নিতে হবে। ডিভোর্স শব্দের মূল অর্থ একটি কিন্তু সে অর্থে তালাক শব্দ ব্যবহৃত হয় না। তালাক শব্দের মূল অর্থ হয়ে গেছে ডিভোর্স এবং এ অর্থে ব্যবহৃত হয়। গণতন্ত্রের মূল কথা হচ্ছে নির্বাচন, পলিটিক্যাল পার্টি, ফ্রিডম, ইকুয়ালিটি, ইলেকশন প্রসেস এবং রুলস অব ল' এসব জিনিস। এমন অনেক রাজনৈতিক স্কলাররা আছেন যারা বলেন, জনগণের সার্বভৌমত্বের কোনো থিওরিই প্রয়োজন নেই। যদি থেকেও থাকে তাহলেও তৎকালীন পাকিস্তানী আলেমরা এর সমাধান করে দিয়ে গেছেন এ কথা বলে যে, এই ইসলাম দেশে সেই গণতন্ত্র হবে যেটি হবে ইসলামী গণতন্ত্র। এখানে জনগণের সার্বভৌমত্ব থাকবে না–এখানে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব থাকবে। এখানে গণতন্ত্র থাকবে–তবে তা থাকবে আল্লাহর আইনের অধীনে। গণতন্ত্র নিয়ে এ ভুল বোঝাবুঝি চলছে, এ সমস্যা দূর করার দায়িত্ব নিতে হবে অগ্রসর আলেমদের। ড. ইউসুফ আল কারযাভী Priorities of the Islamic Movement in the Coming Phase নামে একটি বই লিখেছেন। বইটি 'আধুনিক যুগ ইসলাম কৌশল ও কর্মসূচি' নামে বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের বইটি পড়ে নেয়া উচিত। তিনি গণতন্ত্রের প্রতি সিরিয়াস সমর্থন করেছেন। তিনি বলেছেন, মুসলিম দেশে যখন গণতন্ত্র হবে তখন তা ইসলামের ভিত্তিতেই হবে। গণতন্ত্রের অন্য অর্থকে প্রাধান্য দেয়ার অর্থ হচ্ছে শত্রুর চক্রান্তে পা দেয়া। আমি আপনাকে পরিষ্কার বলছি, ইসলামের শত্রুরা তাই চায়।

**প্রশ্ন :** গণতন্ত্রে তো একজন অসৎ লোকও নির্বাচিত হয়ে আসতে পারে।

**উত্তর :** সেটি তো খিলাফতেও হতে পারে। খিলাফতের নামে কি হয়েছে? ইমাইয়া বাদশারা কি করেছে? আব্বাসীয় বাদশারা কি হয়েছে? সেটি তো খিলাফতের নামেই হয়েছে এবং সে যুগের আলেমরা তো অনেক কিছু মেনেও নিয়েছিলেন। তারা হয়তো মনে করেছেন এছাড়া আর উপায় নেই। সুতরাং আপনি যদি মিসইউজের কথা বলেন তাহলে তো আমি বলবো সর্ব অবস্থায় অপব্যবহার হতে পারে। এমন একটি বিষয় বলেন যেখানে অপব্যবহার হচ্ছে না। মিসইউজের উপর আপনি ভিত্তি করতে পারেন না। আমরা ইসলামের কথা বলছি। ইসলাম এক যুগের নয়, এক দেশের নয়, এক এলাকার নয়, এক ব্যক্তির নয়। উসূলি কথা বলার সময় আপনি একটি জিনিসকে হাইলাইট করতে পারবেন না। গণতন্ত্রের এত বিপদ থাকা সত্ত্বেও এ দেশের মানুষ কি বলছে? বলছে গণতন্ত্রের কথা। আল্লামা ইকবাল গণতন্ত্র পছন্দ করতেন। তিনি বলেছেন–হ্যাঁ ইসলামে গণতন্ত্র আছে, তবে সেটি রুহানী গণতন্ত্র।

**প্রশ্ন :** আমাদের দেশের ইসলামী দলগুলো বিপ্লবের কথা বলে। গণতন্ত্রের মাধ্যমে বিপ্লব কিভাবে সম্ভব?

**উত্তর :** আমার জানা নেই তারা এসব কথা বলে কি না? আমার মনে হয় তারা



www.pathagar.com

বলেন না। বিপ্লব বলতে যদি সামরিক বিপ্লব মনে করে তবে সেটি আইনসম্মত নয় এবং তাদের কোনো সংবিধানে এ ধরনের কথা বলা নেই। তারা প্রাইভেট ড্রইং রুমে কি বলেন আমার জানা নেই। তাদের কোনো ডকুমেন্টে আমি দেখিনি যে তারা বলেছেন, তারা সামরিক বিপ্লব করবেন। এটি একটি রাজনৈতিক পরিভাষা, যে কোনো পরিবর্তনকে বিপ্লব বলা হয়। আর এ পরিবর্তন যদি গণতন্ত্রের পথে হয় এটিও বিপ্লবই। যদি কোনো ইসলামী পার্টি মনে করে অস্ত্রের জোরে কিছু করবে তাহলে আমি বলবো এটি সেই যুগ নয়, বাংলাদেশে এমন কিছু করা যাবে না। আমার এ ৬০ বছর বয়সে পরিষ্কার মত দিচ্ছি–কেউ যদি এটি করে তবে ধ্বংস হবে, এ রাস্তা পরিহার করতে হবে এবং বৃদ্ধি করতে হবে ইসলামের দাওয়াত, বাড়াতে হবে প্রচার-প্রকাশনা। নিজেকে যোগ্য করে তুলতে হবে। আসল সমস্যা আমরা ভুলে গেছি। কেননা যোগ্য লোক তৈরি করাই আসল সমস্যা। সার্বিকভাবেই আমি বলছি এ দেশে যোগ্য লিডারশিপের অভাব রয়েছে। এ দেশে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা ৫০টি বই পড়েই মনে করে আমরা বড় বড় আলেম হয়ে গেছি। পাঁচশ', সাতশ', এক হাজার বই না পড়লে কি সে নিজে কোনো বড় কাজ করতে পারবে?

এদেশে ইসলামী আন্দোলনগুলো তাদের বৃত্তের ভিতরকার আলেমদের বই ঘুরে ফিরে পড়বে, অন্য কে কি বললো সেদিকে তাদের জানার অনীহা রয়েছে। একটি দল তো আছে তারা শুধু একটি বই পড়বে। এমনকি তারা কুরআন পড়তেও খুব বেশি উৎসাহ বোধ করে না। তাফসির পড়াকেও উৎসাহিত করে না। তাহলে আপনি বলেন, তারা ইসলামী বিপ্লব কিভাবে করবে? ১৯৪৭ সালের পর এদেশে ইসলামের অনেক অগ্রগতি হয়েছে। অবশ্য সেটি খুব বেশি নয়। এখন এ দেশে ইসলাম কায়েম না হওয়ার পেছনে মূল সমস্যা হচ্ছে সকল পর্যায়ে লিডারশিপ তৈরি না হওয়া। যেমন ধরুন, প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহমদ সাহেবের কথা। তিনি স্বীকৃত ব্যক্তিত্ব কেন? পড়াশুনার জন্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. আবদুর রব স্বীকৃত ব্যক্তি কেন? কারণ একটি বিষয়ে স্পেশালিস্ট তিনি। তাই তিনি স্বীকৃত। তাই বলছিলাম ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের, নেতাদের স্পেশালিস্ট হতে হবে। বেশি অধ্যয়ন করলে জ্ঞানের পুঁজি বৃদ্ধি পাবে। পুঁজি কম হলে কি ব্যবসা হয়? লেখাপড়া না করলে দাওয়াতে ব্যাপকতা বৃদ্ধি করা যাবে না।

**প্রশ্ন :** আমরা একটি জিনিস লক্ষ্য করছি যারা ইংরেজি বা সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত, তাদের সাথে মাদরাসা শিক্ষায় শিক্ষিতদের চিন্তা-চেতনায়, মন-মননে কিছুটা অমিল রয়েছে। এর কারণ কি?

**উত্তর :** এখানে আমি দু'টো কথা বলবো। ইংরেজি শিক্ষিতদের ভুল আছে, উনাদেরও ভুল আছে। ইংরেজি শিক্ষিতদের ভুলটি হলো তারা আরবি শেখে না। যেমন আমি আলেমদের মতো আরবি জানি না। যদিও দু'বছর আরবি কোর্স



www.pathagar.com

করেছি, তাতে আমার অনেক সুবিধা হয়েছে। আমি অল্প বয়সে উর্দু শিখে নিয়েছি। ফলে সারা ভারতের আলেমদের চিন্তাধারা আমার জানতে সুবিধা হয়েছে। ইংরেজিশিক্ষিত লোকদের উচিত আরবি শেখার ব্যাপারে আরো যত্নবান হওয়া। আর মাদরাসা শিক্ষায় শিক্ষিতদের ভুলটি হলো তাদের শিক্ষাব্যবস্থায়। বিশেষ করে কওমি মাদরাসার শিক্ষাব্যবস্থা বর্তমান সময়, যুগ ও ইসলামের চাহিদা পূরণ করছে বলে আমার মনে হয় না। এ বিষয়ে আমি দু'টো কথা বলে বিষয়টি ক্লিয়ার করতে চাই। একটি কথা হচ্ছে আজকে বাংলাদেশের নেতৃত্ব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা দেয় কেন? জামেয়া কামরাঙ্গীরচর কিংবা জামেয়া লালবাগ দেয় না কেন? তার একটি উত্তর, দুনিয়া চালাতে যে জ্ঞানের দরকার তা জামেয়া লালবাগ কিংবা জামেয়া কামরাঙ্গীরচরে নেই। দুনিয়া চালাতে কম্পিউটার সায়েন্স, অর্থনীতি, বিবিএ, এমবিএ, লোক প্রশাসন লাগবে। অর্থাৎ দুনিয়া চালাতে যা প্রয়োজন তা মাদরাসায় শিক্ষা দেয়া হচ্ছে না। স্বাভাবিকভাবেই দেশ চালাবার লিডারশিপ গড়ে উঠছে না। এ দোষ তো তাদেরই। তারা করে কি, একটি দাওরা ডিগ্রি দেয়। তারা কিছু আরবি শিখায়, কিছু হাদিস শিখায়। আমি একটি প্রবন্ধে প্রস্তাব দিয়েছিলাম যে, আপনারা যদি রোল প্লে করতে চান, তাহলে আপনাদের নতুন আরো একটি ডিগ্রি খুলতে হবে। জামেয়া বা ইউনিভার্সিটি মানে হচ্ছে এখানে একটি ডিগ্রি দেয়া হয় না, এখানে অনেকগুলো বিষয় পড়ানো হয়। আমেরিকার হার্ভার্ডে একশ বিষয় পড়ানো হয়। সেখানে কওমি মাদরাসায় অন্তত আপনারা অর্থনীতিটা ঢুকিয়ে দিন। দুনিয়ার সাথে সংগতি রেখে যদি বিষয়গুলোকে পুনর্বিন্যাস করা না হয় তাহলে লিডারশিপ উঠে আসবে না। আমাদের একটি বিষয়ে চিন্তা করতে হবে যে, কোন বিষয়ে আপগ্রেড হচ্ছে? যেমন অর্থনীতির বইটি যখন পড়ি তখন একশ' বছর আগের বইটি পড়ি? সুতরাং আল্লাহর কালাম ছাড়া, রাসূলের কথা ছাড়া যে কোনো বিষয়ের শেষ বইগুলো পড়তে হবে। আমাদের শেষ বইগুলো আনতে হবে। আগের তাফসিরগুলো কোর্সে আনা উচিত রেফারেন্স হিসেবে। কিন্তু পড়তে হবে কারেন্ট তাফসির। তেমনি ফিকাহর ক্ষেত্রে, আজকের যে কাজগুলো হয়েছে সেগুলো আনতে হবে মেইন হিসেবে। আর আগেরগুলো নিয়ে যেতে হবে রেফারেন্স হিসেবে। কিন্তু এটি তারা করছেন না। ইংরেজি শিক্ষার প্রতিও তাদের একটি অনীহা রয়েছে। এটি বাস্তব যে ইংরেজি হচ্ছে ওয়ার্ল্ড লেংগুয়েজ। তাই এ ভাষা শিখলে সবচাইতে লাভ বেশি আমাদের। ওরা তো চায় আমরা ইংরেজি না শিখি। আমরা ইংরেজি শিখবো এজন্য যে, ইংরেজি শিখে আমরা তাদেরই পরাজিত করবো। কিন্তু আমরা ইংরেজি শিখছি না। শুধু ইংরেজি বলি কেন, বাংলাও ভালো করে শিখি না। তারা ইন্টারনেট জানে না। কম্পিউটার সায়েন্স বলতে তারা বোঝে টাইপ করা। সবচাইতে বড় কথা হচ্ছে, তাদের অনেকে মনে করেন সবাই তাদের কাছে যাবে। ঠিক তারা রাসূলুল্লাহর (সা.) উল্টা পথ ধরেছেন। রাসূল (সা.) সবার কাছে যেতেন। রাসূল (সা.) মক্কাতে ঘুরতেন, তায়েফেও গিয়েছেন, আশেপাশের



www.pathagar.com

শহরগুলোতে গিয়েছেন, লোকদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন। অথচ আমাদের অনেক আলেম তা করেন না।

যা বলছিলাম, আমাদের আলেমদের কোনোদিন দেখিনি তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচারদের এপ্রোচ করেছে।

**প্রশ্ন :** তাদের তো সে সুযোগ থাকতে হবে।

**উত্তর :** তারা যাচ্ছে না কেন? তাদের তো সুযোগ আদায় করে আনতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কি তাদের বন্ধু-বান্ধব নেই?

**প্রশ্ন :** তারা তো বলছে অন্য কথা। একটি সময় সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে একরকম শিক্ষাব্যবস্থা ছিল। বৃটিশরা আসার পরই শিক্ষাব্যবস্থা দু'টো হয়ে গেল। বৃটিশরা চাইলো ইসলাম শেষ হয়ে যাক। তখন অস্তিত্ব রক্ষার্থেই কওমি মাদরাসার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এ প্রজন্ম মাদরাসা শিক্ষাকে ঠিক মেনে নিচ্ছে না।

**উত্তর :** এটি ঠিক, এক সময় অবিভক্ত শিক্ষাব্যবস্থা ছিল এবং এটিই হতে হবে। আমি আবার বলছি এটিই হতে হবে। কিন্তু যতদিন না হচ্ছে–আমি যেটি বললাম সেভাবে ঐ শিক্ষাকে আপগ্রেড করতে হবে। আমি একটি বাড়ি করলাম। এটিকে কি প্লাস্টার করবো না? চুনকাম করবো না? যতক্ষণ না শিক্ষাব্যবস্থা এক হচ্ছে ততক্ষণ তো আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে সংস্কার করতে হবে। শিক্ষাব্যবস্থা এক হওয়া তো অনেক দূরের ব্যাপার। আমার মনে হয় অনেক কঠিন। এটি নির্ভর করে রাজনৈতিক পরিবর্তনের ওপর। ততদিন পর্যন্ত কি আমাদের সিস্টেমকে উন্নয়ন করতে হবে না? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কি তাদের সিস্টেমকে আপগ্রেড করছে না?

**প্রশ্ন :** এখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে তো সরকার পৃষ্ঠপোষকতা করছে। কওমি মাদরাসাগুলোকে তা করছে না।

**উত্তর :** আমাদের জানতে হবে সরকারের উপর নির্ভরশীল হলে চলবে না।

**প্রশ্ন :** আলেমে দ্বীনদের অনগ্রসরতার কারণ কি বলে আপনি মনে করেন?

**উত্তর :** আমার মনে হয়, তারা আধুনিক সভ্যতার সমস্যাগুলো জানতে চেষ্টা করছেন না।

**প্রশ্ন :** আপনি কি মনে করেন তারা অহংকারী বলে এগিয়ে আসছেন না?

**উত্তর :** এ রকম অহংকার আছে কি না আমি জানি না, হয়তো বা নেই। যদি থেকে থাকে তবে অন্যায়। কারণ ইসলামে অহংকারের কোনো জায়গা নেই। আমরা হাদিসও জানি, যার দিলে একবিন্দু অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আমার মনে হয় আধুনিক বিষয় নিয়ে তাদের লেখাপড়া



www.pathagar.com

একেবারেই কম। তারা যদি চিন্তাভাবনা করতেন তাহলে ভাবতেন যে আধুনিক দুনিয়া কি ভাবছে, সমস্যাগুলো কোথায়, আজকে আমাকে কি মোকাবিলা করতে হবে? আজকে তো আমি মোতাজিলা, আশারিয়া মোকাবিলা করছি না–আজকে আমি মোকাবিলা করছি মার্ক্স, হেগেল, কান্ট। অথচ তাদের মাথায় এগুলো আসছে না। সুতরাং আমার মনে হয় এটি একটি বড় কাজ হবে যদি আলেমে দ্বীনরা এ দেশে মাদরাসা শিক্ষাকে আপগ্রেড করেন।

**প্রশ্ন :** শিক্ষাব্যবস্থার কথাই যখন আসলো তখন একটি প্রশ্ন, একটি দেশে একসাথে অনেকগুলো শিক্ষাব্যবস্থা চললে দেশের কল্যাণ কতটুকু হয়?

**উত্তর :** এ বিষয়ে আমার পুরো জ্ঞান নেই। কিন্তু আমার মনে হয় এটি একেবারে অসম্ভব নয়। দুই-তিন ধারায় শিক্ষাব্যবস্থা থাকতে পারে। যেমন হোমিওপ্যাথ শিক্ষাব্যবস্থা, এলোপ্যাথিক মেডিকেল সিস্টেম যা ইউরোপের কোনো কোনো দেশে আলাদা আলাদাভাবে পড়ানো হয়।

**প্রশ্ন :** ওটি ঠিক আছে। আমি বলতে চাচ্ছি আমাদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা দূরত্বটা কি বাড়িয়ে দিচ্ছে না? ইংরেজি শিক্ষিতরা মাদরাসার ছেলেদের বলছে কাঠমোল্লা। আবার মাদরাসার ছেলেরা ইংরেজি শিক্ষিতদের বলছে জাহান্নামের লাঠি। এ দূরত্বকে কি পরিহার করা যায় না?

**উত্তর :** আপনার কথা ঠিক। কিন্তু আমি বলছি শিক্ষাব্যবস্থা দু'তিন রকম হতে পারে না এমনটি নয়। যদি প্রত্যেকটি সঠিক হয় তাহলে অসুবিধা নেই এবং এই দুরত্ব দূর করাও কঠিন, যেটি আমরা আগেই আলোচনা করেছি। এটি দূর করতে সময় লাগবে। আমি এক হওয়ার পক্ষে। শিক্ষাব্যবস্থাকে আমাদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতির আদলে তৈরি করার জন্য অনেক বড় আলেম দরকার। সে আলেম কোথায়? আমাদের দেশের আলেমরা কি গত ৫০ বছরে ৫টি অগ্রসর বই লিখেছেন? মাওলানা আকরাম খাঁর 'মোস্তফা চরিত'-এর মতো কয়টি বই রচিত হয়েছে? ইউসুফ আল কারযাভীর 'ইসলামের যাকাতের বিধান'-এর মতো কয়টি বই গত ৫০ বছরে এ দেশে রচিত হয়েছে? মোহাম্মদ আল গাজ্জালীর 'আকিদাতুল ইসলাম'-এর মতো কয়টি বই এদেশে রচিত হয়েছে? আমি তো মাওলানা আকরাম খাঁর 'মোস্তফা চরিত' ছাড়া কোনো বই দেখছি না। আমার উপর আলেম সমাজ রাগ করতে পারেন; কিন্তু আমি সত্যের খাতিরে বলছি, আমরা এ পর্যায়ের বই লিখতে পারিনি। কিন্তু কেন? এ পর্যায়ের বই আল আজহার থেকে প্রতিবছর একাধিক বের হচ্ছে। আমাদের হচ্ছে না কেন? আল আজহার থেকে ইউসুফ আল কারযাভী, মোহাম্মাদ আল গাজ্জালী, সাইয়েদ কুতুব, হাসান আল বান্না বের হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে বের হচ্ছে না কেন? আমাদের দেশে আল্লামা ইকবাল তৈরি হচ্ছে না কেন? মাওলানা মওদূদী তৈরি হচ্ছে না কেন? আমিন আহসান ইসলাহী তৈরি হচ্ছে না কেন? এ বিষয়টি তো তারেদকে বুঝতে হবে।



www.pathagar.com

**প্রশ্ন :** সৌদি আরবের শিক্ষাব্যবস্থায় দেখা যায় ইসলামী ঐতিহ্য এবং বুনিয়াদকেই অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশে কি এমনটি হতে পারে?

**উত্তর :** স্বীকার করতেই হবে সৌদি আরব শিক্ষার ক্ষেত্রে এডুকেশন সিস্টেমটাকে ইসলামের খুব নিকটবর্তী নিয়ে এসেছে। এটি খুব বড় অর্জন। অবাক হবেন পাকিস্তানের স্কুল কারিকুলামে ইসলামের স্থান খুব ভালো। যদিও সেখানে নানান ধরনের সমস্যা আছে। কিন্তু স্কুল কারিকুলাম অনেকাংশে ইসলামাইজ হয়ে গেছে। মিসরের কারিকুলাম অনেকাংশে ইসলামী, মালয়েশিয়ায় একই অবস্থা। আমরা হতভাগ্য দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে একটি যেখানে আমরা সেটি করতে পারিনি। বাংলাদেশের সরকারগুলো ইসলামী ছিল না, এখনো নেই। অতএব দাবি করে আর লাভ কি? ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলো রাজনীতি বেশি করেছে, এসব দিকের কোনো গভীর কাজ তারা করতে পারেনি।

**প্রশ্ন :** কোনো একটি পার্টিও কি করেনি?

**উত্তর :** আমার তো মনে হয় না যে খুব গভীর কাজ করেছে। কাজ করেছে, যেমন আমি একটি পার্টির কথা জানি, যারা নাকি ৭-৮শ' স্কুল চালায়। এতে তাদের স্বতন্ত্র্য কোনো বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠেনি। এখানে তারা আল আজহারের স্কুল সিস্টেমকে অনুসরণ করতে পারতো। আল আজহারের এক হাজার স্কুল রয়েছে।

**প্রশ্ন :** আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান কোন পদ্ধতিতে করতে চান, কুরআন-সুন্নাহ নাকি ইসলামের কোনো নির্দিষ্ট ইমামের মত অনুসারে?

**উত্তর :** এ ব্যাপারে আমি আবার বলবো, যেসব দেশ এ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করছে তারা শুধু আইনের উৎস হিসেবে কুরআন ও সুন্নাহকে স্বীকৃতি দিচ্ছে। ১৯৪৭ সালে আমরাও যখন পাকিস্তানের অংশ তাতেও সংবিধানে বলা হয়েছে আইনের উৎস কুরআন ও সুন্নাহ। কোনো মাযহাবের কথা বলা হয়নি এবং পাকিস্তানে একটি শরিয়াহ এ্যাক্ট পাশ হয়েছে। সে এ্যাক্টে বলে দেয়া হয়েছে, আইনের মূল উৎস কুরআন এবং সুন্নাহ। আর অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ তারা ইমাম নামেই পরিচিত হউক কিংবা মোফাচ্ছের নামেই পরিচিত হউক তাদের মতামত তারা দেখতে পারে। কিন্তু তাদের মতামত মেনে চলতে বাধ্য নয়। আর আমি এটিই বিশ্বাস করি।

**প্রশ্ন :** বাংলাদেশের আলেম সমাজের মধ্যে ঐক্যের অভাব। এর কারণ কি বলে আপনি মনে করেন?

**উত্তর :** আমার মনে হয়, মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থায় তারা উদার মনের কোনো শিক্ষাই পায়নি। আমার বিশ্বাস, মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থায় কোনো উদার মনের মানুষ সৃষ্টি হয় না। বড় মন তৈরি না হলে এদের মধ্যে বিবাদ-বিরোধ তো বেশি হবেই। দেখছেন না সামান্য ছোটখাট বিষয় নিয়েও তারা মারামারি করছে।



www.pathagar.com

এসব কলহ-বিবাদ শেষ হয়ে যাবে যদি তারা একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন যে, মৌলিক বিষয়ে মতবিরোধ ছাড়া ছোটখাট ইজতেহাদি বিষয়গুলো নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হবেন না। ইজতেহাদি বিষয়গুলো নিয়ে বিভিন্ন যুগের আলেমরা বিভিন্ন মত পোষণ করতেই পারেন, সেসব ক্ষেত্রে আমরা একে অপরকে ধরাধরি করবো না। যে বিষয় ইসলামে নিরঙ্কুশভাবে মৌলিক সে বিষয়ে মতবিরোধ আছে বলে আমার মনে হয় না।

**প্রশ্ন :** বাংলাদেশের ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোর মাঝেও ঐক্যের অভাব রয়েছে, ঐক্যের কি কোনো সম্ভাবনা আছে?

**উত্তর :** আমি জানি না, তবে তাদের চেষ্টা করা উচিত। আমার মনে হয়, যে পার্টিগুলো আলাদা হয়ে গেছে তাদের জোর করে একত্র করা উচিত নয়। কিন্তু তাদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব বাড়ানো উচিত। সবচাইতে বড় কথা হলো মনের ব্যাপার। আপনারা যে মতবিরোধের কথা বলছেন, আমার মনে হয় মৌলিক বিষয় নিয়ে ইসলামী বিশ্বে খুব একটি মতবিরোধ নেই।

**প্রশ্ন :** আমরা জানি আপনি একজন সুলেখক। আপনার বইয়ের সংখ্যা কত?

**উত্তর :** বই খুব বেশি লিখেছি এ কথা আমি বলবো না। সব মিলিয়ে হয়তো ৫-৬টি বই হবে। আসলে আমি জাত লেখক নই। প্রয়োজন অনুসারে লিখি। যেমন আমি প্রয়োজন বোধ করলাম যে, উসূল আল ফিকাহর উপর কিছু লেখা দরকার। আমি ২৫ বছর পড়ে সারা উসূলকে সামারাইজ করে একটি বই তৈরি করলাম, যেটি আমেরিকা থেকে প্রকাশ পাবে। ইনশাআল্লাহ এক সময় হয়তো বাংলাও হবে।

এক সময় সোস্যালিজমের যখন খুব প্রভাব ছিল, তখন আমি মনে করলাম সরকারের কি ভূমিকা হবে অর্থনীতিতে—এ নিয়ে একটি বই লিখলাম। এভাবে আমি বিভিন্ন ইস্যুতে বিভিন্ন বই লিখেছি। যেমন—মেয়েদের বিভিন্ন ইস্যু, মেয়েরা চাকরি করতে পারবে কি না, পতিতা সমস্যা, উত্তরাধিকার ইস্যু, সিভিল কোড, তালাকপ্রাপ্তা নারীর খোরপোষ ইত্যাদি। আমি অবাক হলাম এ সমস্ত ইনটেলেকচুয়্যাল ইস্যুগুলো মোকাবিলা করার লোক বাংলাদেশে খুব কম এবং তারা কিছু লিখছে না। যখন লিখছে না তখন আমি এক একটি বিষয়ের উপর লিখতে শুরু করলাম। লিখে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ করতাম এবং লিফলেট আকারে ছড়িয়ে দিতাম। পরে এগুলোকেই একত্র করে বই আকারে প্রকাশ করলাম।

একবার রেডিও থেকে আমাকে বললো, ইসলামী ল'-এর উপর লেকচার দেয়ার জন্য। আমি ধারাবাহিকভাবে লেকচার দিলাম। পরবর্তীতে এটি বই আকারে বের হলো। এ বইটি এখন ইন্টারনেটে আছে। এছাড়াও আরো কিছু বই প্রকাশ হয়েছে। বেশ কিছু প্রবন্ধ আছে যেগুলো এখনো বই আকারে বের হয়নি।



www.pathagar.com

আমি জাত লেখক নই, বরং আমি বলতে পারি আমি বই কম রেখে যাচ্ছি। কিন্তু আমার হাতে গড়া ছাত্র রেখে যাচ্ছি। আমার বই হচ্ছে আমার ছাত্ররা। প্রায় একশ' ছাত্র তৈরি করেছি। তাদের অনেকেই বড় লেখক হয়ে যাবে। আশা করি আমাকে অতিক্রম করে যাবে। আমি বলতে পারি আল্লাহ যদি তৌফিক দেন ইসলামের জন্য কিছু বুদ্ধিজীবী রেখে যাচ্ছি, যাদের হাতে হয়তো হাজার ইনটেলেকচুয়্যাল তৈরি হবে। আমি যে বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন শুরু করেছি এটি পৃথিবীর যে বড় বড় ইসলামী আন্দোলনগুলো আছে তাদের মিত্র হিসেবে কাজ করবে। পাল্টা কোনো আন্দোলন নয়। এ নিয়ে যাতে কেউ আবার ভুল না বোঝে।

**প্রশ্ন :** পীরদের সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?

**উত্তর :** আমার কোনো পীর নেই। আমি পীরদেরকে ইসলামের মূল ঐতিহ্যের অংশ মনে করি না। রাসূল (সা.) আমাদের যে কুরআন-সুন্নাহ এবং পদ্ধতি দিয়ে গেছেন, আমি পীরদের এর কোনো অংশ মনে করি না। আমি এর বেশি কিছু বলতে চাই না। বিষয়টি বিতর্কিত। এ নিয়ে অনেক মতামত হয়েছে। পরবর্তীতে বহু লোক এটিকে গ্রহণ করে নিয়েছেন, অনেক লোক গ্রহণ করেননি। সৌদি আলেমরা এটিকে গ্রহণ করেন না বোধহয়। বোধহয় আহলে হাদিসরা এটিকে গ্রহণ করেন না। আমি নিজে পীরদের কাছে যাই না, যাওয়ার প্রয়োজন মনে করি না।

**প্রশ্ন :** পাশ্চাত্যের যারা ইসলাম গ্রহণ করেন, তাদের যদি জিজ্ঞেস করা হয় 'কেন ইসলাম গ্রহণ করলেন' তারা বলেন, মুসলমানদের দেখে তারা ইসলাম গ্রহণ করেননি, ইসলামকে জেনে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এটি কতটুকু সত্য?

**উত্তর :** এটি সবাই বলে কি না আমার জানা নেই। বেশিরভাগ লোক ইসলাম গ্রহণ করছে কোনো না কোনো মুসলমানের সংস্পর্শে এসে। সে তার কাছে কুরআন পেয়েছে এবং কুরআনটি পড়েছে। সেগুলো দেখে সে ইসলাম গ্রহণ করেছে। হয়তো সে লোকটিকে দেখে করেনি।

**প্রশ্ন :** ধরুন একজন খ্রিস্টান বা ইহুদি একজন মুসলমানের সাথে মিশলো, দেখলো লোকটি ভালো। সে ইসলাম গ্রহণ করলো। ওই নও মুসলিম যখন মুসলিম কমিউনিটির সাথে মিশলো তখন দেখলো মুসলমানদের চরিত্র কুরআন ও হাদিসের সাথে মিলছে না। এ বিষয়টিকে আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

**উত্তর :** আপনি ঠিকই বলেছেন। এটি ঠিক যে মুসলিম সোসাইটি বর্তমানে সাংস্কৃতিক দিকে থেকে বা আখলাকের দৃষ্টিতে ইসলামকে রিপ্রেজেন্ট করছে না। এটি বলা তো ঠিক হবে না আমাদের কালচারে ইসলাম নেই। তবে এটি একটি প্রচার যে, মুসলমান দেখে ইসলাম গ্রহণ করেনি। এ প্রপাগান্ডায় আমাদের কান



www.pathagar.com

দেয়া উচিত নয়। পাশ্চাত্যে মুসলমান হচ্ছে কোনো না কোনো মুসলমানের কাছে এসে। মুসলমান কুরআন পড়তে দেয়। সেই কুরআন পড়ার পর সে প্রভাবিত হয়। খ্রিস্টান ধর্মে বলা হয় আল্লাহ 'তিন জন'। এটি অনেকের মাথায় ঢোকে না। তারা ইসলাম গ্রহণ করেন। মুসলমানদের ভালো মনে করেই তারা ইসলাম গ্রহণ করেন। কেননা মুসলমানদের পরিবার প্রথা, পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব, আত্মীয়তার বন্ধন ভালো, এখানে যেনা-ব্যাভিচার কম ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় তারা অনুধাবন করে এবং তারা এটিকে অনেক বড় কল্যাণ মনে করে। আমরা হয়তো এটিকে গুরুত্ব দেই না।

**প্রশ্ন :** বর্তমানে স্যাটেলাইটের যুগে ইসলামের ভবিষ্যৎ কতটুকু?

**উত্তর :** খুব বেশি। ইসলামের প্রচার এখন অনেক সহজ হয়ে গেছে। যেটি হাজার বছরে করা যায়নি, সেটি এখন দশ বছরে করা যাচ্ছে। তবে কালচারের ক্ষেত্রে সমস্যা আছে। এ ক্ষেত্রে আমি বলবো ইরানকে অনুসরণ করা যেতে পারে। ইরান চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলো করছে এগুলো আমাদের বিবেচনায় আনা উচিত। গান-বাজনা বিষয়ে ড. ইউসুফ আল কারযাভীর যে মত, যা নাকি হালাল-হারামের বিধানের মধ্যে দেয়া হয়েছে এই সীমার মধ্যে থেকে আমাদের চলা উচিত।

কালচারের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিতে হবে। আমরা যদি ইসলামের সৌন্দর্য মানুষের কাছে তুলে ধরতে পারি তাহলে অনেক মানুষ এগিয়ে আসবে। কিন্তু আমরা সেটি পারছি না। এদিকে আমাদের সচেতন হতে হবে। আমাদের উচিত এ ধরনের স্যাটেলাইট চ্যানেল বের করে আনা। সমস্যা হলো মুসলমানরা এ বিষয় নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করেন না, বোঝেনও না। আমাদের দেশেও অনেক দানশীল মুসলমান আছেন যারা ওরসের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে দেন। পীর সাহেবদের টাকা দেন, বিয়েতে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেন অথচ স্যাটেলাইটের বিষয়টির ব্যাপারে আগ্রহ দেখান না। এটি হয়েছে ইসলামের কনসেপ্ট তাদের মধ্যে না থাকার কারণে। এখন প্রশ্ন হলো, কেন কনসেপ্ট নেই? এজন্য দায়ী আলেমরা। তাদের দায়িত্ব ছিল মেইন। কারণ 'আল উলামা ওয়ারেসুল আম্বিয়া'–আম্বিয়ার দায়িত্ব তো ওদেরও পালন করতে হবে।

**প্রশ্ন :** আপনি একজন অর্থনীতিবিদ। বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয়পর্যায়ে পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামী শাসনব্যবস্থা বলবৎ নেই। ইসলামী ব্যাংকের পক্ষে কি পরিপূর্ণ শরিয়াহ মেনে চলা সম্ভব?

**উত্তর :** একথা সত্য যে এ দেশে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী আইন নেই। কিন্তু এটিও সত্য যে আমরা যদি গভীরভাবে চিন্তা করি তাহলে দেখবো আমাদের যে পার্সোনাল ল' সেটি ৯০ ভাগ ইসলামভিত্তিক। হতে পারে পুরোপুরি নয়। বাকী যে কয়েকশ' আইন আছে তা যদি এনালাইসিস করি তাহলে দেখবো অধিকাংশ



www.pathagar.com

আইনে ইসলাম বিরোধী কিছু নেই। যেমন ট্রাফিক আইন, মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ সংক্রান্ত আইন ইত্যাদি। তাই বলা ঠিক হবে না যে বাকি আইনগুলো ইসলাম সম্মত নয়। কয়েকটি আইন আছে যেগুলোতে ইসলাম বিরোধী কিছু উপাদান আছে। যে দেশে ইসলামী আইন রাষ্ট্রীয়ভাবে নেই সেখানে কি পূর্ণাঙ্গ শরিয়াহ্ মেনে ইসলামী ব্যাংক পরিচালনা সম্ভব–এটি একটি কঠিন প্রশ্ন। তবে আমি মনে করি একটি ইসলামী ব্যাংক বর্তমানে যে নিয়ম ও আইন আছে তার প্রায় একশ' ভাগই মেনে চলতে পারে। ইসলামী ব্যাংকগুলোকে কোনো অনৈসলামী ধারা মানতে বাধ্য করা যায়নি। যদি সে ইসলাম না মেনে চলে থাকে তবে এটি তার নিজের দোষ। যেমন ইসলামী ব্যাংকিংয়ের মূল পদ্ধতি হবে মুদারাবা, মুশারাকা বা ব্যবসা (আমরা মুদারাবা বলি বা যাই বলি)। এ সবগুলো করার আইনে কোনো বাধা নেই। বাধা যদি থেকেই থাকে, সেটি হলো ব্যাংকগুলোর ভেতরে। ইসলামী ব্যাংকগুলো যদি ঠিক মতো ব্যবসা না করে থাকে তাহলে এটি ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যায়। এ ত্রুটির জন্য তো রাষ্ট্র বা সরকার বা আইন দায়ী নয়।

**প্রশ্ন :** অনেকে মনে করেন ইসলামী ব্যাংক এবং সুদি ব্যাংকের মধ্যে তেমন পার্থক্য নেই। শুধু কিছু শব্দের হেরফের মাত্র। এ অভিযোগ কতটুকু সত্য?

**উত্তর :** আমি শুধু এটুকু বলতে পারি, জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি আছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। এর দুটি কারণ–একটি হলো ইসলামী ব্যাংকিং এর দুশমন, যারা ইসলামী ব্যাংকিং পছন্দ করে না, জানতে চায় না, তারা এই কারসাজি করছে। না হলে প্রকৃতপক্ষে বিভ্রান্তির কোনো কারণ নেই। এছাড়া আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন। ইসলামী ব্যাংক বিভিন্ন ব্যবসা করছে। লোকে যদি এসব ব্যবসা না বোঝার চেষ্টা করে তাহলে এগুলো তাদেরও একটি ত্রুটি। আবার ইসলামী ব্যাংকগুলোর কর্মকর্তাদের মধ্যে ত্রুটি রয়েছে, তারা যেসব এলাকায় কাছ করছে, জনগণকে তারা সেগুলো বোঝাতে পারছে না। আর এটিও খুব অন্যায় হবে যে, ব্যবসা করার জন্য যেভাবে কেনাবেচা দরকার সেভাবে যদি তারা না করে তাহলেও বিভ্রান্তি হবে। সুতরাং তাদের সঠিকভাবে ব্যবসা করতে হবে। আমি যদি ইসলামের দুশমনদের কথা বলে থাকি তাহলে তার চেয়ে বেশি দোষ আমাদের। কেননা, এমন হতে পারে, আমি অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলছি, গত চল্লিশ বছরে আমি খুতবায় শুনিনি ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং-এর নীতিমালার কথা। আমাদের খতিব সাহবেগণ, ইমামগণ খুতবায় মুদারাবার উপর, ইসলামী ব্যাংকিং-এর উপর এলাচনা করেননি। তারা কোনোদিন তা বলেননি। এমনকি এই যে বড় বড় ওয়াজ মাহফিল, তাফসির হয় সেখানেও শুনিনি ইসলামী ব্যাংকিং আর ব্যবসার কথা। অথচ এসব ওয়াজ মাহফিলের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিং-এর বিরাট পরিচিতি দেয়া সম্ভব। কিন্তু এসব হয় না। এ বিভ্রান্তি দূর করার জন্য আমাদের আলেমদের ভূমিকা নিতে



www.pathagar.com

হবে। তাছাড়া আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশেষ করে মাদরাসা শিক্ষায় ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে পড়ানো হয় না, আমার মনে হয় এটি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। ফিকাহর অংশ হিসেবে ইসলামী ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্স এবং অর্থনীতি পড়ানো উচিত। কওমি মাদ্রাসায় ফিকাহর ২০০ নম্বরের মধ্যে ৫০ নম্বর এসব বিষয়ের উপর হতে পারে।

**প্রশ্ন :** ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা বাংলাদেশে খুব বেশি পরিচিত হয়নি। তবু স্বল্পসময়েই ইসলামী ব্যাংকগুলোর জমা দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। এর প্রধান কারণ কি?

**উত্তর :** আমার মনে হয় আপনার প্রশ্নের মধ্যেই একটি স্ববিরোধিতা আছে। যদি এটি ভালো করে পরিচিত না হতো, যদি জনগণ পছন্দ না করতো তাহলে ইসলামী ব্যাংকের জমা এত দ্রুত বাড়তো না। আর তা এটিই প্রমাণ করছে জনগণ ইসলামী ব্যাংকের সমর্থক। ইসলামী ব্যাংক যদি বেশি করে শাখা করতে পারতো তাহলে জমা আরো বেশি করতে পারতো। তাই আমি বলবো ইসলামী ব্যাংক অপরিচিত এ বক্তব্যকে আর সঠিক বলা যায় না। আমি একটি কথা পরিষ্কার বলতে চাই, ইসলামী ব্যাংকিং-এর কারণে একটি বিরাট খেদমত হয়েছে। আমি যখন ছাত্র ছিলাম, আমার বন্ধু-বান্ধবরা বলতেন ইসলামে সুদ হারাম। তাই ইসলামী ব্যাংক হবে না, ব্যাংক না হলে ইসলামী অর্থনীতি হবে না, ইসলামী অর্থনীতি না হলে ইসলামী রাষ্ট্র হবে না, সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্র অচল। কিন্তু আল্লাহর কি মেহেরবানী ষাটের দশকের দিকে যে ইসলামী ব্যাংকিং আন্দোলন শুরু হয় আশির দশকে এসে তা গতি লাভ করে। পৃথিবীতে বর্তমানে ২শ' এর বেশি ইসলামী ব্যাংক অথবা অর্থকরি প্রতিষ্ঠান হয়ে গেছে। এর একটি লাভ হয়েছে। গত ১৫-২০ বছরে এ প্রশ্নের মোকাবিলা করিনি যে ইসলামী অর্থনীতি সম্ভব নয়। ইসলামী ব্যাংকিংয়ের সফলতার কারণে এর প্রভাব হয়েছে এই, সকল ব্যক্তি মনে মনে ইসলামী অর্থনীতি সম্ভব বলে মেনে নিয়েছে। যে সকল নেতৃত্বের কারণে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু হয়েছে আমরা তাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

**প্রশ্ন :** ইসলামী ব্যাংকিং মুনাফা না সমাজকল্যাণকে বেশি প্রাধান্য দেয়?

**উত্তর :** যে কোনো ব্যক্তি ব্যবসা করলে মুনাফা বেশি করার চেষ্টা করবে, এটি কি অন্যায়? যতটা সম্ভব তার পক্ষে, অত্যাচার না করে, জুলুম না করে, অন্যায় না করে, বৈধ পথে মুনাফা করা অন্যায় কিছু নয়। ইসলামী ব্যাংকিংয়ে ত্রুটি নেই এ কথা আমি বলবো না। তবে আমি জোর দিয়ে বলতে পারি ইসলামী ব্যাংক সমাজকল্যাণের উপর পুরোপুরি জোর দেয়। জনগণের কল্যাণই বড় কথা। তারা শিল্প, ব্যবসা, দেশের জনগণের উন্নতি চায় এবং তারা এটিও মনে করে যে এরই সাথে মুনাফা করা সম্ভব।



www.pathagar.com

**প্রশ্ন :** শরিয়াহ কমিটির সিদ্ধান্তমালা কি উপদেশমূলক না বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত?

**উত্তর :** এ প্রশ্নটি অপ্রয়োজনীয়। কারণ ব্যাংক সর্বাবস্থায় শরিয়াহ মেনে চলে। কিন্তু আইন বলে যে, ব্যাংকের সর্বাপেক্ষা সিদ্ধান্তকারী বডি হচ্ছে বোর্ড। সুতরাং স্বাভাবিকভাবে শরিয়াহ কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ বোর্ডের নিকট তাদের পরামর্শ হিসেবে গণ্য হবে এবং বোর্ড সাধারণত শরিয়াহ কমিটির পরামর্শ গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি কোনো ইসলামী ব্যাংক যদি নিজস্ব শরিয়াহ কমিটির সিদ্ধান্তের উপর পুরোপুরি সন্তুষ্ট না হতে পারে, তাহলে ব্যাংক চাইলে অন্যান্য শ্রেষ্ঠ আলেমদের মতামত গ্রহণ করতে পারে। ইচ্ছে করলে বিশ্বের অন্যান্য ফিকাহ কমিটি যেমন ওআইসি ফিকাহ একাডেমির মতামত নিতে পারে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : গালীব হাসান
**প্রকাশকাল :** মে ২০০২, দারুস সালাম



www.pathagar.com

# ক্ষুদ্রঋণ দ্বারা দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব নয়

**প্রশ্ন :** বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অর্থনীতি নিয়ে আপনার চিন্তাভাবনা কি?

**উত্তর :** জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম একটি প্রধান দেশ। দেশটির রিসোর্সও খারাপ নয়। জমি উর্বর, পানি সম্পদ প্রচুর। বিরাট সমুদ্র উপকূল। সাগরে মাছ আছে। গ্যাস রয়েছে। তেল যে নেই তাও বলা যাবে না। সে সাথে অন্য ধরনের কিছু খনিজ সম্পদও আছে। পর্যটনেরও ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে যদি আমরা তা কাজে লাগাতে পারি। বাংলাদেশের অর্থনীতির দু'টো বৈশিষ্ট্য খেয়াল করতে হবে। শত ব্যর্থতা সত্ত্বেও আমাদের জিডিপি (Gross Domestic Product) গড়ে প্রতি বছর ৪-৫ ভাগ হারে বাড়ছে। ১৯৭৫ সাল থেকেই এ বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। '৭২ থেকে '৭৫ পর্যন্ত একটি ডিফিকাল্ট পিরিয়ড গিয়েছে। সে সময় জিডিপি ডিক্লাইন করে। এরপর জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসলেন। মূলত '৭৭ থেকেই জিডিপি ক্রমাগতভাবে বাড়তে থাকে। এটি বাংলাদেশের একটি সাফল্য। বাংলাদেশের ব্যুরোক্রেসি, পলিটিশিয়ানরা যাই হোন না কেন বা জনগণের মধ্যে নানা ধরনের সমস্যা যাই থাকুক না কেন বাংলাদেশ এটি অর্জন করতে পেরেছে–এটি স্বীকার করতেই হবে। এ সময় আফ্রিকার অনেক দেশ এটি করতে পারেনি। আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার অনেক দেশেরই নেগেটিভ গ্রোথ ছিল।

বর্তমান অর্থনীতি নিয়ে কথা বলার আগে মনে রাখতে হবে, আমাদের সাডেন ব্রেক থ্রো সম্ভব নয়। বিশাল জনসংখ্যার তুলনায় উন্নয়নের বেস অনেক নিচে রয়ে গেছে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, আমরা যদি ৭/৮ ভাগ হারে প্রবৃদ্ধিতে যেতে পারি তাহলে দশ বছরের মধ্যেই আমরা জিডিপিকে দ্বিগুণে নিয়ে যেতে পারবো। এতে লেভেল অফ ইনকামও দ্বিগুণ হয়ে যাবে। বিশ বছরের মধ্যে তা চারগুণ করে ফেলতে পারবো।

কিন্তু সমস্যা হলো আমাদের অস্থির রাজনীতি এবং রাজনৈতিক কোন্দল। যার ফলে পলিসির ধারাবাহিকতা থাকে না। আমরা রাজনৈতিক নীতিমালা মানছি না বা মানতে চাচ্ছি না বলেই এ অস্থিরতা। রাজনীতিতে আমরা অস্ত্র ও পেশীশক্তি ব্যবহার করছি। ভোট রিগিং করছি। দলের পক্ষে সরকারি কর্মচারীদের জড়িয়ে ফেলছি। আমরা সবসময় ক্ষমতায় থাকতে চাচ্ছি। যারাই



www.pathagar.com

ক্ষমতায় যাচ্ছেন তারাই এটি চাচ্ছেন। জনগণ চাইলে থাকবো, না চাইলে থাকবো না–এটি তারা বলছেন না। ইংল্যান্ড, আমেরিকা কিংবা ফ্রান্সে কিন্তু এরকম নেই। সেখানে জনগণের ভোটই চূড়ান্ত কথা। It is a great achievement of Europe, particularly West Europe. তারা নির্বাচনে পেশীশক্তি ব্যবহার করে না, অস্ত্র ব্যবহার করে না। They are absolutely ready to face consequence. সেখানে কোনো পার্টি হেরে গেলে নেতা নিজেই পদত্যাগ করেন। এ ধরনের ট্রেনিং আমাদের হচ্ছে না।

আমরা যদি রাজনীতিতে নীতিবোধ ফিরিয়ে আনতে পারি, মানবিকতা ফিরিয়ে আনতে পারি, সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পদ্ধতি যদি প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো মেনে চলে, তাহলে আমাদের রাজনীতিও ঠিক হয়ে যাবে। 'তাহলে' অবশ্য অনেক বড় শর্ত। যদি হয় তবে আমরা ৭-৮ ভাগ প্রবৃদ্ধিতে যেতে পারবো। আর এখানেও 'যদি' খুব বড়।

আগেই বলেছি বাংলাদেশে হঠাৎ করে ব্রেক থ্রো করা সম্ভব নয়। এরপরও বর্তমানে যিনি অর্থমন্ত্রী আছেন তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমী ব্যক্তি, অর্থনীতিটা দেখছেন। তবে এটি ঠিক আমাদের প্রাইস লেভেল বেড়েছে। এমন কিছু প্যারামিটার দেখানো যেতে পারে যেগুলো ভালো বলে মনে হয় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি বলবো, জিডিপি একই রয়েছে এবং সামনেও তা-ই হওয়ার সম্ভাবনা। কৃষি উৎপাদন বেড়েছে। এটি একটি ভালো দিক। অর্থনীতির ক্ষেত্রে এমন দু'টি দিকের উন্নতি হয়েছে যাতে আশাবাদী হওয়া যায়। রেভিনিউ কালেকশনের উন্নতি হয়েছে। আমি বলবো ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। হয়তো ট্যাক্স করে এটি করা হয়েছে। কিন্তু উন্নতি তো হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেড়েছে। রিজার্ভ কমে গেলে আমরা খুব রিস্কে পড়ে যাই। রিজার্ভ না থাকলে ক্রাইসিসকে আমরা কিভাবে মোকাবিলা করবো? হঠাৎ যদি কোনো সময় দশ লাখ টন খাদ্য আমদানি করতে হয় তাহলে আমরা কি করবো? রিজার্ভ না থাকলে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ সহজেই আমাদের ঘাড়ে চেপে বসবে। আমাদের রিজার্ভ এখন ১.৫ বা ১.৭ বিলিয়নে দাঁড়িয়েছে। অর্ধ বিলিয়ন থেকে নিশ্চয় এটি ভালো অবস্থা। আমি বলবো, অর্থনীতির অবস্থা মন্দ নয়। ট্রেন্ডটা মন্দ নয়। আমার মনে হয় ট্রেন্ড ঠিক আছে।

**প্রশ্ন :** সরকারের পক্ষ থেকে জিডিপির যে হিসাব দেয়া হয় তা জনগণ কিন্তু কখনোই বিশ্বাস করতে চায় না। তারা বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থাটাই কি বিবেচনা করে না?

**উত্তর :** জনগণকে আমি বলবো এটি বিশ্বাস করা উচিত। তার কারণ হচ্ছে হিসাবগুলো প্রথম তৈরি করে আমাদের পরিসংখ্যান ব্যুরো। কিছু হিসাব তৈরি করে বাংলাদেশ ব্যাংক। এটি বিশেষজ্ঞরা করেন। সুতরাং এখানে কোনো



www.pathagar.com

অসংগতি সম্ভব নয়। আবার ওয়ার্ল্ড ব্যাংক সবকিছুর আলাদা হিসাব রাখে। আইএমএফ, ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের লোকাল অফিস আমদানি, রফতানি, রেমিট্যান্সের প্রতিদিনের তথ্য পাচ্ছে।

হ্যাঁ, এটি ঠিক কিছু কিছু ব্যাপার তো জনগণকে স্পর্শ করবে না। একটি ছোট অংশ ছাড়া জনগণের লেভেলে সবাই কিছু জিনিস বুঝবেও না–যেমন ইনফ্লেশন রেট কিভাবে ডিটেইল ক্যালকুলেশন করা হয় অথবা বাংলাদেশের টাকার সাথে অন্যদের টাকাকে কিভাবে মেলানো হয়। আরেকটি বিষয়, আমাদের ডিস্ট্রিবিউশনে কিছু সমস্যা হয়তো রয়েছে। সম্পদ যেটুকু বাড়ছে সেটুকু সব সেকশনেই ফ্লো করছে না।

এ প্রসঙ্গে আমি একটি কথা বলতে চাই, সেটি হলো, বাংলাদেশের দারিদ্র্য কি কমছে? আমরা নিজেরাই যদি স্টাডি করি তাহলে দেখবো গ্রামে এখন কয়জনে খালি পায়ে চলে, বিশ বছর আগে কয়জনে চলতো। খালি পায়ে চলা লোকের সংখ্যা এখন অনেক কম। স্কুলে যাওয়ার সংখ্যা বেড়েছে। মাস্টাররা যতই ফাঁকি দিন না কেন প্রায় একশত ভাগ ছেলেমেয়েই স্কুলে যাচ্ছে। মানুষ খালি গায়ে থাকছে না, জামা পরছে। কাজেই আমরা অস্বীকার করতে পারবো না যে ২০-৩০ বছর আগের তুলনায় নব্বই ভাগ গ্রামেই পরিবর্তনের একটি ব্যাপার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শহরেও এটি হচ্ছে।

আসলে ব্যাপারটি হলো বাংলাদেশীরা একটি সমালোচক জাতি। তারা ভালোটা কম দেখে। সবকিছুতেই মন্দ দিয়ে শুরু করে। আমরা আবেগপ্রবণ ও ভাবপ্রবণ জাতি। আমি নিজেও এর ব্যতিক্রম নই। নিজের দলের সরকার না হলে আমরা কেবল মন্দটাই দেখি। আবার কেউ সবকিছুকেই ভালো বলে।

**প্রশ্ন :** মানুষের এ নেতিবাচক চিন্তা অথবা অস্থিরতার পেছনে কোন কোন বিষয়গুলো ক্রিয়াশীল বলে আপনি মনে করেন?

**উত্তর :** অস্থিরতার পিছনে অনেকগুলো কারণ রয়েছে। প্রশাসনের অবনতি এর একটি কারণ। পোর্ট, এয়ারপোর্ট কিংবা অফিসগুলোর দিকে যখন তাকাই তখন আমি বলতে বাধ্য হই '৭০-এ অবস্থা অনেক ভালো ছিল। পোর্টগুলোতে বিশৃঙ্খলা ছিল না, এয়ারপোর্টে বিশৃঙ্খলা ছিল না। বর্তমানে সবকিছুতেই একটি বিশৃঙ্খলা। আর রাজনীতিতে তো রয়েছেই। এটি অস্থিরতার অন্যতম একটি শক্তিশালী কারণ। The nation is deeply divided now. হয়তো এটি '৫৪ পর্যন্ত ছিল না। '৫৮-র পরে মার্শাল ল'র বিরুদ্ধে যে জনমত তাতে সবাই একমত ছিল। কিন্তু '৬৬-তে এসে জাতি কেমন করে যেন দু'ভাগ হয়ে গেল এবং যে কোনোভাবেই হোক সেটি বাংলাদেশ হওয়ার পরও চলতে থাকলো। স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ এবং অন্যান্যরা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেল। বিএনপি ক্ষমতায় আসলো। বিএনপি এবং অন্যান্যরা–এ ধরনের একটি



www.pathagar.com

বিভাজন কেমন করে যেন চলে আসলো। এ ধরনের বিভাজন একটি জাতির জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

আমি বলতে চাই, বাংলাদেশে যারা সেকুলার রাজনীতি করেন তাদেরকেই একটি বিষয় মেনে নিতে হবে। এদেশে ইসলামের যে ভূমিকা রয়েছে সেটিকে তাদের স্বীকার করতে হবে। কারণ এটিই সত্য। সত্যকে অস্বীকার করে কোনো লাভ নেই। গণতন্ত্রের ব্যাপারে এখানে খুব একটি বিরোধ নেই। আমাদেরকে বাংলাদেশ কেন্দ্রিক চিন্তা করতে হবে। Bangladesh is a piller of our thought. আমাদের দেশের নব্বই ভাগ মানুষ মুসলিম। আমরা যদি মেনে নিই Islam will have very strong influence in its public life–তাহলে বিরোধটা কমে আসে। আর এটি তো সত্য যে Islam is a great civilization. Arter colonial period it is rising again. ইসলাম সম্পর্কে আজ ভুল বোঝাবুঝি কমছে–এটি আশার কথা। ইসলাম কারো জন্য সমস্যা নয়। ইসলাম মানবাধিকার, নারীর অধিকার, মানুষের মৌলিক অধিকারে বিশ্বাস করে। ইসলাম গণতান্ত্রিক সরকার এবং সংবিধান পদ্ধতিতে বিশ্বাস করে। সন্ত্রাসবাদে ইসলামের বিশ্বাস নেই। ইসলাম চরমপন্থায় বিশ্বাস করে না।

দেশের অধিকাংশ মানুষই মুসলমান। তারা হজ করেন, নামাজ পড়েন, রোজা রাখেন, কুরআন পড়েন। কাজেই তারা যদি ইসলামকে সঠিকভাবে আত্মস্থ করতে পারেন তাহলে জাতির এ বিভক্তি চলে যাবে।

**প্রশ্ন :** আমাদের দেশে এ অস্থিরতার জন্য আপনি কি রাজনৈতিক কারণকেই গুরত্ব দিচ্ছেন বেশি?

**উত্তর :** হ্যাঁ, আমরা যদি চারটি বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারি তাহলে এ অস্থিরতা থাকছে না। Let us agree on four things. প্রথমত, অর্থনীতিতে যে ফ্রি মার্কেট চলছে চলুক। আমার কথা হলো সরকার শুধু প্রয়োজনে হস্তক্ষেপ করবে, অন্যথায় নয়। দ্বিতীয়ত, আমাদের সবাইকে ডেমোক্রেটিক পলিটিক্যাল সিস্টেমে বিশ্বাস করতে হবে। নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার ক্ষমতায় আসবে, অন্য কোনো মাধ্যমে নয়। এটি হলো গণতন্ত্রের মূল কথা। তৃতীয়ত, বাংলাদেশের অস্তিত্ব নিয়ে তাকে ডিফেন্ড করতে হবে। দেশের স্বার্থ আমাদেরকে দেখতে হবে। এ তিনটি বিষয়ে প্রকৃতপক্ষে কারো মধ্যে তেমন কোনো বিরোধ নেই। চতুর্থ যে বিষয়টি আমি বলতে চাই সেটি নিয়েই অনেকে প্রশ্ন তুলে থাকেন। বিষয়টি হলো এদেশে ইসলামের ভূমিকা কি হবে? বাংলাদেশে ইসলামের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ঐতিহাসিকভাবে আসছে। প্রথমেই '৬৬ সালে এ নিয়ে কথা উঠেছিল। এরপর স্বাধীন বাংলাদেশের শুরুতেই সংবিধানে সেকুলারিজম ঢুকানো হলো। আজকে আমরা জানি ইসলামের যে বিধান সেটিই মানবজাতির জন্য প্রকৃত কল্যাণকর। সেকুলারিজমের একটি মূল দিক হচ্ছে অন্য ধর্মাবলম্বীদের উপর কোনো অত্যাচার করা যাবে না। মানুষকে মানুষ হিসেবে



www.pathagar.com

দেখতে হবে। It is also a part of Islam. আর এটুকুকে মেনে নিতে তো কারোর কোনো অসুবিধা নেই। আর যদি এটি হতো তাহলে আমি মনে করি জাতির বিভাজনও থাকতো না। যদি পারতাম তাহলে আমি এ কথাটি আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে বোঝাতাম। আমার নিয়তও আছে এ বিষয়টি নিয়ে তাদের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ করার।

**প্রশ্ন :** আমাদের দেশে অনেক এনজিও-ই রাজনীতির সাথে নানাভাবে জড়িয়ে গেছে। এরা দারিদ্র্য বিমোচনের কথা বলছে। কিন্তু বিশ্বে এমন কোনো নজির নেই যে এনজিওর মাধ্যমে কোনো দেশ তার দারিদ্র্য বিমোচন করতে পেরেছে। আর তা-ই যদি হয়, তাহলে এনজিওদের কাজকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করবেন?

**উত্তর :** প্রত্যেক বিষয়েরই একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত থাকে। আমি বিষয়টিকে পজেটিভলি দেখবো। আমাদের মতো দেশগুলোতে যখন দারিদ্র্য ব্যাপক হচ্ছিল, সমাধান হচ্ছিল না–তখন একটি চিন্তা আসলো। ড. ইউনুস বা তাদের মতো লোকজন এ বিষয়টি নিয়ে ভাবলেন, সমস্যাটি হলো যারা নিম্নবিত্ত মানুষ তারা ঋণ পাচ্ছে না। ভাবনা এলো কি করে এ সমস্যা দূর করা যায়। তারা একটি সাংগঠনিক ভিত্তিতে কাজ শুরু করলেন। শুধু ঋণ দেয়াই নয়, কি করে প্রেসার সৃষ্টির মাধ্যমে সে ঋণ ফেরত নেয়া যায় তার একটি পরিকল্পনা হলো। শুধু ঋণ দিয়ে গেলেই তো চলবে না।

কেউ অভিযোগ করলেন এনজিওদের রাজনৈতিক স্বার্থ রয়েছে। হ্যাঁ থাকতে পারে। আমি সেদিকে যাবো না। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য তো সবারই থাকে। আমি একজনকে দোষী করবো কেন? কিন্তু এটি মনে রাখতে হবে এ ধরনের আইডিয়া সরকারি কর্মচারীরা প্রথম করেছিলেন। আমি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব ছিলাম। আমি জানি পাকিস্তান আমলে Rural Social Service (RSS) নামে এই আইডিয়াটির প্রকৃত প্রোগ্রাম শুরু হয়। হয়তো এখান থেকেই ড. ইউনুস বা তারা তাদের আইডিয়া পিকআপ করেছেন। অথবা স্বতন্ত্র আইডিয়াও তাদের থাকতে পারে। এতে আমি অন্যায় কিছু দেখি না। আমরা তো কতো জায়গা থেকেই কতো আইডিয়া নিয়ে থাকি।

আমি বলবো যারা এগুলো করেছেন তাদের নিয়ত ভালো ছিল। They really wanted to serve their people. কিছুটা যদি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে থাকে তাহলে আমি তাতে অন্যায় কিছু দেখি না।

তবে সত্য যে, ত্রিশ বছর পর এসে এটি প্রমাণ হয়ে গেছে, দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ বড় ভূমিকা পালন করতে পারে না। ক্ষুদ্রঋণ দ্বারা উন্নয়নও সম্ভব নয়। এজন্য ড. ইউনুস এখন গ্রামীণ ব্যাংকের দিকে যত না জোর দিচ্ছেন, তার চেয়ে বেশি দিচ্ছেন আইটি সেক্টর, গ্রামীণ ফোন, গ্রামীণ চেকের



www.pathagar.com

দিকে। এটি ইন্ডিকেট করে যে, তিনি নিজেও বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন। This is not the way, this is a small step. উন্নয়নের পথ হলো অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সার্ভিস সেক্টরে উন্নয়ন, শিক্ষা খাতে উন্নয়ন, কৃষিতে উন্নয়ন। আমাদের সে পথে যেতে হবে।

আমরা মনে করি হার্ডকোর প্রোভার্টি ক্ষুদ্রঋণ দ্বারা দুর করা সম্ভব নয় আরেকটি কারণে। এ সামান্য দুই-পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে উৎপাদনমুখী বিনিয়োগ করে মুলধন ফেরত দেয়া, লাভ বা সুদ ফেরত দেয়া খুবই কষ্টসাধ্য। সত্যিকার অর্থে এর দ্বারা কিছুই হয় না। এজন্যই ইসলামপন্থীরা বলেন, You have to introduce free element or contribution element-যেমন জাকাত। এখানে আদায়ের কোনো কারবার নেই। পুরোপুরি দিয়ে দিতে হয়। কাজেই জাকাত বা জাকাত ধরনের ব্যবস্থা কঠিন দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য আদর্শ ব্যবস্থা। ইতিহাসে তা-ই হয়েছিল। তবে জাকাত দেয়ার ব্যবস্থা সিস্টেমেটিক্যালি করতে হবে।

**প্রশ্ন :** অনেকে বলেছেন, বর্তমানে এনজিও আট-দশটি ব্যবসার মতো স্রেফ একটি ব্যবসা। এ অভিযোগটির ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?

**উত্তর :** আমি এভাবে বলবো না। তাদের মধ্যে যেমন ব্যবসায়ী ধরনের লোক আছে, তেমন আছে বেশকিছু সিনসিয়ার লোক।

**প্রশ্ন :** বর্তমানে বেকার সমস্যা একটি ভয়াবহ সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। এ সমস্যাটি কি কেবলই অর্থনৈতিক, নাকি রাজনৈতিক?

**উত্তর :** রাজনৈতিক নয়, মুলত অর্থনৈতিক। অর্থনৈতিক হিসেবে এটি যদি না মানি তাহলে সেটি রাজনৈতিক হবে। এ অর্থে রাজনৈতিক যে Political leadership has failed to tackle it. আর কোনো অর্থে নয়। এটি গোটা অর্থনীতির প্রশ্ন। আমরা শুরুতে যে ৭-৮ ভাগ উন্নয়নের কথা বলেছি তা যদি করতে পারি, ফ্যামিলি প্ল্যানিং যদি সঠিক পথে এগোয়-তাহলে বেকার সমস্যা যাবে। আর আমাদের সেলফ এমপ্লয়মেন্ট বাড়াতে হবে। আমাদের ..তির কারণে অনেক কিছু নষ্ট হয়ে যায়। আমরা যদি বাজেটের ৪০ হাজার কাটি টাকার অন্তত ৫শ' কোটি টাকা প্রতি বছর সেলফ এমপ্লয়মেন্টে ব্যয় করতে পারি তাহলে আমাদের বর্তমান বেকার সমস্যা দশ বছরে অনেক ভাগ কমে যাবে। তবে এটি অবশ্যই পরিকল্পিত ও দুর্নীতিমুক্তভাবে করতে হবে। কিন্তু আমি মানছি দুর্নীতিমুক্তভাবে করতে পারা মুশকিল।

**প্রশ্ন :** সাধারণ জনগণের সহজ হিসাব হলো দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতি ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে শিল্পের বিকাশ হচ্ছে না। যার কারণে বেকারত্বও কমছে না।



www.pathagar.com

**উত্তর :** হ্যা, এটি ঠিক। আমি অকপটে স্বীকার করছি যে, আমলাতন্ত্র কিছু ভালো কাজ করেছে এটি যেমন সত্য, তেমনি জটিল আমলাতন্ত্র আমাদের গতি স্লো করে দিয়েছে সেটিও সত্য। আমি বলেছি আমরা ৪-৫ ভাগ প্রবৃদ্ধি করেছি। সেটি যেমন আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে কিছুটা হয়েছে তেমনি কিছুটা হয়েছে প্রাইভেট সেক্টরের মাধ্যমে। প্রাইভেট সেক্টরকে যত ফ্রি করা হবে উন্নয়ন তত ত্বরান্বিত হবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই। তখন আমলাতন্ত্র কেবল সহায়ক শক্তি হবে।

আমলাতন্ত্রের ভূমিকাকেও কিন্তু অস্বীকার করা যাবে না, আমাদের দেশে ইনুনাইজেশন প্রোগ্রাম, সেফ টিউবওয়েল প্রোগ্রাম সারা দেশে ছড়িয়েছে কারা? আলটিমেটলি এগুলো তো আমলাতন্ত্রের মাধ্যমেই হয়েছে। এটি আমলাতন্ত্রের ভালো দিক। মন্দ দিকটি হচ্ছে এটি Largely corrupt.

**প্রশ্ন :** এ করাপশনটি কি রাজনৈতিক করাপশন থেকে এসেছে?

**উত্তর :** না, আমার মনে হয় এটি বলা ঠিক হবে না। প্রত্যেকে তারা নিজের কাজের জন্য দায়ী। আমলারা তাদের করাপশনের জন্য দায়ী। আর পলিটিশিয়ানরাও তাদের কাজের জন্য দায়ী। এখানে নিজের সুবিধার জন্য অন্যকে দায়ী করা ঠিক নয়।

**প্রশ্ন :** অভিযোগ রয়েছে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া আমাদের দেশের রাজনীতিবিদরা দুর্নীতিবাজ–এ সুযোগটি কি আমলারা নিচ্ছেন?

**উত্তর :** আমি কিন্তু জানি আল্লাহর আইন ও দুনিয়ার আইন দুই আইনই বলে প্রত্যেকে নিজের কাজের জন্য দায়ী। একথা কেউ বলতে পারবে না যে, আমি চুরি করেছিলাম যেহেতু আমার বস বলেছিলেন। আমি বলবো, আমলারা দুর্নীতিগ্রস্ত নিজেদের অবস্থা ভালো করার জন্য। পলিটিশিয়ানরা দুর্নীতিগ্রস্ত তাদের নিজেদের লাভের জন্য। উভয়েই এখানে জাতির স্বার্থকে অবহেলা করছেন। একজনকে দোষী করবো অপরকে করবো না–আমি এ নীতিতে বিশ্বাসী নই। That will be very improper, both groups are responsible. তবে এটি ঠিক দেশের যা কিছু উন্নতি হয়েছে তা তাদের জন্যই হয়েছে, যা হয়নি তার জন্যও তারা দায়ী। প্রশ্ন হলো, আমরা বিষয়টিকে কিভাবে দেখবো, 'হাফ ফুল' নাকি 'হাফ খালি'?

**প্রশ্ন :** আমাদের মনে হচ্ছে আপনি 'হাফ ফুল' বলার পক্ষে।

**উত্তর :** আমি মনে করি মানুষের জীবনকে পজেটিভভাবে দেখা উচিত। পজেটিভভাবে না দেখার কারণেই যত ঝামেলা। আমি যে ম্যাসেজ দিতে চাই সেটি হলো, ইসলামপন্থীরা যেন এ বিষয়টি বোঝে। How to be Al-Amin and Al-Sadek. রাসূল (সা.) নবী হওয়ার আগে আল-আমিন হয়েছিলেন, আল-সাদেক হয়েছিলেন। আমরা কেন সেভাবে গ্রহণীয় হচ্ছি না?



www.pathagar.com

**প্রশ্ন :** আপনি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (National Board of Revenue - NBR) চেয়ারম্যান ছিলেন। যুগান্তকারী কর ব্যবস্থা ভ্যাট-এর সূচনাকারী। প্রশ্ন হলো, এদেশে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে বাধাটা কোথায়?

**উত্তর :** সত্যিকারভাবে বলা কষ্টসাধ্য যে আসল বাধাটি কি বা কোথায়। তবে আমি বলবো কেউ ইনকাম ট্যাক্স দিতে চায় না। এজন্য প্রধানত করদাতারাই দায়ী। তারা হয়তো বলবেন, আমরা নিয়মকানুন জানি না, পদক্ষেপগুলো কঠিন। কিন্তু আমার মনে হয় ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল সহ এরকম প্রফেশনালরা যত রোজগারই করুক না কেন তাদের ডিক্লারেশন খুবই সামান্য। তারা ঠিকভাবে কর দিচ্ছেন না। ছোট ব্যবসায়ীরা বলতে গেলে খুবই ফাঁকি দিচ্ছেন। বর্তমানে আমাদের যে ইনকাম ট্যাক্স রেট তা বিশ্বের অনেক দেশের তুলনায় খুবই কম। একে কোনোভাবেই হাই রেট বলা যাবে না। ইনকাম ট্যাক্স না দেয়ার কোনো যুক্তি নেই। আমার মনে হয় লিস্টেড কোম্পানি বাদ দিলে ট্যাক্স ফাঁকির পরিমাণ ৬০ থেকে ৭০ ভাগ। এমনকি ৮০ ভাগও হতে পারে। সত্যিকার অর্থে এর কোনো সমাধান নেই। সমাধান সম্ভব হতো যদি ইনকাম ট্যাক্সের লোকজন ঠিকমতো তা আদায়ের ব্যবস্থা নিতেন, তারা যদি নিজেরা দুর্নীতিগ্রস্ত না হতেন। এটি মানতেই হবে যে, ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট বাই এন্ড লার্জ দুর্নীতিগ্রস্ত–This is the reality of Bangladesh. এটি কারোর বিরুদ্ধে নিন্দার জন্য বলছি না। এটি না বলা হলে বলতে হবে সবাই সাধু। তা বলার তো কোনো সুযোগ নেই। কাজেই বিট বাই বিট এগোতে হবে।

ইনকাম ট্যাক্সের একটি ভালো দিক যা সরকার করতে বাধ্য হয়েছে–তা হলো উইথহোল্ডিং ট্যাক্স করা। অর্থাৎ যেখানেই সম্ভব আগে ট্যাক্স নিয়ে নেয়া। আমি বলবো এটি করা সঠিক হয়েছে।

সংকটের আরেকটি দিক হলো কর দেয়ার ব্যাপারে আমাদের অনীহা। এটি একটি বড় ফ্যাক্টর। আমাদের ট্যাক্স কালচারটি সেভাবে গড়ে ওঠেনি। ইউরোপ-আমেরিকাতে ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দেয়া কঠিন ব্যাপার। আমি শুধু এটুকুই বলবো ইউরোপ, আমেরিকার এ সংক্রান্ত আরো কিছু প্রসিডিউর আমাদের কর ব্যবস্থায় যদি অন্তর্ভুক্ত করা দরকার হয় তাহলে তা করতে হবে। বাকি ট্যাক্সের ক্ষেত্রে–যেমন কাস্টমস ডিউটি, ভ্যাট প্রভৃতিতে ইমপোর্ট পর্যায়ে যে রেভিনিউ আসার কথা তার ৯৮ ভাগই চলে আসে বলে আমার ধারণা। লোকাল ম্যানুফ্যাকচারিং লেভেলে যে ট্যাক্স তাতে আমার ধারণা বড় বা মাঝারি ইন্ড্রাস্ট্রিজে ফাঁকি দেয়া কঠিন। কারণ নানা ধরনের লিংকস এর সাথে রয়েছে। কিন্তু ছোট সেক্টরে ফাঁকি দেয়া এখনো সম্ভব। সার্ভিস সেক্টর যেমন মিস্টির দোকান, হোটেল, ক্লিনিক ইত্যাদির ক্ষেত্রে যে ট্যাক্স ব্যবস্থা চালু আছে তাতে ফাঁকি দেয়ার সুযোগ রয়েছে। তবে বড় বড় হোটেল যেমন সোনারগাঁও, শেরাটন–সেখানে ট্যাক্স ফাঁকি দেয়া সম্ভব নয়।



www.pathagar.com

ট্যাক্স ফাঁকি প্রতিরোধে সবচেয়ে কার্যকরী অস্ত্র হলো অডিট সিস্টেমকে শক্তিশালী করা। যে কোনো কারণেই হোক আমরা অডিট সিস্টেমকে স্ট্রং করতে পারিনি। আমি দু'দফায় কর ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকা সত্ত্বেও অডিট ব্যবস্থার ততটা উন্নয়ন করতে পারিনি। শেষ মেয়াদে অবশ্য আমি মাত্র এক বছর দায়িত্বে ছিলাম। অডিটকে তখন আমি ফোকাসে আনার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু এর মধ্যে আমি রিজাইন করে চলে আসার ফলে বিষয়টি যতটুকু শক্তিশালী করা উচিত ছিল ততটুকু হয়েছে বলে আমার মনে হয় না।

এনবিআর-এর যারা চেয়ারম্যান হন তারা প্রত্যেকেই অনেক যোগ্য ব্যক্তি। আমি আশা করি তারা এদিকটায় বিশেষ নজর দেবেন। এটি খুবই ক্রিটিক্যাল সেক্টর। অডিট ব্যবস্থা জোরদার করা হলে বড়, মাঝারি বা ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে কর ফাঁকি দেয়া কঠিন হয়ে যাবে। আরেকটি কথা–রেট না বাড়িয়ে ইনকাম ট্যাক্সই আমাদের বেশি করে আদায় করতে হবে। একটি কথা বলি, যদিও শিল্পপতিরা আমার এ বক্তব্য পছন্দ করবেন না, সত্যি কথা হচ্ছে ট্যাক্স হলিডে রেখে এতো লো রেট গ্রহণীয় নয়। আমরা ট্যাক্স হলিডে যদি তুলে দিতে পারতাম তাহলে রেট কমানো যেত। ট্যাক্স হলিডের বিষয়টি রিভিউ করা দরকার। আমি বলবো, দেশের স্বার্থেই ট্যাক্স হলিডে তুলে দেয়া দরকার। শুধু রফতানি আয়ের উপর ট্যাক্স করা উচিত নয়। এ কথাটি আইএমএফ, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বারবারই বলে আসছে। তবে প্রত্যেক সরকারই রাজনৈতিক কারণে এটি করে না। কারণ রাজনীতিবিদরা নির্বাচনের আগে শিল্পপতি বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে টাকা নেন। এটি করা সম্ভব যদি দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো এ ব্যাপারে একমত হয়ে যায়।

**প্রশ্ন :** আপনি আইএমএফ, ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের কথা বললেন। কিন্তু তারা নিজেরাই স্বীকার করেছে যে, তাদের প্রেসক্রিপশনে কোনো দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। এরপরও আমরা এ দু'টি প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে দুর্বল। তাদের কাছ থেকে বেশি অর্থ পেলে সরকার নিজেকে সফল দাবি করে। অন্যদিকে অর্থের কম প্রাপ্তিকে বিরোধী দল সরকারের ব্যর্থতা বলে চিহ্নিত করে। বিষয়টি আপনি ব্যাখ্যা করবেন কি?

**উত্তর :** আমরা আমাদের সিস্টেমের উন্নয়ন করতে পারছিলাম না, কারণ আমাদের আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা নেই। যেমন, ট্যাক্স সিস্টেম। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ট্যাক্স সিস্টেম কি তা আমাদের জানা নেই। আর তা জানতে গেলে আমাদের কয়েক বছর লেগে যাবে। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ও আইএমএফ-এর সুবিধা হলো তাদের কার্যালয়ে সমস্ত আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা মজুদ আছে। তারা যে কোনো দেশে টিম পাঠিয়ে দেখতে পারে আন্তর্জাতিক অবস্থার আলোকে সে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার পার্থক্যটা কোথায়। আর সে আলোকে তারা পরামর্শ দিতে পারে। আমি অকপটে স্বীকার করবো তাদের কারণে আমাদের সিস্টেমের উন্নতি হয়েছে।



www.pathagar.com

অন্যদিকে আমি গভীরভাবে লক্ষ্য করছি যে, এ দু'টি প্রতিষ্ঠানের অর্থ নিয়ে একটি জাতি লাভবান হয় আবার হয় না। লাভবান হয় সাময়িকভাবে। শেষ পর্যন্ত বিশাল ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ে। এ কারণে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিশ্বে এখন এক নতুন দাসত্বের সৃষ্টি হয়েছে। সেটি হলো ঋণ দাসত্ব (Debt Slavery)। আগে ব্যক্তি দাস হতো, এখন জাতি দাস হয়ে যাচ্ছে। এ দাসত্ব হচ্ছে দু'টি শক্তির কাছে–ইউরোপ ও আমেরিকা। আর তাদেরকে এ কাজে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা করছে আইএমএফ ও ওয়ার্ল্ড ব্যাংক। তাহলে, আসল ব্যাপার দাঁড়ালো বিশ্ব দাসত্বের এক নতুন কিসসা।

প্রাচীন রোমান আইনে দেখা যায় কেউ ঋণ শোধ করতে না পারলে তাকে দাস বানানো যেত। কিন্তু আজ অফিসিয়ালি বলা হচ্ছে না যে, You are a slave–কিন্তু বাস্তবে আমরা দাস হয়ে যাচ্ছি। এ বিষয়টি হচ্ছে মূলত একটি দেশের স্বার্থে। সে কাজটি তারা করছে বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সির মাধ্যমে। এজেন্সিগুলো চোখ বুঁজে চরম আনুগত্য দেখিয়ে তার পারপাস সার্ভ করছে। তারা এতো ভালো বেতন ও সুযোগ-সুবিধা দেয় যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কোনো অবস্থাতেই তাদের স্বার্থের বাইরে কথা বলতে পারে না।

আমি বলবো, আইএমএফ ও ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সিস্টেমের উন্নয়ন বিশ্ব অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ভালো। কিন্তু সামগ্রিক উন্নয়ন তাদের কারণে হয়েছে বলে আমি মনে করি না। প্রত্যেক জাতি যদি রাজনৈতিক সচেতন হতো এবং তারা যদি নিজের রিসোর্সে বড় হতো তাহলেই সেটি অনেক ভালো হতো। যেমন বর্তমানে বাংলাদেশ প্রায় বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ পাঁচ হাজার কোটি টাকার মতো আইএমএফ ও ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে ঋণ পায়। এখানে ঋণ শোধেরও একটি প্রশ্ন থেকে যায়। এ দু'টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আজ যারা আন্দোলন করছে, বিক্ষোভ করছে, তারা প্রকৃতপক্ষে সাধারণ গরীব মানুষের পারপাসই সার্ভ করছে। তারা ঠিক কাজটিই করছে।

আমার মূল্যায়ন হচ্ছে এ দু'টি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উন্নয়নের চেয়ে ক্ষতিই হয়েছে বেশি। দাসত্বের সৃষ্টি হয়েছে। আর অর্থনৈতিক দাসত্ব থেকেই তো রাজনৈতিক দাসত্ব, সাংস্কৃতিক দাসত্ব চলে আসে। এ কারণেই বিশ্ব ইতিহাসে আইএমএফ ও ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের ভূমিকাকে আমি পজেটিভ নয়, নেগেটিভই বলবো। সামগ্রিকভাবে ফেল না পাস–এ প্রশ্নের জবাবে আমি বলবো, ফেল।

**প্রশ্ন :** তাহলে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য তৃতীয় বিশ্বের কি করণীয় বলে আপনি মনে করেন?

**উত্তর :** মুসলিম বিশ্ব ও তৃতীয় বিশ্ব সহ সকল দেশের প্রতি আমার প্রেসক্রিপশন হলো, দশ-বিশ বছরের মধ্যে তাদেরকে ফরেন এইড ট্র্যাপ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। তাদের উন্নয়ন বাজেটের ৫-১০ ভাগ কাট করে এবং রেভিনিউ



www.pathagar.com

বাজেটকে ৫-১০ ভাগ কমিয়ে সারপ্লাস বের করতে হবে। ব্যুরোক্রেসি থেকে অপব্যয় কমিয়ে এগুলো করতে হবে। উন্নয়ন বাজেটকেও ১০-১৫ ভাগ কমিয়ে ফেলতে হবে। এটি করতে পারলে আমি মনে করি, ইনশাআল্লাহ আমরা অর্থনৈতিক দাসত্ব থেকে বেরিয়ে আসতে পারবো।

কিন্তু এটি সম্ভব হচ্ছে না কেন? কারণ এর মধ্যে আমলা ও রাজনীতিবিদদের একটি স্বার্থ জড়িয়ে গেছে। ঋণ আসা মানে কারো এজেন্সি হয়, কারো কন্ট্রাক্ট হয়, কারো কনসালটেন্সি হয়, কারো ছেলেমেয়েরা বিদেশে পড়তে পারে, বিদেশ ভ্রমণ করা যায়, প্লেজার ট্রিপের ব্যবস্থা হয়, বিদেশে ব্যাংক ব্যালেন্স করা যায়।

**প্রশ্ন :** অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা বলে তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেই বিভিন্ন সময়ভিত্তিক পরিকল্পনা (যেমন পাঁচশালা) নেয়া হয়। এ ধরনের পরিকল্পনা কি কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আদৌ সহায়ক।

**উত্তর :** আমেরিকা, বৃটেনে কিন্তু এ ধরনের পরিকল্পনা নেয়া হয় না। সম্ভবত ফ্রান্সেও নেই। আগেও ছিল না। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন New Economy Plan (NEP) নামে প্রথম এ ধরনের পাঁচশালা পরিকল্পনা নেয়। যখন কমান্ড বা সোসালিস্ট ইকোনোমির বিষয়টি আসলো তখন তারা এ ধরনের প্ল্যান করলো। পরিকল্পিতভাবে কাজ করার জন্যই মূলত এটি করা হয়েছিল। সে থেকেই আসলো প্ল্যানড ইকোনোমি। আইডিয়াটি সোসালিস্ট চিন্তা থেকেই বেরিয়ে আসে। আইডিয়াটি ভালো। সোসালিজম বা ক্যাপিটালিজমের সবই যে খারাপ তা তো নয়। ক্যাপিটালিজমই তো ব্যাংক ব্যবস্থা চালু করেছে। সেটি তো আমাদের কাজে লাগছে। অর্থনীতিকে সে কিভাবে কাজে লাগাবে সে ব্যাপারে সরকারের একটি পরিকল্পনা থাকা দরকার। সে প্ল্যানের ভিত্তিতে সরকারের মন্ত্রণালয়গুলো চলতে পারে। সরকার যদি ছোটও হয় তাকে অন্তত দশটি রাস্তা বানাতে হবে, একটি এয়ারপোর্ট বানাতে হবে, একটি পোর্টের উন্নয়ন করতে হবে। তার জন্য একটি পরিকল্পনা করা আমি সঙ্গত মনে করি।

হ্যাঁ, তাহলে আমেরিকা কেন এটি করে না? তাদের প্রাইভেট সেক্টর খুবই উন্নত। বলতে গেলে সরকারি সেক্টর নেই বললেই চলে। আমাদেরও যদি সরকারি সেক্টর একেবারে ছোট থাকে তাহলে আর এ ধরনের পরিকল্পনা করার প্রয়োজন নেই। আমেরিকায় উন্নয়ন কার্যক্রম লোকাল বা সিটি গভর্নমেন্ট করে থাকে বার্ষিক বাজেটের ভিত্তিতে। কাজেই যে কোনোভাবেই হোক সেখানেও প্ল্যান থাকে। কিন্তু ক্যাপিটালিস্টরা এটি মানতে চায় না। তারা বলে এটি ক্যাপিটালিজমের আইডিয়ার বাইরে।

বাংলাদেশ সরকারকে উন্নয়ন বাজেটের প্রায় বিশ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করতে হয় রাস্তাঘাট উন্নয়নে, দারিদ্র্য বিমোচনে বা অন্য ক্ষেত্রে। সে ক্ষেত্রে বার্ষিক পরিকল্পনা দরকার আছে বলে আমি মনে করি। পরিকল্পনা তো



www.pathagar.com

জীবনেরই একটি অংশ। আর অর্থনীতি জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাহলে অর্থনীতিতে পরিকল্পনা থাকবে না কেন?

**প্রশ্ন :** বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উন্নয়ন ক্ষেত্রে সরকার ও প্রাইভেট সেক্টরের ভূমিকা কি ধরনের হওয়া উচিত?

**উত্তর :** বিষয়টি স্টেজের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ অর্থনীতি কোন স্টেজে আছে। যেমন বাংলাদেশে পোর্ট, এয়ারপোর্ট বা হাইওয়েজ, পাওয়ার সেক্টর সহ বড় ধরনের অবকাঠামো প্রাইভেট সেক্টর করবে এটি বর্তমানে আশা করা যায় না। পাঁচশ' কোটি টাকার একটি সার কারখানা করা কি কোনো প্রাইভেট সেক্টরের পক্ষে সম্ভব? কাজেই এখন এ ধরনের কাজ সরকারকেই করতে হবে। প্রাইভেট সেক্টর পর্যাপ্ত পর্যায়ে উন্নতি করলে তখন তাদেরকে সরকার এসব কাজ দিয়ে দিতে পারে। যেমন পাওয়ার সেক্টর সম্পূর্ণই প্রাইভেট সেক্টরকে দিয়ে দেয়া যাবে। এমনকি আমি বলবো তেল কোম্পানিও দেয়া যাবে। সেখানে সরকারের শেয়ার থাকবে। আমি মনে করি, আমরা বর্তমানে যে স্টেজে আছি তাতে সরকারকে এখনো অবকাঠামোতে থাকতে হবে, কোনো ইন্ড্রাস্ট্রিজের ক্ষেত্রে নয়। তবে দু'-একটি ইন্ডাস্ট্রিজের ক্ষেত্রে যেমন পাওয়ার কিংবা সার-কারখানা তৈরির কাজ সরকারকেই করতে হবে।

**প্রশ্ন :** আমাদের দেশে সরকার ছোট হচ্ছে না। বরং হেন কোনো বিষয় নেই যেখানে সরকার নাক গলায় না।

**উত্তর :** সরকারকে অবশ্যই ছোট করে আনতে হবে। বর্তমানে যে ৮-৯ লাখ সরকারি কর্মচারী আছে তা কমাতে হবে। ইউরোপ, আমেরিকায় কেন্দ্রীয় সরকার অত্যন্ত ছোট। লোকাল গভর্নমেন্টই মূলত সব কাজ করে। ট্যাক্স উঠানোর কাজও তারা করে। আর ওখানে অবস্থা এমন যে ট্যাক্স ফাঁকি দেয়ার কোনো উপায় নেই। আবার বলি, আমি ছোট সরকারের পক্ষে। ব্যুরোক্রেসিকে ছোট করে আনতে হবে। এজন্য খুবই সাহসী একজন প্রধানমন্ত্রীর প্রয়োজন হবে। সাহসী অর্থমন্ত্রী লাগবে, সাহসী কেবিনেট লাগবে। কারণ এটি পলিটিক্যালি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। আমরা একটি পরিকল্পনা নিতে পারি যে, দশ বছরের মধ্যে এটি করবো। কিন্তু সব সরকারই ভয় পায় যে, এটি করলে হয়তো পাঁচ বছর পর আর ক্ষমতায় থাকতে পারবে না। এজন্য সকলের ঐকমত্য দরকার।

**প্রশ্ন :** ব্যাংক উচ্চবিত্তের জন্য। নিম্নবিত্ত বা মধ্যবিত্তরা এ থেকে কোনো উপকার পায় না—এ অভিযোগে আপনার বক্তব্য কি?

**উত্তর :** এসব বিষয় মানুষ সরলীকরণ করে ফেলে। প্রথম কথা এ অভিযোগ ঠিক নয়। সুস্পষ্টভাবে সব কাজ বুঝতে হবে। তবে এ কথা বলা ঠিক, ব্যাংক যদি



www.pathagar.com

ইমপোর্ট ফাইন্যান্স করে, ইমপোর্ট যদি সঠিকভাবে হয়-তাহলে তা সবারই কাজে লাগবে। তেমনি এক্সপোর্ট ফাইন্যান্সের ব্যাপারেও একই কথা। এতে রাষ্ট্র বেনিফিট পায়। আর রাষ্ট্র পেলে তো জনগণও পায়। এছাড়া ব্যাংক যদি ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে ফাইন্যান্স করে তাহলে পণ্য তৈরি হয়, কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়-জনগণ উপকৃত হয়। কাজেই এ কথা ঠিক নয় যে নির্দিষ্ট কেউ উপকৃত হচ্ছে না। তবে আমি বলবো ব্যাংকগুলোকে ক্ষুদ্র শিল্পে আরো বেশি ফাইন্যান্স করা উচিত ছিল। ক্ষুদ্র এন্টারপ্রাইজে আরো বেশি ফাইন্যান্স করলে ভালো হতো। একইভাবে সেলফ এমপ্লয়মেন্টের ক্ষেত্রে বলা যায়। কিন্তু যেহেতু আমাদের মানসিকতা ক্যাপিটাল ওরিয়েন্টেড, সোস্যাল ওয়েলফেয়ার ওরিয়েন্টেড বা জাস্টিস ওরিয়েন্টেড নয়, সেহেতু আমরা এদিকে নজর দেই না। সোজা কথা আমরা এলিটে চলে গেছি-গরীবের দুঃখ বুঝি না। রমজান মাসে শুধু ক্ষুধার কষ্ট ছাড়া আর কোনো দুঃখ বুঝি না। We have democracy but not social democracy. আমাদেরকে মানুষের কল্যাণের জন্য পাঠানো হয়েছে। কবি বলেছেন, 'আমরা সবাই পরের তরে'। কিন্তু এ বিষয়টি আর আমাদের মধ্যে নেই। ক্যাপিটালিজম আমাদেরকে মেটেরিয়ালিস্ট বানাচ্ছে।

ক্ষুদ্র বা মাঝারি শিল্পে ঋণ দেয়ার ব্যাপারে ব্যাংকের নেতিবাচক মনোভাবের অনেক কারণ রয়েছে। আমাদের ব্যাংকাররা এমনকি ইসলামী ব্যাংকের ব্যাংকাররাও বলে থাকেন আমরা যদি এদের কাছে বিনিয়োগ করি তাহলে আমাদেরকে এক হাজার, দুই হাজার গ্রাহক নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে। কর্মচারী বেশি নিয়োগ করতে হবে। কাউন্টার বেশি লাগবে। সবকিছুই বেশি বেশি লাগবে। আর যদি সেখানে একবারে একশ' কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয় তাহলে পরিশ্রম কম লাগবে। আসলে ব্যাংকগুলো নিজেদের খরচ বাঁচাতে চায়, সমাজকে নয়। নিজেরা নিজেকেই বাঁচালো-ইসলামের উদ্যোগকে সামনে রাখলো না।

ড. ওমর চাপড়া বলেছেন, ইসলামের উদ্দেশ্য হচ্ছে সামাজিক ন্যায় বিচার, এর অর্থ চাহিদা পূরণ। আগে নিড ফুলফিলমেন্ট করা। এ বিষয়টি আমাদের মধ্যে নেই।

**প্রশ্ন :** অভিযোগ রয়েছে ঋণ খেলাপীর পেছনে ব্যাংকের ভূমিকাই প্রধান। আপনার কি অভিমত?

**উত্তর :** এটি ঠিক নয়, ভুল কথা। মূল কারণ, যারা খেলাপী তারা ঠিকমতো ঋণ ফেরত দিচ্ছেন না। নানারকম তথ্য গোপন করে তারা ঋণ নেন। কিংবা প্রভাব বিস্তার করে ঋণের ব্যবস্থা করেন। প্রভাব বলতে রাজনৈতিক প্রভাব, ইউনিয়নের প্রভাব। আসলে ঋণ খেলাপীর পেছনে এ প্রভাবটার ভূমিকাই প্রধান। তবে ব্যাংকগুলোর দুর্বলতা হলো অযৌক্তিক চাপের সামনে নত হওয়া।



www.pathagar.com

আবার তাদের মধ্যে কিছু দুর্নীতি আছে। খেলাপী ঋণ রিকভারের জন্য তাদের যতটা মনোযোগ দেয়ার দরকার তারা তা দিচ্ছেন না। অন্যদিকে তারা হয়তো বলবেন, Legal system is very complex in our country left by British Government and made more complex by our people. কাজেই It is combination of factors. আমার যেটি মনে হয়, আসল সমাধান হচ্ছে ঋণ দেয়ার সময় মন্দ ঋণ না দেয়া।

আরেকটি কথা বলি, বর্তমানে যে ২৩ ভাগ খেলাপী ঋণ তা আগের হিসাবে প্রায় ৭০ ভাগ। কারণ বর্তমান ঋণ শ্রেণিকরণ পদ্ধতি বেশ টাফ, হিসাব পদ্ধতিও বেশ কড়া। সে অর্থে দশ বছর আগের তুলনায় তা এখন সত্যিই উন্নতি করেছে। কাজেই আমি বলবো, ঋণ খেলাপীর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক ও আমরা যে পরিকল্পনার মাধ্যমে রিফর্ম করেছিলাম, ৯২-৯৬ পর্যন্ত আমি এর দায়িত্বে ছিলাম, তাতে ব্যাংকিং সিস্টেম বেশ উন্নতি করেছে। আমাদের দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা কিন্তু ভালো। অন্যদেশে ব্যাংক বন্ধ হয়ে যায়, দেউলিয়া হয়ে যায়। আমাদের দেশের এখন পর্যন্ত কোনো ব্যাংক বন্ধ হয়নি। বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনাও দেখি না।

**প্রশ্ন : বিশ্বের প্রচলিত অর্থ ব্যবস্থায় কোনো মুসলিম দেশে সার্বিকভাবে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন কি সম্ভব?**

**উত্তর :** প্রথমে বুঝতে হবে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থাটি কি? তবে, এর আগে বলে নিই–এটি সম্ভব। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় বর্তমানের মতোই আমদানি-রফতানি হবে। এরকমই একটি সেন্ট্রাল ব্যাংক মনিটরি পলিসি ফলো করবে। সরকার এরকমই একটি ফিন্যান্স সিস্টেম ফলো করবে। তার একটি ব্যয়নীতি, ট্যাক্সিনীতি থাকবে। বর্তমানের মতোই ব্যাংকিং পলিসি থাকবে। অর্থাৎ ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা কল্পনা রাজ্যের কোনো ব্যাপার নয়। হ্যাঁ, মনিটরি ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন হবে। এ ব্যাপারে আমি ড. ওমর চাপড়ার Towards a Just Monitory System গ্রন্থের Monitory Policy অধ্যায়টি পড়ার জন্য বলবো। ট্যাক্স ব্যবস্থাও প্রায় একই রকম থাকবে। খুব বেশি হলে জাকাত ব্যবস্থা আলাদা করা হবে। জাকাতের এ অর্থ শুধুমাত্র সোস্যাল ওয়েলফেয়ারে ব্যয় হবে। এরপর ব্যয়নীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন হবে। সরকারের 'অগ্রাধিকার' পরিবর্তন হবে। সরকার লাক্সারিস-এ একদমই যাবে না। আগে নিড ফুলফিলমেন্ট। ব্যাংক পলিসিও পরিবর্তন হবে। আমরা সুদকে পরিত্যাগ করবো। যতটা সম্ভব মুদারাবা, মুশারাকা সিস্টেমে যাবো। মুরাবাহা, বাই-মুয়াজ্জল, বাই-সালাম, ইসনিসনাতে যাবো।

আমাদের মধ্যে একটি ধারণা আছে। ওই যে বলে না, খোল নলচে বদলে দেব–পুরোপুরি ভেঙে গড়ে তুলব–এগুলো হচ্ছে আধুনিক অর্থনীতি ও জীবনব্যবস্থা না বোঝার কারণে এবং ইসলাম সম্পর্কে লিটল নলেজ থাকার



www.pathagar.com

কারণে। বাস্তবে সব বদলাতে হবে না। একটি কথা পরিষ্কার করে বলে দিতে চাই যে, আমাদের যে আইন আছে তা গবেষণা করলে দেখা যায় এর তিনটি ভাগ রয়েছে। একটি হচ্ছে, আমাদের ইনহেরিটেন্স-যেমন বিয়ে, তালাক, কাস্টডি, এডপশন ইত্যাদি। এ সবগুলোই ইসলামী আইন মোতাবেক হচ্ছে। আচ্ছা, ট্রাফিক আইনকে কি ইসলাম বিরোধী আইন বলা যাবে? কাজেই বলা যায় ৯০ ভাগ আইনই ইসলাম বিরোধী নয়। এই যে, ফুটবল খেলা-ইসলামী রাষ্ট্রে এটি থাকবে। নামাজের সময় খেলা বন্ধ থাকবে। ক্রিকেটের ক্ষেত্রে পাঁচ দিনের টেস্ট এমনভাবে শুরু করা হবে যা শনিবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত চলে। কারণ শুক্রবারটি জুমার নামাজের জন্য বন্ধ রাখতে হবে।

আসলে ইসলামপন্থীদের আরো গভীর পড়াশুনা দরকার। তাহলে বুঝার ক্ষেত্রে আর কোনো সমস্যা থাকবে না।

**প্রশ্ন :** একটি ব্যক্তিগত প্রশ্ন। আপনাকে কেউ চিন্তাবিদ, কেউ শিক্ষাবিদ, কেউ লেখক, কেউ আমলা আর কেউবা অর্থনীতিবিদ হিসেবে দেখে থাকেন। ইদানিং আপনাকে কেউ কেউ বিশিষ্ট ব্যাংকার হিসেবেও উল্লেখ করেন। আপনার নিজের কোন পরিচয়ে পরিচিত হতে ভালো লাগে?

**উত্তর :** আমি জানি না লোকেরা আমার সম্পর্কে কি ভাবে। আমি নিজেকে মনে করি, আমি একজন ইসলাম বিশ্বাসী মানবসেবক বা সমাজসেবক। আমি এ পরিচয়ে পরিচিত হতে ভালোবাসি। আমি মানুষের উপর অত্যাচার করিনি, তাদের উপর জুলুম করিনি। যতটুকু পেরেছি মানবসেবা ও সমাজসেবার চেষ্টা করছি। তবে আমি এরকম মনে করলেই তো আর হবে না। আমি হয়তো এ ধরনের টাইটেল পাওয়ার যোগ্যই নই। আসলে হয় কি, একটি জাতি যদি অন্ধকারে থাকে তাহলে ছোট মোমবাতিকেও বড় মনে হয়। আমাদের দেশ অন্ধকারে ভরা। সেখানে আমার মতো ক্ষুদ্র লোককেই কেউ কেউ বড় মনে করে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হলো When I see myself, I find myself full of faults.

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : সরদার ফরিদ আহমদ ও ওমর বিশ্বাস
প্রকাশকাল : ৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৩, সাপ্তাহিক সোনার বাংলা



www.pathagar.com

# জিহাদ ও সন্ত্রাস এক নয় গণতন্ত্রই সঠিক পথ

**প্রশ্ন :** বাংলাদেশে পবিত্র কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক একটি সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার আন্দোলন এখন কোন পর্যায়ে রয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

**উত্তর :** প্রাথমিক পর্যায়ে আছে বলেই আমার মনে হয়। অনেক কাজ বাকি।

**প্রশ্ন :** ইসলামী আন্দোলনের সাফল্য বিলম্বিত হবার কারণ কি? এক্ষেত্রে প্রধান বাধাগুলো কি কি?

**উত্তর :** আমাদের যোগ্যতার অভাবই মূল কারণ। আমাদের সকল পর্যায়ে যোগ্যতা অর্থাৎ শিক্ষা, জ্ঞান, Skill ও Dedication বৃদ্ধি করতে হবে।

**প্রশ্ন :** চলমান জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং বিরাজমান সাংবিধানিক ব্যবস্থায় ইসলামের রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থায় উত্তরণের পদ্ধতি কি?

**উত্তর :** আইনসম্মত, শাসনতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক পথেই এগুতে হবে।

**প্রশ্ন :** আপনার কাছে বর্তমান রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা থেকে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় উত্তরণের সঠিক প্রক্রিয়া কোনটি বলে মনে হয়? কেন?

**উত্তর :** ইসলামের সঠিক জ্ঞান ছড়িয়ে দিতে হবে। এর দ্বারা যোগ্য সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রয়োজন বাড়বে। এসব ক্ষেত্রে বর্তমানে আমাদের অভাব রয়েছে।

**প্রশ্ন :** দেশে বিদ্যমান পশ্চিমা ধাঁচের গণতন্ত্র বা সামরিক-অসামরিক শাসন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে অগ্রসরমান ইসলামী দলগুলোর হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা কিভাবে আসবে বলে মনে করেন? কেন?

**উত্তর :** জনগণ যেহেতু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং যেহেতু জনগণ ইসলামের পক্ষে, তাই আজ হোক কাল হোক, জনগণের সমর্থনেই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হবে।

**প্রশ্ন :** বর্তমান অবস্থায় কি ইসলামী দলগুলো সেকুলার গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের সহযোগী হবে, না ইসলামী শক্তির ঐক্য গড়ে প্রেসার গ্রুপ হিসেবে কাজ



www.pathagar.com

করবে? নাকি ময়দানে টিকে থাকার জন্য চলমান সুবিধাবাদী রাজনীতির লেজুড়বৃত্তি করবে?

**উত্তর :** দেশের ইসলামী দলগুলোকে প্রয়োজনে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সহায়তা নিয়েই এগুতে হবে। এটিই বাস্তব অবস্থার দাবি।

**প্রশ্ন :** ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা দেশীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক শক্তিগুলোর ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে নিয়মতান্ত্রিক ব্যালট বিপ্লবের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা কিভাবে সম্ভব?

**উত্তর :** সময় লাগলেও গণতন্ত্রই পথ। অন্য কোনো পথ সঠিক নয়। ১৯৪৮ সালেই সে সময়কার আলেমগণ democracy as enunciated by Islam-কে গ্রহণযোগ্য বলে মতামত দিয়েছেন।

**প্রশ্ন :** অনেক দেশে ইসলামপন্থীরা নির্বাচনে জয়লাভ করেও ক্ষমতায় আসতে পারেনি। এর কারণ ও প্রতিকার কি?

**উত্তর :** এটি অন্যদের ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে। যেমন বার্মাতে বা আরো অনেক দেশে হয়েছে। চূড়ান্ত বিচারে নির্বাচনে বিজয়কে সাময়িকভাবে আটকে রাখতে পারলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা সম্ভব হবে না।

**প্রশ্ন :** ইসলামী দল ও পীর-মাশায়েখগণ একই আল্লাহ, রাসূল, কুরআন ও সুন্নাহকে অনুসরণ করে অভিন্ন লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য কর্মকাণ্ড পরিচালনা করলেও তারা একই মঞ্চ থেকে জনগণের কাছে একই আহ্বান ও একই কর্মসূচি ঘোষণা করতে পারছে না কেন? ঐক্য বা সমঝোতার পথে বাধা কোথায়?

**উত্তর :** ঐক্য জোর করে আদায় করা যায় না। তবে তাদের ছোট ছোট ফিকাহ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কোন্দল করা উচিত নয়। তাদের এসব ক্ষুদ্র কোন্দল বাদ দিতে হবে। মূল বিষয়সমূহে ঐক্য থাকলে তাদের পারস্পরিক সহযোগিতা করা উচিত।

**প্রশ্ন :** আধুনিক যুগ-জিজ্ঞাসা এবং সময়ের দাবি পূরণের জন্য ইসলামী তাত্ত্বিকদের ইজতেহাদের দ্বার উন্মুক্ত রাখা প্রয়োজন আছে কি? থাকলে এজন্য কোনো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠন করা জরুরি বলে কি আপনি মনে করেন?

**উত্তর :** সকল বড় আলেমই এখন ইজতিহাদ করছেন। দরজা খোলার কোনো প্রশ্ন নেই। বিভিন্ন দেশে ফিকাহ কাউন্সিল এবং ওআইসি ফিকাহ একাডেমিও এ ক্ষেত্রে কাজ করছে।

**প্রশ্ন :** জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইসলাম ও মুসলমানরা আজ প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার আক্রমণের শিকার। মিডিয়ার বৈরিতা থেকে আত্মরক্ষা



www.pathagar.com

এবং ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কে একটি ইতিবাচক ধারণা সৃষ্টির লক্ষ্যে মুসলমানদের কি ভূমিকা নেয়া উচিত?

**উত্তর :** আমাদের শক্তিশালী মিডিয়া গড়ে তুলতে হবে। মুসলিম ব্যবসায়ীদের এ ব্যাপারে সহযোগিতা করা উচিত। অবশ্য বিভিন্ন দেশে এ ক্ষেত্রে কাজ শুরু হয়েছে।

**প্রশ্ন :** দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে যেসব মুসলমান একান্ত বাধ্য হয়ে অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে সশস্ত্র জিহাদের পথ অনুসরণ করেছে, তাদের 'আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী' হিসেবে চিহ্নিত করে নির্মূল অভিযান চালানো হচ্ছে। এ থেকে এসব মুসলমানদের নিষ্কৃতির উপায় কি?

**উত্তর :** জিহাদ ও সন্ত্রাস এক নয়। আমাদেরকে জিহাদ কাকে বলে ভালো করে জানতে হবে। সন্ত্রাস পরিহার করতে হবে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : পালাবদল প্রতিবেদক
প্রকাশকাল : পালাবদল ১০ বর্ষ ১২ সংখ্যা



www.pathagar.com

# দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সুপারভাইজড যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তন করা উচিত

**প্রশ্ন :** মাইক্রো ক্রেডিট ব্যবস্থায় এনজিওগুলোর প্রবর্তিত সুদ গ্রুপ সদস্যদের উপর প্রায়ই অভিশাপ হয়ে আসে-এজন্য সুদের মুলোৎপাটন ঘটানো উচিত, না অন্য কোনো ব্যবস্থার মাধ্যমে দারিদ্র্যপীড়িত গ্রুপ সদস্যদের ভাগ্যের পরিবর্তন করা যায়?

**উত্তর :** মাইক্রো ক্রেডিট ব্যবস্থা একটি ঐতিহাসিক ডেভেলপমেন্ট। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে বিভিন্ন সমাজে দারিদ্র্য বৃদ্ধি পেয়েছে। জনসংখ্যাও বেড়েছে। এর মধ্যে যে চরম দারিদ্র্য তা কিন্তু বিশ্বব্যাপী গত একশ' বছরে বেড়েছে। আগে দারিদ্র্য ছিল, কিন্তু চরম দারিদ্র্য কম ছিল। তাই কল্যাণ অর্থনীতি বা মানুষের কল্যাণ নিয়ে যারা চিন্তাভাবনা করছিলেন তারা ভাবছিলেন, কি করা যায়? সমাজতান্ত্রিক ধারায় একরকম চিন্তা করা হচ্ছিল। আবার পুঁজিবাদী বাজার ব্যবস্থায় কি করা যায় তা নিয়েও চিন্তাভাবনা হচ্ছিল। সেসব চিন্তা থেকেই আমাদের মাইক্রো ক্রেডিট বা ক্ষুদ্রঋণের ধারণা আসে। প্রচলিতভাবে বলতে হয় যে, এ বিষয়ে ধারণা দেন ড. ইউনুস। যদিও আমি আমার অন্য এক সাক্ষাৎকারে বলেছি এ ধারণা মুলত সমাজসেবা অধিদপ্তরই প্রথম দেয়। সুপারভাইজিং এবং গ্রুপ গঠনের ধারণাও মূলত তাদের। এটি তাদের এজন্য বলছি যে, ড. ইউনুসের আগে তারা এটি করেছিলেন। আমি ঐ সাক্ষাৎকারে বলেছি যে, ড. ইউনুস সেখান থেকেই নিয়েছেন আমি এটিও বলছি না। হয়তো তিনি নিজেই স্বতন্ত্রভাবে উদ্ভাবন করেছেন। আর স্বতন্ত্রভাবে যে কেউ কোনো কিছু করতেই পারে।

আমাদের দেশে যারা চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করছে তারা মূলত দক্ষ (efficient)। কিন্তু তাদের অভাব হচ্ছে পুঁজি বা সম্পদের। অথচ তারা সামান্য পুঁজিতেই অনেক বড় কাজ করতে পারে। এ ধারণার ভিত্তিই প্রকৃতপক্ষে ড. ইউনুস বিভিন্ন গ্রামে পরীক্ষা করেন। শেষে তিনি গ্রামীণ ব্যাংক গড়ে তোলেন। সেখান থেকেই এ ধারণাটি আরো শত শত এনজিও নিয়ে নেয়। সে সাথে এ মডেলটি বিশ্বের অনেক দেশে নানারকম সংস্থার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। কতটুকু ছড়িয়েছে তা অবশ্য হিসাবের ব্যাপার। এটি গ্রামীণ ব্যাংকে থাকতে পারে।



www.pathagar.com

আমরা আজ দেখি ক্ষুদ্র ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। প্রায় তিন কোটি লোক এর আওতায় চলে আসছে। তাদের এ ব্যবস্থা সুদভিত্তিক। আমরা আরো দেখি তাদের প্রশাসনিক খরচ নানা কারণে বেশি। এ অভিযোগও রয়েছে যে, মাইক্রো ক্রেডিটের যে টাকাটা বিদেশ থেকে আসছে তার একটি বড় অংশ ব্যবস্থাপনায় খরচ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু গরীবরা অল্পই পাচ্ছে। বেশিরভাগ ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনায় সুদের হারটা বেশি। এটি প্রশাসনিক খরচের সাথেই যোগ করে দেয়া হয়েছে। সব মিলিয়েই কিন্তু খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে। আরেকটি জিনিস লক্ষণীয় যে, মাইক্রো ক্রেডিট আন্দোলন শুরু হয়েছে প্রায় ত্রিশ বছর আগে। আর এর মূল্যায়ন শুরু হয়েছে গত দশ বছর ধরে। এখন মূল্যায়নে এটি পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, মাইক্রো ক্রেডিট আন্দোলনের মাধ্যমে যে ব্যাপক বিপ্লব হবে বলে মনে করা হচ্ছিল এবং চরম দারিদ্র্য দূর হবে তা কিন্তু হয়নি। বরং মাইক্রো ক্রেডিটের উপর জনগণের বিশ্বাস বা আস্থাও কমে এসেছে। এমনকি মাত্র ৫-৬ বছর আগে মাইক্রো ক্রেডিটের উপর বিশ্ব সম্মেলন হয়েছিল। তাতে বিশ্বের সকল দেশের অর্থমন্ত্রীরা গিয়েছিলেন। এটি উদ্বোধন করেছিলেন মি. ক্লিনটন। সেখানে তারা ১০০ বিলিয়ন ডলার তহবিল গঠনের অঙ্গীকারও করেছিলেন। কিন্তু বাস্তবে এক বিলিয়ন ডলারও পাওয়া যায়নি। এটি দুঃখজনক। এসব বড় বড় নেতারা এ প্রতিশ্রুতিই বা কেন দিলেন আর তা রক্ষাই বা কেন করলেন না–এটি একটি প্রশ্ন। তবে এ থেকে এটিও প্রমাণ হয় যে, এর উপর মানুষের আস্থা কমেছে। কারণ এর মাধ্যমে উন্নয়ন হবে, সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূর হয়ে যাবে, সমাজ বিপ্লব হয়ে যাবে এমন মনে হচ্ছে না। বরং সঠিক এপ্রোচ বলব এটিই–একটি জাতির সর্বোপরি উন্নয়ন না হলে সে জাতি দারিদ্র্যমুক্ত হবে না। অর্থাৎ দেশের অবকাঠামো, কৃষি, শিল্প তার বিভিন্ন সেবাখাতকে উন্নত করতে হবে এবং বন্টনের দিকে নজর দিতে হবে যাতে এর সুবিধা দরিদ্র সমাজ পেতে পারে। এটি হলো দারিদ্র্য বিমোচনের এবং উন্নয়নের মৌলিক কৌশল। তারপরও কিছু লোক বঞ্চিত থাকবে। তাদের জন্য আমার মতে মাইক্রো ক্রেডিট মুভমেন্ট থাকা উচিত। কিন্তু এর চেয়ে উন্নত ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থা হওয়া দরকার। বর্তমানে মাইক্রো ক্রেডিট ব্যবস্থায় আমি মনে করি ঋণের পরিমাণ বাড়াতে হবে, যদিও এতে কোনো সিকিউরিটি নেয়া হচ্ছে না। কিন্তু উন্নয়নের স্বার্থেই ঋণের পরিমাণ বাড়াতে হবে, এটি পাঁচ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত হওয়া উচিত। এটি হবে শুধু আজকের দিনের হিসাবে। আবার যদি পাঁচ-দশ বছর পরের কথা ধরা হয় সেখানে তখনকার মুদ্রাস্ফীতির হার ধরে টাকার পরিমাণ ঠিক করতে হবে।

আমি মনে করি, অল্প ঋণ দিয়ে এটি আশা করা ঠিক নয় যে, দারিদ্র্য দূর হবে। ঋণ গ্রহীতাকে টাকার উপর এতটা লাভ করতে হবে যাতে টাকা ফেরত দেয়া যায় এবং সে সাথে নিজেরাও চলতে পারে। কিন্তু অল্প টাকায় সুদ সহ আসল টাকা ফেরত দেয়া এবং নিজের চলা বাস্তবে আমার কাছে অবাস্তবই মনে হচ্ছে। আর যদি এ পদ্ধতিই থাকে তাহলে টাকার পরিমাণ তিনগুণ হতে হবে



www.pathagar.com

এবং পাঁচ হাজারের জায়গায় কমপক্ষে পনের হাজার হতে হবে এবং দ্বিতীয়ত, ঋণ পরিশোধের সময় বাড়াতে হবে। সেটি এক বছর নয় বরং তিন বছরে পরিশোধ করার সময় দিতে হবে। তাতে সে ন্যূনতম ঋণ ফেরত দিয়ে নিজে কিছুটা লাভবান হতে পারবে। এতে তারা নিজেরাও চলতে পারবে। এতে ১২ মাসের ১২ কিস্তির জায়গায় ৩৬ কিস্তি হবে; কিস্তির পরিমাণও কম হয়ে যাবে। অনেক দিন ধরে একটি প্রজেক্ট গড়ে তোলারও সুযোগ পাবে। এটি নিজের জীবনধারণেরও অবলম্বন হতে পারে। এটি যদিও এখন পর্যন্ত জটিল, কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা দরকার যে এর মধ্যে পনের হাজার টাকা নিয়ে কিছু করা যায় কি না। না হলে টাকার পরিমাণ আরো বাড়াতে হবে।

মুসলিম বিশ্বের দারিদ্র বিমোচনের জন্য সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে সুপারভাইজড জাকাত প্রদান ব্যবস্থা। কেন সুপারভাইজ করতে হবে? কারণ টাকা নিয়ে গরীবরা খরচ করে ফেলে। সুতরাং জাকাত ব্যবস্থায় টাকা দেয়ার পর সুপারভাইজ করতে হবে। জাকাত তো আর ফিরিয়ে নেয়া যায় না। এখানে সুপারভাইজড জাকাতের ব্যবস্থা চালু করতে হবে। সরকারি পর্যায়ে এটি হতে পারে। এমনও হতে পারে যদি সরকার এটি না করে তাহলে যে সমস্ত মাইক্রো ক্রেডিট অর্গানাইজেশন ইসলামী নীতিমালা মেনে চলবে তাদেরকে জাকাত আদায় করার জন্য ভলান্টারি ভিত্তিতে কর্তৃত্ব দিতে পারে। এটি গবেষণার বিষয়। কারণ আমাদের কাঠামোতে অনেক জিনিস কঠিন মনে হয়। কিন্তু কোনো একটি জিনিস প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে তখন তা সহজ হয়ে যায়। ইসলামী ব্যাংক যখন প্রতিষ্ঠা হয়নি তখন এটি একটি অসম্ভব কঠিন ব্যাপার বলে মনে হতো। কিন্তু এটি এখন কিছুই না বলে মনে হয়। এর থেকে বোঝা যায় প্রতিষ্ঠিত জিনিসের সুবিধা কতো। কাজেই প্রাইভেট সেক্টর থেকেও যদি জাকাত আদায় হয় বা সরকার বড় বড় ইসলামী সংগঠনকে জাকাত আদায় করার কর্তৃত্ব দেয় তাহলে যারা মাইক্রো ক্রেডিট প্রোগ্রাম করতে চান তারা সেই সম্পদকে সুপারভাইজ যাকাত ব্যবস্থায় দিতে পারে। এতে এখানে সুপারভাইজড হবে, গ্রুপ থাকবে, সুপারভিশন থাকবে এবং সবই থাকবে।

এখানে প্রশাসনিক খরচ কিভাবে বহন করা হবে এ প্রশ্ন উঠতে পারে। এজন্য ৫, ১০ কিংবা ১৫% সার্ভিস চার্জ নেয়া যেতে পারে শুধু প্রতিষ্ঠান চালানোর খরচ হিসেবে। তাহলেই এটি করা যাবে আর এটিও বিধান আছে যে প্রশাসনিক খরচ জাকাতের অর্থ থেকে নেয়া যায়। সুতরাং এটি একটি পয়েন্ট যে, যে পরিমাণ জাকাত আদায় করা হবে তার ১০ ভাগ খরচের জন্য রাখা যাবে।

বর্তমানে মাইক্রো ক্রেডিটও থাকতে পারে কিন্তু এর দ্বারা সমস্যার সমাধান হবে না। এটি এভাবেই থাকবে। আর ইসলামী জনতার পক্ষ থেকে দেখতে গেলে এ ব্যবস্থা ঠিক নয়। এদেশের জনগণ মুসলিম। তারা সুদকে মনে-প্রাণে চায় না। তাই এ ব্যবস্থা যদি থাকে তাহলে তিনটি পরিবর্তন আনতে হবে।



www.pathagar.com

প্রথমত, টাকার পরিমাণ বাড়ানো। দ্বিতীয়ত, টাকা ফেরত দেয়ার সময় বাড়ানো, কিস্তির সংখ্যা বাড়ানো। আর তৃতীয়ত, এজন্য শুধু প্রশাসনিক ব্যয় আদায়, সার্ভিস চার্জ হিসেবে যা শরিয়াহ বিশেষজ্ঞগণ বৈধ বলেছেন। অর্থাৎ তারা যা নিয়েছে সেই প্রিন্সিপাল দেবে এবং প্রশাসনিক খরচও দেবে। এটিকে আমরা সার্ভিস চার্জ বলি। এর মধ্য থেকে প্রতিষ্ঠানকে ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যদিকে ইসলামী ব্যবস্থায় সুপাভাইজড জাকাত ব্যবস্থার কথা চিন্তা করা যায়। সরকার যে টাকা জাকাত আদায় করে তা ১০/১৫ কোটি যা-ই হোক না কেন তা সুপারভাইজড মাইক্রো ক্রেডিট ফরমে অর্থাৎ সুপারভাইজড জাকাত ব্যবস্থায় করতে পারে। এখানে মাইক্রো ক্রেডিট ব্যবস্থা ছিল কিন্তু সুপারভাইজও করলো।

আর যদি সরকার খুব বড় আকারে করতে চায় যে, তারা এটিকে ফাউন্ডেশন করে দেবে–তাহলে এটিও করা যায় বিরাট আকারে। আর যদি সরকার তা না করে তাহলে অন্তত যেসব এনজিও বা সংগঠন প্রমাণ করতে পারবে যে তারা ইসলামী নিয়ম মেনে চলবে তাদেরকে কর্তৃত্ব দেয়া উচিত। তাদেরকে সে অর্থ জাকাতের খাতসমূহে ব্যয় করতে হবে। সে সাথে সুপারভাইজ করতে হবে। অর্থাৎ জাকাত ফেরত নেয়া হবে না। শুধু তাদের উপর একটি ব্যয় ধার্য করতে হবে যা শুধুমাত্র খরচের জন্য হবে। সেটি তারা জাকাতের অর্থ থেকে নয় গ্রাহকের নিকট থেকে নিবে। জাকাতের অন্যান্য শরিয়তসম্মত ব্যবহার অবশ্য অব্যাহত থাকবে।

**প্রশ্ন :** মুদ্রাস্ফীতি ঘটানো এবং মুদ্রানীতিকে বিকল করার ক্ষেত্রে সুদের কি কোনো ভূমিকা রয়েছে?

**উত্তর :** অর্থনীতিতে সুদ ফ্যাক্টর কি না এটি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখতে হবে। আমি যা দেখছি এবং নিজেও এ বিষয়ে লিখেছি যে, এটি একটি ফ্যাক্টর। আমি এভাবে বলেছি যে, আমি সুদী ব্যবস্থায় ব্যাংক থেকে ঋণ নিলে আমাকে সুদ দিতে হবে। এটি হতে পার ১০ ভাগ। আবার এর উপর ব্যবসাস্বরূপ আমি ১০ ভাগ লাভ করবো। তাহলে ১০+১০=২০ ভাগ আমি চাপিয়ে দিলাম টাকার উপরে। অর্থাৎ এক লক্ষ টাকা নিয়েছিলাম তারপর ১০ ভাগ কষ্ট অব ফান্ড বলে কাটলাম আর কমপক্ষে দশভাগ আমি লাভ করবো–এ বিশ ভাগ চাপিয়ে দিলাম। ইসলামী ব্যবস্থায় সেখানে শুধু দশভাগ করা হতো। কষ্ট অব ফান্ডের সাথে ঐ দশ ভাগ যোগ করা হতো না। কাজেই এটিকে আমি কন্ট্রিবিউটিং ফ্যাক্টর বলে মনে করি।

**প্রশ্ন :** বাংলাদেশের প্রচলিত কৃষি কাঠামো কৃষির ত্বরিত উন্নয়নের পথে অন্যতম প্রধান অন্তরায়। উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করতে কৃষি কাঠামো কোন পদ্ধতিতে ঢেলে সাজানো যায়?



www.pathagar.com

**উত্তর :** এজন্য সাবেক কৃষিমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর সাক্ষাৎকার নেয়া যেতে পারে। তিনি তার মন্ত্রণালয় ভালো করে চালিয়েছেন। একথা সবাই বলেন। আমিও সবার সাথে একমত যে, তিনি ভালোই চালিয়েছেন। উনার ব্যাপক অভিজ্ঞতাও রয়েছে।

আমাদের কৃষি কাঠামোর মধ্যে ক্ষুদ্র কৃষক একটি দল। এখানে অনেক পুরনো পদ্ধতির চাষাবাদ ব্যবস্থা চালু আছে। তারপরও বলতে হয়, আমাদের জাতীয় উন্নয়নের যা কিছু হচ্ছে অনেকটাই কৃষিতে হচ্ছে। আমাদের গত ৭-৮ বছরের জিডিপির প্রবৃদ্ধির পিছনে বিরাট কন্ট্রিবিউশন হলো কৃষির আর সার্ভিস সেক্টরের। শিল্প সে তুলনায় কম।

কৃষিতে আমাদের পুরানো চাষ পদ্ধতি আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছে। এটি আরো উঠে যাবে। ট্রাক্টর চাষ ব্যাপক হচ্ছে। বপনটা হচ্ছে না, কিন্তু মাড়াইটা মেশিনের সাহায্যে হচ্ছে। এখন জমি ভাগের প্রশ্ন আসে। ইসলামের বিরুদ্ধে এ জমি ভাগ নিয়েই অভিযোগ করা হয়ে থাকে। বলা হয়, এখানে শুধু ভাগই হতে থাকে। আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখন এ অভিযোগটি অনেক বড় ছিল। আমরা নানা উত্তর দিতাম। কিন্তু আজকে বলা হয়, ইরি চাষের জন্য ছোট ছোট ভাগ করতে হয়। পানি আটকে রাখার জন্য এ ধরনের আইল করতে হয়। কাজেই আইল সিস্টেম উচ্চ চাষাবাদের বিরুদ্ধে নয়, কিংবা উন্নয়নের বিরুদ্ধে নয়।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আইল তুলে দেয়া কি সম্ভব? যদি সমবায় ব্যবস্থা থাকতো তাহলে জমির বিষয়টি চিন্তা করা যেত। কিন্তু আমার তো মনে হয় বর্তমানে কো-অপারেটিভ সিস্টেম প্রায় উঠে গেছে। আমি এ মুহূর্তে আইল তুলে দেয়ার পক্ষপাতি নই। এতে অনেক অসুবিধা আছে। মারামারি, হাঙ্গামার ব্যাপারও আছে। জমিকে আমাদের দেশের মানুষ জানের চেয়ে বেশি মূল্যবান মনে করে। এটি স্বাভাবিকও এবং এজন্য সে গণ্ডগোল, মারমারিও করে। হাইব্রিড বীজ কিংবা ইনটেনসিভ কালটিভেশনে এটি কোনো প্রতিবন্ধক নয়। কাজেই আমি বলবো, কৃষির বিষয়টিকে কোনোমতেই হালকাভাবে নেয়া উচিত নয়। এজন্য সংশ্লিষ্ট কৃষিবিদদের সাক্ষাৎকার নেয়া যেতে পারে, এমন একজন কৃষিবিদ যিনি কৃষি নিয়ে গভীরভাবে ভাবেন। কাজেই এ বিষয়টি তাদের কাছ থেকেই নেয়া উচিত। আর ঢেলে সাজানোর প্রশ্নে বলা যায়, একেবারে ঢেলে সাজাতে হবে না। শুধু সাজাতে পারলেই হবে। আমরা বলি একেবারে ভেঙে ফেলতে হবে, উল্টাতে হবে ইত্যাদি–এরকম নয় বিষয়টি। আমার মনে হয় বর্তমানে আমাদের যে সিস্টেম আছে জমির ব্যাপারে সেটি থাকা বাঞ্ছনীয়। বর্গা সিস্টেম যেটি আছে সেটিও ঠিক আছে। কেবল সার্বিক স্টাডির ভিত্তিতেই পরিবর্তন করা উচিত হবে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ওমর বিশ্বাস

প্রকাশকাল : জুলাই ২০০৩, অর্থনীতি গবেষণা



www.pathagar.com

# দারিদ্র্য দূর করার প্রধান উপায় হলো উন্নয়ন

**প্রশ্ন :** দেশে দারিদ্র্য বিমোচনে দেশী-বিদেশী বিভিন্ন সংস্থা ও সরকার কাজ করে যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে দারিদ্র্য বিমোচনে কতটুকু সাফল্য অর্জিত হয়েছে?

**উত্তর :** সাফল্য লাভ করেনি এ কথা বলা ঠিক হবে না। এখানে পরিসংখ্যানের একটি ব্যাপার আছে যা আমি এ মুহূর্তে দিতে পারবো না। যদি আমরা চারদিকে তাকাই তাহলে দেখা যাবে সার্বিক দারিদ্র্য কিছুটা হলেও কমেছে। গ্রামে গেলে দেখা যায় মানুষ পূর্বের তুলনায় ভালো কাপড়-চোপড় পরছে। আজ থেকে পনের-বিশ বছর আগে এরকম অবস্থা ছিল না। এটি সম্ভব হয়েছে সরকারি ও বেসরকারি নীতির কারণে। এ নীতিতে মূলত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এটি ভালো দিক। দেশের উন্নয়ন যদি আমরা করতে পারি তাহলে দারিদ্র্য কমে যাবে। আর এটিই প্রকৃত নীতি হওয়া দরকার। এ উন্নয়ন হওয়া উচিত শিক্ষা, কৃষি ও সেবাখাত সহ সার্বিক ক্ষেত্রে। একই সাথে অবকাঠামোগত উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। এ উন্নয়ন হলে কর্মসংস্থান হবে। এর ফলে মানুষের আয় বাড়বে। একজন ব্যক্তি দারিদ্র্যের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসবে। আমি ইসলামপন্থীদেরকেও বলবো আমরা যেন এটি মনে না করি শুধুমাত্র জাকাতের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব। এ ধারণা ঠিক নয়। জাকাত দারিদ্র্য দূর করতে পারে এমন জনসমাজে যেখানে অধিকাংশ ধনী, অল্পসংখ্যক দরিদ্র। মনে রাখতে হবে সব চেষ্টা করার পর যে দারিদ্র্য থেকে যাবে তা দূর করতে জাকাত হবে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কিন্তু দারিদ্র্য দূর করার প্রধান উপায় হলো উন্নয়ন। যে কোনো দেশের ইসলামী সরকারকেও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।

**প্রশ্ন :** দারিদ্র্য বিমোচনে বিভিন্ন সংস্থা ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করছে যাতে অনেক বেশি সুদ আদায়ের অভিযোগ উঠছে, এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি?

**উত্তর :** দেখুন, অভিযোগ তো আছে। আমরা অনেক কথা অভিযোগ বা ধারণার ভিত্তিতে বলে থাকি। আল্লাহতায়ালা বলেছেন, তোমরা ধারণার পেছনে দৌড়িও না। তাই সত্যিকার ভিত্তি ছাড়া কোনো কথা বলা ঠিক হবে না। আমি কিছু লেখা বিভিন্ন সময় পড়েছি তাতে পেয়েছি বেশিমাত্রায় সুদ নেয়া হচ্ছে। ক্ষুদ্রঋণ বা ক্ষুদ্র ফাইন্যান্সেরও দরকার আছে। তবে এক্ষেত্রে আমি এ আবেদন করতে


www.pathagar.com

পারি–যে এনজিওগুলো সুদের ভিত্তিতে চলে তাদের উচিত প্রশাসনিক ব্যয় কমানো। বড় গাড়ি ব্যবহার কম করা। যে সংস্থার এক গাড়িতে কাজ হয় তাদের দু'টি গাড়ি ব্যবহার না করা। এক্ষেত্রে এনজিও ব্যুরো একটি বিধি করতে পারে। তাতে এনজিও ব্যুরোর প্রতিটি এনজিও, বিশেষ করে যারা ক্ষুদ্রঋণ পরিচালনা করে তাদের প্রশাসনিক ব্যয় পরীক্ষা করার অধিকার থাকবে। এ বিধিতে যেসব এনজিও ক্ষুদ্রঋণ পরিচালনা করে তাদের ব্যয়ের সমান তারা সার্ভিস চার্জ নিতে পারে। অথবা মুদারাবা মুশারাকার ভিত্তিতে পরিচালনা করতে পারে। রিস্ক ফান্ড অবশ্য আলাদা থাকবে।

**প্রশ্ন :** দারিদ্র্য বিমোচনে দেশের নিজস্ব সম্পদকে কি আমরা যথার্থভাবে ব্যবহার করতে পারছি?

**উত্তর :** আমাদের সম্পদ আছে। আবার সম্পদের সীমাবদ্ধতাও আছে। আমি আগেই বলেছি উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব। দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারের নীতির মধ্যে একটি সমস্যা চোখে পড়ছে, সেটি হচ্ছে কঠিন দারিদ্র্য দূর করতে কিছু করা হচ্ছে না। রাস্তায় বা ফুটপাতে যারা অমানবিক জীবনযাপন করছে তাদের দারিদ্র্যতা দূর করতে আমরা কিছু করছি না। উদাহারণ হিসেবে বলি, ঢাকার কমলাপুর রেলস্টেশন থেকে টঙ্গী পর্যন্ত দু'পাশের বস্তিতে যে লোকগুলো বাস করে তাদের দেখলে মনে হয় কুকুর-বেড়ালও এভাবে থাকে না। এগুলো দেখলে মনে হয়, আমার কি অধিকার আছে এ দেশে বাস করার, কি অধিকার আছে গাড়ি চড়ার? আমাদের বাজেটে দারিদ্র্য বিমোচনে ১০-১২ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়, সেখান থেকে ১ বা ২ হাজার কোটি টাকার বিশেষ বরাদ্দ দিয়ে কঠিন দারিদ্র্য দূরীকরণের ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ এদেরকে ঋণ প্রদান বা ফাইন্যান্স করা সম্ভব নয়। এ দারিদ্র্যতা দূর করতে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা নেয়া যেতে পারে। কিছু কিছু বস্তিতে যারা অমানবিক জীবনযাপন করে তাদের ক্যাম্পে সরিয়ে নিতে হবে। এরপর এদের পুনর্বাসন করতে হবে। রেললাইনের পাশে বা এরকম স্থানে রেখে তাদের পুনর্বাসন সম্ভব নয়। এ ধরনের দারিদ্র্য উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে দূর করা সম্ভব নয়। এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার। আমাদের যে সমাজ তাতে এ সমাজের আলোকে বাস্তব চিন্তা করতে হবে। আমাদের সিভিল সার্ভিস দুর্নীতিগ্রস্ত। ইউরোপ-আমেরিকায় সাধারণ মানুষ বা সাধারণ কর্মচারীরা এতটা দুর্নীতিগ্রস্ত নয়। এজন্য দারিদ্র্য বিমোচনে যে কর্মসূচি নেয়া হয় তার ২০-৩০ ভাগ অপচয় হয়। আর যদি ইসলামী সরকার হয় বা সৎ সরকার হয় তবে দুর্নীতি অনেক কমে আসবে–এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

**প্রশ্ন :** দারিদ্র্য বিমোচনে রাজনৈতিক দলগুলো কি ধরনের ভূমিকা পালন করতে পারে?



www.pathagar.com

**উত্তর :** অবশ্যই ভূমিকা নিতে পারে। তারা সমাজের নেতা। তারা সমাজকে প্রভাবিত করতে পারে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে সাধারণভাবে আমাদের রাজনীতিকরা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। রাজনীতিকে ব্যবহার করে কে কতটা আর্থিকভাবে লাভবান হবে তা নিয়ে তারা ব্যস্ত। সত্যিকার অর্থে, রাজনীতিকরা এ দেশে মানবসেবার চিন্তা করে বলে মনে করতে পারি না। আসলে আমাদের যে কোনো পরিকল্পনা বাস্তবতার ভিত্তিতে নিতে হবে। বর্তমানে যে রাজনৈতিক দুর্নীতি চলছে তাতে রাজনৈতিক দলগুলো দারিদ্র্য বিমোচনে তেমন কিছু করতে পারবে না। তারা বহু ভাগে বিভক্ত। তারা একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। তাই আমাদের দারিদ্র্য বিমোচনে প্রাতিষ্ঠানিক যে ব্যবস্থা আছে তাকে ব্যবহার করতে হবে। সরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন–সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভাগসমূহ, প্রাইভেট সেক্টর ও উদ্যোক্তাদের ব্যবহার করতে হবে। সামাজিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সম্ভব হলে এক্ষেত্রে বেশি বেশি প্রচার মাধ্যম বা টেলিভিশনকে ব্যবহার করতে হবে।

সত্যিকার অর্থে আমাদের দেশে সার্বিক উন্নয়নের জন্য ও কঠিন দারিদ্র্য দূর করতে সবাইকে আন্তরিক মনোভাব দেখাতে হবে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : আলফাজ আনাম
প্রকাশকাল : ১৯ ডিসেম্বর ২০০৩, দৈনিক সংগ্রাম



www.pathagar.com

# ভারতের সাথে অমীমাংসিত ইস্যুর ব্যাপারে আলোচনার মাধ্যমে প্যাকেজ ডিল করা উচিত

**প্রশ্ন :** বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার অমীমাংসিত ইস্যুগুলো কিভাবে নিষ্পত্তি করা সম্ভব বলে আপনি মনে করেন?

**উত্তর :** এটি দুঃখজনক যে, ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে অনেক ইস্যু রয়ে গেছে যেটি এখনো নিষ্পত্তি হয়নি। এগুলো আরো অনেক আগেই নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়া উচিত ছিল বলে আমি মনে করি। যাহোক যত দ্রুত সম্ভব এগুলোর নিষ্পত্তি হওয়া উচিত বলে দুই দেশের শান্তিপ্রিয় মানুষ মনে করে। এজন্য দুই দেশের মধ্যে যদি মুক্তমনে আলোচনা হয় তাহলে এগুলোর নিষ্পত্তি সম্ভব। আমাদের এক্সপেরিয়েন্স থেকে বলবো, নিষ্পত্তির জন্য দুই দেশের সরকারের নিয়মিত যোগাযোগ ও আলোচনা অব্যাহত থাকতে হবে। দীর্ঘদিন যাবৎ বিষয়গুলো অমীমাংসিত থাকার কারণে আমার মনে হয় আরেকটি ট্র্যাকে আলোচনা হওয়া দরকার এবং তা হতে হবে দুই দেশের জনগণের সাথে জনগণের বা সিভিল সোসাইটির মধ্যে। আজকাল এ 'টু ট্র্যাক ডিপ্লোম্যাসি' জনপ্রিয় হচ্ছে। একটি হচ্ছে সরকারি পর্যায়ে ডিপ্লোম্যাসি, আরেকটি হচ্ছে পাবলিক লেভেলে বা জনগণের সাথে জনগণের ডিপ্লোম্যাসি। জনগণের সাথে জনগণের ডিপ্লোম্যাসির প্রয়োজন দেখা দেয় যখন দু'দেশের সরকার সমাধান করতে পারে না। আরেকটি কারণ হচ্ছে যখন দু'দেশের মধ্যে নানা কারণে উগ্রমহল থাকে। এ উগ্রমহল সাধারণত জনগণকে নানা কৌশলে শান্তির বিপক্ষে প্রভাবিত করে।

সমস্যা সমাধানে যদি দু'দেশের চিন্তাবিদ বা বুদ্ধিজীবীরা আলোচনা করেন তাহলে তা দু'দেশের জনগণের মধ্যকার অবিশ্বাস দূর করতে সাহায্য করে। এটি শুধু ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে তা নয়; এটি অন্যান্য দেশেও এখন অনুসরণ করা হচ্ছে।

আলোচনা হতে হবে ঢাকা-দিল্লির সাথে। ঢাকা-কলকাতা সাংস্কৃতিক যোগাযোগ হতে পারে। কিন্তু যেহেতু দিল্লি ভারতের রাজধানী ও সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু, তাই আলোচনা হতে হবে ঢাকা-দিল্লি বা রাজধানীর সাথে রাজধানীর। ভারতের জনগণের মূল মতামত গঠিত হচ্ছে দিল্লিতে। তাই ঢাকা-



www.pathagar.com

দিল্লির দু'দেশের সরকার, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিকদের মধ্যে আলোচনা হতে হবে। যাহোক আমি বলবো, সমস্যা সমাধানের জন্য 'টু ট্র্যাক ডিপ্লোম্যাসি' দরকার।

**প্রশ্ন :** আপনার দৃষ্টিতে দু'দেশের মধ্যকার সম্পর্ক উন্নয়নে বাধা কোনটি এবং তা কিভাবে দূর করা যায়?

**উত্তর :** ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে যেসব সমস্যা রয়েছে বা যেসব বিষয় নিষ্পত্তি হয়নি এগুলো নিষ্পত্তি না হওয়ার জন্য আমি কাউকে দায়ী করতে চাই না। এই যে দায়ী করা, যাকে বলে 'ব্লেম গেম'—দায়ী করে কখনো সমাধান হয় না। আমি বিষয়টির গভীরে যেতে চাই। আমি মনে করি, ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি যদি আরো বড় হয় এবং প্রসার লাভ করে, পাশের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের প্রতি যদি তাদের মনোভাব আন্তরিক হয়, তাহলে সমস্যার সমাধান সহজ হয়ে যাবে। বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের বিষয়ে আমার যে অবজারভেশন তা হলো ভারতের গণমাধ্যম বা পত্র-পত্রিকার একাংশ খুবই এগ্রেসিভ লেখে। এতে ভারতের জনগণের মধ্যে বাংলাদেশের প্রতি বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় প্রতিটি রাষ্ট্রই যে সমান বা বাংলাদেশের অধিকার ও মর্যাদাও যে ভারতের সমান তা ভারতের জনগণের একাংশ মনে করতে চায় না, বুঝতে চায় না। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতের অপপ্রচারের জন্যই এমনটি হচ্ছে। যেমন বহুদিন থেকেই অপপ্রচার রয়েছে বাংলাদেশে ১৯৫টি ভারত বিরোধী ক্যাম্প রয়েছে। এটি স্পষ্ট মিথ্যা কথা। কিন্তু তারা এটি ব্যাপকভাবে প্রচার করছে। ভারতের থিংক-ট্যাংকগুলো অবলীলায় এ মিথ্যা প্রচার করায় ভারতের জনগণের মধ্যে বাংলাদেশ বিরোধী মনোভাব তৈরি হয়েছে। এরপর যেমন 'পুশইন'-এর মতো ঘটনা নিত্যদিন ঘটছে। এগুলো তো ঠিক হচ্ছে না। যদি বাংলাদেশ থেকে কেউ অবৈধভাবে ভারতে গিয়েই থাকে তাদের ফেরত দেয়ার বিষয় তো জটিল নয়। ভারত তাদের গ্রেফতার করে বাংলাদেশ সরকারকে জানাতে পারে—সমস্যা সমাধান করা যায়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশে যেসব লিডিং পত্র-পত্রিকা রয়েছে সেগুলোর রিডিং থেকেও আমি বলতে পারি এদেশেও ভারতবিরোধী প্রচারণা রয়েছে যা না থাকা ভালো।

**প্রশ্ন :** অনেকেই বলে থাকেন বাংলাদেশের প্রতিকূলে বিপুল বাণিজ্যঘাটতির জন্য নয়াদিল্লির রক্ষণশীল মনোভাব দায়ী; আপনি কি মনে করেন?

**উত্তর :** আন্তর্জাতি বাণিজ্যে এক দেশের সাথে আরেক দেশের বাণিজ্যঘাটতি থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এটি বিভিন্ন দেশের সাথেই রয়েছে। আমাদের সাথে সৌদি আরব, কুয়েত বা যেসব দেশের কাছ থেকে আমরা তেল কিনি সেসব দেশের সাথেও বাণিজ্যঘাটতি রয়েছে। আরেকটি দিক হচ্ছে ভারত বিরাট অর্থনীতির দেশ। তাদের দেয়ার মতো পণ্য অনেক বেশি, তাই তাদের রফতানি করার মতো পণ্যও অনেক বেশি এবং করছেও। সার্কের যে অ্যাগ্রিমেন্ট


www.pathagar.com

রয়েছে তার মাধ্যমে আমাদের রফতানি বাড়ানোর চেষ্টা রয়েছে। কিন্তু তারপরও তো ইম্ব্যালেন্স রয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান সাহেব একটি ভালো কথা বলেছেন, তা হলো–'ভারত একটি বড় রাষ্ট্র, তাকেই তার অর্থনীতিকে ওপেন করতে হবে, তাহলেই শুধু ইম্ব্যালেন্স কমে যাবে।'

ভারত যদি এক্সপেরিমেন্টালিও তাদের মার্কেট ওপেন করে আর এতে যদি দেখা যায় আমরা এক বা দুই বিলিয়ন ডলার এক্সপোর্ট করি তাতেও ভারতের কোনো উদ্বেগের কারণ নেই। এ সবই হতে হবে সাফটার অধীনে। আমাদের অর্থমন্ত্রী বলেছেন তিনি যখন দিল্লি গেলেন, 'সেখানে কেউ এফটিএ'র কথা বলেনি।' এখানে আমি বিষয়টি ভিন্নভাবে দেখছি–সার্কের রিজিয়নে সাফটার অধীনে বাণিজ্য হওয়া বাস্তবসম্মত। কিন্তু ভারতের সমস্যা হচ্ছে তারা তাদের ইকোনোমিকে অতটা ওপেন করতে পারবে না, কারণ পাকিস্তান তাদের বড় কমপিটিটর। পাকিস্তানও একটি বড় ইকোনোমিক পাওয়ার। তাই এটি সামনে রেখেই ভারত চিন্তা করবে। তবে বাংলাদেশ যা সাপ্লাই করতে পারে সেগুলো যদি ভারত ফ্রি করে দেয়, অন্তত ১০টি আইটেম, তাহলেই এ বাণিজ্যঘাটতি দূর করা সহজ হবে। এটি ভারত বিবেচনা করতে পারে। সাফটার জায়গায় সাফটা থাকবে আবার আমাদের জন্য কিছু বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে। এতে যদি বাংলাদেশ দুই বিলিয়ন ডলারও এক্সপোর্ট করার সুযোগ পায় তাতে ভারতের একটি রেভিনিউ লস হবে কিন্তু বড় কোনো ক্ষতি হবে না। তারা তো অন্যান্য দেশ থেকে প্রডাক্ট নিচ্ছে, সেটি বাংলাদেশ থেকে নিল; তাহলেই তো এ ঘাটতি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। তবে আমার ব্যক্তিগত অভিমত, এ বাণিজ্যঘাটতি নিয়ে বাংলাদেশের এত চিন্তা করার দরকার নেই। চিন্তা করতে হবে যে, আমাদের এক্সপোর্ট অ্যাজ এ হোল টু দ্য ওয়ার্ল্ড বাড়াতে হবে। আমদানির চেয়ে রফতানি বাড়াতে হবে। বিশ্ব লেভেলে সার্বিকভাবে যদি আমাদের এক্সপোর্ট বৃদ্ধি পায় এবং ভারতে যদি তা নাও বাড়ে তাহলেও উদ্বেগের কিছু নেই। আর আমাদের এক্সপোর্ট করার মতো ক্যাপাসিটিও অতো নেই। দুনিয়ার সব মাল আমরা প্রডিউস করি এমন তো নয়। আমাদের সারপ্লাসের পরিমাণই বা কত? সুতরাং আমি ভারতের বিষয় নিয়ে অতো ভাবি না। হ্যাঁ, যদি সাফটার মাধ্যমে হয় ভালো কথা, ভারত যদি এফটিএ'র মাধ্যমে করতে রাজি হয় খুব ভালো কথা। আর তা না হলে সারা দুনিয়া খোলা আছে–তার মাধ্যমেই চিন্তা করতে হবে।

**প্রশ্ন :** বাংলাদেশের উপর দিয়ে মূল ভূখণ্ড থেকে সাত রাজ্যে যাতায়াতের জন্য ট্রানজিট প্রদান ভারতের দাবি। এ বিষয়টি বিবেচনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা ইস্যু–কোনটি প্রধান বিবেচনায় রাখা উচিত বলে আপনি মনে করেন?

**উত্তর :** এ বিষয়টি খুবই সেনসিটিভ। অর্থাৎ এ নিয়ে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক সেনসিটিভ হয়ে গেছে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নানাধরনের বক্তব্যের কারণেই এ



www.pathagar.com

সেনসিটিভিটি তৈরি হয়েছে। তারা এ সাবজেক্টটিকে একাডেমিক রাখেননি। এটিকে রাজনৈতিক ইস্যু বানিয়ে ফেলেছেন। এ পরিস্থিতিতে আমি আবার বলবো, আমাদের অর্থমন্ত্রী ভারতে লাস্ট ভিজিটের আগে পরে যেসব কথা বলেছেন তা খুবই সিগনিফিকেন্ট। এ ধরনের কথাবার্তা আগে আসেনি। বাংলাদেশ, মায়ানমার ও ভারতের মধ্যে পাইপ লাইনের যে কথা উঠে এসেছে এ বিষয়ে তিনি প্যাকেজ ডিলের কথা বলেছেন। যত সময়ই লাগুক না কেন, সামগ্রিক আলোচনার মাধ্যমে এ প্যাকেজ ডিল করে ফেলা উচিত। প্যাকেজ ডিলের একদিকে থাকবে ট্রানজিট প্রসঙ্গ, আরেক দিকে থাকবে পাইপ লাইন প্রশ্ন, থাকবে সীমান্তে সীমানা নির্ধারণ (এখনো ১৫ কিলোমিটার এলাকা অমীমাংসিত রয়ে গেছে), থাকবে তালপট্টি, ছিটমহল সমস্যা, নেপালে আমাদের ট্রানজিটের দাবি–এ সবকিছু নিয়েই একটি প্যাকেজ ডিল করতে হবে। প্যাকেজ ডিল নিয়ে আলোচনা হলে সবগুলো না হলেও প্রধান বিষয়গুলো সমাধানে পৌঁছানো সম্ভব। বিশেষ করে ভারতের ট্রানজিট, আমাদের জন্য নেপালের ট্রানজিট, বর্ডার নির্দিষ্টকরণ–এসব বিষয় একত্রে করা উচিত। আর তা করার সময় রাজনীতিকে প্রাধান্য দেয়া উচিত নয়। রাজনীতিকে প্রধান্য দেয়া ক্ষতি হবে। দু'দেশের লং টার্ম সম্পর্ক, দু'দেশের জেনুইন নিড এবং পারস্পরিকতা–এসবের ভিত্তিতে সমাধান হওয়া উচিত। সাইফুর রহমান সাহেব দীর্ঘদিন পর যে স্পষ্ট কমেন্ট করেছেন তা এতদিন আসেনি। এখন বিষয়টি সামনে এসে যাওয়ায় ভালো হয়েছে।

**প্রশ্ন : সাফটা কার্যকর করার উদ্যোগ নেয়ার পর বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি বা এফটিএ করার প্রয়োজন আছে কি না?**

**উত্তর :** আমি ইতোমধ্যেই এর জবাব দিয়েছি। সাফটাই ভারত চাইবে, এফটিএ চাইবে না এবং সেটিই আগে হওয়া উচিত। ভারত যদি এফটিএতে রাজি হয় ভালো কথা, না হলে এ নিয়ে এগুনোর দরকার নেই।

**প্রশ্ন : ছিটমহল সমস্যা দু'দেশের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন যাবৎ তিক্ত প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করছে। এর সমাধান কিভাবে করা যায়?**

**উত্তর :** আমাদের প্যাকেজ ডিলের আওতায়ই সবকিছু করতে হবে। তবে তা ফেজ-ওয়ান, ফেজ-টু এভাবে হতে পারে। এতদিন ছিটমহলগুলো নিয়ে সমস্যার সমাধান না হওয়ার যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণ নেই। এসব সমাধান ডিপ্লোম্যাটিক্যালি করতে হবে। আর তো কোনো ওয়েও নেই। তবে সেকেন্ড ট্র্যাকে বা সিভিল সোসাইটির মাধ্যমে আলোচনা হলে আমরা বুঝতে পারবো কোনটি ভারতের জন্য সেনসিটিভ আর ভারত বুঝবে কোনটি বাংলাদেশের জন্য সেনসিটিভ। আলোচনার ক্ষেত্র তৈরি হবে। এখন তো রাজনৈতিক উত্তেজনা দ্বারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। যখন দু'দেশের বুদ্ধিমান লোক কোনো বিষয়ে একমত হয়ে যায় তখন সরকারের পক্ষে সে বিষয়ে এগিয়ে যাওয়া সহজ হয়ে যায়।



www.pathagar.com

**প্রশ্ন :** অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন সমস্যা বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হিসেবে কাজ করছে। এ ব্যাপারে আপনার মূল্যায়ন কি? এক্ষেত্রে আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পকে আপনি কিভাবে দেখছেন?

**উত্তর :** আন্তঃনদী সংযোগের বিষয়ে আমার মুল্যায়ন সম্ভব নয়। এটি নদী বিশেষজ্ঞরা করবেন। কিন্তু আমি যা বলবো তা হচ্ছে এই–অভিন্ন নদী, পানি বণ্টন সমস্যা, আন্তঃনদী সংযোগ এসব বিষয়ে সরকারের এবং থিংক-ট্যাংকগুলোর স্টাডি থাকতে হবে। দ্বিতীয় কথা, এটি মানতেই হবে এসব বিষয়ে কিছু কাজ হয়েছে। যেমন, পানি বণ্টন নিয়ে চুক্তি হয়েছে। এসব চুক্তির বাস্তবায়ন হওয়া দরকার। নতুন সমস্যাও আসছে, যেমন–নদী সংযোগের বিষয়। এসব বিষয়ে আমাদের স্টাডি করতে হবে। সরকারকে তার পজিশন, পেপার খুব ভালো করে তৈরি করতে হবে। আমি মনে করি, পানি বাংলাদেশের জন্য জীবন-মরণের ব্যাপার অর্থাৎ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই এসব বিষয় সমাধান করতে হবে। আমি তো আগেই বলেছি সেকেন্ড ট্র্যাক ডিপ্লোম্যাসি এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে। এটিও অব্যাহত রাখতে হবে। ফিলিস্তিনের বিষয়ে, পাক-ভারত সম্পর্কের বিষয়ে এখন সেকেন্ড ট্র্যাক ডিপ্লোম্যাসি চলছে। অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রেও চলছে। আমাদের ক্ষেত্রেও তা কার্যকর হতে পারে। আসলে আমাদের প্রবলেম তো বেশি নেই। আমাদের দু'দেশের মধ্যে তো কাশ্মির, ফিলিস্তিনের মতো কোনো সমস্যা নেই। সুতরাং আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, ভারতের নেতৃত্ব এবং বাংলাদেশের নেতৃত্ব যদি তাদের জাতির স্বার্থে ধৈর্যের সাথে পজেটিভ মাইন্ডে আলোচনা করে তাহলেই সমাধানে পৌঁছানো সম্ভব।

**প্রশ্ন :** ভারতের সাত রাজ্যের বিদ্রোহীদের আশ্রয়-প্রশ্রয়দানের বিষয়ে নয়াদিল্লি নিয়মিত বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে আসছে। একইভাবে স্বাধীন বঙ্গভূমি নামে একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনকে প্রশ্রয় দিচ্ছে ভারত–এ অভিযোগ বাংলাদেশের। এ বিষয়টি আপনি কিভাবে দেখছেন?

**উত্তর :** বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আশ্রয় দেয়ার বিষয়ে কিছু ঐতিহাসিক দিক আছে। পাকিস্তান আমলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আশ্রয় দেয়া হতো বলে ভারতের অভিযোগ ছিল। কিন্তু এটিও আমরা জানি–পার্বত্য চট্টগ্রামে যখন শান্তি বাহিনীর আন্দোলন হতো তখন ভারত শান্তিবাহিনীকে সব ধরনের সহযোগিতা করতো। এটি ওপেন সিক্রেট, না সিক্রেট নয়–পুরোটাই ওপেন। এখন যে পরিস্থিতি এটি একদম পরিষ্কার কথা–বাংলাদেশ কোনো ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয় না, কোনো ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা করে না। আমি বলতে চাই, ভারত যে ১৯৫টি ক্যাম্পের কথা বলছে তা সুস্পষ্ট করে বলতে হবে অমুক গ্রামের অমুক জায়গায়,অমুক শহরের অমুক মহল্লায় বা অমুক জঙ্গলের অমুক স্থানে রয়েছে। আবার আমাদেরকেও সুনির্দিষ্ট তথ্য দিয়ে স্বাধীন বঙ্গভূমি আন্দোলন সম্পর্কে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য বলতে হবে।



www.pathagar.com

আমি মনে করি, দু'পক্ষ যদি এ বিষয়ে আলোচনায় বসে তাহলে সমাধান সম্ভব। এগুলো তো স্থূল ব্যাপার। এদেশ থেকে যদি কিছু লোক পালিয়ে ভারতে গিয়ে কিছু লিফলেট ছাপায় তাতে তেমন কিছু হবে না। আবার ভারতকে বুঝতে হবে এদেশে তাদের বিরোধী কোনো ক্যাম্প নেই। উদ্বেগের কিছু নেই। এসব নিয়ে উত্তেজনার কিছু নেই এবং থাকা উচিত নয়।

**প্রশ্ন :** বাংলাদেশের সীমান্তে ভারত পুশইন করছে যা দু'দেশের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টি করছে, এর সমাধানের উপায় কি?

**উত্তর :** এটি একটি অহেতুক প্রবলেম। ভারতের এটি মোটেই করা উচিত নয়। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারকে বলে দেয়া উচিত কাউকে পুশইন করা যাবে না। যদি কেউ বেআইনিভাবে গিয়ে থাকে তাকে গ্রেফতার করে কোথাও রাখবে। তারপর বাংলাদেশ সরকারের সাথে আলোচনা করে ফেরত দিবে বা ব্যবস্থা নিবে। আর এই যে বলা হয় বাংলাদেশ থেকে মিলিয়নস অব পিপলস আসামে-পশ্চিমবঙ্গে চলে গেছে; এসব কথার মধ্যে কোনো সত্যতা নেই।

বাংলাদেশের মুসলিম জনগণের কেউ ভারতে গিয়ে থাকতে চায় না। ত্রিশ বছর পর যদি ভারত বলে বিশ বছর আগে এরা এসছিল তাহলে এসব তো মানা যায় না। কারণ এসব কথা সত্যি নয়। যদি সুনির্দিষ্ট লোকের বিষয়ে ভারত প্রমাণ দিতে পারে তাহলে বাংলাদেশের উচিত তাদেরকে মেনে নেয়া। তবে তা প্রমাণের মাধ্যমে হতে হবে, পুশইনের মাধ্যমে নয়।

**প্রশ্ন :** আপনি কি মনে করেন সার্ক অর্থনৈতিক ইউনিয়ন ও সার্ক অভিন্ন মুদ্রা প্রবর্তনের মাধ্যমে সার্ক অঞ্চলের সহযোগিতা বাড়বে?

**উত্তর :** হ্যাঁ, আমি এটি মনে করি। যদি ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হয়ে যায় তাহলে সাব-কন্টিনেন্টে উত্তেজনার বড় কারণ আর থাকবে না। যদি কাশ্মির সমস্যা জাতিসঙ্ঘের প্রস্তাব মোতাবেক ১৯৪৯ সালে সমাধান হয়ে যেত অর্থাৎ গণভোটের মাধ্যমে যদি কাশ্মির সমস্যার সমাধান হয়ে যেত তাহলে এ উপমহাদেশে আর কোনো উত্তেজনাই থাকতো না। আর তাহলে বহু আগেই এ সাব-কন্টিনেন্ট একটি ইকোনোমিক ইউনিয়ন হয়ে যেত এবং হয়তো এতদিনে অভিন্ন মুদ্রাও চালু হয়ে যেত। ইউরোপের মতো আলাদা রাষ্ট্র, আবার ইউরোপীয় পার্লামেন্ট এবং ইউরো হতে পারতো। এমন মনে হচ্ছে পাক-ভারত সমস্যা মিটে যেতে পারে। যদি এখানে ইকোনোমিক ইউনিয়ন হয় তা অবশ্যই ইউরোপীয় স্টাইলে হতে হবে, অন্য কোনো স্টাইলে নয়। আর এ ইকোনোমিক ইউনিয়ন হলে কল্যাণ হবে বলেই আমি মনে করি।

**প্রশ্ন :** সার্ককে অধিকতর কার্যকর করার ব্যাপারে আসন্ন শীর্ষ সম্মেলনে কি ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?



www.pathagar.com

**উত্তর :** অর্থনৈতিক বিষয়গুলো প্রাধান্য পাওয়া উচিত হবে। আর সার্কে তো রাজনৈতিক আলোচনা খুব কমই হয়। এছাড়া সার্কে তো বাইলেটারাল বিষয়ে আলাপ হয় না, মাল্টিলেটারাল বিষয়ে আলোচনা হয়। এখানে তো কাশ্মির, আমাদের পানি বণ্টন নিয়ে আলোচনা করতে পারবো না; তাহলে তো সার্কের চার্টার চেঞ্জ করতে হবে। ঐকমত্যের ভিত্তিতে এ সংস্কার করতে পারলে ভালো হতো। তা হয়তো সম্ভব নয়–তাই সেদিকে আমি যেতে চাচ্ছি না। আমি বলবো, অর্থনৈতিক বিষয় বা উপমহাদেশের জনগণের দারিদ্র্য বিমোচন 'ফার্স্ট প্রায়োরিটি' হওয়া উচিত। এজন্য সাহয্য যদি করা দরকার হয় তা ট্রেড দিয়ে করতে হবে। এজন্য সাফটার আওতায় যদি বাংলাদেশে বিশেষ সুবিধা দেয়া হয় তাহলে ভালো কথা। এটি বড় সাহায্য হবে। সার্ক সম্মেলন যাতে নিয়মিত হয় তার ব্যবস্থা নেয়া উচিত। আমরা দেখি ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতারা প্রত্যেক বছর কয়েকবার বসেন। গত দু'বছরে তারা ৫-৭ বার বসেছেন। আমাদের ইউনিয়নের নেতারা যদি ছয় মাসে একবার হলেও বসেন তাহলে ভালো হয়। এতে উত্তেজনা কমে আসবে এবং কল্যাণই হবে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : শাহীন হাসনাত
প্রকাশকাল : ২৫ ডিসেম্বর ২০০৪, দৈনিক নয়া দিগন্ত



www.pathagar.com

# জনগণকে মহাজনদের হাত থেকে রক্ষা করতে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি অব্যাহত রাখতে হবে

**প্রশ্ন :** আমরা নানারকম ঋণের কথা শুনে থাকি, ক্ষুদ্রঋণের (মাইক্রো ক্রেডিট) বৈশিষ্ট্য কি?

**উত্তর :** ২০-৩০ বছর আগে যখন এ আন্দোলন শুরু হয় তখন ১-২ হাজার টাকা দিয়ে শুরু হয়েছিল। এখন তা ৫, ১০, ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত দেয়া হয়। ক্ষুদ্রঋণের ব্যাপারে একটি কনসেপ্ট দাঁড়িয়েছে যে, একটি গ্রুপ করতে হবে। যাতে তারা একে অপরের কাছে দায়বদ্ধ হয়। কেউ ঋণের টাকা দিতে না চাইলেও অন্যরা দিতে যেন বাধ্য করে। এখানে নিয়মিত সুপারভিশনেরও ব্যবস্থা আছে। এছাড়া আমাদের দেশে আরেকটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যে, যদিও এটি নারীদের জন্য করা হয়নি, কিন্তু নারীদের মধ্যে বেশি প্রসার লাভ করেছে। এতে নিশ্চয়ই কোনো ঐতিহাসিক বা সামাজিক কারণ থাকতে পারে। পুরুষরা মাঠে একটু ব্যস্ত, নারীরা ঘরের কাজও করলো আবার এ কাজও করলো। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের যে প্রকল্প এখানেও ৯০ ভাগ নারী।

**প্রশ্ন :** ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে বাংলাদেশে কারা কাজ করছে? তাদের কাজের ধরন কেমন?

**উত্তর :** ক্ষুদ্রঋণের কিছু কিছু কর্মসূচি সরকারেরও আছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ছাড়াও কিছু কিছু সংস্থার এ ধরনের কাজ আছে। ক্ষুদ্রঋণের ব্যাপারে প্রাইভেট সেক্টর তথা এনজিওদের কাজ আছে। কিছু কিছু ব্যাংকও এ ধরনের কাজ করে থাকে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশও ইসলামী পদ্ধতিতে এ ধরনের কাজ করে থাকে। ক্ষুদ্রঋণের এ কর্মসূচি বাংলাদেশ ছাড়া এতো বেশি পৃথিবীর আর কোথাও নেই। ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি নিয়ে অনেক কথা আছে। এর পক্ষে-বিপক্ষে কথা আছে। উচ্চহারে সুদ নেয়ার কথাও আছে। কারো কারো ব্যাপারে রাজনৈতিক স্বার্থে কাজ করার অভিযোগও আছে। তারপরও বলতে হয়, ক্ষুদ্রঋণ বা মাইক্রোফাইন্যান্স থাকতে হবে। কোনো অবস্থাতেই এটিকে বাদ দেয়া যাবে না। কেননা তখন মানুষ আরো বেশি করে মহাজনদের হাতে পড়বে, কাবুলিওয়ালাদের মতো যারা চক্রবৃদ্ধি হারে জনগণের কাছ থেকে সুদ নেয়।



www.pathagar.com

আমি বিশ্বাস করি উন্নয়ন ক্ষুদ্রঋণ দ্বারা হয় না। দারিদ্র্য বিমোচনও ক্ষুদ্রঋণ দ্বারা হতে পারে না। এজন্য উন্নয়ন কার্যক্রম চালাতে হবে। অবকাঠামোসহ প্রতিটি সেক্টরের উন্নয়ন করতে হবে। এর মাধ্যমেই গোটা জাতির অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হবে। কিন্তু এটিও ঠিক যে, উন্নয়ন সময়-সাপেক্ষ ব্যাপার। সরকার হয়তো সব সেক্টর টাচ করতে পারবে না। এক্ষেত্রে বেসরকারিভাবে এ ধরনের কর্মসূচি থাকতে হবে সহযোগী হিসেবে। আমাদের লক্ষ্য হতে হবে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি সংস্কার বা সংশোধন। এর মধ্যে দেশী ও বিদেশী রাজনীতি যদি ঢুকে যায় তবে তা সংশোধন করতে হবে। সম্ভাব্য সরকারি নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে। এনজিও সংগঠনগুলোকেও বুঝতে হবে–তাদের কাজ রাজনীতি নয়, জনসেবা। যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক খরচ কমানো দরকার সেখানে কমাতে হবে। যেখানে সুদের হার কমানো সম্ভব সেখানে কমাতে হবে। এ ধরনের সংস্কার করতে হবে। যদি কোনো এনজিও চেষ্টা করে ধর্মীয় ভিত্তিকে নষ্ট করার, এটিকে বাদ দিতে হবে। এটি তাদের কাজ নয়।

**প্রশ্ন :** বহু বছর থেকে চলে আসা এনজিওদের ক্ষুদ্রঋণের প্রকল্পের ব্যাপারে আপনার মূল্যায়ন কি?

**উত্তর :** পজেটিভলি আমি বলবো, এটি বহু মানুষকে টিকিয়ে রেখেছে। তাদের একটি অবলম্বন হয়েছে। এর মাধ্যমে তারা কিছু না কিছু অর্থ পেয়েছে। কিন্তু এতো আয় করতে পারেনি যাতে সে স্বাবলম্বী হয়ে যায়। ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প মহাজনদের হাত থেকে বাঁচতে তাদের সাহায্য করেছে। আমরা যেন এনজিওর ব্যাপারে খারাপ ধারণা থেকে তাদের ইতিবাচক অবদান ভুলে না যাই। তারা কিছু না কিছু মানুষের কর্মসংস্থান করেছে, কিছু না কিছু নারীদের জাগিয়েছে–এটি অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু এর মাধ্যমে যে কিছু মানুষকে দারিদ্র্য থেকে বের করে আনবে সেটি হয়নি। ক্ষুদ্রঋণ দারিদ্র্য থেকে মানুষকে বের করে আনবে এ ধারণা সঠিক প্রমাণিত হয়নি।

**প্রশ্ন :** ক্ষুদ্রঋণ ও দারিদ্র্য বিমোচন প্রসঙ্গে আপনার বিশেষ কোনো পরামর্শ আছে কি?

**উত্তর :** ৫-১০ হাজার টাকা নিয়ে একটি লোক দারিদ্র্য থেকে বের হয়ে আসতে পারে না। সুতরাং দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য যেটি দরকার তা হলো, একটি অনুদানভিত্তিক ব্যবস্থা করতে হবে। একটি লোক ৫-১০ হাজার টাকা ব্যবহার করে টাকাও শোধ করবে আবার তাকে আয়ও করতে হবে–এটি সম্ভব নয়। ইসলামে কেন জাকাতের কথা বলা হয়েছে? এটি দেখলে আমরা বুঝবো এটি একটি পূর্ণ অনুদান। এর মাধ্যমে একটি লোককে ৫-১০ হাজার টাকা পাওয়ার পর যেহেতু সে অর্থ তাকে ফিরিয়ে দিতে হয় না, ফলে সে দাঁড়াতে পারে। অবশ্য আমাদের দেশে পরিকল্পিত জাকাত ব্যবস্থা নেই। এভাবে জাকাত দেয়



www.pathagar.com

না। তারা খুব সামান্য সামান্য জাকাত দেয়। এটি যদি সামাজিকভাবে দেয়া যেত, আর সবাই জাকাত দিতো এ চিন্তা থেকে যে, কিছু লোকের কর্মসংস্থান করা হবে-তাহলে সমাজ উপকৃত হতো।

কোনো দেশ যদি জাকাত ব্যবস্থা চালু করতে না চায় তবে সেখানে আংশিক বা পূর্ণ দানভিত্তিক দারিদ্র্য বিমোচন স্কিম দাঁড় করাতে হবে। এনজিওদের পক্ষে এটি সম্ভব ছিল না আমি তা বলবো না। তাদের যত টাকা বাইরে থেকে আসছে তা তো দান হিসেবেই আসছে। তারা এটিকে দান আকারেও করতে পারতো অথবা ঋণের সাথে দান মিলাতে পারতো। এসব ব্যাপারে এনজিও সংগঠনগুলোকে চিন্তা করতে হবে। শুধু ক্ষুদ্রঋণের আকারে দারিদ্র্যকে বের করে আনা খুবই কঠিন। একে যদি পূর্ণ বা আংশিক অনুদানে পরিবর্তন করা যায় তাহলে ভালো হতো। বিশেষ করে যে টাকাটা অনুদান হিসেবে আসে তা কেন আমরা অনুদান বা আংশিক অনুদান হিসেবে দিবো না। এসব ব্যাপারে এনজিও ব্যুরো, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও এনজিও সংগঠনগুলোকে চিন্তা করতে হবে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : সামছুল আরেফীন
প্রকাশকাল : ১৯ মার্চ ২০০৫, দৈনিক সংগ্রাম



www.pathagar.com

www.pathagar.com

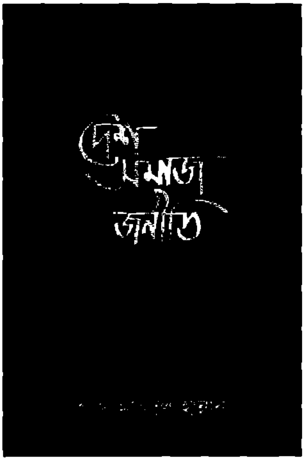

দেশ সমাজ রাজনীতি

প্রকাশকাল : মার্চ ২০০৩, কামিয়াব প্রকাশন

www.pathagar.com

www.pathagar.com

# শুক্রবারের পরিবর্তে রবিবার ছুটি অসঙ্গত

গত ৬ সেপ্টেম্বর তারিখে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় 'অবিলম্বে সাপ্তাহিক ছুটি একদিন রবিবার করার জন্য ব্যবসায়ীদের দাবি' শিরোনামে খবরে প্রকাশ, 'বিজিএমইএ, বিটিএমএ, বিকেএসইএ, বিএসটিএসপিএ ও বিটিটিএলএসপি-এর সভাপতিগণ গতকাল বুধবার এক যুক্ত বিবৃতিতে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বার্থে অনতিবিলম্বে সাপ্তাহিক ছুটি দুই দিনের পরিবর্তে একদিন এবং ছুটির দিনটি রবিবার নির্ধারণ করার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানের নিকট জোর দাবি জানিয়েছেন।'

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিকট এরকম একটি স্পর্শকাতর বিষয়ে দাবি উত্থাপন করা কতটুকু যুক্তিযুক্ত হয়েছে সেটা তারাই জানেন। আশা করি তত্ত্বাবধায়ক সরকার এ ধরনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বিরত থাকবেন।

বাংলাদেশে পাকিস্তানী আমলে এবং স্বাধীনতার পরেও ছুটির দিন ছিল রবিবার, যা ছিল ব্রিটিশ আমলে ব্রিটিশদের চালু করা ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার অংশ। পরবর্তীতে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের আমলে বাংলাদেশে শুক্রবারকে সাপ্তাহিক ছুটি হিসেবে প্রবর্তন করা হয়। এর পরবর্তী বিএনপি সরকার শুক্রবার ছুটি বহাল রাখেন।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসেন। তারাও তাদের পাঁচ বছরের শাসনকালে শুক্রবারের ছুটির কোনো পরিবর্তন করেননি। যদিও এ সময়ে নওয়াজ শরিফ সরকার পাকিস্তানে কোনো নির্বাচনী ম্যান্ডেট ছাড়াই কিছু আন্তর্জাতিক চক্রকে খুশি করার জন্য শুক্রবার ছুটি পরিবর্তন করে রবিবার সাপ্তাহিক ছুটি ঘোষণা করেন এবং এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে কিছু মহল রবিবার ছুটি ঘোষণা করার দাবি করেছিলেন। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার সে দাবি মানেননি।

বর্তমানে কিছু ব্যবসায়ী সমিতি এ দাবি তুলেছে যে, ব্যবসায়ীদের কর্মদিবস বৃদ্ধি ও ব্যবসায়িক বিশ্বায়নের জন্য রবিবারকে যেন সাপ্তাহিক ছুটির দিন ঘোষণা করা হয়। তাদের যুক্তি হচ্ছে, যেহেতু বিশ্বের বেশিরভাগ দেশে রবিবার ছুটির দিন–তাই বাংলাদেশে যদি শুক্রবার ও শনিবার ছুটির দিন হয় তাহলে তা আমদানি-রফতানির ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করবে।



www.pathagar.com

শুক্রবার ছুটির কারণে আমদানি-রফতানির ক্ষতি হয় এটি একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক কথা। আজ থেকে ১২-১৩ বছর আগে এদেশে শুক্রবারকে সাপ্তাহিক ছুটির দিন ঘোষণা করা হয়েছে। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত কখনোই কোনো আমদানি বা রফতানি শুক্রবার ছুটির কারণে বন্ধ বা নষ্ট হয়নি। শুক্রবার ছুটি হওয়ার পরও প্রতিবছর রফতানি ১০-২০% করে বৃদ্ধি হয়েছে। আমি এক সময় বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর ছিলাম এবং ব্যাংকিং বিভাগের সচিব ছিলাম। ব্যবসায়ী এবং ব্যাংকারগণ আমাকে অনেক সমস্যার কথা বলেছেন। কিন্তু কখনো বলেননি যে, শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটি হওয়ার কারণে রফতানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বা কোনো কনসাইনমেন্ট শেষ পর্যন্ত রফতানি করা যায়নি অথবা এলসি করা যায়নি।

শুক্রবার ছুটি হলে ব্যবসায়ীবৃন্দ তাদের কাজ হয় পূর্বদিন বা পরের দিন করে নেন। যেমন রবিবার ছুটি থাকাকালেও তারা পূর্বদিন বা পরের দিন তাদের কাজ করে নিতেন। সামগ্রিক বিবেচনায় শুক্রবার ছুটির কারণে জাতির বা দেশের বা আমদানি-রফতানির কোনো ক্ষতি হয় না। যেসব দেশে শুক্রবার ছুটি রয়েছে সেসব দেশের আমদানি-রফতানির পরিসংখ্যানই তার প্রমাণ।

অনেকে সূরাতুল জুমআর উল্লেখ করে বলেন যে, সেখানে শুক্রবার কাজ না করার কথা বলা হয়নি। কিন্তু এটাই যদি যুক্তি হয় তাহলে তো একথাও বলা যায় যে, কুরআন বা হাদিসে কোথাও কোনো সাপ্তাহিক ছুটির কথা বলা হয়নি। সে প্রেক্ষিতে রবিবার বা শনিবার সাপ্তাহিক ছুটি করার কি যুক্তি আছে? বিশেষ করে যখন শনিবার ইহুদিদের এবং রবিবার খ্রিস্টানদের উপাসনার দিন। ইসলাম সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অন্য জাতিকে অনুসরণ করার কথা বলে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবসময় মুসলিম জাতির সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্র পরিচয় (Identity) গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। এ প্রসঙ্গে সূরাতুল জুমআর তাফসিরে একজন বিখ্যাত তাফসিরকার লিখেছেন–

> এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, কুরআন মজিদে ইহুদিদের 'সাবত' বা শনিবার এবং খ্রিস্টানদের রবিবারের ন্যায় জুমআর দিন সাধারণ ছুটির দিন ঘোষণা করা হয়নি, কিন্তু জুমআর দিনও যে মুসলমানদের নিকট ঠিক তেমনি জাতীয় সংস্কৃতির নিদর্শনের দিন যেমন শনিবার ইহুদিদের নিকট এবং রবিবার খ্রিস্টানদের নিকট জাতীয় সাংস্কৃতিক নিদর্শনের দিন, সে কথা কেউই অস্বীকার করতে পারে না। সপ্তাহে কোনো একটি দিন সাধারণ ছুটির দিন রূপে নির্দিষ্ট করে নেওয়া যদি একটি সামাজিক ও তমদ্দুনিক প্রয়োজন হয়ে থাকে, তাহলে ইহুদিরা যেভাবে শনিবার ও খ্রিস্টানরা যেভাবে রবিবার নির্দিষ্ট করে নিয়েছে, অনুরূপভাবে মুসলমানরাও তাদের মধ্যে যদি ইসলামী চেতনা একবিন্দুও অবশিষ্ট থেকে থাকে জুমআর দিনটিই নির্দিষ্ট করে নিবে,



www.pathagar.com

এটিই স্বাভাবিক। ইহুদিরা ফিলিস্তিনে নিজেদের ইসরাইল রাষ্ট্র কায়েম করার পর সর্বপ্রথমেই রবিবারের পরিবর্তে শনিবারকে জাতীয় ছুটির দিন রূপে নির্দিষ্ট করে নিয়েছে। ব্রিটিশ-ভারতেও সে সময়কার মুসলিম দেশীয় রাজ্যের মধ্যে পার্থক্যের নিদর্শন এই ছিল যে, সমগ্র ভারতে রবিবার দিন ছুটি এবং এসব রাজ্যে শুক্রবার দিন ছুটি প্রচলিত ছিল। তবে যেখানে মুসলমানদের ইসলামী চেতনা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে সেখানে মুসলমানদের হাতে ক্ষমতা আসা সত্ত্বেও রবিবার দিনের ছুটিই চালু রেখেছে। আর যেখানে এ চেতনাহীনতা খুব বেশি মাত্রায় পৌঁছেছে সেখানে তারা শুক্রবার দিনটির ছুটি নাকচ করে রবিবার দিনের ছুটি চালু করেছে। (তাফহীমূল কুরআন, সূরা জুমআর তাফসির, নোট নং ১৬)।

এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৯৭ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তানে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের সরকার শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটি বাতিল করে রবিবার সাপ্তাহিক ছুটি বহাল করার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের কয়েকটি ব্যবসায়ী সংগঠন ২১ মার্চ ১৯৯৭ তারিখে পত্রিকা মারফত রবিবারকে সাপ্তাহিক ছুটি হিসেবে ঘোষণা করার দাবি জানান। সে সময়ে এ বিষয় নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়েছিল। এ প্রেক্ষিতে ১৯৯৭ সালের ৯, ১০ ও ১১ জুন ঢাকা শহরের ১৪টি এলাকায় ৫৫০ জন লোকের ওপর Democracy Watch নামক প্রতিষ্ঠানের Life Skills and Life Style কোর্সের ছাত্ররা একটি জরিপ চালায়। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের সাপ্তাহিক ছুটির দিন হিসেবে সপ্তাহের একদিন বা দু'দিন বেছে নিতে বলা হয়, যার ফলাফল নিম্নরূপ ঃ

| | |
|---|---|
| শুক্রবার | ৩২% |
| শুক্র-শনি | ২৩% |
| শনি-রবি | ১৩% |
| রবিবার | ১২% |
| বৃহঃ (অর্ধ)-শুক্র (পূর্ণ) | ১১% |
| শনি (অর্ধ)-রবি (পূর্ণ) | ৭% |
| শুক্র (অর্ধ)-শনি (পূর্ণ) | ২% |
| মোট | ১০০% |

(সাপ্তাহিক হলিডে, ২০ জুন ১৯৯৭)

সার্বিক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ৬৬% মানুষ শুক্রবারকে সাপ্তাহিক ছুটি হিসেবে চায়। এছাড়া এ ঘটনার সূত্রপাত যে ব্যাপার দিয়ে অর্থাৎ নওয়াজ শরিফের ঘোষণার বিষয়ে অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, নওয়াজ শরিফের নির্বাচনী প্রচারণার সময় তিনি এ ধরনের কোনো পরিকল্পনার কথা বলেননি। তাই অনুমান করা হয় পরবর্তীতে তিনি কিছু আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের চাপে



www.pathagar.com

পড়েই রবিবার সাপ্তাহিক ছুটি ঘোষণা করেছিলেন। এর বিরুদ্ধে পাকিস্তানের জনতা ব্যাপক আন্দোলন করেছিল কিন্তু তিনি যেমন অন্যান্য বিষয়ে জনমতের তোয়াক্কা করেননি, এ ক্ষেত্রেও তেমনি তিনি জনদাবি মানেননি।

সর্বশেষে আমি বলবো যে, পাশ্চাত্যের একটি অংশ সবসময় চায় যেন আমরা তাদের সংস্কৃতি ও নিয়ম-কানুন গ্রহণ করি। রবিবারের বিষয়টিও তা-ই। এ ব্যাপারে আমরা বহু চিন্তা করেই সাপ্তাহিক ছুটি রবিবার থেকে শুক্রবারে নিয়ে এসেছি। এ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার কোনো সত্যিকার অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক যুক্তি আমাদের নেই। সুতরাং সাপ্তাহিক ছুটি দু'দিন হোক বা একদিন হোক (কর্মঘণ্টা দু' অবস্থাতে একই থাকে), শুক্রবারকে সর্বাবস্থায় ছুটি হিসেবে বহাল রাখা ন্যায়সঙ্গত ও জনগণের বিপুল অংশের প্রাণের দাবি। আশা করি, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কোনো সরকারই এর বিপরীত কিছু করবেন না।

১১ সেপ্টেম্বর ২০০১, দৈনিক ইনকিলাব



www.pathagar.com

# ইসলামী দাওয়াতের কর্মপদ্ধতি

ইসলামী দাওয়াত (Islamic Call) ইসলামী আদর্শ ও বিধানেরই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইসলামী দাওয়াত হচ্ছে ইসলামের সংরক্ষণ এবং ইসলামী সমাজের রূপায়ণ ও অগ্রগতির পদ্ধতি। কুরআন মজিদেই ইসলামী দাওয়াতকে মুসলমানদের উপর ফরজ করে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহতায়ালা ঘোষণা করেন–

> তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে, যেন তোমরা ন্যায় ও সৎ কাজের নির্দেশ কর এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ কর, বিরত রাখ। (আল কুরআন, ৩ ঃ ১১০)।
>
> তোমাদের মধ্যে এমন একদল থাকা উচিত; যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান জানাবে, সৎ কাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে। (আল কুরআন, ৩ ঃ ১০৪)।
>
> তোমাদের বানিয়েছি এক মধ্যপন্থী জাতি, যেন তোমরা বিশ্বমানবের পথ প্রদর্শক হতে পারো। (আল কুরআন, ২ ঃ ১৪৩)।

ইসলামী দাওয়াতের লক্ষ্য হচ্ছে, প্রত্যেকটি মানুষকে ইসলামের অনুগত ব্যক্তি হিসেবে তৈরি করা ও সুকৃতির প্রসার এবং দুষ্কৃতির মূলোৎপাটন করা। যেখানেই সম্ভব সেখানে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করাও নিশ্চয়ই ইসলামী দাওয়াতের লক্ষ্য। কেননা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে গেছেন এবং রাসূলের সুন্নাত হলো আমাদের আদর্শ। ইসলামী রাষ্ট্রের লক্ষ্য সম্পর্কে কুরআন পাকে বলা হয়েছে–

> যখন তাদের দুনিয়ার বুকে ক্ষমতা দেওয়া হয় তখন তারা নামাজ কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, সুকৃতির প্রতিষ্ঠা করে ও দুষ্কৃতির মূলোৎপাটন করে। (আল কুরআন, ২২ ঃ ৪১)।

ইসলামী দাওয়াতের চূড়ান্ত লক্ষ্য নিশ্চয়ই ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করা – এমন রাষ্ট্র যা ইসলামী আইন-কানুনের অনুগত হবে ও ইসলামের আলোকে সব সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করবে এবং অনৈসলামিক প্রভাব হতে মুক্ত থাকবে। কিন্তু যদি কোনো সময়ে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যখন ইসলামী রাষ্ট্রের লক্ষ্যে বাস্তবভাবে কাজ করা সম্ভব নয়, তাহলে ইসলামী সমাজ ও ব্যক্তি তৈরি করাই



www.pathagar.com

হবে ইসলামী দাওয়াতের লক্ষ্য। সাধ্যের অতিরিক্ত কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা ইসলামের দাবি বা শিক্ষা নয়। যেমন কুরআন পাকে ঘোষণা করা হয়েছে–

আল্লাহ কাউকে তার ক্ষমতার অতিরিক্ত দায়িত্ব দেন না।

(আল কুরআন, ২ ঃ ২৬৮)।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী শিক্ষা হচ্ছে ক্ষমতানুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করা। কাজেই ইসলামী দাওয়াতের লক্ষ্য হবে কোথাও ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করা এবং কোথাও ইসলামী সমাজ ও ব্যক্তি তৈরি করা। আর তা নির্ভর করবে পরিস্থিতি ও পরিবেশের উপর।

ইসলামী দাওয়াতের এসব লক্ষ্য কার্যকরী করার কর্মপদ্ধতি কী হতে পারে তা নির্ধারণ করার জন্য আমাদেরকে নবীর সুন্নাতের দিকে দেখতে হবে। নবীর জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে তিনি ইসলামী দাওয়াত প্রসারের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তিনি খাওয়ার মজলিসে দাওয়াত দিয়েছেন, পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আহ্বান জানিয়েছেন, গোপনে মক্কার আশেপাশে এবং বিভিন্ন মেলায় ঘুরে ঘুরে প্রচার করেছেন, মক্কার বাইরের বিভিন্ন শহরে দাওয়াত দিতে বের হয়েছেন, হিজরত করেছেন, যুদ্ধ করেছেন – অর্থাৎ দাওয়াতের প্রসারের জন্য যখন যা উপযুক্ত মনে করেছেন, তা-ই করেছেন। তবে ইসলাম যে সাধারণ নৈতিক নিয়ামবলী দিয়েছে, তা কখনো ভঙ্গ করেননি। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, ইসলামী দাওয়াতের ব্যাপারে নবীর সুন্নাত হলো একটি উন্মুক্ত ও উদার পথ। অর্থাৎ ইসলামের নৈতিক নিয়মাবলীর সীমার মধ্যে হলে যে কোনো কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করাই নবীর সুন্নাত মোতাবেক হবে। ইসলামী দাওয়াতের পদ্ধতি একটি মুক্ত ও খোলা বিষয় হওয়ার কারণেই বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন ইসলামী আন্দোলন বিভিন্ন কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেছে।

পদ্ধতিগত সুন্নাতের আলোচনার পর দেখতে হবে যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলামী দাওয়াতের জন্য কি কি কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে। ইসলামী আদর্শ প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য তিনটি পদ্ধতি হতে পারে। প্রথমত রাজনৈতিক, দ্বিতীয়ত তমদ্দুনিক ও তৃতীয়ত বৈপ্লবিক। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় দল গঠন, স্বাধীন সংবাদপত্র ও প্রকাশনার সদ্ব্যবহার, নির্বাচনে অংশগ্রহণ, সরকার গঠন, আইন ও শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও পরিবর্তনের মাধ্যমে কাজ করে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে রাজনৈতিক পদ্ধতি বলা যেতে পারে। অন্যদিকে উন্নত সাহিত্যের মাধ্যমে শিক্ষিত জনগণকে এবং অন্যান্য উপায়ে সাধারণ জনগণকে ইসলামী আদর্শ সম্পর্কে শিক্ষিত, অবহিত ও উদ্বুদ্ধ করা এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে ইসলাম অনুসরণে উৎসাহিত করাকে ইসলামী দাওয়াতের তমদ্দুনিক বা সাংস্কৃতিক পদ্ধতি বলা যায়। ইসলামী দাওয়াতের সব রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হলে অথবা মুসলিম জাতির আত্মরক্ষার জন্য অপরিহার্য হলে বৈপ্লবিক পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে।



www.pathagar.com

কোনো দেশে দাওয়াতের কী পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে তা নির্ভর করবে সে দেশের পরিস্থিতির উপর। এমনও হতে পারে যে বিভিন্ন পদ্ধতিকে একই সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগাতে হবে। তবে একটি কথা আমাদের খুব ভালো করে বুঝে নিতে হবে যে, বর্তমানে মুসলিম বিশ্ব একটি রাজনৈতিক অস্থিরতার (instability) মধ্য দিয়ে এগুচ্ছে। অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্র স্বাধীন হয়েছে গত ষাট বছরে। তার পূর্বে তারা ছিল বিভিন্ন উপনিবেশবাদী রাষ্ট্রের অধীনে। সে সময় তাদের গভীর ও সুদৃঢ় কোনো রাজনৈতিক ট্রেনিং ছিল না। ফলে পশ্চিম ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড যে ধরনের রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা অর্জন করেছে, মুসলিম বিশ্ব সে ধরনের কোনো স্থিতাবস্থা এখনো অর্জন করতে পারেনি। মুসলিম বিশ্বে এখনো হর-হামেশা সামরিক বিপ্লব, নতুন নতুন দল গঠন, সরকার পরিবর্তন ও পতন লেগেই আছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে ইসলামী দাওয়াতের জন্য রাজনৈতিক পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক পদ্ধতির উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। বৈপ্লবিক পদ্ধতির মাধ্যমে গত ত্রিশ বছরে একমাত্র ইরান ছাড়া ইসলামী রাষ্ট্রে বিপ্লব সংঘটিত হয়নি। অবশ্য মুসলমান যেখানে জাতিগত জুলুমের শিকারে পরিণত হয়েছে সেখানে বৈপ্লবিক পদ্ধতি গ্রহণ করা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না।

মুসলিম বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতিতে ইসলামী দাওয়াত ও মিশনের প্রসারের জন্য তমদ্দুনিক পদ্ধতির উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। কেননা বর্তমান পরিস্থিতিতে এ পদ্ধতিই সবচেয়ে অধিক কার্যকর হওয়া সম্ভব। তমদ্দুনিক পদ্ধতির লক্ষ্য হবে জনগণকে ইসলামী আদর্শ, বিধান, মূল্যবোধ ও ইতিহাস সম্পর্কে ব্যাপকভাবে শিক্ষিত করে তোলা, যেন ইসলামী বিধান ও আদর্শ জনগণের এক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের বিশ্বাস, বিবেক ও চিন্তার অংশে পরিণত হয়। জনগণের চিন্তাকে এমনভাবে প্রভাবিত করতে হবে, যাতে যে কোনো সমস্যা ও বিষয়ে তাদের নজর সর্বপ্রথম স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলাম ও তার শিক্ষার দিকে নিবদ্ধ হয়। তমদ্দুনিক পদ্ধতি প্রকৃতপক্ষে হবে একটি শিক্ষা আন্দোলন (Education Movement)। যতদিন পর্যন্ত জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে ইসলামী রূপ দেওয়া না হবে অর্থাৎ ইসলামী শিক্ষা জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার সিলেবাসে যথাযোগ্য মর্যাদা না পাবে, ততদিন পর্যন্ত উন্নত ইসলামী সাহিত্যের মাধ্যমেই কেবল শিক্ষিত সমাজকে ইসলামী বিধান, মূল্যবোধ ও ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত করার উদ্যোগ নিতে হবে। এ পথই আমাদের গ্রহণ করতে হবে। সৌভাগ্যক্রমে মুসলিম বিশ্বে গত পঞ্চাশ বছরে এক নতুন ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। এ সাহিত্যের ভাষা আধুনিক, এর পরিভাষা আধুনিক। সমাজ-বিজ্ঞানে বর্তমান সময়ের সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে এ নতুন সাহিত্য রচিত হয়েছে। এ সাহিত্য রচনায় যারা অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে উপমহাদেশের আল্লামা ইকবাল, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, মাওলানা আকরম খাঁ ও ফররুখ আহমদ উল্লেখযোগ্য। আরব বিশ্বের সাইয়েদ কুতুব, ইউসুফ আল


www.pathagar.com

কারযাভী, মোস্তফা আল জারকা, সাঈদ রমাদান, মুহাম্মদ আল গাজালী ও অন্যদের মধ্যে আলিজা ইজেতবেগভিচ, মুহাম্মদ আসাদ, মরিয়ম জামিলা, ড. জামাল আল বাদাবি, আবদুল হামিদ আবু সুলেমান ও টি বি আরভিংয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইসলামের প্রাথমিক যুগে রচিত সাহিত্যের পর এ নতুন সাহিত্য রচনার ফলে এক বিরাট শূন্যতার কিছুটা পূরণ হয়েছে। আমাদের মুসলিম বিশ্বের প্রতি কোণায় এ বিরাট সাহিত্যভাণ্ডারকে পৌঁছাতে হবে। মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষায় এ সাহিত্যের অনুবাদ করতে হবে, যাতে এক ভাষায় সাহিত্যের যে অভাব রয়েছে অন্যান্য ভাষায় রচিত সাহিত্য অনুবাদ করে তা পূরণ করা যায়।

বর্তমানে যে ইসলামী সাহিত্য রয়েছে তা যদিও যথেষ্ট উন্নত পর্যায়ের, তথাপি অনেক ক্ষেত্রে আরো প্রচুর সাহিত্য রচিত হওয়া দরকার। তমদ্দুনিক আন্দোলনের এটিও একটি দিক। ইসলামী চিন্তাবিদগণ ও সংগঠনসমূহ অবশ্য এ বিষয়ে অবহিত রয়েছেন। ইতোমধ্যেই মুসলিম বিশ্বে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বেশ কয়েকটি রিসার্চ বা গবেষণা প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। এদের তৈরি সাহিত্যকেও দ্রুত অনুবাদ করে মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি কোণায় পৌঁছিয়ে দেওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে।

সাধারণ জনগণকে অবশ্য এ সাহিত্য দ্বারা ইসলাম সম্পর্কে ধারণা দেওয়া যাবে না। এজন্য প্রচলিত পদ্ধতিতে জুমআর খুতবা ও ওয়াজ-মাহফিলের মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষা ও মূল্যবোধ ছড়িয়ে দিতে হবে। অবশ্য জুমআর খুতবাকে আরো সময়োপযোগী করার জন্য দেশবরেণ্য আলেমদের উদ্বুদ্ধ করে তাদের কমিটি গঠন করে নতুনভাবে খুতবার বই প্রণয়ন করার দরকার হবে। এসব কাজই হবে তমদ্দুনিক আন্দোলনের মূল কর্মসূচি।

ইসলামী দাওয়াতের তমদ্দুনিক পদ্ধতিকে সফল করতে হলে ইসলামী সংগঠনসমূহকে এ কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। ইসলামী রাজনৈতিক সংগঠনসমূহের উচিত তমদ্দুনিক কাজকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া। অবশ্য তমদ্দুনিক কাজে আত্মনিয়োগ করার সঙ্গে এসব প্রতিষ্ঠানে সামাজিক খেদমত, কর্মীদের চরিত্র গঠন ও সংগঠনের শক্তি বৃদ্ধির জন্য অন্যান্য কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। কেননা চরিত্র গঠন ও সংগঠনের শক্তি বৃদ্ধি ছাড়া তমদ্দুনিক কাজ এগিয়ে নেওয়া যাবে না।



www.pathagar.com

# শক্তিশালী মুসলিম উম্মাহ্ গঠন

মুসলিম উম্মাহ্‌র অবস্থা আজ খুব ভালো নয় তা সকলেই জানেন। এখন পর্যন্ত আদর্শিক দিক দিয়ে মুসলমানদের মধ্যে উম্মাহ্‌র অবস্থান এবং ইসলাম সম্পর্কে অনেক অজ্ঞতা রয়েছে। এখানে বিদ'আত প্রচলিত আছে। মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ জায়গায় শিরক প্রবেশ করেছে।

সামগ্রিকভাবে মুসলিম উম্মাহ্ গভীর অজ্ঞতা, অনেক বিদ'আত এবং শিরকে ডুবে আছে। বস্তুগতভাবে বললে অধিকাংশ মুসলিম দেশেই অশিক্ষা ও দারিদ্রতা বিরাজমান। এছাড়া উন্নয়নের দিক থেকেও তারা অনেক পিছনে রয়েছে। কিছু দেশ ছাড়া মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ দেশের অর্থনীতি খুব খারাপ, তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও খুব দুর্বল।

মুসলিম বিশ্বের আদর্শিক অবস্থা, তাদের বস্তুগত অবস্থা যখন এই–তখন একটি শক্তিশালী উম্মাহ্ গঠন করতে তাদের কি করা উচিত? একটি শক্তিশালী উম্মাহ্ গড়ে তুলতে অবশ্যই তাদেরকে শিক্ষা, অর্থনীতি এবং প্রতিরক্ষাকে গড়তে হবে। আদর্শিক বিষয় দেখার পূর্বে এগুলো হলো অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। মুসলিম বিশ্বের শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা সবাই অবগত। সব দেশেই নয়, অধিকাংশ দেশেই ইসলামিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা পূরণ হচ্ছে না। আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলি–আমার স্কুল থেকে শুরু করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পর্যন্ত আমাকে কুরআনের বিশটি আয়াতও শিখানো হয়নি। আমি দশটি আয়াতও শিখিনি। আমি শিখিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী–যিনি আমাদের আদর্শ। তাহলে কি এ শিক্ষাব্যবস্থা বা শিক্ষা আমাদের চাহিদা পূরণ করছে?

এটি পূরণ করছে না। স্বাধীন মুসলিম দেশসমূহের শেষ পর্যন্ত শক্তিশালী শিক্ষাব্যবস্থা গড়াই লক্ষ্য হওয়া উচিত। আমি জানি, এটি সময়ের ব্যাপার এবং এখানে আল্লাহ্‌র বিধান এবং অন্যান্য অনেক বিষয় জড়িত। তাই সময় প্রয়োজন। কিন্তু উদ্দেশ্য পরিষ্কার হওয়া উচিত যে, আমাদের এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা অর্জন করতে হবে যেটি আমাদের সকল বস্তুগত চাহিদা পূরণ করবে, সভ্য-সুন্দর মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার সকল চাহিদা পূরণ করবে। একই সাথে এটি আমাদের ইসলামিক প্রয়োজন মিটাবে–যদিও বর্তমানে অধিকাংশ



www.pathagar.com

দেশেই এ লাইনে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেনি। কিন্তু উম্মাহর কাছে উদ্দেশ্য পরিষ্কার হওয়া উচিত যে, শিক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের বৈষয়িক অগ্রসরতার জন্য, আমাদের দ্বীন-ধর্মের অগ্রসরতার জন্য, আদর্শিক উন্নতির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শিক্ষা। যদি চলমান শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের প্রয়োজন পূরণ না করতে পারে তখন আমাদের দায়িত্ব হবে ব্যক্তিগতভাবে অধ্যয়ন করা এবং ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে জানা। ব্যক্তিগত পড়াশুনার কোনো বিকল্প নেই।

আমাদের অনেক কিছু করার আছে। এজন্য সকল মুসলিম সরকার, রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবীদের অবশ্যই কাজ করতে হবে। সকল মুসলিম অর্থনীতিবিদদের শক্তিশালী মুসলিম অর্থব্যবস্থার জন্য কাজ করতে হবে। আমাদের প্রতিরক্ষাব্যবস্থাকেও গড়ে তুলতে হবে। আল্লাহ আমাদের সীমান্ত পাহারা দিতে বলেছেন। মুসলিম উম্মাহর প্রতিরক্ষা সম্বন্ধে, মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা সম্বন্ধে আমরা উদাসীন হতে পারি না। পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ ভালো। কিন্তু এটি শুধু মুসলিমদের জন্যই নয়, সবার জন্য হতে হবে। অন্যরা যেখানে সশস্ত্র সেখানে আমরা মুসলিম বিশ্বকে নিরস্ত্র হতে বলতে পারি না।

যোগ্য উম্মাহ গড়ার কথা বলছিলাম। বস্তুগত বিভিন্ন দিকের মধ্যে কিছু বিষয়ের আলোচনা করেছি। সত্যিকার অর্থে আমাদের এ বিষয়টি বিবেচনায় নিতে হবে যে উম্মাহ নিজেই আগ্রাসনের শিকার, হুমকির সম্মুখীন। আজ আমরা জানি যে, অনেক পণ্ডিত সভ্যতার দ্বন্দ্ব (Clash of Civilization) সম্বন্ধে কথা বলছেন। আমেরিকার একজন প্রধান পণ্ডিত হানটিংটন সভ্যতার দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে কথা বলেছেন এবং তিনি বলেছেন, 'পশ্চিমাদের কাছে ইসলামই পরবর্তী হুমকি। পাশ্চাত্য সভ্যতাকে রক্ষা করতে হলে এর বিরুদ্ধে যে কোনো হুমকির অবসান ঘটাতে হবে।' যেন এটাই সভ্যতার সর্বোচ্চ সীমা, যেন এটাই শেষ কথা। আমরা পশ্চিমা সভ্যতাকে শেষ হিসেবে গ্রহণ করি না। শুধু হানটিংটন নন, ফুকুয়ামা তার বই The End of History (ইতিহাসের সমাপ্তি)-তে বলেছেন যে, ইতিহাস তার শেষ গন্তব্যে পৌঁছেছে। তিনি বোঝাচ্ছেন, সত্যিকার অর্থে সেকুলার গণতন্ত্র এবং পুঁজিবাদ হলো শেষ দৃষ্টিভঙ্গি, যেটা মানব সভ্যতা অর্জন করেছে। তাই কোনো নতুন কিছু আসবে না, কোনো ভালো কিছু আসবে না। এটিই ইতিহাসের সমাপ্তি। কিন্তু আমরা সেকুলারিজমকে শেষ অধ্যায় হিসেবে ধরে নিতে পারি না।

মানব সভ্যতার সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, তারা আল্লাহর বিধানকে ভুলে গেছে এবং এটিই সমস্ত অনৈতিকতার মূল কারণ। আমরা পৃথিবীতে যা দেখি তাতে অধিকাংশ যুদ্ধ জাতিগতভাবেই হচ্ছে। আমি একমত পোষণ করি যে, ধর্মের ভিত্তিতেও যুদ্ধ হচ্ছে। কিন্তু এমন এক সময় আসবে, আমরা যদি তা পছন্দ করি তবে ধর্মের ভিত্তিতে সংঘাত বন্ধ করতে পারি। সেকুলারিজমের কাছে আমরা নৈতিকতাকে ছেড়ে দিতে পারি না, আত্মসমর্পণ করতে পারি না, যা আল্লাহর বিধানকে ভুলিয়ে দেয়।



www.pathagar.com

## পাশ্চাত্য দ্বন্দ্ব ও পাশ্চাত্যের চ্যালেঞ্জ

মুসলিম জাতির কাছে পাশ্চাত্য চ্যালেঞ্জ হলো রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও সবচেয়ে বেশি এবং মৌলিক হলো বুদ্ধিবৃত্তিক। আমি মুসলিম জাতির রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ সম্বন্ধে বেশি বলা প্রয়োজন মনে করি না। পশ্চিমারা কি চায়? পশ্চিমারা চায় মুসলিম দেশসমূহ পশ্চিমাদের নির্দেশগুলো মেনে চলুক। এটি আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

যখন একটি মুসলিম দেশ আণবিক বোমা বিস্ফোরণ করতে যায় তখন বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় গুরুত্বপূর্ণ শক্তির প্রেসিডেন্টের টেলিফোনে নির্দেশ পায় যে, 'তুমি এটি করতে পারো না।' মুসলিম দেশসমূহের ব্যাপারে অনেক বেশি নাক গলানো হয়। পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদেরকে তাদের নির্দেশসমূহ মানাতে চায়। যদি আমরা তাদের আদেশ মেনেও নিই–তারা কখনো মুসলমানদের ভালোর জন্য এবং ইসলামের ভালোর জন্য কোনো নির্দেশ দিবে না। আমি বলি না অন্যের ভালো বিষয়গুলো শুনবো না। আমাদের অন্যের ভালো জিনিসকে শোনা উচিত। কিন্তু আমরা পশ্চিমাদের রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে মেনে নিতে পারি না। তারা আমাদেরকে তাদের সংস্কৃতির কাছে নত হতে বলে – যেটা সবচেয়ে অশোভন, অশ্লীলতাপূর্ণ ও মানবদেহ প্রদর্শনে ভর্তি। পশ্চিমা ভোগবাদী সংস্কৃতিতে নারীদেরকে নোংরাভাবে ব্যবহার করা হয় এবং পুরুষদের লালসার বস্তুতে পরিণত করা হয়। আমি জানি না মানব ইতিহাসে এরকম বাজে সামাজিক ব্যবস্থা ছিল কি না? তাদের পারিবারিক জীবন কমবেশি তিক্তকর, তাদের পিতা-মাতা অবহেলিত আর না আছে তাদের শিশুদেরও নিরাপত্তা। সত্যিকার অর্থে পিতা-মাতা তাদের সমাজে অবহেলিত এবং নিরাপত্তাহীন। বৃদ্ধ বয়সে তাদের প্রচুর সমস্যা হয়। তাদের ছেলেমেয়েরা পিতা-মাতা দু'জনের যত্ন পায় না। সম্ভবত তারা অধিকাংশই একজনের অর্থাৎ মাতার যত্ন পায়। অথচ আল্লাহর নিয়ম হচ্ছে শিশুদের পিতা-মাতা দু'জনেরই যত্ন পাওয়া উচিত। তারা কোনো কারণ ছাড়াই অথবা অর্থহীন কারণেই তাদের পরিবার ধ্বংস করে দেয়। বিবাহ ঐতিহাসিকভাবেই সুন্দর ব্যবস্থা। এটি পুরুষ বা মহিলা কারোর জন্যই ক্ষতিকর নয়। তারা এমন এক অবস্থায় এসেছে সেখানে সত্যিই পরিবার ধ্বংস হচ্ছে। তারা অরাজকতা আর বিশৃঙ্খলতায় পরিচালিত হচ্ছে।

অর্থনীতির দিকে আসা যাক। তাদের সত্যিকার লক্ষ্য সাম্রাজ্যবাদ। তারা আমাদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণির, তৃতীয় শ্রেণির, চতুর্থ শ্রেণির দেখতে চায়। তারা আমাদেরকে তাদের বাজার বানাতে চায়। তাদের প্রতিষ্ঠানগুলো প্রধান পশ্চিমা শক্তির আনুকূল্যে পরিচালিত। আমি তাদেরকে ভালোভাবে জানি।. তাদের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো আমার ভালোভাবে জানা আছে। তারা বেশিরভাগই সমগ্র মানবজাতির উদ্দেশ্যে কাজ না করে পশ্চিমাদের উদ্দেশ্য পূরণ করে। কিন্তু আমি অবশ্যই বলবো, আসল হুমকি হলো বুদ্ধিবৃত্তিক। অন্যান্য চ্যালেঞ্জও



www.pathagar.com

সেখানে আছে; কিন্তু মূল এবং গূঢ় মৌলিক চ্যালেঞ্জ যেটি পশ্চিমাদের থেকে আসছে সেটি সত্যিকার অর্থেই বুদ্ধিবৃত্তিক। তারা অভিযুক্ত করছে এবং আমাদের বলছে যে, ইসলামিক রাষ্ট্রের ধারণা সম্ভবপর নয়। ইসলামিক রাষ্ট্র হওয়া ভালো নয়। তারা বলছে যে ইসলাম মানবাধিকার দেয় না। তারা বলছে যে, ইসলাম নারীর অধিকার দেয় না। আমি অবশ্যই দুঃখের সাথে বলবো, কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু মুসলমানদের কর্মকাণ্ডে এটি প্রকাশ পায় যে, ইসলাম যেন মানুষের অধিকার এবং নারীর অধিকার দেয় না। কোনো কোনো দেশের কোথাও কোথাও এর কিছু প্রকাশ আছে, যা এ ধারণার জন্ম দেয়। দুর্ভাগ্যবশত, আমাদের তা করা উচিত নয়। আমাদের ইসলামের সুনাম ক্ষুণ্ন করা উচিত নয়।

মানবাধিকার এবং নারীর অধিকার ইসলামে খুবই গ্রহণযোগ্য। এর সমর্থনে আমি তিনটি মূল প্রমাণ উল্লেখ করবো। ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরানের সংবিধান উলামা দ্বারা প্রণীত। ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তানের সংবিধান যদিও উলামা দ্বারা তৈরি নয় তথাপি সকল দলের উলামা দ্বারা গ্রহণীয়। এ দুই প্রমাণ এবং ইসলামের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের লেখাগুলো যেমন–মুহাম্মদ আসাদ, আবুল আলা মওদূদী, হাসান তুরাবি, বাংলাদেশের একজন রাজনৈতিক চিন্তাবিদ মরহুম আব্দুর রহীম সহ এরকম অনেকের লেখাগুলো। তাই আমি বলতে পারি, এসব দলিল যেগুলো উলামাদের দ্বারা প্রণীত অথবা তাদের দ্বারা সমর্থিত–পরিষ্কার প্রমাণ করে যে, ইসলাম মানবাধিকার দিয়েছে। পাকিস্তানের সংবিধানে মৌলিক অধিকারের ওপর একটি অধ্যায় আছে। ইরানের সংবিধানেও জনগণের স্বাধীনতার ওপর অধ্যায় আছে।

তুলনামূলক রাজনৈতিক বিশ্লেষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে আমি আমার ছাত্রদের ইরান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও আমেরিকার সংবিধান পড়িয়েছি। তাই আমি বলতে পারি যে, মুসলিম রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের লেখা, গুরুত্বপূর্ণ আলেমদের লেখা এবং ইরান ও পাকিস্তানের দুই সংবিধান প্রমাণ করে এবং পরিষ্কারভাবে দেখায় যে, ইসলাম মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং নারীর অধিকারের প্রতি মর্যাদাশীল। এ ব্যাপারে মানবাধিকার সম্পর্কে OIC Declaration যেটা OIC ফিকাহ একাডেমি কর্তৃক অনুমোদিত তাও দেখা যেতে পারে।

(১৯৯৮ সালের ২২ সেপ্টেম্বর যুক্তরাজ্যের শেফিল্ডে প্রদত্ত বক্তৃতা হতে)



www.pathagar.com

# দি মেসেজ অব দি কুরআন
# এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাফসির

মুহাম্মদ আসাদ (১৯০০-১৯৯৪) যিনি 'দি মেসেজ অব দি কুরআন' তাফসিরটি লিখেছেন, তার লেখার সঙ্গে আমি ১৯৬১ সালের দিকে পরিচিত হই। সে সময় আমি লাহোরে ফাইন্যান্স সার্ভিস একাডেমিতে ট্রেনিংরত ছিলাম। সে একাডেমির লাইব্রেরিতে মুহাম্মদ আসাদের বইগুলো ছিল। আমি তার The Principle of State and Government in Islam (ইসলামে রাষ্ট্র ও সরকার) বইটি পড়ি। এটি আধুনিককালে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার ওপর রচিত প্রধান কয়েকটি বইয়ের একটি। এরপর আমি তার Islam at the Crossroads (সংঘাতের মুখে ইসলাম) বইটি পড়ি। এতে তিনি আধুনিক যুগে ইসলাম যেসব সমস্যার সম্মুখীন সেগুলো এবং তার সমাধান কি সেসব বিষয় তুলে ধরেছেন। এ সময়েই তার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ Road to Mecca (মক্কার পথ) আমি পড়ি। এ বইয়ে তার জীবনী, তার অভিজ্ঞতা এবং ইসলাম সম্পর্কে তার বিভিন্ন মতামত বর্ণিত হয়েছে। The Message of the Quran (কুরআনের মর্মবাণী) আমি আরো আগে পড়ি। এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সালে এবং আমি এর কপি ১৯৬৬ অথবা '৬৭ সালে পাই। আমি এর অনুবাদে মুগ্ধ হই। আমার মনে আছে যে ইসলামী বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ প্রফেসর খুরশিদ আহমদ আমাকে কোনো একসময় বলেছিলেন যে আসাদের অনুবাদ হচ্ছে ইংরেজিতে শ্রেষ্ঠ অনুবাদ।

মুহাম্মদ আসাদের এ তাফসিরের অনুবাদে literal বা শাব্দিক অর্থ না করে বরং মর্মবাণী তুলে ধরা হয়েছে। এরকমটি মাওলানা মওদূদীও তার 'তাফহীমুল কুরআনে' করেছেন। তিনিও তার দৃষ্টিভঙ্গিতে শাব্দিক অনুবাদ না করে অনুবাদে মূলভাব তুলে ধরেছেন। মুহাম্মদ আসাদ অবশ্য তার তাফসিরের নোটে (যেখানে তিনি শাব্দিক অনুবাদ করেননি সেক্ষেত্রে) শাব্দিক অনুবাদও দিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং যারা শাব্দিক অনুবাদ চান তারা এ তাফসিরে শাব্দিক অনুবাদ পেয়ে যাবেন। আসাদ এমন এক মহান ব্যক্তি ছিলেন যিনি নিজের মাতৃভাষা না হওয়া সত্ত্বেও দু'টি বিদেশী ভাষা আরবি ও ইংরেজিকে পুরোপুরি আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন। আসাদের আরবি ও ইংরেজি আরব ও ইংরেজদের থেকেও উন্নত। এটি একটি অসাধারণ বিস্ময়।



www.pathagar.com

আসাদ তার তাফসিরে সংক্ষেপে খুবই গুরুত্বপূর্ণ নোট সংযোজন করেছেন। এসব নোটে তিনি যে কেবল তার নিজের উপলব্ধি তুলে ধরেছেন তা নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রেই বিশেষ করে বিতর্কমূলক বিষয়সমূহে পূর্ববর্তী আলেমদের মতামতও তুলে ধরেছেন। তিনি ইসলামের মানবতাবাদী ও যুক্তিবাদী ধারার প্রতিনিধি, অবশ্য তিনি কোথাও আমার জানামতে ইসলামের মূল spirit বা ভাব থেকে সরে যাননি বা অকারণে অন্য সভ্যতার নিকট নতজানু হননি, যদিও কেউ কেউ এরকম মনে করে থাকেন। তার তাফসিরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি লিঙ্গ পক্ষপাতিত্ব (gender bias) মুক্ত। এটি তার সাফল্য। অনেক তাফসিরে এটি দেখা যায় না।

উদাহরণ ঃ সূরা নিসার প্রথম আয়াতের অনুবাদ ও তার নোট দ্রষ্টব্য। তিনি আয়াতের ইংরেজি অনুবাদ করেছেন এভাবে -

> O mankind! Be conscious of your Sustainer, Who has created you out of one living entity, and out of it created its mate and out of the two spread abroad a multitude of men and women.

সূরা নিসার এক নং নোট দিচ্ছেন এভাবে -

> Out of the many meanings attributable to the term nafs soul, spirit, mind, animate being, living entity, human being, person, self (in the sense of a personal identity), human kind, life essence, vital principle and so forth most of the classical commentators choose 'human being' and assume that it refers here to Adam. Muhammad Abduh, however, rejects this interpretation (Manar, IV) and gives instead preference to humankind is as much as this term stresses the common origin and brotherhood of the human race (which, undoubtedly, is the purport of the above verse), without, at the same time, unwarrantably tying it to the Biblical account of the creation of Adam and Eve. My rendering of nafs, in this context, as 'living entity' follows the same reasoning. As regards the expression Zawjaha (is mate), it is to be noted that, with reference to animate beings the term Zawj ('a pair', 'one of a pair' or 'a mate') applies to the male as well as to the female component of a pair of couple; hence, with reference to human beings, it signifies a woman's mate (husband) as well as man's mate



www.pathagar.com

(wife). Abu Muslim as quoted by Razi interprets to phrase 'He created out of it (minha) its mate' as meaning 'He created its mate (i.e. its sexual counterpart) out of its own kind (min jinsiha)' thus supporting the view of Muhammad Abduh referred to above. The literal translation of minha as 'out of it' clearly alludes, in conformity with the text, to biological fact that both sexes have originated from the 'one living entity.'

অনুবাদ: 'নফস'-এর যেসব বিভিন্ন অর্থ করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে আত্মা, মন, জীবিত প্রাণ, জীবন্ত সত্তা, মানুষ, ব্যক্তি, নিজ (ব্যক্তিগত পরিচয় হিসেবে) মানবজাতি, জীবনের মূল, মূলনীতি ইত্যাদি এবং এসবের মধ্যে প্রাচীন তাফসিরকারগণ 'মানুষ' অর্থটি গ্রহণ করেছেন এবং ধরে নিয়েছেন যে এটি হচ্ছে আদম; কিন্তু মুহাম্মদ আবদুহু এ ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করেছেন (মানার চতুর্থ খণ্ড) এবং এর পরিবর্তে 'মানব জাতিকে' প্রাধান্য দিয়েছেন। কেননা এ অর্থ দ্বারা মানবজাতির সাধারণ ভ্রাতৃত্বের উপর জোর দেওয়া হয়েছে, যা হচ্ছে এ আয়াতের বক্তব্যের লক্ষ্য। একই সঙ্গে তিনি অযৌক্তিকভাবে একে বাইবেলে বর্ণিত আদম ও হাওয়া সৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্কিতও করেননি। আমার অনুবাদে আমি 'জীবিত সত্তা' (living entity) ব্যবহার করেছি, একই যুক্তির ভিত্তিতে। 'জাওজাহা' (তার সঙ্গী) সম্পর্কে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে যে, জীবজন্তু বা প্রাণীর ক্ষেত্রে 'জওজ' (জোড়া, জোড়ার একজন বা একজন সঙ্গী) পুরুষ ও নারী দু'ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয় অথবা পুরুষ-স্ত্রী বোঝায়। সুতরাং মানুষের ক্ষেত্রে এটি বোঝায় একজন নারীর সঙ্গী (স্বামী) এবং একজন পুরুষের সঙ্গী (স্ত্রী)। আবু মুসলিম থেকে রাজি উল্লেখ করেছেন, 'তিনি সৃষ্টি করেছেন তার সাথী (অর্থাৎ যৌন সঙ্গী) এর নিজ জাতি থেকে (মিন জিনসাহা)', এভাবে উপরোল্লিখিত মুহাম্মদ আবদুহুর মতকে সমর্থন করে। 'মিনহা' শব্দের শাব্দিক অর্থ 'এর থেকে' স্পষ্ট করে আয়াতের শব্দের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, জীব বিজ্ঞানের এ সত্য যে দু'লিঙ্গই (পুরুষ ও নারী) একই 'জীবন্ত সত্তা' থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

আসাদ তার তাফসিরে অনেকগুলো বিষয়ে অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত কিন্তু কুরআনের আয়াতের অর্থের আওতাধীন ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে দাসীদের বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রীরূপে গ্রহণ এবং হুর সম্পর্কিত ব্যাখ্যার উল্লেখ করা যায়।

সূরা নিসার ২৪ নং আয়াতের প্রথমাংশের অনুবাদ তিনি এভাবে করেছেন–

And (forbidden to you are) all married women other than those whom you rightfully posses (through wedlock).



www.pathagar.com

এ প্রসঙ্গে তিনি সূরা নিসার ২৬ নং নোটে বলেন-

According to almost all the authorities, almuhsanat denotes in the above context 'married women'. As for the expression 'ma malakat aymanukum (those whom your right hands possess, i.e., those whom you rightfully possess), it is often taken to mean female slaves captured in a war in God's cause (see in this connection 8:67 and corresponding note). The commentators who choose this meaning hold that such slave girls can be taken in marriage irrespective of whether they have husbands in the country of origin or not. However, quite apart from the fundamental differences of opinion, even among the companion of the Prophet, regarding the legality of such a marriage, some of the outstanding commentators hold the veiw that 'ma malakat aimanukum' denotes here 'women whom you rightfully possess through wedlock', thus Razi in his commentary on the verse, and Tabari in one of the alternative explanations (going back to Abdullah Ibn Abbas, Mujahid and others). Razi, in particular, points out that the reference to 'all' married women (al-muhsanat min annisa) coming as it does after enumeration of prohibited degrees of relationship, is meant to stress the prohibition of sexual relations with any woman other than one's lawful wife.

অনুবাদ: প্রায় সকল তাফসিরকারের মতে উপরের প্রেক্ষিতে 'আল মুহসানাত'-এর অর্থ 'বিবাহিতা নারী' যাদের তোমরা আইনসম্মতভাবে 'মা মালাকাত আইমানুকুম' (তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক অর্থাৎ যাদের তোমরা আইনসম্মতভাবে মালিক) দ্বারা প্রায়ই জিহাদে ধৃত নারী দাসীদের বুঝানো হয় (৮ ঃ ৬৭ আয়াতের নোটটি দেখুন)। যেসব তাফসিরকারক এ অর্থ নিয়েছেন তারা মনে করেন যে এমন নারীকে বিবাহ করা যায়, তাদের মূল দেশে তাদের স্বামী থাকুক বা না থাকুক। কিন্তু এর বৈধতার বিষয়ে নবীর সাহাবিদের মধ্যে এবং পরবর্তীতে সাহাবিদের সাথে অন্যদের মধ্যে মৌলিক মতবিরোধ ছাড়াও বেশ কিছু উচ্চ পর্যায়ের তাফসিরকার মনে করেন 'মা মালাকাত আইমানুকুম'-এর অর্থ এখানে 'যাদেরকে তোমরা বিবাহের মাধ্যমে আইনসম্মতভাবে অধিকারী হয়েছো'-এভাবেই ব্যাখ্যা



www.pathagar.com

করেছেন। রাজি এ আয়াতের এবং তাবারি তার এক ব্যাখ্যা এভাবেই করেছেন (আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ এবং অন্যদের উল্লেখ করে)। রাজি বিশেষ করে উল্লেখ করেছেন যে এখানে 'বিবাহিত নারীর' (আল মুহসানাত মিনান নিসা) উল্লেখ (যেহেতু তা নিষিদ্ধ নারীর উল্লেখের পর এসেছে) জোর দেওয়ার জন্য যে, একজনের বৈধ স্ত্রী ছাড়া আর কারো সঙ্গে যৌন সহবাস নিষিদ্ধ।

এ প্রসঙ্গে আসাদের সূরা মুমিনুনের তাফসিরের ৩নং নোটও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তেমনিভাবে 'হুর' সম্বন্ধেও তিনি অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি সূরা ওয়াকিয়ার ৮নং নোটে লিখেছেন–

> The noun 'hur' rendered by me as 'companions pure' is a plural of both 'ahwar' (masc.) and 'hawra' (fem.), either of which describes 'a person distinguished by hawar' which latter term primarily denotes 'in dense whiteness of the eyeball and lustrous black of the iris' (Qamus). In a more general sense, 'hawar' signifies simply 'whiteness' (Asas) or, as a moral qualification 'purity' (cf. Tabari, Razi and Ibn Kathir in their explanations of the term 'hawariyyun' in 3:52). Hence the compound expression 'hur' is signifies, approximately 'pure beings (or more specifically 'companions pure') most beautiful of eye' (which latter is the meaning of 'in', the plural of 'Ayan').
>
> As regards the term 'hur' in its more current feminine connotation, quite a number of earliest Quran commentators, amont them Al-Hasan al Basri understood it signifying no more or no less than 'the righteous among the women of the human kind (Tabari) [even] those toothless women of yours whom God will resurrect as new beings' (Al-Hasan as quoted by Razi in his comments on 44:54).
>
> অনুবাদ: বিশেষ্য 'হুর' শব্দটির আমি অনুবাদ করেছি 'জীবন সঙ্গী'। এ শব্দটি পুংলিঙ্গ 'আহওয়ার' এবং স্ত্রী লিঙ্গ 'হাওরা' শব্দের বহুবচন। আহওয়ার এবং হাওরা দ্বারা এমন এক ব্যক্তিকে বুঝায় যিনি 'হাওয়ার' দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। 'হাওয়ার' দ্বারা প্রধানত বোঝায় 'চোখের গভীরভাবে সাদা হওয়া এবং চোখের মণির উজ্জ্বল কালো হওয়া



www.pathagar.com

(কামুস)'। সাধারণ অর্থে 'হাওয়ার' দ্বারা বোঝায় শুধু সাদা হওয়া (আসাস) অথবা একটি নৈতিক গুণ হিসেবে 'পবিত্রতা' (তাবারি, রাজি এবং ইবনে কাসিরে ৩ঃ৫২ আয়াতের 'হাওয়ারিউন' শব্দের উপর আলোচনা)। সুতরাং যুগ্মশব্দ 'হুর ইন' দ্বারা মোটামুটিভাবে বোঝায় 'পবিত্র ব্যক্তিগণ (বা আরো স্পষ্টভাবে পবিত্র সঙ্গী), যাদের চোখ খুব সুন্দর (এটি হচ্ছে 'ইন' শব্দের অর্থ, এ শব্দটি 'আয়ান' শব্দের বহুবচন)'।

সাধারণভাবে হুর দ্বারা সাধারণত নারী বোঝানো হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় যে, পূর্বের যুগের বেশ কয়েকজন তাফসিরকার, যাদের মধ্যে হাসান আল বসরিও রয়েছেন, এর অর্থ করেছেন 'মানবজাতির মধ্যে সৎকর্মশীল নারীরা' (তাবারি)। এমনকি বিগত ঐসব দাঁতহীন মেয়েরাও 'নতুন মানুষ' হিসেবে পুনরুত্থিত হবেন (আল হাসানকে এভাবেই রাজি উল্লেখ করেছেন তার তাফসিরে ৪৪ঃ৫৪ আয়াতের ব্যাখ্যায়)।

মুহাম্মদ আসাদের পুরো তাফসিরটিই একটি অনন্য সাধারণ সৃষ্টি। মুহাম্মদ আসাদ তার তাফসিরের শেষে চারটি সংযোজনী যোগ করেছেন। এসব সংযোজনীর বিষয় হচ্ছে 'কুরআনের রূপক ও প্রতিকের ব্যবহার', 'আল মুকাত্তায়া', 'জ্বীন' এবং 'মিরাজ' সম্পর্কে। এ সবকয়টিই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংযোজনী।

কুরআনের তাফসিরে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য সব সময়ই ছিল ও থাকবে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে মতবিরোধ অত্যন্ত স্বাভাবিক। বড় চিন্তাবিদদের ক্ষেত্রে এটি সবসময়ই হয়েছে। যারাই তাফসির সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান অর্জন করতে চান তাদের অবশ্যই মুহাম্মদ আসাদের তাফসির পড়া উচিত, যেমন পড়া উচিত এ যুগের এবং পূর্বের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তাফসিরসমূহ।



www.pathagar.com

# হাদিসের পরস্পর বিরোধিতা দূর করার উপায়

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদিসসমূহের নির্দেশানুসারে কাজ করাই হচ্ছে হাদিসের মূলকথা। তবে পরস্পর বিরোধী বক্তব্যের দরুণ কোনো কোনো হাদিসের নির্দেশানুসারে কাজ করতে না পারার ব্যাপার আলাদা। আসল কথা হচ্ছে কোনো কোনো হাদিস যদিওবা পরস্পর বিরোধী বলে মনে হয়, মূলত সেগুলোর মধ্যে কোনো বিরোধ নেই।

আমরা হয়তোবা এমন দু'টি হাদিসের সন্ধান পেতে পারি যাতে রাসূলের (সা.) কার্যাবলী বর্ণিত রয়েছে। একজন সাহাবি একটি হাদিস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, রাসূল (সা.) অমুক কাজটি করতেন, আরেকজন সাহাবি অন্য হাদিস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন রাসূল (সা.) অন্যকিছু করতেন। এক্ষেত্রে হাদিস দু'টিকে পরস্পর বিরোধী বলা যাবে না এবং ধরে নিতে হবে যে, এ দু'টি কাজই অনুমোদনযোগ্য, যদি সেগুলো ইবাদতের পর্যায়ভুক্ত না হয়। যদি কাজ দু'টির একটি ইবাদত বলে মনে হয় এবং অন্যটি তা নয় সেক্ষেত্রে প্রথমটি মুস্তাহাব ও অপরটি শুধুমাত্র জায়েজ গণ্য হবে। এমন যদি হয় যে, দু'টি কাজই ইবাদত জাতীয় তবে দু'টি নির্দেশের গুরুত্ব অনুযায়ী ওয়াজিব অথবা মুস্তাহাব হিসেবে গণ্য হবে এবং এর একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি অনুসরণ করা যাবে।

হাদিসের হাফেজগণও তাদের হাদিস সংকলনে উপরোক্ত নীতি সমর্থন করেছেন। যেমন বর্ণিত আছে বিতরের নামাজ ১১ রাকাত, ৯ রাকাত, ৭ রাকাত, ৩ রাকাত বা ১ রাকাত। তাহাজ্জুদ নামাজের কিরআত উচ্চ স্বরে পড়বে কি নিম্ন স্বরে পড়বে সে ব্যাপারেও একই কথা। রাফে ইয়াদাইন অর্থাৎ নামাজে হাত কান পর্যন্ত উঠাবে কি কাধ পর্যন্ত সে ব্যাপারেও একইভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। হজরত উমর (রা.), আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এবং আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত তাশাহ-হুদের পার্থক্যও উপরোক্ত নিয়মে মীমাংসা করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে সকাল, বিকাল বা অন্যান্য সময়ের নান রকম দোয়ার ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে।

দু'টি হাদিসের মধ্যে কোনো অজ্ঞাত কারণেও বাহ্যত বিরোধ থাকতে পারে। যে কারণে একটি কাজ এক সময়ে ওয়াজিব, অন্য সময়ে মুস্তাহাব অথবা



www.pathagar.com

কোনো কাজ এক সময়ে ওয়াজিব হলেও অন্য সময়ে ভিন্নতর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তা না করারও অনুমতি আছে। এক্ষেত্রে বাহ্যিক বিরোধ বা সংশয় দূরীকরণার্থে গোপন কারণ অনুসন্ধান করতে হবে।

এমনও হতে পারে যে, কোনো একটি হাদিসে বর্ণিত কার্য সেসব কার্যাবলীরই একটি, যা বিশেষভাবে শুধুমাত্র রাসূলেরই (সা.) করার অধিকার ছিল। এক্ষেত্রে সাধারণ মুসলমানরা অন্য হাদিসটি অনুসরণ করবে। তাবিল বা ব্যাখ্যার মাধ্যমেও দু'টি হাদিসের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করা যায়। রাসূলের (সা.) কোনো ফকিহ সহচরের দেওয়া অতি অস্বাভাবিক ব্যাখ্যাও গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে কুরআন ও রাসূল (সা.) প্রদত্ত বিশদ, স্পষ্ট ও সরাসরি নির্দেশাবলীর ব্যাপারে কোনো কল্পিত ব্যাখ্যাই গ্রহণযোগ্য নয়।

দু'টি হাদিসে বর্ণিত দু'টি ঘটনাই যদি প্রশ্নের জবাব হয় অথবা বিশেষ ব্যাপারে রাসূলের (সা.) সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে এবং দু'টিতে ভিন্নতর কারণ ও অবস্থা বিদ্যমান থাকে তবে ঐসব ঘটনা বিবেচনা করেই সংশ্লিষ্ট হাদিসের ভিত্তিতে পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ প্রতিটি হাদিসই ঐ হাদিসের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

যদি এমন হয় যে, উপরোক্ত উপায়েও দু'টি হাদিসের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব নয় তবে সেগুলোকে পরস্পর বিরোধী বলা যেতে পারে। এক্ষেত্রে যদি একটি হাদিসের ওপর অন্যটির অগ্রগণ্যতা নির্ণয় করা যায়, তাহলে যেটি অগ্রগণ্য সেটিকেই অনুসরণ করতে হবে। আর যদি তা নির্ণয় করা সম্ভব না হয় তবে দু'টিকেই বাতিল বলে গণ্য করতে হবে। তবে বাস্তবে কোনো হাদিসই বাতিল করার আদৌ প্রয়োজন হয় না।

একটি হাদিসের উপর অন্যটির প্রাধান্য বা অগ্রগণ্যতা নির্ণয়ের জন্য নিম্নলিখিত নীতিসমূহ অনুসরণীয় –

ক. বর্ণনাকারীদের (রাবি) মর্যাদানুযায়ী (সনদ)

এখানে অগ্রগণ্যতা নির্ণয়ের ভিত্তি হচ্ছে এই যে, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বা ফকিহ সাহাবি কর্তৃক বর্ণিত হাদিস অন্যটির চেয়ে অধিকতর গ্রহণযোগ্য। অনুরূপভাবে যে হাদিস মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত বা যে হাদিস মরফু পর্যায়ের তা অন্যটির উপর শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। একইভাবে ঘটনার সঙ্গে জড়িত বা ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন এমন সাহাবি কর্তৃক বর্ণিত হাদিস ঘটনাস্থলে অনুপস্থিত সাহাবির বর্ণিত হাদিসের চেয়ে অগ্রগণ্য।

খ. হাদিসের মূল বচন

যে হাদিসে বিশদ বিবরণ আছে এবং তা অন্যান্য হাদিসেও পুনরাবৃত্তি ঘটেছে ঐ হাদিস সেই হাদিসের উপর অগ্রগণ্যতার



www.pathagar.com

দাবিদার, যে হাদিসে সেসব বিবরণ অনুপস্থিত। অর্থাৎ একাধিক সাহাবি কর্তৃক একই কথায় বর্ণিত হাদিস ভিন্ন ভিন্ন কথায় বর্ণিত হাদিসের চেয়ে অধিক গ্রহণযোগ্য।

গ. বিষয়বস্তু ও যুক্তি

যে হাদিসে বর্ণিত নির্দেশাবলী শরিয়তের নির্দেশাবলীর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বা এর যুক্তিসমূহ জোরালো সেটি অন্য হাদিসটির তুলনায় অগ্রগণ্য ও গ্রহণযোগ্য। (শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ র.-এর হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ্ গ্রন্থের ৯০ নং অধ্যায় অবলম্বনে)।



www.pathagar.com

# যাকাত আদায়ের বিধান

যাকাত ইসলামী জীবনব্যবস্থা ও অর্থনীতির অন্যতম ভিত্তি। এটি ইসলামের অন্যতম প্রধান ইবাদত। যাকাতব্যবস্থা কায়েম করতে হলে যাকাতের বিধি-বিধান, যাকাত কিসের উপর ধার্য হয়, কতো পরিমাণের উপর ধার্য হয়, কি হারে যাকাত দিতে হয় এসবের বিস্তারিত জ্ঞান জনগণকে দিতে হবে। ফিকাহ্র প্রাচীন পুস্তকসমূহে এ সম্পর্কে যেসব বিধান রয়েছে জনগণকে সে সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত করা হয়নি। কাজেই যাকাত সংক্রান্ত সব বিষয়ের সঠিক জ্ঞান জনগণকে দিতে হবে। তবেই সালাত আদায় করা যেমন জনগণের জন্য সহজসাধ্য, যাকাত আদায়ও তেমনি সহজসাধ্য হবে।

## কিসে যাকাত ধার্য হয়

নগদ টাকা, ব্যাংকে রাখা টাকা, স্বর্ণ-রৌপ্য, স্বর্ণ-রৌপ্যের অলংকার, অন্যান্য মূল্যবান ধাতু, ক্ষেতের ফসল, ব্যবসায়ী পণ্য, কারখানার কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্য, ছাগল, ভেড়া, গরু, মহিষ, উট ইত্যাদি পশু ও খনিজ সম্পদের উপর যাকাত ফরজ। এসব ছাড়াও মুসলিম মালিকানাধীন জমির ফসলের উপর ওশর ফরজ। হানাফী ফকিহদের মতেও জমি যদি খারাজি প্রমাণ পাওয়া না যায় তবে তা ওশরী বলে গণ্য হয়ে থাকে এবং তার উপর ওশর প্রদান করতে হবে। উল্লেখ্য যে ফসলের যাকাতকে ওশর বলা হয়।

আর একথা সর্বজনবিদিত যে, বাংলাদেশে যে ভূমিকর ধার্য করা হয় তা খারাজি নয়। বাংলাদেশের জমিও ওশরী ভূমি। (দ্রষ্টব্য: সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী, ওশরের শরীয়তি বিধান, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা)।

বিভিন্ন দেশে যাকাত আইনে বছরের শেষ দিনের শিল্প কারখানার কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্যের স্টকের উপর যাকাত ফরজ গণ্য করা হয়েছে। কাঁচামালের উপর যাকাতের যুক্তি হচ্ছে স্টকে থাকা কাঁচামাল ব্যবসায়ী স্টকের বা শিল্প উৎপাদনের মতোই। অবশ্য কারখানার যন্ত্রপাতির উপর কোনো যাকাত নেই।

## যাকাতের হার

যাকাতের হার হচ্ছে নগদ অর্থ, ব্যাংকে রক্ষিত অর্থ, অলংকারাদির মূল্য, শেয়ারের মূল্য এবং বছর শেষে শিল্পপণ্যের স্টক, ব্যবসায়ের স্টক, শিল্পের



www.pathagar.com

কাঁচামালের স্টক এসবের শতকরা আড়াই ভাগ। ফসলের উপর ওশর হবে যদি তা সেচ দেয়া না হয় তাহলে শতকরা দশ ভাগ, আর সেচ দিতে হলে শতকরা পাঁচ ভাগ। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন খনির উৎপাদনের উপর, সমুদ্রে আহরিত মাছের উপর মূল্যের শতকরা বিশ ভাগ। গরু, বাছুর, মহিষ, উট ইত্যাদির উপরও যাকাত রয়েছে। তার হার নির্ধারণে ফিকাহর কিতাব দেখে নেয়া ভালো।

## নিসাবের পরিমাণ

নিসাব বা কতো পরিমাণ সম্পদ থাকলে যাকাত দিতে হয়, এ সম্পর্কেও জনগণ পূর্ণভাবে অবহিত নয়। যাকাত বাস্তবায়নের জন্য এ সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করতে হবে। রৌপ্য, নগদ অর্থ, ব্যবসায়ীপণ্য, শিল্পের কাঁচামাল ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিসাব সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মূল্য। বর্তমান বাজার দরে প্রায় দশ হাজার টাকা। এ পরিমাণ সম্পদ থাকলে যাকাত ফরজ। এসব ক্ষেত্রে বছর শেষে যে পরিমাণ সম্পদ থাকবে সেই সম্পূর্ণ সম্পদের উপর যাকাত দিতে হবে। স্বর্ণের ও স্বর্ণালংকারের ক্ষেত্রে যাকাতের নিসাব হচ্ছে সাড়ে সাত তোলা। যদি রৌপ্য, স্বর্ণালংকার ও অন্যান্য মূল্যবান পাথর একত্রে থাকে তবে নিসাব হচ্ছে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মূল্য। ফসলের নিসাব হচ্ছে ৫ ওয়াসাক বা ২৭ মণ ফসল। তেমনিভাবে গরু-মহিষ, ছাগল-ভেড়া ইত্যাদির নির্দিষ্ট নিসাব রয়েছে। খনিজ সম্পদের বেলায় অধিকাংশ ফকিহর মতে কোনো নিসাব নেই।

## যাকাত দেওয়ার বছর কিভাবে গুণতে হবে?

কোনো সম্পদেই বছরে একবারের বেশি যাকাত নেওয়া হয় না। সব ফিকাহবিদই এ ব্যাপারে একমত। ক্ষেতের ফসল, খনিজ সম্পদ, সমুদ্র থেকে পাওয়া সম্পদ ও মাছের ক্ষেত্রে সারা বছর এসব সম্পদ হাতে থাকার শর্ত নেই।

ফসল হওয়া ও আহরণের পরপরই এসব ক্ষেত্রে যাকাত দিতে হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে যাকাত আদায় করার জন্য একটি পূর্ণ বছর ঠিক করে দিতে হয়। যেমন ১ রমজান হতে শাবানের শেষ দিন। এ ব্যাপারে ইমাম মালিক ও শাফেয়ীর মত হচ্ছে যে, শুধু বছরের শেষের হিসাবটা ধরতে হবে। অর্থাৎ যাকাত দেওয়ার জন্য বছরের শেষ দিনে যদি নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে তবে বছরের শুরুতে বা মধ্যে নিসাব পরিমাণ সম্পদ না থাকলেও যাকাত দিতে হবে। ইমাম আবু হানিফা ও তার সঙ্গীগণ, ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম আবু ইউসুফ মত প্রকাশ করেছেন যে, নিসাব বছরের শুরু ও শেষে থাকলেই যাকাত দিতে হবে। বছরের মধ্যের অবস্থা গণ্য করা হবে না। এটিই অধিকাংশ ফিকাহবিদদের মত। এ ব্যাপারেও জনগণকে বিশেষভাবে অবহিত করা দরকার, যেন তারা সহজে যাকাত দিতে পারে। (দ্রষ্টব্য: ইউসুফ আল কারযাভী, ইসলামে যাকাতের বিধান, পৃ: ৪০২-৪০৩)।



www.pathagar.com

## কত পরিমাণ দিতে হবে?

অভাবগ্রস্তকে এমন পরিমাণ যাকাত দিতে হবে যাতে আর অভাব না থাকে। এ প্রসঙ্গে অধিকাংশ ফকিহর মতে, যাকাতের গ্রহীতাকে এক বছরের প্রয়োজন পূর্ণ করে দিতে হবে। কেউ কেউ সমগ্র জীবনের প্রয়োজন পূর্ণ করে দেওয়ার কথা বলেছেন। এর অর্থ যাকাত গ্রহীতাকে পর্যাপ্ত পরিমাণ যাকাত দেওয়া, যার মাধ্যমে তার কর্মসংস্থান হয় এবং প্রতি বছরই তাকে যাকাতের জন্য হাত পাততে না হয়। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা.)-এর মতে, যখন দেবেই তখন স্বচ্ছল বানিয়ে দাও (ইউসুফ আল কারযাভী, ইসলামে যাকাতের বিধান, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩১-৩৭)। উপরোল্লিখিত আদর্শ মোতাবেক যাকাত প্রদান করতে হবে। বাংলাদেশে বিরাজমান সামাজিক পরিস্থিতিতে ধনী লোকেরা অভাবীদের অল্প পরিমাণ অর্থই প্রদান করে থাকে। তবে প্রত্যেক ধনী ব্যক্তির উচিত কমপক্ষে কিছু অভাবীকে অর্থ প্রদানের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা।

## প্রাপককে কি জানাতে হবে?

প্রাপককে দেওয়ার সময় যাকাত দেওয়া হচ্ছে, এটা বলা কি প্রয়োজন? অধিকাংশ ফকিহর মত হচ্ছে, তা বলার প্রয়োজন নেই। আলমুগনির লেখক ইবনে কুদামা বলেছেন, একজনকে ফকির মনে করে তাকে যাকাতের মাল বলে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন পড়ে না। মালিকি মাজহাবের কেউ কেউ বলেছেন, বলাটা মাকরূহ। কেননা তা বললে ফকিরের দিল ক্ষুণ্ন হয়। ইউসুফ আল কারযাভীর নিজের মত হচ্ছে যে, উত্তম নীতি হলো যাকাত দাতা ফকিরকে জানাবেন না যে এটি যাকাতের মাল, কেননা ঐরূপ করা গ্রহীতার পক্ষে মানসিক কষ্টদায়ক হতে পারে (ইউসুফ আল কারযাভী, ইসলামে যাকাতের বিধান, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪২৯-৪৪৩)।

## সামাজিক নিরাপত্তার প্রধান ব্যবস্থা

এ পর্যায়ে ইসলামের সবচেয়ে প্রধান ও মশহুর ব্যবস্থা হচ্ছে যাকাত, কোনো সাধারণ কর বা শুল্ক নয়। সব কাজে যাকাতকে ব্যবহার করা যায় না। যাকাত হচ্ছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রধান ভিত্তি। যাকাতের মাধ্যমে সমাজকে দারিদ্র্য থেকে ইসলাম উদ্ধার করতে চায়। যাকাতের হকদার হচ্ছে তারা যারা কর্মক্ষমতাহীন এবং যারা কর্মক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও উপার্জনহীন অথবা যথেষ্ট পরিমাণে উপার্জন করতে পারছে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহপাক বলেছেন, যাকাত পাবে ফকির, মিসকিন, যাকাত কর্মচারী, যাদের ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা দরকার, ক্রীতদাস, ঋণগ্রস্ত ও নিঃস্ব পথিক। আল্লাহর পথে সাধারণ জনকল্যাণমূলক কাজেও এ অর্থ খরচ করা যাবে (আল কুরআন, ৯ঃ৬০)।



www.pathagar.com

# উসূলে ফিকাহয় কুরআন ও সুন্নাহ ব্যাখ্যার মূলনীতি

উসূলে ফিকাহর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ইসলামের মৌলিক উৎস কুরআন ও সুন্নাহকে ব্যাখ্যা করা। এর জন্য কুরআন ও সুন্নাহকে বোঝা প্রয়োজন, মানে তাদের পাঠ (Text)-এর অর্থ বোঝা দরকার। এর জন্য যে ব্যক্তিই কুরআন ও সুন্নাহকে ব্যাখ্যা করতে চান, তা গভীরভাবেই হোক কিংবা সাধারণ মানেই হোক, আরবি ভাষায় জ্ঞান থাকতে হবে। এজন্য উসূলের পণ্ডিতরা শব্দের প্রকারভেদ ও তাদের অর্থ বা ব্যাখ্যা উসূলে ফিকাহ্ চর্চায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

যদি টেক্সটের মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা না থাকে অর্থাৎ টেক্সটি যদি সুস্পষ্ট হয় তবে তার ব্যাখ্যার তেমন প্রয়োজন নেই। কিন্তু আইন বা ফিকাহর অধিকাংশই ব্যাখ্যার মাধ্যমে গৃহীত হয় বা হয়েছে। কারণ বেশির ভাগ Legal Text-ই self evident (সুস্পষ্ট) নয়। স্মরণ রাখতে হবে যে, তাবিল (Tawil) বা Interpretation এবং তাফসির বা Explanation এক জিনিস নয়। তাফসিরের উদ্দেশ্য হচ্ছে আইনের উৎসের অর্থকে ব্যাখ্যা করা এবং ঐ বাক্যের সীমার মধ্যে হুকুম (Rule) বের করা। কিন্তু তাবিলের ব্যাপ্তি আরো বেশি এবং এর মাধ্যমে টেক্সটের ভেতরের বা অন্তর্নিহিত অর্থ বের করা হয়, যার উপর ভিত্তি করে ইজতিহাদ করা হয়।

সকল শব্দই সাধারণভাবে অসীমাবদ্ধ (Absolute বা মুতলাক), সাধারণ (আম) এবং আক্ষরিক (হাকিকি) অর্থ বোঝায় যদি না তার ব্যতিক্রম হবার কারণ বিদ্যমান থাকে। যদি কুরআন বা হাদিসের একাংশের ব্যাখ্যা বা তাবিল কুরআন বা সুন্নাহর অন্য কোনো অংশে পাওয়া যায় তবে তাকে তাফসির তাশরিয়ী বলা হয় অর্থাৎ যার ব্যাখ্যা শরিয়তেই আছে এবং এসবকে আইনের অপরিহার্য অংশ বলে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু যদি এ ব্যাখ্যাসমূহ মতামত বা ইজতিহাদের উপর নির্ভর করে তবে তা আইনের অপরিহার্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে না। এভাবে প্রাপ্ত আইনের মর্যাদা প্রথমে আলোচিত আইনের মর্যাদার চেয়ে কম এবং এসব আইনের ধারায় আলেমদের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। তাবিল প্রেক্ষিতের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। এরকম তাবিল সবার দ্বারাই গৃহীত হয়েছে কিন্তু খুবই দূরবর্তী তাবিল সবার নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।



www.pathagar.com

জাহেরি আলেমরা সাধারণত এরকম ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন না। যদিও তাদের এরকম অবস্থান নেওয়া দুর্বল ও বাস্তবতা বিবর্জিত।

ব্যাখ্যা বুঝতে হলে আমাদেরকে শব্দ বুঝতে হবে, শব্দের মাধ্যমে যে বাক্য বা বাক্যাংশ গঠিত হয়, এসব বুঝতে হবে। এজন্য বিভিন্ন শব্দের প্রকারভেদ জানতে হবে। যথা সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট শব্দ।

১টি প্রকারভেদ হচ্ছেঃ

ক. আলফাজ আল ওয়াজিহা (সুস্পষ্ট শব্দাবলী) ও
খ. আলফাজ গায়রিল ওয়াজিহা (অস্পষ্ট শব্দাবলী)।

এদের প্রতিটিকে আবার চার ভাগে বিভক্ত করা যায়:

১. আল-মুহকাম তথা চূড়ান্ত অর্থবোধক শব্দ।
২. আল-মুফাস্সার তথা বিশ্লেষণার্থ শব্দ।
৩. নাস তথা উদ্দেশ্য প্রণোদিত শব্দ।
৪. জাহের তথা সরাসরি অর্থবোধক শব্দ।

প্রথম দু'প্রকার শব্দ পুরোপুরি সুস্পষ্ট এবং এদের কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। মূলত এ দু'প্রকার শব্দের মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই অর্থের বিচারে। কিন্তু উসূলবিদগণ মুহকাম শব্দকে বলেছেন যে, এদেরকে রহিতকরণ (Abrogation) সম্ভব নয়। যদিও মুফাস্সার শব্দসমূহকে রহিতকরণ করা যাবে। অবশ্য রাসূল (সা.)-এর ইন্তেকালের পর যেহেতু আর নাসখ বা রহিতকরণ সম্ভব নয় সুতরাং মুহকাম এবং মুফাস্সার এখন বাস্তবে একই হয়ে গেছে। (দ্রষ্টব্য: হাশিম কামালি রচিত Principles of Islamic Jurisprudence)।

এর নিচের পর্যায়ের সুস্পষ্ট শব্দকে বলা হয়েছে জাহের ও নাস অর্থাৎ স্পষ্ট ও পরিষ্কার শব্দ। কিন্তু এদের বিভিন্ন ব্যাখ্যা সম্ভব। মুফাস্সার বা মুহকামের বিভিন্ন ব্যাখ্যা সম্ভব নয়, কিন্তু জাহের ও নাস-এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা সম্ভব। জাহের ও নাস শব্দের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, অর্থটি Context বা প্রেক্ষিতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না অথবা অর্থটি মূলপাঠে (Text) প্রাথমিক (Primary) না নির্গত (Secondary) অর্থ।

## মুতাশাবিহাত

এমন সব শব্দ যেগুলো আমাদের কাছে রহস্যপূর্ণ বা যাদের অর্থ আমাদের বোঝা সম্ভব নয় বলে মনে করা হচ্ছে। যেমন আল হারফুল মুকাত্তায়াত (যথা আলিফ-লাম-মিম, হা-মিম ইত্যাদি); কেউই এদের অর্থ জানে না। অধিকাংশ স্কলার মনে করেন যে, কুরআনের যেসব অংশে আল্লাহর কোনো বিষয় মানুষ কিংবা পার্থিব কোনো বিষয়ের সাথে তুলনাযোগ্য রয়েছে, সেসব আয়াতই মুতাশাবিহাত (যেমন আল্লাহর হাত, সিংহাসন, আরশ প্রভৃতি)।



www.pathagar.com

## মুজমাল

মুতাশাবিহাতের চেয়ে একটু কম অস্পষ্ট শব্দকে বলা হয় মুজমাল। এগুলো এমন সব শব্দ যাদের ব্যাখ্যা বর্ণনাকারী না উল্লেখ করে দিলে বোঝা যায় না। যেমন সালাত, সিয়াম, হজ ইত্যাদি মুজমাল শব্দ। সালাত মুজমাল, কারণ সালাতকে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ ও তার রাসূল ব্যাখ্যা না করে দেবেন, ততক্ষণ এটা বোঝা যায় না এবং যদি সত্যিকার অর্থেই এসব আল্লাহর রাসূল না বুঝিয়ে দিতেন তাহলে সালাত আমরা আদায় করতে পারতাম না। অধিকাংশ মুজমাল শব্দ যা কুরআন ও হাদিসে আছে রাসূল (সা.) তা ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন, হজ ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। ফলে এগুলো আর মুজমাল থাকেনি – এগুলো মুফাস্‌সার হয়ে গেছে। মানে সুস্পষ্ট শব্দ হয়ে গেছে।

কিন্তু এখনো যে সকল শব্দ মুজমাল রয়ে গেছে এবং শরিয়ত প্রণেতা তা ব্যাখ্যা করে দেননি, তা সবই মুজমাল রয়ে গেছে এবং এগুলো অস্পষ্ট শব্দ বলে গণ্য হবে। ১০১ঃ১-৫ এ 'আল কারিয়াহ' শব্দটি মুজমাল। কিন্তু এটি কুরআনেই ব্যাখ্যা করে দেওয়া হয়েছে এবং তা এখন সুস্পষ্ট।

## মুশকিল

মুজমালের চেয়ে আরেকটু কম অস্পষ্ট শব্দকে মুশকিল শব্দ বলা হয়। মুশকিল মানে কঠিন ( Difficult)। যেমন একটি শব্দের তিনটি অর্থ – কোনটি হবে? এগুলো মুশকিল শব্দ। গবেষণা করে এসব শব্দের অর্থ বের করা সম্ভব। যদিও তাতে সম্পূর্ণভাবে অস্পষ্টতামুক্ত হয় না।

## আল-খাফি

কোনো এক শব্দের যদি একাংশ স্পষ্ট হয় এবং অন্য অংশ অস্পষ্ট হয়, তবে সে সকল শব্দকে আল-খাফি বলে। যেমন সারিক (চোর)। আল্লাহ্ বলেন, যে চোর তার হাত কেটে দাও। এখন চোর কে? একজন পকেটমার কি এ চোরের পর্যায়ভুক্ত হবে? কাফন চোর কি চোর? এসব ক্ষেত্রে শব্দের মধ্যে অস্পষ্টতা রয়ে গেছে। এ শব্দের একাংশ অস্পষ্ট রয়ে গেছে। তাই এটি খাফি শব্দ। এসবের আইনগত গুরুত্ব ব্যাপক। যারা মনে করেন পকেটমার কুরআনে বর্ণিত চোরের পর্যায়ে পড়ে না, তারা এক্ষেত্রে হাত কাটার শাস্তি দেন না। কিন্তু তাকে তাজির তথা আদালতের রায় বা বিচারের অধীনে শাস্তি পেতে হবে।

## আ'ম ও খাস

শব্দের প্রকারভেদের আরেকটি বিধান হচ্ছে আ'ম ও খাস। এরা শব্দের scope বা সীমা বা ব্যাপ্তি কতটুকু, একটি শব্দে কি সকলেই অন্তর্ভুক্ত না কিছু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র বা অংশ অন্তর্ভুক্ত তা নির্ধারণ করে। এ সীমার দৃষ্টিকোণ থেকেই শব্দের এরূপ দুই ভাগ।



www.pathagar.com

আ'ম হচ্ছে ঐসকল শব্দ যার অর্থ একটি এবং খাসও এমন শব্দ যার অর্থ একটি । কিন্তু আ'ম শব্দের আওতায় যত ব্যক্তি, বস্তু চলে আসে, তাদের সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে ফেলে। আ'ম কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যক বোঝায় না। ইনসান (মানবজাতি) একটি আ'ম শব্দ যা সকল মানুষকে এর অন্তর্ভুক্ত করে। ইনসানের আর দ্বিতীয় কোনো অর্থ নেই। তাহলে কোনো বাক্যে যদি ইনসান থাকে, তবে ঐ বাক্যের ইনসান অর্থে সকল মানুষ অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। যখন কোনো বিশেষ্য পদের বা নামের পূর্বে নির্দিষ্টসূচক শব্দ 'আল' (The) বসে, তবে সেই শব্দ আ'ম হয়ে যায়। এমনিভাবে জামি (সবকিছু), কাফকাহ, কুল প্রভৃতি আরবি শব্দ যখন কোনো শব্দের পূর্বে বসে তখন সেসব শব্দাবলী আ'ম হয়ে যায়। অর্থাৎ যখন একটি আদেশ কোনো আ'ম শব্দ দ্বারা হয়, তখন তা আওতাধীন সকলের উপর প্রযোজ্য হবে। আ'মকে নিম্নোক্ত তিন ভাগে ভাগ করা যায়-

১. আ'ম যা পুরোপুরি সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন 'কোনো প্রাণী নাই যার রিজক আল্লাহর উপর নাই (ওয়ামা মিন দাব্বাতিন ফিল আরদে ইল্লা আলাল্লাহি রিজকুহা)।' (সূরা হুদ ঃ ৬)।

২. আ'ম যা নির্দিষ্ট কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন সূরা ইমরানের ৯৭ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'হে আহলে কিতাবধারী, কেন তোমরা আল্লাহর কথাকে অস্বীকার করছো?'

৩. আ'ম যাকে নির্দিষ্ট বা বিশেষায়িত করা হয়েছে অন্যত্র কোনো আয়াত দ্বারা। ২ঃ২২৮ ও ৩৩ঃ৪৯ আয়াতের প্রথমটিতে তালাকপ্রাপ্তির পর নারীকে তিন মাস (কুরু) ইদ্দত পালনের কথা বলা হয়েছে, অথচ ৩৩ঃ৪৯-এ বলা হচ্ছে 'যতি স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক দাও, তখন ইদ্দতের কোনো সময় নেই।'

আইন বা আদেশ যদি নির্দিষ্ট (Specific) করে দেওয়া থাকে তখন তা কাত্'ঈ (অকাট্য) হবে এবং তা তাবিলের উপযুক্ত হবে না। খাস (Specific) শব্দকে কাত্'ঈ (সুস্পষ্ট) গণ্য করা হয় মানে এর অর্থ ও প্রয়োগ দুর্বোধ্যতাশূন্য ও পরিষ্কার।

কিন্তু আ'ম শব্দ কাত্'ঈ না যন্নী, এ বিষয়ে আলেমদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। অধিকাংশ আলেমদের মতে আ'ম কাত্'ঈ নয়, খাস কাত্'ঈ। তাদের মতে, যদি একই বিষয়ে আ'ম বিধান (Ruling) ও খাস বিধান (Ruling) দুটিই পাওয়া যায় তাহলে খাসকে বহাল রাখতে হবে এবং আ'মকে সীমাবদ্ধ (Restrict) করে দিতে হবে। যেহেতু আ'ম যন্নী (অকাট্য নয়) ও খাস কাত্'ঈ (অকাট্য), সুতরাং খাসতো বহাল থাকবেই আর আ'ম-এর উমুমিয়াত (সর্বব্যাপকতা) তার সাধারণ ব্যবহারটি খাস দ্বারা নির্ধারিত ও বিশেষায়িত হয়ে যাবে।

আ'ম-এর প্রভাব হচ্ছে এটিকে বিশেষায়িত না করলে তা আ'ম হিসেবেই প্রয়োগ হবে। এমনকি যদি আংশিকভাবে আ'মকে বিশেষায়িত করা হয়ও



www.pathagar.com

সেক্ষেত্রে আ'ম-এর বাকি অংশ অবিশেষায়িত (Unspecified) অংশের জন্য আইনের সাধারণ উৎস হিসেবে বিদ্যমান থাকবে। যেহেতু অধিকাংশের মতে আ'ম কাত্'ঈ নয়, সেহেতু এর তাখসিস (সীমাবদ্ধতা বা Limitation) করা যায়।

## হাকিকি ও মাজাজি

শব্দের বিশ্লেষণে আরেকটি বিষয় হচ্ছে হাকিকি (Literal বা আক্ষরিক অর্থ) হবে না মাজাজি (রূপক অর্থ) হবে। সকল শব্দ সাধারণত হাকিকি অর্থে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ করে আইনের ক্ষেত্রে কোনো শব্দের অর্থ সাধারণত আক্ষরিকভাবে করা হয়, রূপক অর্থ এক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয় না। কুরআনে বেশিরভাগ শব্দই আক্ষরিক অর্থ দ্বারা বোঝা হয়। যেমন মানুষ মানে মানুষই, গরু মানে গরুই। এদের রূপক অর্থ গ্রহণ করা হবে না। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে কুরআনে মাজাজি অর্থ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন ৪০:১৩-তে আল্লাহ্ বলেন, 'Allah sends down sustenance from the heavens.' (অর্থ আল্লাহ্ আকাশ থেকে রিজিক পাঠান)। এখানে Sustenance অর্থ বৃষ্টি, আল্লাহ্ বৃষ্টি পাঠান, যার মাধ্যমে রিজিক উৎপন্ন হয়। সুতরাং এখানে হাকিকি অর্থ নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আবার সূরা নূরের ৩৫নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহু নূরুস্‌সামাওয়াতি ওয়াল আরদ'। এখানে নূর মানে আমরা যে Light দেখি সে Light-কে নূর বা আলো মনে করলে হবে না।

কিন্তু যদি দেখা যায় একটি শব্দের মাজাজি ও হাকিকি এ দু'টি অর্থ থাকে, তখন অধিকাংশের মতে হাকিকি আক্ষরিক অর্থেই নিতে হবে, একটি ক্ষেত্র ব্যতীত। অর্থাৎ যদি রূপক অর্থ প্রধান অর্থে পরিণত হয় এবং আক্ষরিক অর্থের উপরে চলে যায় তখন রূপক অর্থ গ্রহণ করতে হবে। যেমন তালাক শব্দের আক্ষরিক ও পরিভাষাগত অর্থ হচ্ছে To release বা মুক্ত করা বা Removal of restriction। কিন্তু এখন আইনে এর মাজাজি রূপটিকেই গ্রহণ করা হয়েছে। কেননা তালাকের প্রধান অর্থ এখন Dissolution of marriage বা Divorce হয়ে গেছে, ফলে এক্ষেত্রে হাকিকি অর্থ গ্রহণ করার কোনো সুযোগ নেই।

হাকিকি শব্দকে Linguistic (ভাষাগত), Customasy (রীতি বা রেওয়াজভিত্তিক) এবং Juridical (আইনগত) – এ তিনটি উপভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। হাকিকি ও মাজাজিকে আরো দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১. সরিহ্ (Sarih or Plain): যাদের অর্থ সহজেই বের করা যায় এবং যাদের অর্থ নিরূপণে বক্তা বা লেখককে কোনো প্রশ্নই করতে হয় না।

২. কিনায়াহ্ (যার মধ্যে অদৃষ্টতা আছে): যাদের অর্থ বক্তার বা লেখকের অন্য বক্তব্যের দ্বারা ব্যাখ্যা করতে হয়।



www.pathagar.com

আরেক প্রকার হচ্ছে মুশতারাক (Mushtarak)। মুশতারাক হচ্ছে ঐসব শব্দ যাদের একাধিক অর্থ আছে। যেমন 'আইন' (Ayn) একটি মুশতারাক শব্দ, যার অর্থ চোখ, ঝরণা, স্বর্ণ, গোয়েন্দা – এ চারটিই হতে পারে। এসব শব্দ 'মুশকিল' শব্দের অন্তর্ভুক্ত এবং কোনো আয়াতে এসব শব্দের সঠিক অর্থ বের করার জন্য যোগ্য ব্যক্তির (যোগ্য মুজতাহিদ আলেম) প্রয়োজন। মুজতাহিদদের মধ্যে এসব ব্যাপারে ভিন্ন মতামতের অবকাশ রয়েছে এবং ইজতিহাদ করতে এটি সবসময়ই হয়।

## মুতলাক ও মুকাইয়াদ

মুতলাক হচ্ছে এমন সব শব্দ যাদের নির্দিষ্ট বা বিশেষায়িত করা হয়নি তত। যখন আমরা বলি 'একটি বই' তখন তা কোনো বাধা তত ছাড়াই যে কোনো বইকে বোঝায়। আর যখন কোনো মুতলাক শব্দ অন্য কোনো এক বা একাধিক শব্দ দ্বারা বিশেষায়িত করা হয় তখন তা মুকাইয়াদ হয়ে যায়। যেমন 'একটি নীল বই' । আম ও খাস শব্দ যেখানে শব্দের তত বা ব্যাপ্তি-পরিধি নিয়ে চিন্তা করে, সেখানে মুতলাক বা মুকাইয়াদ শব্দসমূহ শব্দের গুণ বা শর্ত নিয়ে চিন্তা করে (যদিও মুতলাকের সাথে আম ও মুকাইয়াদের সাথে খাসের মিল আছে)। উদাহরণস্বরূপ 'দাস মুক্ত কর' (৫ঃ৯২) একটি মুতলাক আর 'বিশ্বাসী একজন দাস মুক্ত কর' (৪ঃ৯২) মুকাইয়াদের উদাহরণ।

যখন মুতলাক শর্তাধীন হয়ে মুকাইয়াদে রূপ নেয়, তখন মুকাইয়াদ অর্থই গ্রহণযোগ্য হয়। যেমন ৫ঃ৩ আয়াতে 'রক্তপান'-কে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে এবং ৬ঃ১৪৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'প্রবাহিত রক্ত হারাম'-এর কথা। এক্ষেত্রে পরেরটি মুকাইয়াদ ও প্রথমটি মুতলাক এবং মুকাইয়াদ অগ্রগণ্য হবে মুতলাকের চেয়ে। যদি দু'টি Text-এর একটি মুতলাক ও অন্যটি মুকাইয়াদ হয় এবং যদি তা আইনের দিক থেকেও কোনো কারণে ভিন্নধর্মী হয় তবে দু'টিই প্রযোজ্য (Operate) হবে, কোনোটিই শর্তাধীন হবে না। এটিই অধিকাংশের মত। যদিও ইমাম শাফেয়ী এ ব্যাপারে কিছুটা ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, যদি দু'টি Text আইনের দিক থেকে ভিন্ন হয়, কিন্তু কারণ একই থাকে, তখন মুতলাক মুকাইয়াদ দ্বারা শর্তাধীন হবে (৫ঃ৭ ও ৪ঃ৪৩ আয়াতদ্বয়)।

প্রমাণ গ্রহণের পদ্ধতি: একদল ওলামা প্রমাণ গ্রহণের ৪টি পদ্ধতির কথা বলেছেন। যথা–

১. ইবারাতুন্নাস: এর মানে হচ্ছে একেবারে শব্দের মধ্যেই, ইবারতের মধ্যেই হুকুমের প্রমাণ আছে। যেমন ফরজ নামাজ, রোজা, শাস্তিসমূহ বা উত্তরাধিকার আইন। এ সবগুলো প্রধানত ইবারাতুন্নাস শব্দের মধ্যে আছে। এটি হচ্ছে প্রমাণ গ্রহণের প্রথম পদ্ধতি এবং অধিকাংশ আইনের প্রমাণ এ পদ্ধতিতে করা হয়।



www.pathagar.com

২. ইশারাতুন্নাস: শব্দের মধ্যে সরাসরি নেই কিন্তু ইশারার মধ্যে প্রমাণ বা তথ্য রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, কুরআনের ২ঃ২৩৬ আয়াত (দোষ হবে না যদি তোমরা তালাক দাও, অথচ তোমাদের মধ্যে কোনো দৈহিক সম্পর্ক হয়নি অথবা তোমাদের মধ্যে মোহর ধার্য্য করা হয়নি)। এ আয়াতের ইশারা থেকে প্রমাণ হয় যে, মোহর ধার্য না হয়ে থাকলেও বিবাহ পূর্ণ হয়ে যায়। তবে পরে মোহর-ই-মিসল দিতে হবে।

৩. দালালাতুন্নাস: তেমনিভাবে তৃতীয় পদ্ধতি হচ্ছে দালালাতুন্নাস (Inferred meaning), অর্থাৎ দার যুক্তি দেখা। যেমন সূরা বনি ইসরাইলের ২৩ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'তাদেরকে অর্থাৎ পিতামাতাকে তোমরা 'উহ্' বলবে না।' এখানে কেউ যদি বলে আমি উহ্ বলবো না, কিন্তু অন্য সকল ধরনের খারাপ আচরণ করবো বা মন্দ কথা প্রয়োগ করবো – তা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, আয়াতটির Spirit বা দালালা বা কারণ বলে যে, মা-বাবার সাথে কটূক্তি করা, বাজে আচরণ করা, গালমন্দ করা যাবে না।

৪. ইকতিদাউন্নাস: এর অর্থ হচ্ছে Required বা যে অর্থ নেওয়া আবশ্যক সে অর্থ। যেমন সূরা নিসার ২২ নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'তোমাদের মায়েরা ও কন্যারা তোমাদের জন্য (বিবাহের জন্য) হারাম।' এ কন্যারা মানে কোন কন্যারা? এখানে কন্যারা বলতে বিবাহের মাধ্যমে কন্যা বোঝায়। তারা হারাম হয়ে যাবে বিয়ের ক্ষেত্রে।

কোনো রকম বিরোধের ক্ষেত্রে প্রমাণ গ্রহণে প্রথম পদ্ধতিটি দ্বিতীয় পদ্ধতির চেয়ে বেশি গুরুত্ব পাবে এবং দ্বিতীয় পদ্ধতি তৃতীয় পদ্ধতির উপর এবং তৃতীয় পদ্ধতি চতুর্থ পদ্ধতির উপর স্থান পাবে। কেননা, এদের একটি আরেকটি থেকে প্রমাণ পদ্ধতি হিসেবে উচ্চতর।

অন্যদিকে ইমাম শাফেয়ী প্রমাণ গ্রহণের পদ্ধতিকে দু'টি মৌলিক ভাগে ভাগ করেছেন। ১. দালালাহ আল মানতুক (Pronounced meaning), ২. দালালাহ আল মাফহুম (Implied meaning)।

এদের মধ্যে প্রথমটিকে আরো দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে – দালালাহ আল ইকতিদা (Required meaning – যে অর্থ গ্রহণ করা জরুরি) এবং দালালাহ আল ইশারাহ (Alluded meaning – যে অর্থ ইশারার মধ্যে আছে)। আবার দালালাহ আল মাফহুমকে মাফহুম আল মুয়াফাকাহ (Harmonious meaning বা সঙ্গতিপূর্ণ অর্থ) এবং মাফহুম আল মুখতালিফাকে (Divergent meaning বা অসঙ্গতিপূর্ণ অর্থ) এ দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। শাফেয়ীরা মাফহুম আল মুখতালিফাকে গ্রহণ করে না যদি না নিম্নোক্ত শর্তকে তা মেনে চলে।

১. এর অর্থ দালালাহ আল মানতুকের আওতার বাইরে হতে পারবে না।

২. অসঙ্গতিপূর্ণ অর্থ প্রধান অর্থ হতে পারবে না।



www.pathagar.com

৩. অসঙ্গতিপূর্ণ অর্থ কোনো প্রচলিত অর্থের পরিপন্থী হবে না।

৪. এর অর্থ অবশ্যই সত্য ভাষণের বিপক্ষে হবে না।

৫. এর অর্থ এমন এক সিদ্ধান্ত আনয়ন করবে না যা কোনো Textual আইন বা বিধানের বিপক্ষে হয়।

কিন্তু হানাফি আলেমরা মাফহুম আল মুখতালিফাকে আরো বেশি অগ্রহণযোগ্য মনে করেছেন। তারা এমন কোনো অর্থ গ্রহণ করেননি যা কিনা মূল পাঠের (Text) বা তার মর্মার্থ (Spirit)-এর সাথে খাপ খায় না। তারা কুরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এদের আদৌ গ্রহণ করেননি।

(বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: ৪র্থ ও ৫ম অধ্যায়, Principles of Islamic Jurisprudence by Mohammad Hashim Kamali, Islamic Texts Society, Cambridge).



www.pathagar.com

# ফতোয়া ঃ ঐতিহাসিক ও আইনগত প্রেক্ষাপট

ফতোয়া সম্পর্কে বিতর্ক বাংলাদেশে খুব বেশি আগে শুরু হয়নি। গত শতাব্দীর একেবারে শেষদিকে এ নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয়। যতটুকু জানা যায়, কিছু এনজিও এ নিয়ে আন্দোলন শুরু করে এবং 'ফতোয়াবাজি' শব্দটি প্রথমবারের মতো ব্যবহার করে। কিছু পত্র-পত্রিকা এ বিষয়ে ফলাও করে প্রচার করতে থাকে। তারা কেবল 'ফতোয়ার' অপব্যবহারের উপর কথা বলেনি; বরং ফতোয়ার বিরুদ্ধেই বক্তব্য রাখে।

সে প্রেক্ষিতে আমি ১৯৯৮ সালে ফতোয়ার ব্যবহার ও অপব্যবহারের উপর একটি চিঠি লিখি, যা বিভিন্ন ইংরেজি দৈনিকে সে বছর জুন মাসে প্রকাশিত হয়। একটি ইংরেজি দৈনিকে ২৫ জুন ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত পত্রটির বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া হলো।

ফতোয়ার ব্যবহার ও অপব্যবহার

> এটি সত্য যে, আমরা বিখ্যাত পণ্ডিতবর্গ অথবা পণ্ডিতবর্গের গ্রুপের লেখা অনেক ফতোয়ার কিতাব দেখতে পাই। যেমন – 'ফতোয়া-ই-আলমগিরি' যা সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনামলে ৩০০ আলেম সংকলন করেছেন। তেমনি রয়েছে 'ফতোয়া-ই-রাশিদিয়া' যা দেওবন্দের একজন বিখ্যাত আলেমের লেখা। আরো রয়েছে 'ইমদাদুল ফতোয়া' যা মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.) লিখেছেন। অনুরূপ আরো বেশকিছু ফতোয়ার বিখ্যাত সংকলন রয়েছে।
>
> এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ফতোয়ার আইনানুগ মূল্য কি? আমি কিছুদিন আগে ফতোয়ার একটি ভালো সংজ্ঞা পড়েছি যা এরূপ – ফতোয়া হচ্ছে আলেমগণের আইনানুগ মতামত যা বাধ্যতামূলক নয়। আসলে এটিই সত্য এবং এটিকেই একটি সাধারণ সংজ্ঞা হিসেবে গ্রহণ করা যায়। অবশ্য এটি আদালতের রায় বা সিদ্ধান্ত থেকে পৃথক। রায় হচ্ছে আদালতের সিদ্ধান্ত যা বাধ্যতামূলক; তবে তা উচ্চতর আদালতে আপিলযোগ্য। অথচ ফতোয়া শুধু আইনানুগ মতামত, যা বাধ্যতামূলক নয়। যেমন একজন আধুনিক আইনজীবী বা এটর্নির মতামত। অ-বাধ্যতামূলক 'ফতোয়া' কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ ব্যক্তিগত ব্যাপারে



www.pathagar.com

মেনে চলতে পারে, এমনকি তা সামাজিক ব্যাপারেও মানা যেতে পারে, যতক্ষণ না তা জোর করে চাপানো হয় অথবা তা রাষ্ট্রীয় আইনের (Public Law) অন্তর্ভুক্ত হয়। ফতোয়ার দ্বারা কোনো শাস্তি দেওয়া যায় না। শাস্তি কেবল ইসলামী রাষ্ট্রের আদালত দিতে পারে। ইসলামের ইতিহাসে এ নজির নেই যে, কোনো আলেম কাউকে শাস্তি দিয়েছেন বরং শরিয়াহ্ আদালতই এরূপ শাস্তিবিধান করেছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, 'ফতোয়া-ই-আলমগিরি'-এর মতে ফতোয়ার কিতাব জনগণের ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানে সহায়তা যেমন করেছে, তেমনি আদালতকেও তাদের সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করেছে। সে সময় সংসদের দ্বারা পাস করা কোনো আইন ছিল না। ফলে আদালতের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে এসব কিতাব খুবই সহায়ক ছিল। অবশ্য এসব ফতোয়া আদালতের উপর বাধ্যতামূলক ছিল না – ফতোয়া গ্রহণ করা না করা আদালতের এখতিয়ার ছিল। আদালত ইচ্ছা করলে তা গ্রহণ করতো অথবা স্বাধীনভাবে তাদের মতামত ব্যক্ত করে রায় দিতো।

আমি একমত যে উপরোক্ত বিষয়ে অন্য কিছু মুসলিম দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও অনেক ভুল বোঝাবুঝি রয়েছে। এটি যোগ্য আলেমদের দ্বারা অবশ্যই দূরীভূত হতে হবে। ফতোয়া অবশ্যই যোগ্য ইসলামী পণ্ডিতবর্গের কাজ। গ্রাম্য বা স্থানীয় নেতা এমনকি ইসলামী আইন সম্পর্কে ব্যাপকভাবে অবহিত নন এমন সুধীদের কাজ নয়। ফতোয়ার অপব্যবহার কালক্রমে প্রচারমাধ্যমের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার দ্বারা জনগণকে অবহিত করতে পারলেই কেবল সঠিকভাবে রোধ করা যাবে।

বাংলাদেশে বর্তমান বিতর্কের পূর্বেই আমি এ লেখা লিখেছিলাম। এখন আমি Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World-এর ফতোয়া সংক্রান্ত তিনটি প্রবন্ধ থেকে কিছুটা আলোকপাত করতে চাই। এই প্রবন্ধ তিনটি হচ্ছে Concept of Fatwa বা ফতোয়ার ধারণা – মুহাম্মদ খালিদ মাসুদ, Process and Function of Fatwa বা ফতোয়ার পদ্ধতি ও কার্যাবলী – ব্রিঙ্কলি মেজিক এবং Modern Usage of Fatwa বা ফতোয়ার আধুনিক রীতি – আহমদ এস দাল্লাল।

## ফতোয়ার ধারণা

ফতোয়া শব্দটি 'ফাতা' থেকে উদ্ভূত। 'ফাতা' অর্থ যৌবন, নতুনত্ব, সরলীকরণ বা ব্যাখ্যা। এসকল অর্থ তার বিভিন্ন সংজ্ঞায় দেখা যায়। কুরআনে এর উল্লেখ দেখা যায় দুইভাবে। প্রথমত, কোনো বিষয়ে সুনির্দিষ্ট উত্তর চাওয়া এবং দ্বিতীয়ত, সুনির্দিষ্ট জবাব দান। (সূরা নিসা, আয়াত ১২৭ ও ১৭৬)। ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির কাঠামোতে তথ্য সরবরাহের



www.pathagar.com

মাধ্যমে 'ফতোয়ার' ধারণার উন্মেষ ঘটে। তখন এর বিষয় ছিল জ্ঞান। পরবর্তীতে 'জ্ঞান' যখন হাদিসের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন ফতোয়া রায় বা ফিকাহ বা আইন শাস্ত্রের সাথে যুক্ত হয়। ফলে ফতোয়া শব্দটির কৌশলগত ব্যবহার আরো অধিকতর পরিশীলিত হয়।

বিচার সংক্রান্ত কর্তৃত্বের কার্যকারিতার প্রেক্ষাপটে ফতোয়া এবং আদালতের রায় এক নয়। ফতোয়ার আওতা আদালতের রায়ের চেয়ে প্রশস্ততর। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের আওতাভুক্ত ইবাদত বা বাধ্যতামূলক ধর্মীয় অনুষ্ঠান আদালতের আওতাবহির্ভূত, যদিও এগুলো ইসলামী আইনের অপরিহার্য অংশ এবং আইনশাস্ত্রে ও ফতোয়ায় এটি উল্লেখযোগ্যভাবে উদ্ধৃত হয়। আরো উল্লেখ্য যে, ফতোয়া কারো উপর বাধ্যতামূলক নয়, যদিও আদালতের রায় বাধ্যতামূলক এবং আইনানুগভাবে কার্যকরী।

পূর্বে ফতোয়া বিচার পদ্ধতি বহির্ভূতভাবেও কাজ করতো, যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোর্টের সাথে মুফতিদের সংযুক্ত করা হতো। আন্দালুসিয়ায় আদালতের উপদেষ্টা হিসেবে মুফতিগণ কাজ করতেন।

আধুনিক পণ্ডিতবর্গও ফতোয়াকে সচরাচর ইসলামী পণ্ডিতগণের দ্বারা প্রদত্ত আনুষ্ঠানিক আইনানুগ মতামত হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। অবশ্য তাদের ভূমিকা উপদেশমূলক এবং তা স্ব-স্ব দেশের ধর্মীয় মন্ত্রণালয়ের অংশ, বিচার মন্ত্রণালয়ের নয়।

## ফতোয়ার পদ্ধতি এবং কাজ

ফতোয়া সাধারণত একজন মুফতি প্রশ্নকারী কোনো ব্যক্তিকে উত্তর আকারে দিয়ে থাকেন। ফতোয়া এমন একটি ইসলামী পদ্ধতি (Institution) যা সকল কালে এবং সকল স্থানে মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। ফতোয়াকে রোমান আমলের আইন পরামর্শদাতাদের (Juris Consuls) মতামতের (Legal Opinion) সঙ্গে তুলনা করা যায়। কোর্টের রায় এবং ফতোয়া ভিন্ন ধরনের (Different Category)। কোর্টের রায় বাধ্যতামূলক। কিন্তু ফতোয়া পরামর্শদানের পর্যায়ের (Advisory)। মুফতিগণ ব্যক্তিগত প্রশ্নের জবাব দেন কিন্তু কোর্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করে রায় প্রদান করে। ইসলামী রাষ্ট্রে বিচারক এবং মুফতি নিজস্ব পদ্ধতিতে শরিয়তের ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকেন। যেখানে কোর্ট প্রধানত সাক্ষ্য-প্রমাণ দেখে বিচার করে সেখানে মুফতি কুরআন-সুন্নাহ ও অন্যান্য প্রমাণ দেখে ফতোয়া প্রদান করেন। তত্ত্বগতভাবে ফতোয়া মৌখিকভাবেও দেওয়া যায়। লিখিতভাবে অসংখ্য ফতোয়া রয়েছে বিভিন্ন ফতোয়ার গ্রন্থে। এছাড়া বিভিন্ন ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অসংখ্য ফতোয়া সংরক্ষণাগারে (Archive) সংরক্ষিত আছে।

ফতোয়া 'হ্যাঁ' বা 'না' আকারে প্রশ্নের উত্তরে এক শব্দ হতে পারে। আবার কোনো ক্ষেত্রে তা পুস্তিকার আকার ধারণ করতে পারে।


www.pathagar.com

ফতোয়ার সামগ্রিক তাৎপর্য দু'ধরনের। প্রথমত, ফতোয়ার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক, রাজনৈতিক ও তত্ত্বগত বিষয়ে খ্যাতনামা ফিকাহবিদগণ (Jurist) তাদের আনুষ্ঠানিক (Fromal) মতামত দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, অন্যান্য অসংখ্য ফতোয়ার মাধ্যমে মুসলিম জনগণ তাদের জীবনকে শরিয়তের আলোকে সাজিয়ে নিয়েছেন (arrange their affairs)।

## ফতোয়ার আধুনিক পদ্ধতি

ফতোয়ার উদ্দেশ্যে মুফতি সাহেবদের জন্য সরকারি অফিস প্রতিষ্ঠার অনেক আগে থেকেই অনানুষ্ঠানিকভাবে ফতোয়ার প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয় এবং তার সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তা দৃষ্ট হয়। উসূলে ফিকাহে এর বিষয়বস্তু পরিলক্ষিত হয়। ইজতেহাদের পরেই এ বিষয়ে আলোচনা হয়ে থাকে।

ব্যবহারিক আইনের ক্ষেত্রে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও বুদ্ধিবৃত্তিক মতামতের অনুসন্ধানের নাম ইজতেহাদ। অথচ ফতোয়া আইনের বিষয়ে উপদেষ্টা হিসেবে মুজতাহিদের সামাজিক ভূমিকার উল্লেখ করে। এক্ষেত্রে এটি সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত কাজির ভূমিকা থেকে পৃথক। তাই ফতোয়া হচ্ছে একজন মুসতাফতি বা প্রশ্নকারীর জিজ্ঞাসার জবাবে অ-বাধ্যতামূলক (non-binding) আইনানুগ মতামত। এক্ষেত্রে একজন মুফতি কোনো বিবাদের একটি পক্ষের জিজ্ঞাসার জবাবে মতামত দিয়ে থাকেন। এ কারণেই একজন মুফতির ফতোয়া বাধ্যতামূলক হয় না, যেমনটি হয়ে থাকে একজন বিচারকের রায়।

একাদশ শতাব্দীর আগে যিনি ফতোয়া দিতেন তিনি মুফতি হতে পারতেন। কেবল তার জ্ঞান ও সমাজের পণ্ডিত সম্প্রদায়ের স্বীকৃতিই এক্ষেত্রে পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচিত হতো। একাদশ শতাব্দীতে এসে মুফতিদের সরকারি অফিস চালু হয়। খোরাসানে কোনো নগরের শাইখুল ইসলামই সেই নগরের উলামাদের সরকারি প্রধান হিসেবে বিবেচিত হতেন এবং তিনি প্রধান মুফতি হিসেবে তার কাজ করে যেতেন।

মামলুক শাসনামলে প্রত্যেক প্রাদেশিক রাজধানীতে আপিল আদালতের অংশ হিসেবে প্রত্যেক মাজহাব থেকে একজন মুফতি নিয়োগদান করা হতো।

উসমানীয় শাসনামলে প্রত্যেক নগরে একজন করে মুফতিকে নিয়োগ দেওয়া হতো। মুফতিগণকে আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংঘবদ্ধ করা হতো এবং ফতোয়াদানের কাজকেও একটি দৈনন্দিন রাষ্ট্রীয় পদ্ধতির আওতায় আনা হতো। দ্বিতীয় সুলতান মুরাদের শাসনামলে (১৪১১-১৪৪৪ এবং ১৪৪৬-১৪৫১) শাইখুল ইসলামের উপাধি পরিবর্তিত হয়ে সাম্রাজ্যের প্রধান মুফতি-তে পরিণত হয়। কালক্রমে মুফতির অফিস উসমানীয় সাম্রাজ্যে রাজনৈতিক অনুমোদন লাভ করে, যা পূর্বে ছিল না। পরবর্তীতে প্রধান মুফতির অফিস আবার শাইখুল ইসলামের অফিসে রূপান্তরিত হয়। উসমানীয় খলিফা সুলাইমান ইস্তাম্বুলে শাইখুল ইসলামের



www.pathagar.com

পদে প্রধান মুফতিকে নিয়োগদান করতেন এবং তাকেই সাম্রাজ্যের ধর্মীয় প্রধান হিসেবে বিবেচনা করতেন। সুলতান শাইখুল ইসলামকে নিয়োগদান ও বরখাস্ত করতেন। আবার সুলতানকে তার পদে স্থায়ীকরণ বা ক্ষমতাচ্যুতি শাইখুল ইসলামের ফতোয়ার উপর নির্ভর করতো। এক্ষেত্রে অবশ্য শাইখুল ইসলাম তার রায় কার্যকর করতে বিচারপতিদের উপর নির্ভরশীল ছিলেন।

উসমানীয় সাম্রাজ্যে ফতোয়ার ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যুদ্ধ ও শান্তির বিষয়ের সংস্কারের ক্ষেত্রেও শাইখুল ইসলামের ফতোয়ার প্রয়োজন হতো। তার অনুমোদন ব্যতিরেকে প্রশাসনিক ও রাজস্ব বিভাগের কোনো সংস্কার সম্ভব ছিল না। আধুনিক মুসলিম বিশ্বেও কিছু উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা মুসলিম উম্মাহর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ফতোয়া দিয়ে থাকেন। ওআইসির 'ফিকাহ একাডেমি' ও সৌদি আরবের স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান 'দারুল ইফতা' এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। উত্তর আমেরিকার মুসলমানদের রয়েছে 'নর্থ আমেরিকান ফিকাহ কাউন্সিল'। ফতোয়ার ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশাবলী সুস্পষ্ট। যেহেতু প্রত্যেক মুসলমানের জন্যই ইসলামী বিধিবিধান জানা ফরজ বা অপরিহার্য কর্তব্য তাই এ ব্যাপারে জানার জন্য কোনো বিজ্ঞ আলেমের কাছে প্রশ্ন করা বা মতামত চাওয়াও ফরজের অঙ্গ। আর আলেমদের জন্য কেউ দ্বীন ও শরিয়ত সংক্রান্ত বিষয়ে জ্ঞানীদের কাছ থেকে জেনে নেওয়ার নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহ ও তার রাসূল (সা.) দিয়েছেন। কোনো আলেমের কাছে শরিয়াহ সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করা হলে সে বিষয়ে তার জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও প্রশ্নকারীকে অবহিত না করলে পরকালে তাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে বলে রাসূল (সা.) বলেছেন। তাই শরিয়াহ বিষয়ে আলেমদেরকে জিজ্ঞাসা করা এবং আলেমদের পক্ষ থেকে সে বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করা বা ফতোয়া প্রদান করা ইসলামী শরিয়তের অপরিহার্য অঙ্গ। আর এ বিষয়টি কুরআন, সুন্নাহ, সাহাবিদের আমল এবং মুসলিম বিশ্বের সর্বকালের আলেমদের ভূমিকা দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত।

সুতরাং ফতোয়া বন্ধ করা কোনোভাবেই ইসলামসম্মত কাজ নয়। এরকম করা হলে মুসলিম সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে ও ইসলামী আইনের অগ্রগতি বিনষ্ট হবে এবং ইজতিহাদের মাধ্যমে নতুন সমস্যা সমাধানে ইসলামী আইনের ভূমিকা ব্যহত হবে। তবে ফতোয়ার অপব্যবহার রোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তার দায়িত্ব সমাজের সকল মহলের।



www.pathagar.com

# ইসলাম ও জননিরাপত্তা

রাষ্ট্র ও সমাজের অস্তিত্বের মূল কারণই হচ্ছে জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা। একসময় রাষ্ট্র ছিল না। তখন বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজ করাই স্বাভাবিক ছিল। এ বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে বের হয়ে এসে সমাজে নিরাপত্তা বিধান করার জন্য রাষ্ট্র গঠন করা হয়।

ইসলাম রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) মদিনাতে পৌছেই একটি সংঘবদ্ধ সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। এ রাষ্ট্র গঠন ও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল অবশ্যই ইসলামী আইন-কানুন ও আদর্শ কার্যকরী করা। তবে এর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

জননিরাপত্তা নষ্ট করাকে ইসলাম একটি বড় অপরাধ গণ্য করে। ইসলামের পরিভাষায় 'ফাসাদ ফিল আরদ' (পৃথিবীতে বিপর্যয়) সৃষ্টি করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং তার জন্য মৃত্যুদণ্ড হতে পারে। (সূরা মায়িদা, আয়াত ৩২)।

জননিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য ইসলাম জীবন, সম্পদ ও সম্মানের নিরাপত্তাসহ সব ধরনের প্রয়োজনীয় মৌলিক অধিকার দিয়েছে। বিদায় হজের বাণীতে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

> হে লোকসকল! তোমাদের পরস্পরের জান, মাল ও সম্মান পরস্পরের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত এই নগরী, এই মাস, এই দিনের মতো হারাম সাব্যস্ত করা হলো। (সকল হাদিসগ্রন্থ)।

জীবন, মাল ও সম্মানের উপর হস্তক্ষেপের নিষিদ্ধতা জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মদিনার ইসলামী রাষ্ট্রের শুরুতে ও মদিনার সনদে একই অধিকার দেওয়া হয়েছিল। সে সনদের কিছু অংশ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

> খোদাভীরু মুমিনগণ তাদের মধ্যকার বিদ্রোহী, ঘোরতর নির্যাতক, অপরাধী, মুসলিম সমাজের স্বার্থের ক্ষতিকারক ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারকদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিবে এবং এ ধরনের অপরাধীদের বিরুদ্ধে সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে পদক্ষেপ নিবে। চাই সে তাদের কারো ছেলেই হোক বা অন্য কেউ হোক। মুসলিম রাষ্ট্রে



www.pathagar.com

অনুগত অমুসলিমদের অধিকার সমান। একজন সাধারণ অমুসলমানকেও মুসলমানরা পূর্ণ নিরাপত্তাসহ আশ্রয় দেবে। (সিরাতে ইবনে হিশাম, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত, পৃ. ১৪৭)।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইসলাম অনেক সময় 'অধিকারকে' 'দায়িত্ব' হিসেবে উল্লেখ করেছে। যেমন সূরা নিসায় আল্লাহ পাক বলেছেন, 'হে ইমানদারগণ, তোমরা একে অপরের মাল অবৈধভাবে ভোগ করো না।' এখানে অবৈধ সম্পত্তি বা সম্পদ ভোগ না করার দায়িত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য মানুষের অধিকার আদায় সুনিশ্চিত করাই এর লক্ষ্য। প্রত্যেকে যদি তার দায়িত্ব পালন করে তাহলে অন্যের অধিকার রক্ষিত হয়।

জননিরাপত্তা কেবল আইন দ্বারা অর্জন করা সম্ভব হয় না। এজন্য প্রয়োজন নাগরিকদের নৈতিকতাবোধে উদ্বুদ্ধ করা। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য ইসলাম কেবল শিক্ষাকে সবার জন্য ফরজ ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হয়নি, শিক্ষা যাতে সুশিক্ষা হয় তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। সাধ্যমতো কুরআন, সুন্নাহর জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব। ইসলামের প্রথম যুগে যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছিল তাতে কুরআন ও হাদিস শিক্ষার বিশেষ স্থান ছিল। কেননা কুরআন ও হাদিসের জ্ঞানই মানুষকে নৈতিকতাবোধে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। অবশ্য সব প্রয়োজনীয় জ্ঞানই মুসলমানদের অর্জন করতে হবে।

জননিরাপত্তা রক্ষিত হতে পারে যদি সঠিক বিচার কায়েম থাকে। এজন্য ইসলাম ন্যায়বিচার কায়েম করার চেষ্টা করে। ইসলাম সকল মানুষের মধ্যে ন্যায়ভাবে বিচার করার কথা বলেছে।

> তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচার করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে বিচার করবে। (সূরা নিসা, আয়াত ৫৮)।

ইসলাম সবাইকে যথাযথ সাক্ষ্য দিতে বলেছে এবং সাক্ষ্য গোপন করতে নিষেধ করেছে। (সূরা বাকারা, আয়াত ২৮২-২৮৩)।

প্রাথমিক যুগে ইসলামের বিচারব্যবস্থা অত্যন্ত সহজ ছিল। বিচার পেতে কারো পয়সা খরচ করতে হতো না। বর্তমানেও ইসলামী রাষ্ট্রের লক্ষ্য হতে হবে যেন বিনা খরচে অথবা সামান্য খরচে বিচার পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করা।

ইসলাম নারীর নিরাপত্তাকে পুরুষের চেয়েও অধিক গুরুত্ব দিয়েছে। ইসলাম নারীর প্রতি লালসার নজরে তাকানো নিষিদ্ধ করেছে। রাসূল (সা.) বলেছেন:

> যে ব্যক্তি অন্য নারীর সৌন্দর্যের দিকে লালসার নজরে তাকাবে কিয়ামতের দিনে তার চোখে গলিত লোহা ঢেলে দেওয়া হবে। (তাফসিরে ফাতহুল কাদির)।



www.pathagar.com

ইসলাম প্রমাণ ছাড়া কোনো নারীকে অসতী বলাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ ঘোষণা করেছে।

> যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং সাক্ষী উপস্থিত করে না তাদেরকে আশিটি কষাঘাত করো এবং আর কখনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না, তারা তো ফাসেক। (সূরা নূর, আয়াত ৪)।

এসব কার্যকরী করা আমাদের দায়িত্ব। এসবকে কার্যকরী না করে ইসলামী সমাজের বর্তমান অবস্থার জন্য আমরা ইসলামকে দোষারোপ করতে পারি না।



www.pathagar.com

# বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে নবী জীবনের শিক্ষা

রবিউল আউয়াল মাসে আমরা নবী জীবনের আদর্শ ও শিক্ষার কথা নতুন করে স্মরণ করে থাকি। বাংলাদেশের শতকরা নব্বই জনের অধিক মানুষ মুসলিম হওয়ায় এটি অত্যন্ত স্বাভাবিক। এটি আরো স্বাভাবিক এজন্য যে, ইসলাম ও নবীর শিক্ষা মুসলিম জীবনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। মুসলমানদের ঈমান ও ইবাদতই কেবল নবীর জীবন দ্বারা প্রভাবিত হয়নি, তাদের জীবনবোধ, সংস্কৃতি, সভ্যতা, ইতিহাস, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্য সবদিকই নবীর শিক্ষা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে ইসলাম ও নবী জীবনের শিক্ষার ব্যাপকতার উল্লেখ করতে হয়। বাস্তবিকই ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন ও বিধান। যে কেউ কুরআন ও হাদিস অধ্যয়ন করবে সে ইসলামী শিক্ষার ব্যাপকতা অস্বীকার করতে পারবে না। এ বিধান আমরা পেয়েছি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে। তাই যা কিছু রাসূল (সা.) থেকে আমাদের কাছে প্রমাণিত সূত্রে পৌঁছেছে তা-ই ইসলাম, অন্য কিছু নয়। অবশ্য ইসলামী পণ্ডিতদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণেরও ইসলামে গুরুত্ব রয়েছে।

মানবজাতির ইতিহাসকে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর থেকে বেশি কেউ প্রভাবিত করেনি – এটা মুসলমানদের বক্তব্য নয় বরং পাশ্চাত্যের গবেষকের মন্তব্য। 'দি হান্ড্রেড' বইতে পৃথিবীর ইতিহাসকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে এমন একশ' জনের কথা আলোচনা করা হয়েছে। বইতে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বকে আনা হয়েছে মানব ইতিহাসে তাদের প্রভাবের ক্রমানুসারে। সে বইয়ের খ্রিস্টান লেখক হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে প্রথমে স্থান দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, মানব ইতিহাসকে তিনিই সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছেন। তার মতে, পৃথিবীর অন্যান্য ব্যক্তিত্বরা জীবনের কোনো একটি বা কয়েকটি দিককে প্রভাবিত করেছেন। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সা.) জীবনের সব দিককে প্রভাবিত করেছেন। মানব জাতির ধর্ম, সংস্কৃতি, ইতিহাস, আইন, জ্ঞান-বিজ্ঞান, নৈতিকতা সবকিছুকে তিনি প্রভাবিত করেছেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ব্যাপক ও বিপুল জীবন বা তার শিক্ষা শুধুমাত্র একটি প্রবন্ধে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তাই বাংলাদেশের প্রেক্ষিতকে সামনে রেখে



www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনের কিছু শিক্ষা ও কয়েকটি দিক এ প্রবন্ধে আলোচনা করা হলো।

বাংলাদেশের নারীরা আজ নির্যাতনের শিকার। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শিক্ষাকে অনুসরণ করা হলে বাংলাদেশে কখনো এ পরিস্থিতি হতে পারতো না। নারীকে হীন ও অযোগ্য মনে করা নারী নির্যাতনের অন্যতম কারণ, এতে কোনো সন্দেহ নেই। অথচ আল্লাহপাকের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কুরআনের ঘোষণা হচ্ছে –

> পুরুষ যেমন কাজ করবে তেমন ফল পাবে এবং নারী যেমন কাজ করবে তেমনি ফল পাবে। (সূরা নিসা, আয়াত ৩২)।
>
> তাদের প্রভু তাদের প্রার্থনার প্রত্যুত্তরে বললেন, আমি তোমাদের মধ্যে কোনো আমলকারীর আমল নষ্ট করবো না সে আমলকারী পুরুষ হোক বা নারী। তোমরা একজন অন্যজন হতে হয়েছো। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯৫)।

আল্লাহ আদম সন্তান সবাইকে সম্মানিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে কালামেপাকের ঘোষণা –

> এবং বনি আদমকে আমি সম্মানিত করেছি। (বনী ইসরাইল, আয়াত ৭০)।

এ সম্মানে নারী-পুরুষ সমান অংশীদার। নারী-পুরুষ বা মানুষে মানুষে সম্মানের পার্থক্যের একমাত্র ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহকে মেনে চলা (তাকওয়া)। আল্লাহর ঘোষণা –

> হে মানব জাতি! আমি তোমাদের একজন পুরুষ ও একজন নারী হতে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তোমাদের জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো। বস্তুত তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানী সে-ই, যে সবচেয়ে বেশি মুত্তাকি। (সূরা হুজুরাত, আয়াত ১৩)।

এ আয়াতের মাধ্যমে চিরকালের মতো মানবজাতির মধ্যে আল্লাহর দৃষ্টিতে কে সম্মানিত তার ভিত্তি বলে দেওয়া হয়েছে, আর তা হচ্ছে তাকওয়া বা খোদাভীতি। পুরুষ হলেই নারী থেকে কেউ অধিক সম্মানিত হয় না। আজকের সারা বিশ্বের কোনো পুরুষের সম্মানই হযরত খাদিজা, হযরত আয়েশা ও হযরত ফাতিমা (রা.)-এর সমান হবে না।

নবী করিম (সা.) নারীদের মান-মর্যাদা ও অধিকারের দিকে বিশেষ খেয়াল রাখতেন। তিনি নারীদের সুবিধা-অসুবিধার দিকেও খেয়াল রাখতেন। মদিনার মসজিদে রাসূলের পিছনে জামায়াতে অনেক মহিলা সাহাবি শরিক হতেন। নামাজের সময় যদি রাসূলুল্লাহ কোনো বাচ্চার কান্না শুনতে পেতেন তাহলে তিনি



www.pathagar.com

নামাজ সংক্ষিপ্ত করে দিতেন এবং কারণ স্বরূপ বলতেন যে বাচ্চার কান্না নামাজরতা মায়েদের কষ্টের উদ্রেক করে থাকে। (বুখারি, হাদিস নং ৬৬৫-৬৭)।

একবার রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উট চালক আনজাশা হুদি (আরবি রাখালী গান) গেয়ে গেয়ে জোরে উট চালাচ্ছিলেন। উটের উপর মহিলারাও ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তখন বললেন, হে আনজাশা, আস্তে চালাও, কেননা তোমার পিঠে 'কাঁচ' রয়েছে। (বুখারি, হাদিস নং ৫৭০৯, ৫৭২১)।

রাসূলুল্লাহ (সা.) নারীদের কাঁচের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। এ ছিল রাসূলের নীতি। আজকে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে রাসূলের এসব শিক্ষা আমরা ভুলে গিয়েছি। তাই বাংলাদেশে নারী নির্যাতন এতো বৃদ্ধি পেয়েছে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, ইসলামে নারীর অধিকার পুরুষের মতোই। কুরআন বলছে –

> পুরুষদের উপর নারীর তেমনি অধিকার রয়েছে, যেমন নারীদের উপর পুরুষদের অধিকার রয়েছে। (সূরা বাকারা, আয়াত ২২৮)।

এ কথা সত্য যে, সম্পত্তির অধিকার, পরিবারের কর্তৃত্ব এসব বিষয়ে পুরুষের অধিকার বেশি। কিন্তু মোহরানার অধিকার, ভরণপোষণ পাওয়ার অধিকার, তালাকের ক্ষেত্রে বাচ্চাদের জিম্মা পাওয়ার অধিকার নারীদের বেশি। সবকিছু বিবেচনা করে বলা যায় যে, ইসলামে নারী-পুরুষের অধিকারের পার্থক্য অতি সামান্য।

আজকের বাংলাদেশের আরেকটি দিক হচ্ছে কথা ও কাজের অমিল। এটি সর্বপর্যায়ে বিরাজমান। রাসূল (সা.)-এর জীবনে কথা ও কাজের কোনো অমিল ছিল না। ইসলাম কথা ও কাজের অমিলকে 'মোনাফেকি' বলে থাকে। কুরআন বলছে –

> তোমরা এমন কথা কেন বলো যা তোমরা করো না? (সূরা সাফ, আয়াত ২)।

নবীর জীবন থেকে আমরা এ আদর্শটি গ্রহণ করতে পারি। তিনি ছিলেন আদর্শ নেতা। নৈতিকতার সর্বোচ্চ মানদণ্ড তিনি স্থাপন করে গেছেন।

বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির অন্য একটি দিক হচ্ছে অপরাধ বৃদ্ধি পাওয়া। ইসলাম ও নবীর জীবন এ ব্যাপারে আমাদের পথ দেখায়। ইসলাম সৌন্দর্যের ভক্ত কিন্তু অশ্লীলতাকে নিষিদ্ধ করেছে। কুরআনের ঘোষণা –

> নিষেধ করা হয়েছে, তোমাদের জন্য অশ্লীলতা। (সূরা নহল, আয়াত ৯০)।

অশ্লীল সাহিত্য, ফিল্ম, পত্র-পত্রিকা অপরাধ বৃদ্ধি করতে সাহায্য করছে। তেমনিভাবে মদ ও জুয়াও অপরাধের সহায়ক, যা ইসলাম নিষিদ্ধ করে দিয়েছে।



www.pathagar.com

অপরাধ দমনে নবীর মাধ্যমে পাওয়া ইসলামের শিক্ষা খুবই কাজে লাগতে পারে। ইসলাম হত্যা, ব্যভিচার, ধর্ষণ, ডাকাতি ইত্যাদির জন্য অপরাধীকে অত্যন্ত কঠোরভাবে শাস্তি দেওয়ার পক্ষপাতী। ইসলাম অপরাধের প্রকাশ্য শাস্তি দেওয়ার পক্ষপাতী, যাতে জনগণের মধ্যে অপরাধের পরিণতি সম্পর্কে সঠিক অনুভূতি সৃষ্টি হয়। এসব নীতি আমরা গ্রহণ করে অপরাধ দমনে অগ্রগতি সাধন করতে পারি।

বাংলাদেশের ব্যাপক অর্থনৈতিক সমস্যা দূর করার ক্ষেত্রেও নবীর থেকে পাওয়া শিক্ষাকে আমরা ব্যবহার করতে পারি। ইসলাম দারিদ্র্য দূর করতে চায়। কেননা নবী (সা.) বলেছেন, দারিদ্র্য মানুষকে অবিশ্বাসের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। ইসলাম উৎপাদন বৃদ্ধি করতে চায়, কেননা ইসলাম জমি বা সম্পদকে অব্যবহৃতভাবে ফেলে রাখতে নিষেধ করেছে। ইসলাম কেবল ধনীদের মধ্যে যেন সম্পদ সীমাবদ্ধ না থাকে সে ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছে। ইসলাম মানুষকে আইনের আওতায় কর্ম ও ব্যবসার স্বাধীনতা দিয়েছে। ইসলাম দরিদ্রদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে যাকাতের উল্লেখ করা যায়। ইসলাম সুদকে নিষিদ্ধ করে অর্থনৈতিক শোষণ বন্ধ করতে চেয়েছে। এসব নীতির ভিত্তিতে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে গড়ে তুলে জনগণের অভাব ও দারিদ্র্য দূর করা যায়।

উপরোক্ত আলোচনা হতে স্পষ্ট হয় যে, নবীর জন্মদিবসে তার শিক্ষা স্মরণ করা আমাদের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ। নবীর জীবনী আমাদের জীবনকে আলোকিত করুক এ প্রার্থনা করি।



www.pathagar.com

# হজ, ঈদুল আজহা ও কুরবানি

আরবি ভাষায় 'হজ' শব্দের অর্থ জিয়ারতের সংকল্প করা। যেহেতু মুসলমানরা কাবা শরিফ জিয়ারতের জন্য পৃথিবীর চারদিক থেকে মক্কায় আসেন, এ জন্য ইসলামের এ মৌলিক ইবাদতের নাম রাখা হয়েছে হজ।

হজের প্রচলন হয় চার হাজার বছর পূর্বে হযরত ইবরাহিম (আ.) হতে। তিনি ইরাকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি তার জ্যেষ্ঠ পুত্র হযরত ইসমাইলকে অত্যন্ত অল্প বয়সে তার মা হযরত হাজেরা সহ মক্কায় রেখে যান। আল্লাহপাক মক্কার সে বিরান প্রান্তরে তাদের রক্ষা করেন এবং ক্রমে ক্রমে হযরত হাজেরার অনুমতিক্রমে মক্কায় জনবসতি গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে হযরত ইবরাহিম (আ.) ও হযরত ইসমাইল (আ.) কাবা শরিফ প্রতিষ্ঠা করেন। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনে বর্ণিত হয়েছে –

> এবং স্মরণ কর, ইবরাহিম ও ইসমাইল যখন এ ঘরের ভিত্তি স্থাপনকালে দোয়া করছিল – প্রভু! আমাদের প্রচেষ্টা কবুল করো, তুমি সবকিছু জানো ও শোনো। প্রভু! তুমি আমাদের দু'জনকেই তোমার অনুগত করো এবং আমাদের বংশ থেকে এমন একটি জাতি বানাও যারা একান্তভাবে তোমার অনুগত হবে। আমাদেরকে তোমার ইবাদত করার পন্থা জানিয়ে দাও, আমাদের প্রতি ক্ষমার দৃষ্টি নিক্ষেপ করো, তুমি বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াময়। (সূরা বাকারা, আয়াত ১২৭-২৮)।

> মানুষের জন্য সর্বপ্রথম যে ঘর (ইবাদতের জন্য) নির্দিষ্ট করা হয়েছিল, তা ছিল মক্কার ঘর। এ ঘর অত্যন্ত পবিত্র, বরকতপূর্ণ এবং সারা জাহানের জন্য হেদায়াতের কেন্দ্রস্থল। (সূরা আনকাবুত, আয়াত ৯৬)।

এ ঘরের হজ করার জন্যই আল্লাহর নির্দেশে হযরত ইবরাহিম (আ.) মানব জাতিকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনে বলা হয়েছে –

> এবং স্মরণ করো! যখন ইবরাহিমের জন্য এ ঘরের স্থান ঠিক করেছিলাম এবং এ নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, এখানে কোনো শিরক করবে না এবং আমার এ ঘরকে তওয়াফকারী ও নামাজীদের জন্য পাক-সাফ রাখবে। আর লোকদের হজ করার জন্য প্রকাশ্যভাবে আহ্বান জানাও। (সূরা হজ, আয়াত ২৬)।



www.pathagar.com

আল্লাহর নির্দেশে হযরত ইবরাহিম (আ.)-এর আহ্বানের ভিত্তিতে আজ পর্যন্ত হজ অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। কিন্তু হযরত ইবরাহিম (আ.) ও হযরত ইসমাইল (আ.)-এর ইন্তেকালের অনেক পরে জাহেলিয়াতের যুগে হজ অনুষ্ঠানে নানা কুসংস্কার ও অশ্লীলতা ঢুকে পড়ে। যেমন – কাবা শরিফে মূর্তি রাখা হয়, লোকেরা উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করতে শুরু করে, তাওয়াফের সময় হাততালি, বাঁশি ও শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হতে থাকে। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এসব কুসংস্কার ও অশ্লীলতাকে আবার দূর করে তৌহিদের শিক্ষার ভিত্তিতে হজকে প্রতিষ্ঠিত করেন। আল্লাহপাক প্রত্যেক সমর্থ ব্যক্তির উপর হজ ফরজ ঘোষণা করেছেন।

> মানুষের উপর আল্লাহর এ অধিকার রয়েছে যে, যার এ ঘর পর্যন্ত পৌছার সামর্থ্য আছে, সে যেন হজ সম্পন্ন করে। আর যে এ নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করে, তার জানা উচিত যে, আল্লাহ কারোর মুখাপেক্ষী নন। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৯৭)।

এখানে সামর্থ্য অর্থ শারীরিক ও আর্থিক সামর্থ্য। হযরত মুহাম্মদ (সা.) হজকে ইসলামের পাঁচটি বুনিয়াদের একটি বলে বর্ণনা করেছেন। কেননা হজের অসংখ্য কল্যাণকারী দিক রয়েছে। হজের কল্যাণকারী দিকের মধ্যে প্রথমেই মনে হয় যে, এ অনুষ্ঠান মুসলমানদের জন্য একটি মহাসম্মেলন। দুনিয়ার অন্যান্য সম্মেলন কোনো না কোনো গোষ্ঠী বা শ্রেণির। অন্যান্য সম্মেলন হয় রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধান বা পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন অথবা বৈজ্ঞানিক, লেখক, সাংবাদিক বা অন্য গোষ্ঠীর সম্মেলন। কোনো সম্মেলনই সর্বব্যাপক ও সার্বজনীন নয়। হজ হচ্ছে এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। এ বাৎসরিক সম্মেলনে শরিক হয় সব দেশের, সব স্তরের বিপুল সংখ্যক লোক। এর মাধ্যমে মুসলিম জাতির ব্যাপক যোগাযোগের যে ব্যবস্থা আল্লাহ নিজে করে দিয়েছেন তার কোনো তুলনা হয় না। এর মাধ্যমে সব কল্যাণকর ধারণা বা আইডিয়া মুসলিম বিশ্বে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে। মুসলমানরা পরস্পরের সংহতি সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। এতে পরস্পরের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি দূর হয় এবং মুসলিম সংস্কৃতির মধ্যে শরিকভিত্তিক যুক্তিসঙ্গত ঐক্য সৃষ্টি হতে পারে। হজ মুসলিম পুনর্জাগরণ, জ্ঞান বিস্তার, ব্যবসায়িক যোগাযোগ, রাজনৈতিক সমস্যার মোকাবেলার প্লাটফরম হিসেবে কাজ করতে পারে। আজ হয়তো এসব ক্ষেত্রে হজের পূর্ণ ব্যবহার মুসলিম জাতি করতে পারছে না। কিন্তু এ ধরনের অধিকতর ব্যবহারের সুযোগ ক্রমেই সৃষ্টি হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে হজ আমাদের কল্যাণের বড় ভিত্তি হতে পারবে। অবশ্য হজকে কোনো দেশ ও দলের বিশেষ রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা সঠিক হবে না। হজে মত প্রকাশের স্বাধীনতা অব্যাহত রেখেও আমরা সাময়িক গোষ্ঠীগত ও রাজনৈতিক স্বার্থ অর্জনের চেষ্টা পরিহার করতে পারি। হজের শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট কারো কল্যাণ করবে না। এরকম করাকে কেউ সমর্থনও করতে পারবে না।



www.pathagar.com

হজের অন্য বিরাট কল্যাণের দিক হচ্ছে মুসলিম জনতার ট্রেনিং। আজকাল সৌদি আরবের বাইরে থেকে প্রায় ১৮ লাখ লোক প্রতি বছর হজ করে থাকেন। যারা মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন তারা কোনো আর্থিক স্বার্থের জন্য তা করেন না। কিছু লোক ব্যতিক্রম হয়ে থাকলেও তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। অন্তত এক-দু'মাসের জন্য এসব হজযাত্রীকে বাড়ি থেকে দূরে থাকতে হয়। এসময় তারা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ইবাদত বন্দেগিতে লিপ্ত থাকেন। এর ফলে তাদের মন-মানসিকতায় স্বাভাবিকভাবে অনেক পরিবর্তন আসে। ইহরাম বাঁধা অবস্থায় তাদের দীনহীনতার কথাই তাদের মনে হয়। মিনাতে পাথর মারার সময় তারা প্রকৃতপক্ষে নিজের মনের শয়তানকেই পাথর মারে। আরাফাত, মুজদালিফা ও মিনাতে লাখ লাখ হাজি একত্রে অবস্থান করেন। এর মাধ্যমে তারা ধৈর্য, সহনশীলতা ও মিলেমিশে থাকার শিক্ষা গ্রহণ করেন। সবকিছু মিলে হজকে পবিত্রতা অর্জনের এক বিরাট ট্রেনিং বলা যায়। প্রতি বছর মুসলিম সমাজ এভাবে একদল নতুন লোক পায়, যাদের ভালো থাকার অধিক সম্ভাবনা রয়েছে। এভাবে অবশ্যই অনেকের জীবন পরিবর্তিত হয়ে যায়, যা নিঃসন্দেহে সমাজের জন্য কল্যাণকর।

## ঈদুল আজহা

হজের সাথে ঈদুল আজহার নিকট সম্পর্ক। মক্কায় যখন হজ অনুষ্ঠিত হচ্ছে সে সময় সারা মুসলিম বিশ্বে ১০ জিলহজ ঈদুল আজহা পালন করা হয়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে হজের আনন্দে ও ইবাদতে সারা বিশ্বের মুসলিমকে একাত্ম করা। ঈদুল আজহায় একত্রে জামায়াতে দু'রাকায়াত নামাজ আদায় করতে হয়। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা সম্বন্ধে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী (সা.) যখন মক্কা থেকে মদিনা এলেন, তখন তিনি দেখলেন যে, লোকেরা বছরে দু'টি নির্দিষ্ট দিনে খেলাধুলা ও আনন্দ উপভোগ করে। নবী (সা.) বলেন যে, আল্লাহ এ দু'টি দিনের পরিবর্তে দু'টি উৎকৃষ্টতর দিন নির্ধারিত করে দিয়েছেন। একটি ঈদুল ফিতরের দিন এবং অন্যটি ঈদুল আজহার দিন। (দ্রষ্টব্য: আসান ফিকাহ, ১ম খণ্ড, মাওলানা ইউসুফ ইসলাহী, প্রকাশক - আধুনিক প্রকাশনী)।

## কুরবানি

ঈদুল আজহার দিন মুসলিম জাতি কুরবানি করে থাকে। ঈদ অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে নবী (সা.) এ কুরবানির বিধান দেন। এ সম্পর্কে অনেক হাদিস রয়েছে। বিখ্যাত হাদিসগ্রন্থ তিরমিযী-তে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর হতে বর্ণিত হয়েছে – নবী করিম (সা.) মদিনায় দশ বছর অবস্থান করেন। এ সময় তিনি প্রতি বছরই কুরবানি করতেন।

ফিকাহর গ্রন্থে কুরবানি ওয়াজিব অথবা সুন্নাত হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম নববী তার মুসলিম শরিফের ভাষ্যে লিখেছেন, সামর্থ্যবান ব্যক্তির (অর্থাৎ



www.pathagar.com

যাকে যাকাত দিতে হয়) জন্য কুরবানি ওয়াজিব না সুন্নাত এ সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে। অধিকাংশের মতে কুরবানি সুন্নাত। এদের মধ্যে রয়েছেন হযরত আবু বকর সিদ্দিক, ওমর ফারুক, বেলাল, সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব, আলকামা, আসওয়াদ, আতা, মালিক, আহমদ, আবু ইউসুফ, ইসহাক প্রমুখ। ইমাম আবু হানিফা, আওজায়ী, লাইস ও রাবিয়া প্রমুখ একে ওয়াজিব মনে করেন। (সহিহ মুসলিম, উর্দু অনুবাদ, ইমাম নববীর টীকাসহ, মালিক গোলাম আলী এন্ড সন্স, করাচি কর্তৃক প্রকাশিত, কুরবানি অধ্যায়)।

ঈদ অর্থ আনন্দ-উৎসব। এ আনন্দ উৎসবের প্রয়োজনেই কুরবানির মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জাতীয় আনন্দ অনুষ্ঠানে ভোজের প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য রাসূলুল্লাহ (সা.) কুরবানির ঘটনাকে হযরত ইবরাহিম (আ.) কর্তৃক হযরত ইসমাইলকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কুরবানি করতে উদ্যত হওয়ার ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত করে দিয়েছেন। এর ফলে আমরা কুরবানিকে যেমন আল্লাহর জন্য মহাত্যাগের প্রস্তুতি বলে গণ্য করতে পারি, তেমনিভাবে আনন্দ উৎসবের অংশ বলেও গণ্য করতে পারি।

কুরবানির জন্য বিশ্বে এখন পর্যন্ত কোনো পশু সংকট দেখা দেয়নি। কুরবানির কারণে বরং পশুপালন বৃদ্ধি পায় এবং যারা ব্যবসা করেন তারা উপকৃত হন। তবে যদি সত্যিই কোনো সময় কোনো দেশে পশু সংকট দেখা দেয়, তাহলে সে দেশের শ্রেষ্ঠ আলেমগণ অথবা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আলেমগণ সংশ্লিষ্ট রয়েছেন ওআইসির যে ফিকাহ একাডেমিতে তাদের পরামর্শ নিয়ে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

## ঈদের কিছু বৈশিষ্ট্য

ইসলামে ঈদ নানাদিক দিয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ঈদ প্রত্যেক মুসলিমের ধর্মীয় দায়িত্ব পালনে সাফল্যের জন্য উৎসব। প্রথম ঈদ হচ্ছে রমজানের রোজা রাখার দায়িত্ব পালনে সাফল্যের জন্য। দ্বিতীয় ঈদ হচ্ছে মক্কায় হজ পালন সম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে একাত্ম হওয়ার, যে হজ দুনিয়ার দৈনন্দিন বিষয়সমূহ প্রয়োজনে পরিত্যাগ করে আল্লাহর আহ্বানের দিকে সাড়া দেওয়ার শিক্ষা দেয়।

প্রত্যেক ঈদ হচ্ছে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা। এ শুকরিয়া হচ্ছে আধ্যাত্মিক দায়িত্ব পালনের। তবে এ শুকরিয়া শুধুমাত্র আধ্যাত্মিকতা প্রকাশের মাধ্যমেই হয় না। এর অনেক মানবিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালনের দিকও আছে। সাধারণত ঈদুল ফিতরে দরিদ্র জনগণকে সাদকা দিয়ে তাদের দুঃখ দূর করার চেষ্টা করা হয়। ঈদুল আজহায় মুসলিমগণ কুরবানি দিয়ে থাকে যার গোশত সাধারণত গরীব জনগণ এবং আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বণ্টন করা হয়। ঈদের বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে এভাবে জনগণের সাথে শরিক হওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।



www.pathagar.com

প্রত্যেক ঈদ হচ্ছে আল্লাহকে স্মরণ করার দিন। মুসলিম জনগণ সব সময় সকল আনন্দ আল্লাহকে স্মরণ করার মাধ্যমে শুরু করে থাকে অর্থাৎ ঈদের ক্ষেত্রে সালাত বা নামাজ আদায় করে। তারা নামাজ আদায় করে এবং আল্লাহর তাকবির বা শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে। এর সাথে সাথে তারা তাদের দোয়ায় মৃতদের স্মরণ করে। তারা রোগী ও দুঃস্থদের কথাও স্মরণ করে এবং তাদের দেখতে যায়। এ সবই ইসলামের মূল শিক্ষার অংশ।

ঈদ একটি বিজয়ের দিন। যিনি সঠিকভাবে তার আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করতে পারেন, ঈদে তিনি নিজেকে বিজয়ী হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন। এ বিজয় হচ্ছে নিজের কামনা-বাসনা, প্রবৃত্তির দুর্বলতাকে বিজয় এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ অর্জনের বিজয়।

প্রত্যেক ঈদ হচ্ছে এক অর্থে ফসল কাটার দিন। কেউ এ দিনে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মানসিক শান্তি অর্জন করবে, আবার কেউ ন্যায়ভাবে আর্থিক সাহায্য লাভ করবে। এ অর্থে এদিন হচ্ছে কোনো না কোনোভাবে সাফল্য অর্জনের দিন।

ঈদ হচ্ছে ক্ষমার দিন। ঈদের জামায়াতে যারা শরিক হয় তাদের মধ্যে একে অপরের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ ঘটে। এ সুযোগে পুরানো শত্রুতার অবসান ঘটে এবং হৃদ্যতা বৃদ্ধি পায়, যদি কেউ ঈদের বাণীকে সঠিকভাবে গ্রহণ করে।

প্রত্যেক ঈদ হচ্ছে শান্তির দিন। ব্যক্তি মাত্রই তার দায়িত্ব পালন করার মাধ্যমে স্রষ্টার সাথে একাত্মতায় বিলীন হতে পারে। কেউ যদি নিজে শান্তি পায় তাহলে সে দুনিয়াকেও অনেক কিছু দিতে পারে।

এসব হচ্ছে ঈদের প্রকৃত অর্থ। এটি হচ্ছে ইসলামের দিন, যা আল্লাহর মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বোঝার দিন।



www.pathagar.com

# জুমার খুতবার মান উন্নয়ন

দীর্ঘদিন যাবত জুমার খুতবা শুনে আমার ধারণা জন্মেছে যে, অধিকাংশ মসজিদে ব্যবহৃত খুতবার পুস্তকসমূহের মান উচ্চ পর্যায়ের নয় এবং আমাদের যুগের জন্য পুরোপুরি উপযোগী নয়। মুসলিম জাতির নৈতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক মান উন্নয়নে জুমার খুতবা ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে পারে। এ প্রেক্ষিতে বিভিন্ন ইসলামী প্রতিষ্ঠানের উচিত স্থানীয় ও আঞ্চলিক রাজনীতির প্রভাবমুক্ত থেকে উন্নত মানের খুতবার পুস্তক তৈরি করা। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে প্রচলিত খুতবার পুস্তকসমূহ পূর্বের যুগের আলেমদের তৈরি করা বলে সেগুলোর পরিবর্তে আরো উন্নত পুস্তক তৈরি এবং ব্যবহার বৈধ ও যুক্তিসংগত।

আমি আনন্দিত হয়েছি যে, ইতোমধ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমি-এর অধীনে একটি খুতবার পুস্তক প্রকাশ করেছে, যাতে ১৮টি খুতবা রয়েছে। আরও পূর্ণাঙ্গ পুস্তক রচনা না হওয়া পর্যন্ত আমাদের সম্মানিত ইমাম সাহেবগণকে ঈদে ও জুমাতে নির্বাচিত খুতবা নামে এ পুস্তকটি ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ করছি। উল্লেখ্য বাংলাদেশের একদল প্রখ্যাত আলেম এ বইটি রচনা করেন।

খুতবার বিষয়সমূহের মধ্যে বিশ্বের এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমস্যার উপর কয়েকটি খুতবা থাকা উচিত। এসবের সমাধান কি, ইসলামের আলোকে তার আলোচনা করা দরকার। এ ধরনের খুতবা প্রতি দু'মাসে একটি থাকা প্রয়োজন। তেমনিভাবে বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যার উপর প্রতি দু'মাসে একটি খুতবা থাকা দরকার। সামাজিক সমস্যাসমূহের মধ্যে রয়েছে নারী নির্যাতন, যৌতুকের অত্যাচার, পথশিশু, ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি ইত্যাদি। নারী নির্যাতন অত্যন্ত ব্যাপক। নারী অধিকার নিয়ে বছরে আট-দশটি খুতবা হওয়া উচিত। পরিবার ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী করা এবং পিতা-মাতা ও পরিবারের বয়োবৃদ্ধদের অধিকারের উপর কয়েকটি খুতবা থাকা উচিত। এছাড়াও প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক, তাদের হক এবং তাদের প্রতি দায়িত্বের বিষয়ে বছরে দু'-তিনটি খুতবা থাকা প্রয়োজন।

প্রচলিত খুতবায় এসব নেই। এগুলো খতিবদের নিজস্ব পড়াশোনা এবং উচ্চমানের লেখকদের বই থেকে তথ্য নিয়ে তৈরি করতে হবে।



www.pathagar.com

# আমাদের রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষার পাঠক্রমে সংশোধন দরকার

আমাদের রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়ার পাঠক্রম বা কোর্সে কিছু অসঙ্গতি রয়েছে। এটি তুলে ধরা এবং এর সংশোধনের জন্য প্রস্তাব করাই এ প্রবন্ধ লেখার উদ্দেশ্য।

'রাজনৈতিক ইতিহাস' জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। কলেজ স্তরে সামান্যকিছু আলোচনা হলেও একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্তরেই রাজনৈতিক ইতিহাস পূর্ণাঙ্গভাবে পড়ানো হয়। কিন্তু আমাদের দেশে এ ইতিহাসের নামে যা পড়ানো হয় তাতে রয়েছে মৌলিক গলদ। কেননা, রাজনৈতিক ইতিহাসের ধারা সব সময়েই বিশ্বের বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতিনিধিত্বমূলক হওয়া উচিত। কেবলমাত্র কোনো একটি বা দু'টি দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচনার মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশে এ ইতিহাসের নামে শুধু পশ্চিমের চিন্তাধারাই শিক্ষা দেওয়া হয়। পাশ্চাত্য দেশ ছাড়া অন্য কোনো জাতির ও অন্য কোনো দেশের রাজনীতি প্রবাহের উপর বিন্দুমাত্র গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। মনে হয় যেন রাজনৈতিক চিন্তা ও তার অনুশীলনে একমাত্র পশ্চিমের লোকদেরই অবদান রয়েছে। প্রাচ্যের কোনো দার্শনিকই বুঝি এ সম্পর্কে চিন্তা করেননি কোনোদিন। এই একদেশ-দর্শীতার হয়তো বা কিছু কিছু কারণও দর্শানো যেতে পারে, কিন্তু কোনো যুক্তিতেই শুধুমাত্র পাশ্চাত্য চিন্তাধারার পটভূমিকায় লেখা রাজনৈতিক ইতিহাস পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না।

এক্ষেত্রে উল্লেখিত সীমিত চিন্তাধারার আলোচনার ফলে রাজনৈতিক ইতিহাসে এক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের প্রথম পড়ানো হয় গ্রিক রাজনীতির কথা। বিশেষ করে সক্রেটিস, এরিস্টটল ও প্লেটোর চিন্তাধারা। তাদের পূর্বাপর অনেক দর্শন এবং গ্রীক সমাজের সাধারণ অবস্থাও তার সাথে গুরুত্বসহকারে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয়। এ যুগের পরে আসে রোমান রাজনৈতিক ইতিহাস, বিশেষ করে সিসেরুর রাজনৈতিক মতবাদ। প্রসঙ্গত রোমান আইনের উপরও আলোকপাত করা হয়। অতঃপর খ্রিস্টীয় যুগের আরম্ভ। এ পর্যায়ে এসে প্রধানত অগস্টাইন, এমবোর্জ, গ্রেগরি প্রমূখ খ্রিস্টান যাজকদের সঙ্গে, এদের দর্শনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। এ যুগের শেষ সীমা খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতক অবধি। পঞ্চম শতক থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত ইউরোপীয় চিন্তাজগতে কোনো প্রতিভাবান রাজনৈতিক চিন্তাবিদের আবির্ভাব লক্ষ্য করা



www.pathagar.com

যায় না, নতুন কোনো রাজনৈতিক তত্ত্বেরও সন্ধান মেলে না। সর্বশেষে দ্বাদশ শতাব্দীর সাধু টমাস একুনাহ ও পদুয়ার মার্সিলিও থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত পশ্চিমের রাজনৈতিক চিন্তাধারা পড়ানো হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। এ যুগের রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে সমন্বয়বাদ আন্দোলন বা কনসিলিয়ার মুভমেন্ট বিশেষ প্রসিদ্ধ। ষোড়শ শতাব্দী থেকে শুরু হয়েছে গতিশীল রাজনৈতিক চিন্তাধারা এবং আমরা দেখতে পাই একের পর এক মেকিয়াভেলি, মন্টেস্কু, হবস, লক, রুশো প্রমুখ আরো অনেক রাজনীতিবিদকে।

উপরের আলোচনায় দেখা যায়, দ্বাদশ শতাব্দীর কিয়দংশ ছাড়া পঞ্চম শতাব্দীর শেষ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর আরম্ভ পর্যন্ত এক বিরাট রাজনৈতিক শূন্যতা। এ সুদীর্ঘ সময়ে সাধারণভাবে রাজনৈতিক চিন্তা সামান্যই ছিল; যা ছিল তা-ও অত্যন্ত দুর্বল স্তরের। এ কারণেই দেখতে পাওয়া যায় দ্বাদশ শতাব্দীর সাধু একুনাহ, পদুয়ার মার্সিলিও-এর দর্শন এবং সমন্বয়বাদী আন্দোলন – সবই গির্জা ও রাষ্ট্রের সম্পর্কের মতো সাধারণ প্রশ্নকে কেন্দ্র করে প্রবলভাবে আলোচিত হয়েছে। যদিও এ সমস্যা রাজনীতির মূল অধ্যায়ে পড়ে না, তথাপি ইউরোপীয় চিন্তাবিদগণ এই সামান্য ব্যাপারকেই খুব ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে লিখেছেন। এসব কারণে মধ্যযুগকে, বিশেষ করে আদি মধ্যযুগকে ইউরোপীয় রাজনীতি-বিশারদরাই অরাজনৈতিক যুগ বা আন-পলিটিক্যাল এজ বলে আখ্যা দিয়েছেন।

আসলে তাদের এ মন্তব্য সত্য কিনা তার যৌক্তিকতা বিচার করা দরকার। এ বিচার গোটা দুনিয়াকে সামনে রেখেই করা উচিত। আমাদের মতে উপরের মন্তব্য শুধু ইউরোপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে, সারা বিশ্বের জন্য সত্য নয়।

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে ঊষর আরব মরুর বুকে এক বিপ্লব এসেছিল, যা অনেক দিক থেকে ছিল অনন্য, অভূতপূর্ব। এ বিপ্লবের পুরোধা আল্লাহর রাসূল হজরত মুহাম্মদ (সা.)। এ বিপ্লব অন্য যে কোনো বিপ্লবের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। চিন্তা ও মতবাদের ক্ষেত্রে ইসলাম বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনলো, বিশেষ করে রাজনৈতিক দর্শন ও চিন্তাধারায়। পুরাতন রাজনীতির ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণভাবে ভেঙে দেওয়া হলো, উঠে দাঁড়ালো এক নব রাজনৈতিক আলোড়ন। নতুন নতুন পলিটিক্যাল ইনস্টিটিউশন সৃষ্টি হলো এ যুগে। এ বিপ্লবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল থিওরি ও প্র্যাকটিস বা আদর্শ ও বাস্তবায়নের সমান্তরাল অগ্রগতি। থিওরির সাথে সাথে গড়ে উঠেছে নতুন নতুন কায়দা-কানুন, শাসন-সংবিধান এবং বাস্তবে হয়েছে তার রূপায়ণ। কুরআনে যে রাজনৈতিক মতবাদ ঘোষিত হলো, পরবর্তীকালে তারই বিভিন্নমুখী বিকাশ ও সমৃদ্ধি ঘটে বিভিন্ন দার্শনিকের হাতে। আল মাওয়ার্দী, ইমাম গাযালী, ইবনে তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়েম, ইবনে রুশদ, ইবনে খালদুন ও আল ফারাবির ভূমিকা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এদের বিস্তৃত চিন্তাধারা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে পর্যালোচনা সম্ভব নয়। তবে পাশ্চাত্য



www.pathagar.com

রাজনৈতিক চিন্তাধারার সাথে সামঞ্জস্যশীল কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। দশম শতাব্দীর বিখ্যাত আইনবিদ আল মাওয়ার্দী অনেক বই লিখেছেন রাজনীতির উপর। তর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হচ্ছে আল আহকামুস সুলতানিয়া অর্থাৎ রাষ্ট্র চালনা বিধি। এ গ্রন্থে তিনি খেলাফত ও ওজারত সম্পর্কে যে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন তা যে কোনো আধুনিক চিন্তাবিদকে চমৎকৃত করবে। তিনি রাষ্ট্রপ্রধান ও মন্ত্রীসভার দু'ধরনের সম্পর্ক নির্ণয় করেছেন। এ দু'টি ব্যবস্থা বর্তমান যুগের প্রেসিডেন্সিয়াল সিস্টেম ও কেবিনেট সিস্টেমের অনুরূপ। সুতরাং এ দু'রকম শাসন ব্যবস্থার আদি গুরু হিসেবে আল মাওয়ার্দীকে গ্রহণ করতে পারি।

একাদশ শতাব্দীর ইমাম গাযালীর রাজনীতিক পুস্তকাবলীর মধ্যে কিতাব আল ইকতিসাদ ফিল ইতিকাদ, কিতাব আল মুসতাজহাবী ও তিবরুল মাসবুক সুপ্রসিদ্ধ। তিনি গ্রিক চিন্তাধারার উপর অনেক পুস্তক প্রণয়ন করেছেন। গভীরভাবে অনুধাবন করলে দেখা যাবে, পাশ্চাত্য দার্শনিক টমাস একুনাহ গাযালীর মতধারারই প্রতিধ্বনি করেছেন মাত্র। গ্রিক চিন্তাধারা নিয়ে আরো যারা বিশেষভাবে গবেষণা করেছেন তাদের মধ্যে আল ফারাবি ও ইবনে রুশদের নাম উল্লেখযোগ্য। ফারাবি গ্রিক চিন্তাধারার যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন অনেকদিন পর্যন্ত তা ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে টেক্সট বুক হিসেবে পাঠ্য ছিল। ইবনে রুশদ এরিস্টটলের সবচেয়ে বড় ব্যাখ্যাতা বলে পরিচিত হয়েছিলেন এবং তার দর্শন ইউরোপে এভাররোস্ট এরিস্টটলিয়ানিজম নামে পরিচিত ছিল। পদুয়ার মার্সিলিওর প্রায় সবগুলো যুক্তিই ইবনে রুশদের কাছ থেকে ধার করে নেওয়া। অথচ দুঃখের বিষয়, মার্সিলিওর চিন্তাধারাকে বর্তমানে আমাদের দেশেও অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে পড়ানো হয়, কিন্তু সেখানে ইবনে রুশদের নামমাত্র উল্লেখ নেই।

ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক বা গির্জা ও শাসনক্ষমতার সম্পর্ক চিরদিন ইউরোপের চিন্তাবিদদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে রেখেছে। তার ফলে শত শত বছর যুক্তির ও অস্ত্রের যুদ্ধ চলেছে। খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত রাজনৈতিক চিন্তাধারার এছাড়া অন্য কোনো বৈশিষ্ট্য ইউরোপে ছিল না। মুসলিম চিন্তাবিদগণ এ সম্পর্কে সুস্থ মত ব্যক্ত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে মুসলিম চিন্তাবিদগণ গির্জা ও রাষ্ট্র তথা ধর্ম ও রাজনীতি কখনো আলাদা করে দেখেননি। ইসলামের দৃষ্টিতে একটির উপর অন্যটির প্রভাব বিস্তারের প্রশ্নই ওঠে না, দু'টো মিলেই এক। ইবনে খালদুন তার কিতাব আল ইবার বা বিশ্ব-ইতিহাস নামক গ্রন্থের ভূমিকায় ধর্ম ও রাজনীতিকে এক বলে উল্লেখ করেছেন। এ চিন্তাধারা আজ পর্যন্ত মুসলিমদের মধ্যে অক্ষুণ্নভাবে বিদ্যমান। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের বিরুদ্ধে আল্লামা ইকবালের তীব্র প্রতিবাদও এক্ষেত্রে অবশ্যই স্মরণীয়। তিনি বলেছেন, 'একনায়কত্বের বিক্রমই হোক কিংবা গণতন্ত্রের তামাসাই হোক, রাষ্ট্র



www.pathagar.com

ও ধর্ম আলাদা হলে থাকে শুধু বর্বর শক্তি।' মুসলিম চিন্তাবিদদের এই সুস্থ চিন্তাও আমাদের দেশের পাঠ্য রাজনৈতিক ইতিহাসের তালিকায় স্থান পায়নি। পক্ষান্তরে স্থান পেয়েছে সাধু অগস্টাইন, এমবোর্জ ও গ্রেগরি প্রমুখ পাশ্চাত্য রাজনীতিবিজ্ঞানীদের কথা।

অন্যদিকে আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের সত্যিকার প্রথম বিকাশ ঘটে মুসলিম চিন্তাবিদদের হাতে। আইন শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখায় মুসলমানদের অবদান অতুলনীয়। অধুনা যে জুরিসপ্রুডেন্স অব ল' পড়ানো হয় তার প্রথম নিয়মমাফিক বিকাশ লক্ষ্য করা যায় মুসলিম মনীষিদের হাতে। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেয়ীর নাম এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, মধ্যযুগের জার্মানদের আইন পড়ানো হয় অথচ মুসলিম আইনবিদদের চিন্তা-জগতের সঙ্গে পরিচয়ের কোনো ব্যবস্থাই নেই আমাদের পাঠ্যপুস্তকে।

উপরের আলোচনা থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, মধ্যযুগ আন-পলিটিক্যাল ছিল না। ইউরোপের জন্য তা অরাজনৈতিক যুগ হলেও আরব ও মুসলিম বিশ্বে তখন পূর্ণ রাজনৈতিক যুগ। আমাদের উচিত রাজনৈতিক চিন্তাধারার এ শূন্যতাকে দূর করে বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসকে নতুন করে লেখা। রাজনৈতিক চিন্তাধারার ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে মুসলিম চিন্তানায়কদেরকে তাদের যথাযোগ্য স্থান দিলে এ শূন্যতা দূর হবে – রাজনীতির ইতিহাস পাবে পূর্ণাঙ্গতা, সংশোধিত হবে একটি ঐতিহাসিক ভুল।

ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও মুসলিম মনীষিদের চিন্তাধারাকে প্রচলিত এবং আমাদের পাঠ্য রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাসের অংশ করে নিলে একদিকে যেমন বর্তমান ইতিহাসের ইউরোপীয় একঘেয়েমী দূর হবে, অন্যদিকে পৃথিবীর মুসলিম রাষ্ট্রগুলো শাসন-সংবিধানে পাশ্চাত্য মতামত গ্রহণ-বর্জনের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট পথ খুঁজে পাবে। বস্তুত যে কোনো ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষে উল্লিখিত মুসলিম রাজনীতিবিজ্ঞানীদের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-গবেষণার সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হবার গুরুত্ব আদর্শের সংঘাতময় বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে একান্তভাবেই প্রয়োজনীয়।

(১৯৬০-৬১ সালের ফজলুল হক হল বার্ষিকীতে প্রকাশিত)



www.pathagar.com

# সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শালীনতার সমস্যা

বাংলাদেশে সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠান নতুন কিছু নয়। ইংরেজ আমলে যখন থেকে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখন থেকে বাংলাদেশে সহশিক্ষা রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় থেকে এখানে সহশিক্ষা রয়েছে। অন্য সকল সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়েও একই অবস্থা।

কলেজ ও স্কুল পর্যায়ে অবস্থা কিছুটা ভিন্ন। অধিকাংশ স্কুল ও কলেজে সহশিক্ষা নেই। অধিকাংশ স্থানে ছাত্রীদের জন্য আলাদা স্কুল ও কলেজ রয়েছে। তবে যেখানে মেয়েদের পর্যাপ্ত স্কুল ও কলেজ নেই সেখানে স্কুল ও কলেজগুলোতে সহশিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

মাদরাসাগুলোতে সহশিক্ষা নেই বললেই চলে। পূর্বে মেয়েদের জন্য মাদরাসা ছিল না। এটি একটি সামাজিক ব্যর্থতার দিক। এখন মেয়েদের মাদরাসা হচ্ছে। যেখানে মেয়েদের মাদরাসা নেই সেখানে কিছু কিছু মাদরাসায় বিশেষ ব্যবস্থায় মেয়েদের পড়ার সুযোগ আছে।

বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে যেখানে পূর্বে ছাত্রীরা কম ছিল, সে সময় ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে গভীর মেলামেশা (free mixing) ছিল না বা খুব কম ছিল। এর ফলে তেমন কোনো সমস্যাও পূর্বে দেখা দেয়নি। এখন অবশ্য সঙ্গত কারণেই ছাত্রীসংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর প্রভাবও পরিবেশের উপর পড়তে শুরু করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও সহশিক্ষার কারণে মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের মেলামেশা বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন ছাত্র-ছাত্রীদের অনেককেই একত্রে বসে গল্প করতে দেখা যায়, যেখানে সব ধরনের হাসি-ঠাট্টা চলে। কিছু ছাত্র-ছাত্রী আরো এগিয়ে যায়। হাত ধরাধরি করে চলে, একত্রে রিকশায় চলে। এর কোনোটিই ইসলাম অনুমোদিত নয়।

এর ফলাফলও অনেক ক্ষেত্রে খারাপ হচ্ছে, নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবৈধ সম্পর্কের দিকে যাচ্ছে। এ সম্পর্কে ১৯৯৮ সালের ১৪ মে সংখ্যা বাংলাদেশ অবজার্ভার পত্রিকায় ডা. সাবরিনা কিউ রশীদ লেখেন, 'পূর্বে কখনো আমরা ডাক্তাররা এতো অধিক সংখ্যক অবিবাহিত



www.pathagar.com

অল্প বয়স্ক (in teens) মেয়েকে গর্ভবতী হতে দেখিনি।' তিনি এ মন্তব্য সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেয়েদের সম্পর্কে করতে গিয়ে লেখেন।

ডা. সাবরিনা রশীদ তার প্রবন্ধে বলেন যে, ছাত্র-ছাত্রীদের পারস্পরিক কথাবার্তা শেষ পর্যন্ত সৎ (innocent) থাকে না। এগুলো পরবর্তীতে স্পর্শ পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এ বয়সের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যৌন হরমোনের নিঃসরণ হওয়ায় যে কোনো স্পর্শ শরীর ও মনে আগুন ধরিয়ে দেয়। এটি ছেলেদের ক্ষেত্রে বেশি ঘটে। কেননা মেয়েরা একটু ঠাণ্ডা (cold) হলেও ছেলেরা অনেক বেশি আবেগপ্রবণ। সুতরাং মেয়েরা ছেলেদের বন্ধু হিসেবে নিতে চাইলেও ছেলেরা তার চেয়ে অনেক বেশি ভাবে।

সেজন্য ডা. রশীদ সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেয়েদের ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা না করতে এবং নিরাপদ দূরত্ব (safe distance) রক্ষা করে চলতে বলেছেন। ডা. সাবরিনা রশীদের পরামর্শ যুক্তিযুক্ত। সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছেলে-মেয়েদের সম্পর্ক হাসি-ঠাট্টা (informal) পর্যায়ের হওয়া উচিত নয়। তাদের সম্পর্ক অত্যন্ত সতর্ক এবং ফরমাল (formal) ধরনের হওয়া উচিত। আমরা একটি অফিসে গেলে যেভাবে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে কথা বলি, ব্যবহার করি, এটিই হচ্ছে ফরমাল ধরনের ব্যবহার।

প্রাইভেট টিউশনির ক্ষেত্রেও একই সতর্কতা প্রয়োজন। ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়ার প্রয়োজনে শিক্ষকদের সঙ্গে বা ছাত্রীরা ছাত্রীদের সঙ্গে এবং ছাত্ররা ছাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ করাই সঙ্গত। অন্যরকম হলেও শেষ পর্যন্ত (কিছু ব্যতিক্রম বাদে) পরিস্থিতি ঐ দিকে চলে যেতে পারে যা ইসলাম অনুমোদন করে না। কিশোরী মেয়েদের যুবকদের কাছে একা নিভৃতে পড়া উচিত নয়। কিশোরী মেয়েদের ছাত্রীদের বা মহিলাদের কাছেই পড়া উচিত। এজন্য উচ্চ শিক্ষিত ছাত্রীদের প্রাইভেট টিউশনি করার জন্য তৈরি থাকতে হবে। তাহলেই এ সমস্যার সমাধানে সাহায্য হবে। আমাদের সবারই জানা যে প্রাইভেট টিউশনির কারণে ছেলে-মেয়েরা বাল্যবয়সে প্রেমে জড়িয়ে পড়ে, যা তাদের এবং পরিবারসমূহের জন্য ক্ষতির কারণ হয়।

এ বিষয়ে অবশ্য অনেক চিন্তাশীল লোক অন্যরকম সমাধানের কথা ভাবেন। তারা মনে করেন যে, উচ্চ পর্যায়ে সহশিক্ষা তুলে দিয়ে মেয়েদের জন্য আলাদা বিশ্ববিদ্যালয় বা আলাদা ক্যাম্পাস করাই ভালো। অবশ্য এ ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া সময়ের ব্যাপার। তবে কয়েকটি মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় বা মেডিকেল কলেজ তো অবশ্যই করা সম্ভব।

একই সঙ্গে স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে সহশিক্ষা পুরোপুরি তুলে দেওয়া যেতে পারে, কেননা এ পর্যায়ে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা ব্যাপকভাবে সৃষ্টি হয়। এজন্য আরো অধিকসংখ্যক গার্লস স্কুল ও কলেজ স্থাপনের উদ্যোগও নিতে হবে। যেসকল



www.pathagar.com

স্কুল ও কলেজে এখন সহশিক্ষা আছে সেগুলোকেও ছেলে ও মেয়েদের দু'টি আলাদা সেকশনে ভাগ করার উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।

পাকিস্তানের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আলাদা ক্যাম্পাস রয়েছে। মালয়েশিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় অবশ্য সহশিক্ষাই বহাল রেখেছে। কিন্তু তারা সুন্দর পোষাক বিধি (Dress Code) এবং অন্যান্য নির্দেশাবলী চালু করেছে যা পরিস্থিতিকে শালীন রাখে। বাংলাদেশেও এ ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু তা না হওয়া পর্যন্ত সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছেলে-মেয়েদের সে পথই অবলম্বন করা উচিত যা ডা. সাবরিনা রশীদ বলেছেন এবং এ প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

দেশের সরকার, সকল শিক্ষাবিদ, সমাজতত্ত্ববিদ, ইসলামী চিন্তাবিদ সহ অন্যান্য ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এবং নৈতিকতায় বিশ্বাসী ছাত্র-ছাত্রীদের এ প্রস্তাবসমূহের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সকলকে এসব ব্যাপারে জনমত সৃষ্টি করার অনুরোধ করছি।



www.pathagar.com

# কওমি মাদরাসা শিক্ষার অগ্রগতির জন্য কিছু প্রস্তাব

এ প্রবন্ধে আমি যেসব মাদরাসা কওমি মাদরাসা বলে পরিচিত তাদের মান উন্নয়নের জন্য কিছু প্রস্তাব রাখার চেষ্টা করবো। ঊনবিংশ শতাব্দীতে দেওবন্দ মাদরাসা প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পদ্ধতির মাদরাসা এ উপমহাদেশে ছড়িয়ে যায়। তারপর থেকে এ পদ্ধতির মাদরাসাসমূহের ব্যাপক কোনো সংস্কার এখন পর্যন্ত হয়নি। এ পদ্ধতির মাদরাসা থেকে যারা পাশ করেন তারা সাধারণত অন্যান্য মাদরাসায় কাজ করেন বা মসজিদে ইমামতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দেশের শিল্প-বাণিজ্য, ব্যাংকিং বা প্রশাসনে তাদের সাধারণত কোনো স্থান হয় না, হলেও তা খুবই কম।

কওমি মাদরাসাসমূহের পরিচালকগণ তাদের মাদরাসা কোর্সের কি ধরনের সংশোধনের চিন্তা-ভাবনা করছেন, তা আমার জানা নেই। এ ধরনের কোনো রিপোর্টও আছে কি-না তাও আমি অবগত নই। যদি থেকে থাকে তাহলে তার উপর পদক্ষেপ গ্রহণ করা সঙ্গত।

এ নিবন্ধে আমি কওমি মাদরাসার শিক্ষাব্যবস্থাকে ইসলামের জন্য আরো কল্যাণকর করার লক্ষ্যে কিছু পরামর্শ দিতে চাই। ইসলামের স্বার্থেই এটি প্রয়োজন যে, মাদরাসাশিক্ষিত ছাত্ররা যেন সমাজের সর্বস্তরের প্রয়োজন মিটাতে পারেন। তারা যেন ইমাম, মাদরাসা শিক্ষক ছাড়াও ব্যাংকার, প্রশাসক ও অর্থনীতিবিদ হতে পারেন।

অধিকাংশ বড় মাদরাসাকে জামেয়া বলা হয়। জামেয়া অর্থ বিশ্ববিদ্যালয় (University)। জামেয়া বা বিশ্ববিদ্যালয়ের তাৎপর্য হচ্ছে যে, এখানে সব প্রয়োজনীয় বিষয় বা subject শিক্ষা দেওয়া হবে। সব ছাত্র সবকিছু শিখবে তা নয়, প্রতিটি subject বা বিষয় কিছু ছাত্র শিখবে। এ প্রেক্ষিতে বর্তমানে যে দাওরাহ ডিগ্রি আছে তার সঙ্গে যদি আমরা আর মাত্র দু'টি দাওরাহ কোর্স সব জামেয়ায় খুলতে পারি তাহলে মাদরাসার ছাত্ররা যে কোনো স্থানে প্রশাসক হতে পারবে এবং সকল অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা হতে পারবে। বিষয় দু'টি হচ্ছে অর্থনীতি (ইকতিসাদ) এবং লোক-প্রশাসন বা Public Administration। যদিও সব বিষয়ে দাওরাহ খোলা সম্ভব নয়, কিন্তু দু'টি নতুন বিষয়ে দাওরাহ খোলা খুবই সম্ভব। এর ফলে সারা দেশে প্রশাসনে এসব



www.pathagar.com

ছাত্ররা যেতে পারবে এবং গোটা জাতির ইসলামিকরণে তারা ভূমিকা রাখতে পারবে। ইতোমধ্যে Islamic Economics বা ইসলামী অর্থনীতি একটি নতুন বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে। Public Administration-এ অনেক কাজ হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে আমি কওমি মাদরাসাসমূহে দু'টি নতুন দাওরাহ খোলার প্রস্তাব করছি। এর ফলে নিচের ক্লাশসমূহে কোর্স পরিকল্পনায় কিছু পরিবর্তন করতে হবে। কওমি মাদরাসায় একাদশ-দ্বাদশ ক্লাশে অর্থনীতি ও পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন-এর দু'টি পত্র (Paper) যোগ করতে হবে। যে কেউ যে কোনো একটি গ্রহণ করতে পারবে। দু'টি বিষয় একত্রে নেওয়া যাবে না। যারা এ পর্যায়ে অর্থনীতি বা পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন নেবেন কেবল তারাই দাওরাহ পর্যায়ে এসব বিষয়ে পড়তে পারবেন।

আর যে কয়টি পরিবর্তন করা প্রয়োজন তা হচ্ছে, আরবি ভাষা শিক্ষা আরো শক্তিশালী করা দরকার। বাংলা ভাষা শিক্ষাকেও পুরোপুরি অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন যাতে মাদরাসা ছাত্ররা এ দেশে প্রখ্যাত লেখক হতে পারেন। ইংরেজি ভাষাকেও উপযুক্তভাবে সব পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, তাহলে তারা কেবল জাতীয় পর্যায়ে নয়, আন্তর্জাতিক পর্যায়েও দেশের ও ইসলামের খেদমত করতে পারবেন বলেই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এছাড়া খুব ভালো হবে যদি দাওরাহ কোর্সে আধুনিককালে তাফসির, হাদিস ও ফিকাহর ওপর যেসব মহৎ কাজ সম্পন্ন হয়েছে সেগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করেন। তাদের সকল কোর্স রিভিউ বা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। পুরানো কিছু বই বাদ দিয়ে নতুন কিছু বই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তাহলে তাদের কোর্সসমূহ এ যুগে ইসলাম ও সমাজের চাহিদা পূরণ করতে পারবে।

আমাদের মাদরাসাসমূহে যে আরবি শিখানো হয় তাতে তারা আরবিতে দক্ষ হন না, তারা আরবিতে বলতে-লিখতে পুরোপুরি সক্ষম হন না। আরবি শেখার আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে।


www.pathagar.com

www.pathagar.com

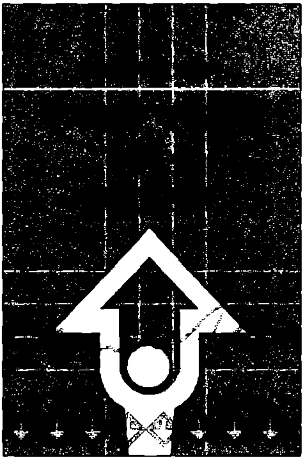

ইসলামী অর্থনীতি ঃ দর্শন ও কর্মকৌশল

প্রকাশকাল : প্রথম প্রকাশ - এপ্রিল ২০০২, আল-আমিন প্রকাশন
তৃতীয় সংস্করণ - জুন ২০১১, দি পাইওনিয়ার

www.pathagar.com

www.pathagar.com

# ইসলামী অর্থনীতি ঃ দর্শন ও কর্মকৌশল

ইসলামী অর্থনীতি বর্তমানে একটি বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে এ কথাও বলা যায় যে, অর্থনীতি সাবজেক্টের বয়সও খুব বেশি নয়। মাত্র আশি বা নব্বই বছর। এর পূর্বে এটা পলিটিক্যাল সায়েন্সের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তখন এটাকে পলিটিক্যাল ইকোনমি (Political Economy) বলা হতো।

গত পঞ্চাশ-ষাট বছর ধরে ইসলামী অর্থনীতির উপর ব্যাপক কাজ হচ্ছে। বেশকিছু বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, সিনিয়র অর্থনীতিবিদ এই বিষয়ে কাজ করছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন প্রফেসর খুরশীদ আহমদ, ড. নাজাত উল্লাহ সিদ্দিকী, প্রফেসর ড. ওমর চাপরা, ড. মনজের কাহাফ, ড. তরিকুল্লাহ খান, ড. মুনাওয়ার ইকবাল প্রমুখ। এছাড়াও অন্য স্কলাররা এই বিষয়ে অনেক কাজ করেছেন। আস্তে আস্তে ইসলামী অর্থনীতি একটি পূর্ণ বিজ্ঞানে (Science) পরিণত হয়েছে।

ইসলামী অর্থনীতির ওপর আলোচনা করতে গেলে ইসলামী অর্থনীতির যে দর্শন বা স্ট্র্যাটেজি সেই বিষয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। ইসলামী অর্থনীতির দর্শন হলো এই অর্থনীতির ভিত্তি অথবা তার স্ট্র্যাটেজি বা কর্মকৌশলের ভিত্তি। কেননা, একটি বিল্ডিং যেমন নির্ভর করে তার ফাউন্ডেশনের ওপর, ফাউন্ডেশনটাই বলে দেয় বিল্ডিংটি কি রকম হবে, তেমনিভাবে ইসলামী অর্থনীতির দর্শন বলে দেয় যে, তার স্ট্র্যাটেজিটা কি হবে বা কি হওয়া উচিত।

কিন্তু সেই দর্শন এবং কর্মকৌশল আলোচনার পূর্বে আমি মনে করি বর্তমান যা চলছে তা সংক্ষেপে আলোচনা করা দরকার। বর্তমানে বিশ্বের সর্বাধিক েত (Ruling) অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হচ্ছে ক্যাপিটালিজম (Capitalism)। আমরা যদি এই ক্যাপিটালিজমের সমস্যাগুলো বুঝতে পারি তা হলেই ইসলামী অর্থনীতির গুরুত্ব বুঝতে পারব। এটা এই জন্যেই প্রয়োজন যে, বর্তমান রুলিং আইডিওলজি (Ruling Ideology) দৃশ্যত খুব শক্তিশালী, খুব সফল বলে মনে হয়। অনেকের এও মনে হতে পারে যে, এর বুঝি কোনো দুর্বলতা নেই। কিন্তু এ কথাটা সত্য নয় এবং এ কথাটাই আমি এখানে আলোচনা করতে চাই।

ক্যাপিটালিজমের বয়স ষোড়শ শতাব্দী থেকে ধরা হয়। প্রায় পাঁচশ' বছর এর বয়স। এই পাঁচশ বছরে ক্যাপিটালিজম যে দুনিয়ায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছে তা অস্বীকার করা যাবেনা, তেমনি এ কথাও অস্বীকার করা যাবে না যে,



www.pathagar.com

ক্যাপিটালিজম বিশ্ব থেকে দারিদ্র্য (Poverty), অসমতা (Unequality) দূর করতে পারেনি। কাজেই, ক্যাপিটালিজম দোষমুক্ত বা সমস্যামুক্ত এটা যেমন অতীতের ক্ষেত্রে বলা যায় না, তেমনি আজকেও বলা যায় না।

আমরা গত বিশ-পঁচিশ বছরে পুঁজিবাদী বিশ্বের অনেক সংকট দেখেছি। সাউথ ইস্ট এশিয়ায় বিরাট অর্থনৈতিক ক্রাইসিস দেখলাম বিগত শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে এবং সেটা এখনো চলছে। ল্যাটিন আমেরিকাতেও আমরা বিভিন্ন সময় ক্রাইসিস দেখেছি। ২০০৮ সন থেকে চলছে বিশ্বজোড়া নতুন করে অর্থনৈতিক সংকট।

ক্যাপিটালিজম আমরা কমবেশি সবাই বুঝি। বিভিন্ন অর্থনৈতিক মতবাদ প্রধানত পাশ্চাত্যেই তৈরি হয়েছে এবং ডেভেলপ করেছে। পাশ্চাত্যের পন্ডিতরাই এর ওপর বেশি কাজ করেছেন। এ কথাগুলো শুধু ক্যাপিটালিজমের ক্ষেত্রেই সত্য নয়, সোস্যালিজমের ক্ষেত্রেও সত্য। ওয়েলফেয়ার ইকোনমিকস (Welfare Economics) নামে যা বিশ্বে চলছে, সেটাও পাশ্চাত্যেরই অবদান। পাশ্চাত্যের চিন্তাবিদরাই এসব ধারণা নিয়ে আসছেন।

ক্যাপিটালিজমের ভিত্তি ছিল বা এর পেছনে শুরুতে কাজ করত খৃস্টান এথিকস বা খৃস্টান নৈতিকতা। কারণ, পাশ্চাত্যের যেখানে এর বিকাশ ঘটে সেই সমাজ মূলত খৃস্টান সমাজ ছিল। মৌলিকভাবে জনগণ খৃস্টীয় এথিকসে বিশ্বাস করত। ফলে ক্যাপিটালিজমের অর্থনৈতিক নীতিমালায় যা-ই ত্রুটি থাকুক না কেন, খৃস্টান এথিকস তাকে মডারেট করতো, তার খারাপ প্রভাবকে সংযত করত, তাকে নিয়ন্ত্রণ করত।

পরবর্তীকালে কোনো কোনো লেখকের দ্বারা অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুক্তবুদ্ধির (Enlightenment) যে আন্দোলন শুরু হয় তার মূল দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধর্মকে জীবনের মৌলিক কর্মকাণ্ড থেকে বাদ দেয়ারও চেষ্টা করা হলো। এই আন্দোলনের কারণে বাস্তবে সেকুলারিজম প্রাধান্য পায় এবং সমাজ সেক্যুলারিস্ট হয়। সেখানে মোরালিটি গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে এবং যুক্তিকে (Reason) প্রাধান্য দেয়া হয়। এতে মনে করা হলো যুক্তিই সবকিছুর সমাধান করতে পারে। যদিও আমরা জানি, যুক্তিবাদে অনেক সীমাবদ্ধতা আছে। এর দ্বারা সব সমাধান করা যায় না। যুক্তিবাদ সত্ত্বেও মানুষের ভিতর মতবিরোধ দেখা দেয় এবং আজকে যেটা যুক্তিসংগত মনে হয় কালকে সেটা যুক্তিসংগত থাকে না। এই সমস্ত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও একটা সময় গেছে যখন রিজনকে প্রায় পূজা করা হতো। আল্লাহর স্থানে, গডের স্থানে রিজনকে নিয়ে আসা হলো। সেটা ভ্রান্ত ছিল, বিভ্রান্তি ছিল, ভুল ছিল।

এনলাইটেনমেন্ট মুভমেন্টের কারণে (ক্যাপিটালিজমের ভিত্তি হওয়ার কারণে বা এর ফল স্বরূপ) চলে আসল ম্যাটেরিয়ালিজম (Materialism), ভোগবাদ, ব্যক্তিবাদ, স্বার্থপরতার মতো বস্তুবাদের বিষয়সমূহ। এর ফলে আসে বেশি হাই



www.pathagar.com

কনজাম্পশান। অন্যদিকে এটা একটা সামাজিক ডারউইনিজম সৃষ্টি করল। আমরা ডারউইনিজম সম্পর্কে জানি। ডারউইনিজম হচ্ছে, জীব জগতের যে ধারণা ডারউইন থেকে এসেছে বা ডারউইন উদ্ভাবন করেছেন - (Natural selection and servival of the fittest)। অর্থাৎ জীবজগত সম্পর্কিত ডারউইনের ধারণাই ডারউইনিজম। এখন সোস্যাল ডারউইনিজম অর্থাৎ সামাজিক ক্ষেত্রেও ডারউইনিজম বিশ্বব্যাপী এত গুরুত্ব পেয়েছে এনলাইটেনমেন্ট মুভমেন্ট এবং ম্যাটেরিয়ালিজমের বিকাশের কারণে। ক্যাপিটালিজমের মাধ্যমে এই ধারণা সৃষ্টি হয় যে, অর্থনীতিতেও Natural selection হবে এবং এখানে শুধু ফিটেস্টরাই সারভাইভ করবে। যোগ্যরাই বাঁচবে। অর্থনীতিতে, যদি তা-ই হয়, তাহলে তার মানে হবে প্রকৃতপক্ষে দুর্বলের কোনো স্থান থাকবে না, দরিদ্রের স্থান থাকবে না। যদি থাকেও তাহলে তাদের খুব সংকীর্ণ স্থান থাকবে।

সোজা কথা, বিশ্ব অর্থনীতি ধনীদের, যোগ্যের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। অর্থাৎ ম্যাটেরিয়ালিজম, এনলাইটেনমেন্ট মুভমেন্টের কারণে, সোস্যাল ডারউইনিজমের কারণে পুঁজিবাদ একটি ডকট্রিনে পরিণত হয়। অর্থনীতিতে শুধু যোগ্যরাই টিকে থাকবে - সেটাই একটি মতাদর্শে বা দর্শনে পরিণত হয়। এতে দরিদ্রের প্রতি খৃস্টান ইথিকসের কারণে যে মায়া-মহব্বত ছিল, তাদের প্রতি যে দায়িত্ববোধ ছিল, সেটা উঠে গেল। এমনকি দর্শনের মাধ্যমে সেটা উঠে গেল। তখন তারা দরিদ্র মারা গেলে কি হবে সে যুক্তি খাড়া করতে পারল না। যোগ্যদের টিকে থাকার ফলে দরিদ্ররা মরে যাবে। এই ধরনের ফলাফল অষ্টাদশ শতাব্দীর মুক্তবুদ্ধির আন্দোলনের কারণে দেখা দিয়েছিল।

ক্যাপিটালিজমের থিওরীর পেছনে কতগুলো অগ্রহণযোগ্য ধারণা (Concepts) ছিল যেগুলো আমাদের জানা দরকার। যেগুলো প্রকৃতপক্ষে একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন প্রথমত, অর্থনীতির আইনগুলো হচ্ছে ফিজিক্যাল ল'-এর মতো। যেমন যেভাবে পৃথিবী ঘুরছে বা সূর্য যেভাবে চলছে নিজস্ব নিয়মে অথবা বায়ু প্রবাহ, নদী বা সমুদ্রের গতি প্রভৃতি ফিজিক্যাল ল'জ যেমন সঠিক তেমনি ইকোনমিক ল'জ সঠিক। এখানে অর্থনীতির আইন ফিজিক্যাল আইনের মতোই-এরকম একটা ধারণা নিয়ে আসা হলো। তারা এগুলো বিশ্বাস করে। কিন্তু এটা একেবারে সত্য নয়। আমরা জানি, বাজার ক্রমাগত পরিবর্তন হতে থাকে। যেই পরিবর্তন আমাদের সোলার (Solar) সিস্টেমে হয় না বা আমাদের ফিজক্যাল ল'তে হয় না। অথচ যেকোনো বাজার ব্যাপক পরিবর্তনের সম্মুখীন। সুতরাং এ রকমই একটা ভুল ধারণার ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে ক্যাপিটালিজম।

দ্বিতীয়ত, মানুষের কাজের মোটিভেশন বা কাজ করার প্রেরণাটা কি? সে সম্পর্কে তারা বলে, মানুষের কাজের মোটিভেশন হলো শুধু তার স্বার্থপরতা (Pecuniary Interest)। মানুষ মূলত স্বার্থপর এবং তার স্বার্থপরতা, স্বার্থ



www.pathagar.com

উদ্ধার করাই হচ্ছে তার প্রকৃত মোটিভেশন। এটাকেই তারা টেকনিক্যালি বলে Rational Economic Man। মানুষ হচ্ছে যুক্তিবাদী (Rational)। এ যুক্তির পরিচয় হচ্ছে সে স্বার্থের জন্য কাজ করে। তবে একথা ঠিক যে, মানুষের মধ্যে স্বার্থপরতা রয়েছে এবং স্বার্থ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

মানুষ কেবল স্বার্থের জন্যেই কাজ করে? এ কথা সত্য নয়। তাহলে দুনিয়ায় এত ত্যাগ (Sacrifice) মানুষ করতে পারত না। পরিবারের জন্যে, সমাজের জন্যে মানুষ এত ত্যাগ করত না। এত চ্যারিটি দুনিয়াতে থাকতো না।

তৃতীয়ত, তারা একটি মূল্যবোধহীন অর্থনীতির জন্ম দিল। তারা একটি ডকট্রিন খাড়া করল পজিটিভিজম (Positivism) নামে। পজিটিভিজম হলো, অর্থনীতিতে কোনো মূল্যবোধ নেই। অর্থনীতিতে মূল্যবোধ এলেই অর্থনীতি প্রভাবিত হয়ে যাবে। অর্থনীতি তার ন্যাচারাল কোর্স থেকে সরে পড়বে। অর্থনীতি একটি বিজ্ঞান হিসেবে থাকবে না। কিন্তু অর্থনীতির কার্যক্রমে কোনো মূল্যবোধ থাকবে না? এরকম দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত মারাত্মক। আর তা-ই যদি হয় তাহলে কোন যুক্তিতে আমরা দরিদ্রের জন্য কাজ করব? দারিদ্র্য কেন দূর করব? কেন আমরা নিরক্ষরতা দূর করব? কেন আমরা বঞ্চিত জনগণের জন্য কাজ করব? এ সবই তো মুল্যবোধের সাথে সম্পর্কিত।

সুতরাং পজিটিভিজম ধারণা ক্যাপিটালিজমে প্রবেশ করল যে, অর্থনীতিতে কোনো মুল্যবোধ নেই। ক্যাপিটালিজমের অপর নাম মূল্যবোধহীন অর্থনীতি। এটা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না অথচ এটাই চলছে ক্যাপিটালিজমের নামে। আবার বলা যায়, পুরোপুরি চলছে না। কারণ, মানুষের মানবিকতা কখনো কখনো এসব বিষয় কার্যকর হতে দেয় না। কারণ এগুলো সব আন-ন্যাচারাল (অস্বাভাবিক) ধারণা। এ জন্যে হয়ত বা এগুলো থিওরিতে আছে তবে বাস্তবে তা পুরোপুরি কার্যকর করা সম্ভব হয় না।

চতুর্থত, ক্যাপিটালিজম মার্কেট সিস্টেমের উপর গুরুত্ব দেয়। মার্কেট সিস্টেমের গুরুত্ব সত্ত্বেও তার অনেক সমস্যা রয়েছে। কিন্তু সেটা তারা স্বীকার করে না। ক্যাপিটালিজমের মার্কেট সিস্টেমের অনেক ভালো দিক আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এলোকেশন অব রিসোর্সের ক্ষেত্রে মার্কেট একটি ভালো কাজ করে। কিন্তু আমাদের এটা মনে রাখতে হবে যে, ক্যাপিটালিজমে মার্কেট সিস্টেমটাকে যে রকম পুরোপুরি পারফেক্ট মনে করা হয় তা কিন্তু সত্য নয়। বাস্তবে মার্কেট সিস্টেমের মাধ্যমে পুরোপুরি রিসোর্স বা সম্পদের সঠিক বণ্টন (Proper allocation) হয় না। ন্যায়বিচারমূলক বণ্টন হয় না। তার প্রমাণ বাস্তবে একটা দেশে জনগণের একটা অংশের হাতে প্রয়োজনীয় ক্রয় ক্ষমতা না থাকায় তারা কিনতে পারে না। যেমন, আমাদের দেশে অর্ধেকের বেশি লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। তাদের কাছে ডলার বা পাউন্ড নেই। তারা কিনতে পারে না। তারা অর্থের অভাবে প্রয়োজনীয় জীবন সামগ্রী কিনতে পারে



www.pathagar.com

না বলে তাদের প্রয়োজনটা মার্কেটেই যায় না, যেতেও পারে না। তাদের দুধ বা ওষুধ দরকার হলেও সেই প্রয়োজন মার্কেটে আসছে না। তাদের বাড়ি দরকার, বাড়ি ভাড়া করা দরকার-সেই প্রয়োজন মার্কেটে যায় না। কারণ, তারা সেটা কিনতে পারছেনা।

অন্যদিকে মার্কেট সিস্টেমে যাদের টাকা আছে তারা চারটা-পাঁচটা গাড়ি কিনতে পারে। বিরাট বিরাট বাড়ি বানাতে পারে। অন্যদিকে যাদের টাকা নেই তারা দুধ পর্যন্ত কিনতে পারে না। ওষুধ কিনতে পারে না। এই পরিস্থিতিতে দু'টো ফল জনগণের হয়। প্রথমত পূর্ণ ও সঠিক ডিমান্ডটা মার্কেটে আসতে পারে না বর্তমান মার্কেট সিস্টেমের কারণে এবং দ্বিতীয়ত অগ্রাধিকার (Priorities) নষ্ট হয়ে যায়। দরকার দুধের অথচ মার্কেট বলছে বিলাস সামগ্রী বানাও। কেননা Price Mechanism-এর মাধ্যমে বাজারে সেসব দ্রব্যের চাহিদা এসেছে। গাড়ির চাহিদাটাই মার্কেটে আসছে। দুধের চাহিদা আর আসতে পারছেনা।

সুতরাং মার্কেট সিস্টেম সঠিক পদ্ধতি নয় যার মাধ্যমে সম্পদের সমবণ্টন হতে পারে। কেননা, সম্পদ চলে যাবে সেইদিকে, যেদিক থেকে মার্কেটে ডিমান্ড আসছে। সম্পদ সেই দিকেই যাবে, যেই ডিমান্ডটি মার্কেটে আসে। ফলে যে ডিমান্ড আসছে না (দুধের ডিমান্ড পুরোপুরি আসছে না) সেদিকে তো সম্পদ যাচ্ছে না। এরকম প্রচণ্ড ইমপারফেকশন (Imperfection) মার্কেট সিস্টেমে রয়েছে। সুতরাং যারা মনে করেন মার্কেট সব সমস্যার সমাধান করবে তারা সম্পূর্ণ ভুল করে, মার্কেটের দাস (Servant) হয়ে যায়। কিন্তু সেটা হওয়া ঠিক হবে না। বাজার গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু বাজার একমাত্র বিবেচ্য বিষয় নয়।

এই কনটেক্সটে (Context) এখন ইসলামের অর্থনীতির যে মূল ভিত্তি বা তার যে স্ট্র্যাটেজি সে সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই। বর্তমানে রুলিং আইডিওলজি ক্যাপিটালিজমের দুর্বলতা বোঝার কারণে ইসলামী অর্থনীতির কর্মকৌশল ভালো করে বোঝা সম্ভব। ইসলামী অর্থনীতিবিদগণ তিনটি বিষয় বা কনসেপ্টকে মূল ভিত্তি বলেছেন। প্রথম ভিত্তিটি হলো তৌহিদ। এই তৌহিদ হচ্ছে পৃথিবী আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। এটা তাৎপর্যহীন সৃষ্টি নয়। সকল মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি। সকল মানুষের গুরুত্ব রয়েছে এবং সকল মানুষকে গুরুত্ব দিতে হবে।

ইসলামী অর্থনীতির দ্বিতীয় ভিত্তি হচ্ছে খিলাফত। খিলাফত হলো - মানুষ আল্লাহর খলিফা। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষই। সূরা বাকারা, সূরাতুল ফাতিরে এবং অন্যান্য সূরাতে একথা বলা হয়েছে। খিলাফত মানুষকে অত্যন্ত সম্মানিত করেছে। মানুষ কোনো চান্স প্রোডাক্ট (Chance Product) নয়। হঠাৎ করে একটা এক্সিডেন্টের মাধ্যমে মানুষের সৃষ্টি সে রকম নয়। মানুষ জন্মগত অপরাধী (Born Sinner)-ও নয়। যেমনটি পাশ্চাত্যে মনে করা হয়। খিলাফতের ধারণা মানুষের মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। খিলাফতের তাৎপর্য



www.pathagar.com

হলো বিশ্বভ্রাতৃত্ব (Universal Brotherhood)। অর্থাৎ সকল মানুষ ভাই বা ভাই-বোন এবং এ হিসেবে তারা মর্যাদার অধিকারী, সমতার অধিকারী, সমভাবে তাদের দিকে খেয়াল করতে হবে। খেয়াল করার প্রয়োজন রয়েছে। এর আরেকটা তাৎপর্য হলো, মানুষ মূল মালিক নয়। মূল মালিক আল্লাহ্ পাক এবং সম্পদ (Resource) একটা আমানত মাত্র। যে কোনোভাবে সে সম্পদকে ব্যবহার করতে পারে না। সম্পদকে ব্যবহার করতে হবে আল্লাহ্ তায়ালা যেভাবে চেয়েছেন ঠিক সেভাবে। এগুলো হলো খিলাফতের ধারণার গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য।

তৃতীয় ভিত্তি জাস্টিস, ইনসাফ বা ন্যায়বিচার। আদল হলো কুরআনের পরিভাষা। কুরআনে প্রায় একশ' আয়াত আছে, যেখানে জাস্টিসের কথা বলা হয়েছে। আরো একশ' আয়াত আছে যেখানে জুলুমের নিন্দা করা হয়েছে। তার মানে হলো, অর্থনীতিতে জুলুম থাকলে চলবে না এবং জাস্টিস আনতে হবে। এটাই হলো জাস্টিসের মূল তাৎপর্য।

আরো পরিষ্কারভাবে বলা যায়, ইনসাফের দাবি হলো সকল মানুষের প্রয়োজনকে পূর্ণ করতে হবে। সকলের জন্য সম্মানজক আয়ের (Respectable earning) ব্যবস্থা করতে হবে। এমনভাবে অর্থনীতিটাকে সাজাতে হবে, এমনভাবে কর্মকৌশলটাকে নির্ধারণ করতে হবে যাতে সকলের আয়ের ব্যবস্থা হয়। যদি কারোর আয়ের ব্যবস্থা না হয় কিংবা যদি কেউ সম্মানজনক আয়ের ব্যবস্থা না করতে পারে-অর্থাৎ যদি তার কোনোরকম শারীরিক বা মানসিক দুর্বলতা থাকে বা অর্থনৈতিক কোনো বিপর্যস্ত অবস্থা থাকে সে অবস্থায় অনেকে হয়ত ইনকাম করতে পারল না; তাহলে তাদের ব্যবস্থা প্রথমে করতে হবে তার পরিবারের বা আত্মীয়-স্বজনদের। আর তারা যদি না পারে তাহলে রাষ্ট্রকে করতে হবে। এ হলো জাস্টিসের দাবি।

এরপর ইসলামী অর্থনীতির কর্মকৌশল (Strategy) সম্পর্কে বলতে হয়। চারটি স্ট্র্যাটেজির কথা আমাদের অর্থনীতিবিদরা বলেছেন। অনেক কথা বললেও এই চারটি কথাই প্রধান। এর মধ্যে প্রথমটি হলো নৈতিক ছাঁকনি। অর্থাৎ রিসোর্সের একটা পয়েন্ট অব টাইম বা কোনো নির্দিষ্ট সময়ের একটা সীমা আছে এবং এর ডিমান্ড প্রায় সীমাহীন। ফলে এ দু'টির মধ্যে মিলাতে গেলে ডিমান্ডের উপর এমন এক ছাঁকনি দরকার যাতে ডিমান্ডগুলো যেন একটু কমে আসে, সংযত থাকে।

একটি ছাঁকনি হলো প্রাইস (Price) যেটা আধুনিক ক্যাপিটালিজমে আছে। প্রাইসের মাধ্যমে ডিমান্ডকে সংযত করা হয়। আমার টাকা কম সুতরাং আমি কিনতে পারবো না - এটা হচ্ছে এক ধরনের ছাঁকনি বা ফিল্টার, যার মাধ্যমে এটা হয়। ইসলাম এই প্রাইস ফিল্টারকে মেনে নিয়েছে। আবার মেনে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা জিনিস সে নিয়ে আসে। সেটাকে বলা হয় নৈতিক ফিল্টার। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে ইসলাম এমন একটা নৈতিকতা সৃষ্টি করেছে,



www.pathagar.com

এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েছে যে, মানুষ যেন অপব্যয় না করে। অতিভোগ যেন না করে। অতিরিক্ত ভোগের দিকে যেন তার নজর না যায়। নৈতিক ছাঁকনির গুরুত্ব অনেক। কেননা, মূল্য ছাঁকনি (Price Filter) দ্বারা কেবল দরিদ্র মানুষের দাবি কমানো যায়। সুতরাং এই একটা স্ট্র্যাটেজি ইসলামী অর্থনীতিবিদরা সাজেস্ট করেছেন - মূল্য ছাঁকনি ছাড়াও কর্মকৌশলের অংশ হিসেবে একটা নৈতিক ছাঁকনি (Moral Filter) নিয়ে আসা। যাতে করে ডিমান্ড সংযত হয়। প্রাইসের মাধ্যমেও আমরা ডিমান্ডকে সংযত করব, অন্যদিকে নৈতিক ছাঁকনির মাধ্যমে আমরা অতিরিক্ত ভোগ নিয়ন্ত্রণ করব। যতবেশি ভোগ করব, ততবেশি আল্লাহর কাছে দায়ী হব। আমাদেরকে জবাব দিতে হবে। এর জন্য চ্যারিটি করতে হবে। এইসব মাধ্যম ডিমান্ড এর দাবিকে কমিয়ে এনেছে যেন আমাদের কোনো একটা নির্দিষ্ট সময়ের রিসোর্সের প্রাপ্যতার সঙ্গে ডিমান্ডের সংঘাতটা কমে আসে।

ইসলামী অর্থনীতিবিদগণ দ্বিতীয় যে স্ট্র্যাটেজির কথা বলছেন সেটা হলো প্রপার মোটিভেশন (Proper motivation)। আমাদের প্রপার মোটিভেশন থাকতে হবে, প্রপার মোটিভেশন সৃষ্টি করতে হবে। ক্যাপিটালিজম এই মোটিভেশনকে একমাত্র স্বার্থ বলেছে। কিন্তু ইসলাম বলেছে - না, স্বার্থ ঠিকই আছে কিন্তু এই স্বার্থপরতাকে বিস্তার করে দিতে হবে। অর্থাৎ ক্যাপিটালিজম যেখানে দুনিয়াভিত্তিক স্বার্থের কথা বলে সেখানে ইসলামী অর্থনীতি দুনিয়া ও আখিরাতের স্বার্থের কথা বলে। দু'টো মিলে যাতে লাভ সেটাই স্বার্থ। এডুকেশনের মাধ্যমে, মিডিয়ার মাধ্যমে, প্রচারের মাধ্যমে, ওয়াজের মাধ্যমে, দাওয়াতের মাধ্যমে - সর্ব উপায়ে এটা করতে হবে। জনগণের মাঝে উপযুক্ত মোটিভেশন সৃষ্টি করতে হবে। অর্থনৈতিক কাজকর্মে কেবল দুনিয়ার স্বার্থ দেখলে চলবে না। দুনিয়ার স্বার্থ এবং আখিরাতের স্বার্থ দেখতে হবে। সুতরাং ইসলাম মোটিভেশনের স্বার্থপরতাকে বিস্তৃত করে দিয়েছে। বেসিক কর্মকৌশলের মধ্যে এটা রয়েছে।

উপরের বিষয়গুলো বাস্তবায়নে সময় লাগবে। এ জন্য ইসলামী অর্থনীতিবিদরা তৃতীয় কর্মকৌশলও নির্ধারণ করেছেন Socio-economic financial re-structuring নামে এবং এই বিষয়টিকেই তারা খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে অভিহিত করেছেন। এর মাধ্যমে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ফাইনান্সিয়াল ব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করতে হবে। এর সাহায্যে ব্যাংকিং সিস্টেমের মনিটরিং পলিসির (Monitoring ploicy), ফিসকেল সিস্টেমে (Fiscal) পরিবর্তন করতে হবে। ব্যাংকের টাকা সৃষ্টির ক্ষমতাকে (Power to money creation) সংযত করতে হবে। পূর্ণ কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে ও মিডিয়াম শিল্পের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। কৃষি এবং রুরাল অর্থনীতির উপর গুরুত্ব দিতে হবে। শুধুমাত্র আরবান বেসড (Urban based) হলে চলবে না। এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা ইসলামী অর্থনীতিবিদরা করেছেন।



www.pathagar.com

কর্মকৌশলের চতুর্থ দিক হলো, Social re-structuring, Economic re-structuring এবং Financial re-structuring-এর কাজটি করতে হবে সরকারকে। ইসলামের অবস্থা সমাজতন্ত্রের মত নয় যে, সরকার সব করবে। আবার পুঁজিবাদের মতোও নয় যে, মার্কেটই সব করবে। ইসলাম বলে, মার্কেটকে আশি ভাগ আর সরকারকে বিশ ভাগ করতে হবে (এ হার পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তন হতে পারে)। এটাই হচ্ছে সরকারের ভূমিকা।

আর এই চারটিই হলো ইসলামী অর্থনীতির মূল কর্মকৌশল।

## গ্রন্থসূত্র


১. আল-কুরআনুল করীম
২. বুখারী ও মুসলিম শরীফ
৩. ড. এম. ওমর চাপরা, ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ, বিআইআইটি
৪. শাহ আবদুল হান্নান, ইসলামী অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকা
৫. Duraut, The Story of Civilizaiton
৬. Arnold Toynbee, A Study of History
৭. Paul A Samuelson, Economics
৮. ইমাম ইবনে তাইমিয়া, আল-হিসবাহ্ ফিল ইসলাম
৯. ইমাম শাতিবি, আল-মুয়াফাকাত ফিল উসূল আল-শরীয়হ





www.pathagar.com

# ইসলামী অর্থনীতি ঃ প্রয়োগ ও বাস্তবতা

ইসলামী অর্থনীতির প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রথমেই বলতে হয়, এটা কোনো নতুন অর্থনীতি নয়। এর মূল ভিত্তি রয়েছে কুরআনুল করীমে - যা চৌদ্দশত বছর আগে নাযিল হয়েছিল। এর অপর মূল ভিত্তি রয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষায়। আর এর প্রয়োগও শুরু হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ই।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় গিয়ে একটি রাষ্ট্র গঠন করেন। সেখানে বিভিন্ন জাতির লোকেরা ছিল। বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোকেরা ছিল। রাসূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবী ছিলেন - একই সাথে তিনি রাষ্ট্রপতি ছিলেন। সকল বিষয়ে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন, মৌলিক সিদ্ধান্তগুলো। তাঁর আমলে তাঁরই নির্দেশনায় সে দেশের অর্থনীতিসহ সবকিছু পরিচালিত হচ্ছিল। তখন থেকেই স্বাভাবিকভাবে মদিনা রাষ্ট্রে ইসলামী অর্থনীতির প্রয়োগ শুরু হলো।

তিনি যে সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য পেয়েছিলেন তাতে দেখলেন তার মধ্যে কিছু ব্যবসা জুলুমমূলক। সেগুলো সুবিচারমূলক নয়। সেগুলোকে তিনি বাতিল করে দিলেন (যেমনঃ মুলামাসা এবং মুনাবাদা, দ্রষ্টব্য - বুখারী, কিতাবুল বাই)। তেমনি কৃষির ক্ষেত্রেও কিছু ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ থাকায় তিনি তাও বাতিল করে দেন। তিনি অনেক উৎপাদনকে বাতিল করে দেন। যেমন সে দেশে মদ উৎপাদন করা সম্ভবপর ছিল না। তিনি কিছু পেশাকেও অবৈধ ঘোষণা করলেন। জুয়া খেলা সেখানে যেমন সম্ভব ছিল না তেমনি অশ্লীল কোনো দ্রব্য উৎপাদনও সম্ভব ছিল না। সুতরাং ইসলামী অর্থনীতির প্রয়োগ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগেই শুর হলো।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের শেষ দিকে এসে সুদ সম্পূর্ণরূপে উৎখাত হয়ে যায়। তখন সুদমুক্ত একটি অর্থনীতি এসে যায় - যার মূল ভিত্তি ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। তখন থেকেই ব্যক্তিমালিকানা কিংবা শরীকানায় ব্যবসা হতো। শরীক মালিকানায় লাভ-লোকসানকে ভাগ করে নেয়া হতো। কিংবা একজনের মূলধন হলে অন্যজনের শ্রম হতো - যাকে মুদারাবা (Mudaraba) বলা হয়। সেই ব্যবস্থাতেও লাভ বা লোকসান ভাগ করে নেয়া



www.pathagar.com

হতো। এই মূলনীতির ভিত্তিতেই উমাইয়া (এর সময় প্রায় একশ' বছর) এবং আব্বাসীয় (প্রায় সাত-আটশ' বছর)-এই সম্পূর্ণ যুগে ইসলামী অর্থনীতি চালু ছিল। এখানে আমাদের ভুলে গেলে চলবে না - উমাইয়াদের শাসন ব্যাপক এলাকায় ছিল। উত্তর আফ্রিকাসহ ভারতের একটা অংশ তাদের অধীনে ছিল। মধ্য এশিয়া ও গোটা মধ্যপ্রাচ্যও তাদের অধীনে ছিল। পরবর্তীতে আব্বাসীয়দের আমলে এটা আরো বিস্তার লাভ করে। কাজেই সেটা ছিল সেই সময়ের সবচেয়ে বড় শক্তি (Greatest super power)। তারা ছিল তখনকার সবচেয়ে বড় রাষ্ট্রশক্তি, আন্তর্জাতিক শক্তি এবং সামরিক শক্তি।

আমরা জানি, সেই সময়ে অর্থনীতির ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছিল। শিল্পের, ব্যবসার, যোগাযোগের ক্ষেত্রে উন্নয়ন হয়েছিল। শিক্ষা, সাহিত্যের উন্নয়ন হয়েছিল। স্থাপত্যের উন্নয়ন হয়েছিল। সুতরাং বলা যায়, তারা একটি উন্নত সভ্যতার অধিকারী ছিল। তাদের সে রাষ্ট্রেরও আইনগত ভিত্তি ছিল ইসলামী শরীয়ত। সেই রাষ্ট্রের বৈধতার (Legitimacy) ভিত্তি ছিল ইসলাম বা আল কুরআনুল করীম। কাজেই সেই রাষ্ট্র ইসলামী অর্থনীতিকে ফলো করছিল।

এখন ইসলামী অর্থনীতি বলতে কি বোঝায়? সেই যুগে যে প্রযুক্তি (Technology) ছিল সেটাই কি ইসলামী অর্থনীতি? নাকি অর্থনীতির ক্ষেত্রে ইসলামের যে শিক্ষা, ইসলামের যে লক্ষ্য এবং ইসলামের যে মূল্যবোধ সেগুলোকেই কার্যকর করা হচ্ছে ইসলামী অর্থনীতি? আবার ইসলামী অর্থনীতির প্রশ্নে বলা যায় - কি অর্থে সেখানে ইসলামী অর্থনীতির প্রয়োগ করা হয়েছিল। এটা স্বীকার করতেই হবে যে, টেকনোলজিই ইসলামী অর্থনীতির মূল কথা নয়। কারণ টেকনোলজি যুগে যুগে পরিবর্তন হয়ে যায়। তেমনিভাবে যে ব্যবসায় সংগঠন (Business organization) - সেটাও মূল কথা নয়। আজকের দিনে আমরা করপোরেশন (Corporation) দেখছি, যেটা আগের দিনে ছিল না। এই করপোরেশন সিস্টেম মাত্র একশ'-দুইশ' বছর আগে এসেছে। অর্থাৎ বোঝা যায় যে, ব্যবসা সংগঠনের শেপ (Shape) কি বা কি পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যবসাকে বা প্রতিষ্ঠানটিকে সংগঠিত করা হয়েছে - সেটা মূল জিনিস নয়। মূল জিনিস হলো কোন জিনিসে ব্যবসা করা বৈধ আর কোন জিনিসে ব্যবসা করা বৈধ নয়। কোন পদ্ধতিতে ব্যবসা করা বৈধ আর কোন পদ্ধতিতে ব্যবসা করা বৈধ নয়।

কাজেই আমরা যখন ইসলামী অর্থনীতির কথা বা এর প্রয়োগের কথা বলছি তখন আমরা বোঝাচ্ছি তার নীতিগুলোকে, তার মূল্যবোধ, তার লক্ষ্য কি। সে কি সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তন চাচ্ছে - এই ভিত্তিতে আমরা এই বিষয়টিকে দেখছি।

আজকের দিনে যে ইসলামী অর্থনীতি হবে, সেখানে নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করা হবে। নতুন যে বিজনেস অর্গানাইজেশন, যেমন আগে উল্লেখিত করপোরেশন অথবা জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ (Joint stock companies) - এগুলো সেখানে



www.pathagar.com

থাকবে। এখানে শেয়ার (Share) ব্যবস্থা থাকবে। আগের দিনে শেয়ারের ধারণা ছিল না। বাস্তবে বিভিন্ন মালিকানা থাকলেও তখন শেয়ার সার্টিফিকেট ছিল না, শেয়ারের ভিত্তিতে মালিকানা ভাগ করা হতো না, এগুলো সবই গ্রহণ করা হবে। এ প্রসঙ্গে আমরা জানি ওআইসি'র (OIC) ফিকাহ একাডেমি এগুলোকে বৈধ ঘোষণা করেছে। শ্রেষ্ঠ আলিম দ্বারা সকল যুগেই এসব অর্গানাইজেশন, নতুন টেকনোলজি বা শেয়ার সার্টিফিকেট (যদি তা বৈধ ব্যবসার হয়) - তাকে তারা বৈধ ঘোষণা করেছেন।

অর্থনীতির ক্ষেত্রে এখন যদি আমরা এর ঐতিহাসিকভাবে প্রয়োগের দিকে লক্ষ্য করি - যেমন এখানে এতক্ষণ যা আলোচনা করা হলো - তাহলে আমরা দেখতে পাব ইসলামী অর্থনীতির প্রয়োগের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূর হয়েছিল। আর এটা এই জন্যেই সম্ভব হয়েছিল যে, ইসলামের যে যাকাত ব্যবস্থা এবং ইসলামের ওয়াকফ'র যে ব্যবস্থা তার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূর করা সহজ। এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, প্রকৃতপক্ষে অর্থনীতি প্রধানত সরকারি ছিল না। এটা একদল ব্যক্তি বা গোষ্ঠী দ্বারা সংগঠিত ছিল। ইসলামী অর্থনীতি যেহেতু অর্থনীতির স্বাভাবিক বিকাশে বিশ্বাস করে, মানুষের যে উদ্ভাবনী শক্তি তার উপর বিশ্বাস করে, মানুষের যে যোগ্যতা (Capacity) তার উপর বিশ্বাস করে এবং যেহেতু ইসলাম মানুষকে প্রয়োজনীয় কিছু বিধি-নিষেধের আওতায় স্বাধীনতা দেয়, ফলে সে অর্থনীতি সাধারণত বিকাশমান হয়। অগ্রগতিমুখী হয়। সে কারণেই অর্থনীতি তখন উন্নতি করেছিল। আর অর্থনীতি উন্নত করার কারণে দারিদ্র্য কম ছিল।

একইভাবে তখন ইসলামী অর্থনীতির জন্যে কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন ও প্রসার ঘটে। ইন্ডাস্ট্রিজ ফ্লারিশ (Flourish) করেছিল। তখন দারিদ্র্য খুব কমই দেখা দেয় এবং যাও দেখা দিয়েছিল তা প্রাকৃতিক কারণে, দুর্ভিক্ষ (Famine) দেখা দেয়ায়। দেখা গেলো কোনোখানে বৃষ্টিপাত হয়নি। আর এসব কারণে যেখানে সমস্যা দেখা দিয়েছে তা সাধারণত সরকার তার রাজস্ব ব্যবহার করে, তার বায়তুল মালের অর্থ দ্বারা সেটাকে মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছে এবং তা করেছে। আর এ ধরনের পরিস্থিতির কথা যদি আমরা বাদ দেই তাহলে সাধারণভাবে যে পরিস্থিতি ছিল তাতে যাকাতের মাধ্যমে দারিদ্র্যের সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। তখন খুব কম লোকই গরীব ছিল। কিন্তু যারা ধনী তাদের (অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে) প্রচুর অর্থবিত্ত ছিল। তাদের যাকাত হতো। মুসলিম ইতিহাসে এমন অনেক সময় গেছে যখন যাকাত দেয়ার মতো তারা লোক পেতেন না।

এরপর ওয়াকফ'র কথা যদি বলি তাহলে বলব ইসলামে দানকে, ইনফাক ফি সাবীলিল্লাহ - আল্লাহর পথে ব্যয় করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। ফলে সকলেই চাইতেন কিছু সম্পদ দরিদ্রদের মধ্যে ওয়াকফ করে দিতে। এই



www.pathagar.com

ওয়াকফ'র আয় থেকে শুধুমাত্র ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো চলত বা আমরা যাকে সরাইখানা বলি (অর্থাৎ তখনকার পথিক বা আগন্তুকদের জন্য যে মেহমানখানা) তা চলত - যা সরকার চালাতেন। তখন প্রায় সবখানেই সরাইখানা করা হতো। এইসব ওয়াকফ'র আয় দ্বারা ছাত্রদের বেতন দেয়া হতো। দরিদ্রদের সাহায্য করা হতো। তাদের বৃত্তি দেয়া হতো। এমনিভাবে সার্বিক অভাব মুসলিম বিশ্ব থেকে দূর করা সম্ভব হয়েছিল। তখন মুসলিম বিশ্বের কোনো ব্যক্তি অভাবী ছিলেন বা দরিদ্র ছিলেন বা না খেয়ে কোনো মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে - এরকম ঘটনা খুব কমই ঘটেছে। কিংবা বলা যায় ঘটেনি, বিশেষ করে উমাইয়াদের আমল থেকে শুরু করে কলোনিয়াল (Colonial) ব্যবস্থার উত্থানের আগ পর্যন্ত।

ইসলামে যাকাত এমন একটি ব্যবস্থা যা কঠিন দারিদ্র্য (Hardcore poverty) দূর করতে সক্ষম। এর মূল কারণ হলো বর্তমানে আমাদের কিংবা বিভিন্ন দেশে যে এনজিওগুলো (NGO) তারা যে স্বল্প ঋণ দেয় (যদি টাকার হিসেবে বলি, পাঁচ হাজার বা দশ হাজার এরকম) আর তা তাদেরকে এক বছর, ছয় মাস, তিন মাস, এমনি করে বিভিন্ন সময়ের মধ্যে ফেরত দিতে হয়। এ সমস্ত স্বল্প আয় থেকে ঋণ ফেরত দেয়া এবং তার উপর আবার বাড়তি সুদ ফেরত দেয়া - যেটা এনজিওরা চায় তা প্রকৃতপক্ষে সম্ভব হয় না। এ জন্য এনজিওরা দারিদ্র্য বিমোচন করতে বিশেষ করে (Hardcore poverty) দূর করতে পারে না।

কিন্তু ইসলামে যে যাকাত ব্যবস্থা, সেটা হলো প্রকৃতপক্ষে ট্রান্সফার (Transfer), এটা একবারে দিয়ে দেয়া হয়; এটা আর ফেরৎ নিতে হয় না। এ প্রসঙ্গে আমাদের স্কলাররা বলেছেন, যাকাত এমন পরিমাণ দিতে হবে যাতে যাকাতগ্রহীতা স্বাবলম্বী হয়ে যায়। অধিকাংশ ফিকাহবিদ এ কথাই বলেছেন যে, এমনভাবে দিতে হবে যাতে তাকে আর কারো কাছে যেতে না হয়। অর্থাৎ স্বাবলম্বী করে দাও, কিংবা অন্তত এই পরিমাণ দাও যাতে এক বছর আর তার কাছে ফিরে আসতে না হয়। এই যে দৃষ্টিভঙ্গি তার বাস্তব প্রয়োগের কারণেই তখন কঠিন দারিদ্র্য (Hardcore poverty) দূর করা সম্ভব হয়েছিল। এখনও যদি মুসলিম বিশ্ব দারিদ্র্য দূর করতে চায় তাহলে যাকাতকে এবং যাকাতের সঙ্গে সঙ্গে এই ধরনের ট্রান্সফারের মাধ্যমেই এই কাজটি করতে হবে।

এক্ষেত্রে এনজিওদের প্রতি আমার পরামর্শ হবে - এনজিওরা যেভাবে করছে তার মাধ্যমে হবে না। তাদের মধ্যে ট্রান্সফারের একটা উপাদান (Element) থাকতে হবে। ইসলামের দাবী এটা যে, তারা সুদভিত্তিক কোনোকিছু না করুক। তারা সেটাকে মুসলিম দেশগুলোতে বিশেষ করে ইসলাম ভিত্তিতে করুক। এটা তারা সার্ভিস চার্জের ভিত্তিতে করতে পারে। তাতে তাদের লাভ হবে না কিন্তু তাদের খরচ উঠে আসবে। এখানে সার্ভিস চার্জ



www.pathagar.com

হলো, যে পরিমাণ দিয়েছি তার উপর এত পরিমাণ নেয়া যাতে তার প্রশাসনিক খরচ (Administrative cost) আদায় হয়ে যায়। কিন্তু তার চেয়ে এক পয়সাও বেশি নিলে তা সুদ বলে গণ্য হবে। এটাই হলো ওআইসির ফিকাহ্ একাডেমির ফতোয়া বা ঘোষণা বা রুলিং।

এনজিওগুলোর উচিত হবে সার্ভিস চার্জের ভিত্তিতে করা - সঙ্গে সঙ্গে তাদের আর যেটা করতে হবে সেটা হলো এই ধরনের ঋণের সাথে ট্রান্সফারকে একত্র করা। কথা উঠতে পারে, যদি দান বা অনুদান দেই তাহলে সেটা তারা খেয়ে ফেলতে পারে। তারা সেটা ফেরত দেবেও না বরং খেয়ে ফেলবে, তাতে কাজ হবে না। এই সমস্যাগুলো রয়েছে। আর এটা যে হতেও পারে তা অস্বীকার করা যায় না। আমাদের মধ্যে স্বভাব খারাপের জন্যে এরকম পরিস্থিতি হতে পারে। কিন্তু তথাপি আমাদের ভালো সুপারভিশনের মাধ্যমে এই পদ্ধতি সার্থক করার চেষ্টা করতে হবে, অন্য পদ্ধতিতে হবে না।

যাকাতের ব্যাপারে আইন কি হবে তার একটা স্ট্রাকচার আমরা ইতোমধ্যে পাকিস্তানে পেয়ে গেছি। সেদিক থেকে যাকাতের ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে। যদিও সরকারি পর্যায়ে আদায়ের ব্যাপারটি এখনো ভালো করে গড়ে ওঠেনি। আদায় এবং বন্টনের ক্ষেত্রে সেটাকেই এখন গড়ে তুলতে হবে। এটা সামাজিক সংগঠনগুলোর মাধ্যমেও হতে পারে। রাষ্ট্র যদি বলে দেয় আমরা এই অংশটুকু পর্যন্ত আদায় করব, বাকীটা জনগণ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে আদায় করবে। সেটাও সম্ভব, একেবারে অসম্ভব কিছু নয়। যদিও সেটার অনেক আইনগত বা শরীয়ত সংক্রান্ত দিক রয়েছে। সেগুলো পরীক্ষা করে আমাদেরকে দেখতে হবে। যদিও এটা বড় কোনো সমস্যা হবে বলে মনে হয় না (যাকাত সম্পর্কে দ্রষ্টব্য - ইসলামে যাকাতের বিধান, ড. ইউসুফ আল কারযাভী)। আগে একসময় ছিল যাকাত মানুষ একদম দিত না। এখন যারা ব্যবসায়ী, যারা শিল্পপতি তারা যাকাতের জ্ঞান উপলব্ধি (Awareness) বা প্রকৃতি (Nature) সম্পর্কে বুঝে গেছে। ফলে ভালো লক্ষণ হলো যারা এটা জানে তাদের অধিকাংশই এখন যাকাত দেন। তারা যতটুকু বোঝেন ততটুকুই দেন। এ ক্ষেত্রে তাদের উপলব্ধি আরো ব্যাপক হওয়া প্রয়োজন। আলিমদের দায়িত্বও অনেক। এসব ক্ষেত্রে দেখা যায়, আলিমরা অনেক পুরোনো বই পড়েছেন কিন্তু তাঁদের আধুনিক বইও পড়া প্রয়োজন।

'ইসলামে যাকাতের বিধান' - আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভীর এই বইটি পড়লে দেখা যায় যে, যাকাত কত বড় মাধ্যম এবং এর মাধ্যমে বিশ্বের কত সমস্যার সমাধান করা যায়। অর্থনীতির কত সমস্যার সমাধান করা যায়।

হাজার বছর মুসলিম শাসনের পর মুসলিম শাসনের পতন হলো। জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা পিছিয়ে পড়লাম। তারই ফলে আমরা সর্বক্ষেত্রেই পিছিয়ে পড়লাম। জ্ঞানের সাথে সাথে সামরিক ক্ষেত্রেও পিছিয়ে পড়লাম। কারণ



www.pathagar.com

মিলিটারী হার্ডওয়ার বা এর যে সুপিরিয়রিটি - তার পেছনে রয়েছে নলেজ। আবার টেকনোলজী তারও পেছনে রয়েছে নলেজ। এই জ্ঞানের দিক থেকে পিছিয়ে পড়ার কারণে আমরা সবদিক থেকে পিছিয়ে পড়লাম। ফলে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো (Colonial power) জোর করে আমাদের দেশ দখল করার সুযোগ পেয়ে গেল। আর তারা আমাদের দেশে এসে দুনিয়ার যত অবৈধ ব্যবসা সম্ভব তা শুরু করল। মদের ব্যবসা শুরু করল। আবার অন্যান্য সুদভিত্তিক কাজ কারবার চালু করল। পরবর্তীকালে সুদভিত্তিক ব্যাংক চালু করল। ফলে এই কলোনিয়াল প্রভাবের কারণে মুসলিম বিশ্ব ইসলামী অর্থনীতি থেকে অনেকটা দূরে সরে গেল। ব্যক্তিগত জীবনে তারা মুসলিম থাকল। যতটা সম্ভব ইসলামী কালচার থাকল। কিন্তু তা সত্ত্বেও অর্থনীতিতে অনৈসলামিক উপাদান বাড়তে লাগল।

এরপর আবার ইসলামের নব উত্থান ঘটে। The new rise of Islam- ইসলামের নতুন করে জাগরণ শুরু হলো। সেটা ঘটে গত একশ' বছর আগে। এরপর পঞ্চাশ ষাট বছর আগে বিভিন্ন দেশ স্বাধীন হতে থাকে। পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া স্বাধীন হলো। আস্তে আস্তে মুসলিম দেশগুলো স্বাধীন হলো। সবশেষে সোভিয়েত ইউনিয়নের অধীন যে সব মুসলিম দেশ ছিল তা স্বাধীন হয়ে গেল। এসব রাষ্ট্রের মধ্যে বহু লোকই ইসলামের জন্য কাজ করতে লাগলেন। ইসলামী আন্দোলনের উত্থান হলো। তারা ইসলামকে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন এবং নতুন করে ইসলামী আইন (Legislation) লেখা শুরু হলো। পাকিস্তানে অনেক ধরনের আইন হলো - যাকাতের উপর, উশরের উপর। এমনকি তারা নতুন প্যানাল কোড করলেন। সাক্ষ্য আইন (Evidence Act) করলেন। অন্যান্য আইনে ইসলামী ধারা সংযোজন করলেন। ইসলামী কন্সটিটিউশন করলেন। এভাবে ইরান, সুদানে একই ব্যাপার হলো। আবার মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়াতে কিছু হলো। এভাবে সকল মুসলিম দেশে কিছু না কিছু ইসলামী আইন হতে লাগল। বাংলাদেশেও কিছু হলো। শাসনতন্ত্রে কিছু ইসলামী ধারা যোগ হলো। যাকাত অর্ডিন্যান্স হলো। এর ফলাফল স্বরূপ ইসলামী ব্যাংকিং শুরু হলো। অর্থনীতির সবচেয়ে বড় একটা উপাদান বা টুল হচ্ছে ব্যাংকিং। এই ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমেই অর্থের (Money) আদান-প্রদান হয় এবং এরই মাধ্যমে অর্থনীতি গড়ে ওঠে। আমরা যদি ইসলামী ব্যাংকিংকে এগিয়ে নিতে পারি, ইসলামী ব্যাংকিং যদি জাতীয় ব্যাংকিং সিস্টেম হয়ে যায় তাহলে সুদ অটোমেটিক উঠে যাবে। আবার সুদের উপর মানুষের এমনিতেই আস্থা নেই। আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকেই বলতে পারি, মুসলিমরা সুদ চায় না, বাধ্য হয়েই সুদে জড়ায়।

ইসলামী ব্যাংকিং যদি সাকসেসফুল হয়, অনেক দেশে ইসলামী ব্যাংকিং মেজর ফ্যাক্টর হয় অথবা অধিকাংশ ব্যাংক ইসলামিক হয়ে যায় তাহলে সুদ ক্রমে দূর হয়ে যাবে বলে আমরা ধরে নিতে পারি।



www.pathagar.com

নতুন যুগে এই ইসলামী ব্যাংকিংয়ের যে প্রয়োগ শুরু হলো তা ইসলামী অর্থনীতিতে একটা বড় ভূমিকা পালন করেছে। প্রায় সকল মুসলিম দেশেই এখন ইসলামী ব্যাংক হয়ে গেছে। প্রায় তিনশ'র বেশি ইসলামী ব্যাংক তাদের অনেক শাখা নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কাজ করছে। এই ব্যাংকগুলো আরো ব্যাপক হচ্ছে। এতে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলামী ব্যাংকিং সফল হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকগুলো সুদমুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালুর চেষ্টা করছে। এছাড়াও তারা ইসলামের যে সামাজিক অর্থনৈতিক লক্ষ্যাবলী (Socio-economic objectives) তা কার্যকর করার জন্য চেষ্টা শুরু করেছে।

এসব লক্ষ্যের মধ্যে আছে মানুষের প্রয়োজনকে পূর্ণ করতে হবে, সুবিচার করতে হবে এবং তা যদি করতে হয়, মানুষের চাহিদা পূর্ণ করতে হয় তাহলে অনেক কিছুই আমাদের করতে হবে। এরমধ্যে অন্যতম একটা হলো পূর্ণ কর্মসংস্থান (Full employment)। অর্থনীতিকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে মানুষের পূর্ণ কর্মসংস্থান হয়। কর্মসংস্থান হলে আয় হবে আর আয় হলে তাদের চাহিদা পূর্ণ হবে। আমরা যদি তাই কাজের বা নিয়োগের ব্যবস্থা না করতে পারি তাহলে আয় হবে না -আর আয় না হলে চাহিদাও অপূর্ণ থেকে যাবে, প্রয়োজনও পূর্ণ হবে না। মানুষ সমাজের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে আর সেটা ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য নয়। ইসলামী অর্থনীতি চায়, যেসব লোক কোনোভাবেই কাজ জোগাড় করতে পারছে না (যেমন সে অসুস্থ বা অতি বৃদ্ধ বা বিধবা এরকম অন্যান্য অসুবিধা যাদের আছে) সেসব ব্যক্তিকে তার পরিবার প্রথমত চালাবে। আর যদি তা সম্ভব না হয় আত্মীয়-স্বজন তারাও করবে। আর যদি তা না করতে পারে, তাহলে তা রাষ্ট্র করবে। এছাড়া ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে রোজগার করবে, ভালো রোজগার করবে। অর্থনীতিতে সফল হতে হবে। সে রোজগার করতে পারবে এবং সেই রোজগারের ভিতর তাকে চলতে হবে।

এসব করতে গেলে আজকের যুগে সমস্ত মুসলিম বিশ্বে রুরাল ইকোনমি (Rural economy) গড়ে তুলতে হবে। কারণ জনগণের একটা বিরাট অংশ, কোনো কোনো মুসলিম রাষ্ট্রে আশিভাগ - গ্রামে বাস করে। কোথাও ষাট ভাগ আবার কোথাও ত্রিশ বা চল্লিশ ভাগ গ্রামে বাস করে। আরব দেশের কোথাও দশ বা বিশ ভাগ গ্রামে বাস করে। পাকিস্তানে ষাট বা পঁয়ষট্টি ভাগ লোক গ্রামে বাস করে। বাংলাদেশের মত রাষ্ট্রে সত্তর ভাগ লোক গ্রামে বাস করে। এসব কারণে আমাদের রুরাল অর্থনীতিকে গড়ে তুলতে হবে। আমাদেরকে গ্রামীণ অর্থনীতি; এগ্রিকালচারকে গড়ে তুলতে হবে। শুধু ইন্ডাস্ট্রি করলে চলবে না। ইন্ডাস্ট্রি করতে হবে কিন্তু কৃষিকে আমাদের গড়ে তুলতে হবে, যাতে গ্রামীণ জনগণের আয়-রোজগারের ব্যবস্থা উন্নত হতে পারে।

তেমনিভাবে শহরাঞ্চলকে যদি সামনে রাখি তাহলে বড় ইন্ডাস্ট্রি তো করতেই হবে। সাথে ছোট ইন্ডাস্ট্রিও করতে হবে। কারণ ছোট ইন্ডাস্ট্রি করতে



www.pathagar.com

পারলেই বেশি কর্মসংস্থানকে নিশ্চিত করা যায়। সেই সাথে আত্মকর্মসংস্থানের (Self employment) সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। এগুলো ব্যাপকভাবে করতে হবে। এসব কাজ বিভিন্ন এনজিও করতে পারে। সমাজ সাহায্য করতে পারে। আমরা একে অপরকে সাহায্য করতে পারি। ব্যাংকিং সিস্টেমের একটি অংশ এ কাজে ব্যয় হতে পারে। সরকারও এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

এভাবে আমরা ইসলামের সামাজিক লক্ষ্যগুলো - নীড ফুলফিলমেন্ট (Need fullfilment), জাস্টিস (Justice) যদি করতে পারি তাহলেই একটা সংঘাতমুক্ত সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব হবে। শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠন করা সম্ভব হবে।

ইসলামী অর্থনীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রেও সমস্যা আছে। আমাদের দেশেই শুধু নয়, প্রত্যেক মুসলিম দেশেই যারা সমাজ চালাচ্ছেন - তাদের মধ্যে ইসলামের জ্ঞানের অভাব রয়েছে। এগুলোকে দূর করতে হবে। মানুষের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে নানা কারণে, নানা ভীতি রয়েছে - যেহেতু ইসলাম খুব কঠিনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। সে ভীতিগুলো দূর করতে হবে। তাহলেই আমাদের যে এলিট শ্রেণি, উচ্চ শ্রেণি বা সবচেয়ে শিক্ষিত শ্রেণি, তারা ভয়মুক্ত হবে। তারা তখন ইসলামের প্রয়োগের ব্যাপারে আগ্রহী হবে।

তেমনিভাবে পাশ্চাত্য এ ব্যবস্থা চায় না - সে সমস্যাও রয়েছে। আবার তারা তাদেরটা বাদ দিয়ে আমাদেরটাই বা চাইবে কেন? সে ক্ষেত্রেও সমাধান কঠিন। কিন্তু আমরা যদি যোগ্য হয়ে উঠি - আমরা যদি আমাদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারি, আমরা যদি সবাই শিক্ষিত হয়ে যাই, আমরা যদি আমাদের অর্থনীতিকে গড়ে তুলতে পারি; আমরা যদি আমাদের সম্পদকে (Resource) ব্যবহার করতে পারি তাহলে পাশ্চাত্যের কাছে আমরা তত দায়বদ্ধ থাকব না। আর আমরা যদি তাদের কাছে দায়বদ্ধ না থাকি তাহলে পাশ্চাত্যের সাথে সংঘাত না করেও আমরা আমাদের পদ্ধতি ফলো করতে পারবো। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এটা স্বীকার করতেই হবে, মুসলিম দেশগুলোতে নানা রকম ডিক্টেটরশিপ (Dictatorship) রয়েছে, রাজতন্ত্র রয়েছে। এগুলো সহায়ক নয়। এগুলো ইসলামিকও নয়। আমাদেরকে আল্লাহর আইনের অধীনে জনগণের সরকার, যেটাকে আমরা শূরাভিত্তিক শাসন বলি বা যেটাকে আমরা গণতন্ত্র বলি সেটাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

হিউম্যান রাইটস (Human rights) প্রতিষ্টিত করতে হবে। সকল মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। জবাবদিহিতামূলক (Accountable) সরকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এসব কথাই ইসলামী চিন্তাবিদগণ বলেছেন। এগুলো যদি আমরা করতে পারি তাহলে আমাদের অর্থনীতি শক্তিশালী হবে। ডিক্টেটরের অধীনে কোনো কোনো সময় সাময়িকভাবে উন্নতি হয়। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী (Long-term) ডিক্টেটরের অধীনে কল্যাণমুখী অর্থনীতি গড়ে ওঠে না।



www.pathagar.com

আমরা সামনের দিকে লক্ষ্য করলে দেখি, যদি ইসলামের সংকটগুলো, দারিদ্র্যের সংকট, শিক্ষার সংকট, পাশ্চাত্য শক্তির সঙ্গে আমাদের যে সংঘাত - এই সংঘাতগুলোকে আমরা যদি কাটিয়ে উঠতে পারি, আমরা যদি আমাদের নিজেদের যে দুর্বলতাগুলো রয়েছে, আমাদের মধ্যে যে অতি গোঁড়ামী রয়েছে, কোথাও কোথাও যার কোনো ইসলামী ভিত্তি নেই - সেগুলো যদি আমরা দূর করতে পারি; আমরা যদি একটা Balanced understanding of Islam অর্জন করতে পারি, আমরা যদি সামঞ্জস্যপূর্ণ উপলব্ধি (ফিকাহ) অর্জন করতে পারি - তাহলে আমি মনে করি, ইসলামী অর্থনীতি ক্রমাগতভাবে শক্তিশালী হতে থাকবে।

এর জন্য ইসলামী জ্ঞানের ব্যাপক বিস্তার করা দরকার। ইসলামী সাহিত্যের ব্যাপক বিস্তার করা দরকার। ইসলামের যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে ওঠা দরকার। ইসলামী আন্দোলনগুলোকে আরো যোগ্য হওয়া দরকার। এসব যদি করা সম্ভব হয় তাহলে মুসলিম বিশ্ব ক্রমাগতভাবে ইসলামী অর্থনীতির নিকটে চলে আসবে। তাহলে মুসলিম বিশ্ব থেকে সুদ উঠে যাবে। অবৈধ ব্যবসা উঠে যাবে, জালিয়াতি কমে যাবে। ভেজাল, মিথ্যা, ধোঁকাবাজি কমে যাবে - যদিও রাস্তা যে দুর্গম তা অস্বীকার করা যায় না। এর জন্য অনেক পরিশ্রম দরকার, অনেক প্রচেষ্টা দরকার - সেগুলোকেও অস্বীকার করা যায় না।



www.pathagar.com

# ইসলামী অর্থনীতি ও তার বাস্তবায়ন

বিশেষজ্ঞদের ব্যাপক গবেষণার ফলে 'ইসলামী অর্থনীতি' বিষয়টি একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ নিয়েছে। অবশ্য প্রত্যেক বিষয়েরই বিকাশ হতে থাকে এবং ইসলামী অর্থনীতিও ভবিষ্যতে বিষয় হিসেবে ব্যাপক বিকাশ হবে বলে আশা করা যায়।

ইসলামী অর্থনীতির বিষয়বস্তু (Scope) নিয়ে কিছু অস্পষ্টতা আছে। সাধারণভাবে ইসলামী অর্থনীতি বলতেই 'যাকাত' ও 'সুদ' সংক্রান্ত আলোচনা, খুব বেশি হলে ইসলামী ব্যাংক সংক্রান্ত আলোচনাকে বোঝা হয়। কিন্তু এ ধারণা সঠিক নয়। অর্থনীতির তত্ত্বগত ও প্রয়োগ সংক্রান্ত সকল বিষয়ই ইসলামী অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়। ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য হচ্ছে জনকল্যাণ, সুবিচার প্রতিষ্ঠা, দারিদ্র্য নিরসন, নির্যাতিত ও বঞ্চিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠা, সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার ও যথাযথ বণ্টন। ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য অর্জনের জন্য ইসলাম একটি ইসলামী মূল্যবোধভিত্তিক স্বাধীন অর্থনীতি কায়েম করতে চায় যাতে উৎপাদনের, ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাধীনতা থাকবে, যেখানে শ্রমিকের অধিকারের দিকে বিশেষ নজর দেয়া হবে, যেখানে বিনিয়োগ হবে প্রধানত অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে (মুদারাবা ও মুশারাকা), যেখানে অভাবগ্রস্তদের সমস্যা দূর করার জন্য যাকাত ও অন্যান্য সম্পদ ব্যবহার করা হবে। অর্থাৎ ব্যাপক উৎপাদন বৃদ্ধি, যথাযোগ্য বণ্টন ও জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমেই ইসলাম তার অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জন করবে। এ প্রেক্ষিতে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, 'ইসলামী অর্থনীতি' বিষয়ে (Subject) উৎপাদন, বণ্টন, ব্যবসা, বাণিজ্য, বিনিয়োগ এসব এবং এগুলোর থিওরী অন্তর্ভুক্ত হবে। এসব থিওরী না বুঝে কেউ উৎপাদন, বণ্টন, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ প্রক্রিয়া ভালো করে সম্পন্ন করতে পারবে না। সুতরাং Micro ও Macro economics-এর সকল বিষয়ই ইসলামী অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং তা পড়তে হবে। অবশ্য থিওরীর সকল ক্ষেত্রে না হলেও অনেক ক্ষেত্রে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হতে হবে এবং তা ইসলামী অর্থনীতিবিদগণ তাদের বইয়ে আলোচনাও করেছেন। অর্থনীতির অধিকাংশ থিওরীকে পুঁজিবাদের অংশ মনে করা একেবারে অসঙ্গত। এগুলো হচ্ছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ ধরনের তত্ত্ব, যেমন Theories of price, firm, trade - যা সকল চিন্তাধারাতেই ব্যবহার করা যায়। উপরের আলোচনায় পরিষ্কার হলো যে, ইসলামী অর্থনীতির Scope



www.pathagar.com

বিশাল। ইসলামী বাজার ব্যবস্থার স্বরূপ সম্পর্কেও কিছু বিভ্রান্তি আছে। ইসলাম বাজার ব্যবস্থাকে স্বীকার করে এবং গুরুত্ব দেয়।

বাজার (Market)-এর মাধ্যমে চাহিদা (Demand), ভোক্তার পছন্দ (Preference) বোঝা যায়। সে মোতাবেক উৎপাদনও যোগান দেয়া যায়। চাহিদা ও যোগান দ্বারা মুল্য বা Price নির্ধারিত হয়ে থাকে। ইসলামের শুরুতে যে অর্থনীতি বিরাজ করছিল তাতে দেখা যায় যে উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয়, বিনিয়োগ ও মূল্য নির্ধারণ স্বাধীনভাবে হতো, যদিও তা ইসলামের হালাল ও হারামের নীতির অধীন ছিল। এটাকে স্বাধীন বাজার ব্যবস্থা বলতে হয়।

কিন্তু ইসলাম আমাদেরকে বাজারের দাস (Servant) হতে বলেনি। বাস্তবক্ষেত্রে আমাদেরকে ইসলামের অন্যান্য নীতিমালাও অনুসরণ করতে হবে। যেমন বাজারের নামে শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি না দেয়া চলবে না। শ্রমিককে বাঁচার মতো মজুরি দিতে হবে। পুরাতন পুঁজিবাদের সময়ে বাজারের নামে শ্রমিককে বঞ্চিত করা হতো, তাদের উপযুক্ত মজুরি দেয়া হতো না। যার ফলে সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব উদ্ভাবিত হয় আর নানা দেশে রক্তাক্ত বিপ্লব সংগঠিত হয় এবং বিশ্বের অনেক দেশ প্রায় ৮০ বছর একধরনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাসত্বে বাস করে। ইসলাম এ ধরনের নীতি সমর্থন করে না। ইসলাম আমাদেরকে আবদুল্লাহ (আল্লাহর দাস) হতে বলে, বাজারের দাস (আবদুল মার্কেট) হতে বলে না। বাজার অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু শ্রমিক ও বঞ্চিতদের অধিকার সমানভাবে বরং বেশি গুরুত্বপূর্ণ। শ্রমিক ও কর্মচারীকে ন্যায্য মজুরি দিয়ে যেসব প্রতিষ্ঠান টিকে থাকতে পারে, কেবল সেগুলো Long-term টিকে থাকবে। যারা তা পারে না, তাদেরকে তাদের বিনিয়োগকে নতুন ক্ষেত্রে সরিয়ে নিতে হবে, যাতে তারা ন্যায্য মজুরি দিয়েও টিকে থাকতে পারে। ইসলামের সঠিক নীতিমালা এটাই।

কেউ কেউ প্রশ্ন করেন, বাংলাদেশে ইসলামী প্রশাসন হলে কি দ্রুত অবস্থার উন্নতি হবে? এ প্রশ্নের উত্তর কঠিন; এটা নির্ভর করবে ইসলামী প্রশাসনের যোগ্যতার উপর। যদি তারা যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেন তবে কর না বাড়িয়েও একই টাকা সদ্ব্যবহার করে অধিকতর কাজ করতে পারবেন। ইসলামী প্রশাসন হলে উচ্চপর্যায়ে দুর্নীতি দূর হবে যার ফল নিচের দিকেও যাবে। তারা যাকাত বাধ্যতামূলকভাবে আদায় করে কয়েক বছরের মধ্যে acute poverty দূর করতে পারবেন বলে মনে করি। তবে সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে সময় লাগবেই। রাজস্ব বাজেট বা উন্নয়ন বাজেটে বিভিন্ন খাতে যে ধরনের বরাদ্দ আছে তাতে তেমন পরিবর্তনের অবকাশ নেই। আসলে প্রায় সব খাতেই আরো বরাদ্দ প্রয়োজন অথচ সে পরিমাণ অর্থ আমাদের হাতে নেই। কর ফাঁকি রোধ, প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। এসব ক্ষেত্রে উন্নতি করা সম্ভব হলে কর রাজস্ব বৃদ্ধি, বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করে উন্নয়ন দ্রুততর করা সম্ভব হবে।



www.pathagar.com

# ইসলামী অর্থনীতি ঃ কিছু দিক

মানব জীবনে অর্থনীতির গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমান যুগে অর্থনৈতিক সমস্যাকেই সবচেয়ে বড় সমস্যা মনে করা হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের উপর ইসলামী দাওয়াতের অগ্রগতি নির্ভরশীল। কেননা দারিদ্র্য জর্জরিত জনগণ ইসলামের দাওয়াত বোঝার অবকাশই পায় না। এ জন্য ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতিগুলো নির্ধারণ এবং সে আলোকে বিশদ বিধান (Laws and regulations) তৈরি করা বিশেষ জরুরি। নব্য স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের অর্থনৈতিক বিকাশ যেন ইসলামের আলোকে হতে পারে, সে জন্য ইসলামী অর্থনীতিবিদ ও মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের প্রশাসকদের বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

এ গুরুত্বপূর্ণ কাজে কিছু মনীষী ও সংস্থা গত দুই দশকে অনেক মূল্যবান কাজ করেছেন। সংস্থাসমূহের মধ্যে আমেরিকার Association of Muslim Social Scientists, International Centre for Islamic Economics, Jeddah-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। বাংলাদেশে Bangladesh Islamic Bankers Association ও Islamic Economic Research Bureau বেসরকারি পর্যায়ে কিছু কাজ করছে।

এ প্রসঙ্গে ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে সাধারণভাবে যেসব ভুল ধারণা রয়েছে তা দূর করা দরকার। অনেকের ধারণা, ইসলামী অর্থনীতি মানে চৌদ্দশ' বছর পূর্বে আরব দেশে যে অর্থব্যবস্থা চালু ছিল তার পুনরুজ্জীবন করা। কিন্তু এ ধারণা মোটেই সঠিক নয়। যারা ইসলামী অর্থনীতি কায়েম করতে চান, তারা কোনো বিগত দিনের অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চান না। বর্তমান সময়ে ইসলামী অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হলে তা আধুনিকই হবে এবং সে ব্যবস্থায় আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি, প্রযুক্তি বিদ্যা (Technology) ও সংগঠনের (Methods of organization) নিয়মই অবলম্বন করা যাবে। এ কথা মনে করা ভুল হবে যে, উৎপাদন ও সংগঠন পদ্ধতি এবং প্রযুক্তি বিদ্যা কোনো বিশেষ আদর্শের উপযোগী। প্রকৃতপক্ষে যে কোনো অর্থনীতিতেই এসব উদ্ভাবন ও পদ্ধতিকে সমভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। আদর্শিক অর্থব্যবস্থা বলতে কি বোঝায় বা ইসলামী অর্থনীতি বলতে আমরা কি বুঝতে চাই তাও পরিষ্কার করা দরকার। অনেকে বলে থাকেন, ইসলামের কোনো



www.pathagar.com

অর্থব্যবস্থা নেই এবং একটি চিরন্তন নৈতিক আদর্শ হিসেবে ইসলামী অর্থব্যবস্থা থাকাও উচিত নয়। যদি ব্যবস্থা (System) বলতে অর্থনীতির প্রতিটি দিকের বিস্তারিত ও নির্দিষ্ট নিয়মাবলী বোঝানো হয় তাহলে অবশ্য বলা যেতে পারে যে, ইসলামে কোনো অর্থব্যবস্থা নেই। কিন্তু ব্যবস্থা (System) বলতে কতকগুলো মূলনীতি ও মূল্যবোধও বোঝানো যেতে পারে যা একটিকে অন্যটি হতে পৃথক করে থাকে। মূলনীতি বা মূল্যবোধের দৃষ্টিতেই অর্থনৈতিক অবাধ স্বাধীনতাকে (Laissez-faire) পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে এবং সামাজিক মালিকানাকে সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য মনে করা হয়েছে। ইসলামে সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদ থেকে অনেক বেশি বিস্তারিত অর্থনৈতিক নিয়মাবলী রয়েছে। কাজেই ইসলামী অর্থব্যবস্থা থাকতে পারে না বলা অত্যন্ত অযৌক্তিক। ইসলামী অর্থনীতির ইসলামিত্ব (Islamicness) হচ্ছে তার মূল্যবোধ এবং তার প্রয়োগনীতিতে। অর্থনীতি বিষয়ে কয়েকটি প্রধান ইসলামী মূলনীতি হচ্ছে সুদ নিষিদ্ধকরণ, সম্পত্তির মালিকানা সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি, দুস্থদের জন্য সামাজিক ব্যবস্থা (যাকাত), ব্যবসা ও জীবিকা অনুসন্ধানের অধিকার, অর্থ ও সম্পদ জমাকরণের (Concentration) বিরুদ্ধে শক্ত মনোভাব, ইসলামের মিরাসি ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতির প্রতিরোধ (আমরু বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার)। আমরা পরে দেখতে পাব যে, ইসলামী রাষ্ট্র নাহি আনিল মুনকার (দুর্নীতির প্রতিরোধ)-এর ক্ষমতা প্রয়োগ করে সমকালীন সব অর্থনৈতিক জুলুম ও অনাচার প্রতিরোধ করতে সক্ষম।

এ প্রসঙ্গে আরো একটি বিষয় পরিষ্কার করা দরকার। অনেকে মনে করেন যে কোনো সমস্যার কেবল একটিই ইসলামী সমাধান হতে পারে। কিন্তু এ ধারণা সঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন ইসলামী রাষ্ট্র একই সমস্যাকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে সমাধান করতে পারে। কোনো লেখকের পক্ষে ইসলামী অর্থনীতির বিশদ বিধান (details) রচনা করে সেটিকে একমাত্র মডেল বা চূড়ান্ত মনে করা নিঃসন্দেহে অযৌক্তিক দাবি। কেননা কুরআন ও সুন্নাহর মূল পাঠ (text) থেকে পাওয়া বিধানের অতিরিক্ত বিশদ বিধান তৈরি করার জন্য লেখকরা যে ইজতিহাদ করবেন তাতে ব্যাপক মতপার্থক্য হতে পারে। সুতরাং গত হাজার বছরের অর্থনৈতিক বিবর্তন ও বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদেরকে ইসলামী অর্থনীতির বিশদ মডেল তৈরি করতে গিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে মতপার্থক্যের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। যেসব ক্ষেত্রে এসব মতপার্থক্য দেখা দেয়ার সম্ভাবনা বেশি তার মধ্যে ভূমি সংস্কার, অর্থনীতিতে সরকারি ভূমিকা, সুদবিহীন অর্থনীতির সঠিক মডেলের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ইসলামী চিন্তাবিদদের এসব মতপার্থক্য সম্বন্ধে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য ঐক্যের গুরুত্ব লাঘব করা নয়। তবে ঐক্য ও সমঝোতা কেবল পরেই বিতর্কের মধ্যে আসতে পারে, পূর্বে নয়।



www.pathagar.com

## অর্থনীতিতে সুদের প্রভাব

সামাজিক সুবিচার বা আদল প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা বা অর্থনীতির প্রধান লক্ষ্য। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের সব শিক্ষার উদ্দেশ্যই সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। সামাজিক সুবিচার কায়েম করার জন্যই ইসলামে সুদকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আল্লাহ পাক কুরআন মজিদে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে সুদকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেনঃ

> সুদখোরদের অবস্থা হলো সেই ব্যক্তির ন্যায়, যাকে শয়তান তার নিজ প্রভাব দ্বারা মস্তিষ্ক বিকৃত করে দিয়েছে। এর কারণ হলো এই যে, তারা বলে, ব্যবসা ও সুদ একই ধরনের। অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সুদকে হারাম করেছেন। যারা আল্লাহর আদেশ মোতাবেক এরপর সুদী কারবার হতে বিরত হবে, তারা পূর্বে যা নিয়েছে, তা তাদেরই থাকবে। এ ব্যাপারে তাদের সমস্যা আল্লাহর নিকট সোপর্দ কিন্তু যারা এ আদেশের পরেও সুদী কারবার করবে তারা জাহান্নামী, জাহান্নামেই তারা চিরকাল থাকবে।
>
> (আল বাকারা: আয়াত ২৭৫)

> হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক তবে সুদ বাবদ যা পাওনা আছে, তা ছেড়ে দাও। যদি তোমরা তা না করো, তবে তোমাদের আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার ঘোষণা দেয়া হচ্ছে। আর যদি তোমরা তওবা করো তবে তোমরা নিজেদের আসল মূলধন ফেরত পাবে। কারো ওপর জুলুম করো না, তোমাদের উপরও জুলুম করা হবে না।
>
> (আল বাকারা: আয়াত ২৭৮-২৭৯)

সূরা আল ইমরানে রয়েছেঃ

> হে ঈমানদারগণ! দ্বিগুণ, চতুর্গুণ সুদ খেয়ো না। দুনিয়া ও আখিরাতে মুক্তি পাবার নিমিত্ত আল্লাহকে ভয় করতে থাক।
>
> (আল ইমরান: আয়াত ১৩০)

এখানে দ্বিগুণ, চতুর্গুণ সুদের উল্লেখের অর্থ এই নয় যে, দ্বিগুণ, চতুগুর্ণ সুদ না হলে তা বৈধ হবে। তা হতে পারে না। এটা সূরা বাকারার আয়াতসমূহ হতে স্পষ্ট হয়। এখানে আরবে সে সময় যা কিছু বাস্তবে ঘটতো তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

সুদবিহীন অর্থব্যবস্থা কোনো নতুন বিষয় নয়। আগেও একবার ইসলামের প্রথম যুগে অর্থনীতিকে সুদমুক্ত করা হয়েছিল। ইসলাম-পূর্ব যুগে আরব দেশে অর্থনীতি সুদের ভিত্তিতে পরিচালিত হতো। সব ব্যবসায়ীক ও ব্যক্তিগত লেনদেন সুদের ভিত্তিতে হতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদীন অর্থনীতিকে সুদবিহীনভাবে গড়ে তোলেন। সুতরাং



www.pathagar.com

আমাদের জন্য সুদহীন অর্থ-ব্যবস্থা নতুন কিছু নয় বরং আমরা জানি যে, এর মডেল ইতিহাসে ছিল। আমাদের কাজ হচ্ছে সুদবিহীন অর্থ ব্যবস্থাকে নতুনভাবে পুনঃপ্রবর্তন করা।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অষ্টম শতাব্দী হতে শুরু করে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী অর্থনীতি সুদ ছাড়াই পরিচালিত হতো। কেননা সে সময় মুসলিম বিশ্বই সবচেয়ে উন্নত ছিল; কেবল জ্ঞান-বিজ্ঞানে নয়, ব্যবসা-বাণিজ্যেও। সর্বোপরি পাশ্চাত্য হতে যেসব পণ্য প্রাচ্যে আসতো তার পথও (Trade route) ছিল মুসলিম বিশ্বের ভেতর দিয়েই। কেননা পাশ্চাত্য তখনো অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। ইউরোপীয় সভ্যতার বিকাশ আরো পরে শুরু হয়েছিল। মুসলিম অর্থনীতি তখন ইসলামের ভিত্তিতে সুদ ছাড়া পরিচালিত হতো; কেননা মুসলিম বিশ্বের আইন ব্যবস্থা ছিল তখন ইসলামী ফিকাহ্। যদিও খেলাফতের নামে বাদশাহী তখন কায়েম ছিল, তথাপি ইসলামী আইনের ভিত্তিতেই সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালিত হতো। যদি অষ্টম শতাব্দী হতে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত অত্যন্ত উন্নত এক অর্থনীতি সুদ ছাড়া চলতে পারে তবে আজও সুদ ছাড়া একটি সমৃদ্ধ ও উন্নত অর্থনীতি পরিচালনা করা যে সম্ভব, এতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না।

এরপর আমি সুদভিত্তিক অর্থনীতির মন্দ প্রভাব সংক্ষেপে আলোচনা করব। লাভ হোক বা না হোক, ঋণদাতা কর্তৃক ঋণগ্রহীতার নিকট হতে নির্দিষ্ট হারে সুদ দাবি করা নিঃসন্দেহে একটি জুলুম। এর ফলে অনেক ঋণগ্রহীতার অর্থনৈতিক ভরাডুবি ঘটে যা সমাজের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করে থাকে। অনেকে মনে করতে পারেন যে, আজকাল ব্যাংকে যারা টাকা জমা রাখেন, তারা ব্যাংক হতে সুদ পেয়ে থাকেন এবং এ সুদ দেয়ার ফলে ব্যাংকের কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। কিন্তু এ ধারণা সঠিক নয়; কেননা ব্যাংক যে সুদ জমাকারীদের দিয়ে থাকে তার দ্বিগুণ সুদ ঋণগ্রহীতার উপর চাপিয়ে দেয়। এ পরিস্থিতিতে ঋণগ্রহীতা ব্যবসায়ী বা শিল্পপতি যদি মন্দার সম্মুখীন হয়, তবে সে আর সুদসহ ঋণ পরিশোধ করতে অনেক সময় সক্ষম হয় না। ফলে ব্যাংক ঋণগ্রহীতার শিল্প বা বন্ধক দেয়া বাড়ি ও সম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ করে থাকে। এভাবে সুদ ব্যবস্থার কারণে অনেকের সর্বনাশ হয়ে থাকে। কাজেই সুদ যে ইনসাফের সম্পূর্ণ খেলাফ, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

এ সুদের কারণেই দ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিক রকম চড়া হয়ে থাকে। সুদবিহীন ব্যবস্থায় উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ী উৎপাদন খরচের উপর স্বাভাবিক মুনাফা যোগ করে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে থাকে। কিন্তু সুদী অর্থনীতিতে সুদও মূল্যের উপর যোগ করা হয়। কাজেই অধিকাংশ দ্রব্যের ওপর কেবল সুদের কারণেই জনগণকে অতিরিক্ত দাম দিতে হচ্ছে। সুদী ব্যবস্থার আর একটি ভয়াবহ দিক হচ্ছে এই যে, এর ফলে পুঁজি সামান্যসংখ্যক লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ার সুযোগ পায়, যা



www.pathagar.com

কুরআনের শিক্ষার সম্পূর্ণ খেলাফ। পুঁজির এ পুঞ্জিভূত হওয়া কোনো চেষ্টা তদবীরের ফল নয়। সুদের এটি একটি বৈশিষ্ট্য যে, হাত গুটিয়ে বসে থাকা একটি শ্রেণিকে এ ব্যবস্থা শ্রম ছাড়া সম্পদ বৃদ্ধির এক সুবর্ণ সুযোগ করে দেয়। যে কেউ প্রচুর বিত্ত-সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে বা অন্য কোনো সূত্রে পেয়ে গেলে সুদের বদৌলতে টাকা ব্যাংকে রেখে বিনা পরিশ্রমে সম্পদ বৃদ্ধি করতে পারে। ফলে এ শ্রেণির লোকদের মধ্যে অকর্মন্যতা, বিলাসিতা ও দুষ্কর্মের প্রসার দেখা দেয়। আর যে সম্পদ সে এভাবে পেয়ে থাকে তা সবই সমাজের দরিদ্র শ্রেণির লোকদের ঘর্ম ও রক্তধারা নিঃসৃত। এমনিভাবে দু'টি ভয়াবহ সামাজিক ব্যাধি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে যার একটি হচ্ছে, পুঁজি অপরিমিত ও অস্বাভাবিকভাবে জমা হতে থাকা, অপরটি হচ্ছে, ধনী-গরীবদের মধ্যে অস্বাভাবিক শ্রেণি পার্থক্য সৃষ্টি হওয়া। এতে সামাজিক শান্তি নষ্ট হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দেয়। মালের জমা হওয়া সম্বন্ধে জার্মানির প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডক্টর সাখত, যিনি জার্মানির রাইখ ব্যাংকের গভর্নর ছিলেন, এলজেবরার একটি হিসাব দ্বারা প্রমাণ করেন যে, সুদী ব্যবস্থায় দুনিয়ার সমগ্র ধন-দৌলত একটি সুদখোর শ্রেণির হাতে চলে যেতে বাধ্য। এর কারণ হচ্ছে সুদের ভিত্তিতে ঋণদাতা সর্বদাই লাভবান হয়ে থাকে আর গ্রহীতা হয়ে থাকে কখনো লাভবান, কখনো ক্ষতির সম্মুখীন। (সাইয়েদ কুতুব শহীদ, ইসলাম ও সামাজিক সুবিচার, পৃ: ৩৫৪)।

অথচ শরীকদারী নীতি ও মুনাফার ভিত্তিতে যে অর্থনীতি গড়ে উঠবে তাতে একটি শ্রেণির হাতে পুঁজি ক্রমাগত জমা হতে থাকার বা কর্মবিমুখ একটি শ্রেণি গড়ে ওঠার কোনো সম্ভাবনা থাকে না।

সুদের অন্য এক মারাত্মক দিক হচ্ছে, এর ফলে অর্থনীতিতে বারবার মন্দা ও তেজীভাবের আবর্তন হতে থাকে (Business cycle) যার ফলে অর্থনীতিতে সব সময় অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা বিরাজ করে। অর্থনীতিতে যখন তেজীভাব থাকে, তখন সুদের হার বৃদ্ধি পেতে থাকে। এভাবে যখন সুদের হার অতিরিক্ত বৃদ্ধি পায় তখন ঋণগ্রহীতা যদি হিসাব করে দেখে যে, অতিরিক্ত সুদের হারের কারণে লাভের সম্ভাবনা কম, তখন সে আর ঋণ নিতে চায় না। এর ফলে পুঁজি খাটানোতে ভাটা পড়ে, উৎপাদন কমে যায়, শ্রমিক ছাঁটাই হয় এবং সাধারণভাবে ব্যবসায় মন্দাভাব দেখা দেয়। এরপর আবার যখন ব্যাংক দেখতে পায় যে, পুঁজির চাহিদা কমে গেছে, তখন অপারগ হয়ে আবার সুদের হার কমিয়ে দেয়। তারপর ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি নতুন করে পুঁজি নিয়ে বিনিয়োগে আত্মনিয়োগ করে। এমনিভাবে অর্থনীতিতে ক্রমাগতভাবে মন্দা ও তেজীভাব সৃষ্টি হতে থাকে। এ পরিস্থিতি যে অর্থনীতি ও জনকল্যাণের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর, তাতে কোনোই সন্দেহ থাকতে পারে না। সুদী ব্যবস্থার অন্য একটি বিপদজনক দিক হচ্ছে এ ব্যবস্থায় ফটকাবাজারী (Speculation) উৎসাহিত হয়। অন্যদিকে মুনাফার ভিত্তিতে যে ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে ব্যবস্থা গড়ে ওঠে তাতে ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে অতিরিক্ত সতর্কতা গ্রহণ করা হয়। এ ব্যবস্থায়



www.pathagar.com

জামানত (Security) দেয়াই যথেষ্ট নয়, লাভের নিশ্চয়তাও থাকতে হবে। কিন্তু সুদী অবস্থায় জামানত দিতে সক্ষম হলেই অন্য সতর্কতার কোনো প্রয়োজন নেই। আজকাল কেন্দ্রীয় ব্যাংক কোনো ক্ষেত্রে ঋণ না দেয়ার যে নির্দেশ দিয়ে থাকে তা খুব কমই পালিত হয় এবং এসব ফাঁকি দিয়ে ফটকাবাজারীর জন্য ঋণ নেয়া বিশেষ কঠিন হয় না। কেননা, যেহেতু সুদী ব্যবস্থায় জামানতকেই যথেষ্ট মনে করা হয়, সে জন্য বাস্তবে টাকার কি ব্যবহার হচ্ছে তার উপর নজর রাখা হয় না। ফলে সুদী ব্যবস্থার আড়ালে বিশেষ করে বিভিন্ন পণ্য মওজুদের মাধ্যমে ফটকাবাজারী কায়েম হয়ে থাকে যা দ্রব্যমূল্য ও অর্থনীতিকে অস্বাভাবিকভাবে প্রভাবিত করে জনসাধারণের দুর্দশার কারণ হয়।

অর্থনীতির উপর সুদের খারাপ প্রভাব খুব সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদীর 'সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং' এবং আনোয়ার ইকবাল কোরেশীর 'ইসলাম এন্ড দি থিওরী অব ইন্টারেস্ট' পুস্তক দুইটি দেখা যেতে পারে।

অর্থনীতিতে সুদ কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে না। ১৯৩৫ সালে কিনস (Keynes)-এর The General Theory of Income, Employment and Interest পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মনে করা হতো যে, সুদ হচ্ছে সঞ্চয়ের মূল কারণ। কিন্তু কিনস দেখিয়ে দিয়েছেন যে, সঞ্চয়ে সুদের কোনো ভূমিকা নেই। সব আধুনিক অর্থনীতিবিদই আজ তা সত্য বলে মনে করেন।

বর্তমানে সুদ কেবল ঋণদান ও ঋণগ্রহণের একটি ভিত্তি হিসাবে কাজ করছে এবং এ ভিত্তিতেই ঋণ দেয়া নেয়া হচ্ছে। অবশ্য ঋণ দানের এ ভিত্তিটি যে কত ক্ষতিকর তা তো আমরা আগেই দেখেছি। অথচ শরিকদারী এবং মুনাফার সম্পর্ক যে ঋণ দেয়া-নেয়ার আরো সুন্দর ও ন্যায়সঙ্গত ভিত্তি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এর ফলে অর্থনীতিতে কোনো খারাপ প্রভাবও দেখা দেবে না।

সুদমুক্ত অর্থনীতি ও ব্যাংক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইতোমধ্যেই অনেক অগ্রগতি হয়েছে। বাংলাদেশসহ প্রায় সব মুসলিম দেশে ইসলামী ব্যাংক কায়েম করা হয়েছে। প্রতিটি ব্যাংকের অনেক দেশী-বিদেশী শাখাও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ইসলামী ব্যাংক এখন বিশ্বে একটি স্বীকৃত ব্যাংকিং ও বিনিয়োগ ব্যবস্থা। প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থা অপেক্ষা এটা অনেক ভালো ফল দেখাতে পেরেছে। আশা করা যায় যে, পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এ ব্যবস্থা আরো শক্তিশালী ও কার্যক্ষম হয়ে উঠবে।

## যাকাত ও সামাজিক নিরাপত্তা

নিরাপত্তা মানবজীবনের জন্য অপরিহার্য। নিরাপত্তা না থাকলে কোনো সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে উঠতে ও বিকাশ লাভ করতে পারে না। ইসলাম তাই নিরাপত্তা চায়। ইসলামের অর্থই হচ্ছে শান্তি, অর্থাৎ ইসলাম এমন এক জীবন ব্যবস্থা



www.pathagar.com

যেখানে নিরাপত্তাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ইসলাম নিরাপত্তা চায় বলেই সে যেসব উপাদান নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি করতে পারে যেমন মদ, জুয়া, অশ্লীলতা ইত্যাদিকে হারাম করেছে। এ জন্যই ইসলামী দন্ডবিধিতে পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির (ফাসাদ ফিল আরদ) জন্য প্রয়োজনে হত্যার বিধান রাখা হয়েছে (সূরা মায়েদা: আয়াত ৩৩)।

অর্থনৈতিক নিরাপত্তা সামাজিক নিরাপত্তার একটি প্রধান অংশ। অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। পরিভাষার দিক থেকে সামাজিক নিরাপত্তার অর্থ হচ্ছে সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক প্রত্যেক ব্যক্তির মৌলিক প্রয়োজন পূরণের নিরাপত্তা দান। তাই ইসলাম অর্থনৈতিক নিরাপত্তাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। ইসলাম এমন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে তার জীবিকা অর্জন করতে পারে। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেনঃ

> তোমাদের জন্য ব্যবসাকে হালাল করা হয়েছে।
> (সূরা বাকারা: আয়াত ২৭৫)

কুরআন ও হাদিসে বহু স্থানে মানুষকে কাজ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। যারা কোনো কারণে নিজেদের প্রয়োজনীয় জীবন ধারণের ব্যবস্থা করতে পারে না তাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার দায়িত্ব প্রথমত, তাদের আত্মীয়-স্বজনের ও স্থানীয় সমাজের। ইসলাম সমাজবদ্ধ জীবনে বিশ্বাস করে এবং সমাজের প্রত্যেকের একে-অপরের প্রতি দায়িত্ব রয়েছে। এ প্রসঙ্গে কুরআন মজীদের ঘোষণাঃ

> এবং নিকটাত্মীয়, মিসকীন ও নিঃস্ব পথিককে তার হক দাও।
> (সূরা বনী ইসরাইল: আয়াত ২৬)

> অতএব নিকটাত্মীয়কে এবং মিসকীন ও নিঃস্ব পথিককে তার হক দাও। (সূরা আর রূম: আয়াত ৩৮)

> পূর্ব ও পশ্চিমের দিক মুখ করে দাঁড়ানো কোনো প্রকৃত কল্যাণের কাজ নয়। বরং প্রকৃত কল্যাণের কাজ করল তারা যারা আল্লাহ্, পরকাল, কিতাব, ফিরিশতা ও নবীদের প্রতি ঈমান আনল এবং ধনমাল আল্লাহর ভালোবাসায় নিকটাত্মীয়, এতিম, মিসকীন, নিঃস্ব পথিক, দরিদ্র, সাহায্যপ্রার্থী ও ক্রীতদাস মুক্তির জন্য দান করল এবং নামাজ কায়েম ও যাকাত প্রদান করল। (সূরা বাকারা: আয়াত ১৭৭)

ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বা সামাজিক প্রচেষ্টা অপ্রতুলতার কারণে যারা অভাবগ্রস্ত থাকবে বা দূরবস্থার সম্মুখীন হবে তাদের অসুবিধা দূর করা এবং তাদের পুনর্বাসন করার দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারের। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সমগ্র সৃষ্টিই আল্লাহর পরিবার



www.pathagar.com

(বুখারী)। এ পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব আল্লাহর পক্ষ থেকে খিলাফতের দায়িত্ব হিসেবে ইসলামী সরকারের। এ প্রসঙ্গে কুরআন মজীদের শিক্ষা নিম্নরূপঃ

> পৃথিবীতে চলৎশক্তিসম্পন্ন এমন কোনো জীব নেই যার রিযিক দেয়ার দায়িত্ব আল্লাহর নয়। (সূরা হুদ: আয়াত ৬)
>
> তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি এবং ব্যয় কর সেই ধন-সম্পদ থেকে যাতে তিনি তোমাদের খলিফা নিযুক্ত করেছেন। (সূরা আল হাদীদ: আয়াত ৭)

এ পর্যায়ে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘোষণা হচ্ছেঃ জেনে রাখো! তোমাদের সকলেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে (বুখারী ও মুসলিম)।

যে লোক ধন-মাল রেখে মরে যাবে, তা তার উত্তরাধিকারীরা পাবে এবং যে লোক অসহায় সন্তানাদি ও পরিবার রেখে যাবে তার দায়িত্ব আমাদের উপর বর্তাবে (বুখারী ও মুসলিম)।

উপরের আলোচনা হতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম তিন পর্যায়ে সামাজিক বিশেষ করে অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে। প্রথমত, ব্যক্তির নিজস্ব প্রচেষ্টা; দ্বিতীয়ত, সামাজিক ব্যবস্থা এবং তৃতীয়ত, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। ইসলামের সামগ্রিক ব্যবস্থা (তার শিক্ষা ও আইন ব্যবস্থাসহ) কার্যকর করা সম্ভব হলে কোনো মুসলিম সমাজেই কোনো ধরনের নিরাপত্তাহীনতা দেখা দিতে পারে না।

ইসলামী সমাজে সামাজিক নিরাপত্তা বলতে কি বোঝাবে? এ প্রসঙ্গে কুরআনের ঘোষণাঃ

> আমরা বনী আদমকে সম্মানিত করে সৃষ্টি করেছি।
> (সূরা বনী ইসরাইল)

এ প্রসঙ্গে রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘোষণা হচ্ছেঃ তোমাদের জান, তোমাদের মাল ও তোমাদের সম্মান পবিত্র ও সম্মানার্হ (বিদায় হজ্জের ভাষণ: সিহাহ সিত্তাহ)।

কাজেই ইসলামী সমাজে এমন এক নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকতে হবে যেখানে জান-মালই শুধু বিপদমুক্ত হবে না বরং প্রত্যেক মানুষ ইজ্জতের সঙ্গে বাস করতে পারবে। এ জন্য ইসলামের ফকীহগণ খাদ্য, চিকিৎসা, বাসস্থান ও বিবাহের ব্যবস্থাকে মৌলিক প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইবন হাজম লিখেছেনঃ প্রত্যেক এলাকার ধনবান লোকদের উপর সেখানকার দরিদ্র জনগণের প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। শাসক তাদেরকে এ কাজ করতে বাধ্য করবেন এবং যাকাত বাবদ প্রাপ্ত সম্পদ এ দায়িত্ব পালনে যথেষ্ট না হলে ধনীদের নিকট হতে আরো সম্পদ সংগ্রহ করে



www.pathagar.com

তাদের অপরিহার্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, শীত-গ্রীষ্মের পোশাক, বৃষ্টি, রৌদ্র ও পথিকদের বৃষ্টি হতে রক্ষাকারী একটি ঘরের ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে (আল মিলাল ওয়ান নিহাল)।

জানের নিরাপত্তা ঘোষণার মধ্যেই চিকিৎসা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আর শিক্ষা তো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই সবার উপর ফরজ করেছেন। 'প্রত্যেক মুসলিম পুরুষ ও নারীর উপর শিক্ষা ফরজ' (আল হাদিস)।

এ আলোচনা প্রসঙ্গে বাংলাদেশের বিখ্যাত আলিম ও ফকীহ মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম লিখেছেন, পুরুষ ও নারীর যথাসময়ে বিবাহ হওয়া এ পর্যায়েরই মৌলিক প্রয়োজন (ইসলামের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা, ১ম সংস্করণ, পৃ-৯৩)।

## সামাজিক নিরাপত্তার প্রধান প্রধান ব্যবস্থা

এ পর্যায়ে ইসলামের সবচেয়ে প্রধান ও মশহুর ব্যবস্থা হচ্ছে যাকাত। যাকাত কোনো সাধারণ কর বা শুল্ক নয়। সব কাজে যাকাতকে ব্যবহার করা যায় না। যাকাত হচ্ছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রধান ভিত্তি। যাকাতের মাধ্যমে সমাজকে দারিদ্র্য থেকে ইসলাম উদ্ধার করতে চায়। যাকাতের হকদার হচ্ছে যারা কর্মক্ষমহীন এবং যারা কর্মক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও উপার্জনহীন অথবা পর্যাপ্ত পরিমাণ উপার্জন করতে পারছে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক বলেছেনঃ

> যাকাত পাবে ফকীর, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী কর্মচারী, যাদের ইসলামের প্রতি আকর্ষণ করা দরকার, ক্রীতদাস, ঋণগ্রস্ত এবং নিঃস্ব পথিক। আল্লাহর পথে সাধারণ জনকল্যাণমূলক কাজেও এ অর্থ খরচ করা হবে। (সূরা তওবা: আয়াত ৬০)

যাকাতের মাধ্যমে সব অভাবগ্রস্ত, দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের অভাব দূর করা ও অর্থনৈতিকভাবে পুনর্বাসন করা সম্ভব। যাকাত অভাবগ্রস্তকে পর্যাপ্ত পরিমাণ দিতে হবে যাতে সে আর অভাবগ্রস্ত না থাকে। এ পর্যায়ে কোনো কোনো ফকীহ মত প্রকাশ করেছেন যে, যাকাতের যে গ্রহীতা তাকে এক বছরের প্রয়োজন পূর্ণ করে দিতে হবে। কেউ কেউ সারা জীবনের প্রয়োজন পূর্ণ করে দেয়ার কথা বলেছেন। হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর মত হচ্ছে - যখন দেবেই, তখন সচ্ছল বানিয়ে দাও।

যাকাতের মাধ্যমে দরিদ্র জনতার পুনর্বাসন সম্পূর্ণভাবে সম্ভব। সারা মুসলিম বিশ্বের দেশভিত্তিক বা সামগ্রিক আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। সব তথ্যও আমাদের কাছে নেই। এখানে কেবল বাংলাদেশের আদায়যোগ্য যাকাতের একটি নিম্নতম হিসাব পেশ করা হচ্ছে। বাংলাদেশে তিন কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়। এর অন্তত ১ কোটি টন সচ্ছল কৃষকগণ উৎপাদন



www.pathagar.com

করে থাকেন। যদি এই ১ কোটি টনের উপর অর্ধ ওশর (৫%) আদায় করা হয় তার পরিমাণ হবে ৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্য। যার নীচের পক্ষে মূল্য হচ্ছে ২,৫০০ কোটি টাকা। অন্যদিকে পাট, চা, রবিশস্য, তামাক ও অন্যান্য ফসল যার যাকাতযোগ্য পরিমাণ পাঁচ হাজার কোটি টাকা হবে। এতে শতকরা ৫ ভাগ হারে ২৫০ কোটি টাকার যাকাত আদায় হতে পারে। এ হিসাবের জন্য আমরা ধরে নিচ্ছি যে, সব জমিতেই সেচ দেয়া হচ্ছে এবং এ জন্য জমির মালিকগণ শতকরা ১০ ভাগ ওশর না দিয়ে শতকরা ৫ ভাগ অর্ধ ওশর দিচ্ছে। তেমনিভাবে যাকাতযোগ্য ব্যবসায়ী পণ্য, নগদ অর্থ এবং স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার হতে যথাক্রমে ১,০০০ কোটি, ১,০০০ কোটি ও ৫০০ কোটি টাকার যাকাত আদায় হতে পারে। এভাবে অন্যান্য বনজ সম্পদ, পশু সম্পদ এবং সমুদ্র হতে প্রাপ্ত মাছ ইত্যাদি বাদ দিলেও অন্তত ৫,২৫০ কোটি টাকা যাকাত আদায় হতে পারে। নিম্নে এ সম্পর্কে একটি ছক দেয়া হলোঃ

| যাকাতযোগ্য পণ্য, সম্পদ ও অর্থের হিসাব (২০১০ সালের হিসাব অনুযায়ী) | | | |
|---|---|---|---|
| সম্পদ | যাকাতযোগ্য পরিমাণ/ মূল্য/ অর্থ | যাকাতের পরিমাণ ও মূল্য (টাকায়) | মন্তব্য |
| ১. খাদ্যশস্য | ১ কোটি টন | ৫ লক্ষ টন (মূল্য ২,৫০০ কোটি টাকা) | শতকরা ৫ ভাগের মূল্য |
| ২. অন্যান্য শস্য | ৫,০০০ কোটি টাকা | ২৫০ কোটি টাকা | ঐ |
| ৩. ব্যবসায়ী/ শিল্প পণ্য | ৪০,০০০ কোটি টাকা | ১,০০০ কোটি টাকা | শতকরা ২.৫ ভাগ হারে |
| ৪. নগদ অর্থ (ব্যাংক সহ) | ৪০,০০০ কোটি টাকা | ১,০০০ কোটি টাকা | ঐ |
| ৫. স্বর্ণ/ স্বর্ণালঙ্কার | ১০,০০০ কোটি টাকা | ৫০০ কোটি টাকা | ঐ |

যাকাতের এ পরিমাণ অর্থ যদি প্রতি বছর কেবল দরিদ্র জনতাকে বৃত্তিমূলক শিক্ষাদান, কর্মে নিয়োগ ও পুনর্বাসনে ব্যয় করা হয় তবে কয়েক বছরেই বাংলাদেশে ছিন্নমূল বলে কিছু থাকবে না। অবশ্য যাকাতের অর্থ উন্নয়ন ও সাধারণ প্রশাসনিক কাজে ব্যবহার করা যায় না। সে জন্য অন্য কর ও শুল্কও আদায় করতে হবে।

যাকাতের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সরকারের দায়িত্ব। এ প্রসঙ্গে কুরআন মজীদে রয়েছেঃ

> যখন আমরা তাদেরকে ক্ষমতা দান করি, তখন তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায করে, সৎকাজের আদেশ করে এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করে। (সূরা হাজ্জ: আয়াত ৪১)



www.pathagar.com

রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ আদেশ করেছেনঃ

তাদের মাল থেকে যাকাত আদায় করুন।

(সূরা তওবা: আয়াত ১০৩)

আয়াতে 'সাদাকাত' শব্দের অর্থ ফকীহ্গণ যাকাত করেছেন, কেননা আয়াতে 'খুজ' ক্রিয়াটি আদেশবাচকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে যা কেবল বাধ্যতামূলক কাজের জন্য প্রযোজ্য। আর আমরা জানি যে, একমাত্র বাধ্যতামূলক সাদাকা হচ্ছে যাকাত (ইউসুফ আল কারযাভী, ইসলামের যাকাত বিধান, পৃ. ৩১-৩৭, ২য় খণ্ড)।

সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের দ্বিতীয় প্রধান উপায় হবে ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুল মালের অন্যান্য সম্পদ - যদি যাকাত, স্থানীয় সমাজ ও আত্মীয়-স্বজনের সাহায্য সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে অপর্যাপ্ত হয়। বায়তুল মালের পরিচয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ বায়তুল মালের সম্পদ সাধারণ মুসলমানের সম্পদ। বায়তুল মালের এ সম্পদ হতে কেবল মুসলমানই নয়, অমুসলিমদেরও সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে। হযরত ওমর ফারুকের খিলাফতকালে ইরাকের হিরাবাসী খৃস্টানদের সঙ্গে যে চুক্তি হয় তাতে লেখা ছিলঃ

যে বৃদ্ধ কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে কিংবা কোনো বিপদে পড়ে গেছে অথবা পুর্বে ধনী ছিল এবং স্বচ্ছল ছিল এখন দরিদ্র হয়ে পড়েছে আর সমাজের লোকেরা তাকে ভিক্ষা দিতে শুরু করেছে এরূপ ব্যক্তির উপর, সে যতদিন ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক থাকবে - ধার্য জিজিয়া প্রত্যাহৃত হবে এবং মুসলমানদের বায়তুল মাল থেকে তার ও তার পরিবার-পরিজনের জীবিকার ব্যবস্থা করা হবে (প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪, আবু ইউসুফের কিতাবুল খারাজ থেকে)।

হযরত ওমর ফারুক (রা.) অন্য এক সময় একজন অসমর্থ জিম্মী সম্পর্কে বায়তুল মালের দায়িত্বশীল কর্মচারীকে লিখে পাঠানঃ

এই লোকটি ও তার উপর ধার্য জিজিয়া ইত্যাদি করের বোঝা সম্পর্কে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা কর। আমরা লোকটির উপর কিছুমাত্র সুবিচার করিনি, তার যৌবনকালের উপার্জনে সকলে উপকৃত হয়েছি, আর এখন তার বার্ধক্যকালে লাঞ্ছিত হওয়ার জন্য তাকে ত্যাগ করেছি। অথচ আল্লাহ্ তো বলেছেন, সাদাকাসমূহ ফকীর ও মিসকীনদের জন্য। ফকীর বলতে মুসলমান দরিদ্র লোককে বোঝায়। আর এ লোকটি হচ্ছে আহলি কিতাব থেকে মিসকীন (প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬, আবু ইউসুফের কিতাবুল খারাজ থেকে)।

বর্তমান যুগে ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যকর করার জন্য আরো অনেক প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থা কায়েম করা যেতে পারে, যাতে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো সংহত ও প্রসারিত হয়। এ প্রসঙ্গে বীমা



www.pathagar.com

ব্যবস্থার উল্লেখ করা যেতে পারে। জীবন বীমাকেও সুদমুক্ত ও জুয়ামুক্তভাবে সংগঠিত করা সম্ভব। আধুনিক অনেক ফকীহই এই মত পোষণ করেন। (১. Nazatullah Siddiqui, Muslim Economic Thinking, A Survey of Contemporary Literature, Islamic Foundation, UK. ২. মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, ইসলামী অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা)। প্রকৃতপক্ষে এর ফলে রাষ্ট্রীয় রাজস্ব ও যাকাত অর্থের উপর চাপ কমবে। ইতোমধ্যেই কয়েকটি ইসলামী বীমা কোম্পানি মধ্যপ্রাচ্যে কাজ শুরু করেছে।

বর্তমান যুগে ইসলামী ব্যাংকও সামাজিক নিরাপত্তা কায়েমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। ইসলামী ব্যাংক অভাবগ্রস্ত কর্মক্ষম যুবক ও শ্রমিকদের মুদারাবার ভিত্তিতে অর্থ বিনিয়োগ করতে পারে। এ জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে খুব বেশি অর্থ দিতে হবে না। এ পদ্ধতিতে লক্ষ লক্ষ যুবক কর্মীকে বেকারত্ব থেকে মুক্ত করে উৎপাদনের কাজে নিয়োগ করা যেতে পারে। এটাও সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে ব্যাপক সহায়তা করবে।

এসব প্রতিষ্ঠান কায়েম করা প্রকৃত পক্ষে কুরআনের দৃষ্টিতে মারূফ কায়েম করা হিসেবেই গণ্য হবে। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেনঃ

> যাদেরকে আমরা পৃথিবীতে ক্ষমতা দিয়েছি তারা... সৎকাজের আদেশ করে ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করে। (সূরা হাজ্জ: আয়াত ৪১)

বাস্তব সামাজিক নিরাপত্তা ও যাকাত ব্যবস্থাকে কার্যকর করতে হলে রাষ্ট্রকে এর দায়িত্ব নিতে হবে। আগেই উল্লেখ করেছি যে, যাকাত প্রতিষ্ঠা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। যতটুকু যাকাত রাষ্ট্র কর্তৃক আদায় করা অধিকাংশ ফকীহ্ ন্যায়সঙ্গত মনে করেন, ততটুকু যাকাত বাধ্যতামূলকভাবেই আদায় করতে হবে। যাকাতের কিছু অংশ ফকীহদের কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবে আদায় করার কথা বলেছেন (ইউসুফ আল কারযাভী, ইসলামের যাকাত বিধান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২য় খণ্ড)। এ জন্য সব মুসলিম দেশে প্রয়োজনীয় যাকাত আইন প্রণয়ন ও সংশোধন করতে হবে।

যাকাত আদায়কে সহজ করার জন্য যাকাত সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞান জনগণকে দিতে হবে। তবেই সালাত আদায় করার মতো যাকাত আদায় করা জনগণের জন্য সহজ হবে। জনগণ এ ব্যাপারে অনেক কিছুই জানে না। এ সম্পর্কে ইউসুফ আল কারযাভী লিখেছেনঃ '(যাকাত সম্পর্কে) আরও কতকগুলো বিষয় জানার প্রয়োজন সম্পূর্ণ নতুনভাবে এ যুগে দেখা দিয়েছে। প্রাচীনকালীন ফিকাহবিদগণ এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলেন।' এ প্রসঙ্গে তিনি বড় বড় শিল্প কারখানার উৎপাদন, জাহাজ, ভাড়া বাড়ি, হোটেল-রেস্তোরাঁ, প্রেস ইত্যাদি নতুন ধরনের সম্পদের কথা উল্লেখ করেছেন। বাংলাদেশের ভূমি যে খারাজী ভূমি নয় বরং উশরী ভূমি, এ সম্পর্কেও জনগণের জ্ঞানের অভাব আছে। জনগণকে জানানো দরকার যে, বাংলাদেশের মুসলিম জনগণের জমির ফসলের



www.pathagar.com

উপর ওশর দান ফরজ। (ক. ইউসুফ আল কারযাভী, ইসলামের যাকাত বিধান, খ. সাইয়েদ মোহাম্মদ আলী, ওশরের শরীয়তী বিধান, আধুনিক প্রকাশনী)। তেমনিভাবে যাকাত প্রতিষ্ঠার জন্য যাকাত কি কি সম্পদে ফরজ, নিসাব কি, যাকাতের বছর কিভাবে গণনা করতে হয় - এ সম্পর্কেও সম্যক জ্ঞান জনগণকে দিতে হবে (ইউসুফ আল কারযাভী, প্রাগুক্ত)।

সুতরাং আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় যাকাত সংক্রান্ত এ আইন-কানুনকে বিস্তারিতভাবে পড়বার ব্যবস্থা করতে হবে।

যাকাত ব্যবস্থা কার্যকরণে কেবল সরকারি কর্মচারীর উপর নির্ভর করা ঠিক হবে না; তাতে যাকাত বিভাগের প্রশাসনিক খরচ বেশি হবে। কাজেই যাকাত প্রতিষ্ঠার জন্য প্রত্যেক মুসলিম দেশকে বেসরকারি পর্যায়ে সর্বস্তরের জনগণের কমিটির ব্যবস্থা করতে হবে। সরকারি যাকাত কর্মচারীগণ তাদের কাজ তদারক করবেন।

যাকাত বিভাগে কর্মরতদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার হবে। এ প্রশিক্ষণের মধ্যে যাকাতের বিধি-বিধান, প্রসাশনিক আইন-কানুন ও হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত হবে। যাকাত বিভাগের কর্মচারীদের যথাযোগ্য বেতন দিতে হবে, যেন তারা অসততার পথে পা না বাড়ায়।

সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে সুসংহত করার জন্য ইসলামী বীমা ব্যবস্থা ও ইসলামী ব্যাংকের ব্যাপক প্রসার ঘটাতে হবে। এ কাজ বেসরকারি ও সরকারি দুই পর্যায়েই হতে হবে।

সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ইসলামী সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অপরিহার্য অংশ। এ ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য প্রত্যেক সরকার ও সমাজের দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা কর্তব্য। একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ইসলামী অর্থনীতি নানাবিধ দিক-নির্দেশনা দিয়েছে।



www.pathagar.com

# বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং ঃ ঐতিহাসিক ভূমিকা

ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ঐতিহাসিক ভূমিকা, বিশেষ করে বাংলাদেশে এর পটভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা যায়। আমার বিশেষ করে মনে পড়ে, আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম এবং একটি ছাত্র সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলাম তখন দু'টি প্রশ্ন মনে উদয় হতো এবং বিব্রত করতো। এটা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার আগে যখন ঢাকা কলেজে ছিলাম তখনও হতো। একটি প্রশ্ন ছিল যে, ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয় এবং যেহেতু ইসলামী শাসনতন্ত্র সম্ভব নয় সুতরাং একটি ইসলামী রাষ্ট্রও সম্ভব নয়। যেহেতু ইসলামী সংগঠন থেকে বলা হতো যে, আমাদের দাবি হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র বা হুকুমাতে ইলাহিয়া অর্থাৎ খেলাফত কায়েম করা। খেলাফত অর্থ এই নয় যে, শুধু একজন খলিফা মনোনয়ন করা। খেলাফত মানে খেলাফত ব্যবস্থা কায়েম করা। এই খেলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দাবি ছিল - যার মধ্যে মানবতা থাকবে, যার মধ্যে ইসলামের রাষ্ট্রে ব্যবস্থার সকল বৈশিষ্ট্য থাকবে। কিন্তু মনে প্রশ্ন জাগতো যে, এটি সম্ভব নয়। কিন্তু যখন পাকিস্তানে ১৯৫৬ সালে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণীত হয়ে গেল এবং শাসনতন্ত্র দেশের আলিম সমাজও গ্রহণ করলেন তখন ইসলামী শাসনতন্ত্র তথা ইসলামী রাষ্ট্র সম্ভব নয় - এই প্রশ্ন সবার মন থেকে সরে গেল। যে ভাবনা সারাক্ষণ তাড়া করতো, ইসলামী শাসনতন্ত্র বা ইসলামী রাষ্ট্র একেবারেই সম্ভব নয় - তা আর রইল না। এমনকি আল্লাহ পাকের মেহেরবানীতে যে ব্যক্তি একসময় বলেছিলেন যে, ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন সম্ভব নয়, সম্ভব হলে আপনারা প্রণয়ন করে দেখান, যখন ১৯৫২ সালে সকল মতের আলিম একত্রিত হলেন এবং তাঁরা ২২ দফা মূলনীতি তৈরি করে দিলেন তখন (এই ব্যক্তি মরহুম এ কে ব্রোহী) তিনি পরবর্তীকালে ইসলামী শাসন ব্যবস্থার সমর্থক হয়ে দাঁড়ান এবং পরবর্তীকালে তিনি একজন ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবেই পরিচিত হয়ে যান। এটা ছিল একটা দিক।

দ্বিতীয় দিক যেটা লোকে মনে করত (আমাদের ছাত্র জীবনে), যেহেতু ইসলাম সুদকে স্বীকার করে না, সেহেতু ইসলামী ব্যাংক সম্ভব নয় এবং যেহেতু ব্যাংক সম্ভব নয় সুতরাং ইসলামী অর্থনীতিও সম্ভব নয়। কাজেই ইসলামী রাষ্ট্রের এই যে ধারণা, তা আমাদের পরিত্যাগ করা প্রয়োজন। কিন্তু আল্লাহপাকের অসংখ্য মেহেরবানী, যে প্রশ্নটি আমাদেরকে বিব্রত করেছিল ১৯৭০ পর্যন্ত



www.pathagar.com

এমনকি ১৯৭৪-৭৫ পর্যন্ত - যখন ইসলামী ব্যাংকগুলোর কার্যক্রম শুরু হয়ে গেল মধ্যপ্রাচ্যে এবং তারপরে যখন এ ধারণা বাংলাদেশে নিয়ে আসা হলো, এই ধারণা যখন ব্যাপক হলো এবং আল্টিম্যাটলি যখন ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশে চালু হয়ে গেল, তখন থেকে লক্ষ্য করছি আমরা যে প্রশ্নে বিব্রত হচ্ছিলাম তা আর রইল না।

ব্যাংক যখন হয়ে গেল এবং কাজ শুরু করলো (১৯৮৩) এবং বাংলাদেশে যখন ইসলামী ব্যাংকের কাজের মাধ্যমে জনগণ দেখলো যে, ইসলামী ব্যাংক একটি প্র্যাকটিকেবল মাধ্যম এবং এরা ভালো করে একটি ব্যাংক চালাতে পারে, তারপর থেকে লক্ষ্য করছি, বাংলাদেশে ইসলামপন্থী লোকদের বিরুদ্ধে বা ইসলামপন্থী সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে বা ইসলামী আদর্শের বিরুদ্ধে যাই বলা হোক না কেন কিন্তু এ কথা আর বলা হচ্ছে না যে, ইসলামী ব্যাংক সম্ভব নয়। এ কথা বলা হচ্ছে না যে, ইসলামী অর্থনীতি সম্ভব নয়। এটা যে কত বড় বিপ্লব তা আমরা অনুধাবন করতে পারছি না। আমরা যদি ঐতিহাসিকভাবে এটাকে দেখি পাকিস্তানে ১৯৫৬ সালে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হওয়া এবং ইরানে ১৯৭৯ সালে শাসনতন্ত্র হয়ে যাওয়ার ফলে একটা মানসিক বিপ্লব সৃষ্টি হলো। যার ফলে ইসলামী রাজনীতি, ইসলামী রাষ্ট্র, ইসলামী খেলাফত বা ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্ভব নয় - এই যে ধারণা, তা চলে গেল।

এখন এ কথাটি তারা বলতে পারেন যে, আমরা ইসলামী শাসন ব্যবস্থা আমাদের জন্যে গ্রহণযোগ্য মনে করি না, এটা হলো অন্য প্রশ্ন। কিন্তু ইসলামী শাসন ব্যবস্থা সম্ভব নয়, ইসলামী অর্থনীতি সম্ভব নয় - এই অভিযোগ চলে না। আল্লাহ পাকের অশেষ শুকরিয়া যে, ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা চালু হওয়ার কারণে বাংলাদেশে এবং বিশ্বব্যাপী এই চিন্তা নেই যে, ইসলামী অর্থনীতি অচল। যতটুকু মনে পড়ে, ১৯৯৪ সালের ৬ আগস্ট সংখ্যায় ইকোনোমিস্টে 'সার্ভে অব ইসলাম' নামে একটি দশ-বারো পৃষ্ঠার লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে তারা অনেকটা বিস্তৃত আলোচনা করে, সেটা আমাদের অনেকের দেখা দরকার ছিল। তারা সে লেখায় বলে যে, দুইটি জিনিস এখন আমরা ইসলাম থেকে নিতে পারি। তার মধ্যে একটি হলো, আমরা ইসলামী ব্যাংকিং নিতে পারি। তার মানে তারা মেনে নিয়েছে যে, ইসলামী ব্যাংকিং ইজ সুপিরিয়র টু কনভেনশনাল ওয়েস্টার্ন মডার্ন ব্যাংকিং। কারণ ওয়েস্টার্ন মডার্ন ব্যাংকিংয়ের যে সঙ্কীর্ণতা বা অসুবিধা অথবা অন্যভাবে বলা যায় যে, ওয়েস্টার্ন মডার্ন ব্যাংকের যে সুবিধা তার চেয়ে অতিরিক্ত কিছু সুবিধা আছে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায়। মুদারাবা, মুশারাকা, বাই মুয়াজ্জাল–এসব ভালো ভালো ব্যবস্থা রয়েছে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় যা তারা গ্রহণ করেছে। এ প্রসঙ্গে তারা যুক্তি দেখিয়েছে যে, অতীতে আমরা ইসলাম থেকে ইউনিভার্সিটির আইডিয়া নিয়েছিলাম। স্পেন, আন্দালুসিয়া থেকে আধুনিক শিক্ষা-সংস্কৃতির অনেক উন্নত বিষয়ের আইডিয়া নিয়েছিলাম। এখন আমরা ইসলামী ব্যাংকিংয়ের আইডিয়াও গ্রহণ করতে পারি।



www.pathagar.com

এই আলোচনার সারসংক্ষেপ বলতে পারি বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং এর ইম্প্যাক্ট এটা হয়েছে যে, তারা ট্রেড ফাইন্যান্স করতে পেরেছে এবং ফাইন্যান্স সফলভাবেই করেছে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স করেছে সফলভাবে। ট্রেড ফাইন্যান্স মুরাবাহার ভিত্তিতে, বাই মুয়াজ্জালের ভিত্তিতে করেছে। তারা রুরাল ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রেও একটা বড় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তাই ইসলামী ব্যাংকিং এদেশে মোটামুটি সফল -এটা আমাদের স্বীকার করতে হবে। ক্যাশ ওয়াকফ (সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিঃ) ব্যবস্থায় ক্যাশ নামে যে ধারণাটি নিয়ে আসছে, এটি হিস্টোরিক্যাল। ইসলামী অর্থনীতিতে এটা আছে, সেটা এরা নিয়ে এসেছে। আপনি আপনার ক্যাশ যেমন ধরুন এক লক্ষ টাকা ওয়াকফ করে দিতে পারেন এবং ব্যাংককে নির্দেশ দিতে পারেন যে, এটা এই এই খাতে বা কর্মে এভাবে ব্যয় করতে হবে। ইসলামের এই চালু নেই ব্যবস্থাটাও বর্তমানে তারা চালু করেছে।

বাংলাদেশে লক্ষ্য করছি ইসলামী অর্থনীতির পরিভাষাসমূহ আস্তে আস্তে পরিচিত হয়ে যাচ্ছে। যেমন আজকে অনেক লোক জানে যে, মুশারাকা কি, মুরাবাহা কি, মুদারাবা কি। একটা সময় ছিল যে, এগুলো আমি নিজেও জানতাম না। আমি ইসলামী মুভমেন্ট করি ১৯৫৭ থেকে কিন্তু আমি ইসলামী ইকোনমির এই টার্মগুলো সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত। অথচ এই সময় পর্যন্ত আমি ইসলামী মুভমেন্টে ছিলাম। কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের লোকেরা এগুলোর সঙ্গে আমাকে পরিচিত করাননি। এটা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে। আলিমরাও করাননি। কোনো খুতবাতেও আমি কোনদিন শুনিনি আলিমরা কোনদিন কোনো খুতবায় বলেছে যে, মুশারাকা কি, মুদারাবা কি, বাই মুয়াজ্জাল কি? এটাও তো আলিমদের তথা সমাজের একটা ব্যর্থতা। দুশো, তিনশো বছর ধরে আমরা জনগণকে ইসলামের পরিচিত টার্মগুলো, বিজনেস টার্মগুলোর সঙ্গে পরিচিত করাতে পারিনি। কাজেই মুসলমান হয়েও কত অন্ধত্বের মধ্যে যে অনেকেই আছেন তা কিন্তু তারা জানেন না।

আজকে এই ইসলামী টার্মগুলো পরিচিত হয়ে গেছে। যদিও এগুলোর সম্পর্কে একটা প্রপাগান্ডা আছে (ট্রেডিং মোডটা তারা বুঝতে পারে না)। ব্যবসায় লাভ আর সুদের টাকার উপর টাকা দেয়া যে এক জিনিস নয়, এটা তারা এখনো বুঝতে পারে না। তারা অনেকেই বলেন যে, আমরা একটু ঘুরিয়ে খাই এই যা। এই ভ্রান্ত ধারণাটাও আমাদের প্রচারের মাধ্যমে, আলোচনার মাধ্যমে দূর করতে হবে। এলিটরা ইসলামী টার্মগুলো মেনে নিয়েছেন। এই দেশে যারা সবচেয়ে বড় পুঁজিপতি, একশ' কোটি, দুইশ' কোটি টাকার মালিক তারাও আজকে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের সাথে আগ্রহ ভরে অনেক ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন। এলিটরা বুঝেছেন যে, এটা সুবিধাজনক, এতে কোনো অসুবিধা নেই। সুতরাং, আমি মনে করি ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে আমরা একটা



www.pathagar.com

বিরাট কাজ করেছি। যারা এই আন্দোলনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন তারা খুব বড় এবং মহান কাজ করেছেন বলে আমি মনে করি। এটা ইসলামের স্বপক্ষে সবচেয়ে বড় পজিশন এনে দিয়েছে। ইসলামী মুভমেন্টের ক্ষেত্রে বড় একটা বাধা ছিল ইসলামী ইকোনমি। এই বাধাটাই তারা দূর করে দিয়েছেন।

সেন্ট্রাল ব্যাংক থেকে আমাদের যে অভিজ্ঞতা, আমি যখন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর ছিলাম তখন ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ সমসাময়িক অন্যান্য ব্যাংকের মধ্যে রেটিংয়ের দিক থেকে নাম্বার ওয়ান ব্যাংকে পরিণত হয়।

ইসলামের আদর্শ হলো নম্র, ভদ্র এবং শালীনতার আদর্শ। সেটা ছিল আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের। এই আদর্শ দিয়ে আমাদেরকে জনগণের কাছে পৌছাতে হবে। এরপরও আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই যে, ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাত্র শুরু বলা যায়। তবুও এটা বর্তমানে যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছে তাতে তারা এদেশের অর্থনীতি ও জনগণের ভাগ্য অনেকটা বদলে দিতে পারবে। ইসলামী অর্থনীতির ভিত্তি দাঁড়ানোর কাজ এই ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার দ্বারা হয়েছে। এটা যে কত বড় একটা কাজ তা আমি ভাষায় বলতে পারবো না।

আসলে আগে আমাদের বুঝতে হবে যে, ব্যাংকিং কি? আগে ব্যাংকিং, তারপর ইসলামী ব্যাংকিং। আগে রাষ্ট্র, তারপর ইসলামী রাষ্ট্র। আগে মানুষ, তারপর ইসলামী মানুষ। এখন ব্যাংকিং না বুঝলে সমস্যা হবে। ব্যাংকস আর ডিলিং উইথ দ্য পিপলস মানি - জনগণ কি চায়, এটা আপনাকে আরো জানতে হবে। আপনি ভালো ব্যবসা করবেন, সঠিক ব্যবসা করবেন এবং ইসলামী আদর্শ অনুসারে করবেন, করে যতটা প্রফিট সম্ভব করবেন। এটা জনগণের মতামত। এটা ইসলামবিরোধী নয়। সুতরাং, আপনাকে সমন্বয় করতে হবে প্রফিট এবং আদর্শের।



www.pathagar.com

# ইসলামী ব্যাংকিং ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা

ইসলামী ব্যাংকিংয়ের সমস্যা ও সম্ভাবনা আলোচনার পূর্বে আমি এর সংজ্ঞা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও আধুনিক ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ইতিহাস ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা করতে চাই।

## সংজ্ঞা

ইসলামী ব্যাংকিং হচ্ছে এমন এক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা ব্যাংকিং ক্ষেত্রে ইসলামী অর্থনৈতিক ও আর্থিক নীতিমালা প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে কাজ করে। ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) মতে–

> ইসলামী ব্যাংক হলো - এমন এক আর্থিক প্রতিষ্ঠান যার মর্যাদা, নিয়ম ও নীতিমালায় ইসলামী শরিয়াহ আইনের প্রতি অঙ্গীকার এবং যে কোনো কর্মকাণ্ডে সুদ গ্রহণ ও প্রদান নিষিদ্ধের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছে।

১৯৮৩ সালে প্রণীত মালয়েশিয়ার ইসলামী ব্যাংকিং আইনে বলা হয়েছে–

> ইসলামী ব্যাংক হলো এমন এক কোম্পানি যা ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবসায় পরিচালনা করে... ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবসায় মানে যে ব্যাংকিং ব্যবসার লক্ষ্য ও কর্মকাণ্ডে ইসলাম ধর্মে অননুমোদিত কোনো উপাদান যুক্ত নেই।

## লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

কেবল মুনাফা অর্জনই ইসলামী ব্যাংকিংয়ের উদ্দেশ্য নয়। জনগণের কল্যাণ এর লক্ষ্য। ইসলামী চেতনা হলো অর্থ, আয় ও সম্পদের মালিকানা আল্লাহর। তাই এই সম্পদ ব্যবহৃত হবে সমাজের ভালোর জন্য। ইসলামে লাভ-ক্ষতিতে অংশীদারিত্বের যে নীতিমালা রয়েছে এবং অন্যান্য অনুমোদিত বিনিয়োগ মডেলের ভিত্তিতে ইসলামী ব্যাংক পরিচালিত হয়। এতে সুদ কঠোরভাবে পরিত্যাজ্য। যা সকল শোষণের মূল ও ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্বের জন্য দায়ী। একটি ইসলামী ব্যাংক অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প বৈষম্য দূর করে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিনির্মাণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।



www.pathagar.com

## ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ইতিহাস

ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ইতিহাসকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত, এটা যখন কেবল ধারণার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। দ্বিতীয়ত, যখন এটা কোথাও বেসরকারি উদ্যোগ এবং কোথাও কোথাও আইনের মাধ্যমে বাস্তবে রূপ নেয়।

## ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ধারণা

সাম্প্রতিক অতীতে গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের দিকে পণ্ডিত ব্যক্তিগণ সুদমুক্ত ব্যাংকিংয়ের স্থলে ইসলামী ব্যাংকিং নিয়ে লেখালেখি শুরু করেন। পরের দু'দশকে ইসলামী ব্যাংকিং অধিকতর মনোযোগ আকর্ষণ করে। সত্তর দশকের প্রথম দিকে এ ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সম্পৃক্ততা লক্ষ্য করা যায়। মুসলিম দেশগুলোর অর্থমন্ত্রীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠান ও সরকারের সম্পৃক্তির কারণে বাস্তবে অনুশীলন শুরু হয় তত্ত্ব এবং যার ফল হলো ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা। এই প্রক্রিয়ায় ১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি)।

## ইসলামী ব্যাংকসমূহের জন্মলাভ

বিভিন্ন মুসলিম দেশের ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে প্রথম বেসরকারি ইসলামী ব্যাংক 'দুবাই ইসলামিক ব্যাংক'ও প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৫ সালে। মিসর ও সুদানে 'ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক' নামে ১৯৭৭ সালে আরো দু'টি বেসরকারি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। একই বছর কুয়েত সরকার প্রতিষ্ঠা করে 'কুয়েত ফিন্যান্স হাউজ'। দুবাইয়ের প্রথম বেসরকারি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ১০ বছরের মধ্যে ৫০টিরও বেশি ইসলামী ব্যাংক জন্মলাভ করে। মুসলিম দেশ ছাড়াও ডেনমার্ক, লুক্সেমবার্গ, সুইজারল্যান্ড ও যুক্তরাজ্যে এগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়।

অধিকাংশ দেশে বেসরকারি উদ্যোগ কাজ করে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পেছনে এবং এর কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট ব্যাংকেই সীমাবদ্ধ থাকে। ইরান ও পাকিস্তানে সরকারি উদ্যোগে ইসলামী ব্যাংকিং চালু হয় এবং দেশের সকল ব্যাংক এর আওতায় আসে। এ দু'দেশই ১৯৮১ সালে ইসলামী ব্যাংকিং চালুর পদক্ষেপ নেয়।

বর্তমানে যেসব দেশে ইসলামী ব্যাংক রয়েছেঃ

| | | |
|---|---|---|
| ০১. আফগানিস্তান | ০২. আজারবাইজান | ০৩. আয়ারল্যান্ড |
| ০৪. আলজেরিয়া | ০৫. আলবেনিয়া | ০৬. আর্জেন্টিনা |
| ০৭. অস্ট্রেলিয়া | ০৮. বাহামা | ০৯. বাহরাইন |
| ১০. বাংলাদেশ | ১১. বসনিয়া হার্জেগোভিনা | ১২. ব্রুনাই |
| ১৩. কেম্যান দ্বীপপুঞ্জ | ১৪. চীন | ১৪. সাইপ্রাস |
| ১৬. ডেনমার্ক | ১৭. ইথিওপিয়া | ১৮. জিবুতি |



www.pathagar.com

১৯. মিসর
২০. ফ্রান্স
২১. জার্মানি
২২. গিনি
২৩. গাম্বিয়া
২৪. হংকং
২৫. ভারত
২৬. ইন্দোনেশিয়া
২৭. ইরান
২৮. ইরাক
২৯. জর্ডান
৩০. কাজাখস্তান
৩১. কেনিয়া
৩২. কিবরিস টার্কিস রিপাবলিক
৩৩. কুয়েত
৩৪. লেবানন
৩৫. লিবিয়া
৩৬. লিচেনস্টেইন
৩৭. লুক্সেমবার্গ
৩৮. মালয়েশিয়া
৩৯. মালদ্বীপ
৪০. মরিশাস
৪১. মৌরিতানিয়া
৪২. মরক্কো
৪৩. নাইজেরিয়া
৪৪. ওমান
৪৫. পাকিস্তান
৪৬. ফিলিস্তিন
৪৭. ফিলিপাইন
৪৮. কাতার
৪৯. রাশিয়া
৫০. সউদি আরব
৫১. সেনেগাল
৫২. সিরিয়া
৫৩. দক্ষিণ আফ্রিকা
৫৪. শ্রিলংকা
৫৫. সুদান
৫৬. সুইজারল্যান্ড
৫৭. থাইল্যান্ড
৫৮. তানজানিয়া
৫৯. তিউনিসিয়া
৬০. ত্রিনিদাদ ও টোবাগো
৬১. তুরস্ক
৬২. সংযুক্ত আরব আমিরাত
৬৩. যুক্তরাজ্য
৬৪. যুক্তরাষ্ট্র
৬৫. উগান্ডা
৬৬. ইয়েমেন
৬৭. জাম্বিয়া

## ইসলামী ব্যাংকগুলোকে যেসব সমস্যার সমাধান করতে হয়

অধিকাংশ ইসলামী ব্যাংক, বিনিয়োগের জন্য মুরাবাহা, বাই মুয়াজ্জল, বাই সালাম, ইসতিসনা, হায়ার পারচেজ/লীজ এসব পদ্ধতি অবলম্বন করে। ইসলামী ব্যাংক সর্বদা শরিয়াহ্ আইনের আওতায় লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। ফলে অনেক সময় অর্থনীতিবিদ ও সাধারণ জনগণ ইসলামী ব্যাংকিং ও প্রচলিত ব্যাংকিংয়ের মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য অনুধাবন করতে পারে না।

ইসলামী ব্যাংকিংয়ে বিনিয়োগের মুদারাবা ও মুশারাকা ধরন হলো আদর্শ। কিন্তু ইসলামী ব্যাংক এ দু'টো ধরন অনুসরণ করে না। এর কারণ – উপরোক্ত দু'টি ধরন প্রচলনের জন্য কোনো নিয়মতান্ত্রিক বিশ্লেষণ ও গবেষণা যেমন হয়নি তেমনি নেয়া হয়নি প্রকৃত প্রচেষ্টা। অবশ্য পেশাদাররা নিম্নোক্ত কারণগুলোকে দায়ী করেনঃ

ক) একনিষ্ঠ উদ্যোক্তার ঘাটতি,
খ) সৃজনশীল একনিষ্ঠ পেশাদারের অভাব,
গ) পদ্ধতি প্রক্রিয়া,
ঘ) একনিষ্ঠ স্পন্সরের অভাব, যারা কিনা পেশাদারদের এ ব্যাপারে চাপের মুখে রাখতে পারে,
ঙ) দক্ষ পেশাদার জনবলের অভাব।


www.pathagar.com

## আগাম চুক্তি বৈদেশিক মুদ্রা বুকিংয়ে সমস্যা

বাংলাদেশে মার্কিন ডলার, পাউন্ড, ইউরো ও অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রার মান নির্দিষ্ট নয়। এগুলোর দাম প্রায়ই ওঠানামা করে। আমাদের অধিকাংশ আমদানি-রফতানি হয় মার্কিন ডলারে। শক্তিশালী মুদ্রা হিসেবে মার্কিন ডলার সবসময় সামনে এগিয়ে থাকে এবং দেশের আমদানিকারকদের তুলনায় রফতানিকারকরা ভালো অবস্থায় আছেন। ভারী প্রকল্প-যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে এক বছর বা ৬ মাস লাগতে পারে। এমন দীর্ঘ সময়ের ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রার মানের তারতম্য সামলানোর জন্য বাংলাদেশে আগাম বুকিং প্রয়োজন হয়। কিন্তু শরিয়াহর বিধি-নিষেধের কারণে ইসলামী ব্যাংক আগাম চুক্তি করে বৈদেশিক মুদ্রা মানের তারতম্য এড়ানোর ঝুঁকি দূর করতে পারে না। আগাম বুকিংয়ের অনুমতি শরিয়াহ দেয় না। শরিয়াহ অনুযায়ী মুদ্রা বিনিময় হতে হবে শরিয়াহ কর্তৃক 'সরফ'-এর লিখিত সুনির্দিষ্ট শর্তের ভিত্তিতে। ইনল্যান্ড বিল পারচেজ/ফরেন বিল পারচেজ ইসলামী ব্যাংকের ক্ষেত্রে আরেকটি সমস্যা। দেখা যায় যখন রফতানিকারকরা তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন পূরণের জন্য বিল পরিপক্বতা লাভের আগেই রফতানিকৃত পণ্যের মূল্যের জন্য ব্যাংকের দ্বারস্থ হয়। এ ক্ষেত্রে প্রতি বছর ব্যাংককে শত শত কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে হয়। কিন্তু এটা কেন বা কি ধরনের বিনিয়োগ? বিল সংগ্রহের সামান্য ফি ছাড়া ব্যাংক রফতানিকারককে দেয়া তহবিলের জন্য কিছু গ্রহণ করতে পারে না।

## ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতির সাথে পরিচিতির অভাব

গত ৪০ বছর ধরে ইসলামী ব্যাংকের বিস্তার সত্ত্বেও মুসলিম ও অমুসলিম বিশ্বের অনেকেই বোঝেন না ইসলামী ব্যাংকিং আসলে কি, এটা প্রথম সমস্যা। অথচ ইসলামী ব্যাংকিংয়ের মূলনীতি পরিষ্কার। টাকা থেকে টাকা বানানো ইসলামী আইনের পরিপন্থী। ব্যবসা ও ভূসম্পত্তির মালিকানা থেকে সম্পদ আয় করতে হবে। তবে কোনটি ইসলামী ব্যাংকিংয়ের উৎপাদন, আর কোনটি নয় তার কোনো একক সংজ্ঞা আজো নেই। ইসলামী ব্যাংকিংয়ের একক সংজ্ঞাও এখনো কেউ দিতে পারেনি। এখানে একটি বড় ব্যাপার হচ্ছে, প্রতিটি ব্যাংকের শরিয়াহ কাউন্সিল বা বোর্ড নির্ধারণ করে কোনটি ইসলামী ব্যাংকিং আর কোনটি নয়, ব্যবসায় কোনটি গ্রহণযোগ্য আর কোনটি ব্যাংক ও গ্রাহক উভয়ের জন্য ঝুঁকিপুর্ণ আরো সহজভাবে বলতে গেলে, কি হবে আর কি হবে না। এই অনিশ্চয়তার কারণে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতিতে এখনো মান প্রমিতকরণ করা যায়নি। নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের জন্যও এটা কঠিন। কারণ, তারা জানতে চান তারা আসলে কিসের কর্তৃত্ব প্রদান করছেন। বাজারে নতুন আসা গ্রাহকদের পরিচিত করে তোলার বিষয়টিও এই ব্যাংকের জন্য একটি অতিরিক্ত সমস্যা।



www.pathagar.com

## পোর্টফলিও ব্যবস্থাপনা

যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক প্রতিনিধির আচরণ নির্ধারিত হয় অতীত অভিজ্ঞতা ও বর্তমান সীমাবদ্ধতা দ্বারা। অনেক দেশেই ইসলামী ব্যাংক এখনো অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মাধ্যমে বেড়ে উঠছে। সীমাবদ্ধতা হলো, অনেক দেশেই ইসলামী ব্যাংক তাদের পছন্দসই ও সবচেয়ে অনুকূল সংজ্ঞা বেছে নিতে পারে না। ফলে গ্রাহকের চাহিদা থাকলেই তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা যায় না এবং বিদ্যমান অর্থনৈতিক পরিবেশে কাঠামোগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নমনীয়তা প্রদর্শন করা সম্ভব হয় না। এছাড়াও ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় পরিচিত পছন্দসই পরিবর্তনও করা যায় না। যেমন, পরিপক্কতা লাভের পরও স্বল্পমেয়াদী তহবিলের একটা অংশ সাধারণত উত্তোলন করা হয় না। মধ্যম বা দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের জন্য এই তহবিল ব্যবহার করা হয়। ম্যাচিউরিটি ট্রান্সফরমেশন বা পরিপক্কতা রূপান্তরের পূর্বশর্ত হলো - অপ্রত্যাশিত প্রত্যাহার বা অন্য কোনো কারণে একটি ব্যাংক বাইরের উৎস থেকে তারল্য গ্রহণে সক্ষম হবে। সুদমুক্ত ইসলামী অর্থ ও পুঁজিবাজার না থাকায় এ ধরনের কার্যকর পরিপক্কতা রূপান্তরের পূর্ব শর্ত পূরণের মতো যথার্থ ব্যবস্থা ইসলামী ব্যাংকগুলোর নেই। অন্যদিকে সুদমুক্ত বন্ড মার্কেট বা ইসলামী ফিনান্সিয়াল পেপারসের জন্য একটি মাধ্যমিক বাজার থাকলে ইসলামী ব্যাংক টার্ম ট্রান্সফরমেশন জোরদার করতে পারে। এখনো অনেক আর্থিক পদ্ধতি উদ্ভাবন ঘটাতে হবে, তা না হলে আর্থিক মধ্যস্থতা বিশেষ করে ঝুঁকি ও ম্যাচিউরিটি ট্রান্সফরমেশন যথাযথভাবে কাজ করবে না।

## নিয়ন্ত্রণকারী পরিবেশ

ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক কর্তৃপক্ষের মধ্যে সম্পর্ক একটি স্পর্শকাতর বিষয়। প্রচলিত ব্যাংকিংয়ের জন্য তৈরি একই আইন-কানুনের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ও তদারক করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। লক্ষ্য-উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, ইসলামী ব্যাংক এমন এক পরিবেশে জন্মলাভ করেছে যেখানে আইন, প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ও মনোভাব গড়ে উঠেছে সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে সহায়তা করার জন্য। ইসলামী ব্যাংকগুলোর লাভ-লোকসানভিত্তিক কর্মতৎপরতা, আসলে বর্তমান দেওয়ানী আইনের আওতায় পুরোপুরি আসে না। বিরোধ নিষ্পত্তির প্রয়োজন দেখা দিলে, দেখা যায় দেওয়ানী আদালত ইসলামী ব্যাংকিং তৎপরতার যৌক্তিকতা সম্পর্কে যথাযথভাবে জ্ঞাত নয়।

ক) আমানত, যা লেনদেনের ভারসাম্য রক্ষা করে। এতে রয়েছে শতভাগ রিজার্ভ এবং তা নিরাপদ। ফলে ঝুঁকি এড়ানো যায়।

খ) লাভ-লোকসানে অংশীদারিত্ব বা ইক্যুইটি হিসাবে আমানতকারীদের বিবেচনা করা হয় ব্যাংকের শেয়ার হোল্ডারদের মতোই। এখানে লাভের হারের বা শেয়ারের মূল্যের নিশ্চয়তা নেই।



www.pathagar.com

অমুসলিম দেশগুলোতে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের অনুমতিদানের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো খুবই কঠোর। এসব দেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি কর্তৃপক্ষের বাড়তি শর্তাবলীও পূরণ করতে হয় (আইনগত বিধি-নিষেধ ছাড়াও বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অমুসলিম দেশে ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনাকে দুরূহ করে তোলে)। মুসলিম দেশেও অর্থনৈতিক বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হয় ইসলামী ব্যাংকের। তহবিল যোগান ছাড়াও গ্রহণযোগ্য বিনিয়োগ ক্ষেত্র খুঁজে বের করা ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

## তারল্য উপাদানের অনুপস্থিতি

অনেক ইসলামী ব্যাংকে ট্রেজারি বিল ও অন্যান্য বিপনণযোগ্য সিকিউরিটিজের মতো লিকুইডিটি ইন্সট্রুমেন্ট বা তারল্য উপকরণের অভাব রয়েছে। এসব উপকরণ তারল্য ঘাটতি বা অতিরিক্ত তারল্য সামাল দেয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেত। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চেয়ে ভিন্নতর পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংক কাজ করায় এই অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে উঠেছে। এই অসামঞ্জস্যতার ফলে ইসলামী ব্যাংকে যদি তারল্য ঘাটতি দেখা দেয় তাহলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক একে নিয়ন্ত্রণ বা সমর্থন যোগাতে পারে না। তাই ইসলামী ব্যাংকিংয়ের সাথে জড়িত কর্তৃপক্ষের উচিত তারল্য ব্যবস্থাপনার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে পর্যালোচনা ও সমাধানের পথ খোঁজা।

## আধুনিক প্রযুক্তি ও সংবাদ মাধ্যমের ব্যবহার

গ্রাহকদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য অধিকাংশ ইসলামী ব্যাংকেরই প্রডাক্ট এসেনশিয়ালের কোনো বৈচিত্র্য নেই। কোনো পণ্যের মানোন্নয়ন এবং এর ব্যবহার বহুমুখীকরণের ক্ষেত্রে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের গুরুত্ব বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। আধুনিক প্রযুক্তির সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে ইসলামী ব্যাংকে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা সাধন, ব্যবস্থাপনা ও নীতি নির্ধারণী কাঠামো ঢেলে সাজানো এবং সর্বোপরি এর প্রতিটি পর্যায়ে আধুনিক প্রযুক্তির প্রচলন ঘটাতে হবে। গবেষণা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনেক ইসলামী ব্যাংকের প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ জ্ঞান ও প্রাতিষ্ঠানিক যোগ্যতার ঘাটতি রয়েছে। অথচ এটা শুধু সম্ভাবনার পূর্ণ পরিস্ফুটনের জন্য নয়; তীব্র প্রতিযোগিতা, স্পর্শকাতর বাজার এবং সচেতন গ্রাহকদের এই যুগে ব্যাংকগুলোর টিকে থাকার জন্যও জরুরি।

## পেশাদার ব্যাংকারের প্রয়োজনীয়তা

ইসলামী ব্যাংকে পেশাদার ব্যাংকার বা ব্যবস্থাপকদের প্রয়োজনীয়তা এখন পর্যন্ত গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হচ্ছে না। এখনো অনেক ব্যাংক মালিক নিজেই সরাসরি পরিচালনা করেন বা এমন লোকদের দ্বারা পরিচালিত হয় যাদের ইসলামী ব্যাংকিং কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তেমন অভিজ্ঞতা নেই অথবা যারা প্রচলিত ব্যাংকিং পদ্ধতিতেই অধিক অভ্যস্ত। ফলে অনেক ইসলামী ব্যাংকই চ্যালেঞ্জ ও



www.pathagar.com

তীব্র প্রতিযোগিতা মোকাবিলায় সক্ষম হয় না। পেশার প্রতি একনিষ্ঠ যোগ্য ব্যাংকারদের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বাড়িয়ে ব্যাংকিং কর্মকাণ্ডে পেশাদারিত্ব তৈরি করা প্রয়োজন। ইসলামী ব্যাংকে কর্মরত পেশাদারদের বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হলে তাদের শিল্প, প্রযুক্তি ও ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে গভীর ধারণা অর্জন করতে হবে। ব্যবসায়িক উদ্যোগের পাশাপাশি বিনিয়োগের নৈতিক ও ধর্মীয় প্রয়োগ সম্পর্কেও তাদের ধারণা থাকতে হবে। ব্যাংকিং পেশাদারদের ইসলামিক ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্সের ক্ষেত্রে যথাযথ প্রশিক্ষণও দিতে হবে।

অধিকাংশ ব্যাংকের জনশক্তি প্রচলিত অর্থনীতিতে প্রশিক্ষিত। ইসলামী ব্যাংকিংয়ের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য তাদের দূরদৃষ্টি ও নিষ্ঠায় ঘাটতি রয়েছে। বর্তমান ইসলামী ব্যাংকগুলো অনেকটা স্থবির। গতিশীল কর্মসূচির অভাবই শুধু নয় এসব ব্যাংক এখন পর্যন্ত সংবাদ মাধ্যমকেও যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারছে না। এই বিশ্বে যে ইসলামী ব্যাংকিং সেবা চালু রয়েছে মুসলমানরাও সে ব্যাপারে খুব একটা সচেতন নয়। নিজেদের কর্মকাণ্ড তুলে ধরতে ইসলামী ব্যাংকগুলো এখন পর্যন্ত মিডিয়াকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে পারেনি। ইসলামী ব্যাংকগুলোর কর্তৃপক্ষকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিষয়টির ওপর নজর দেয়া উচিত।

## প্রচলিত ব্যাংকারদের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে ইসলামী পণ্ডিতদের দৃষ্টিভঙ্গি গুলিয়ে ফেলা

পেশাগত প্রকৃতির কারণেই ব্যাংকাররা বাস্তববাদী ও প্রয়োগমুখী। ইসলামী ব্যাংকে কর্মরত ব্যাংকারদের প্রবণতা হচ্ছে ইসলামী নীতিগুলোকে উপস্থিত লেনদেনের প্রয়োজন পূরণ করতে পারে এমনভাবে সাজিয়ে নেয়া। অধিকন্তু প্রতিদিনের ব্যস্ততার ফাঁকে কোনো গবেষণা করার সময় তাদের কমই থাকে। অথচ এ গবেষণা ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারত। অন্যদিকে যেসব বুদ্ধিজীবী ইসলামী ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্স নিয়ে গবেষণা করেন তাদের মনোভাব অনেকটা পদ্ধতিগত। অর্থাৎ কি হওয়া উচিত, এটা নিয়েই তারা অধিক ব্যস্ত। ব্যাংকিং বা গ্রাহকদের চাহিদা সম্পর্কে তাদের খুব কম জনেরই ধারণা আছে।

## ইসলামী অর্থবাজারের অনুপস্থিতি

বাংলাদেশে ইসলামী অর্থবাজারের অনুপস্থিতির কারণে ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের উদ্বৃত্ত তহবিল বিনিয়োগ করতে পারে না। এই তহবিল ব্যবহার করা যায় না বলে আয়ের বদলে তা অলস ফেলে রাখতে হয়। কারণ, বাংলাদেশে সরকারি ট্রেজারি বিল, অনুমোদিত সিকিউরিটিজ ও বাংলাদেশ ব্যাংক বিল - সব কিছুই সুদ উৎপাদক। ২০০৪ সালে বাংলাদেশ সরকার 'বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট



www.pathagar.com

ইসলামী ইনভেস্টমেন্ট বন্ড' চালু করে। ইসলামী ব্যাংকগুলো এক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে পারে। এর ফলে এ সমস্যার কিছুটা সমাধান হয়েছে।

## উপযুক্ত দীর্ঘমেয়াদী সম্পদের অনুপস্থিতি

ইসলামী ব্যাংকগুলোর উপযুক্ত দীর্ঘমেয়াদী সম্পদের অনুপস্থিতির প্রমাণ স্বল্পমেয়াদী লেনদেনযোগ্য আর্থিক উপাদনের স্বল্পতার মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে আন্তঃব্যাংক বাজারের মতো কোনো স্থান নেই যেখানে কোনো ব্যাংক গিয়ে দৈনন্দিন উদ্বৃত্ত তহবিল হাজির করতে পারে অথবা সাময়িক তারল্য ঘাটতি পূরণের জন্য যেখান থেকে তহবিল গ্রহণ করা যায়। আবার পরিপক্কতার আগ পর্যন্ত যেখানে লাভের হার জানা যায় না সেখানে ট্রেডিং ইন্সট্রুমেন্ট লেনদেনের ব্যবস্থা করাও কঠিন। তাছাড়া বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলো নতুন ধরনের ইন্সট্রুমেন্ট ব্যবহার করতে পারে কি না তাও পরিষ্কার নয়। প্রকৃত অর্থে এসব কার্যকারণ বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিংকে বেশ প্রতিকূল অবস্থায় ফেলেছে।

## সহায়ক ও সংযোগ প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতা

যত সমন্বিতই হোক না কেন, কোনো ব্যবস্থাই কেবল নিজস্ব উপায়-উপাদানের ওপর টিকে থাকতে পারে না। উপযুক্ত প্রকল্প চিহ্নিত করার জন্য ইসলামী ব্যাংকিং লাভজনকভাবেই অর্থনীতিবিদ, আইনজীবী, বীমা কোম্পানি, ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা, নিরীক্ষক ইত্যাদি পেশাদারের সেবা গ্রহণ করতে পারে। গ্রাহকদের মধ্য থেকে উদ্যোক্তা তৈরির জন্য ব্যাংকগুলোর গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ফোরাম থাকা প্রয়োজন। পুরোপুরে ইসলামী ব্যাংকিংমুখী এ ধরনের সহায়ক সেবা এখনো বাংলাদেশে গড়ে উঠেনি।

## বিদেশী ব্যাংকের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকগুলো আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে তা হলো, বিদেশী ব্যাংকগুলোর সাথে তাদের সম্পর্ক কিভাবে প্রতিষ্ঠা করা হবে। আরো সহজভাবে বলতে গেলে, কিভাবে আন্তর্জাতিক ব্যবসা তৎপরতা চালানো হবে। এটা অবশ্যই নতুন কোনো আর্থিক ইনস্ট্রুমেন্ট তৈরির সাথে জড়িত যে ইনস্ট্রুমেন্ট একই সাথে ইসলামী নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সুদভিত্তিক ব্যাংক, তথা বিদেশী ব্যাংকগুলোর কাছেও গ্রহণযোগ্য হবে।

## দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়ন

সরকারের মূল্য নির্ধারণ নীতির সাথে ইসলামী ব্যাংকগুলো গভীরভাবে যুক্ত থাকে কোনো যৌক্তিকতা ছাড়াই। উদ্যোক্তাদের মূল্যস্তর বাড়িয়ে দেয়ার মতো গোপন কস্ট ও ইনপুট থেকে এরা লাভবান হতে পারে না। অন্যদিকে, বিনিয়োগকৃত প্রকল্পের ব্যর্থতার জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইসলামী



www.pathagar.com

ব্যাংকগুলো লাভসহ তহবিল ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তা, প্রকল্পের সাফল্যের ওপর নির্ভর করে। অসততা ও উপেক্ষার মাধ্যমে অংশীদারের কাছ থেকে নিরাপত্তা আদায় করা ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়।

## সম্ভাবনা

আমার মতে, ইসলামী ব্যাংকিংয়ের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। দেশের ব্যাংকিং খাতের অন্তত ২১-২৪ ভাগ বাজার ইসলামী ব্যাংকগুলোর নিয়ন্ত্রণে। এর পরিধি ক্রমেই বাড়ছে। ইসলামী ব্যাংকিংয়ের প্রতি প্রচলিত ব্যাংকগুলো ঝুঁকছে। বর্তমানে ৮টি ইসলামী ব্যাংক ও ১৭টি প্রচলিত ব্যাংকে পৃথক ইসলামী ব্যাংকিং উইং চালু আছে। এদের মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত সোনালী ব্যাংক ও অগ্রণী ব্যাংকও রয়েছে। সারাদেশে শুধু ইসলামী ব্যাংকেরই ২৮০টি শাখা রয়েছে। ৮টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক মিলিয়ে এ সংখ্যা ৭৬৪ (আগস্ট ২০১৪)।

সব দেশে অবস্থা সমান না-ও হতে পারে। যদি কোনো একটি দেশেও ইসলামী ব্যাংক সফল হতে পারে, তাহলে আমার মতে প্রত্যেক মুসলিম দেশের অবস্থা একই হবে। এর মানে, কোনো দেশে প্রথম ইসলামী ব্যাংকটিকে দক্ষতার সাথে পরিচালিত এবং সফল হতে হবে। যাতে, জনগণ এর ওপর আস্থা রাখতে পারে। নতুন ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পুরনোগুলোর উচিত দক্ষ ও যোগ্য কর্মকর্তা ধার দিয়ে সাহায্য করা।

উপরে যেসব সমস্যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকে উত্তরণ অসম্ভব কোনো বিষয় নয়। আরও আন্তরিকতাপূর্ণ চেষ্টা ও গবেষণার মাধ্যমে এর অধিকাংশ সমস্যা দূর করা সম্ভব। আইডিবি, ওআইসি, ফিকাহ একাডেমি, আন্তর্জাতিক ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য ইসলামী ব্যাংকের উচিত ইসলামী ব্যাংকিং, ফাইন্যান্স ও অর্থনৈতিক ইস্যুগুলোতে গবেষণার জন্য আরো খরচ করা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সরকারি সহায়তার প্রয়োজন হবে।



www.pathagar.com

# বিশ্ব আর্থিক সংকট
# অংশীদারিত্ব ব্যাংকিংই একমাত্র সমাধান

পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ এখন উল্লেখ করার মতো আর্থিক সংকটের মধ্য দিয়ে সময় অতিবাহিত করছে। এ সংকট ১৯৩০-এর দশকের মতো ব্যাংকগুলোকে অচল অথবা ব্যাংকিং খাতের ব্যর্থতাকে নিয়ন্ত্রণের অযোগ্য করে না তুললেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এখন অর্থ সংকটে ভুগছে। এ ধরনের সংকট গত ৫০ বছরে কখনও দেখা যায়নি।

আইএমএফ-এর সমীক্ষা অনুযায়ী আইএমএফ-এর সদস্য দেশসমূহের দুই-তৃতীয়াংশের বেশি রাষ্ট্র উল্লেখ করার মতো আর্থিক সংকটের সম্মুখীন। ব্যাংকিং খাতের সংকটের কারণে সৃষ্ট উচ্চমূল্য ও সামষ্টিক অর্থনীতির নানা প্রতিবন্ধকতা আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাসমূহের বড় ধরনের উদ্বেগের কারণ হয়ে আছে।

সাম্প্রতিককালে এশিয়ার কিছু কিছু দেশ মারাত্মক মুদ্রা ও আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়। কয়েক দশকের সময়কার অর্থনৈতিক অগ্রগতির পর এশীয় দেশগুলো এ ধরনের সংকটের মুখোমুখি হয়। সর্বশেষ ২০০৮ সালে বিশ্ব অর্থনৈতিক ক্রাইসিস দেখা দেয়। শেয়ার মার্কেটের পতন হয়, অসংখ্য ব্যাংক বন্ধ হয়ে যায়, শিল্প বন্ধ হয় এবং লোকজন বেকার হয়। এটা চলছে।

বর্তমান সংকটের পূর্ব পর্যন্ত উন্নয়নশীল বিশ্বের মূলধন প্রবাহের অর্ধেকই এসেছে এশিয়ায়। বিগত দশকে বিশ্ববাজারে এশিয়ার বিকাশমান ও উন্নয়নশীল বাজার অর্থনীতির দেশসমূহের রপ্তানির পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণে উন্নীত হয়ে বিশ্ব রপ্তানির এক-পঞ্চমাংশে পৌঁছে। এ ধরনের প্রবৃদ্ধির রেকর্ড ও শক্তিশালী বাণিজ্য সাফল্যের নজীর অভূতপূর্ব এবং ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য অর্জন হিসেবে চিহ্নিত হয়। প্রশ্ন হলো, বহু বছরের অসাধারণ সাফল্যের পর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এসব ঘটনা কিভাবে ঘটল? ভুলটি হয়েছিল কোথায়?

বহু দিক থেকে থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া ও কোরিয়া প্রায় একই ধরনের সংকটের মোকাবিলা করছে। এসব দেশ আস্থার সংকটে ভুগছে এবং তাদের মুদ্রা ব্যাপক অবমূল্যায়নের শিকার। অধিকন্তু প্রতিটি দেশের দুর্বল আর্থিক ব্যবস্থা, অভ্যন্তরীণ বেসরকারি খাতের অতিমাত্রায় বিদেশী ঋণগ্রহণ এবং



www.pathagar.com

স্বচ্ছতার অভাব সংকটের সৃষ্টি করেছে এবং তা নিরসনের প্রচেষ্টাকে জটিল করে তুলেছে (আইএমএফ সমীক্ষা, বিভিন্ন সংখ্যা)।

১৯৯০-এর দশকে ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশ আর্থিক খাতের সংকটের সম্মুখীন হয়। এ সংকটের বৈশিষ্ট্য ছিল অব্যাহতভাবে আমানত প্রত্যাহার, পুঁজি নিয়ে সরে পড়া এবং ব্যাংকিং খাতের ব্যর্থতা। ল্যাটিন আমেরিকার মধ্যে ভেনিজুয়েলার সংকট মুদ্রাস্ফীতি ও প্রবৃদ্ধির ওপর সবচেয়ে বেশি নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। বস্তুত সামষ্টিক ব্যবস্থাপনার ভারসাম্যহীনতা, অসম্পূর্ণ আর্থিক উদারীকরণ, ব্যাপক হারে আভ্যন্তরীণ ঋণগ্রহণ, জালিয়াতিকে গোপন করে রাখার সুযোগ না পাবার মতো প্রয়োজনীয় ব্যাংকিং তত্ত্বাবধানের অভাব ইত্যাদির সম্মিলিত ফল হিসেবে আলোচ্য সংকটের সৃষ্টি হয়। ১৯৯৫ সালের গোড়ার দিকে সূচিত আর্জেন্টিনার আর্থিক খাতের সংকটের সময় ব্যাপক আকারে পুঁজির বহির্গমন লক্ষ্য করা যায়। মেক্সিকান অবমূল্যায়নের প্রভাব, চলতি হিসেবের ঘাটতি, নিম্নপর্যায়ের অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ও অবনতিশীল রাজস্ব ব্যবস্থা থেকে সৃষ্ট সামষ্টিক অর্থনীতির ভারসাম্যহীনতার ফলে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। ১৯৯৫ সালে শুরু হওয়া প্যারাগুয়ের ব্যাংকিং সংকটের সৃষ্টি হয় প্রধানত পর্যাপ্ত ব্যাংক সম্পর্কিত বিধি-বিধান ও তত্ত্বাবধান ছাড়াই আর্থিক উদারীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে। এতে অপর্যাপ্ত পুঁজিসর্বস্ব একটি আর্থিক ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়।

দক্ষিণ এশিয়ার সাম্প্রতিক মুদ্রা বিপর্যয়, পুঁজির প্রবাহ বর্ধিত এবং আর্থিক বাজারের ক্রমাগত বিশ্বায়নে উন্নয়নশীল দেশের বিশেষত বিকাশমান অর্থনীতির দেশের নীতিনির্ধারকদের কাছে উদারভাবে মুদ্রা ব্যবস্থাপনা সাজানোর উদ্যোগ প্রশ্নসাপেক্ষ হয়ে পড়েছে।

## আর্থিক সংকটের বিশ্লেষণ এবং ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের দিক নির্দেশনা

পূর্ব এশিয়ার সাম্প্রতিক আর্থিক সংকটের কারণসমূহের বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ সংকটের সমাধানের জন্য আর্থিক খাতের বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দিয়েছেন। প্রশ্ন হলো, সংকট নিরসনের জন্য দেয়া এসব পরামর্শ কতটুকু যথার্থ এবং তা কতটা ইসলামী নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?

বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অর্থনীতিবিদের প্রস্তাবিত সমাধান কতটা আমরা গ্রহণ করতে পারি? এসব সমাধান কি ইসলামী ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য এবং অর্থনীতির তত্ত্ব ও ধারণাসমূহ কি অপরিহার্যভাবে মূল্য নিরপেক্ষ? আর্থিক সংকট দূর করা বা তা প্রতিহত করার ব্যাপারে কি বিশেষ ইসলামী কৌশল ও কর্মসূচি রয়েছে?

১৯৯৭-৯৮ এর এশীয় আর্থিক সংকটকে সংক্ষিপ্তভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় অর্থনীতিবিদ, আইএমএফ কর্মকর্তা ও অন্যরা প্রধানত নিম্নে উল্লেখিত কারণগুলোর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন। এর মধ্যে সর্বাগ্রে রয়েছে, এসব



www.pathagar.com

দেশের অধিকাংশতেই কৃত্রিম বিনিময় হার বজায় রাখার মাধ্যমে স্থানীয় মুদ্রাকে অতিমূল্যায়িত করে রাখা হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সময়মত ও যথাযথভাবে মুদ্রার অবমূল্যায়ন অনুমোদন করেনি। এর ফলে অধিকাংশ দেশেই চলতি হিসাবের ঘাটতি স্ফীত হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত বিনিময় হারের পতন ঘটেছে। একই সময়ে মুদ্রার ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের আন্দাজ-অনুমান এবং ভবিষ্যত বাণীও আস্থায় চিড় ধরিয়েছে। এটি মুদ্রার বিনিময় হারকে দ্রুত নিচে নামিয়ে আনার ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে।

দ্বিতীয়ত, এসব দেশ বিপুল অংকের বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করেছে, যার অধিকাংশ নেয়া হয়েছে বেসরকারি খাত থেকে। এসব ঋণের সিংহভাগ স্বল্প মেয়াদের জন্য গ্রহণ করে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ করা হয়। আর্থিক সংকটের সামান্য আভাস পাবার পর বিদেশী পুঁজির ব্যাপক বহির্গমন শুরু হয়। যা থেকে বড় আকারের তারল্য সংকটের সূত্রপাত ঘটে। সংকট কবলিত দেশগুলোর মধ্যে আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক ও কয়েকটি আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থার উদ্ধার প্যাকেজ সহায়তা ছাড়া উক্ত ঋণ ফেরত দানেও অসমর্থ হয়ে পড়ে। বিদেশী পুঁজির আকস্মিক নির্গমনের ফলে স্থানীয় মুদ্রার মূল্যমান দ্রুত পড়ে যায়, মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পায়, প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পায়, বেকারত্ব বাড়তে থাকে, আয় কমে যায়, সামাজিক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, এমনকি কোথাও কোথাও দাঙ্গা-হাঙ্গামা বেধে যায়।

তৃতীয়ত, এসব দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও ব্যাংকিং তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রেও মারাত্মক সমস্যা ছিল। বিদেশ থেকে নেয়া তহবিলসহ বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করা হয় মন্দ খাতে। এ কারণে এসব দেশ ১৯৯৭-৯৮ সালের সংকট দেখা দেয়ার আগে থেকেও মন্দ ঋণের সমস্যার সম্মুখীন হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকও তত্ত্বাবধান এবং বিধিগত অনুশাসনমূলক দায়-দায়িত্ব পালন করতে পারেনি। ফলে সংকটের সৃষ্টি হবার পর অধিকাংশ ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সহায়তা অথবা বিদেশ থেকে কোনো উদ্ধার প্যাকেজ ব্যতিরেকে তাদের বৈদেশিক দায় মেটাতে ব্যর্থ হয়। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে আর্থিক সংকটের সমাধানের জন্য যে প্রস্তাব করেছেন তার মূল বক্তব্য নিচে দেয়া হলোঃ

এক. যেসব দেশ মুক্তভাবে অথবা নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে নমনীয় বিনিময় হার অনুসরণ করেছিল তা তাদের বজায় রাখা উচিত। আমার বিবেচনায়, এটি ভবিষ্যতের জন্য একটি যুক্তিসঙ্গত কার্যক্রম হবে। তা না হলে অতিমূল্যায়িত মুদ্রার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সামনেও অব্যাহত থাকবে।

দুই. বেসরকারি বিনিয়োগ প্রবাহকে অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। স্বল্পমেয়াদী বেসরকারি পুঁজি অত্যন্ত সতর্কভাবে ব্যবহার করা উচিত।

প্রকৃত খাতে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা দরকার। প্রয়োজনবোধে দেশে স্বল্পমেয়াদী পুঁজি প্রবাহের পর্যায় ও শর্তাবলী কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্ধারণ করতে পারে।



www.pathagar.com

আমার বিবেচনায় বেসরকারি পুঁজিপ্রবাহ, বিশেষভাবে স্বল্পমেয়াদী বেসরকারি পুঁজিপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। স্বল্পমেয়াদী বাজারে নানা সমস্যা দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে দায়-দায়িত্ব সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক উপেক্ষা করতে পারে না।

তিন. আর্থিক ব্যবস্থার সব ত্রুটি-বিচ্যুতির সংশোধন করা প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এমনভাবে ব্যাংকগুলোকে পরিচালনা করা উচিত যাতে মন্দ ঋণ সমস্যা ও তারল্য সংকটের কারণে কোনো বিপর্যয় সৃষ্টি হতে পারে - এমন মন্দ বিনিয়োগ কোনোভাবেই এসব ব্যাংক করতে না পারে। আর্থিক সংকটে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে যে, একটি শক্তিশালী ও কার্যকর কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং গতিশীল আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন কত বেশি।

ভবিষ্যতে যে কোনো দেশ যাতে আর্থিক সংকট থেকে রক্ষা পেতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পর্কে উপরে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। এসব সমাধানকে ইসলামী অর্থনীতিবিদ ও ইসলামী সরকারও অন্যদের সাথে অনুসরণ করতে পারেন। বিশেষ কোনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে এসব কর্মসূচিকে সংযুক্ত করার কোনো যুক্তি থাকতে পারে বলে মনে হয় না।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তত্ত্বাবধান, বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ কার্যক্রম, বিনিময়নীতি, হার প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি ইসলামী বা অ-ইসলামী শাসনে একই রকম থাকতে পারে। একই সাথে এটাও বলা যায় যে, অর্থনীতির অধিকাংশ তত্ত্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বোঝা, ব্যাখ্যা করা ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য উপকরণ ছাড়া আর কিছু নয় (কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে), অবশ্য ইসলামী অবকাঠামোতে ন্যায়বিচার ও নৈতিক মানদন্ডসহ আরো কিছু বিষয় বিবেচনায় আনা হয়। অনেক কারণে উপরে সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখিত আর্থিক সংকট থেকে বাঁচার ক্ষেত্রে ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অধিকতর কল্যাণকর প্রতীয়মান হয়। ভালো ব্যবস্থাপনা ও যুক্তিযুক্ত তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে একটি শ্রেষ্ঠ নমুনা হিসেবে চিহ্নিত করে 'ইকোনমিস্ট' (লন্ডন) বলেছেঃ 'পাশ্চাত্য আধুনিক যুগেও ইসলামের কাছ থেকে ইকুইটি ব্যাংকিং বা অংশীদারিত্বের ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা নিতে পারে' (দি ইকোনমিস্ট, আগস্ট ১৯৯৪, ৬ষ্ঠ সংখ্যা)।

ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় মন্দ বিনিয়োগের সম্ভাবনা অনেক হ্রাস পায়। এ ব্যবস্থায় বিনিয়োগের ব্যাপারে অনেক বেশি তত্ত্বাবধান করা হয় বলে যে কোনো ইকুইটি স্কিমে মন্দ ঋণের সম্ভাবনা অনেক কমে যায়। 'মুশারাকা' ব্যবস্থায় বিদেশী তহবিল নেয়া হলে এ ধরনের পুঁজির অসময়ে পালিয়ে যাওয়া বা প্রত্যাহার করে নেয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

দ্বিতীয়ত, ইসলামী ব্যবস্থায় ধারণা-অনুমানের আচরণ (Speculation) অত্যন্ত কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ইসলাম জুয়াকে নিষিদ্ধ করেছে। ইসলামে অনুমাননির্ভর ব্যবস্থাকে দারুণভাবে অপছন্দ বলে ঘোষণা করা



www.pathagar.com

হয়েছে। এটি সত্য যে, অনেকসময় স্বাভাবিক ব্যবসায়িক কার্যক্রম ও অনুমানের মধ্যে পার্থক্য করে অনুমানকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তবুও ইসলামী ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক কর্তৃপক্ষ অনুমানভিত্তিক তৎপরতার (শেয়ার বাজার অথবা মুদ্রা বাজার অথবা অন্য যে কোনো ক্ষেত্রেই হোক না কেন) উপর ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ রাখে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষ পদক্ষেপ গ্রহণ অথবা দিকনির্দেশনা জারি করতে পারে। যদি সবকিছুকে মুক্ত রাখার পক্ষপাতি একশ্রেণীর অর্থনীতিবিদের বিরোধিতা সত্ত্বেও অর্থনীতির স্বার্থে প্রয়োজন হয় অথবা জনগণ চায় তাহলে এ পদক্ষেপ নিতে হবে। অর্থনীতির আকস্মিক পরিবর্তনশীলতা ইসলামী অর্থনীতিতে কম দেখা যায়। এটা স্বীকৃত যে, ভালো ব্যবস্থাপনার উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। আর্থিক সংকট থেকে রেহাই পাবার ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যবস্থার যে সুবিধা তা অন্য কোনোভাবে পাওয়ার সুযোগ নেই।



www.pathagar.com

# দারিদ্র্য বিমোচন ঃ ইসলামের কৌশল

ইসলাম দারিদ্র্য বিমোচনে সক্ষম কি-না? এই প্রশ্নের উত্তর ভাবতে গেলে একদিকে মনে হয় এই প্রশ্নটি সঠিক নয়। কেননা, ঐতিহাসিক বিচারে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখবো ইসলাম যখন বিস্তার লাভ করে, তার খিলাফতের যখন বিস্তার হয় তারপর থেকে বিভিন্ন সময়ে পর্যায়ক্রমে সম্পূর্ণভাবে দারিদ্র্য উৎখাত হয়ে গিয়েছিল। ঐতিহাসিকভাবে দেখা গেছে, এমন সময় পার হয়েছে যখন যাকাত নেয়ার লোক ছিল না। যাকাত নেয়ার লোক কখন থাকে না, যখন কোনো সমাজে দারিদ্র্য থাকে না। কিন্তু আজকের আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজ কি এই দাবি করতে পারবে যে, সাহায্য নেবার কেউ নেই? আমেরিকা কি দাবি করতে পারবে, তাদের সাহায্য নেবার কেউ নেই? এর থেকে বোঝা যায় ইসলামের ইতিহাস অনেক গৌরবোজ্জ্বল আর এই অর্থে সুপিরিয়র, শ্রেষ্ঠ যে সে দারিদ্র্য দূর করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু এই দাবি পুরোপুরিভাবে পশ্চিমা বিশ্ব এখনো করতে পারবে না। এইদিক থেকে বিবেচনা করতে গেলে ইসলাম দারিদ্র্য বিমোচন করতে সক্ষম কি না - এই প্রশ্নটি অযৌক্তিক মনে হয়। কিন্তু এই প্রশ্নটিই মাঝেমধ্যে শুনতে হয়। আবার একদিক থেকে এই প্রশ্নটি সাধারণ মানুষের মধ্যে আসতে পারে। কেননা, তারা বলে ইসলামে আখিরাতের কথা বলা হয়, এবাদত-ঈমানের কথা বলা হয়, নামাজ, রোজা, হজ্জের কথা বলা হয়, কিছুটা যাকাতের কথা বলা হয়। তাহলে এখানে দারিদ্র্য বিমোচন করার ওপর কিংবা অর্থনীতির ওপর তেমন গুরুত্ব দেয়া হয়েছে বলে মনে হয় না। এর থেকে তাদের ধারণা হয়, ইসলামে প্রকৃতপক্ষে দারিদ্র্য বিমোচনের কোনো কথা বলা হয়নি। কিংবা ইসলামের আলোকে হয়তো বা দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব হবে না।

কিন্তু ঐতিহাসিক যে বিচারের কথা প্রথমেই উল্লেখ করেছি সেটা ছাড়াও তারা এটা ভুলে যায় যে, ইসলাম দুনিয়ার কথা বলেছে। ইসলাম বলেছে, 'রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানা' - এই কথা তারা ভুলে যায় যে, কুরআনে সূরাতুল বাকারার ২০১ আয়াতে প্রথমত দুনিয়ার কল্যাণের কথা বলা হয়েছে - আখিরাতের কল্যাণের পূর্বে। আবার ইসলামে কাজের কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, তোমরা কাজ কর। আমল কর। কিন্তু তোমরা বসে থাকো - এইকথা ইসলাম বলেনি। আবার ইসলাম ব্যবসার কথা বলেছে। বলেছে সম্পদের ব্যাপক বিতরণের কথা, মানুষের অধিকারের কথা। ইসলামে হকের কথা বলা



www.pathagar.com

হয়েছে। ইসলামে 'হাক্কুল ইবাদ' অর্থাৎ বান্দার অধিকারের কথা বলা হয়েছে। এগুলোকে যদি আমরা সামনে রাখি তাহলে একথা ভাবার কোনো কারণ নেই যে, ইসলাম শুধু আখিরাতের কথা বলেছে। শুধু ঈমানের কথা বলেছে। তবে আমি একথাও বলব যে, সাধারণ মানুষ বা যারা জানে না তাদের পুরো দোষও দেয়া যাবে না। কেননা, তারা জুমার খুতবায়, ঈদের খুতবায়, আলেমদের ওয়াজ মাহফিলের আলোচনায় সাধারণভাবে ইসলামের অর্থনীতির কথা শোনেনি। তারা 'মুদারাবা' নামে যে এক ধরনের বিনিয়োগ পদ্ধতি আছে সেই 'মুদারাবা'র কথা শোনেনি। মুদারাবা হলো এক পক্ষ কাজ করবে আরেক পক্ষ অর্থ দেবে। আবার তারা 'মুশারাকা'র কথাও শোনেনি। এটা হলো এক ধরনের শরীকদারী ব্যবসা-বাণিজ্য বা শিল্প যাতে শরীকদের পুঁজি একত্র হয়। আবার 'ইসতিসনা' বা ম্যানুফ্যাকচারিং কন্ট্রাক্ট (Manufacturing contract)-এর কথাও শোনেনি। যদি বলি, আজকের বাংলাদেশের ষোল কোটি মানুষের মধ্যে কতজন 'ইসতিসনা'র কথা শুনেছে তা চিন্তার বিষয় হবে। কিন্তু এইসব কথা তারা খুতবায়, ওয়াজে শোনেনি। ফলে তাদের কি করে দোষ দেয়া যায় যে, কেন তারা এই প্রশ্ন করে, ইসলাম দারিদ্র্য বিমোচন করতে সক্ষম কিনা। এই প্রসঙ্গে এখানে একথা বলতে হয় যে, ইসলামের লক্ষ্য হলো জনকল্যাণ। ইসলামের শ্রেষ্ঠ আলেমগণও তাঁদের পুস্তকাদিতে এই কল্যাণের কথা বলেছেন। এঁদের মধ্যে ইমাম গাযালী, ইমাম শাতিবি, ইবনুল কাইয়্যেম-এর কথা উল্লেখ করা যায়। 'মাকাসিদ আল-শরিয়াহ' বা শরিয়াহর লক্ষ্য হচ্ছে জনকল্যাণ। জনকল্যাণ কি? জনকল্যাণ হচ্ছে যা কিছু ঈমান বা বিশ্বাসের, বুদ্ধিবৃত্তি, প্রাণ বা জীবন, মাল বা অর্থনীতি, ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য কল্যাণকর সেগুলোকে তারা বলেছেন, প্রকৃত জনকল্যাণ। আর যা কিছু এসবকে নষ্ট করে অর্থাৎ জীবনের কল্যাণ, অর্থ বা অর্থনীতি কিংবা মালের কল্যাণের বিরোধী হবে, যা কিছু ঈমানের বিরোধী হবে, যা কিছু মানুষের বুদ্ধি-বিবেক নষ্ট করে সেগুলোকে 'মাফাসিদ' বা অকল্যাণ বলে গণ্য করা হবে। (দ্রষ্টব্য: ইমাম গাযালী, আল-মুসতাসফা, ১ম খণ্ড; ইবনুল কাইয়্যেম, ই'লাম আল-মুয়াক্কিয়িন, তৃতীয় খণ্ড)।

আবার সহজ করে বলতে গেলে ইসলামের লক্ষ্য হচ্ছে জনকল্যাণ। আমরা লক্ষ্য করেছি, আধুনিক যুগে যারা ইসলামী অর্থনীতি নিয়ে লিখেছেন, যেমন ড. ওমর চাপরা, ড. ফাহিম খান, ড. মনওয়ার ইকবাল, প্রফেসর খুরশীদ আহমদ, ড. তরিকুল্লাহ খান, ড. নাজাতুল্লাহ সিদ্দিকী, ড. মনজের কাহাফসহ অন্যান্য বড় বড় ইসলামী অর্থনীতিবিদের কথা যদি বলি তাহলে দেখবো তারা যে ইসলামী অর্থনীতির দার্শনিক ভিত্তি খাড়া করেছেন তার মধ্যে একটি হচ্ছে আদল বা জাস্টিস। তারা কুরআন বিশ্লেষণ করে বলেছেন, কুরআনে প্রায় একশ' আয়াত আছে যেখানে আদল, জাস্টিস, ইনসাফ বা ন্যায়বিচারের কথা বলা হয়েছে। আবার একশ' আয়াত আছে যেখানে জুলুমের বিরুদ্ধে কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ তারা বোঝাতে চাচ্ছেন মোটামুটি প্রায় দু'শ' আয়াতে ইনসাফ করার কথা বলা হয়েছে।



www.pathagar.com

তারা বলেছেন, ইনসাফ করার মূল তাৎপর্য হচ্ছে মানুষের প্রয়োজনকে মেটাতে হবে। ইংরেজিতে তারা বলেছেন Need fulfillment করতে হবে। তার মানে এই দাঁড়ায় যে, ইসলামী শরীয়তের লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের কল্যাণ (Welfare)। আবার ইসলামী শরীয়তের যে দর্শন, অর্থনীতির যে দর্শন সেখানেও রয়েছে জাস্টিস। আর জাস্টিসের অন্যতম তাৎপর্য হচ্ছে প্রয়োজন মেটানো। জাস্টিসের এছাড়াও অনেক তাৎপর্য আছে। কাজেই যেই অর্থনীতির দর্শনে রয়েছে নিড ফুলফিলমেন্ট বা প্রয়োজন পূরণ করা, তাহলে এটা কি করে বিশ্বাস করা যায় যে, সেই অর্থনীতি দারিদ্র্য বিমোচন করতে চায় না, তা দূর করার কর্মকৌশল দেবে না?

এখন প্রশ্ন হলো, ইসলামী অর্থনীতি দারিদ্র্যতা দূর করার জন্য কি পদ্ধতি গ্রহণ করেছে? কি কৌশল (Strategy) গ্রহণ করেছে? অর্থনীতিতে এভাবেই ইসলাম তার কৌশল ও কর্মপদ্ধতিকে সাজিয়েছে যে, মানুষ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করবে - এটা হবে শরীয়তের সীমার মধ্যে। সে রোজগার করবে। তার সম্পত্তির ওপর তার অধিকার রয়েছে এবং থাকবে। ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক যে মালিকানা হয় তা তার থাকবে। সে স্বাধীনভাবেই ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্প গড়তে পারবে।

এমনভাবে যদি অর্থনৈতিক কাঠামো গঠন করা যায় বা সাজানো যায় তাহলে দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা হবে। তবে কিছুটা সময় অবশ্য লাগবেই। এর সবকিছু নির্ভর করে যদি সরকার ইসলামী সরকার হয় কিংবা কমিটেড হয় এবং জনগণ তা চায় কি-না। আর সরকার যদি ইসলামিক না হয় কিংবা ইসলামের প্রতি কমিটেড বা আগ্রহী না হয় বা তার প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বা অঙ্গীকারাবদ্ধ না হয় অথবা জনগণ যদি এ ব্যাপারে আগ্রহী না হয় তাহলে তো ইসলামের যে কর্মসূচি তা কার্যকর হবে না। এক ব্যক্তি যদি পরাধীন হয়, স্বাধীন না হয় তাহলে তার মধ্যে প্রতিভার স্ফূরণ হয় না। সুতরাং যে অর্থনীতি মৌলিকভাবে স্বাধীন নয় সেখানে অর্থনৈতিক উদ্যোগ বেশি হবে না, প্রবৃদ্ধি (Growth) বেশি হবে না। কিন্তু যেহেতু ইসলাম ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শরিয়াহর সীমার মধ্যে মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছে ফলে তা যদি কার্যকর করা যায় তাহলে এখানে ব্যক্তির বিকাশ বা স্ফূরণ পূরণ হবে। অর্থনীতির বিকাশ হবে। যার ফলে স্বাভাবিকভাবেই অধিকাংশ লোক নিজেদের রোজগারের ব্যবস্থা নিজেরা করে নেবে। আর এটাও স্বাভাবিক, যে কোনো অর্থনীতিতে মানুষ নিজেরা নিজেদের আয়-রোজগারের ব্যবস্থা করে থাকে।

একথা সত্যি যে, ইসলামী অর্থনীতিতে এমনভাবে স্ট্রাকচার করা হবে যাতে মানুষ নিজেরাই তাদের আয়-রোজগারের ব্যবস্থা করতে পারে। এই প্রসঙ্গটি আমরা একটু পরেই আলোচনা করব। তারপরও যারা কোনো কারণে রোজগার কিংবা প্রয়োজনীয় আয় করতে পারবে না তাদের দায়িত্ব ইসলামী



www.pathagar.com

ব্যবস্থায় পরিবার বা আত্মীয়-স্বজনদের ওপর বর্তাবে। আবার তারাও যদি সে দায়িত্ব পালন করতে না পারে তাহলে সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির দায়িত্ব পড়বে রাষ্ট্রের ওপর।

এখানে একটা পার্থক্য রয়েছে - ইসলাম যেটাকে ওয়েলফেয়ার স্টেট বা কল্যাণ রাষ্ট্র বলেছে, এর সাথে পাশ্চাত্যের কল্যাণ রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। পাশ্চাত্যে ওয়েলফেয়ার রাষ্ট্রে (যেমন সুইডেন) যদি কোনো লোক নিজে তার ব্যবস্থা করতে না পারে তাহলে তার দায়িত্ব রাষ্ট্রের ওপর চলে যায়। এরফলে সেখানে একটা খারাপ দিক দেখা দেয় - তা হলো রাষ্ট্রের ওপর অনেক বেশি বোঝা বাড়ে। আর রাষ্ট্রের ওপর যদি বোঝা বেড়ে যায় তাহলে রাষ্ট্রকে সেটা মোকাবিলা করার জন্য জনগণের ওপর বেশি ট্যাক্স বসাতে হয়। রাষ্ট্রকে অনেক বেশি ঋণ (Borrow) করতে হয়। আর ঋণ নিলে পাশ্চাত্যের সিস্টেমে সুদ দিতে হয়। কাজেই দেখা যায়, বাধ্য হয়ে ঋণ নিতে হয়, তার ওপর সুদও দিতে হয়। অথবা ট্যাক্স করতে হয়। না হলে দু'টোই করতে হয়। যার ফলে কিছুদিন এভাবে চলে। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে (long-term) একটা পর্যায়ে যাওয়ার পর এটা আর চলে না, স্থবির হয়ে যায়। এটা খুব কষ্টসাধ্য হয়ে যায়।

এ জন্য পাশ্চাত্যের ওয়েলফেয়ার ইকোনমি বা জনকল্যাণ রাষ্ট্রগুলো ক্রমেই রিট্রিট করছে। ক্রমেই তারা পিছিয়ে আসছে জনকল্যাণমূলক প্রোগ্রাম থেকে। এগুলোকে তারা কাট-ছাঁট করতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু ইসলাম এই বিষয়টিকে এভাবে মোকাবিলা করছে যে, যদি কোনো ব্যক্তি নিজে আয়-রোজগার করতে না পারে তাহলে তাৎক্ষণিকভাবেই তার দায়িত্ব রাষ্ট্রের ওপর পড়বে না; বরং তা তার পরিবারের ওপর পড়বে। তার ছেলের, পিতা বা ভাইয়ের ওপর পড়বে। কিংবা অন্য কোনো আত্মীয়ের ওপর পড়বে। আর রাষ্ট্র এটা দেখবে যে, তারা এ দায়িত্ব পালন করছে। এখানে যদি কেউ বেআইনি কাজ করে তাহলে তার জন্য রাষ্ট্র তাকে শাস্তি দিতে পারে, তাকে বাধ্য করতে পারবে। এর জন্য তার ওপর আইনগত বাধ্যবাধকতা (Obligation) হবে। কিন্তু এ সবকিছু করার মতো তার যদি কেউ না থাকে তা হলে কেবলমাত্র তখনই তার দায়িত্ব রাষ্ট্রের ওপরে পড়বে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, পাশ্চাত্যের ওয়েলফেয়ার সিস্টেমে রাষ্ট্রের ওপর যে বিরাট দায়িত্ব চলে আসে তার তুলনায় ইসলামের ওয়েলফেয়ার রাষ্ট্রে দায়িত্ব কম আসে। যার ফলে ইসলামের ওয়েলফেয়ার রাষ্ট্র More sustainable, এটা বেশি কার্যকর। এটাকে কার্যকর করাও সম্ভব। যেটা পাশ্চাত্য দীর্ঘমেয়াদে সম্ভব হয় না বলেই সেখানে ওয়েলফেয়ার সিস্টেম ধসে (Collapse) পড়ছে। নর্থ ইউরোপ, বৃটেন, আমেরিকাসহ বিভিন্ন জায়গায় এই ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। যার ফলে তারা আবার পুরোনো ক্যাপিটালিজম সিস্টেমে ফিরে যাচ্ছে কিংবা যেতে বাধ্য হচ্ছে।



www.pathagar.com

এই ওয়েলফেয়ার সিস্টেম যেটার কথা ইসলাম বলছে তার মধ্যে যাকাত একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচনের যে কর্মসূচি তার মধ্য যাকাত একটা ভূমিকা পালন করবে। সেখানে রাষ্ট্র যাকাত আদায় করবে।

কি পরিমাণ যাকাত আমাদের দেশে আদায় হতে পারে তার একটা হিসাব কিছুদিন আগে আমরা করে দেখেছি। প্রায় ২৪০০ কোটি টাকা যাকাত আদায় করা সম্ভব (২০০২ সালের হিসাব)। এটা এক বছরের কথা বলা হয়েছে। এখানে খুব কমই হিসাব করা হয়েছে। এর পরিমাণ আরো বেশি এমনকি পাঁচ হাজার কোটি টাকা পর্যন্ত হতে পারে। আমরা কম করে ২৪০০ কোটি টাকা হিসাব করলেও যদি এই টাকা সত্যিই রাষ্ট্র আদায় করে এবং এটা যদি শুধুমাত্র দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যবহার করা হয় তাহলে এটা দারিদ্র্য বিমোচনে বিরাট ভূমিকা রাখবে। কিন্তু যদি ধরি তা রাষ্ট্র আদায় করবে না, ব্যক্তি বা সমাজ করবে আর সেটাও যদি আমরা মেনে নেই তাহলে যে ২৪০০ কোটি টাকা আদায় হবে তা গরীবদের মাঝে বন্টন (Transfer) হবে, ধনীদের কাছ থেকে। এটা যদি সিস্টেমেটিক্যালি করা যায়, সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে করা যায় এবং এমনভাবে করা যায় যেটা ইসলামের লক্ষ্য, এমনভাবে দেয়া হবে যে গ্রহীতা ব্যক্তি জীবনের মতো স্বাবলম্বী হয়ে যায়। হযরত ওমর (রা.)-এর বিখ্যাত বক্তব্য হলোঃ তুমি এমনভাবে দাও যাতে সে ধনী হয়ে যায়। অর্থাৎ তাকে যেন আর কোনদিন যাকাত না নিতে হয়। যাতে তার কোনো না কোনো কাজের ব্যবস্থা হয়ে যায়। একটা Self-employment হয়। তার যেন একটা ব্যক্তিগত আয়-রোজগারের ব্যবস্থা হয়ে যায়। কাজেই যাকাতের কার্যকারিতার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র করুক বা সমাজ করুক এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে।

যাকাত ব্যবস্থার সাথে সাথে 'ওয়াকফ' তার ভূমিকা পালন করবে। আমাদের ওয়াকফ সিস্টেম ধ্বংস হয়ে গেছে। আমরা এটাকে নষ্ট করে ফেলেছি। কিন্তু আমরা জানি যে, ইসলামের ইতিহাসে ওয়াকফ'র বিরাট ভূমিকা ছিল, যেটা বর্তমানে নষ্ট হয়ে গেছে। আমরা তা অস্বীকার করতে পারি না। সেটাকে আমাদের পুনরুদ্ধার (revive) করতে হবে। এক সময় ইসলামে যে দারিদ্র্য বিমোচন হয়েছে তা মূলত একদিকে যাকাত আর একদিকে ওয়াকফ'র কারণ। এমন সময় গেছে যখন সবাই চাইত কিছু না কিছু সম্পত্তি আল্লাহর পথে দিতে। সেটা দিতো বলেই সেই সময় সকল স্কুল ফ্রি চালানো সম্ভব হতো। ওয়াকফ'র কারণে সকল ইউনিভার্সিটি ফ্রি চালানো হতো। অর্থাৎ গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাই। ওয়াকফ'র কারণেই সকল চিকিৎসা ফ্রি চালানো হতো। পথিক কিংবা আগন্তুকদের জন্য যে সরাইখানার ব্যবস্থা ছিল তাও ওয়াকফ সম্পত্তির মাধ্যমেই ফ্রি চালানো সম্ভব হতো।

তেমনিভাবে ওয়াকফকে একটি লম্বা সময় ধরে পুনর্গঠন করার কথা জনগণকে বোঝানো দরকার। জনগণ যদি এটা বুঝতে পারে এবং যদি সত্যিই



www.pathagar.com

আগের দিনের লোকদের মতো যেভাবে তারা আল্লাহর পথে দান করত, সেভাবে প্রত্যেক ধনীই যদি ওয়াকফ করে যান তাহলে ব্যাপকভাবে সমাজে দারিদ্র্য দূরীকরণে, উন্নয়নে এই ব্যবস্থা একটা ভূমিকা রাখতে পারে।

ড. ওমর চাপরা তার বইতে উল্লেখ করেছেন, একসময় গেছে যখন দশ থেকে পনের ভাগ পর্যন্ত মানুষের সম্পত্তি ওয়াকফতে চলে গিয়েছিল যেগুলোর মাধ্যমে অর্জিত আয় সম্পূর্ণ জনকল্যাণে, মানুষের দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যবহার করা হতো। আমরা জানি, সোভিয়েত ইউনিয়নে ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য ক্ষমতায় যাবার পরপরই সমস্ত ওয়াকফ প্রপার্টি বাতিল করে দেয়া হয়। এর একটা অন্যতম কারণ হলো যাতে করে সোভিয়েত ইউনিয়নে ইসলামী শিক্ষা বন্ধ হতে পারে। সেখানে স্কুলগুলো চলতো এসব ওয়াকফ প্রপার্টির মাধ্যমে। (দ্রষ্টব্য: Islam in the Soviet Union, Alexander Bennigsen)।

যা-ই হোক, দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে যাকাতের ভূমিকা থাকবে যা আগেই উল্লেখ করেছি। সেই সাথে ওয়াকফ তার ভূমিকা পালন করবে। নতুনভাবে, নতুন করে আমাদের ওয়াকফ চালু করার ব্যবস্থা করতে হবে। সেই সাথে ব্যাংকিং ব্যবস্থাকেও তার যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হবে। আমরা জানি, ইসলাম ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে নতুনভাবে সংগঠিত করার কথা বলে। এটা সুদভিত্তিক হবে না। এটা মুদারাবাভিত্তিক, মুশারাকাভিত্তিক হবে। মুরাবাহাভিত্তিক হবে। ব্যবসাভিত্তিক হবে। এখানে শোষণের সুযোগ কম থাকবে। যদিও একথা এখনো পুরোপুরি বলা সম্ভব নয় যে, ইসলামী ব্যাংকিং তার যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারছে। আর একথা দাবি এখন করাও সম্ভব নয়। ইসলামের সামাজিক অর্থনৈতিক লক্ষ্য পূরণে ইসলামী ব্যাংকিংকে পদক্ষেপ নিতে হবে। ইসলামী অর্থনীতিবিদগণ বলেন, ইসলাম যে সামাজিক বিপ্লব চায়, অর্থনৈতিক বিপ্লব বা পরিবর্তন চায়, সেই পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে ব্যাংকিং সিস্টেমের মাধ্যমেই মূল ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা, এই কাজের জন্য অর্থ লাগবে এবং অর্থ আদান-প্রদান হবে ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে। সুতরাং ব্যাংককেই এই ভূমিকা পালন করতে হবে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে গেলে আমাদেরকে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ওপর যেসব থিওরিটিক্যাল কাজ হয়েছে, তাত্ত্বিক কাজ হয়েছে এবং তার লক্ষ্য সম্পর্কে যেসব কাজ হয়েছে, তার পলিসি সম্পর্কে যে সমস্ত কাজ হয়েছে সেগুলোকে আমাদের পড়তে হবে এবং জানতে হবে।

তেমনিভাবে, ইসলামী রাষ্ট্র তার রাজস্ব নীতিকে (Fiscal Policy) কাজে লাগাবে। রাজস্ব নীতিতে আয় ও ব্যয়ের নীতিগুলোকে পুরোপুরি কাজে লাগাবে। ব্যয়ের ক্ষেত্রে ইসলামী রাষ্ট্রে ব্যয়ের নীতির ব্যাপক পরিবর্তন হবে। যেমন - ঢাকা শহরে যারা রাস্তা-ঘাটে থাকে (এর মধ্যে নারীর সংখ্যা অর্ধেক) তাদের জন্য কি আমাদের বাজেট থেকে এক-দুই বছর ৫০০ কোটি টাকা করে



www.pathagar.com

বের করতে পারি না? আমরা কি বিশেষ প্রকল্পের মাধ্যমে এদেরকে আবার শহর থেকে যার যার গ্রামে নিয়ে গিয়ে পুনর্বাসন করে দিতে পারি না? কিন্তু এর জন্য দরকার আমাদের সর্বোচ্চ পর্যায়ে Determind Policy।

এখানে ইসলামের যে ব্যয়নীতি (Expenditure Policy) তার একটা বিরাট ভূমিকা আছে। কিন্তু আমরা সেগুলো করতে ব্যর্থ হচ্ছি, সেগুলো আমাদের করতে হবে। তেমনিভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের যে মনিটরিং পলিসি এটাতে ইসলামের আলোকে ব্যাপক পরিবর্তন আনতে হবে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য। কারণ, সেন্ট্রাল ব্যাংক প্রতিবছরই নতুন অর্থ বাজারে ছাড়ে ৫-১০ ভাগ, এটা একটা ক্রিয়েটেড মানি। এতে নুতন অর্থের সৃষ্টি হয়। এই অর্থ যদি জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করা যায়। সেন্ট্রাল ব্যাংকের এই নতুন অর্থের জন্য যেহেতু কোনো খরচ করতে হচ্ছে না, এর জন্য তাকে কোনো জিনিস বেচতে হচ্ছে না। এটা একদমই আকাশ থেকে পাওয়া অর্থই বলা যায়। যেটা নোট প্রিন্টের মাধ্যমে সেন্ট্রাল ব্যাংক প্রতিবছর বাজারে ছাড়ে। সেই টাকা যদি সরকারকে দেয়ার সময় বলে এটা শুধুমাত্র জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করতে হবে, দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যয় করতে হবে তাহলে এর মাধ্যমে সামগ্রিক পরিবর্তন সম্ভব। এ টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারকে কর্জ বা বিনা সুদে দিতে পারে। এ ব্যাপারে ড. ওমর চাপরা তার Towards a just Monetary System গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। এর থেকে বোঝা যায়, ইসলামী অর্থনীতিতে ব্যয়নীতি, মুদ্রানীতির একটা বিরাট ভূমিকা থাকবে। এসব পলিসি ব্যবহার করে আমাদের সার্বিক উন্নয়ন ঘটাতে হবে, যা দারিদ্র্য নিরসনে সাহায্য করবে। এরপর যে কথা আমি আগেই বলেছিলাম যে, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে দেখা যায় ইসলামী সমাজে কঠিন দারিদ্র্য কম ছিল। যাকে আমরা Hardcore poverty বলি তা কম ছিল বা ছিল না। দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ তারা গড়তে পেরেছিল। একেবারেই শুরু থেকে ইসলাম সিস্টেমটিকে আস্তে আস্তে গড়ে তোলে যদিও শুরুতে কিছু দারিদ্র্য ছিলই। কিন্তু উমাইয়া, আব্বাসীয়দের সময় থেকে তা কার্যত সম্পূর্ণ দূর হয়ে যায়। আর একথাও আগেই উল্লেখ করেছি যে, ইসলামে এমন এক সময় গেছে যখন যাকাত নেয়ার লোক পাওয়া যায়নি। কিন্তু পশ্চিমা দেশগুলো আজকেও এ দাবি করতে পারবে না যে, সাহায্য নেবার লোক তাদের সমাজে নেই।

যেই সরকারই থাকুক সেই সরকার যদি ইসলামকে অগ্রাধিকার দেয় এবং কমিটেড হয় আর সেই সাথে জনগণ যদি তা গ্রহণ করতে রাজি হয় তাহলে আমার মতে, ইসলামের চেয়ে দারিদ্র্য বিমোচনের আর কোনো ভালো আদর্শ হতে পারে না।


www.pathagar.com

# ওয়াকফ ঃ প্রয়োজন নতুন আন্দোলন

আমাদের নতুন এক ওয়াকফ আন্দোলন প্রয়োজন। ওয়াকফ'র যে গুরুত্ব তা আজকের দিনে আমাদের সমাজে হারিয়ে গেছে। সে গুরুত্বকে আমাদের পুনরায় ফিরিয়ে আনতে হবে।

ওয়াকফ'র নীতি হলো, যে কোনো ব্যক্তিই তার সম্পত্তির একটি অংশ আল্লাহর ওয়াস্তে দিয়ে দিতে পারে এবং বলে দিতে পারে সে সম্পদ কিভাবে ব্যবহৃত হবে, কি কাজে ব্যবহার হবে। ওয়াকফ সবসময় ভালো কাজেই ব্যবহার করা যায়, মন্দ কাজে ব্যবহার করা যায় না। ওয়াকফ যিনি করেন তিনিই ওয়াকফ কিভাবে চলবে তার নির্দেশ দিয়ে থাকেন। তার ব্যবস্থাপনা কৌশল বলে দেন। কমিটির মাধ্যমে বা কিভাবে ওয়াকফ পরিচালিত হবে, এ নির্দেশ তিনি দিতে পারেন।

ইসলামের শুরুতেই ওয়াকফ শুরু হয়। প্রথম থেকেই মুসলমানদের স্বভাব ছিল তাদের সম্পত্তির একটা অংশ তারা আল্লাহর পথে দিয়ে যেতেন। এই সম্পদই কিভাবে ব্যয় হবে তাও বলে দিতেন। যেমন - এর মাধ্যমে সেখানে সরাইখানা করা হতো যেখানে পর্যটকরা থাকতে পারত। যারা মুসাফির হতো, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেত তারা থাকতে পারতেন। সেখানে চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল। সে সময় বহু হাসপাতাল তৈরি করা হয়েছিল। সেসব ছোট-বড়-মাঝারি বিভিন্ন আকারে হয়েছিল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সবকিছুই ওয়াকফ'র মাধ্যমে পরিচালিত হতো। ওয়াকফ'র ফান্ড থেকে ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা চালু ছিল। সমাজের যত এতিম ছিল তাদের জন্য ওয়াকফ'র মাধ্যমে এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করা হতো। সমাজের দুঃস্থ শ্রেণির শিশুদের জন্য একটি পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা এবং তাদের ভরণ-পোষণের সব রকম ব্যবস্থা এই ওয়াকফ ব্যবস্থা থেকে করা হতো। অর্থাৎ বলতে গেলে তখন ওয়াকফ'র একটি বিরাট সামাজিক ভূমিকা ছিল, গুরুত্বও ছিল।

ঐতিহাসিক বিচারে আমরা দেখতে পাই, মধ্য এশিয়ার ইতিহাস পড়ে আমি দেখেছি, মধ্য এশিয়া বিশেষ করে তাতারস্থান, বশখিরিয়া, ভলগা-উরাল অঞ্চলের মতো রাশিয়ার মুসলিম অঞ্চল অথবা মধ্য এশিয়ার যেসব অঞ্চল এক



www.pathagar.com

সময় রাশিয়া দখল করে নিয়েছিল সেসব জায়গায় ওয়াকফ'র সম্পত্তির পরিমাণ ছিল তাদের ভূখণ্ডের প্রায় ১০ থেকে ১৫ শতাংশ। এত বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি ওয়াকফ'র অধীনে থাকার কথা ইতিহাস সাক্ষী দেয়। তখন মূল সম্পদ হিসেবে ভূসম্পত্তিকেই ধরা হতো। এটা আজ থেকে আটশ' বা এক হাজার বছর আগের কথা। এটা শিল্পবিপ্লবের বহু আগের কথা। সে সময় সম্পদ বলতে বোঝাতো একদিকে জায়গা-জমি আর অন্যদিকে ব্যবসা-বাণিজ্য। আমি Pall Mall Press, London থেকে প্রকাশিত Alexander Bennigsen and C.L. Quelquejay - Islam in the Soviet Union বইতে এই বিষয়ে অনেক কিছু দেখেছি। আবার ড. ওমর চাপরা তার Islam and the Economic Challenge বইতে বলছেন, ওয়াকফ'র বিরাট গুরুত্ব রয়েছে এবং একসময় মুসলিম বিশ্বের ১০ থেকে ১৫ ভাগ সম্পদ ওয়াকফ'র অধীনে চলে এসেছিল।

কিন্তু পরবর্তীকালে কমিউনিস্টরা সোভিয়েত রাশিয়ার ক্ষমতা দখল করে সমস্ত সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত করল। ফলে সেসব ওয়াকফ'র অধীনে যেসব স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, এতিমখানা, সরাইখানা বা হাসপাতাল পরিচালিত হতো তার সবই বন্ধ হয়ে গেল।

আমাদের দেশে একসময় ওয়াকফ সিস্টেম চালু ছিল। কিন্তু বর্তমানে আগ থেকে চলে আসা কিছু ওয়াকফ বাদে নতুন করে ওয়াকফ কম হচ্ছে। আমরা যদি সত্যি সমাজের দুঃস্থ ও দরিদ্রদের জন্য ব্যবস্থা করতে চাই যারা সমাজে অসহায়, বিত্তহীন তাহলে আমাদের নতুন করে আবার ওয়াকফ আন্দোলন শুরু করতে হবে। এর জন্য একটি নতুন ওয়াকফ আন্দোলন শুরু করা উচিত বলে আমি মনে করি। এটা সারা বিশ্বেই শুরু করা উচিত, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে এবং বাংলাদেশে।

আমাদের দেশের কথাই বলি। এখানে যাদের শত কোটি টাকা আছে বা প্রচুর সম্পদ আছে তারা তাদের অর্থ-সম্পদ রেখে মারা গেলে সেই অর্থ-সম্পদে তাদের কি লাভ হবে? তারা তাদের সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ যেমন; তিন ভাগের এক ভাগ, চার ভাগের এক ভাগ কিংবা দশ ভাগের এক ভাগ ওয়াকফ করে যেতে পারেন। বাকি অর্থ-সম্পদ তাদের পরিবারের জন্য থাকবে। এর জন্য এক একজন এক এক নামে ফাউন্ডেশন গঠন করে যাবেন। ক করবে ক ফাউন্ডেশন, খ করবে খ ফাউন্ডেশন, আর এসবের যদি ওয়াকফ করা ২০, ২৫ কিংবা ৩০ কোটি টাকার সম্পদ থাকে তাহলে তা সমাজের জন্য বিরাট অর্থবহ হয়ে উঠবে। এর জন্য যার একশ' কোটি টাকা আছে সে উপরের উল্লেখকৃত অনুপাতে দিলে দাঁড়ায় ১০, ২৫, ৩৩ কোটি টাকা। এই টাকাই প্রতি বছর ওয়াকফ'র জন্য ব্যবহৃত হবে। এ টাকা থেকে আবার আয় হবে। এভাবে যদি আমাদের দেশে ১০০, ২০০, ৩০০ ওয়াকফ ফাউন্ডেশন



www.pathagar.com

তৈরি হয় তাহলে তার কি বিপুল প্রভাব সমাজে পড়ে - তা চিন্তা করতে পারি। এসব ফাউন্ডেশন কি করতে পারে? কোনো কোনো ফাউন্ডেশন হাসপাতাল করতে পারে, কেউ এতিমখানা করল, সেই সাথে এতিমখানায় স্কুল-কলেজ করতে পারে। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ও করতে পারে। ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্কলারশিপের ব্যবস্থা করতে পারে। কোনো ফাউন্ডেশন হসপিটাল তৈরি করতে পারে যেখানে কম পয়সায় মানুষ থাকতে পারবে। লোকেরা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় এলে তাদের থাকার জায়গার অভাব, হোটেল খরচ দিতেও পারে না, কষ্ট পায়, সেখানে অত্যন্ত কম ফি'র মাধ্যমে, এমনকি বিনামূল্যে তাদের জন্য ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যেহেতু এটা ওয়াকফ প্রপার্টি তাই ফ্রিও করা যেতে পারে। না হলে খুব সামান্য ফি করা যেতে পারে। আবার কোনো ফাউন্ডেশন শুধু এমন হতে পারে যে তারা বৃদ্ধ নিবাস তৈরি করে বৃদ্ধদের দেখার ব্যবস্থা করবে। তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে। বিধবাদের দেখাশোনার জন্যও হতে পারে। এমনিভাবে বিভিন্ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সকল অসহায়ের দেখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এই ওয়াকফ কাজটি হবে যাকাতের অতিরিক্ত এবং যাকাত থেকে আলাদা। মানুষ যাকাত তো দেবেই। যাকাতের মাধ্যমেও দারিদ্র্য বিমোচনের বিরাট কাজ হতে পারে। আবার এসব ফাউন্ডেশনের মাধ্যমেও যাকাতকে অর্গানাইজ করা যায়। তারা ওয়াকফ বাদেও যাকাতের জন্য একটা স্পেশাল ফান্ডের ব্যবস্থা করতে পারে। প্রয়োজনে তা শুধুমাত্র যাকাতের খাতেই ব্যয় হবে। সেটা কোনো সমস্যা হবে না। আর যাকাতের মাধ্যমেও বিপুল পরিমাণ দরিদ্র পরিবারকে আত্মনির্ভরশীল করা যায়। আমাদের দেশে যাকাতকে প্রধানত স্বনির্ভর করার কাজে ব্যয় করা উচিত। তারপর মানুষের অনেক ঋণ থাকে, সেই ঋণ প্রদানে ব্যবহার করা উচিত। যাকাতের মাধ্যমে গরীব, মিসকিনদের এলাউন্স বা ভাতা দেয়া উচিত। এটা বৃদ্ধ ভাতা বা বিধবা ভাতা হতে পারে।

যাকাত আদায়ের পরিমাণ আমাদের সমাজে আগের তুলনায় বেশি প্রচলিত হয়ে গেছে। প্রায় শিল্পপতিই আজ যাকাত দেয়। তাদের যাকাতের টাকা যদি তারা নিজেরা সঠিকভাবে ব্যয় করে তাহলেও তার প্রভাব সমাজে পড়বে। এই যাকাতের টাকা দিয়ে তারা বিপুল পরিমাণ রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারেন। সমাজের বিধবাদের জন্য উত্তম ব্যবস্থা করতে পারেন। বিত্তহীন ও অসহায়দের জন্য ভাতা সিস্টেম করতে পারেন। আর এই যাকাতের সঙ্গে যদি যে ওয়াকফ'র কথা আগে বললাম সে ওয়াকফ যোগ হয় তাহলে তার দ্বারা কি বিরাট কাজই না হতে পারে সমাজে।

এ জন্য আমি মনে করি, আমাদের দেশে নতুন করে একটি ওয়াকফ আন্দোলন দরকার। আমার আবেদনও থাকবে, যারা কোটিপতি বা শতকোটি টাকার মালিক তারা একটি করে ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করবেন। তারা সব সম্পদ



www.pathagar.com

তাদের সন্তান বা পরিবারের জন্য না রেখে তার একটি নির্দিষ্ট অংশ ওয়াকফ করে দিয়ে এই ফাউন্ডেশনের জন্য রাখবেন। তারাই একটি কমিটি গঠন করবেন বা বলবেন কি ধরনের কমিটি হবে। কমিটির মাধ্যমেই ফাউন্ডেশন পরিচালিত হবে। নগদ টাকাই যে দিতে হবে, তার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। যেমন, কারও দশটা শিল্প প্রতিষ্ঠান থাকলে তিনটা প্রতিষ্ঠান ওয়াকফ দিয়ে দিতে পারেন। এতে তিনটি কোম্পানি ওয়াকফে চলে গেল। এর মানে হলো জমির আয় থেকে যেমন ব্যবস্থা তেমনি এই ওয়াকফ প্রতিষ্ঠান থেকেও আয় হবে। সেই শিল্প প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে থাকবে ফাউন্ডেশন। সেখান থেকে যে আয় আসবে তা সমাজকল্যাণ কাজে ব্যয় হবে।

এ প্রসঙ্গে বলতে হয়, বর্তমানে যে ওয়াকফ আছে তার পরিমাণ তেমন উল্লেখযোগ্য নয় এবং তা খুব একটা ভালোও চলছে না। আবার যাও আছে তার যে ব্যবহার হতে পারত তা হচ্ছে না। এর জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের ব্যর্থতা আছে। আবার যারা এর মোতাওয়াল্লী তাদেরও ব্যর্থতা আছে। এসবই সত্য কথা। কিন্তু আমি ওয়াকফ'র কথা উল্লেখ করেছি তা কিছুটা নতুন ধরনের। এটা একেকটা ফাউন্ডেশন ধরনের হবে বা ট্রাস্ট ধরনের হবে। ফাউন্ডেশন বা ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনায় তা পরিচালিত হবে। সেখানে একটা সিস্টেমেটিক ম্যানেজমেন্ট হবে। সেখানে প্রচলিত ওয়াকফ'র পরিণতি হবার সম্ভাবনা নেই। এখানে কোনো একক ব্যক্তি কর্তৃক অপব্যয়, অপব্যবহারের কোনো সুযোগ থাকবে না। আর বর্তমানে যেসব ওয়াকফ আছে তা খুব সামান্য এবং বাস্তবে এসব দিয়ে তেমন কিছুই হবে না। এগুলো যেমন আছে তাই থাকতে পারে। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান ওয়াকফগুলো হলো কতকগুলো দরগাকেন্দ্রিক, এর আয় সমাজের মানুষের খুব একটা কাজেও লাগছে না। কিছু ওয়াকফ মসজিদ কর্তৃক পরিচালিত। এগুলো চলবে। কিছু ওয়াকফ কর্তৃক এতিমখানা চলছে। এটাও চলুক। অনেক মাদ্রাসা ওয়াকফ চালায়। কিছু কিছু ওয়াকফ মসজিদের খরচ বহন করে। এসবই ভালো। এসব থেকে আমাদের যে নতুন প্রকৃতির ওয়াকফ তা হবে ভিন্ন ধরনের এবং অনেক উন্নত। এখানে মডার্ন কর্পোরেশন ধরনের ম্যানেজমেন্ট ব্যবহার করা হবে। ফাউন্ডেশন বা ট্রাস্ট যাকে বলা হয়, এখানে সেটাই ব্যবহার করা হবে। তখন এ ওয়াকফ দ্বারা অনেক ভালো কাজ করা সম্ভব হবে।

এটা সম্পূর্ণ নতুন টাইপ বলে জিরো থেকেই শুরু করতে পারি। আগে হয়তো কোনো ব্যক্তি কোনো মাদ্রাসাকে লিখে দিত, আকারও ছোট ছিল। সেটা কখনো বড় আকার ধারণ করেনি। আর সে যুগে আজকের মত এত সম্পদশালী ব্যক্তিও ছিলো না। এখন অনেক পরিবারই ১০০, ২০০, ৫০০ কোটি টাকার মালিক। এদের থেকেই নতুন ওয়াকফ'র কথা চিন্তা করা সম্ভব। তবে আজকের ব্যক্তি ওয়াকফ খুব কম। সেটাও চলতে থাকবে। কিন্তু তার থেকে বর্তমান প্রস্তাবিত ফর্মে করাই ভালো।



www.pathagar.com

এর জন্য সরকারি আইন থাকবে। কেউ যেন এর অপব্যবহার বা অপচয় না করতে পারে। তবে কোনভাবেই সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকবে না। এটা প্রাইভেট পর্যায়ে থাকবে। যিনি ওয়াকিফ তিনি বলে দিবেন কি কাজে, কিভাবে বা কোন কোন খাতে এটা ব্যয় হবে। তিনি বলতে পারেন, কোন কাজে ব্যয় করা হবে। এর মানে হলো আসলে সব কাজেই ব্যয় করা যাবে। কিন্তু বাস্তবে সবাই সব কাজ করতে পারে না। কাজেই কাউকে হাসপাতাল, কাউকে এতিমখানা বা স্কুল-কলেজ দিয়ে যেতে হবে। এটা নানা ধরনের হতে পারে। আমাদের দেশে তাই সার্বিকভাবে দারিদ্র্য বিমোচন এবং দুঃস্থদের সাহায্যের জন্য এই নতুন ধরনের ওয়াকফ বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে। সুতরাং, বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় দেশেই নতুন করে ওয়াকফ আন্দোলন শুরু করা দরকার। আশা করি, জাতির চিন্তাবিদ, স্কলার ও আলেমগণ এ বিষয়ে নতুন করে চিন্তা করবেন। আর সমাজের বিত্তশালী ব্যক্তিবর্গ সেদিকে নজর দেবেন এবং এগিয়ে আসবেন।



www.pathagar.com

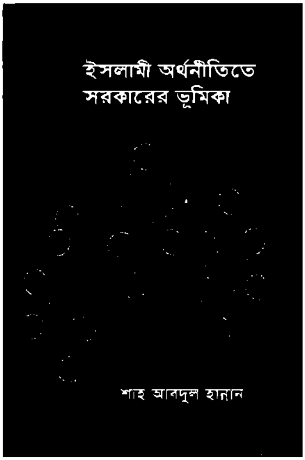


# ইসলামী অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকা

প্রকাশকাল : প্রথম প্রকাশ - ডিসেম্বর ১৯৭৬, দি পাইওনিয়ার
পঞ্চম সংস্করণ - মার্চ ২০১১, দি পাইওনিয়ার

www.pathagar.com

www.pathagar.com

# ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য

ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য আলোচনার পূর্বে ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলে কিছু আছে কিনা সে প্রশ্নের জবাব দেয়া প্রয়োজন। এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে আমাদেরকে জানতে হবে যে, সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদকে কেন অর্থব্যবস্থা বলে উল্লেখ করা হয়। পুঁজিবাদ বলতে আমরা নিশ্চয়ই কোনো দেশের বাজার, শিল্প, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি বুঝি না। কেননা এসব তো সমাজতন্ত্রেও রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কেবল একটি নীতি অর্থাৎ ব্যক্তির অর্থনৈতিক উদ্যোগ নেবার স্বাধীনতা ও মালিকানা যে ব্যবস্থায় থাকে তাকেই পুঁজিবাদ বলা হয়ে থাকে। তেমনিভাবে সমাজবাদ বলতে আমরা ব্যাংকব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, কৃষি ইত্যাদি বুঝি না। কেননা এসব তো পুঁজিবাদেও রয়েছে। বরং রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও উৎপাদনের নীতির কারণেই একটি অর্থব্যবস্থাকে সমাজতন্ত্র বলে আখ্যায়িত করা হয়।

এ প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, যদি একটি মাত্র প্রধান মূলনীতির কারণে কোনো অর্থব্যবস্থাকে পুঁজিবাদ বা সমাজতন্ত্র বলে অভিহিত করা হয় তবে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী অর্থনৈতিক নীতিকে কেন্দ্র করে যে অর্থনীতি গড়ে ওঠে তাকে নিঃসন্দেহে ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলে গণ্য করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র অপেক্ষা অধিক ও বিস্তৃত অর্থনৈতিক নীতি ইসলাম দিয়েছে। ব্যক্তির অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, সুদের নিষিদ্ধতা, যাকাতের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা, সম্পত্তি বণ্টনের ইসলামী নিয়ম, হালাল ও হারামের ত সীমারেখা – এসব হচ্ছে ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতি।

মদিনায় ইসলামী অর্থনীতির যে প্রথম মডেল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল তাতে শরীয়তের সীমার মধ্যে উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয় ও ভোগের স্বাধীনতা ছিল। এ স্বাধীনতাকে পুঁজিবাদী গণ্য করা যাবে না। কেননা মদিনার ইসলামী অর্থনীতি পুঁজিবাদের অনেক আগেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। কাজেই ইসলাম পুঁজিবাদ থেকে কিছু নিয়েছে একথা বলা যায় না।

ইসলামের অর্থনীতির লক্ষ্য কি তা আমাদের কুরআন ও সুন্নাহ থেকে জানতে হবে। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইসলামী অর্থনীতির মূল লক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপ:



www.pathagar.com

## ক. অর্থনীতিতে সুবিচার প্রতিষ্ঠা

ইসলাম অর্থনীতিসহ সর্বক্ষেত্রে সুবিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার কথা বলেছে। এ প্রসঙ্গে কুরআনের ঘোষণা হচ্ছে:

> আল্লাহ্ তোমাদের আদল ও ইহ্সান প্রতিষ্ঠা করার আদেশ করেছেন। (সূরা নহল: আয়াত ৯০)
>
> লোকদের মধ্যে যখন কোনো বিষয়ে ফয়সালা করবে তখন ইনসাফের সাথে করবে। (সূরা নিসা: আয়াত ৫৮)

সূরা নহলে যে আদেশ আল্লাহ্ করেছেন তা যেমন ব্যক্তির উপর প্রযোজ্য তেমনি প্রযোজ্য সরকারের উপর। কাজেই সরকারকে শ্রমিক, কৃষক সহ সব শ্রেণি ও গোষ্ঠীর প্রতি সুবিচার করতে হবে। ব্যক্তি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানেরও একই দায়িত্ব। সূরা নহলে আল্লাহ্পাক কেবল সুবিচারের কথাই বলেননি ইহ্সান বা সু-আচরণের কথাও বলেছেন। সুবিচার পাওয়া তো প্রত্যেকের অধিকার। তবে সুবিচারের অতিরিক্ত জনগণকে দিতে হবে এবং সেটাই হচ্ছে ইহ্সান। সূরা নিসার আয়াতের আলোকে বিভিন্ন অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর পারস্পরিক দ্বন্দ্ব মীমাংসা করার জন্য উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান বা আদালত থাকতে হবে যা সুবিচারের সঙ্গে বিরোধের মীমাংসা করবে ও অধিকার আদায় করে দেবে।

## খ. নির্যাতিত ও বঞ্চিতদের স্বার্থ সংরক্ষণ

নির্যাতিত ও বঞ্চিতদের প্রতি আল্লাহ্ বিশেষভাবে সহানুভূতিশীল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্পাকের ঘোষণা হচ্ছে:

> পৃথিবীতে যারা নির্যাতিত ও বঞ্চিত তাদের অনুগ্রহ করতে চাই। তাদেরকে পৃথিবীতে ইমাম (নেতা) ও উত্তরাধিকারী বানাতে চাই। তাদেরকে পৃথিবীতে ক্ষমতাসীন করতে চাই।
>
> (সূরা কাসাস: আয়াত ৫-৯)

এ হচ্ছে বঞ্চিতদের সম্পর্কে আল্লাহ্পাকের সাধারণ নীতি। 'উত্তরাধিকারী' করার অর্থ হচ্ছে এমন সুযোগ সুবিধা দেয়া যাতে বঞ্চিতরা পৃথিবীকে ন্যায়সংগতভাবে উপভোগ করতে পারে। এ নীতির অর্থ হবে এমন বেতন, সুবিধা, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বসবাসের সুবিধা যা তাদের জীবনকে সুন্দর করে তোলে। কাজেই ইসলামী অর্থনীতিতে এমন সব আইন, বিধি, নীতি, প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করতে হবে যাতে সাধারণ লোকদের স্বার্থ বিশেষভাবে রক্ষিত হয় এবং কোনোভাবে ক্ষুণ্ন না হয়। এটা করতে ব্যর্থ হলে সে অর্থনীতিকে বা সরকারকে আমরা সঠিক অর্থে ইসলামী অর্থনীতি বা সরকার বলতে পারি না। অবশ্য এর অর্থ এ নয় যে অন্য সব শ্রেণির অধিকার নষ্ট করা। অন্য সব শ্রেণির ন্যায়সংগত অধিকারও রক্ষা করতে হবে, কিন্তু সাধারণ লোকদের অধিকার (তাদের দুর্বল হবার কারণেই) প্রাধান্য পাবে।



www.pathagar.com

## গ. অর্থনীতিতে সুনীতি প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতির উৎখাত করা

এ প্রসঙ্গে আল্লাহপাক যে সাধারণ নীতি দিচ্ছেন (যা অর্থনীতিতেও সমভাবে প্রযোজ্য) তা হচ্ছে:

> যাদেরকে পৃথিবীতে ক্ষমতা দেয়া হয় তাদের দায়িত্ব হচ্ছে সালাত ও যাকাতের প্রতিষ্ঠা, মারুফ (সুকৃতি বা ভালো কাজ) কাজের আদেশ দেয়া ও মুনকার (দুর্নীতি) প্রতিরোধ করা। (সূরা হজ্ব: আয়াত ৪১)

এ ধরনের বহু আয়াত কুরআন মজীদে রয়েছে। এসব আয়াতের 'মারুফ' ও 'মুনকার' শব্দকে সামগ্রিক অর্থে গ্রহণ করতে হবে, কেবল নৈতিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করলে চলবে না। এ আয়াতের আলোকে ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য হচ্ছে এমন সব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, নীতি, পলিসি ও প্রতিষ্ঠান কায়েম করা যাতে কল্যাণের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয় এবং দুর্নীতি দূর হয়। একইভাবে এ আয়াতের তাৎপর্য হবে অর্থনীতি হতে এমন সব ব্যবস্থা, নীতি, পলিসি, প্রতিষ্ঠান, আইন সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ, অপসারণ ও দূর করা যার ফলে জনগণের কল্যাণ হয়। এসব কাজ করা ইসলামী সরকার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অবশ্য কর্তব্য।

## ঘ. জনগণের সহজ জীবন নিশ্চিত করা

আল্লাহপাক নবী(সা.)-এর অন্যতম দায়িত্ব এভাবে নির্ধারণ করেছেন:

> তিনি তাদেরকে বোঝা হতে মুক্ত করেন এবং যে সব শিকলে তারা আবদ্ধ তা থেকে তাদের মুক্ত করেন। (সূরা আরাফ: আয়াত ১৫৭)

নবী (সা.) এর উত্তরাধিকারী হিসেবে প্রতিটি মুসলিম সরকার ও কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হচ্ছে মানুষকে সে সব অন্যায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিষ্পেষণ, বিধিবিধান ও নিয়মনীতি হতে উদ্ধার করা যা জনগণের জীবনের উপর বোঝা ও শিকল হয়ে আছে। অপ্রয়োজনীয় রীতি-রেওয়াজ ও আইনকানুন মানুষের জীবনের স্বাধীনতা ও শান্তি নষ্ট করে। কাজেই ইসলামী সমাজ ও অর্থনীতিতে কোনো অপ্রয়োজনীয় বিধিবিধানের স্থান নেই। অবশ্য কোনটি প্রয়োজনীয় আর কোনটি অপ্রয়োজনীয় তা ইসলামী সরকারের আইন পরিষদই ঠিক করবেন।

## ঙ. সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার

ইসলাম জনকল্যাণের জন্য সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার চায়। এ জন্যই ইসলাম পতিত জমি ফেলে রাখা সমর্থন করেনি। যে কেউ তিন বৎসর পর্যন্ত জমি ফেলে রাখলে নবী(সা.) তা নিয়ে নেয়ার জন্য বলেছেন। পতিত সরকারি জমি আবাদ করার জন্য হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ এক-দশমাংশ ফসল পাবার বিনিময়ে হলেও চাষীদের নিকট বন্দোবস্ত দেয়ার জন্য গভর্নরদের নির্দেশ দিয়েছিলেন।[১] একই নীতি অর্থনীতির সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে গণ্য করতে হবে।



www.pathagar.com

## চ. সম্পদের যথাযথ বন্টন

ইসলাম সম্পদের যথাযথ বন্টনের উপর গুরুত্ব দিয়েছে। আল্লাহপাকের নীতি নির্ধারণী ঘোষণা হচ্ছে:

> সম্পদ যেন তোমাদের ধনীদের মধ্যেই ঘোরাফেরা করতে না থাকে। (সূরা হাশর: আয়াত ৭)

এ আয়াতের আলোকে ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য হচ্ছে আইন ও পলিসির মাধ্যমে সম্পদের সর্বাধিক বিস্তার ও বন্টন নিশ্চিত করা এবং লক্ষ্য রাখা যেন সম্পদের অতিরিক্ত পুঞ্জিভূত হবার সুযোগ না হয়।

## ছ. কল্যাণকর দ্রব্যের সর্বাধিক উৎপাদন

নবী(সা.)-এর দায়িত্ব হিসেবে আল্লাহপাক বলেছেন:

> তিনি তাদের জন্য পবিত্র দ্রব্য হালাল করেন ও অপবিত্র দ্রব্য হারাম করেন। (সূরা আরাফ: আয়াত ১৫৭)

এ আয়াতের আলোকে ইসলামের উৎপাদন ব্যবস্থায় অপবিত্র দ্রব্যের কোনো স্থান নেই। সেখানে কেবল স্বাস্থ্যকর ও পবিত্র দ্রব্যই থাকবে। তাই ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম লক্ষ্য হবে জনগণের স্বার্থে স্বাস্থ্যসম্মত দ্রব্যের পর্যাপ্ত উৎপাদন নিশ্চিত করা এবং সব অকল্যাণকর দ্রব্যের উৎপাদন, আমদানি, রফতানি, ব্যবসা নিষিদ্ধ করা।

এ অধ্যায়ে ইসলামী অর্থনীতির কয়েকটি প্রধান লক্ষ্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এসব মূলনীতি কার্যকর করা ইসলামী সরকারসমূহের কর্তব্য। এসবের কার্যকর করার উপরই ইসলামী বিশ্বের শান্তি ও কল্যাণ নির্ভর করে। আইন করেও যদি এসব লক্ষ্য অর্জিত না হয় তাহলে বুঝতে হবে ইসলামের কোনো ভুল নেই, ভুল রয়েছে আমাদের আইন, বিধিবিধান ও আমাদের উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে। এ কথা যেমন আজকের জন্য সত্য, তেমনি সত্য ভবিষ্যতের জন্যও।

তথ্যসূত্র

১. ইউসুফ আল কারযাভী: আল হালাল ওয়াল হারাম ফিল ইসলাম।



www.pathagar.com

# ইসলামী অর্থনীতির প্রথম মডেল

বর্তমান যুগে ইসলামী অর্থনীতি কি রূপ নেবে তা নির্ধারণ করার জন্য আমাদের রাসূলুল্লাহ (সা.) ও খোলাফায়ে রাশেদার আমলে যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা কায়েম করা হয়েছিল, তাকে ভালো করে বুঝে নিতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর মদিনার জীবনের শেষ দিকে এমন একটি অর্থনীতি কায়েম করতে সক্ষম হয়েছিলেন যা কুরআনের শিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছিল। সে অর্থনীতি জাহেলিয়াতের যুগের সব অন্যায়, অত্যাচার ও বেইনসাফী হতে মুক্ত ছিল এবং সে কাজটি রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজে করেছিলেন – যিনি আল্লাহপাকের দ্বারা তখন সতত পরিচালিত হতেন। সে অর্থনীতির ভিত্তি ছিল ইসলামী সুবিচার।

মক্কার জীবনে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইসলামী শিক্ষার মূলনীতি প্রচার করেছিলেন। একটি সমাজ ও অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ তখন তিনি পাননি। মদিনার জীবনের প্রথমদিক অতিবাহিত হয়েছিল আত্মরক্ষা ও সমাজকে ধীরে ধীরে অনৈসলামী জাহেলী রীতি-রেওয়াজ হতে পবিত্র করার কাজে। সুতরাং মদিনার জীবনের শেষদিকে যে অর্থনীতি ও বণ্টনব্যবস্থা চালু ছিল, তাকেই আমরা ইসলামী অর্থনীতির প্রথম মডেল বলে ধরে নিতে পারি।

এ মডেলটিই খোলাফায়ে রাশেদার আমলে সুসামঞ্জস্য ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। এ যুগে ইসলামী অর্থনীতির একটি সঠিক মডেল তৈরি করার জন্য যেসব মূলনীতি ও নজীর দরকার তা আমাদেরকে কুরআনের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রাথমিক যুগের ইসলামী অর্থনৈতিক মডেল হতে গ্রহণ করতে হবে। কেননা, আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ইসলামের আদর্শ ও শিক্ষার আলোকে আজকের যুগের উপযোগী অর্থনৈতিক একটি মডেল তৈরি করা – নিজেদের মনগড়া মতবাদকে ইসলামের উপর চাপিয়ে দেয়া নয়।

মদিনায় যে নতুন অর্থনীতি কায়েম করা হয়েছিল তাতে প্রত্যেকের স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করার অধিকার ছিল। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সবাই স্বাধীনভাবে ব্যবসা, কৃষি, পশুপালন ও অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত ছিল। উৎপাদন কার্য স্বাধীনভাবে চলত। কৃষকরা ক্ষেতে ফসল উৎপন্ন করতে পারতো। তারা নিজেরাও পরিশ্রম করতো এবং প্রয়োজনবোধে



www.pathagar.com

মজুরও নিয়োগ করতো। ইতিহাসে অনেক সাহাবির মজুরির বিনিময়ে কাজ করার উদাহরণ রয়েছে। পেশার স্বাধীনতার কথা অবশ্য কুরআন মজীদেও স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে। সূরা বাকারায় বলা হয়েছে, "তোমাদের জন্য ব্যবসাকে হালাল করা হয়েছে" (আয়াত ২৭৫) এবং সূরা জুমআতে রয়েছে, "তোমরা নামাজ শেষে দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর দেয়া জীবিকা অনুসন্ধান করো (আয়াত ১০)।"

বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত লোকেরা তাদের উৎপাদিত খাদ্য ও অন্যান্য ব্যবহার্য দ্রব্য বাজারে নিয়ে আসতেন। যাদের এসব দ্রব্যের প্রয়োজন হতো তারা বাজার থেকে এসব দ্রব্য খরিদ করে নিতেন। সাধারণত যোগানের উপর কোনো হস্তক্ষেপ করা হতো না। তেমনিভাবে চাহিদার উপরও হস্তক্ষেপ করা হতো না। কোনো মূল্য নির্ধারণ করে দেয়া হতো না। যোগান ও চাহিদার পরিস্থিতির উপর মূল্য নির্ভর করতো।

অবশ্য যোগান ও চাহিদাকে অন্যায়ভাবে প্রভাবিত করাও নিষিদ্ধ ছিল। যেমন মজুতদারী নিষিদ্ধ ছিল, যাতে যোগানের উপর খারাপ প্রভাব না পড়ে। একবার হযরত ওমর (রা.) এর সময় এক ব্যবসায়ী বাইরে থেকে অনেক ঘোড়া এনে মদিনায় রাখতে শুরু করেন। হযরত ওমর (রা.) তাকে ঘোড়ার খাবার মদিনার বাইরে থেকে না আনা পর্যন্ত এসব ঘোড়াকে মদিনার অভ্যন্তরে রাখতে নিষেধ করে দেন। ফলে সে ব্যবসায়ী ঘোড়ার খাবার মদিনার বাইরে থেকে আনার ব্যবস্থা করেন।[১] এ থেকেও স্পষ্ট হয় যে, মদিনায় ঘোড়ার খাবারের চাহিদার উপর যেন হঠাৎ প্রভাব না পড়ে সে জন্যই তিনি এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। এখানে এ কথাও উল্লেখ করা জরুরি যে, যদিও স্বাভাবিক অবস্থায় মূল্য নির্ধারণ না করাই ইসলামের নীতি, তথাপি যদি দ্রব্যমূল্য ইনসাফের সীমা অতিক্রম করে যায় এবং জুলুমের কারণ হয়ে দাঁড়ায় তেমন অবস্থায় সরকার মূল্য নির্ধারণ করে দিতে পারে।[২]

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে যে অর্থনীতি গড়ে ওঠে তা ছিল ইসলামী শিক্ষার আওতাধীন এক স্বাধীন অর্থনীতি। উৎপাদন কার্যক্রম ও জীবিকা অর্জন সে অর্থনীতিতে স্বাধীনভাবে হতো। বাজারও ছিল সেখানে স্বাধীন এবং চাহিদা ও যোগানের স্বাভাবিক অর্থনৈতিক প্রভাবে সেখানে শ্রম, দ্রব্য ও অন্যান্য সরবরাহের মজুরি ও মূল্য নির্ধারিত হতো। অর্থ বা বিনিময়ের মাধ্যমে এসবের লেনদেন চলতো। কিন্তু এ অর্থনীতি স্বাধীন অর্থনীতি হলেও তা অবাধ ছিল না।

এ অর্থনীতিকে তাই আধুনিক বা পুরোনো পুঁজিবাদের সঙ্গে সাদৃশ্যের জন্য কিছুতেই এক করে দেখা যেতে পারে না। কেননা যদিও বর্তমান পুঁজিবাদে কারো ঠিক নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা নেই, কিন্তু তাতে ব্যক্তির উপর আইনেরই নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত



www.pathagar.com

অপর্যাপ্ত; কাজেই সুবিচার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা তাতে নেই। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইসলামী অর্থনীতিতে উৎপাদন, উপার্জন, ব্যয়, ভোগ, সঞ্চয়, বিনিয়োগ ইত্যাদি সবক্ষেত্রেই ব্যক্তির উপর অনেক নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে। আধুনিক পুঁজিবাদে এক ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে উইল করে তার সম্পত্তি যেভাবে ইচ্ছা দিয়ে যেতে পারে। সে ইচ্ছা করলে সম্পত্তি যে কোনো একটি মাত্র সন্তানকে দিয়ে যেতে পারে, এমনকি অন্যান্য সন্তানদের বঞ্চিত করে প্রিয় কুকুরের ভরণপোষণের জন্যও দিয়ে যেতে পারে। কিন্তু ইসলামে এ ধরনের স্বাধীনতার কোনো স্বীকৃতি নেই। এ ব্যাপারে প্রত্যেক ব্যক্তি ইসলামী মিরাসী আইনের অধীন।

## ব্যক্তিগত মালিকানা

এখন আমরা ইসলামের প্রাথমিক অর্থনীতিতে মালিকানা কি অবস্থায় ছিল তা বিচার করবো। এই অর্থনীতিতে প্রত্যেক ব্যক্তি বাড়ি, সাওয়ারী, অস্ত্র ও জমির মালিক হতে পারতো। সে জমিতে স্বাধীনভাবে কৃষিকাজ করতে পারতো। ব্যক্তি জমি কিনতে ও বিক্রি করে দিতে পারতো। শিল্প সে সময় উন্নত পর্যায়ের ছিল না। কিন্তু কাপড় বোনা, অস্ত্র নির্মাণ, সাধারণ কৃষি যন্ত্রপাতি প্রস্তুত ও অন্যান্য আসবাবপত্র শিল্প ব্যক্তিমালিকানার অধীনেই ছিল। এসব ব্যক্তিমালিকানার সুযোগে অনেকেই প্রচুর ধনসম্পদের মালিক হয়েছিলেন। এদের মধ্যে হযরত ওসমান (রা.) ও আবদুর রহমান ইবনে আওফের (রা.) নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। কাজেই ব্যক্তি মালিকানা সে সমাজে স্বীকৃত ছিল।

অবশ্য ব্যক্তি তার মালিকানাধীন চাষোপযোগী জমিকে পতিত রাখতে পারতো না। তাকে জমি চাষ করতে হতো। তিন বৎসরের বেশি কেউ কোনো জমি ফেলে রাখলে সরকার তা নিয়ে নিতো। এ সম্পর্কে হযরত ওমরের (রা.) বিশেষ আদেশ ছিল। কিন্তু কোনো ব্যক্তি সমাজের জন্য জরুরি কতকগুলো জিনিসের একক মালিক হতে পারতো না। যেমন – খনি, পশুপালন-ভূমি, জঙ্গল, নদী-নালা, কূপ ও পানির উৎস ইত্যাদি।

এখানে এ কথা পরিষ্কার করে দেয়া দরকার যে, ইসলামে কারো কোনো নিরঙ্কুশ মালিকানা নেই। মালিকানা এখানে আমানত মাত্র। কেননা কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণা হচ্ছে:

> পৃথিবী ও আকাশ মণ্ডলের সব কিছুর মালিক হচ্ছেন আল্লাহ।
> (সূরা বাকারা: আয়াত ২৫৫)
>
> পৃথিবীর মালিক হচ্ছেন আল্লাহ। (সূরা আল-আরাফ: আয়াত ১২৮)

ফকিহদেরও সম্মিলিত মত হচ্ছে যে, সেই মালিকানাই ন্যায়সংগত ও বৈধ যা শরিয়ত প্রণেতা দান করেছেন বা স্বীকার করে নিয়েছেন। মালিকানা স্বতঃসিদ্ধ নয় বরং শরিয়ত দাতার অনুমতিতে তা অস্তিত্বে আসে।[৩]



www.pathagar.com

বৈধ উপায়ে অর্জিত সব সম্পদের মালিকানা মদিনার অর্থনীতিতে স্বীকৃত ছিল। হারাম উপায়ে সম্পদ অর্জন করা ও তার মালিক হওয়া অবৈধ ছিল। অর্জন করা ছাড়াও দান ও মিরাসী পদ্ধতিতে ব্যক্তি সম্পত্তির মালিক হতে পারতো।

## সুদহীন অর্থনীতি

মদিনায় সুদহীন অর্থনীতি চালু ছিল। কুরআন মজীদে দ্ব্যর্থহীনভাবে সুদকে নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে (সূরায়ে বাকারা)। মদিনার ব্যবসায়ীরা নিজের অর্থে ব্যবসা করতেন অথবা অন্যের নিকট থেকে লাভ-লোকসানে অংশীদার হওয়ার ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণ করে ব্যবসার জন্য প্রয়োজনাতিরিক্ত মূলধনের ব্যবস্থা করতেন। লাভের অংশ ঋণদাতাকে দিয়ে দিতেন। শরীকানা ভিত্তিতেও ব্যবসা করা হতো। শরীকানা ব্যবসায়ে হয় দু'জনের পুঁজিই খাটানো হতো অথবা একজনের পুঁজি ও অন্যজনের শ্রম সংযুক্ত হতো এবং নির্দিষ্ট হারে লাভ-লোকসানের ভাগ করা হতো।

ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বিনা সুদে একজন অন্যজনের নিকট হতে ঋণ গ্রহণ করতেন। সমাজের প্রয়োজন এ পদ্ধতিতে মোটামুটি মিটেও যেত, কেননা কুরআন মজীদে 'করজে হাসানা'কে উৎসাহিত করা হয়েছে।

মদিনার অর্থনীতিতে কোনো আধুনিক ধরনের ব্যাংক কায়েম ছিল না। এ কারণে আধুনিক অর্থনীতিতে সুদের যেসব খারাপ প্রভাব রয়েছে অথবা ব্যাংক মুদ্রা সৃষ্টির মাধ্যমে যে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় তা মদিনার ইসলামী অর্থনীতিতে দেখা দেয়নি।

অর্থনীতি ও ব্যাংককে কি করে সুদমুক্ত করা যেতে পারে তা অবশ্য আলাদা করে আলোচনা করার বিষয়। এখানে শুধু একটি কথা উল্লেখ করা যায় যে, আধুনিক অর্থনীতিকে একবারে সুদমুক্ত করা হয়ত যাবে না, তবে অর্থনীতির এক-একটি অংশকে পর্যায়ক্রমে সুদমুক্ত করতে হবে।

## মজুরের অধিকার

মদিনার অর্থনীতিতে মজুররা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারতো। তারা কোনো বিশেষ ব্যক্তির অধীনে কাজ করতে বাধ্য ছিল না। যে কোনো ব্যক্তির অধীনে কাজ করা বা মালিক বদল করার ব্যাপারে তারা নিজেরাই স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতো। মদিনার সমাজে শ্রমিকদের মর্যাদাশীল নাগরিক মনে করা হতো। শ্রমিকদের মর্যাদা মালিকদের থেকে কম মনে করা হতো না। মদিনায় বসবাসকারী মুহাজিররা আনসারদের বাগানে কাজ করতেন কিন্তু মুহাজিরদের মর্যাদা এতে কোনো অংশে কমে যায়নি। বড় বড় সাহাবিরা, যারা পরবর্তীকালে ইসলামী রাষ্ট্রের খলিফা হয়েছিলেন, অন্য মুসলমানের এমনকি মদিনার



www.pathagar.com

অমুসলিম ইহুদিদের নিকটও মজুরির বিনিময়ে কাজ করেছেন। মজুরদের সামাজিক মর্যাদা ইসলামের শিক্ষা হতেই মদিনার ইসলামী সমাজে সৃষ্টি হয়েছিল। তাকওয়ার কারণে যে মর্যাদার পার্থক্য সৃষ্টি হয় তা ছাড়া অন্য কোনো কারণে ইসলাম মর্যাদার পার্থক্য স্বীকার করে না। কুরআন মজীদে ইরশাদ করা হয়েছে:

> তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট তারাই অধিক সম্মানিত যারা অধিক তাকওয়াশীল। (সূরা হুজরাত: আয়াত ১৩)

নবী করিম (সা.) সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন: "তারা (শ্রমিকরা) তোমাদের ভাই। আল্লাহ্ তাদের দায়িত্ব তোমাদের উপর অর্পণ করেছেন। ... তোমরা যা খাবে, তাই তাদের খেতে দেবে। যা পরবে তাদেরকে তাই পরতে দেবে। আর যে কাজ করা তাদের পক্ষে কষ্টকর, তা করার জন্য তাদেরকে বাধ্য করবে না।"[৪]

কাজেই মদিনার সমাজে মজুরদের ভাই বলে গণ্য করা হতো। সেখানে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হতো না। উপরন্তু তাদের তৎকালীন পরিস্থিতিতে পর্যাপ্ত মজুরি প্রদান করা হতো। মজুরি সময়মতো পরিশোধ করা হতো। মজুরি কাজে নিযুক্ত করার পূর্বে নির্ধারিত হতো। এ ব্যাপারে নবী করিমের (সা.) আদেশ হচ্ছে:

ক. মজুরের মজুরি তার ঘাম শুকাবার পূর্বে আদায় কর।[৫]
খ. মজুরকে মজুরি নির্ধারণ না করে কাজে নিয়োগ করবে না।[৬]

আজকের দিনেও মজুরের মর্যাদা, অধিকার ও স্বার্থরক্ষা করার জন্য ইসলামী সরকারকে বিস্তারিত আইন রচনা করতে হবে, যাতে ইসলামের নির্দেশগুলো সঠিকভাবে পালিত হয়। এখানে এ কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যদিও ইসলাম শ্রেণি-সংগ্রাম সমর্থন করে না, তবুও তার অর্থ এ নয় যে সমাজের ভিন্ন স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী বিভিন্ন শ্রেণির (যেমন বাড়িওয়ালা বনাম ভাড়াটিয়া অথবা মালিক বনাম শ্রমিক) মধ্যে যে স্বাভাবিক সংঘাত রয়েছে, তাকে অস্বীকার করতে ইসলাম শিক্ষা দেয়। এ ক্ষেত্রে ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে, এসব সংঘাতের মধ্যে ইনসাফ সহকারে মীমাংসা করে দেয়া। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে:

> যখন বিশ্বাসীদের মধ্যে দুই দল সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তখন তাদের মধ্যে ইনসাফের ভিত্তিতে মীমাংসা করে দাও। (সূরায়ে হুজরাত: আয়াত ৯)

## করব্যবস্থা

মদিনার অর্থনীতিতে ওশর, খারাজ, যাকাত, বাণিজ্যশুল্ক – এগুলো ছিল প্রধান সরকারি আয়। মুসলমানদের অধিকারভুক্ত জমিতে উৎপন্ন ফসলের যাকাতকে ওশর বলা হয়। বৃষ্টি বা ঝর্ণায় সিক্ত ভূমি হতে ফসলের এক-দশমাংশ ও যেসব



www.pathagar.com

জমিতে অন্যভাবে সেচ দিতে হয় তা থেকে বিশ ভাগের একভাগ ফসল ওশর হিসেবে নেয়া হতো। অমুসলিমদের মালিকানা ও ভোগাধিকারভুক্ত জমি হতে খারাজ আদায় করা হতো। জমির গুণাগুণ ও উর্বরতার ভিত্তিতে খারাজ নির্ধারণ করা হতো। নগদ অর্থ, ব্যবসাপণ্য, স্বর্ণ-রৌপ্য, প্রয়োজনাতিরিক্ত পশু ইত্যাদি সম্পদের উপর হতে যাকাত আদায় করা হতো।

মদিনার অর্থনীতিতে যাকাত ও অন্যান্য খাত হতে পর্যাপ্ত আয় হতো এবং তাতে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ও সামরিক ব্যয়ের চাহিদা মিটে যেত, তাই এসব খাতে অতিরিক্ত কর ধার্য করার কোনো প্রয়োজন তখন দেখা দেয়নি। কিন্তু রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে এসব খাতে অতিরিক্ত কর ধার্য করার অধিকার ইসলামী সরকারের রয়েছে। হযরত ওমর ফারুক (রা.) আমদানি পণ্যের উপর শুল্ক ধার্য করেছিলেন।[৭] পরবর্তী ইমামরাও যেমন ইমাম শাতিবী ও ইমাম ইবনে হাজম সরকারের অতিরিক্ত কর ধার্য করার আইনগত অধিকার স্বীকার করেছেন।[৮]

মদিনার অর্থনীতির উপর কড়া নজর রাখা হতো যাতে আদল-ইনসাফ কায়েম থাকে ও কোনো জুলুম হতে না পারে। আল মাওয়ার্দী তাঁর বিখ্যাত বই 'আল-আহকামুস সুলতানীয়া'তে লিখেছেন, "ইসলামী সরকারের অন্যতম দায়িত্ব মারুফকে কায়েম করা ও মুনকারকে বন্ধ করে দেয়া। এ হচ্ছে একটি সামগ্রিক ফরয, যা জীবনের প্রতিটি দিকের সাথে সম্পর্কিত। এ ফরয আদায় করার জন্য ইসলামী সরকারসমূহ বিশেষ ব্যবস্থা করে থাকে এবং ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ইসলামী সরকারসমূহ 'হিসবা' নামে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান কায়েম করেছিল।"[৯]

হযরত ওমর ফারুক (রা.) এ কাজ নিজেই করতেন। তিনি বাজারের উপর সর্বক্ষণ নজর রাখার জন্য আবদুল্লাহ বিন ওতবাকে নিয়োগ করেছিলেন।[১০]

কাজেই স্পষ্টই প্রমাণিত হচ্ছে যে, মদিনার অর্থনীতির উপর সব সময়ই কড়া নজর রাখা হতো এবং কোনো অবিচার যাতে না হতে পারে তা নিশ্চিত করা হতো। হযরত ওমর (রা.) একবার বাজারে নিজে পানি মেশানো দুধ দেখতে পেয়ে তা মাটিতে ঢেলে দিয়েছিলেন যাতে ভেজাল প্রতিরোধ করা যেতে পারে।[১১]

ওপরে মদিনা ও আরব দেশে কায়েম করা ইসলামী অর্থনীতির প্রথম মডেলটির চিত্র তুলে ধরা হলো। আজকের যুগেও নতুন করে ইসলামী অর্থনীতি গড়ে তুলতে হলে তার মূলনীতি মদিনার মডেল থেকে গ্রহণ করতে হবে। এ অর্থনীতি কুরআনের আলোকে রসূলুল্লাহ (সা.) ও মহান খোলাফায়ে রাশেদার হাতে গড়ে উঠেছিল। তাঁদের চেয়ে বেশি ভালো করে কেউ ইসলামকে বুঝতে পারেন না বা তাদের চেয়ে বেশি ইনসাফ ও জনকল্যাণ করার কথা কেউ ধারণাও করতে পারেন না, ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতি ও তার প্রতিষ্ঠা করার যারা চিন্তা করেন তাদের একথা মনে রাখতে হবে।



www.pathagar.com

তথ্যসূত্র:

১. তাবারী।

২. ইমাম ইবনে তাইমিয়া, আল হিসবা ফিল ইসলাম।

৩. শেখ আবু জোহরা: আল মিলকিয়াত ও নজরিয়া ফি শরীয়া আল ইসলামিয়া।

৪. বুখারী, কিতাবুল ঈমান।

৫. ইবনে মাজাহ, বায়হাকী।

৬. বায়হাকী।

৭. আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, পৃষ্ঠা ১৬১।

৮. শাতিবী, আল ইতিসাম, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ২৯৫, ইবনে হাজম, আলমুহাল্লা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৫৬ এবং ইউসুফ আল কারজাভী, ইসলামের যাকাত বিধান, ২য় খণ্ড।

৯. আল মাওয়ার্দী: আল-আহকামুস সুলতানিয়া, পৃষ্ঠা - ২০৭।

১০. মুয়াত্তা ইমাম মালিক: কিতাবুজ যাকাত, কনজুল উম্মাল, তৃতীয় খণ্ড, ২৬৫২ নং রেওয়ায়েত।

১১. ইমাম ইবনে তাইমিয়া: আল হিসবা ফিল ইসলাম।



www.pathagar.com

# ইসলামী অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকা

অর্থনীতিতে ইসলামী সরকারের ভূমিকা আলোচনার পূর্বে ইসলামী অর্থনীতির উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা প্রয়োজন। কেননা এর উপরেই নির্ভর করে অর্থনীতিতে সরকার কি ভূমিকা নেবে।

ইসলামী অর্থনীতির (প্রকৃতপক্ষে গোটা ইসলামী জীবনব্যবস্থা বা বিধানের) মূল লক্ষ্য হচ্ছে 'আদল' ও 'ইহসান' কায়েম করা। এ সম্পর্কে কুরআন পাকের ঘোষণা হচ্ছে:

> আল্লাহ তোমাদের আদল, ইহসান ও নিকট লোকদের অধিকার আদায়ের আদেশ দিচ্ছেন ও অশ্লীলতা, দুর্নীতি ও অবাধ্যতা নিষেধ করেছেন। (সূরা নহল: আয়াত ৯০)

আদল ও ইহসানকে সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠা করার কথাই আল্লাহপাক বলেছেন। কেবল ব্যক্তিগত পর্যায়ে নয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও এই আদল ও ইহসানকে (সুকার্যক্রম বা good conduct) প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার অর্থ হচ্ছে সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক জুলুমের পন্থাকে নিষিদ্ধ করে দেয়া ও এমন সব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যাতে দেশের ভেতরে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, শ্রেণিতে শ্রেণিতে, অঞ্চলে অঞ্চলে সুবিচার কায়েম হয়। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুবিচারের অর্থ হবে এক রাষ্ট্র কর্তৃক অন্য রাষ্ট্রের শোষণ বন্ধ করা। আজকাল উন্নত রাষ্ট্রসমূহ দরিদ্র দেশসমূহকে কাঁচামালের কম দাম দিয়েও শিল্পজাত দ্রব্যের উচ্চ দাম আদায় করার মাধ্যমে শোষণ করে থাকে। শোষণের আরো অনেক উপায় আছে।

ইসলামী অর্থনীতির সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে, সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। এটিই প্রধান বিষয় এবং কোনো যুক্তিতেই সামাজিক সুবিচারের মূলনীতিকে ক্ষুণ্ন করা যাবে না। ইসলামী অর্থনীতির অন্যান্য লক্ষ্য যেমন সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার, জীবিকা অর্জনের স্বাধীনতা, বঞ্চিতদের অর্থনৈতিক প্রয়োজন মিটানো ও মানবিক মর্যাদার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার কায়েম করা। কাজেই অন্যসব অর্থনৈতিক বিবেচনাকে সামাজিক সুবিচার মূলনীতির অধীনস্থ মনে করতে হবে এবং সত্যিকার অর্থে সামাজিক ও



www.pathagar.com

অর্থনৈতিক সুবিচার ব্যাহত করে এমন কোনো অর্থনৈতিক নিয়ম বা নীতিকে কার্যকর থাকতে দেয়া কিছুতেই বৈধ হতে পারে না।

সুবিচার এবং সুকার্যক্রম প্রতিষ্ঠার যে আদেশ আল্লাহপাক দিয়েছেন তা ইসলামী সরকারসহ প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উপর ফরয। এ ফরয পালন করা থেকে কোনো মুসলমান বা সরকার অব্যাহতি পেতে পারে না। এছাড়া আল্লাহপাক স্পষ্টভাবে কুরআন মজীদে ইসলামী সরকারের ভূমিকা এভাবে উল্লেখ করেছেন:

> তাদেরকে পৃথিবীতে ক্ষমতা দান করা হলে তারা নামাজ কায়েম করে, যাকাত দান করে, সুনীতির প্রতিষ্ঠা করে ও দুর্নীতির প্রতিরোধ করে। (সূরা তওবা: আয়াত ৭১)

এ আয়াতে আল্লাহপাক মারুফের প্রতিষ্ঠা ও মুনকারের প্রতিরোধের কথা বলেছেন। আদল ইহসান করতে হলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মারুফকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং মুনকারকে প্রতিরোধ করতে হবে। মারুফ বা সুনীতি ও মুনকার বা দুর্নীতি শব্দ দু'টি অত্যন্ত ব্যাপক এবং নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সবক্ষেত্রেই এটি সক্রিয় রয়েছে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে 'আমরু বিল মারুফ' এর সঠিক প্রয়োগের অর্থ হবে সর্ববিধ উপায়ে সুবিচারমূলক অর্থনীতি গড়ে তোলা এবং 'নাহি আনিল মুনকার' এর অর্থ হবে অর্থনৈতিক জুলুমের সব উপায় ও পন্থাকে বন্ধ করে দেয়া। অর্থনৈতিক সুবিচার কায়েম ও জুলুমের অবসানের জন্য রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় সব আইন রচনা করতে পারে এবং তার প্রয়োজনীয় আইনগত ক্ষমতা কুরআনের এ আয়াতে ইসলামী সরকারকে প্রদান করা হয়েছে। অবশ্য কি ধরনের অর্থনৈতিক পন্থা ও উপায়কে জুলুম বলে গণ্য করা হবে তা নির্ভর করবে শরিয়তের ভিত্তিতে গঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের পার্লামেন্টের সিদ্ধান্তের উপর। পার্লামেন্টের এ ক্ষমতা ব্যক্তি স্বাধীনতার অজুহাতে খর্ব করা যেতে পারে না। এ ক্ষমতা প্রয়োগ করে ইসলামী সরকার সব ধরনের মুনাফাখোরী, মজুতদারী, কার্টেল, মনোপলী, চোরাচালান ও অন্য সব অন্যায় পন্থা বন্ধ করে দিতে পারে। এসব বন্ধ করে দেয়ার জন্য আইন তৈরি করা সরকারের জন্য অপরিহার্য। অন্যদিক থেকে বিচার করলেও আমরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামী সরকারের ক্ষমতা সম্পর্কে একই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারবো। ইসলামী আইন রচনার তিনটি ভিত্তি হচ্ছে - কুরআন, সুন্নাহ ও ইজতিহাদ। ইজতিহাদ করার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। কিয়াস বা অনুমিত সিদ্ধান্ত (Systematic inference) হচ্ছে ইজতিহাদের অন্যতম পদ্ধতি। ইজতিহাদের অন্য উল্লেখযোগ্য নীতি ইসতিহসান বা ইসতিসলাহ অর্থাৎ আইনের এমন ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করা যাতে জনগণের মঙ্গল ও সুবিধা হয়। এখন দেখা যেতে পারে যে, শরিয়তে কেন সুদ ও জুয়াকে হারাম করা হলো, কেন যাকাতকে ফরয করা হলো এবং কেন বা অর্থ যেন ধনীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে সে ব্যাপারে সতর্ক করা হলো?



www.pathagar.com

স্পষ্টতই আল্লাহপাক সুদ ও জুয়াকে সমাজের জন্য অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অত্যন্ত ক্ষতিকর মনে করেই নিষিদ্ধ করেছেন। তেমনিভাবে যাকাতকে সমাজের জন্য অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কল্যাণকর হওয়ার কারণেই ফরয করেছেন। এ থেকে স্পষ্ট কিয়াস করা যায় যে, আল্লাহ পাক ক্ষতিকর অর্থনৈতিক নিয়ম ও পন্থাকে অপছন্দ করেন এবং সমাজের জন্য কল্যাণকর অর্থনৈতিক পন্থাকে পছন্দ করেন। কাজেই কিয়াসের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়া যায় যে, সমাজ ও ইসলামী সমাজের দায়িত্ব হলো ক্ষতিকর অর্থনৈতিক উপায় ও পন্থাকে উৎখাত করা এবং সমাজের পক্ষে কল্যাণকর অর্থনৈতিক উপায় ও পন্থাকে উৎসাহিত ও প্রতিষ্ঠিত করা।

শরিয়ত ও ইসলামী আইনের লক্ষ্য সম্পর্কে ইমাম ইবনে কাইয়্যেমের মত এখানে উল্লেখ করা হলো:

> আল্লাহতায়ালার নবী পাঠানো ও কিতাব নাজিল করার উদ্দেশ্য ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা যা হচ্ছে গোটা সৃষ্টির মূলনীতি। আল্লাহর নাজিল করা প্রতিটি বিষয় এ কথাই প্রমাণ করে যে, এসবের সত্যিকার উদ্দেশ্য হচ্ছে সত্য ও ইনসাফ এবং একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা। যেভাবেই আইন রচনা করা হোক না কেন আইনকে সত্য ও ইনসাফের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আইনের আসল লক্ষ্য কিভাবে আইন পাওয়া গেল তা নয়। কিন্তু আল্লাহ আমাদের কিছু আইন দিয়ে কতকগুলো উদাহরণ স্থাপন করেছেন এবং আইনের কয়েকটি যুক্তিসংগত ভিত্তি দিয়েছেন। আমরা তাই ন্যায়সংগত সরকারি নীতি ও আইনকে শরীয়তের অংশ মনে করি। শরীয়তের বরখেলাপ হওয়া মনে করি না। এসবকে রাজনৈতিক নীতি বলা কেবল পরিভাষার ব্যাপার। আসলে এগুলো শরীয়তেরই অংশ, তবে শর্ত এই যে, এগুলিকে ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।[১]

এই উদ্ধৃতিটি বর্তমানকালে ইসলামী আইন রচনা প্রসঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামী রাষ্ট্র কর্তৃক তৈরি করা আইনের ধর্মীয় প্রকৃতি এ থেকে প্রমাণিত হয়। আরো একদিক থেকে আমরা ইসলামী অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা পর্যালোচনা করতে পারি। শরীয়তের পরিভাষায় 'ফরজে কেফায়া' বলা হয় সে সব সামাজিক ফরজকে যা নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর ফরজ নয়, কিন্তু যা সমাজকে অবশ্য করতে হয়। এ সম্পর্কে ইমাম শাতিবি লিখেছেন:

> ফরজে কেফায়া'র অর্থ – এগুলি নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর ফরজ নয়। এগুলি গোটা সমাজের দায়িত্ব। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐ সব সাধারণ জনকল্যাণকর কাজগুলি অব্যাহতভাবে হতে থাকার অবস্থা করা যার অবর্তমানে ব্যক্তিস্বার্থও নিরাপদ থাকে না। এগুলি পূর্বে উল্লিখিত ব্যক্তিগত ফরজগুলিকে পূর্ণ ও শক্তিশালী করে। কাজেই এগুলি অত্যন্ত



www.pathagar.com

জরুরি কাজ। ফরজে কেফায়াগুলি সব মানুষের কল্যাণের জন্য। এজন্যই এসব দায়িত্ব ব্যক্তির উপর ছেড়ে দেয়া হয়নি, কারণ তাহলে এগুলি ব্যক্তিগত ফরজে পরিণত হতো। কিন্তু ব্যক্তির পক্ষে তার নিজের সব দায়িত্বই সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব হয় না, পরিবার, আত্মীয়স্বজন, সমাজ ও সাধারণ মানুষের কথা তো অনেক বড় ব্যাপার। সে জন্যই আল্লাহতায়ালা সাধারণ স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়গুলোর দায়িত্ব সমাজের উপর অর্পণ করেছেন। এটাই সমাজ ও রাষ্ট্রের অস্তিত্বের ভিত্তি।[২]

জিহাদ, ইসলামের প্রচার, সবার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা এবং গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক শিল্প ও সেবা 'ফরজে কেফায়া'র অন্তর্ভুক্ত। ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, "শাফিয়ী ও হামবলী ফিকাহর অনুসারী অনেক ফকীহ্ এবং গাজ্জালী ও আলজওজীর মতে এসব শিক্ষা হচ্ছে 'ফরজে কেফায়া', কেননা (জাতির) অর্থনৈতিক জীবন এসব শিক্ষা ছাড়া চলতে পারে না।"[৩] কাজেই দেখা যাচ্ছে, গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সেবা ও শিল্পগুলো কায়েম রাখা সমাজ ও সরকারের দায়িত্ব।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে ক্ষমতা ও অধিকার প্রয়োজন, উপরের আলোচনা হতে প্রমাণিত হয় যে, সে ক্ষমতা ইসলামী শরিয়তে সরকারকে দেয়া হয়েছে। মুসলিম ফকীহরাও এ মত সমর্থন করেছেন। এ নীতিগত আলোচনার পর বর্তমান মুসলিম বিশ্বের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সামনে রেখে ইসলামী সরকারের বাস্তব অর্থনৈতিক ভূমিকা কি হতে পারে তা নির্ধারণ করা যেতে পারে।

সব মুসলিম দেশেই ইসলামী সরকারের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে শরীয়ত প্রদত্ত সব অধিকার হেফাজত করা। ইসলামী শরীয়ত ব্যক্তিকে আয় উপার্জনের অধিকার দান করেছে। কুরআন মজীদে ঘোষণা করা হয়েছে:

> আল্লাহ্ তোমাদের জন্য ব্যবসাকে হালাল করেছেন।
> (সূরা আল-বাকারা: আয়াত ২৭৫)

> যখন নামাজ শেষ হয়, পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর দেয়া রিজিক অনুসন্ধান কর। (সূরা জুমুয়া: আয়াত ১০)

ওপরের আয়াত দু'টি হতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, কর্মের স্বাধীনতা (Freedom of work and enterprise) ইসলামের একটি বুনিয়াদী নীতি। ইসলামে কেবল কর্মের স্বাধীনতা দেয়া হয়নি বরং জীবিকার জন্য কাজ করাকে ফরজ করা হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না ঐ অধিকারকে অপব্যবহার করা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এটা রক্ষা করা ইসলামী সরকারের কর্তব্য।

তেমনিভাবে জায়েজ পথে অর্জিত ধন-সম্পদ এবং ইসলামী উত্তরাধিকার আইন বলে পাওয়া ধন-সম্পদ নিজের কর্তৃত্বাধীনে রাখা ও ভোগ-দখল করার



www.pathagar.com

অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তিকে ইসলাম দান করেছে। কুরআন মজীদে স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে:

> তোমাদের মাল একে অপরে অন্যায়ভাবে খেয়ো না।
> (সূরা আল-বাকারা: আয়াত ১৮৮, সূরা নিসা: আয়াত ২৯)
>
> পুরুষগণ যা উপার্জন করে তা তাদের এবং স্ত্রীলোকগণ যা উপার্জন করে তা তাদের। (সূরা নিসা: আয়াত ৩২)

কুরআন পাকে আরো বলা হয়েছে,

> তারা কি চিন্তা করে না যে আমি আমার ক্ষমতায় তাদের জন্য জন্তু-জানোয়ার সৃষ্টি করেছি, যেসবের তারা মালিক হয়ে থাকে। (সূরা ইয়াসিন: আয়াত ৭১)

এ আয়াতে আল্লাহপাক মানুষের জন্য 'মালিক' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অবশ্য মানুষ কখনো নিরঙ্কুশ মালিক হতে পারে না। নিরঙ্কুশ মালিকানা হচ্ছে একমাত্র আল্লাহর। কেননা কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানে ঘোষণা রয়েছে যে, আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর মালিক হচ্ছে আল্লাহ। কাজেই মানুষের অধিকার হচ্ছে আমানতী মালিকানার। মানুষ আল্লাহর খলিফা হিসেবে আমানতদার মাত্র। আল্লাহর আদেশ-নির্দেশের অধীনেই তাকে তার ধন-সম্পত্তি ভোগ-ব্যবহার করতে হবে। ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার প্রত্যেক ব্যক্তির ও প্রতিষ্ঠানের আমানতী মালিকানার অধিকার সংরক্ষণ করবে।

## অবৈধ সম্পত্তি

নাজায়েজ পন্থায় জুলুম করে অর্জিত সম্পত্তি রক্ষা করা ইসলামী সরকারের দায়িত্বের অংশ নয়। বরং অবৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদ ইসলামী সরকার বাজেয়াপ্ত করে নেবে। কেননা সব অবৈধ পন্থাই হচ্ছে হারাম ও মুনকার, আর মুনকার নির্মূল করা হচ্ছে ইসলামী সরকারের প্রধানতম দায়িত্ব।

অবৈধ সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে নেয়ার অথবা তার মূল মালিকদের নিকট ফিরিয়ে দেয়ার অনেক নজির ইসলামী ইতিহাসে রয়েছে। যেসব শাসনকর্তা তাদের সরকারি পদের সুযোগ নিয়ে বিত্ত-সম্পত্তি করেছিলেন তাদের সম্পত্তির এক অংশ হযরত ওমর (রা.) বাজেয়াপ্ত করেছেন। এ কারণে তিনি একবার ওমর বিন আল আস ও সা'দ বিন আবী ওয়াককাসের অর্ধেক মাল বাজেয়াপ্ত করেন।[৪]

হযরত ওমর বিন আব্দুল আজিজ (রা.) ক্ষমতা গ্রহণ করার পর বনি উমাইয়ার লোকেরা অন্যদের যেসব জমাজমি ও সম্পদ জোরজবরদস্তি করে বা অবৈধ উপায়ে দখল করে নিয়েছিল তা তাদের নিকট থেকে কেড়ে নিয়ে মূল মালিকদের নিকট ফিরিয়ে দেন।[৫]



www.pathagar.com

ইমাম আবু ইউসুফ বলেন, 'আমার এক শিক্ষক আমাকে বলেছেন যে, ওমর বিন আব্দুল আজিজের নজর সবসময় অন্যায়ভাবে দখলীকৃত সম্পদ তার সত্যিকার মালিকদের নিকট ফিরিয়ে দেয়ার প্রতি নিবদ্ধ ছিল।'[৬]

কাজেই ইসলামী সরকারের অন্যতম দায়িত্ব হবে অবৈধ সম্পত্তি উদ্ধার করে তার সত্যিকার মালিকদের নিকট ফিরিয়ে দেয়া অথবা বায়তুল মালে জমা রাখা। এজন্য অতীতে 'হিসবা' নামে একটি দফতর কায়েম করা হয়েছিল।[৭]

আজও মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান কায়েম করতে হবে। এ বিভাগের দায়িত্ব দিতে হবে অত্যন্ত সচ্চরিত্র উচ্চপর্যায়ের লোকদের হাতে। কোনো সাধারণ বিভাগের পক্ষে এ দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। যাদের হাতে সীমাতিরিক্ত অর্থ-সম্পদ রয়েছে তাদের সম্পদ জায়েজ পথে অর্জিত হয়েছে কিনা তা দেখা এ বিভাগের বিশেষ কর্তব্য হবে। ইসলামের দেয়া কর্ম ও জীবিকা অনুসন্ধানের স্বাধীনতার অর্থ এ নয় যে, সমাজের জন্য ক্ষতিকর ব্যবসা করা যাবে। তা কখনো হতে পারে না। কেননা ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে সমাজের জন্য ক্ষতিকর কোনো কাজই জায়েজ হতে পারে না। এগুলো সবই মুনকারের পর্যায়ভুক্ত। এগুলো নির্মূল করা সরকারের কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ (সা.) ঘোষণা করেছেন, 'যে ব্যক্তি ধোঁকাবাজি করে সে আমার তরীকার লোক নয়।'[৮]

এর উপর ভিত্তি করে সাইয়েদ কুতুব বলেছেন, 'ইসলাম ব্যবসা-বাণিজ্য ও কারবারের মধ্যে ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা সম্পূর্ণভাবে হারাম ঘোষণা করেছে।'[৯]

সাইয়েদ মওদূদী বলেছেন, 'সামগ্রিক স্বার্থের পক্ষে ব্যবসায়ের যেসব নিয়মপন্থা মারাত্মক ও ক্ষতিকর তা সবই আইনত বন্ধ করে দেয়া আবশ্যক।'[১০]

## মজুতদারি

ইসলামী সরকারকে সব অবৈধ-অন্যায় ব্যবসার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। যেসব ব্যবস্থা জনগণের খুব বেশি ক্ষতি করে থাকে তার মধ্যে মজুতদারি অন্যতম। মজুতদার স্বাভাবিক ব্যবসায়ী নয়। স্বাভাবিক ব্যবসায়ী মাল কিনে ও বিক্রি করে স্বাভাবিক মুনাফা করে থাকে। কিন্তু মজুতদার পণ্য কিনে বহুদিন আটকে রাখে যাতে বাজারে দুষ্প্রাপ্যতা সৃষ্টি হয় ও মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। মজুতদারির ফলে দ্রব্যের মূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। অনেক সময় দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হয়। ফলে অসংখ্য মানুষ মৃত্যুবরণ করে। নবী করিম (সা.) বলেছেন: 'যে ইহতিকার করল সে অপরাধী।'[১১]

'ইহতিকার' অর্থ অধিক লাভের আশায় পণ্য মজুত রাখা। খাদ্য দ্রব্যের ইহতিকার করতে রাসূলুল্লাহ (সা.) নিষেধ করেছেন। কাজেই ইসলামী সরকার মজুতদারকে শক্ত হাতে দমন করবে। এজন্য প্রয়োজনীয় আইন রচনা করতে হবে। যদি আগে হতে আইন থেকে থাকে তবে তা যথাযোগ্যভাবে সংশোধন ও প্রয়োগ করতে হবে। অবশ্য আইন প্রণয়ন বা সংশোধনের সময়



www.pathagar.com

খেয়াল রাখতে হবে যেন স্বাভাবিক মজুত ব্যবসায়ে কোনো অসুবিধা না হয়। এজন্য আইনে এমন ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে যার অধীনে ব্যবসায়ী কোনো মাল সর্বোচ্চ কত পরিমাণ কত দিন ধরে রাখতে পারবে, সময়ে সময়ে সরকার তা নির্ধারণ করে দেবেন। যেমন, কৃষিপণ্য ফসল উৎপাদনের সময় অধিক পরিমাণ বেশি দিন ধরে রাখার অনুমতি দেয়া যেতে পারে। আবার যে সময় এ দ্রব্য কম পাওয়া যায় সে সময় মজুতের সময় ও পরিমাণ কমিয়ে দেয়া যেতে পারে। আমদানি ও শিল্পজাত দ্রব্যের ব্যাপারে তেমনিভাবে মজুতের সময় ও পরিমাণ নির্ধারণ করে দেয়া যেতে পারে। আমদানি এবং উৎপাদনের পরিমাণ ও বিক্রি মূল্য পত্রিকায় নিয়মিত ঘোষণা করতে বাধ্য করা যেতে পারে। ক্রেতারা কিনতে চাইলে এসব উৎপাদন ও আমদানি দ্রব্য যাতে আমদানিকারক ও উৎপাদক বিক্রি করতে বাধ্য থাকে, আইনে তার ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। মজুতদারি বন্ধ করার জন্য সরকার অন্যসব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

## মুনাফাখোরী

ইসলামী শিক্ষার আলোকে ন্যায়সংগত মুনাফা হচ্ছে সেই মুনাফা,

ক. যা সাধারণ অবস্থায় স্বাভাবিক বাজারের (Market) চাহিদা ও যোগানের নিয়ম অনুযায়ী পাওয়া যায়। অর্থাৎ যে অবস্থায় চাহিদা বা যোগানকে অস্বাভাবিকভাবে প্রভাবিত করা হয় না।

খ. যা মিল-কারখানা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা ক্ষেতে-খামারে কর্মরত শ্রমিকদের ন্যায়সংগত মজুরি দেয়ার পর পাওয়া যায়।

গ. যা ক্রেতাদের ক্রয়ক্ষমতার খেয়াল রেখে অর্জন করা হয়।

এ ধরনের মুনাফাকেই ন্যায়সংগত মুনাফা বলা যেতে পারে। কাজেই যেসব ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি চাহিদা ও যোগানকে অস্বাভাবিকভাবে প্রভাবিত করে, শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে ও ক্রেতাদের শোষণ করে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করতে চায়, সরকার তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

নানাভাবে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার রক্ষা করার জন্য সরকার আইন প্রণয়ন করবে এবং তা মানতে মালিক ও ব্যবসায়ীদের বাধ্য করবে। দোকান কর্মচারী ও শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা করার জন্য এখনো নানা আইন রয়েছে। এগুলোকে বাস্তবতা, ইনসাফ ও প্রয়োজনের আলোকে সংশোধন ও শক্তিশালী করা যেতে পারে। দ্রব্যমূল্য কমিয়ে আনার জন্য সরকার স্বাভাবিক অর্থনৈতিক নিয়মসমূহের সুযোগ গ্রহণ করবেন। দেশে উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব না হলে বিদেশ হতে আমদানি বৃদ্ধি করে সরবরাহ বৃদ্ধি করার চেষ্টা করতে হবে। দেশে মালপত্রের অভ্যন্তরীণ চলাচলের উপর



www.pathagar.com

বিধিনিষেধ খুবই কম রাখতে হবে, কেননা এতে নানা অঞ্চলে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি হয় ও দুর্নীতির অবকাশ বৃদ্ধি পায়।

## দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ

অবশ্য এ সবেও কাজ না হলে ইসলামী সরকারকে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। জনগণের কষ্ট ও তাদের উপর জুলুম বন্ধ করা সরকারের অপরিহার্য দায়িত্ব। স্বাভাবিক অবস্থায় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করা ইসলামের নীতি নয়, কেননা ইসলাম স্বাভাবিক ও স্বাধীন অর্থব্যবস্থা পছন্দ করে যতক্ষণ পর্যন্ত না তাতে কোনো জুলুম হয়। কিন্তু যদি ব্যবসায়ীরা অন্যায়ভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করে এবং তাতে জনগণের অসহনীয় কষ্ট হয় তবে দ্রব্যমূল্য বেঁধে দিতে হবে। এ সম্পর্কে কয়েকজন মনীষীর মত উল্লেখ করা হলো:

বিশেষ অবস্থায় দ্রব্যমূল্য নির্ধারণের অধিকার রাষ্ট্রের রয়েছে এবং এ অধিকারের বুনিয়াদ শরীয়তের এই নীতি যে, জনগণের অসুবিধা দূর করা অপরিহার্য।[১২]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া তার 'আল হিসবা ফিল ইসলাম' বইতে কোন কোন অবস্থায় মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা যায় তা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তার আলোচনা তিনি সমাপ্ত করেছেন এভাবে, 'যদি স্বাভাবিকভাবে সাধারণ মানুষের প্রয়োজন পূরণের জন্য মূল্য ন্যায়সংগত পর্যায়ে নির্ধারিত না হয় তবে জনগণের জন্য ইনসাফের ভিত্তিতে মূল্য নির্ধারণ করে দেয়া হবে, কমও নয়, বেশিও নয়।'[১৩]

ফিকাহর বিখ্যাত গ্রন্থ 'হিদায়া'তে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'জনগণকে নিয়ন্ত্রিত মূল্যের অধীন করে দেয়া সরকারে জন্য ঠিক নয়, কেননা নবী করিম (সা.) বলেছেন, 'মূল্য নিয়ন্ত্রণ করবে না, কেননা আল্লাহ মূল্য নির্ধারণ করে থাকেন, সংকীর্ণতা ও প্রশস্ততা সৃষ্টি করে থাকেন এবং রিজিক দিয়ে থাকেন।' কাজেই বাজারের মূল্য নির্ধারণ করা ক্রেতা ও বিক্রেতার কাজ। সরকারের এতে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। একমাত্র জনগণের অসুবিধা দূর করার জন্যই তা করা যেতে পারে।'[১৪]

'আল্লাহ মূল্য নির্ধারণ করে থাকেন' অর্থ চাহিদা ও যোগানের স্বাভাবিক নিয়মে (Market forces) তা নির্ধারিত হয়ে থাকে। এ হাদিসটি সম্পর্কে ইমাম তাইমিয়া বলেছেন, "যে ব্যক্তি মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কে নবী (সা.)-এর হাদিস থেকে এ ব্যাখ্যা করেন যে, মূল্য নির্ধারণ ছিল সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ, তিনি ভুল করেন। কেননা এটা ছিল একটি বিশেষ অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত আদেশ, সাধারণ আদেশ ছিল না। এই হাদিসে একথা বলা হয়নি যে, কোনো ব্যক্তি এমন কোনো দ্রব্য বিক্রি করতে অস্বীকার করেছিল কিনা যা বিক্রি করতে সে বাধ্য ছিল অথবা এমন কোনো কাজ করতে অস্বীকার করেছিল যা করা তার উপর ওয়াজিব ছিল অথবা সে স্বাভাবিক মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত দাবি করেছিল।[১৫]



www.pathagar.com

মূল হাদিসটি হচ্ছে এই: নবী করিম (সা.)কে এক ব্যক্তি বলেছিল যে, মূল্য নির্ধারণ করে দিন। নবী (সা.) বললেন, মূল্য নির্ধারণ আল্লাহর কাজ, তিনিই সংকীর্ণতা ও প্রশস্ততা সৃষ্টি করেন ও রিজিক দিয়ে থাকেন। আমি খোদার কাছে এমনভাবে যেতে চাই যেন কারো হক আমার কাছে পাওনা না থাকে।[১৬]

এ সম্পর্কে শাহ ওয়ালীউল্লাহ বলেন, 'আমি বলি যে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে এমন ইনসাফ 'যাতে কারো ক্ষতি না হয় অথবা সমান ক্ষতি হয়' কায়েম করা কষ্টকর ছিল। এজন্য নবী (সা.) এ সতর্কতা অবলম্বন করেন যাতে শাসকরা (মূল্য নির্ধারণকে) সাধারণ নিয়মে পরিণত না করে ফেলেন। এ সত্ত্বেও যদি ব্যবসায়ীদের পক্ষ হতে প্রকাশ্য জুলুম হয় যা সব সন্দেহ হতে মুক্ত, তবে তা বন্ধ করা জায়েজ, কেননা এতে দেশের ধ্বংস নিহিত।'[১৭]

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, সামাজিক স্বার্থরক্ষা ও ইনসাফ কায়েম রাখার জন্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা সরকারের কর্তব্য, এ কথা ইসলামের বহু পণ্ডিতই ব্যক্ত করেছেন।

## মনোপলি ও কার্টেল

আজকাল শিল্পপতিরা মনোপলি ও কার্টেল কায়েম করে তার মাধ্যমেও জনগণকে শোষণ করে থাকে। যদি উৎপাদনের উপর উৎপাদকের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকে তবে তাকে মনোপলি বা একচেটিয়া কারবার বলে। যদি উৎপাদনের উপর মাত্র কয়েকজনের নিয়ন্ত্রণ থাকে তাতেও একচেটিয়া কারবারের অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। যখন উৎপাদকরা সমিতিবদ্ধ হয়ে উৎপাদন, মূল্য ও বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করে, সে অবস্থাকে কার্টেল বলে।

মনোপলির কিছু ভালো দিকও আছে। এতে উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে পারে এবং উৎপাদন খরচও কম হতে পারে। কার্টেলের কিছু অর্থনৈতিক সুবিধা হয়ত আছে, কিন্তু সাধারণভাবে এ যুগে একে ক্রেতা ও জনগণকে শোষণ করতে ব্যবহার করা হয়। উৎপাদন কমিয়ে দিয়ে অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি করা হয়। অধিকাংশ সময় উৎপাদন খরচের সাথে সংগতি না রেখে অস্বাভাবিক মূল্যে জনগণকে মাল কিনতে বাধ্য করা হয়। এসব যে স্পষ্ট জুলুম তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। অবশ্য সরকারি খাতে যেসব মনোপলি রয়েছে তাদের কথা স্বতন্ত্র। সে সব ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি বা জনগণকে শোষণের প্রশ্ন ওঠে না। কাজেই সরকারি মনোপলি ছাড়া অন্য সব মনোপলি ও কার্টেলকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শক্ত আইন করতে হবে এবং প্রয়োজন হলে বর্তমান আইনসমূহকে আরো শক্তিশালী করতে হবে। তেমনিভাবে অন্যান্য অবৈধ ব্যবসাকে (যেমন দ্রব্যে ভেজাল দেয়া) আইন প্রয়োগ করে শক্ত হাতে বন্ধ করতে হবে। আসল কথা, কোনো অন্যায় ও জুলুমমূলক এবং প্রবঞ্চণা ভিত্তিক ব্যবসায়ী নীতি চালু থাকতে দেয়া হবে না।


www.pathagar.com

## হিজরের আইন

ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা যদি এসব আইন মেনে না চলে এবং আইন ভঙ্গ করে তবে সরকার তাদের সম্পত্তি সাময়িকভাবে নিজের হাতে নিয়ে নিতে পারে। ইসলামী পরিভাষায় এ ব্যবস্থাকে হিজর বলে। হিজর অর্থ নিরস্ত করা। শরীয়তের দৃষ্টিতে হিজর অর্থ কোনো ব্যক্তিকে অর্থসম্পদের অপব্যবহার থেকে থামিয়ে দেয়া।[১৮] হিজরের আইনের ভিত্তি হচ্ছে কুরআন মজীদের এই আয়াত:

> তোমরা তোমাদের মাল নির্বোধ লোকদের উপর ছেড়ে দিও না, কেননা আল্লাহ এ ধন-সম্পত্তি তোমাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করে দাও সে সম্পত্তি হতে এবং তাদের ভালো নীতি শিক্ষা দান কর। (সূরা আন নিসা: আয়াত ৫)

এ আয়াতে নির্বোধ লোকদের নিকট থেকে তাদের আইনত মালিকানাধীন সম্পত্তি নিয়ে নেয়ার অধিকার সমাজকে দেয়া হয়েছে। অবশ্য সমাজের পক্ষ থেকে এ অধিকার সরকারই পালন করবে। ইসলামী আইন শাস্ত্রের দৃষ্টিতে নির্বোধ বলতে কেবল অবুঝ ও নাবালেগ ব্যক্তিকেই বুঝায় না। যারা মাল বরবাদ করে, জুলুমের জন্য ব্যবহার করে অথবা অনৈতিক কাজে ও অপরাধ বিস্তারে ব্যবহার করে তারাও নির্বোধ হিসেবে গণ্য হতে পারে। এসব অবস্থায় সরকার একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কারখানা, ব্যবসা বা অন্য সম্পত্তি মালিকের হাত হতে সরকারি কর্তৃত্বাধীনে নিয়ে যেতে পারে। অবশ্য হিজর কতদিনের জন্য হবে তা আদালত কর্তৃক নির্ধারিত হওয়া উচিত। হিজর কালে সরকার মালিককে যথোপযুক্ত খোরপোষ দিতে কুরআন মোতাবেক বাধ্য।

কারখানা বা ব্যবসা তার পক্ষ থেকে সরকার পরিচালনা করবে এবং খরচের পর যে লাভ থাকবে তা মালিকের একাউন্টে জমা হবে। অবশ্য হিজর বলবৎ থাকা অবস্থায় মালিক টাকা তুলতে পারবে না। এ ব্যবস্থা ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের সব সময় সতর্ক থাকতে বাধ্য করবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে এক নৈতিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনবে। এজন্য অবশ্য হিজর নীতির আলোকে একটি আধুনিক আইন রচনা করে সরকারকে তা আইন পরিষদ কর্তৃক পাশ করিয়ে নিতে হবে। এছাড়া হিজর কার্যকরী করা যাবে না।

## শ্রমিকের অধিকার

ইসলামী সরকারের একটি প্রধান কর্তব্য হবে শ্রমিকদের ন্যায়সংগত অধিকার পাওয়ার ব্যবস্থা করা এবং তাদের উপর যাতে জুলুম না হতে পারে তার যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা। নানা দিক দিয়ে এটি বর্তমান কালেও সরকারের বিশেষ নজর দাবি করে। শিল্প, কৃষি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সমাজের এক বিরাট অংশ শ্রমিক ও কর্মচারী হিসেবে কর্মে নিযুক্ত থাকে। বাংলাদেশেও শতকরা ২০ ভাগের মতো কর্মক্ষম জনশক্তি শ্রমিক ও কর্মচারী হিসেবে শিল্প, কৃষি ও ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছে। অপেক্ষাকৃত শিল্পোন্নত মুসলিম দেশ তুরস্ক, মিশর,



www.pathagar.com

পাকিস্তান ও ইরানে এ সংখ্যা আরো অধিক হবে। কাজেই সমাজের জনশক্তির এই বিরাট অংশের স্বার্থকে কিছুতেই অবহেলা করা যাবে না। অন্যদিকে শ্রমিক ও কর্মচারীদের অধিকার নিয়ে যদি মালিকরা ছিনিমিনি খেলে বা মালিকরা যদি যথোপযুক্ত মজুরি না দেয় তাহলে প্রায়ই সমাজে ব্যাপক অশান্তি দেখা দেয়। এসব ফেতনা-ফাসাদ ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত নিন্দনীয়। কাজেই যাতে সমাজে কোনো কারণে ফেতনা-ফাসাদ না হয় তার দিকে নজর রাখা ও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা সরকারের জন্য অপরিহার্য।

শ্রমিকদের ব্যাপারে ইসলামের মূলনীতি হচ্ছে যে, তারা হচ্ছে ভাই এবং তাদেরকে ভাইয়ের মতো ভরণপোষণের ব্যবস্থা করতে হবে। মজুরি না ঠিক করে কাজে নিয়োগ করা এবং বেকার খাটানো ইসলামে জায়েজ নয়। কাজেই সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে যাতে শ্রমিকরা পর্যাপ্ত মজুরি পায়। এ প্রসঙ্গে এ কথা উল্লেখ করা দরকার যে শ্রমকে অন্যান্য পণ্যের মতো বিবেচনা করা যেতে পারে না এবং বাজার দরের ভিত্তিতে তার মূল্য নির্ধারণ করা কখনো সংগত হবে না। অন্যান্য পণ্যকে যেমন তার মালিক হতে আলাদা করে বিবেচনা করা যেতে পারে, শ্রমকে তেমনিভাবে শ্রমিক হতে আলাদা করা যায় না। শ্রমিক শ্রমকে আলাদা করে বিক্রি করে অন্য কাজে লিপ্ত হতে পারে না। অপর দিকে শ্রমিকের অনুভূতি রয়েছে যা অন্যান্য পণ্যের নেই। শ্রমের ক্ষেত্রে আসল ব্যাপার হচ্ছে একটি পূর্ণ মানুষের ব্যবহার, কেবল তার শ্রমের ব্যবহার নয়। কাজেই শ্রমকে অন্যান্য পণ্য ও যন্ত্রের মতো কেনাবেচা করা যেতে পারে না বা তার অনুভূতিকে অবহেলা করা যেতে পারে না। তার মানবিক প্রয়োজন ও সম্মানকে কিছুতেই ক্ষুণ্ন করা যায় না। তার যথোপযুক্ত মজুরি ও সম্মান তাকে দিতেই হবে।

এসব নীতি ও মূল্যবোধকে সামনে রেখে সরকারকে একটি নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ করে দিতে হবে যা অনুসরণ করতে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা বাধ্য থাকবে। এজন্য সরকারের প্রয়োজন হবে একটি স্থায়ী মজুরি কমিশন নিয়োগ করা। কেননা, একদল এক্সপার্টের পক্ষেই বাজার দর পর্যালোচনা করে মজুরি কমিশনের সুপারিশকে আইন রচনা করে বা বর্তমান আইন সংশোধন করে কার্যকর করতে হবে। মজুরি কমিশন সব সময় বাজার দর পর্যালোচনা করতে থাকবে। যখনই বাজার দর বৃদ্ধি পাবে নিম্নতম মজুরির পর্যায়কেও সে সঙ্গে বাড়াতে হবে। বাস্তবতার প্রয়োজনে অবশ্য কমিশন বিভিন্ন শিল্পের জন্য প্রয়োজন হলে বিভিন্ন মজুরি হার নির্ধারণ করতে পারেন। কেননা ভারি শিল্পের পক্ষে শ্রমিককে যে বেতন দেয়া সম্ভব, ছোট শিল্পের জন্য তা সম্ভব নাও হতে পারে। আবার শিল্পের পক্ষে যে মজুরি দেয়া সম্ভব দোকানের পক্ষে তা দেয়া সম্ভব নাও হতে পারে।

বাস্তবতার আলোকেই সরকার মজুরদের অন্যান্য সুবিধাদানের ব্যবস্থা সম্বলিত আইন রচনা করবেন। শ্রমিকদের স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন করার যথাযথ



www.pathagar.com

অধিকার ও বাসস্থান, চিকিৎসা, বোনাস ইত্যাদি সুবিধা দেয়ার ব্যবস্থা আইনে থাকতে হবে। কিন্তু বোনাস কেবল সে শিল্পের পক্ষেই দেয়া সম্ভব, যে প্রতিষ্ঠানে লাভ হয়ে থাকে। লোকসানের সময় বোনাসের প্রশ্ন উঠতে পারে না। তেমনি ছোট শিল্প ও দোকান মালিকদের পক্ষে বাসস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব না হওয়ারই কথা। কিন্তু বড় শিল্পের পক্ষে ক্রমে ক্রমে শ্রমিকদের বাসস্থানের জন্য কলোনি করা সম্ভবপর হওয়া উচিত। অর্থাৎ বাস্তবতার নিরিখেই সরকারকে শ্রমিক অধিকার সংক্রান্ত আইন রচনা করতে হবে। অবাস্তব আইন কার্যকরী করা যাবে না, তা যত সদুদ্দেশ্যমূলক হোক না কেন। এসব আইনের উদ্দেশ্য হবে শ্রমিকের সত্যিকার স্বার্থ রক্ষা করা, শিল্প ও ব্যবসার উপরে স্বাভাবিক বোঝা চাপিয়ে দিয়ে অর্থনৈতিক উদ্যোগ নষ্ট করা নয়, কেননা তা অবশেষে বেকারত্ব ডেকে আনবে। এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, একটি দেশের শ্রমিক সমাজের জীবনযাত্রার মান কৃষক বা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারী সমাজ হতে অস্বাভাবিক বেশি হওয়া সম্ভব নয়। একটি মুসলিম দেশ যতদিন পর্যন্ত সামগ্রিকভাবে উন্নত না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত কোনো শ্রেণির জীবনমানই বাঞ্ছিত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না।

ইসলামী সরকারকে তাই সামগ্রিকভাবে অর্থনীতিকে উন্নত করার জন্য সর্বপ্রকার উদ্যোগ নিতে হবে এবং সেজন্য আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা, সংগঠন, পরিকল্পনা পদ্ধতি ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু তা হবে ইসলামী সরকারের সুদূরপ্রসারী কর্মসূচি। একই সঙ্গে প্রত্যেকটি মুসলিম সরকারকে তার দেশে বর্তমানে শ্রমিক সমাজ যেসব শোষণ ও জুলুমের শিকার হচ্ছে তার প্রতিবিধান করতে হবে।

## জুলুমের প্রতিবিধান

বিভিন্ন দেশে শ্রমিক সমাজ নানাভাবে বঞ্চিত ও শোষিত হচ্ছে। প্রথমে শিল্প শ্রমিকের কথাই ধরা যাক। আজও শিল্প শ্রমিকের চাকরির নিরাপত্তার অভাব রয়েছে। সামান্য কারণে বা ট্রেড ইউনিয়ন কার্যে অংশগ্রহণ করার জন্য তার চাকরি চলে যায়। তাই শ্রমিকের কর্মের নিরাপত্তা সম্পর্কিত আইনকে আরো শক্তিশালী করতে হবে। শ্রম আদালতের এখতিয়ার ব্যাপক হওয়া উচিত। মালিকরা যাতে সহজে 'লে-অফ' করে শ্রমিকদের বঞ্চিত করতে না পারে তার ব্যবস্থা আইনে রাখতে হবে। উপযুক্ত কারণ ছাড়া কিছুতেই 'লে-অফ' করতে দেয়া উচিত নয়, কেননা তাতে উৎপাদনও হ্রাস পায়। 'লে-অফ'-এর বিরুদ্ধে শ্রমিক ইউনিয়ন কর্তৃক শ্রম আদালতে মামলা করার অধিকার থাকতে হবে এবং এসব ক্ষেত্রে যাতে শ্রম আদালত সাত দিনের মধ্যে বিচার সম্পন্ন করে তার বিধানও আইনে থাকা উচিত।

তেমনিভাবে বোনাস না দিয়ে শ্রমিক সমাজকে যাতে মালিকরা বঞ্চিত না করতে পারে তার ব্যবস্থাও থাকা দরকার। যেহেতু লাভের উপর বোনাস নির্ভর করে, তাই মালিক যেন অপব্যয় ও হিসাবের কারচুপি করে লোকসান না দেখাতে



www.pathagar.com

পারে তার ব্যবস্থাও করা দরকার। অনেক সময় মালিকরা কারখানা হতে অতিরিক্ত ভাতা, যাতায়াত ও অন্যান্য খরচ নিয়ে কারখানার খরচ বৃদ্ধি করে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত লোকসান দেখিয়ে শ্রমিকদের বোনাস থেকে বঞ্চিত করে থাকে। বিষয়টি সরকারকে ভালো করে পর্যালোচনা করতে হবে। ভাতা খুবই যুক্তিসংগত পর্যায়ের হওয়া উচিত। এসবকে কিছুতেই কারখানার খরচ বৃদ্ধির পন্থা হতে দেয়া উচিত নয়। প্রকৃত খরচাদির পর কারখানার লাভের একটি যুক্তিসংগত অংশ বোনাস হিসেবে শ্রমিকদের দেয়া উচিত। আইনে তার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকা দরকার। এভাবে শ্রমিকদের শোষণের যত পন্থা আছে সব বন্ধ করে দিতে হবে। কেননা আল্লাহ্ জুলুম ও জালেমকে পছন্দ করেন না। বাংলাদেশের মতো কিছু মুসলিম দেশে কৃষি শ্রমিকরা নানাভাবে শোষিত হচ্ছে। গ্রামের জনসাধারণের এক বিপুল অংশ ভূমিহীন অথবা প্রায় ভূমিহীন জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। দুর্ভিক্ষ ও অন্যান্য দুর্যোগে তাদের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ক্ষেত তৈরি ও ফসল কাটার মওসুমে তারা মোটামুটি মজুরি পেয়ে থাকে। অন্যান্য মওসুমে তাদেরকে অত্যন্ত কম মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য হতে হয়, কেননা তখন কাজের অভাব থাকে। এ অবস্থার আসল প্রতিকার নিশ্চয়ই কাজ সৃষ্টি করার মধ্যে রয়েছে। সেজন্য অবশ্য এসব দেশের সরকারকে যথাযোগ্য পদক্ষেপ নিতে হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইসলামী সরকারের উচিত হবে কৃষি শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য তাদের নিম্নতম মজুরি বেঁধে দেয়া। আইন করেই তা করতে হবে। আইন ছাড়া এ অবস্থার সংশোধন করা সম্ভব নয়। মজুরি নির্ধারণ অবশ্য বাস্তবতার আলোকেই করতে হবে। অবাস্তব মজুরি নির্ধারণ করা হলে কৃষি শ্রমিক হয়ত বা একেবারেই কাজ পাবে না। তাতে অবস্থার আরো অবনতি হতে পারে। কাজেই তাদের নিম্নতম মজুরি ফসলের মওসুমে কিছুটা বেশি ও অন্য সময়ের জন্য কিছু কম ধার্য করা যেতে পারে। এজন্য স্থায়ী মজুরি কমিশনকে দায়িত্ব দিতে হবে। বাস্তব অবস্থা ও অভিজ্ঞতার আলোকেই তারা এসব মজুরি নির্ধারণ করবেন। সময় সময় সে মজুরি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পর্যালোচনা করতে হবে।

দোকান কর্মচারীরাও অস্বাভাবিক পরিশ্রম করতে বাধ্য হয়। তাদের বারো ঘণ্টার বেশি পরিশ্রম করতে হয়। এটা কিছুতেই ইনসাফ হতে পারে না কেননা এটা স্বাস্থ্যসম্মত নয়। তাদের অসুবিধা লাঘব করার ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরি। দোকান কর্মচারীদের জন্য কাজের শিফট ব্যবস্থা চালুর চিন্তা করা যেতে পারে। খুব ছোট দোকানে সম্ভব না হলেও বড় বড় দোকানের জন্য তা করা নিশ্চয়ই সম্ভব। কর্মে নিযুক্ত জনশক্তির একটি বিরাট অংশ হচ্ছে এই দোকান কর্মচারী। কাজেই তাদের যথার্থ অধিকারের ব্যবস্থা করা ইসলামী সরকারের বিশেষ দায়িত্ব হওয়া উচিত। অন্যান্য শ্রমিকদের মতো অবশ্য তাদের নিম্নতম বেতনও কমিশনকে বাস্তবতার আলোকে নির্ধারণ করে দিতে হবে। সরকারি কর্মচারীদেরকে ন্যায়সংগত মজুরি দেয়া সরকারের বিশেষ কর্তব্য হবে। গৃহকর্মীদের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থাও আইনে থাকতে হবে।



www.pathagar.com

## দারিদ্র্য দূরীকরণ

সমাজ হতে দারিদ্র্য দূর করা ইসলামী সরকারের অন্যতম দায়িত্ব, কেননা রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন যে, দারিদ্র্য মানুষকে কুফরের দিকে নিয়ে যেতে পারে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, দারিদ্র্য মুসলমানদের এক বিরাট অংশকে ইসলামের মূল দাওয়াত বুঝা, গ্রহণ করা ও কার্যকরী করার প্রচেষ্টা থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে। তারা এত সমস্যায় জর্জরিত যে, ইসলামী আদর্শবাদের কথা চিন্তা করতেও সময় পায় না। কাজেই সব উপায়ে মুসলিম বিশ্ব হতে দারিদ্র্যকে উৎখাত করতে হবে। এজন্য মুসলিম সরকারসমূহকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। দারিদ্র্যকে এক নম্বর শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে।

বেকার জনশক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। বেকার সমস্যার সার্বিক সমাধান অবশ্য অর্থনীতির ব্যাপক উন্নয়নের উপর নির্ভর করে। এ জন্য সরকারকে সরকারি ও বেসরকারি অর্থনৈতিক উদ্যোগকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে হবে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইসলামী সরকারের ভূমিকা যে কোনো গণতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক সরকার অপেক্ষা বেশি হওয়া উচিত। বেকার সমস্যার দীর্ঘস্থায়ী সমাধানের জন্য কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে জরুরি ভিত্তিতে সাময়িক কাজেরও ব্যবস্থা করতে হবে। সে জন্য বেকার জনসংখ্যাকে তালিকাবদ্ধ করে কর্মীবাহিনী (Work Brigade) গড়ে তুলে নদী খোদাই, খাল খনন, বাঁধ নির্মাণ, নদীর বাঁক কাটা, রাস্তাঘাট নির্মাণ, সেচ প্রকল্প ইত্যাদি বড় বড় কাজ করে নেয়া যেতে পারে।

অসহায় বৃদ্ধ, পঙ্গু, অসুস্থ শিশু ও বিধবা যারা খেটে খেতে পারে না তাদের পুনর্বাসনের জন্য অবশ্য আলাদা উদ্যোগ নিতে হবে। ইসলামী সরকারকে এজন্য রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যাকাতকে কায়েম করতে হবে। যাকাতের অর্থ দিয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক এতিমখানা, মহিলা ও বৃদ্ধ পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাদের ভরণপোষণের খরচও যাকাত হতে মেটাতে হবে। এসব লোকের মধ্যে যাদের আবাস রয়েছে, তাদের অবশ্য ভাতা দিলেই চলবে। যেসব অভাবী বেকারকে কাজ যোগাড় করে দেয়া যাবে না তাদেরকেও ভাতা দিতে হবে।

## যাকাত কায়েম

যাকাত কায়েম করা সরকারের জন্য অপরিহার্য। যাকাত যে সরকারি পর্যায়ে কায়েম করতে হবে তার একটি বড় দলিল কুরআনে যাকাতের ব্যয়ের খাত হিসেবে যাকাত কর্মচারীদের উল্লেখ (সূরায়ে তওবা: আয়াত ৬০, ১০৩)। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কয়েক'শ বছর যাবত যাকাত কায়েম না থাকায় নতুন করে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যাকাত ব্যবস্থা কায়েম করা নিঃসন্দেহে কিছুটা জটিল হবে। এজন্য ইজতিহাদের প্রয়োজন। একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি কায়েম করে আধুনিক আইনের সাহায্য নিয়ে বর্তমানের উপযোগী একটি যাকাত বিধি (Zakat Act) তৈরি করতে হবে।



www.pathagar.com

## শিল্পের জাতীয় নিয়ন্ত্রণ

ইসলামী সরকারকে যদি বেকারত্ব ও অভাব দূর করতে হয়, তবে তাকে ব্যাপক অর্থনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আজকের যুগে কেবল বেসরকারি উদ্যোগের উপর নির্ভর করলে সমস্যার সমাধান হবে না। এজন্য সরকারি খাতে ব্যাপক শিল্প স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়া সরকারের কর্তব্য। এজন্য প্রথমত মূল শিল্পের দিকে নজর দেয়া উচিত, কেননা মূল শিল্পগুলো গড়ে তুলতে বেসরকারি উদ্যোগের খুবই অভাব হয়ে থাকে। অথচ এসব শিল্প গড়ে তোলা জাতির জন্য অপরিহার্য। অন্য কথায়, এটা হচ্ছে সরকারের পক্ষ হতে 'ফরজে কেফায়া'র দায়িত্ব পালন। বর্তমান যুগে একটি মুসলিম দেশের মূল ও প্রধান শিল্প রাষ্ট্রের হাতেই থাকা উচিত। এ বিষয়টি নির্ভর করে সময়, পরিস্থিতি ও অভিজ্ঞতার উপরে। বেসরকারি উদ্যোগ কিছুটা দক্ষ সন্দেহ নেই, কিন্তু তারা প্রায়ই সরকারি রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে থাকে, যা হচ্ছে জনগণের পাওনা। তারা মালের চড়া মূল্য আদায় করে এবং ভেজাল ও অবৈধ ব্যবসা পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। আমাদের অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা বলতে পারি যে, জনগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বড় শিল্পপতিদের জুলুমের শিকার হয়েছে। কাজেই সব কিছু বিবেচনা করে প্রধান শিল্পগুলো সরকারের নিয়ন্ত্রণে রাখাই সংগত হবে। শরীয়তের দৃষ্টিতেও এটি নিঃসন্দেহে সম্পূর্ণ বৈধ। আমরা জানি যে ইসলামী রাষ্ট্র পানি, খনি, বন-জঙ্গল, চারণভূমি ইত্যাদির উপর ব্যক্তি মালিকানা স্বীকার করে না।

এসব সম্পদ ব্যক্তি মালিকানায় দেয়া হলে সর্বসাধারণের অধিকার নষ্ট হতো এবং জনগণ কষ্টের সম্মুখীন হতো। শরীয়তের সিদ্ধান্ত হতে আমরা এ নীতি পাচ্ছি যে, যেসব সম্পদ ব্যক্তি মালিকানায় অর্পিত হলে জনগণের স্বার্থ নষ্ট হয় অথবা জনগণ অসুবিধার সম্মুখীন হয় তা ব্যক্তি মালিকানায় থাকা কিছুতেই সঠিক নীতি হতে পারে না। এজন্য অতীত ইসলামী অর্থনীতিবিদদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, যেসব সম্পদ সাধারণভাবে সকল মুসলমানের জন্য অত্যাবশ্যকীয় তা কারো ব্যক্তিগত মালিকানায় দান করার অধিকার রাষ্ট্রপতির নেই।[১৯]

কাজেই যেসব সম্পদ কারো ব্যক্তিগত মালিকানায় ছেড়ে দিলে সর্বসাধারণের কষ্ট বা অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তা সবই রাষ্ট্রীয় অথবা সার্বজনীন মালিকানায় রাখতে হবে। বেসরকারি মালিকানায় যেসব ব্যবসা ও শিল্প সুফল না দিয়ে বরং জাতির সমূহ ক্ষতি করেছে বলে আমাদের অভিজ্ঞতা আছে, সেসব শিল্প ও ব্যবসা জাতীয় মালিকানায় নিয়ে নেয়াই সঠিক ও জনকল্যাণকর পদক্ষেপ হবে। অবশ্য কোন কোন শিল্প ও ব্যবসাকে জাতীয় মালিকানায় নেয়া জাতীয় কল্যাণ ও জুলুম বন্ধ করার জন্য জরুরি তা নির্ধারণ করার দায়িত্ব ইসলামী সরকারের পার্লামেন্টের। তবে ক্ষতিপূরণ না দিয়ে কোনো বৈধ মালিকানাই সরকার হরণ করতে পারবে না। জাতীয় মালিকানার ধরনও নানারকম হতে পারে। সরকার একাও মালিক হতে পারে অথবা জনগণের হাতে মালিকানার একটি অংশ শেয়ারের আকারে ছেড়ে দেয়া যেতে



www.pathagar.com

পারে। এ ব্যাপারে কোনো বাঁধাধরা নিয়ম করা যেতে পারে না। এ বিষয়টি নির্ভর করবে প্রয়োজন, পরিবেশ, সময়, পরিস্থিতি ও অভিজ্ঞতার উপরে।

এ যুগে ইসলামী সরকারের প্রধান দায়িত্ব হবে সুদবিহীন অর্থনীতির পুনঃপ্রবর্তন। সুদকে নির্মূল করা ইসলামের একটি প্রধান লক্ষ্য। বিশাল ইসলামী খেলাফত হতে সুদকে নির্মূল করা হয়েছিল এবং সুদ ছাড়াই অষ্টম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সে যুগের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাষ্ট্র আব্বাসী খেলাফতের অর্থনীতি পরিচালিত হতো। আজও তা সম্ভব।

ইসলামী সরকারের প্রধান দায়িত্বসমূহ এ প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে। এ সরকারের অন্য অনেক অর্থনৈতিক ও অন্যান্য দায়িত্ব রয়েছে। ইসলামী আইন ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে সরকারকে সেসব দায়িত্ব পালন করতে হবে।

## তথ্যসূত্র


১. ইমাম ইবনে কাইয়েম, ইলম আল মুয়াক্কিন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩০৯-৩১১।

২. ইমাম শাতিবি, আল মুয়াফিকাত ফি উসুলুস শরিয়াহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৬৮।

৩. ইমাম ইবনে তাইমিয়া, আল হিসবা ফিল ইসলাম, পৃষ্ঠা: ১৭।

৪. আবু ওবায়েদ, কিতাবুল আমুয়াল, পৃষ্ঠা: ৬৯।

৫. সাইয়েদ কুতুব, ইসলাম ও সামাজিক সুবিচার, বাংলা অনুবাদ ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা: ৫১৬-৫১৯।

৬. ইমাম আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, পৃষ্ঠা: ১৩৮।

৭. আল মাওয়ার্দী, আল আহকামুস সুলতানিয়া, পৃষ্ঠা: ২০৮।

৮. সিহাহ সিত্তাহ।

৯. সাইয়েদ কুতুব, ইসলাম ও সামাজিক সুবিচার, পৃষ্ঠা: ৩০৯।

১০. সাইয়েদ মওদূদী, ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ, পৃষ্ঠা: ১৮২।

১১. আবু দাউদ, তিরমিজী।

১২. ইবনে নখীম হানফী, আল হিসবা ওয়া নাজায়ের, পৃষ্ঠা: ১২১-১২৯।

১৩. ইমাম ইবনে তাইমিয়া, আল হিসবা ফিল ইসলাম, পৃষ্ঠা: ৩৭।

১৪. হিদায়া।

১৫. ইমাম ইবনে তাইমিয়া, আল হিসবা ফিল ইসলাম, পৃষ্ঠা: ২৭-২৯।

১৬. আবু দাউদ, তিরমিজী।

১৭. শাহ ওয়ালিউল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা।

১৮. ইবনে কুদামা, আল মুগনী।

১৯. মুহাম্মদ আবদুর রহীম, ইসলামের অর্থনীতি, ১ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা: ৪৭।




www.pathagar.com

# ওশরের বিধান

ফসলের যাকাত বা ওশর আদায় মুসলমানদের জন্য কেবল শরীয়তের বিধানের দিক দিয়েই অপরিহার্য বা ফরজ নয়, বাংলাদেশের মতো কৃষিপ্রধান দেশে ওশর আদায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এদেশের বিরাট জনগোষ্ঠী গ্রামে অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থায় বাস করে। এদেশের দারিদ্র্য দূর করা, দরিদ্রদের পুনর্বাসন করা ও তাদের ভবিষ্যতের জন্য স্বাবলম্বী করা ওশর আদায় করার উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। কিন্তু অত্যন্ত বেদনার কথা যে বাংলাদেশের জনগণ ওশর সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত নয়। তাই তারা ওশর আদায় করে না। এভাবে শরীয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ হুকুম এদেশে পালিত হচ্ছে না এবং তার ফায়দা থেকে এদেশের জনগণ বঞ্চিত হচ্ছে।

## ওশর ফরজ হওয়ার দলিল: কুরআন ও হাদিস থেকে

ওশর ফরজ হওয়ার দলিল নিম্নে উল্লেখ করা যাচ্ছে। আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন:

> হে ঈমানদারগণ! তোমরা পবিত্র উপার্জন থেকে এবং আমরা তোমাদের জন্য জমি থেকে যা কিছু বের করি, তা থেকে ব্যয় করো। আর ব্যয় করতে গিয়ে খারাপ জিনিস দিতে ইচ্ছা করো না। কেননা তোমরা নিজেরাও তো উপেক্ষা করা ছাড়া গ্রহণ করতে প্রস্তুত হও না। (সূরা বাকারা: আয়াত ২৬১)

ব্যয় করার এই নির্দেশ ফরজ প্রমাণ করে। জাসসাস বলেছেন, ব্যয় করো অর্থ যাকাত দাও। অন্য বিশেষজ্ঞরাও এ ব্যাপারে একমত। আল্লাহপাক আরো ইরশাদ করেছেন:

> তিনি আল্লাহ যিনি নানা প্রকারের গুল্মলতা ও গাছ-গাছালি সম্বলিত খেজুর বাগান সৃষ্টি করেছেন, ক্ষেত-খামার বানিয়েছেন, যা থেকে নানা প্রকারের খাদ্য উৎপাদন করা হয়, জয়তুন ও আনারের গাছ তৈরি করেছেন যার ফল দেখতে সাদৃশ্যসম্পন্ন ও স্বাদে বিভিন্ন হয়ে থাকে, তোমরা সকলে খাও এর উৎপাদন - যখন তা ধরবে এবং আল্লাহর হক আদায় কর যখন তার ফসল কেটে তুলবে। (সূরা আনআম: আয়াত ১৪১)



www.pathagar.com

ইমাম আবু হানিফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ আল শায়াবানী, ইমাম মালিক, সাইদ ইবনুল মুসাইয়েব, তাউস, কাতাদাহ ও দাহহাকসহ অধিকাংশ মনীষীদের মতে এ আয়াতে আল্লাহর হক বলতে ফসলের যাকাত ওশরকে বুঝানো হয়েছে। এ আয়াতেও আদায় করো দ্বারা ওশর ফরজ প্রমাণিত হয়।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

> যেসব জমিকে বৃষ্টির পানি ও নদীর পানি সিক্ত করে তা থেকে ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ (ওশর) এবং যেসব জমি সেচের মাধ্যমে সিক্ত হয় তা থেকে ফসলের বিশ ভাগের এক ভাগ (অর্ধ-ওশর) দিতে হবে।[১]

হযরত জাবির (রা.) থেকেও আহমদ ও মুসলিম একই ধরনের হাদিস নবী (সা.)-এর কথা হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

## কি কি ফসলের ওশর হয়

সূরাতুল বাকারা এবং সুরাতুল আনআম-এর উপরোল্লিখিত আয়াত ও রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণিত সহীহ হাদিসের সাধারণ তাৎপর্যের আলোকে জমির সব ধরনের উৎপাদনের উপর ওশর ফরজ। এসব আয়াতে ও হাদিসে বিভিন্ন ধরনের ফসলের মধ্যে পার্থক্য করা হয়নি। এ জন্য ইমাম আবু হানিফা, দাউদ জাহেরী, ইবরাহীম নখয়ী, ওমর ইবনে আবদুল আযীয, মুজাহিদ ও হাম্মাদ ইবনে আবু সালমান মত প্রকাশ করেছেন যে জমির সব ধরনের উৎপাদনেই ওশর হবে।

ইমাম মালিক শাফেয়ীর মত হচ্ছে যা-ই খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত ও সঞ্চয় করে রাখা যায় তাতেই ওশর হবে। এ মতে যা খাদ্য নয় এবং যেসব খাদ্য শুকিয়ে জমিয়ে রাখা যায় না তাতে ওশর হবে না।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের প্রচলিত মত হচ্ছে যেসব ফসল মাপা যায়, সংরক্ষণ করা যায় এবং শুকিয়ে রাখা যায় তাতে ওশর হবে।

এ যুগের বিখ্যাত মুজতাহিদ আলেম ইউসুফ আল কারযাভী সব মতামত ও তাদের যুক্তি আলোচনার পর কুরআনের আয়াত ও সহীহ হাদিসের সাধারণ তাৎপর্যের ভিত্তিতে সব ধরনের ফসলেই ওশর হবে বলে মত দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন:

> কেবলমাত্র খাদ্য হিসেবে গ্রহণীয় জিনিসের উপরে যাকাত ধার্য সংক্রান্ত হাদিসসমূহের কোনোটিই ক্রটিমুক্ত নয়। হয় তার সনদ বিভিন্ন, ধারাবাহিকতা ও অবিচ্ছিন্নতা নাই, না হয় কোনো কোনো বর্ণনাকারী জইফ। কিংবা যে হাদিস রাসূলে করীমের (সা.) কথা হিসেবে বর্ণিত আসলে তা কোনো সাহাবির উক্তি।
>
> নবী করীমের (সা.) কথা হিসেবে বর্ণিত 'শাকশবজিতে যাকাত নেই' সনদের দিক দিয়ে খুব দুর্বল হাদিস। তাই তা দলিল হিসেবে



www.pathagar.com

গ্রহণযোগ্য নয়। কুরআন ও হাদিসের সাধারণ ও ব্যাপক ঘোষণাবলীকে সীমিত ও সংকীর্ণ করা তো দূরের কথা। ইমাম তিরমিযী এই হাদিস উদ্ধৃত করে লিখেছেন, 'এই হাদিসের সনদ সহীহ নয়।' হাদিসটিকে সহীহ মেনে নিলে হানাফীদের মতে তার ব্যাখ্যা হচ্ছে তাতে এমন যাকাত ধার্য নয় যা আদায়কারী কর্মচারীদের মাধ্যমে আদায় করতে হবে।[২]

কাজেই সব ধরনের ফসলে ওশর হবে এ মতই কুরআন, সুন্নাত ও অধিকাংশ আলেমের মত বিবেচনায় যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য।

## নিসাবের পরিমাণ কি

কি পরিমাণ ফসলে ওশর ফরজ হবে সে সম্বন্ধে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবু হানিফার মত হচ্ছে, পরিমাণ কম হোক কি বেশি হোক ফসলের সব পরিমাণের উপরই ওশর দিতে হবে। ইবরাহীম নখয়ী, ইয়াহইয়া ইবনে আদম ও ওমর ইবনে আবদুল আযীয থেকে একই মত বর্ণিত হয়েছে। তাদের মতের ভিত্তি হচ্ছে নবী (সা.) বর্ণিত একটি হাদিস, "আকাশের পানিতে যাই সিক্ত হবে তাতেই ওশর হবে।"

কিন্তু নিম্নে উল্লিখিত হাদিসের ভিত্তিতে ইমাম মালিক, শাফেয়ী, আহমদ ইবনে হাম্বল, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদসহ অধিকাংশ আলেম মত প্রকাশ করেছেন যে পাঁচ ওয়াসাকের পরিমাণে কোনো যাকাত হবে না।

পাঁচ ওয়াসাক খেজুরের কম পরিমাণে যাকাত নেই।[৩]

নাসায়ীতে আবু সাইদ খুদরী থেকে বর্ণিত হয়েছে, "কোনো ফসলে ও খেজুরে তার পরিমাণ পাঁচ ওয়াসাক না হওয়া পর্যন্ত যাকাত নেই।" এ ব্যাপারে অধিকাংশের মতই যুক্তিযুক্ত। প্রকৃতপক্ষে এসব হাদিসের মধ্যে কোনো বৈপরিত্য নেই। কেননা আকাশের পানি যা সিক্ত করে তাতেই ওশর কথাটি দ্বারা কোন জমির উপর ওশর ধার্য হবে এবং কোনটিতে অর্ধ-ওশর ধার্য হবে সে কথার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। নিসাবের পরিমাণ কি হবে সে সম্বন্ধে এ হাদিসে ইঙ্গিত করা হয়নি। সে দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে অন্য হাদিসসমূহে।

পাঁচ ওয়াসাক বলতে কত পরিমাণ বুঝাবে এ সম্বন্ধে কিছুটা মতভেদ আছে। ৬০ ছা-এ এক ওয়াসাক হয়ে থাকে। মতভেদের কারণ হচ্ছে ছা-র পরিমাণ। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার পর ইউসুফ আল কারযাভী মত দিয়েছেন যে পাঁচ ওয়াসাক সমান ৬৫৩ কিলোগ্রাম অর্থাৎ ১৮ মনের মতো।

পাকিস্তানে যাকাত ও ওশর আইন প্রণয়নের সময় এ পর্যায়ে ব্যাপক আলোচনা হয়। সর্বশেষে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে পাঁচ ওয়াসাক হবে ৯৪৮ কিলোগ্রাম বা সাড়ে ছাব্বিশ মন। পাকিস্তানে যাকাত ও ওশর আইন প্রণয়নে বিশ্বের অনেক খ্যাতনামা আলেমের মতামত নেয়া হয়। কাজেই এ



www.pathagar.com

মতকে এ যুগের আলেমদের এক ব্যাপক অংশের মত বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। আমাদের দেশেও এ মতের উপর আমল করা উচিত হবে।

## ওশর ও খারাজ

জমহুর ফিকাহবিদগণ মুসলমানের মালিকানাধীন সব জমির উপর ওশর ফরজ বলেছেন। কেননা কুরআন ও সুন্নাতের স্পষ্ট আয়াত ও দলিলের ভিত্তিতে কোনো মুসলমানই ওশর আদায় হতে অব্যাহতি পেতে পারে না। তারা এও মনে করেছেন যে, সরকার কর্তৃক যদি কোনো ভূমিকর বা খারাজ ধার্য করা হয় তা দিলেও ওশর দিতে প্রত্যেক মুসলমান বাধ্য। তারা ওশর ও খারাজ একত্রে ধার্য হওয়া অবৈধ মনে করেন না। কেননা খারাজ ও ওশর দুই ভিন্ন প্রকৃতির হক। খারাজ হওয়ার কারণ হচ্ছে জমি ব্যবহার করার অধিকার। অন্যদিকে ওশর আদায়ের কারণ হচ্ছে জমির ফসল লাভ। জমহুর ফিকাহবিদগণ ইবনে মসউদের মাধ্যমে নবী (সা.) হইতে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদিস গ্রহণ করেননি। "কোনো মুসলিমের জমির উপর ওশর ও খারাজ একসঙ্গে ধার্য করা যেতে পারে না।" ইমাম নববী বলেছেন এ হাদিসটি বাতিল। এর দুর্বল হওয়া সর্ব সমর্থিত। বায়হাকী বলেছেন যে এর বর্ণনাকারী ইয়াহইয়া ইবনে আম্বাসাতা যে দুর্বল বর্ণনাকারী তা সর্ব সমর্থিত। ইমাম সুয়ুতী ইবনে আব্বাস ও ইবনে আদী সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে ইয়াহইয়া ছাড়া আর কেউ তা বর্ণনা করেননি, সে দাজ্জাল।[৪]

এ পর্যায়ে ইমাম আবু হানীফা মত প্রকাশ করেছেন যে, জমি যদি ওশরী হয় তবে ওশর দিতে হবে এবং যদি খারাজী হয় তবে খারাজ দিতে হবে। জমি কিভাবে ওশরী হয় এবং কিভাবে খারাজী হয় এ প্রসঙ্গে আবু ওবায়েদ কিতাবুল আমুয়ালে যা লিখেছেন তার সারাংশ হচ্ছে:

ক. যে জমির মালিকই ইসলাম গ্রহণ করবে ও তারপরও জমির মালিক থেকে যাবে সেই জমিই ওশরী জমি হবে।

খ. কোনো দেশ বিজয়ের পর সে দেশের জমি যদি মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করা হয় সে জমি ওশরী হবে।

মৃত জমি ও পোড়ো জমি যদি মুসলমানরা আবাদ করে তা ওশরী হবে।

.. অন্যদিকে বিজয় বা সন্ধির পর অন্য জাতির জমি যদি তাদের নিকটই করের বিনিময়ে রাখা হয় তবে তা হবে খারাজী জমি।[৫]

উপরে বর্ণিত নীতি মোতাবেক বাংলাদেশের প্রায় জমিই যে ওশরী তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এ দেশের অধিকাংশ অধিবাসী অমুসলমান ছিল এবং তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে। তারা বিপুল পরিমাণ অনাবাদী জমি আবাদ করেছে। মুসলিম সরকার হতেও তারা অনেক জমি পেয়েছে। এ সব জমিই ওশরী। অনুমানের ভিত্তিতে মুসলমানের জমিকে খারাজী গণ্য করা যায় না। তেমনিভাবে মুসলিম বিজয়ের সময় প্রত্যেকটি জমির কি অবস্থা ছিল তা বিবেচনা করে



www.pathagar.com

কোনো জমিকে খারাজী গণ্য করা আজ সম্ভব নয় এবং শরীয়তের যথেষ্ট কোনো দলিলের ভিত্তিতে এমন কিছু করার মতো প্রয়োজনীয়তাও আমাদের নেই।

এ যুগের বড় হানাফী আলেম ও তাফসিরকার মুফতী মুহাম্মদ শফী এ সম্পর্কে বলেন:

> (সরকার) জমির যে সরকারি খাজনা আদায় করে তা ওশর বা খারাজের শরয়ী নীতির অধীনে আদায় করে না এবং ওশর ও খারাজ নামেও আদায় করে না। আবার তার খাতে খরচ করার কোনো ঘোষণা সরকারের পক্ষ থেকে করা হয়নি। এজন্য মুসলিম রাষ্ট্রের আরোপিত ইনকাম ট্যাক্স বা সরকারি খাজনা দিলে যাকাত ও ওশরের ফরজ দায়িত্ব হতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না। এ দায়িত্ব বহাল থাকে এবং সম্পদের মালিকদের নিজ নিজ যাকাত ও ওশর বের করে তা তার খাতে ব্যয় করা অবশ্য কর্তব্য।[৬]

কাজেই বাংলাদেশের মুসলমানদের জমিকে ওশরী গণ্য করতে হবে এবং ওশর দিতে হবে। অবশ্য জনগণের অধিকার রক্ষার প্রয়োজনে এবং ওশর আদায়ের পরে প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য যদি জমির খাজনা তুলে দেয়ার প্রয়োজন বোধ হয় তবে তা করা খুবই সংগত হবে। যেখানে বাংলাদেশে মুসলমানদের জমির খাজনা ২০/২৫ কোটি টাকার মতো হবে সেখানে মুসলমানদের জমি হতে ওশর আদায় হতে পারে অন্তত ২৫০ কোটি টাকা। কাজেই সামান্য ভূমিকরের জন্য আমরা ওশর আদায় পরিত্যাগ কোনো অবস্থাতেই করতে পারি না। কেননা তাতে গরীবের অধিকার লঙ্ঘিত হবে।

## ওশরের পরিমাণ

একটি স্বাভাবিক বৎসরে বাংলাদেশে অন্তত তিন কোটি টন খাদ্যশস্য (চাল, গম ইত্যাদি) উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশের জনগণের এক বড় অংশ ভূমিহীন কৃষক। তাদের হাতে জমি নেই। জমির অর্ধেক পরিমাণ রয়েছে সচ্ছল বা বড় কৃষকদের হাতে। কাজেই বাংলাদেশের উৎপাদিত খাদ্যশস্যের অন্তত অর্ধেক অর্থাৎ ১ কোটি টন উৎপাদন করে থাকে সচ্ছল কৃষকগণ এবং তাদের প্রত্যেকের উৎপাদনের পরিমাণ নিসাবের অতিরিক্ত হয়ে থাকে যা যাকাতযোগ্য। যদি এই ১ কোটি টনের উপর অর্ধ-ওশর (৫%) আদায় করা হয় তবে ওশরের পরিমাণ হবে ৫ লক্ষ টন যার মূল্য হবে কমপক্ষে ২৫০ কোটি টাকা। অন্যদিকে পাট, চা, রবিশস্য, তামাক ও অন্যান্য ফসল (যার যাকাতযোগ্য পরিমাণ হবে অন্তত ৫,০০০ কোটি টাকা) হতে অর্ধ-ওশর (৫%) আদায় করা হলে ২৫০ কোটি টাকার ওশর আদায় হবে। এ হিসাবের জন্য আমরা ধরে নিয়েছি যে সব জমিতেই সেচ দেয়া হচ্ছে এবং তাই ওশর (১০%) আদায় না করে অর্ধ-ওশর আদায় করা হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে অনেক জমির ফসল হতে ওশর (১০%) আদায়যোগ্য হবে এবং সেক্ষেত্রে মোট ওশরের পরিমাণ আরো অনেক বৃদ্ধি পাবে।



www.pathagar.com

## ওশর সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়

ওশর আদায়ের পূর্বে জমির ফসল উৎপাদনের খরচ বাদ যাবে কি? এ পর্যায়ে আমরা জানি যে সেচের খরচকে আল্লাহর রাসূল (সা.) বিশেষভাবে বিবেচনা করেছেন এবং যে জমিতে সেচ দিতে হয় তার ফসলের ওশর ১০% না করে ৫% নির্ধারণ করেছেন। অন্যান্য খরচ বাদ দেয়ার ব্যাপারে কোনো সহীহ্ সুন্নাত আমাদের কাছে নেই। ইবনে হাযাম, ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী ও আবু হানীফা মত প্রকাশ করেছেন যে, আল্লাহ্ যে হক ধার্য করেছেন তা কুরআন বা প্রমাণিত সুন্নাত ছাড়া প্রত্যাহার করা জায়েজ নয়। হযরত ইবনে আব্বাসের মত হলো যা ফসলের জন্য ব্যয় করা হয়েছে তা বাদ দিয়ে অবশিষ্টের উপর ওশর দিতে হবে। হযরত ইবনে ওমর মনে করেন পরিবার ও কৃষিকাজ করার জন্য যে ঋণ বা খরচ করা হলো তা সবই বাদ যাবে। মকহুল, সুফিয়ান সাওরী, আবু উবাইদ এ মতই পোষণ করেন। সুফিয়ান সাওরী ও ইমাম আহমদ খারাজ বা ভূমিকর বাদ দেয়ার পর ওশর আদায় করার কথা বলেছেন।[৭]

পাকিস্তানে যাকাত ও ওশর আইন প্রণয়নের সময় আলেমদের অধিকাংশের পরামর্শে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে ফসল উৎপাদনকারী খরচ বাবদ সর্বোচ্চ এক-চতুর্থাংশ বাদ দিতে পারবে। অবশিষ্টের উপর ওশর (১০%) দিতে হবে। অবশ্য সেচের ক্ষেত্রে অর্ধ-ওশর (৫%) দিতে হবে। যদি কোনো জমিনে বৎসরের এক সময় সেচ এবং অন্য সময় বৃষ্টির পানি দ্বারা ফসল ফলানো হয় সে ক্ষেত্রে যে ফসল সেচ দ্বারা ফলানো হয় তার উপর অর্ধ-ওশর (৫%) এবং যে ফসল বৃষ্টির পানিতে ফলানো হয় তার উপর ওশর (১০%) দিতে হবে। অবশ্য যদি কোনো ফসল ফলানোর সময়ের এক অংশ বৃষ্টির পানি এবং এবং অন্য অংশ সেচ দ্বারা সিক্ত হয় তাহলে বেশিরভাগ সময় হিসাবে ধরে ওশর বা অর্ধ-ওশর দিতে হবে।

যদি কোনো জমিন বর্গা দেয়া হয় তাহলে কি হবে? সে ক্ষেত্রে জমির মালিক ও বর্গাদারকে তার নিজ নিজ অংশের ওশর বা অর্ধ-ওশর দিতে হবে। যদি দু'জনের একজনের ফসল নিসাব পরিমাণ হয় এবং অন্য জনের নিসাব পরিমাণ না হয় তাহলে যার নিসাব পরিমাণ হবে তাকে দিতে হবে এবং যার হবে না কে কিছুই দিতে হবে না। এ মতই যুক্তিযুক্ত।

ওশর পণ্যেও আদায় করা যায় এবং নগদেও আদায় করা যায়। আমাদের দেশে ধান ও গমের ওশর পণ্যে এবং অন্যান্য ফসলের ওশর নগদে অর্থাৎ ওশর হিসাবে আদায়যোগ্য পণ্যের মূল্যে আদায় করা যায়। ধান ও গমের ওশর পণ্যে আদায় করা হলে দেশের গ্রামাঞ্চলে এসব পণ্যের মজুদ গড়ে তোলা সম্ভব হবে যার মাধ্যমে দরিদ্র জনগণকে সহায়তা করা অনেক সহজ হবে। ওশর আদায় করার জন্য প্রত্যেক গ্রামে স্থানীয় জনগণ মসজিদভিত্তিক কমিটি ও অন্যান্য ব্যবস্থা করতে পারেন। মসজিদের পাশেই ওশরের ফসল রাখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।



www.pathagar.com

ওশর আদায় করার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা আমাদের সমাজকে দারিদ্র্যমুক্ত করার জন্য অপরিহার্য। এ ব্যাপারে আলেম, ইসলামী চিন্তাবিদ, সমাজবিদ ও অন্যান্য সবার উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। এজন্য ওশর সংক্রান্ত বিস্তারিত আহকাম জনগণকে জানানো অত্যন্ত জরুরি। কেননা জনগণ এ সম্পর্কে অবহিত নয়।

## তথ্যসূত্র


১. বুখারী, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাযাহ।

২. ইউসুফ আল কারযাভী, যাকাতের বিধান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৩১-৪৩৪, প্রকাশক – ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

৩. বুখারী ও মুসলিম।

৪. ইউসুফ আল কারযাভী, ঐ, পৃষ্ঠা: ৪৯০।

৫. ইউসুফ আল কারযাভী, ঐ, পৃষ্ঠা: ৪৭৭-৪৭৯।

৬. মুফতী মুহাম্মদ শফী, ইসলাম কা নেযামে আরাদী, পৃষ্ঠা: ১৮৩।

৭. ইউসুফ আল কারযাভী, ঐ, পৃষ্ঠা: ৪৬৪-৪৬৭।




www.pathagar.com

# ইসলামের দৃষ্টিতে জাতীয়করণ ঃ তত্ত্ব ও প্রয়োগ

বিগত ছয়-সাত দশক যাবত মুসলিম বিশ্বে জাতীয়করণ (Nationalization) একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। গত শতাব্দীর চল্লিশ দশকের শেষের দিক থেকে মুসলিম বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শক্তির যাঁতাকল হতে স্বাধীনতা লাভ করতে শুরু করে। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত এসব মুসলিম রাষ্ট্রের সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোকে অর্থনৈতিক বুনিয়াদ মজবুত ও দারিদ্র্য দূরীকরণের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের দিকে মনোযোগ দিতে হয়। তাই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অর্থনীতির পুনর্গঠনে সরকারের ভূমিকা মুখ্য হয়ে ওঠে। দূর ভবিষ্যতের জন্য এসব সমস্যা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না।

এ প্রেক্ষিতে জাতীয়করণের বিষয়টি একটি মূল সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। মুসলিম দেশসমূহের সরকার ও রাজনৈতিক দলসমূহ এ ব্যাপারে ইসলামের মতাদর্শকে উপেক্ষা করতে পারেনি। ইসলাম প্রকৃতিগতভাবেই একটি ব্যাপক বুদ্ধিভিত্তিক আদর্শ জীবন ব্যবস্থা। নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে হোক অথবা কর্ম পদ্ধতির ক্ষেত্রে সর্বত্রই ইসলামের কিছু বক্তব্য রয়েছে। ফলে মুসলিম দেশসমূহে এ প্রশ্নটি উথাপিত হয়েছে যে ভূমি, উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণসমূহ অথবা কোনো সম্পদের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করতে পারে কিনা এবং যদি তা হয়, তবে তা কি শর্তে ও কি উদ্দেশ্যে এবং ইসলামে মালিকানার ধারণাই বা কি?

আলোচ্য প্রবন্ধে মুসলিম অর্থনীতিবিদগণ ইসলামে মালিকানা বলতে কি বুঝেছেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে মালিকানার ধারণা, এ ব্যাপারে বর্তমান মুসলিম দেশসমূহের মনোভাব কি এবং ভবিষ্যতে মুসলিম দেশসমূহের জন্য কিছু পরামর্শ উপস্থাপন করার প্রয়াস পাব।

ইসলামী অর্থনীতিবিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, প্রকৃত মালিকানা একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহর এবং মানুষ আমানতদার হিসেবেই সম্পদের অধিকারী হয়। তাই সে ইসলামী শরিয়তের বিধান ও উপরে বর্ণিত অর্থনৈতিক দর্শন মোতাবেক আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য। সম্পদ আহরণ, এর ব্যবহার ও হস্তান্তর খোদা নিরূপিত সীমারেখার মধ্যে এবং আল্লাহর নির্ধারিত নিয়মেই হতে হবে। ব্যক্তিমালিকানার অধিকারের সাথে সাথে অন্যদের প্রতি কিছু দায়-



www.pathagar.com

দায়িত্বও নির্দিষ্ট করা আছে। ব্যক্তিগত সম্পদের পর সরকারি মালিকানা ইসলামের একটি কেন্দ্রিয় ধারণা। এ দু'টোর সীমারেখা দৃঢ়ভাবে নির্ধারণ করে দেয়া হয়নি বরং অবস্থা ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে কতগুলো নীতির আলোকে তা নির্ধারিত হবে।[১]

ইসলামের প্রথম যুগের অর্থনীতিবিদগণ ব্যক্তিগত সম্পদ ও মালিকানার উপর জোর দিয়েছেন। তাদের এ দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি হলো প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের জীবনধারা - যারা ব্যক্তিগত ভূমি ও ব্যবসার অধিকারী ছিলেন তাদের অধিকাংশই ছিলেন কৃষিজীবী বা ব্যবসায়ী। ব্যবসা ও কৃষি সম্পর্কে এবং এর বৈধ ও অবৈধ দিক সম্পর্কে হাদিস শাস্ত্রে বিস্তারিত অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে। কুরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে রচিত ফিকাহ শাস্ত্রেও এ বিষয়ে প্রচুর আলোচনা রয়েছে। ব্যক্তিগত ব্যবসা, কৃষি ও শিল্পের বৈধতা সম্পর্কে প্রথম যুগের পণ্ডিতগণের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। আল-কুরআন ব্যবসার অনুমতি দিয়েছে (সূরা বাকারা: আয়াত ২৭৬), সম্পদ উপার্জন ও মানুষের কাজে লাগানোর জন্য উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দান করেছে (সূরা জুমা: আয়াত ১০), উত্তরাধিকারের মাধ্যমে সম্পদ হস্তান্তরের অনুমতি দিয়েছে (সূরা নিসা: আয়াত ৭,১১,১২,১৭৬) যা ব্যক্তিগত সম্পদ ও মালিকানার স্বীকৃতির প্রমাণ। বর্তমানকালে এ মতের প্রবক্তা হচ্ছেন মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী (মাশাইয়াত-এ ইসলাম) ও মিশরের সাইয়্যেদ কুতুব (ইসলামে সামাজিক সুবিচার)। তবে তারা রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করেননি, কিন্তু এটাকে ন্যূনতম পর্যায়ে রাখতে চান।

তবে কিছু সংখ্যক বিজ্ঞ ইসলামী চিন্তাবিদ ব্যক্তিগত মালিকানার কেন্দ্রীয় অবস্থানকে অস্বীকার করেছেন। এ প্রসঙ্গে শহীদ আবদুল কাদের আওদাহ-এর দীর্ঘ উদ্ধৃতি উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, শাসক ও পরামর্শদাতাদের মাধ্যমে সম্পদ ব্যবহারের উপায় উপকরণ সংগঠিত ও সংঘবদ্ধ করার অধিকার সমাজের রয়েছে। সমগ্র সম্পদের মালিক আল্লাহ। তিনি সমাজের কল্যাণের জন্যই এসব সৃষ্টি করেছেন। ইসলামের বিধান হচ্ছে যে, আল্লাহর মালিকানাধীন সব সম্পদই সমাজের কল্যাণের জন্য এবং সম্পদের উপর সমাজেরই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, ব্যক্তির নয়। সমাজ প্রতিনিধিত্বকারী শাসক শ্রেণির মাধ্যমে জনস্বার্থের কথা বিবেচনা করে কোনো সম্পদের ব্যক্তি মালিকানা রহিত করতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হলো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে। যদিও ইসলাম সীমাহীন মালিকানার অনুমতি দেয় তথাপি সমাজ হক্কুল্লাহ (আল্লাহর অধিকার/জনকল্যাণ) নিশ্চিত করা ও এর সুষম ব্যবহারের লক্ষ্যে ব্যক্তিমালিকানার সীমা নির্ধারণ করে দিতে পারে। সমাজ তার প্রতিনিধিদের মাধ্যমেই এটা করতে পারে। শহরাঞ্চলের জমিজমা, বাড়ি-ঘর ও কৃষি ক্ষেত্রের সীমা নির্ধারণেও নীতি প্রয়োগ করা যেতে পারে।[২]



www.pathagar.com

মুসলিম পণ্ডিতবর্গ 'জাতীয়করণ' বিষয়টি সম্পর্কে ক্রমান্বয়ে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করেছেন বলে আমার মনে হয়। এর দু'টি কারণ রয়েছে। প্রথমত ইসলাম তত্ত্বগতভাবে এ বিষয়টির ব্যাখ্যার ব্যাপারে নমনীয়তা অবলম্বন করেছে। কেননা ইসলামে একদিকে পেশা ও উপার্জনের অধিকার (সূরা বাকারা: আয়াত ২৭৫), ব্যক্তিগত সম্পদের উপর অবৈধ হস্তক্ষেপের নিষিদ্ধতাকে (সূরা নিসা: আয়াত ২৯; বিদায় হজ্জের ভাষণ) গুরুত্ব দিয়েছে, অপরদিকে সামাজিক ন্যায়বিচার, অন্যের অধিকার (সূরা বাকারা: আয়াত ১৭৭ ও সূরা তওবা: আয়াত ১০৩) এবং সম্পদের সর্বাধিক বন্টনের (সূরা হাশর: আয়াত ৭) উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে।

ইসলামী পণ্ডিতগণের মধ্যমপন্থা অবলম্বনের দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে বিশ্বে বিগত দিনের জাতীয়করণের অভিজ্ঞতা। জাতীয়করণ অন্যায় ও বেআইনীভাবে অর্জিত ভূমির উপর সামন্ততান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ভেঙ্গে দিতে সাহায্য করেছে; অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শ্রমিকের অধিকার সংরক্ষণ, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং বিভিন্ন ক্ষেত্র ও সেক্টরে শোষণের অবসানে সহায়তা করেছে। অপরদিকে জাতীয়করণ অনেক ক্ষেত্রেই অযোগ্যতা, দুর্নীতি ও উৎপাদনে ঘাটতি বৃদ্ধি করেছে এবং অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা হরণ করেছে। ফলে মুসলিম অর্থনীতিবিদগণ সতর্কতার সাথে অভিমত ব্যক্ত করেছেন এবং জাতীয়করণ করার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন কেবল যেখানে সামাজিক কল্যাণ ও বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থে জাতীয়করণ প্রয়োজন।

অতীত ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমরা ইসলামের প্রাথমিক যুগে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় - এ তিন প্রকারের মালিকানা দেখতে পাই। প্রাকৃতিক সম্পদ যথা - বন, খনি, পানি সম্পদ এবং বিশাল ভূখণ্ড রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ছিল। চারণভূমি, সমাধিস্থান ইত্যাদি স্থানীয় সমাজের প্রয়োজনীয় সম্পদের মালিক ছিল সমাজ, ব্যক্তি নয়। তবে অধিকাংশ কৃষিভূমি, ঘর-বাড়ি, কারখানা, পশুসম্পদ ইত্যাদি ব্যক্তি মালিকানায়ই ছিল। হাদিসে ব্যক্তিগত মালিকানার বিস্তারিত বিবরণ আছে। প্রতিটি হাদিস ও ফিকাহর গ্রন্থে ব্যবসা, কৃষি ইত্যাদি সম্পর্কে পৃথক পৃথক অধ্যায় রয়েছে যা স্পষ্টতই প্রমাণ করে যে, ব্যক্তি মালিকানাই ইসলামের প্রাথমিক যুগে মালিকানার সাধারণ রূপ ছিল। ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাসে তত্ত্ব ভিত্তিক মালিকানা নির্ধারণে এ বিষয়টির বাস্তবতা অস্বীকার করা যায় না যেমনটি কোনো কোনো লেখক করেছেন।

এ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রীয় বনাম ব্যক্তি মালিকানার বিষয়টি ভালভাবে উপলব্ধি করার জন্য ইসলামের প্রথম যুগের একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়। সিরিয়া ও ইরাক বিজয়ের পর সদ্য অধিকৃত ভূমি বিজয়ী সেনাবাহিনীর মধ্যে বিতরণ করা হবে - না রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকবে এ নিয়ে মহানবী (সা.)-এর সাহাবাদের মধ্যে এক বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। হযরত যুবায়ের, বিলাল, আবদুর রহমান ইবনে আউফ,



www.pathagar.com

সালমান ফারসী এবং আরও কতিপয় সাহাবি (রা.) অধিকৃত ভূমি সৈনিকদের মধ্যে বিতরণের দাবী জানান। অপরদিকে উমর, আলী, মুআয বিন জাবাল (রা.) ভবিষ্যৎ মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং রাষ্ট্রের রাজস্ব বৃদ্ধিকল্পে এসব ভূমি রাষ্ট্রীয় মালিকানায় রাখার পক্ষে মত ব্যক্ত করেন। দু'-তিন দিন যাবৎ দীর্ঘ বিতর্কের পর মজলিশ-ই-শুরায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, এ সব ভূমি রাষ্ট্রের মালিকানায় থাকবে যা সাহাবিগণের দ্বারা সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয় এবং সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত হয়েছিল। বিজিত ভূমি রাষ্ট্রীয় ভূমিতে পরিণত হয় এবং তা একপ্রকার ভূমিকর (খারাজ) এর বিনিময়ে কৃষকদের নিকট ইজারা দেয়া হয়। ভূমি করের বাৎসরিক আয় রাষ্ট্রযন্ত্রের পরিচালন ও জনকল্যাণে ব্যয় করা হত।[৩]

এ ঘটনা স্পষ্টতই প্রমাণ করে যে যখন কোনো সম্পদকে রাষ্ট্রীয় অথবা ব্যক্তি সম্পদে পরিণত করার এখতিয়ার থাকে তখন জনকল্যাণের বিষয়টিকে অত্যধিক গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। আর কিয়াসের ভিত্তিতে এর অনুরূপ অন্যান্য ক্ষেত্রেও এ দৃষ্টান্ত সমভাবে প্রযোজ্য হতে পারে।

বর্তমানে ইসলামী রাষ্ট্র ইরান ও পাকিস্তানে ব্যাংকিং ব্যবস্থা, বীমা ও (ভারী) মৌলিক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ অধিকাংশ আলেমদের সমর্থনে জাতীয়করণ করা হয়েছে। ইরানের উলামা পরিচালিত সরকার জাতীয়করণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এমনকি বাংলাদেশেও ইসলামী দলসমূহ ইতোমধ্যে জাতীয়করণকৃত মূল সেক্টরগুলোর বিরাষ্ট্রীয়করণ প্রক্রিয়াকে সমর্থন করেনি। এতে প্রতীয়মান হয় যে, উলামা সমাজ ও ইসলামী দলসমূহের নিকট ক্রমশ গণস্বার্থে মূল অর্থনৈতিক সেক্টরগুলোর জাতীয়করণ করার প্রয়োজনীয়তা গ্রহণীয় হয়ে উঠেছে।

বর্তমানে সম্পদের কেন্দ্রীভূত করে পাহাড় গড়া অর্থনৈতিক অবিচার এবং সামাজিকভাবে মারাত্মক অর্থনৈতিক ক্ষতি প্রতিরোধ কল্পে 'জাতীয়করণ' ইসলামী সরকারের একটি কর্মপদ্ধতি হতে পারে কিনা তা এ পর্যায়ে বিবেচনা করা যেতে পারে। সম্পদের কেন্দ্রীভূত করার ক্ষেত্রে ইসলামের নিষেধাজ্ঞা[৪] এবং ন্যায় বিচারের (সুষ্ঠু বণ্টনের)[৫] উপর গুরত্বারোপ বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। সমাজের সকল প্রকার অবিচার ও অসাম্য বিদূরিত করা নবীদের একটি কর্তব্য ছিল যা সূরা হাদীদে উল্লেখ করা হয়েছে।

> নিশ্চয়ই আমরা নবীদেরকে স্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি, তাঁদেরকে দেয়া হয়েছে গ্রন্থ এবং আরও দেয়া হয়েছে সত্যাসত্য নিরূপণের মানদণ্ড, যাতে তারা ভারসাম্য ও ইনসাফের উপর মানবতাকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। (সূরা হাদীদ: আয়াত ২৫)

নবী রাসূলগণের অবর্তমানে মানবতাকে ভারসাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করা মুসলিম মিল্লাত বিশেষ করে সরকারের দায়িত্ব। যদি কোনো উদ্ভুত পরিস্থিতির কারণে ভারসাম্য বিনষ্ট হয় তাহলে তা ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন। ক্ষতিপূরণসহ বা



www.pathagar.com

ক্ষতিপূরণ ব্যতিত (অবৈধ পন্থায় আহরিত সম্পদের ক্ষেত্রে) জাতীয়করণ ইসলামী সরকারের একটি কর্মপন্থা হতে পারে। যাহোক, অনুরূপ সিদ্ধান্ত বা কর্মপন্থা ইনসাফ ও জনগণের প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রতিফলিত মতামতের ভিত্তিতে হতে হবে। অনুমান ভিত্তিক বা কারো খেয়ালখুশী মতো তা করা ঠিক হবে না।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, জাতীয়করণ (Nationalization) পরিভাষার পরিবর্তে জাতীয় ব্যবস্থাপনা (National Management) পরিভাষাটি ব্যবহার করা অধিক যুক্তিযুক্ত। জাতীয় ব্যবস্থাপনা পরিভাষাটি ইসলামী ভাবধারার সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল বলে মনে হয়। কেননা ইসলামে সরকার বা ব্যক্তি কেউ মালিক হননা, সবাই ব্যবস্থাপনা করেন।

তথ্যসূত্র

১. Nazatullah Siddiqi: Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature, Islamic Foundation, UK. খুরশীদ আহমদ সম্পাদিত, দশম অধ্যায়, পৃষ্ঠা: ১৯৭।

২. শহীদ আবদুল কাদের আওদাহ: আল মাল ওয়াল হুকুম ফিল ইসলাম, নাজাতুল্লাহ সিদ্দিকী কর্তৃক উদ্ধৃত।

৩. দ্রষ্টব্য: ক. সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, তাফহীমুল কুরআন, সূরা হাশরের তাফসির, সপ্তদশ খণ্ড।

খ. ইমাম আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ।

গ. ইমাম আবু উবায়েদ, কিতাবুল আমওয়াল।

৪. সূরা হাশর ঃ আয়াত ৭।

৫. সূরা নহল ঃ আয়াত ৯০।



www.pathagar.com

www.pathagar.com

# পরিশিষ্ট



www.pathagar.com

# বিষয়ভিত্তিক সূচি


**মানবাধিকার**

ইসলামের দৃষ্টিতে মানবাধিকার // ৫৫

**আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও পররাষ্ট্রনীতি**

ইসরাইলকে কেন স্বীকৃতি দেয়া সঙ্গত নয় // ৮০

ধর্মীয় মিলিট্যান্সির উপর বিআইআইএসএস-এর সেমিনারে আমার অংশগ্রহণ ও অভিজ্ঞতা // ৯৬

ভারতের সাথে অমীমাংসিত ইস্যুর ব্যাপারে আলোচনার মাধ্যমে প্যাকেজ ডিল করা উচিত // ৩৪৪

**বিশ্ব বাস্তবতা**

মুসলিম বিশ্বের বর্তমান সময়ের প্রধান ইস্যুসমূহ // ১৩

মুসলিম উম্মাহর সমস্যা থেকে উত্তরণ ঃ কিছু ভাবনা // ২৭

ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মুসলিম জাগরণ // ৮৪

পারিবারিক নির্যাতন একটি বিশ্ব সমস্যা // ৯০

বিশ্বের সবচেয়ে বড় সমস্যা স্রষ্টাকে ভুলে যাওয়া // ৯৩

যে সংঘাতের সীমান্ত নেই // ১৪৬

**ইসলামী অর্থনীতি**

ইসলামী অর্থনীতি ঃ দর্শন ও কর্মকৌশল // ৪১৯

ইসলামী অর্থনীতি ঃ প্রয়োগ ও বাস্তবতা // ৪২৭

ইসলামী অর্থনীতি ও তার বাস্তবায়ন // ৪৩৬

ইসলামী অর্থনীতি ঃ কিছু দিক // ৪৩৮

ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য // ৪৮৩

ইসলামী অর্থনীতির প্রথম মডেল // ৪৮৭

ইসলামী অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকা // ৪৯৪

ইসলামের দৃষ্টিতে জাতীয়করণ ঃ তত্ত্ব ও প্রয়োগ // ৫১৭




www.pathagar.com

**ইসলামী ব্যাংকিং**

ইসলামী ব্যাংকের বিরুদ্ধে প্রচারণা ঃ নেপথ্যে কী কারণ // ৭৭
ইসলামী ব্যাংকিংয়ে মৌলিক কোনো ত্রুটি নেই // ২৫১
বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং ঃ ঐতিহাসিক ভূমিকা // ৪৫১
ইসলামী ব্যাংকিং ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা // ৪৫৫
বিশ্ব আর্থিক সঙ্কট ঃ অংশীদারিত্ব ব্যাংকিংই একমাত্র সমাধান // ৪৬৪

**দারিদ্র্য বিমোচন, ক্ষুদ্রঋণ ও ওয়াকফ**

পথশিশুদের রক্ষা করা এবং
দারিদ্র্য দূরীকরণের সামগ্রিক পদক্ষেপ // ২৩৩
ক্ষুদ্রঋণ দ্বারা দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব নয় // ৩১৮
দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সুপারভাইজড যাকাত ব্যবস্থা
প্রবর্তন করা উচিত // ৩৩৬
দারিদ্র্য দূর করার প্রধান উপায় হলো উন্নয়ন // ৩৪১
জনগণকে মহাজনদের হাত থেকে রক্ষা করতে
ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি অব্যাহত রাখতে হবে // ৩৫১
দারিদ্র্য বিমোচন ঃ ইসলামের কৌশল // ৪৬৯
ওয়াকফ ঃ প্রয়োজন নতুন আন্দোলন // ৪৭৬

**যাকাত ও ওশরের বিধান**

যাকাত আদায়ের বিধান // ৩৭৮
ওশরের বিধান // ৫১০

**ধর্ম ও ইসলাম**

সামাজিক সমস্যা সমাধানে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের
ইমাম প্রশিক্ষণ প্রকল্প // ১০৬
রাষ্ট্রধর্মের ইতিহাস ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ // ২২৯
'জিহাদি' শব্দের অপব্যবহার // ২৪৮
কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা // ২৫৪
ইসলামী দাওয়াতের কর্মপদ্ধতি // ৩৬১
শক্তিশালী মুসলিম উম্মাহ গঠন // ৩৬৫
হাদিসের পরস্পর বিরোধিতা দূর করার উপায় // ৩৭৫
উসুলে ফিকাহয় কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যার মূলনীতি // ৩৮১
ফতোয়া ঃ ঐতিহাসিক ও আইনগত প্রেক্ষাপট // ৩৮৯
ইসলাম ও জননিরাপত্তা // ৩৯৪
জুমার খুতবার মান উন্নয়ন // ৪০৬



www.pathagar.com

## গণতন্ত্র ও ইসলাম

গণতন্ত্র ঃ প্রেক্ষিত ইসলাম ও মুসলিম বিশ্ব // ২১
ধর্মীয় দল নিষিদ্ধ করার অসঙ্গত চিন্তা // ২৬৮
ইসলাম বহুদলীয় গণতন্ত্রের বিরোধী নয় // ২৭৩
জিহাদ ও সন্ত্রাস এক নয় গণতন্ত্রই সঠিক পথ // ৩৩৩

## নেতৃত্ব ও আদর্শ

মহৎ আদর্শের জন্য কাজ করতে হলে // ৩১
এ দেশে ইসলাম কায়েম না হওয়ার পেছনে মূল সমস্যা হচ্ছে সকল পর্যায়ে লিডারশিপ তৈরি না হওয়া // ৩০১

## শিক্ষা

মাদরাসা শিক্ষার সংস্কার প্রসঙ্গে // ১৪২
শিক্ষা, সভ্যতা, ধর্ম ও সেকুলারিজম // ১৫৯
শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ঃ সব ধর্মীয় শিক্ষার অবমূল্যায়ন প্রধান বৈশিষ্ট্য // ১৬৬
বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে নবী জীবনের শিক্ষা // ৩৯৭
আমাদের রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিক্ষার পাঠক্রমে সংশোধন দরকার // ৪০৭
সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শালীনতার সমস্যা // ৪১১
কওমি মাদরাসা শিক্ষার অগ্রগতির জন্য কিছু প্রস্তাব // ৪১৪

## শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ঃ একটি পর্যালোচনা // ৩৫
সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক // ৪০
ইসলামি সংস্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্য তৌহিদ // ৪৭
সংস্কৃতি আইনের চেয়ে শক্তিশালী // ৫০
অশ্লীল সংস্কৃতির প্রতীক ভ্যালেন্টাইন ডে // ৫২
টিভি কম দেখুন ঃ সময়কে কাজে লাগান // ৬০
আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য // ১২২
একজন লেখক প্রকৃতপক্ষে বইয়েরই প্রোডাক্ট // ১৩৬
শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতির অগ্রগতি // ১৫০
সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও ধর্ম // ১৫৪
নয়া দিগন্তের একটি কলাম ও বাউল প্রসঙ্গ // ২৩৭
নজরুল জন্মবার্ষিকী ও সাহিত্যিকদের মূল্যায়ন // ২৫৮
অল্প বয়সে প্রেমে জড়িয়ে পড়া // ২৬০
তৌহিদই আমাদের সংস্কৃতির মূল ভিত্তি // ২৮৮



www.pathagar.com

**উৎসব**


ঈদ সংস্কৃতির স্বরূপ ও মূল্যায়ন // ১৩২
উৎসব পালন ঃ বিভিন্ন দিক // ১৩৯
হজ, ঈদুল আজহা ও কুরবানি // ৪০১


**ব্যক্তিত্ব, জীবন ও কর্ম**


ঐক্য ও নেতৃত্বে জামাল উদ্দীন আফগানী // ৬৯
ইকবাল ও তার রাজনৈতিক অবদান // ৭৩
মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর শ্রেষ্ঠ কৃতি তাঁর 'তাফসীরুল কোরআন' // ১১১
কাজী নজরুল ইসলাম ঃ প্রসঙ্গ ভাবনা // ১২৮
একজন শ্রেষ্ঠ নারী বেগম রোকেয়া // ২০২
কবি গোলাম মোস্তফা প্রকৃতপক্ষেই বাংলাদেশের গুটিকয়েক শ্রেষ্ঠ সন্তানদের একজন ছিলেন // ২৯৬
দি মেসেজ অব দি কুরআন এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাফসির // ৩৬৯


**নারী সমাজ**


সমাজ ও সংস্কৃতিতে নারীর অবস্থান // ১১৫
কর্মজীবী মেয়েদের বাসস্থান সমস্যা // ১১৮
ইসলামে নারীর মর্যাদা, অধিকার ও ক্ষমতায়ন // ১৮১
ইসলামে আর্থিক সুবিধা পুত্রের চেয়ে কন্যার বেশি // ১৮৭
ইসলামে শালীনতা, পোশাকের দর্শন ও বিধানাবলী // ১৯২
শহরাঞ্চলের ছিন্নমূল দুঃস্থ মহিলাদের পুনর্বাসন // ১৯৯
গৃহকর্মীর মূল্যায়ন ও মর্যাদা // ২০৭
সিভিল কোড প্রসঙ্গে // ২১৬
নাতির সম্পত্তির অধিকার // ২১৯
নারীনীতি নিয়ে বিভ্রান্তি ঃ কিছু সংশোধন জরুরি // ২৩১


**যৌতুক ও তালাক**


তালাকপ্রাপ্তা নারীর খোরপোষ // ১৮৯
বাংলাদেশে যৌতুক ঃ প্রয়োজন একটি সামাজিক আন্দোলন // ২১৩
তালাক পরবর্তীতে নারীর নিরাপত্তা ঃ একটি সামাজিক সমস্যা // ২২২


**পতিতাবৃত্তি**


পতিতাবৃত্তি ঃ কারণ ও প্রতিকার // ১৯৬
পতিতাবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রতীক শবমেহের // ২০৫
পতিতাবৃত্তি নিষিদ্ধ করে তাদের পুনর্বাসন করতে হবে // ২২৪




www.pathagar.com

**জাতীয় সমস্যা**
একটি সামাজিক ও একটি আইনি সমস্যা // ২৪৫
সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ কাদের বিরুদ্ধে? // ২৬৩
আজকের প্রজন্ম নতুন ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন // ২৬৫
শুক্রবারের পরিবর্তে রবিবার ছুটি অসঙ্গত // ৩৫৭

**প্রশাসন, আইন ও বিচার বিভাগ**
শিশু গ্রহণ আইন // ২০৮
শিশু গ্রহণ ও পালন আইন প্রণয়ন // ২১০
বিচার বিভাগের জবাবদিহিতা ও মাতৃত্ব ছুটি বাড়ানো // ২৩৯
বিচার পদ্ধতির সংস্কার প্রয়োজন // ২৫৬
পুলিশ প্রশাসনকে ইউরোপ-আমেরিকার পুলিশ প্রশাসনের আদলে সম্পূর্ণ ঢেলে সাজানো ও পুনর্গঠন প্রয়োজন // ২৯৯

**মিডিয়া**
টিভি চ্যানেল কর্তৃপক্ষের নিকট কিছু প্রস্তাব // ৬৪
সাংবাদিকদের পাঠাভ্যাস জরুরি // ১৬৯
সংবাদপত্রের সততা ও নিরপেক্ষতা // ১৭৫

**শেয়ার বাজার**
শেয়ার বাজার ও আইনের শাসন // ২৪১
শেয়ারবাজার সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা // ২৪৩

**কৃষি**
বিভিন্ন ফসলের বাম্পার ফলনের ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় // ২৩৫



www.pathagar.com

www.pathagar.com

# নির্বাচিত সংকলন

শাহ আবদুল হান্নান

Nirbachito Sankalan : Shah Abdul Hannan
First Publication : September 2013
Bookmaster, Dhaka, Bangladesh.
Cover Design : Zia Shams
Price : Tk. 600.00

BOOKMASTER